ন্যয়েই কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। মুখে মুখে বিস্তৃত সাহিত্যকে শিক্ষা দিতে, ও রক্ষা করিতে হইলে, তাহার মূল তত্ত্ব সকলকে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত আকারে নিবদ্ধ করিলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রাচীন ভারতের শ্রুতিযুগে, সূত্র সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রাদি এইজন্য সেই যুগের সাহিত্যেরই অন্তর্গত। কিন্তু কেবল শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রেই সূত্রসাহিত্য শেষ হয় নাই। শ্রোত ও গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে চরণ, শাখা ও প্রবরাদি, প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের এই বিভিন্ন বিভাগের আচার ব্যবহার ও বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ধর্ম্মসূত্র অবশ্যই রচিত হইয়াছিল, ম্যাক্সমূলর সর্ব্বপ্রথমে এই মত প্রচার করেন। সেই সকল ধর্ম্মসূত্র অবলম্বনেই পরবর্ত্তী ধর্ম্মস্মৃতি সকল রচিত হয়। অতএব মনুর স্মৃতিও ঐরূপ একটা ধর্ম্ম সূত্রেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিছু কাল পূর্ব্বে এই মানবসূত্রের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়া ম্যাক্সমূলরের এই মতকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অতি আদিকাল হইতে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে, অশোকের রাজত্বের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত, সংস্কৃত সাহিত্যের এই শ্রুতিযুগ বহমান ছিল। অশোকের সময় হইতেই লিপিযুগের আরম্ভ। সংস্কৃত বর্ণমালা ও লিপিপ্রণালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে দুই মত প্রচলিত আছে। এক মতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যেরা ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতে বর্ণমালা ও লিপিপ্রণালী শিক্ষা করেন। গ্রীকেরাও ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতেই বর্ণমালা লাভ করিয়াছিলেন। অপর পণ্ডিতেরা বলেন যে ভারতীয় আর্য্যেরা সাক্ষাৎ ভাবে ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু ফিনিশীয়দিগের শিষ্য গ্রীক্‌দিগের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে উত্তর ভারতে দুই প্রকারের বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। ইহার একটীকে লাটলিপি কহে। আলেকজেণ্ডারের পূর্ব্বে ভারতে লাটলিপি প্রচলিত ছিল বলিয়া, কেহ কেহ মনে করেন, এই লিপিতেই তদানীন্তন কালে চিঠিপত্র ও হিসাবাদি লেখা হইত। অতএব এই লাটলিপি সাক্ষাৎভাবে ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতেই ভারতে আসিয়াছিল কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ম্যাক্সমূলরের মতে প্রাচীন ভারতের উভয়বিধ বর্ণমালাই গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে আর্য্যেরা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপেই ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ বর্ণলিপি শিক্ষা করুন না কেন, অশোকের সময়ের বহু পূর্ব্বে যে এ দেশে লিখিত সাহিত্য ছিল না, ইহা একরূপ স্থির নিশ্চিত। ম্যাক্সমূলর সংস্কৃত সাহিত্যের দুই যুগ বিভাগ করিয়া, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের অনেক জটিল বিষয়ের যে বিশদ মীমাংসার উপায় করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই বর্ত্তমান যুগের বৈদিক সাহিত্যের আলোচনার ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে।

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় ম্যাক্সমূলরের কার্য্য।

ম্যাক্সমূলর বৈদিক সাহিত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—(১) সংহিতা; (২) ব্রাহ্মণ; (৩) উপনিষদ্‌। এই বিভাগ সঙ্গত ও সমীচীন, এবং আজি পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত এই বিভাগের বিরুদ্ধে কোনও মতামত প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু এই বিভাগত্রয়ের তিনি যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। তাঁহার মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব দশম শতাব্দীর মধ্যে বেদের সংহিতা ভাগের রচনা শেষ হয়। এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০০০ হইতে ৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণভাগের কাল, এবং তৎপরে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত উপনিষদের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কাল বিভাগ সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। তিনি যেমন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে বেদের আরম্ভ কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ অপর কেহ বা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীকে ঋগ্বেদের কাল বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফলতঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে, কাল নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। প্রাচীন ইহুদার ইতিহাসে অপর জাতির আক্রমণাদির উল্লেখ আছে। অপর দেশের রাজাদের নাম পর্য্যন্ত ইহুদীয় শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল জাতির বা রাজার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি আলোচনা ও অনুশাসনাদি উদ্ধার করিয়া পণ্ডিতেরা তাহার সাহায্যে, ইহুদীয় ইতিহাসের কাল নির্ণয় করিতে পারিতেছেন। প্রাচীন ভারতে গ্রীক্‌দিগের পূর্ব্বে অন্য কোনও যবন জাতির সঙ্গে আর্য্যদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদির উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদিগের প্রাচীন

ইতিহাসে কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা কোনও প্রকারেই সফল হইতে পারে না। বেদের সংহিতা ভাগ রচিত হইতে কত কাল যে লাগিয়াছিল কে বলিতে পারে? আবার বেদের সংহিতাকে ঋক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়া, ঋক্‌ প্রথমে, তার পর যজু, তৎপরে সাম, সর্ব্বশেষে পরিশিষ্টরূপে অথর্ব্ব রচিত হইয়াছিল, একথারই বা প্রমাণ কোথায়? অথচ য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বৈদিক সংহিতার রচনার এই ক্রম বেদ বাক্যের মত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে ভারতীয় ভাষ্যকারগণের মতই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ঋক্‌ অর্থে পদ্য, যজু অর্থে গদ্য এবং সাম অর্থে গান, বেদের কোনও অংশ পদ্য কোনও অংশ গদ্য কোনও অংশ বা গান এই জন্যই "ত্রয়ী বেদাঃ" কথা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদের প্রকৃতি-অনুযায়ী এই বিভাগত্রয়কে কালানুযায়ী বিভাগ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা অথর্ব্ববেদকে পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অথর্ব্ব বেদ অপর বেদত্রয়ের পরিশিষ্ট নহে, কিন্তু যজ্ঞার্থে সংগৃহীত ও রচিত বলিয়া, তাহাতে ঋক্‌, যজু ও সাম এই তিনই পাওয়া যায়। বেদ প্রথম হইতেই, একই সঙ্গে, পদ্যে, গদ্যে ও গানের আকারে রচিত হইতেছিল; এবং একই কালে সমুদায় সংহিতা সঙ্কলিত হয়, প্রাচীন ভাষ্যকারগণের এই মত, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষা সমধিক যুক্তিযুক্ত। তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদকেও সংহিতার সমকালীন মনে করিয়া, বৈদিক সাহিত্যে ক্রম বিকাশের সত্যতা যে অস্বীকার করেন, এই বিষয়ে ভাষ্যকারেরা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত।

যেমন বৈদিক সংহিতার কালবিভাগ করিতে গিয়া, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া ম্যাক্সমূলর অশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রথমে, বৈদিক ধর্ম্মের মর্ম্ম উদ্ঘাটনেও প্রাচীন নিরুক্তকারদিগের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র আধিভৌতিক অর্থে, বৈদিক সুক্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও তিনি অশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব মত বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছিল; এবং অবশেষে সায়ণাচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া, বেদের সদর্থ নির্ণয় করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এই কথা পর্য্যন্ত তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

পুরাণ ও কাব্যের কাল নির্ণয়।

যেমন বৈদিক সাহিত্যের কাল-নির্ণয়ে সেইরূপ পৌরাণিক সাহিত্য এবং প্রাচীন কাব্যাদির কাল নির্ণয়েও ম্যাক্সমূলর অশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। উইলসনের অনুসরণ করিয়া তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী যুগে সমুদায় পুরাণ রচিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই কারণেই তিনি পুরাণাদির চর্চ্চায় তেমন মনোনিবেশ করেন নাই। এই জন্যই ভারতীয় ধর্ম্ম-বিকাশের ক্রম নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, তিনি শঙ্কর-বেদান্তকেই, হিন্দুর তত্ত্ব-বিচারের চরমকালরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদের ন্যায়, পুরাণেরও এইরূপ কাল নির্ণয় চেষ্টা বৃথা। উইলসন এবং ম্যাক্সমূলর উভয়েরই এই সিদ্ধান্ত কোনও উপযুক্ত প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বিক্রমাদিত্যের সময়ে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি, ম্যাক্স মূলর, এই আর এক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদ ও তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হইলে পরে, কোনও কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা ভারতে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। বিক্রমের সময় ইহার পুনরালোচনা আরম্ভ হইয়া, ভারতীয় সাহিত্যের এক নব যুগের অভ্যুদয় হয়। মহাকবি কালিদাসই এই নবযুগের যুগাবতার। কিন্তু বুলারপ্রমুখ পণ্ডিতগণ, ম্যাক্স মূলরের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। অশ্বঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারেরা, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃত চর্চ্চা যে প্রাচীন ভারতে কখনও বিলোপ পাইয়াছিল, ইহার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালিদাস প্রভৃতির ভাষা ও ছন্দাদি তাঁহাদের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা সপ্রমাণ হওয়াতে ম্যাক্স মূলর সংস্কৃত কাব্য-যুগের যে কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তারবিহীন তাড়িত বার্ত্তা।

বহুদিন হইতেই তার বিহীন তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণের চেষ্টা হইতেছিল। এমন কি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাণ্ডি (Dundee) সহরের মিষ্টার টি বি লিণ্ডজে (Mr T. B, Lindsay) ডাণ্ডি ডকসের অপর পারে ও ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে টে (Tay) নদীর এক পার হইতে অপর পারে এবং এবার্ডিন (Aberdeen) সহরে ডী (Dee) নদীর এক পার হইতে অন্য পারে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটার সঞ্চালন (needle deflection) দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি নদীর দক্ষিণ পারে একটি ধাতব পাত জলের নীচে রাখিয়া বেটারির পজিটিবদিকের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নিগেটিবদিক্ সেইরূপ অন্য একটি জলমগ্ন পাতের সহিত লম্বা তার দ্বারা সংযোজিত ছিল। এই দ্বিতীয় পাতটি প্রথম পাত হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এবং এই দূরত্ব নদীর প্রস্থ হইতে অনেক বেশী। বাম পারেও ঠিক ঐরূপ দুইটী পাত প্রোথিত ছিল, কিন্তু অন্য পাত অপেক্ষা খাট তার দ্বারা সংযোজিত এবং মাঝখানে একটি গেল্‌বেনোমেটার ছিল। এই গেল্‌বেনোমেটারের (Galvanometer) কাঁটার সঞ্চালন দ্বারা বার্ত্তা লওয়া হইত। তাড়িত প্রবাহ পজিটিব দিক্ হইতে নির্গত হইয়া জলে আসিয়া শাখা প্রবাহে বিভক্ত হইত। একটি প্রবাহ নদী পার হইয়া গেল্‌বেনোমেটারের ভিতর দিয়া যাইয়া পুনর্ব্বার নদী পার হইয়া নিগেটিবে আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর প্রীস্ (Priece) সাহেবও এইরূপ কয়েকটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এস্থলেও তাড়িত প্রবাহ সমুদ্র বাহিয়া যাইত; এবং টেলিফোণের সাহায্যে মরসের সাঙ্কেতিক (Morse's Telegraph Signals) শব্দ (যাহা এখনও টেলিগ্রাফ আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) পড়া হইত। এই প্রণালী অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে লেবারনক্ (Lavernock) ও ফ্লেট্‌হলমে (Flatholne) প্রতিদিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আমরা এখানে যে প্রণালীর কথা বলিব তাহাতে তাড়িত প্রবাহ আকাশ বাহিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। হার্টজ (Hertz) সাহেবই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক যদিও এই প্রণালী যে সব মতের উপরে নির্ভর করে, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তথাপি মহাত্মা ফ্যারাডে (Faraday) ও ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েল (Clerk Maxwell) প্রবর্ত্তিত মতের কিছু উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল এক বস্তুর তড়িৎ অন্য একটি দূরস্থিত বস্তুতে তাড়িত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে কোন মধ্যবর্ত্তীর সাহায্য গ্রহণ করে না। যেমন একটি চুম্বক দূরস্থিত একখানি লৌহফলকে তাহার আকর্ষণ শক্তি চালনা করে, সেইরূপ তড়িৎও দূরস্থিত কোন বস্তুতে তাহার ক্রিয়া সম্পাদন করে। ফ্যারাডে সাহেবই প্রথমে পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার 'লাইনস্ অব্ ফোরস্' (Lines of force) মত পোষণ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থিতিস্থাপক (elastic) বস্তুর মধ্যবর্ত্তিতাতে আকর্ষণের তারতম্য দেখাইয়া, স্থিতিস্থাপক বস্তুর সাহায্য প্রতিপন্ন করেন। তৎপরে ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল সাহেব এই মতের বহুল উন্নতি সাধন করিয়া আলোকরশ্মির সহিত তাড়িত রশ্মির একত্ববাদ প্রচলন করেন। এই মত "ফ্যারাডে ম্যাক্স্‌ওয়েল ইলেক্ট্রোমেগ্‌নেটিক থিয়রি অব্ লাইট্" (Electromagnetic Theory of Light) নামে প্রচলিত। এখানে সর্ব্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম ঈথরই স্থিতিস্থাপক মধ্যবর্ত্তীর কার্য্য করিতে সমর্থ। এই মত মহাত্মা হার্টজ সাহেব সর্ব্বপ্রথম ৮৮ সনে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপাদন করেন। তদবধি [illegible] পোষকগণ ইহার বহুল উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছেন।

১ নং চিত্রে সঙ্কেত প্রেরণের যন্ত্র দেখান হইয়াছে।— "ক" একটি রম্‌করফ্‌স্ কয়েল (Ruhmkorfs coil), "খ" তাহার প্রাইমারী কয়েল (Primary coil), এবং "গ" তাহার সেকেণ্ডরি কয়েল (Secondary coil)। "ঘ" একটি বেটারি; তাহার একদিক্ প্রাইমারির এক দিকের সঙ্গে সংযোজিত ও অন্য দিক্ একটি ছোট ধাতব পাতের সহিত সংযোজিত রহিয়াছে। এই পাতটির ঠিক উপরেই "ঙ" চিহ্নিত একটি স্প্রীং রহিয়াছে, এই স্প্রীংটি প্রাইমারির অপর দিকের সহিত সংযোজিত। "ঙ" চিহ্নিত স্প্রীংটী পাতের উপর চাপিয়া ধরিলেই বেটারি হইতে তাড়িত প্রবাহ নির্গত হইয়া প্রাইমারিতে প্রবাহিত হয়। স্প্রীং ছাড়িয়া দিলেই তাড়ি-
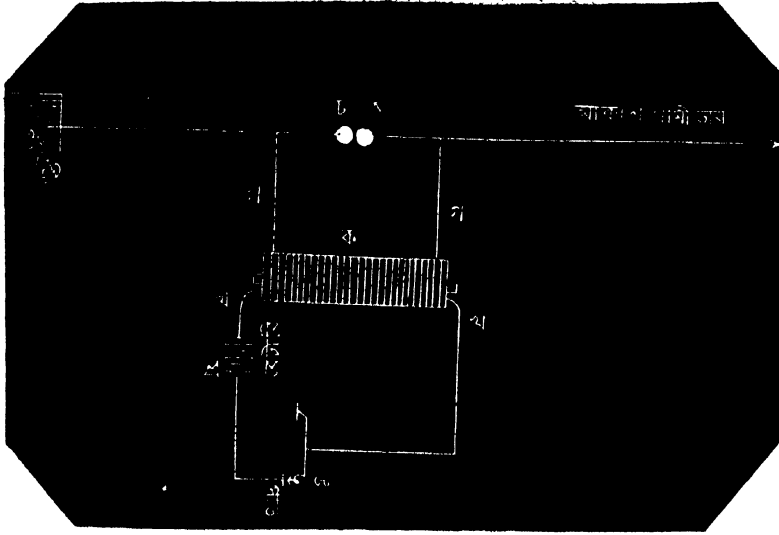
১নং চিত্র।

প্রবাহ প্রতিহত হইয়া যায়। এবং সেই মুহূর্ত্তে ক্ষণকালের নিমিত্ত সেকেণ্ডরি কয়েলে অতি বেগে তাড়িত প্রবাহ উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সেকেণ্ডরি কয়েলের দুই দিকে দুইটি "চ" ও "চ" চিহ্নিত প্লেটিনাম কিম্বা অন্য ধাতু নির্ম্মিত ছোট ছোট বর্ত্তুল সংযোজিত; আবার এই বর্ত্তুল দুটির একটি তারদ্বারা পৃথিবীর সহিত ও অন্যটি একটি আকাশগামী তারের সহিত সংযোজিত। এই আকাশগামী তারটি পৃথিবী হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন, ইহার তড়িৎ কোনরূপেই পৃথিবীতে যাইতে পারে না। বর্ত্তুল দুটির মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। "ঙ" চিহ্নিত স্প্রীংটি চাপিয়া ছাড়িয়া দিলেই, সেই উদ্দীপিত তাড়িত প্রবাহ সেই মুহূর্ত্তে বর্ত্তুল দুইটির মধ্যস্থলে একটি তাড়িতস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করে। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই তাড়িতস্ফুলিঙ্গ যদিও একটি বলিয়া মনে হয় তথাপি উহা বহু বহু সংখ্যক স্ফুলিঙ্গের সমষ্টি মাত্র।

জলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে যেমন তরঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং সেই তরঙ্গরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ঈথরসমুদ্রে কোন প্রকারের আঘাত লাগিলে ঈথরতরঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ঈথর সমুদ্রের তরঙ্গমালা চক্ষুর স্নায়ুতে আঘাত করিয়া আলোক অনুভূতির উৎপাদন করে। কিন্তু এই সকল তরঙ্গমালা ছোট বড় নানা প্রকারের। তাহার কতকগুলি আলোক তরঙ্গ, আবার কতকগুলি অদৃশ্য তরঙ্গ। এই অদৃশ্য তরঙ্গেরও নানা বিভাগ আছে। তাহার এক বিভাগ তাড়িত তরঙ্গ। আলোকরশ্মি যেমন আমাদের চক্ষুর সাহায্যে বোধগম্য হয়, সেইরূপ তাড়িতরশ্মিও তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে বোধগম্য হইতে পারে। সেই বিশেষ তাড়িত যন্ত্রকে "তাড়িত চক্ষু" বলা যাইতে পারে।

একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সৃষ্ট হইয়াই চতুর্দ্দিকে আলোক তরঙ্গ উৎপাদন করে, সেইরূপ তাড়িতস্ফুলিঙ্গও তৎক্ষণাৎ তাড়িততরঙ্গ উৎপাদন করে; এবং এই "তাড়িত চক্ষুর" সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

২ নং চিত্রে একটি "তাড়িত চক্ষুর" নানা অংশ দেখান হইয়াছে:—"ট" একটি ছোট বেটারি; "ঠ" একটি এক ইঞ্চি পরিমিত লম্বা সরু কাচের নল, ইহার দুই দিকই বন্ধ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ নিকেল ও রৌপ্য চূর্ণ দ্বারা অসংলগ্ন ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে ও দুই দিক হইতে দুটি প্লেটিনামের তারের সহিত সংযোজিত, এই তার দুটির মধ্যের ব্যবধান অতি যৎসামান্য। বাহিরের দিকে তার দুটি বেটারির পজিটিব ও নিগেটিব প্রান্তের সহিত সংযোজিত, আবার তেমনই একটী পৃথিবীর সহিত ও অন্যটী পূর্ব্বকথিত আকাশগামী তারের ন্যায় আর একটী তারের সহিত সংযোজিত। বেটারি ও কাচের নলের (যাহাকে "কহেরার" বলে) একদিকের তারের মাঝে একটি টেলিগ্রাফ রিলে (Relay) "ড" সংযোজিত।

প্রথমে "কহেরারের" মধ্যে ধাতব চূর্ণ অসংলগ্ন ভাবে
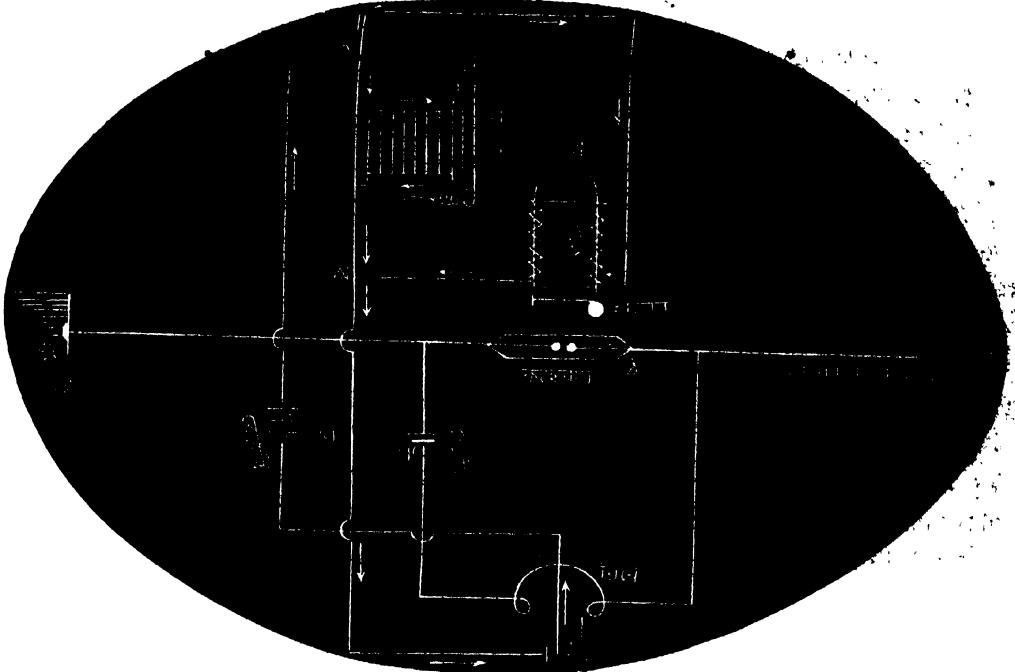
২নং চিত্র।

থাকায় বেটারির তাড়িত প্রবাহ বহিতে পারে না। কিন্তু যখনই কোন তাড়িত তরঙ্গের আঘাত লাগে, তখনই সেই অসংলগ্ন ভাব কিরূপ হইয়া যায়, আর অমনি তাড়িত প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করে ও রিলের কাঁটা সরিয়া আসে। এখন "কহেরারটি" একটু নাড়া দিলেই পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাড়িত প্রবাহ প্রতিহত করিয়া দেয়, এবং রিলের কাঁটা পুনরায় সরিয়া যায়। এই এদিক ওদিক সরিয়া আসা যাওয়ায় আমরা তাড়িত তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি।

রিলে যন্ত্রটীর আরও বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। "চ" একটি বেটারি, ইহার পজিটিব দিক্ হইতে প্রবাহ নির্গত হইয়া "ণ" তে আসিয়া দুটি শাখা প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা "প" চিহ্নিত ইলেক্‌ট্রিক বেলের (Electric Bell) মধ্য দিয়া, ও অন্যটি "ক" চিহ্নিত মরসের সাউণ্ডারের (Morses' Sounder—যাহা শব্দ করিবার জন্য সকল টেলিগ্রাফ আফিসেই ব্যবহৃত হয়) মধ্য দিয়া পুনরায় "ব"তে আসিয়া এক প্রবাহে মিশিয়া রিলেতে আসিয়া পড়িয়াছে। রিলের অন্য দিক্ নিগেটিবের সহিত সংযোজিত ; কিন্তু তাড়িত প্রবাহ, যখন রিলের কাঁটা সরিয়া আসে, কেবল তখনই বহিতে পারে। তাই যতক্ষণ প্রথম তাড়িত প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই দ্বিতীয় তাড়িত প্রবাহের সম্ভব। দ্বিতীয় তাড়িত প্রবাহ জনন মাত্রই বেল ও সাউণ্ডার দুটি তাহাদের কাজ করিতে থাকে। বেলের হাতুড়ির আঘাত "কহেরারে" লাগে এবং এবং তাহাতেই উহা সাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এখন দেখা যাইবে যে যখনই "ঙ" চিহ্নিত প্রীডে আঘাত হয় সেই মুহূর্ত্তে "চ" ও "চ" চিহ্নিত বর্ত্তুলের মাঝে একটি তাড়িত স্ফুলিঙ্গের ও তাহাতেই চতুর্দ্দিকে তাড়িত তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। সেই তরঙ্গরাশি "ঠ" চিহ্নিত "কহেরারে" আঘাত করিয়া রিলের কাঁটার সঞ্চালন করে, এবং সেই মুহূর্ত্তে সাউণ্ডারে শব্দ হয় ও বেলের হাতুড়ি "কহেরারে" আঘাত করিয়া উহাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করে। পর মুহূর্ত্তে আর একটি তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিলে পুনরায় আর একটি শব্দ হয়, ও হাতুড়ির আঘাতে

"কহেরার" পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দের সমষ্টিতে যে কোন কথাই প্রেরণ করা যায়।

যে ছুটি আকাশগামী তারের কথা বলা হইয়াছে, বহু দূরে বার্ত্তা প্রেরণই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই ছুটি তার যত উচ্চে অবস্থিত হইবে, ততই দূর হইতে বার্ত্তা লওয়া যাইতে পারিবে। মার্কনি (Marconi) সাহেব ইহা প্রথমে ব্যবহার করেন।

আমরা গুটি কতক কথায় এই দুরূহ ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে অনেক কথা বাদ দিতে হইয়াছে। বুঝাইতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না।

বিজ্ঞান জগতে ও সাধারণ্যে এই বিষয়ের এত প্রচলন হইয়াছে যে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ইহার কিছু জানা আবশ্যক। বিশেষতঃ যখন আমাদের দেশের গৌরবস্বরূপ, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ব মত খণ্ডন ও তাঁহার নিজ মত প্রচলন করিয়া বিজ্ঞান জগতের পণ্ডিত মণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হার্টজ সাহেবই প্রথমে এ বিষয়ের পরীক্ষা করেন। তাঁহার "তাড়িত চক্ষু" আমাদের বর্ণিত "তাড়িত চক্ষু" হইতে বিভিন্ন। তাঁহার "তাড়িত চক্ষু" বিশেষভাবে রক্ষিত একটি চক্রাকৃতি তার ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাহাতে যে ছুটি বর্ত্তুল আছে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য এবং তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি করিবার উপায় আছে। তাড়িত তরঙ্গের আঘাত হইলে এই বর্ত্তুল ছুটির মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়।

এই প্রবন্ধে বর্ণিত "তাড়িত চক্ষুর" ক্রিয়া ১৮৯১ সনে ব্রানলি (M. Branly) সাহেব প্রথমে আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক লজ (Prof. Lodge) সাহেবের মত এই যে, তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে ধাতব চূর্ণ সংলগ্ন ভাব ধারণ করে এবং তাহাতেই তড়িৎ প্রবাহিত হইতে সমর্থ হয়। কিন্তু অধ্যাপক বসু মহাশয় সে মত পরীক্ষা দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পটাসিয়াম রিসিভার (Potassium Receiver) দ্বারা দেখাইয়াছেন, যে তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে প্রবাহ ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রতিহত হয়। তাঁহার মতে তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে অণু সকল বিরূপ ভাব ধারণ করে এবং তাহাতেই তাহাদের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শুধু তাহাই নয়, এই মত, জীব ও উদ্ভিদ জগতের অনেকানেক আজ পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বিষয় সহজ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার এই মত প্রায় সর্ব্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও বস্তুগুণ সকল এই মতের আলোকে সহজে বোধগম্য হইবে।

সাময়িক সাহিত্যের কথা।

ব্যাষিংটন আর্বিং "সাহিত্যের পরিবর্ত্তনশীলতা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"Many a man of passable information at the present day, reads scarcely anything but reviews; and before long a man of erudition will be little better than a mere walking catalogue." আজ প্রায় আশী বৎসর হইল আর্বিং এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তখন এডিনবরা রিবিউ, কোয়াটার্লি রিবিউ এবং ব্ল্যাক উড্‌স্ ম্যাগাজিনের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। তাহার পর ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে সাময়িক পত্রের সংখ্যা এরূপ বাড়িয়াছে যে, তাহাদের সকলের নাম লিখিতে হইলেও প্রদীপের কয়েক পৃষ্ঠা লাগিবে। এখন পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অবস্থা এমনই হইয়াছে যে, লোকে ত্রৈমাসিক পত্রের প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ মনে করে; পড়িয়া শেষ করিতে না পারিয়া ক্লান্তিভরে হাই তুলিতে থাকে। মাসিক পত্রের প্রবন্ধগুলিও অনেকে বড়ই দীর্ঘ মনে করেন। মাসিকপত্রের সংখ্যাও অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে। তাই রিবিউ অব্ রিবিউজের সৃষ্টি। তাহাও কি সকলে পড়িয়া উঠিতে পারে? দৈনিক কাগজখানি পড়িয়া উঠাই দায়। উহার সকল অংশ সকলে পড়েন না। কেহ কেবল তারের খবরগুলি পড়েন, কেহবা ঘোড়দৌড়ের বাজির বৃত্তান্ত পড়েন, কেহবা নানা দ্রব্যের, এবং যৌথকারবারের অংশের, বাজার দর পড়েন, কেহবা পুলিস আদালতের মোকদ্দমার বিবরণ মাত্র আগ্রহের সহিত পাঠ করেন।

বাস্তবিক আজি কালিকার দিনে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হওয়া দুর্ঘট। বিদ্যার একটি শাখার, একটী প্রশাখার, একটি পল্লবের সম্যক্ অধিকারী হওয়াও দুর্ঘট। প্রথমেই ত ভাষা শিক্ষা লইয়া বিপন্ন হইতে হয়। বিজ্ঞানের অনেক

উচ্চ অঙ্গ আছে, যদ্বিষয়ক গ্রন্থ ইংরাজীতে অতি অল্পই আছে। ঐ সকল অঙ্গের অনুশীলন করিতে হইলে অন্ততঃ ফরাসী ও জর্ম্মান্ ভাষা জানা দরকার। ইতালীয় ও রুশীয় ভাষা জানিলে আরও ভাল। মনে করুন, কেহ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিয়া ইংরাজী ব্যতীত আরও দুই তিনটি ভাষা শিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহাতেই কি পার পাওয়া যায়? তিনি যদিই বা বিদ্যার একটী প্রশাখার একটি মাত্র পল্লবের কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকারী হইলেন, তথাপি তিনি অল্পই জ্ঞান লাভ করিলেন। আমি এরূপ বলিতেছি না যে কাহারও সর্ব্ববিদ্যাবিৎ হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা বর্ত্তমানকালে একেবারেই অসম্ভব। যে সকল পুস্তক পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক্। বর্ত্তমানকালেই প্রতি বৎসর গ্রেট ব্রিটেন হইতে ৭৫০০, জর্ম্মণী হইতে ২৪০০০, ফ্রান্স হইতে ১৩০০০, ইটালী হইতে ৯০০০, এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ৫০০০ পুস্তক প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এই সকল দেশ হইতে বৎসরে গড়ে ষাট হাজার পুস্তক প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বের গ্রন্থকারদের কত পুস্তক পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালয়ে সঞ্চিত আছে, তাহা বলা যায় না। তবে উহাদের সংখ্যা যে খুব বেশী তাহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ের নিম্নলিখিত পুস্তক সংখ্যা হইতে বুঝা যাইবে।

লাইব্রেরী।			পুস্তক সংখ্যা।
প্যারিস ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী	...	...	২,৩৭০,০০০
মিউনিক্ রয়্যাল লাইব্রেরী	...	...	১,০২৬,০০০
সণ্ট পীটর্সবর্গ ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী	.	...	১,০ ৬,০০০
লণ্ডন ব্রিটিষ মিউজিয়ম্	...	...	১,৫৫০,০০০
কোপেনহেগেন রয়্যাল লাইব্রেরী	...	...	৪৯০,০০০
বার্লিন্ রয়্যাল লাইব্রেরী	...	...	৭৬৬,০০০

এই সকল লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা গত উনিশ বৎসরে না জানি আরও কত বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য সকল পুস্তকই সারবান্ নয়, কিন্তু সারবান্ পুস্তকের সংখ্যাও অন্ততঃ এক লক্ষ হইবে। তালিকাটি দেখিয়াই বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই বলিবেন, তবে আর সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হওয়া গেল না। কিন্তু সকলেইত আর পণ্ডিত হইবার জন্য সৃষ্ট হন নাই। যাঁহারা পণ্ডিত হইবেন, তাঁহারাও বিদ্যার কোন একটি সামান্য অংশে পণ্ডিত হইতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন সকলেরই কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রকার মনোবৃত্তির পরিচালনা করিতে হইলে এবং উদারহৃদয় হইতে গেলে বহু বিষয়ের মোটামুটি খবর রাখা প্রয়োজনীয়; অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে বলে well-informed man, তাহাই হওয়া দরকার। কিন্তু ইহা কি প্রকারে হওয়া যায়? পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়েরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু পড়ে কে? এত সময় কাহারই বা আছে? এরূপ আপত্তি অনেকেই করিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিষয়ক পুস্তকও খুব কম। তবে উপায় কি?

উপায় সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-সম্পাদকেরা অনেক পরিমাণে করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্রের কলেবর সংবাদ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, "ভীষণ" গল্প, জাল জুয়াচুরির গল্প এবং ব্যক্তিগত অত্যাচার উপদ্রবের বর্ণনায় পূর্ণ থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থটি ছাড়া ইহার কোনটিই অনাবশ্যক নহে। কিন্তু সাধারণতঃ রাজনীতি ও অর্থনীতির চর্চ্চা যেরূপ ভাবে হইয়া থাকে, তদপেক্ষা গভীরতর ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা অনেকে উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছি, এইরূপ পরিচয় দিই; কিন্তু রাজনীতি এবং শাসনপ্রণালী সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তক কয়খানি পড়িয়াছি? পড়া দূরে থাকুক্, ক'খানি গ্রন্থের নাম জানি? অথচ আমরা যত সহজে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখি, এমন আর কোন বিষয়েই পারি না। তবে একটা কথা আছে;—প্রতিভাশালী লোকে বেশী কিছু না পড়িয়াও নিজ মস্তিষ্ক হইতে অনেক তত্ত্বের উদ্ভাবন করিতে পারেন।—অনেক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি বাঙ্গালা কাগজে "মুদ্রাবিভ্রাট" বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িয়াছি; কিন্তু এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার বোধ হয় না। বোধ হয় আমার মত আরও অনেক পাঠক আছেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—কোন্ দেশের কোন্ অবস্থাতেই বা নাই? কিন্তু রাজা বা রাজার আইন যতই ভাল হউক, প্রজাবর্গের স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে জাতীয় জীবনের উন্নতি অসম্ভব। অবশ্য রাজকীয় ব্যবস্থা আমাদের উন্নতির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। কিন্তু মোটের উপর উন্নতি করা না করা আমাদেরই হাতে। এক হিসাবে দেখিতে গেলে রাজকীয় ব্যবস্থা প্রজাপুঞ্জের চরিত্র ও অবস্থার প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি মাত্র। বুদ্ধিমান্, সাহসী, উন্নতি প্রয়াসী জাতিকে কোনও

ব্যবস্থা অধিক দিন অবনত অবস্থায় রাখিতে পারে না। তেমনি আবার অধঃপতিত জাতির মধ্যে উন্নততম শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেও, তদনুরূপ সুফল ফলিবে না। কারণ eternal vigilance is the price of liberty স্বাধীনতা কেনা যায় কেবল চিরজাগ্রত সতর্কতা দ্বারা। অধঃপতিত জাতি আলস্যে ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন থাকায় ক্রমেই একটি একটি করিয়া উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়।

আমরা ক্রমাগত আন্দোলন করিলে নিশ্চয়ই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিব; নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে অনেক উচ্চ অধিকার পাইব; কিন্তু এই সকল অধিকার আমাদিগকে দেওয়া না দেওয়া রাজার হাতে। আমরা যে এই সকল অধিকারের উপযুক্ত তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে না পারিলে, কখনই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইব না। সমাজ, শিক্ষা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে, আমরা যদি উন্নতি করিতে পারি, তবে আমাদের উচ্চ অধিকার লাভের উপযুক্ততা প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে উন্নতি বহু পরিমাণে রাজকীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। তাহা হইলেও কিছু উন্নতি আমরা গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য ব্যতিরেকেও করিতে পারি। আর সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে উন্নতি করা সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজের হাতে। সত্য বটে, দেশ বিদেশীর অধীন হইলে সকল বিষয়েই প্রজাবর্গের প্রতিভা, উৎসাহ ও উদ্যম যেন চাপা পড়িয়া যায়; পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে আত্মগ্লানি, ও আত্ম সম্মানের অভাব লক্ষিত হয়, তৎপ্রযুক্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা খাট হইয়া যায়, আত্মনির্ভর কমিয়া যায়, কিছু মহৎ বিষয়ে হাত দিতে সাহসে কুলায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ের উন্নতি হওয়া অসম্ভব নয়। মুসলমান রাজত্বের সময়েই বৈষ্ণব ও শিখ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। যখন য়িহুদীরা রোমের অধীন ছিল, তৎকালেই তাহাদের দেশে ঈশার জন্ম হয়। সুতরাং আমরা যে ইংরাজের অধীনে থাকিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে পারি, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, কৃষি বাণিজ্য, শিল্পাদি বিষয়েও যথাসাধ্য উন্নতি করা আমাদের কর্ত্তব্য।

সুতরাং এই সমুদয় বিষয়েই যাহাতে আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে, তাহা করা সংবাদ পত্র সমূহের কর্ত্তব্য। এ স্থলে দুটি কথা উঠিতে পারে। (১) এতগুলি বিষয় সম্বন্ধে একই কাগজে কি সম্যক্‌রূপে আলোচনা সম্ভব? (২) গ্রাহকগণ এরূপ লেখা চায় না। উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে সম্যক্ আলোচনা সম্ভব না হইলেও যাহা সম্ভব তাহা ত করা উচিত। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক এক খানি কাগজ থাকিলেই ভাল হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে মাসিক পত্র ও বড় বড় সাধারণ কাগজ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য নিম্নলিখিতরূপ খবরের কাগজ ছিল :—

হিসাবরক্ষক (accountants)—২; এজেণ্ট—৩; কৃষি—৭০; প্রত্নতত্ত্ব—৩; টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধে—১; স্থাপত্য ৮; সেনা ১১; ললিতকলা—১৬; জ্যোতিষ—১; ব্যায়াম—১২; নিলাম—৩; পাঁওরুটিওয়ালা—৩; মহাজনী তেজারতী—১; ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়—১১; মৌমাছি—৩; ঘণ্টানির্ম্মাণ—১; পুস্তক বিক্রেতা—৯; জুতার ব্যবসা—২; উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—২; বালক—৬; মদ্য প্রস্তুত করা—৪; রাজমিস্ত্রী—১৩; গৃহনির্ম্মাণ সমিতি সমূহ—২; কসাই—১; ছুতার—১; ভোজের ব্যবস্থাকারী—৩; গোমেষব্যবসায়ী—২; দান সম্বন্ধীয়—৫; ঔষধ ব্যবসায়ী—১০; দাবাখেলা—৩; রাজকীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়—৪৭; সিবিল সার্ব্বিস—৪; গাড়ী নির্ম্মাতা—২; কয়লার ব্যবসা—২; উপনিবেশ সম্বন্ধীয়—২১; রংতামাসা বিষয়ক—৩০; বাণিজ্য বিষয়ক—৪১; ময়রার ব্যবসায়—৩; ঠিকা লওয়া—৪; সহযোগিতা (co-operation)—৪; জনপদ (country)—৭; মফঃস্বলের আদালত—১; গোরক্ষক—১; ক্রিকেট—১; বাইসিকল আরোহণ—১; গৃহসাজান—৬; দন্তসম্বন্ধীয়—৩; কুকুর—৫; নাট্য—১৩; পোষাক নির্ম্মাতা—৪; রঞ্জক (dyers)—১; শিক্ষা—২৭; তাড়িত—৬; ইঞ্জিনীয়ারিং—১০; কীটপতঙ্গতত্ত্ব—১; জমিদারী—৭; এক্সচেঞ্জ—৪; ফ্যাষন—৩৭; অর্থসম্বন্ধীয়—৩৯; আগুন—২; মাছধরা ও মাছের ব্যবসা—৪; খাদ্য—৩; ফ্রীমেসন্—৪; ফ্রীমেথডিষ্টস্—২; ফ্রেণ্ডলী সোসাইটিজ—৪; সোসাইটী অব ফ্রেণ্ডস্—৩; ফল ব্যবসায়—২; গৃহের আসবাব—৮; মালীর কাজ—১৬; গ্যাস্—৩; ভূগোলবিষয়ক—২; ভূতত্ত্ব—১; জর্ম্মান—২; মুদী—৯; নারীরোগ ও শরীর তত্ত্ব—১; নাপিত—২; বাসন ও তৈজসপত্র—১; হ্যাটনির্ম্মাতা—১; হোমিওপ্যাথী—২; সময়নিরূপণ বিদ্যা—২; ঘোড়া—২; মোজানির্ম্মাতা—১; সচিত্র—১৪; ছাতিয়ার—১; ভারতবর্ষ—৬; রবার—১; জীবনবীমা—১৮; ময়াবিক্রিয়া—৩; লৌহ ও লৌহব্যবসায়ী—৭; জহুরী—১; য়িহুদী—৪; শ্রমজীবী—৪; ধোপা—৩; আইন—১৮; চামড়া—৪; লাইসেন্সট ভিটলর্স—৬; জীবনরক্ষক নৌকা—১; সাহিত্য বিষয়ক—১৮; গৃহপালিত পশু পক্ষী—৭; স্থানীয় শাসন—৬; কুল—৩; বিবাহসম্বন্ধীয়—২; যন্ত্রবিজ্ঞান—৩; চিকিৎসা—২৬; মিটিয়রলজি—১; জাঁতাওয়ালা—২; খনিজ সলিল—৪; খনি খনন—৩; সঙ্গীত—১৮; প্রাণিবিদ্যা—৬; জলযুদ্ধ বিভাগ—৪; ননকনফর্মিষ্টস্—১৩; অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—৪৬; প্রশ্নোত্তরাদি (Notes and Queries)—২; মুদ্রাতত্ত্ব—১; রাজকীয়—২; তৈল ও রং ব্যবসা—২; কাগজ ব্যবসায়—১০; বন্ধকী ব্যবসায়—১; শান্তি—১; ফোটোগ্রাফী—১০; ফ্রেনলজি—২; জল গ্যাস ড্রেন—১; কুম্ভকার—১; গৃহপালিত পক্ষী—৮; প্রেসবিটীরিয়ন্—৩; প্রিমিটিব মেথডিষ্ট—৭; মুদ্রাকর—১২;

রেলওয়ে—১০ ; রোমান ক্যাথলিক—১৫ ; ঘোড়ারজীননির্ম্মাতা—৩ ; স্বাস্থ্যবিষয়ক—৮ ; বৈজ্ঞানিক—৬ ; সেকুলার (secular)—৩ ; জাহাজ—১৪ ; সংক্ষেপ লিখন—৩ ; সোসাইটী ("society")—২৪ ; শিকার ক্রীড়াদি—৪০ ; ষ্টাম্প—১ ; রবিবাসরীয় বিদ্যালয়—৬ ; দরজি—৩ ; টেলিগ্রাফী—২ ; মাদকনিবারণ—৩২ ; তন্তুবায়—১১ ; কড়ি কাঠের ব্যবসা—২ ; রেলওয়ে টাইম টেবিল—৩৬ ; তামাক—৪ ; সমাধির ব্যবস্থাকারী—১ ; একেশ্বরবাদী—২ ; গোলাঘর রক্ষক (Warehouse men)—৩ ; ওয়েস্লীয়ান্—৬ ; নানাবিধ মদ্য—৪ ; আমোদার্থ নৌকাযোগে ভ্রমণ (yachting)—১।

এই তালিকা দশবৎসর পূর্ব্বেকার। এখন নিশ্চয়ই সকল প্রকারের কাগজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমাদের দেশে এত প্রকারের কাগজ চলিতেই পারে না। কিন্তু দু একটা বিষয় আছে, যৎসম্বন্ধীয় কাগজ চলা উচিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানদেশ। বাঙ্গালা প্রদেশও তাই। অথচ বাঙ্গালা কৃষি বিষয়ক পত্রিকা এক আধখানা সামান্যভাবে কিছুদিন চলে, আবার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশে শিক্ষার অবস্থা অতিশয় হীন। অথচ সমগ্র বাঙ্গালা দেশে কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী একখানিও ভাল শিক্ষা বিষয়ক সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজ নাই। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে 'শিক্ষাপরিচয়' নামে একখানি কাগজ ছিল, এখন তাহা নাই। এডুকেশন গেজেটে সরকারী শিক্ষাবিষয়ক খবর বাহির হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গুরুতর কোন বিষয়ের আলোচনা হয় না। চট্টগ্রাম হইতে "অঞ্জলি" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হইত। এখন আছে কিনা জানি না। এই যে তিনখানি কাগজের নাম করিলাম, এ গুলিও আবার মোটের উপর নিম্ন শিক্ষা বিষয়ক। মনে হইতে পারে যে Calcutta University Magazine উচ্চ শিক্ষাবিষয়ক কাগজ। কিন্তু তাহা নামে মাত্র। মান্দ্রাজের Educational Reviewএর তুলনায় ইহা অতি অপদার্থ। সাহিত্যের চর্চ্চাও আমাদের দেশে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোনও সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজে আমি এ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে ভাল সমালোচনা বাহির হইতে দেখি নাই। বিলাতে কেবল সমালোচনার জন্য Academy, Athenæum, Literary World এবং Literature এই চারিখানি উচ্চ শ্রেণীর কাগজ রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন সাধারণ সমস্ত কাগজে ও শিক্ষাবিষয়ক কাগজে নিয়মিতরূপে সমালোচনা বাহির হয়।

যাহাই হউক, যাহা নাই তাহার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। কি হইতে পারে, তাহাই দেখা উচিত। আমাদের সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজগুলিতে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা থাকা উচিত। বাজে "ভীষণ" ও জাল জুয়াচুরীর গল্পগুলি তুলিয়া দিলে অনেক জায়গাও হইতে পারে—আমি গল্পের বিরোধী নহি। কিন্তু তাহার মধ্যেও ভাল মন্দ আছে।—যায়গা না হয় হইল। এখন কথা উঠিতে পারে, নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে কে? সমালোচনাই বা করে কে? সাপ্তাহিক কাগজের এক সম্পাদক এবং হয়ত এক সহকারী সম্পাদক আছেন, তাঁহারা ঢাক, ঢোল, সানাই সবই বাজান। সময় থাকিলেও সকল বিষয়ে লিখিবার ক্ষমতা এক ব্যক্তির থাকিতে পারে না। সমালোচনা করাও সময় ও ক্ষমতা সাপেক্ষ। অনেক সময় গ্রন্থকারের নিজের বা তাঁহার বন্ধুর লিখিত সমালোচনাই কাগজে বাহির হয়। সুতরাং কাগজ ভাল করিতে হইলে অনেক লেখকের অনেক সমালোচকের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু লেখক ও সমালোচকের সাহায্য পাওয়া সহজ নয়। আমি নিজে সম্পাদকতা করিয়াছি; সুতরাং সম্পাদকদিগের দুর্দ্দশা আমার যথেষ্ট জানা আছে। অনেক লেখককে পত্র লিখিয়া উত্তর বা লেখা কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ সম্পাদক সকল স্থলে যে নিজের লাভের জন্য লেখকদের সাহায্য ভিক্ষা করেন, তাহা নয়; অনেক স্থলে সম্পাদকও পয়সা পান না, লেখকও পান না। পত্রের উত্তর না দেওয়া যে নিতান্তই শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কেহ মুখে মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর না দিলে যেমন অভদ্রতা হয়, পত্রের উত্তর না দিলেও তেমনি অভদ্রতা হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, সময় নাই, বা উত্তর দিতে বাধ্য নহি। তাহার উত্তরে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ যখন ঘোরতররূপে চলিতেছিল, তখন লক্ষ্ণৌর একটী বাঙ্গালী যুবক লর্ড রবার্টসের বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসা করিয়া একটি চলন সই রকমের কবিতা লিখিয়া পাঠান। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বাঙ্গালী লেখকদিগের অপেক্ষা লর্ড রবার্টস্ কম ব্যস্ত ছিলেন না। কোন প্রকার উত্তর দিতেও বোধ হয় তিনি বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু যথাসময়ে সেই বাঙ্গালী যুবক লর্ড রবার্টসের ধন্যবাদ পূর্ণ উত্তর পাইয়া-

ছিলেন।—এমন লেখকও আছেন যাঁহারা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সম্বৎসর কাগজখানি লন, কিন্তু কিছুই লেখেন না। আমার বিবেচনায় লেখকদিগকে টাকা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা উচিত। অনেকে মনে করিবেন, টাকা না দিয়াই কাগজের খরচ কুলায় না; তাহার উপর টাকা দিতে হইলে স্বত্বাধিকারীর কিছু পৈতৃক জমিদারী থাকা চাই। "ভীষণ" গল্প বাহির করিব না, "উপহার" দিব না, অশ্লীল বা আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন বাহির করিব না, তাহার উপর লেখকদিগকে টাকা দিতে হইবে, এরূপ করিলে একেত গ্রাহক কমিয়া যাইবে, বিজ্ঞাপনের আয় কমিয়া যাইবে, তাহার উপর খরচ ভয়ানক বাড়িবে। খরচ বাড়িবে বটে, কিন্তু খুব বাড়িবে না। হয়ত গ্রাহক না কমিতেও পারে। অনেক লেখকেরা ধারণা আছে যে বিলাতে কাগজে লিখিয়া খুব আয় হয়। তাঁহাদের জন্য chamber's Encyclopædia হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"A general idea prevails among the public that to write foi the Magazines is a sure and easy road to competence. As a matter of fact the number of contributors to periodical liteiature, not holding editorial appointments, who make £200 a year out of the magazines might probably be counted upon the fingers of one hand. The best paid contributions by the highest class reviews seldom exceed £1 a page of 500 words."

অর্থাৎ খুব ভাল কাগজের খুব ভাল লেখকেরা প্রায়ই ৫০০ কথার জন্য ১৫৲ টাকার বেশী পান না। কিন্তু এই সকল মাসিক পত্রের গ্রাহক যদি এক লক্ষ হয়, ত আমাদের কাগজগুলির গ্রাহক হইবে এক হাজার। এবং বিলাতের উৎকৃষ্ট লেখকদের সহিত, দু একজন বাদ দিয়া আমাদের দেশের লেখকদের তুলনা করাও বোধ হয় ঠিক্ নয়। না হয় উভয় শ্রেণীর লেখকদিগকে ক্ষমতা হিসাবে সমানই ধরিলাম। তাহা হইলে ও দেখিতে হইবে, বিলাতে লোকের গ্রাসাচ্ছাদনাদির কিরূপ খরচ পড়ে, আর আমাদের দেশেই বা কিরূপ পড়ে। এ বিষয়ে আমার ঠিক্ আন্দাজ নাই। কিন্তু ভদ্রলোকদের কিরূপ খরচ হইতে পারে, ছাত্রদের খরচ হইতে হয় ত তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কেম্ব্রিজে একজন ছাত্র মিতব্যয়িতার সহিত ১৫০৲ টাকায় নিজের খরচ চালাইতে পারে, কলিকাতায় ২০৲ টাকায় চলিতে পারে। তাহার পর, বিলাতের ভাল লেখকদের পুস্তক হাজার হাজার বিক্রীত হয়। এই জন্য তাঁহাদের লেখার জন্য তাঁহারা যত টাকা চান, আমাদের দেশের লেখকেরা কখনই তাহার সিকিও চাহিতে পারে না। সুতরাং বিলাতী উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র যেখানে ৫০০ কথার জন্য ১৫৲ টাকা দেয়, সে স্থলে আমাদের দেশে কেহ যদি ৫০০৲ কথার অর্থাৎ মোটামুটি প্রদীপের মত কাগজে এক পৃষ্ঠার জন্য ২৲ টাকা দেন ত নিতান্ত অন্যায় হয় না। বিশেষতঃ গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রদত্ত অর্থ হইতে যখন আমাদের আয় এত কম। ইহা গেল ভাল লেখার দর। চলনসই লেখার মূল্য অনেক কম। বিলাতে এখন ও অনেক মাসিক পত্র বিনামূল্যে প্রাপ্ত লেখায় চলে। আর একটা হিসাব দেখুন। একখানা ডিমাই আট পেজী বহি অর্থাৎ "সাহিত্যের" আকারের বহি ভাল করিয়া ছাপাইতে ও বাঁধাইতে প্রতি হাজারে প্রত্যেক আট পৃষ্ঠায় আন্দাজী দশ এগার টাকা পড়ে। প্রত্যেক আট পৃষ্ঠার মূল্য দুই পয়সা করিয়া রাখিলে ৩১।০ হয়। ইহা হইতে কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই এবং পুস্তক বিক্রেতার কমিশন শতকরা ২৫৲ বাদ দিলে ১২।১৩, টাকা থাকে। অর্থাৎ গ্রন্থকার প্রতি পৃষ্ঠায় আন্দাজী ১৷৷০ টাকা লাভ পান। ইহা হইতে বিজ্ঞাপনের খরচ বাদ দিলে লাভ তদপেক্ষা কম হয়। ছবি দিতে গেলে লাভ আরও কম থাকে। অবশ্য কোন কোন বহি এক হাজারের উপর বিক্রয় হয়, কিন্তু আমার ধারণা অধিকাংশ পুস্তকই (বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তক বাদে) এক হাজারের চেয়ে বেশী বিক্রী হয় না। অনেক গ্রন্থের তদ্রূপ কাট্‌তি ও হয় না। শেষে প্রায় ওজনদরে গুরুদাস বাবু কিনিয়া লইয়া অর্দ্ধমূল্যে, সিকিমূল্যে, উপহার প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। যে সকল পুস্তকের কাট্‌তি আছে, তাহাদেরও কাট্‌তি ধীরে ধীরে হয়; খরচ উঠিয়া গিয়া লাভের টাকাটা গ্রন্থকারের হাতে আসিতে সময় লাগে। আসল কথা এই, নিজ ব্যয়ে পুস্তক ছাপাইলে লাভ ক্ষতি উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। টাকা লইয়া সম্পাদককে লেখা দিলে, যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্যের আকারের কাগজে লেখা দিয়া যদি কোন লেখক বিনা ঝঞ্ঝাটে পৃষ্ঠা প্রতি ১৷৷০ টাকা পান এবং সম্পাদক কপিরাইট না চান, তাহা হইলে লেখকের লোকসান নাই। বস্তুতঃ অনেক

লেখকের ইহা অপেক্ষা কমে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কারণ সকলের লিখিত পুস্তক কিছু বিক্রী হয় না। আমি এতক্ষণ লেখার দরের বিষয় যাহা লিখিলাম, তাহার অর্থ বাজার দর। বাস্তবিক একখানি সদ্‌গ্রন্থের এক খণ্ডও বিক্রয় না হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহা বহুমূল্য। আবার একখানা কুৎসিত গল্পের বহির খুব কাট্‌তি হইতে পারে; তাহা হইলেও তাহা মূল্য হীন। এরূপ মূল্যের বিষয় লেখা, কিম্বা লেখকগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের দেশে শিক্ষকদের বেতন কম। কিন্তু তাঁহাদের কাজ খুব মূল্যবান্‌। তাঁহাদের মজুরী কম বলিলে যেমন তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় না, সাহিত্য-সেবীদের মজুরী কম বলিলেও তদ্রূপ তাঁহাদের অপমান করা হয় না।

যাহাই হউক লেখকদিগকে টাকা দিতে হইলে যে, ব্যয় বাড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল জিনিস চাহিলে মূল্য দিতেই হয়।

আমি যে লেখার জন্য টাকা দিতে বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেহ যেন ভুল না বুঝেন। আমাদের ভাল ভাল লেখকদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের অন্যবিধ আয় এরূপ আছে, যে তাঁহাদের সাহিত্য-জীবী হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহারা টাকার, বিশেষতঃ সামান্য টাকার, প্রত্যাশায় কলম ধরিবেন, এরূপ মনে করা ভুল। তবে তাঁহারা যখন গ্রন্থ লেখেন, এবং উহার দামও আছে, এবং বিক্রয়ের টাকাও লইয়া থাকেন, তখন কাগজে লিখিয়া টাকা লইবেন না কেন? গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ বা ডিউক্‌ অব্‌ আর্গাইলের সাহিত্যজীবী হইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাও সাময়িক সাহিত্য পরিপুষ্ট হইত; এবং তাঁহারা টাকাও লইতেন। লেখার জন্য টাকা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে সম্পাদককে লেখকদের কাছে নিতান্ত ভিক্ষুক ও অনুগ্রহজীবী সাজিতে হয় না; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লেখকদের উপকার হয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, এবং কালে সাহিত্যসেবকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিছু টাকা দিতে পারিলে সম্পাদক মনে করিতে পারেন, 'আমার যাহা সাধ্য লেখকগণকে দিলাম। যদি তাঁহাদের লেখার উপযুক্ত মূল্য না দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেমন বিনালাভে বা অল্প লাভে পরিশ্রম করিতেছি, তাঁহারাও না হয় মাতৃভাষার সেবার জন্য তদ্রূপ কিছু স্বার্থ ত্যাগ করুন।" তাহা ছাড়া, অর্থের জন্য যাঁহাদের সাহিত্যসেবক হইবার আবশ্যক নাই, তাঁহারা লেখার জন্য টাকা লইতে স্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের অপেক্ষা নির্ধন লেখকগণের টাকা লইতে কোন সঙ্কোচ বোধ হইবে না। ইহাও কম লাভ নয়।

বর্ত্তমানে যতগুলি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক আছে, আমি যতদূর জানি তাহার সকল গুলিতেই আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন থাকে। এগুলি উঠিয়া যাওয়া উচিত। একখানি আদর্শ কাগজ চালাইতে হইলে যদি আপাততঃ আয়ের অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যয় হয়, তাহা নির্ব্বাহ করিবার উপায় করা উচিত। বস্তুতঃ লোক শিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। যেমন স্কুল কলেজ চালাইবার জন্য বড় লোকেরা টাকা দেন, তেমনি ভাল কাগজ চালাইবার জন্যও দান করা উচিত। কিন্তু একটী বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। যিনি খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রের জন্য টাকা দিবেন, তিনি যেন নিজের খোসামোদ না চান। এইজন্য একজন পৃষ্ঠপোষক না হইয়া অনেকে মিলিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়।

হয়ত ভাল করিয়া কাগজ চালাইলে গ্রাহক কমিয়া যায়; হয়ত খরচ পোষায় না। বাস্তবিক গ্রাহকেরা যেমনটি চান তেমন লেখা দিতে গেলে, কাগজের আর মর্য্যাদা থাকে না; কোথায়, সম্পাদকেরা সাধারণের মত গঠন করিবেন না নিজেইরাই সাধারণের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া উঠেন। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিলাতেও বুয়র যুদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ গ্রাহকবর্গের মতানুসারে কাগজ পরিচালন না করায় ডেলি ক্রনিক্লের সম্পাদককে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আমি সম্পাদকের কার্য্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না। বাঙ্গলা দেশের অনেক স্কুল কলেজ ছাত্রদত্ত বেতন হইতেই চলে। এই বিদ্যা মন্দিরগুলি বিদ্যার দোকান মাত্র। সকলেই খদ্দের বাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। এইজন্য আমাদের দেশে শিক্ষার এমন দুরবস্থা, যখন ছাত্র ছাড়িয়া গেলে কলেজ উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন ছাত্রদিগকে শাসনে রাখা কখনই সুবিধাজনক হইতে পারে না। স্কুল

কলেজের উন্নতি করিতে হইলে endowment চাই। যেমন পুরাকালে চতুষ্পাঠী এবং দেবমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দান করা হইত, একালে তদ্রূপ বিদ্যামন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্পত্তি দান প্রয়োজন। আমার মতে সাময়িক সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান এবং মর্য্যাদা রক্ষার জন্যও এইরূপ সম্পত্তির প্রয়োজন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বদাল-স্তম্ভে উৎকীর্ণ

রাম-গুরবমিশ্রের প্রশস্তি।

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশে, মঙ্গলবাড়ী হইতে ৩ মাইল ও দমদমা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে (অক্ষা. ২৫°৫' উঃ ও দ্রাঘি.৮৮°৫৮' পূঃ) বদাল-গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরাংশে বদাল-কাছারী নামক স্থানে, একটী ১২ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান; এই স্তম্ভের মাথায় একটী গরুড়মূর্ত্তি ছিল, সেইজন্য এই স্তম্ভের নাম হয় 'গরুড়স্তম্ভ'। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ভীমের লাঠী' বলিয়া জানে। এই গরুড়স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত স্তম্ভে আলোচ্য প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ বিল্‌কিন্স এই বদাল-স্তম্ভলিপি আবিষ্কার করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহার অনুবাদ ও অক্ষরের নমুনা এবং সর্ উইলিয়াম্ জোন্‌স্ ইহার উপর গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন।* তৎপরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমেকট সাহেব পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে একখানি অস্পষ্ট প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন, তাহাই অনুবাদ সহ সুপণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করেন।† কিন্তু প্রকাশিত উভয় পাঠ বা অনুবাদই মূল-শিলালিপি-সম্মত নহে।

* Asiatic Researches, Vol. I, pp. 131-144.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XLIII, pt. I, pp. 356-363.

উক্ত প্রশস্তির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট গারিক সাহেবকে পাঠাইয়া উহার কতকগুলি ছাপ (impressions) তুলিয়া আনেন, এই ছাপগুলির সাহায্যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কিলহোর্ণ সাহেব উহার প্রকৃত পাঠপ্রকাশে যত্ন করেন।*

অবশেষে "ঐতিহাসিক চিত্রের"-সম্পাদক সেই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে-প্রকাশিত বিকৃত পাঠের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত শিলালিপির বিস্তৃত আলোচনা করেন।† কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা মূল শিলালিপির অনুযায়ী না হওয়ায় অনেকেই তৎপাঠে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই কারণ আমার কোন কোন সহৃদয় বন্ধু গরুড়স্তম্ভলিপির যথাযথ পাঠ ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, তাঁহাদের আগ্রহে অদ্য যথাসাধ্য পাঠ উদ্ধার করিয়া উপস্থিত করিলাম।

আলোচ্য শিলালিপির পাঠোদ্ধারকল্পে তিনটী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে :—

১ম। দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দত্ত গত ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুন তারিখে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট উক্ত মূল লিপির (পেন্সিল ঘসিয়া) এক প্রস্থ প্রতিকৃতি প্রেরণ করেন, হীরেন্দ্র বাবু তৎকালে পাঠোদ্ধারের জন্য আমাকে সেই প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।

২য়। দিনাজপুর-নিবাসী আমার এক বন্ধু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী উক্ত লিপির একখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।

৩য়। অধ্যাপক কিল্‌হোর্ণ সাহেব গারিকের ছাপ হইতে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

এই তিন প্রস্থের সাহায্যে বর্ত্তমান প্রতিলিপি নির্ণীত হইল।

শিলালিপির পরিচয়।

এই শিলালিপিতে ২৯ পঙ্‌ক্তি আছে। যে স্থানের উপর ঐ পঙ্‌ক্তিগুলি সন্নিবিষ্ট, তাহা দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ৮½ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ১ ফুট ৮½ ইঞ্চ। অক্ষরের আয়তন প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ। ১ম ও ২য় পঙ্‌ক্তির আদ্যক্ষর দুইটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,

* Epigraphia Indica, Vol. II. pp. 160-167.

† ঐতিহাসিক চিত্র ১ম বর্ষ।

এতদ্ভিন্ন পাথরের চোক্‌লা উঠিয়া ২৫শ হইতে ২৮শ পঙ্‌ক্তির আদ্য অনেকগুলি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়াছে। অক্ষরগুলির ছাঁদ অনেকটা মদনপালের তাম্রশাসনধৃত অক্ষরের মত।* তবে দেখিলেই শেষোক্ত তাম্রশাসনের অক্ষরের অপেক্ষা এই শিলালিপির ছাঁদ অনেকটা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। খ্রীষ্টীয় ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে যে অক্ষর এই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, এই শিলালিপি সেই অক্ষরে খোদিত হইয়াছে। সূত্রধার বিষ্ণুভদ্রের পরিচয় ব্যতীত আর সকল অংশই সংস্কৃতশ্লোকে গ্রথিত। এই লিপির সর্ব্বত্রই একটী "ব", বর্গীয় "ব"। স্থানে অন্তস্থ "ব", "ব"এর পূর্ব্বে অনুস্বারের স্থানে "ম্ব" এবং অনুস্বারের পরিবর্ত্তে তিনটী স্থলে ঙ্‌ (১,২১ ও ২৬ পঙ্‌ক্তি) এবং এক স্থলে "ন্" (যথা ৭মি পঙক্তিতে পান্‌সু) ব্যবহৃত হইয়াছে। দুই এক স্থানে সন্ধিব্যত্যয় এবং লুপ্ত অকারের অনর্থক ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

এই শিলালিপির উদ্দেশ্য।

গরুড়মূর্ত্তিশোভিত স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এখন কিন্তু সেই গরুড়মূর্ত্তির অংশ নষ্ট হইয়াছে। গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লিখিত হইলেও রাম-গুরবমিশ্র এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমা বর্ণন করাই এই প্রশস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

এই শিলালিপি হইতে কয়েকজন গৌড়াধিপ পালরাজের নাম এবং তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিবংশের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়:—

শাণ্ডিল্যবংশে (বিষ্ণু?) জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কুলে বীরদেব, তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল এবং তাঁহা হইতে গর্গ উৎপন্ন হইয়াছিলেন (১ম শ্লোঃ)। এই গর্গ পূর্ব্বদিক্‌পতি ধর্ম্মের (অর্থাৎ ধর্ম্মপালের) উপদেষ্টা ছিলেন (২য় শ্লোক)। গর্গ ইচ্ছার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র দর্ভপাণি রাজা দেবপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন (৩-৭ম শ্লোঃ)। দর্ভপাণির সহিত শর্করাদেবীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে সোমেশ্বরের জন্ম (৮—৯ম শ্লোঃ)। সোমেশ্বর রল্লাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, (১০ম শ্লোঃ) তাঁহার পুত্র কেদারমিশ্র। এই কেদারমিশ্রের মন্ত্রণাবলে গৌড়াধিপ উৎকল, হূণ, দ্রবিড় ও গুর্জ্জরদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৩শ শ্লোঃ) এবং ইনি যজ্ঞে রাজা শূরপালকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কেদারমিশ্রের সহিত দেবগ্রামীয় বব্বাদেবীর বিবাহ হয় (১৬শ শ্লোঃ), তাঁহার গর্ভে প্রসিদ্ধ রাম-গুরবমিশ্র জন্মলাভ করেন (১৮শ শ্লোঃ) রাজা নারায়ণপালের নিকট ইনি উচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন* (১৯শ শ্লোঃ)। বদালের গরুড়স্তম্ভ রাম-গুরবমিশ্রের কীর্ত্তি (২৭ শ্লোঃ)। সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি খোদিত হইয়াছে (২৯শ পঙ্‌ক্তি)

প্রতিলিপি।

১ম পঙ্‌ক্তি। (বিষ্ণু)[1] শাণ্ডিল্যবঙ্‌শে[2]ত্তু বীরদেব-

স্তদন্বয়ে[3]

পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত॥ [১]

শক্রঃ পুরোদিশি পতির্ন্ন দিশস্তরেষু

তত্রাপি দৈত্যপতিভির্জ্জিত এব

২য়।

ধর্ম্মঃ কৃতস্তদধিপস্ত্বখিলাসু দিক্ষু

স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ॥ [২]

পত্নীচ্ছা নাম তস্যাসীদিচ্ছেবাত্মর্ব্বিবর্ত্তিনী।

নিসর্গনির্ম্মলস্নিগ্ধা কান্তিশ্চন্দ্র-

৩য়। মসো যথা॥ [৩]

বিদ্যাচতুষ্টয়মুখাম্বুরুহান্তলক্ষ্মী

নৈসর্গিকোত্তমপদাধরিতত্রিলোকঃ।

সূনুস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ

শ্রীদর্ভপাণিরিতি নাম নিজন্দধা-

৪র্থ। নঃ॥ [৪]

আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলসঙ্গতে-

রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নো

গিরেঃ।

---

* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ "পালরাজবংশ" শব্দে এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৩য় ভাগ ১৪৪ পৃষ্ঠায় মদনপালের তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।
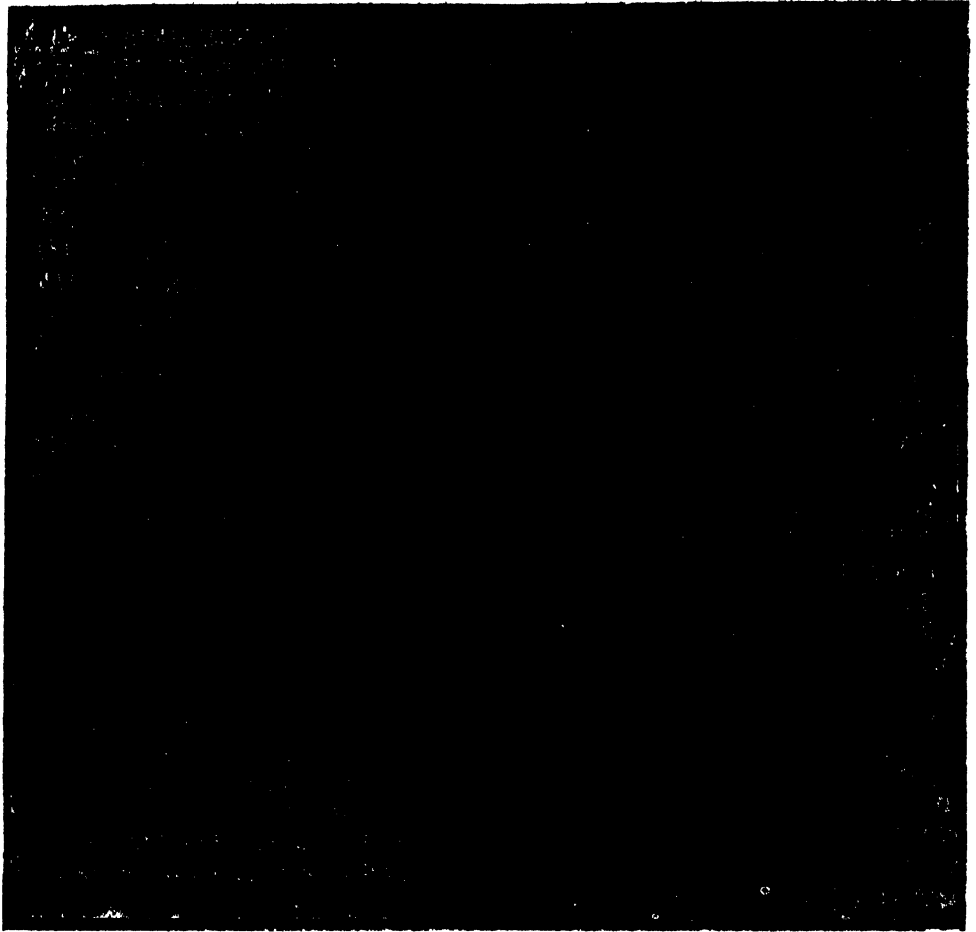
* ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে ইনি গুরুক ও ভট্ট গুরব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। উক্ত পালরাজগণের বিস্তৃত ইতিহাস বিশ্বকোষের ১১শ ভাগে "পালরাজবংশ" শব্দে দ্রষ্টব্য।

[1] মূল অস্পষ্ট, যেন 'বিষ্ণু' এইরূপ বোধ হয়।

[2] বংশে। [3] স্তদন্বয়ে।

বদালস্তম্ভে উৎকীর্ণ—রামগুরব মিশ্রের প্রশস্তি (মূল লিপির ২ অংশ)।

মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরা-
৫ম। শিম্বয়া-
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেব-পালো
নৃপঃ ॥ [৫]
মাদ্যন্নানাগজেন্দ্রস্রবদনবরতোদ্দামদানপ্রবাহো-
ম্মৃষ্টক্ষোণীবিসর্প্পিপ্রবল
৬ষ্ঠ। ঘনরজঃসম্বৃতা[৪] শাবিকাশং[৫]।

দিকচক্রাযাতভূভৃৎ পরিকরবিসরদ্বাহিনীদুর্ব্বিলোক
স্তস্থৌ শ্রীদেবপালো নৃপতিরবসরাপেক্ষয়া দ্বারি
৭ম। যস্য ॥ [৬]
দক্চা[৬]প্যানম্রমূড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিস্সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদপাংসুঃ[৭]
সিংহাসনং সচ-
৮ম। কিতঃ স্বয়মাসসাদ ॥ [৭]

৪ সংবৃতাশা।

৫ অধ্যাপক কিলহোর্ণ 'সংবৃতাশাবিকাশং' এই পাঠই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু মূলে স্পষ্ট 'বিকাশং' এই পাঠ আছে।

৬ দত্বা। ৭ পাংশু।

তস্য শ্রীশর্করাদেব্যামত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বরবল্লভঃ ॥ [৮]
ন আত্তবিকটং[৮]
৯ম। ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা ক্ষিতিগিরো নোদার্ব্বমাকর্ণিতাঃ।
নেবোক্তা মধুরম্বহু[৯] প্রণয়িনঃ সম্বল্‌গিতাশ্চশ্রিয়া।[১০]
১০ম।
যেনৈবং স্বগুণৈর্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে
সতাম্বিস্ময়ঃ[১১] ॥ [৯]
শিব ইব করং শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যা
গ্রহাশ্রমপ্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধি-
১১শ। বৎ[১২] রল্লাদেব্যাঃ স জগ্রাহ ॥ [১০]
আসন্নাজিষ্মরাজবহলশিখিশিখাচুম্বিদিক্‌চক্রবালো
দুর্ব্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতাশেষবিদ্যা-
১২শ। প্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ
স্বক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রো গুহ ইব বিকসজ্জাত-
রূপপ্রভাবঃ ॥ [১১]
১৩শ। সক্রদ্দর্শনসম্পীতান্[১৩] চতুর্ব্বিদ্যাপয়োনিধীন্
[।]
জগাসাগস্ত্যসম্পত্তিমুদ্‌গিরন্বাল এব যঃ ॥ [১২]
উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃ-
১৪শ। তদ্রবিড়গুর্জ্জরনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥ [১৩]
স্বয়মপহৃতবিত্তানর্থিনো যো-
১৫শ। সুমেনে
দিবতি সুহৃদি চাসীন্নির্ব্বিবেকো যদাত্মা।
ভবজলধিনিপাতে যস্য ভীশ্চ ত্রপা চ।[১৪]
পরিমুদিতকষায়ো[১৫] যঃ পরে ধাম্নি রেমে ॥ [১৪]
যস্যো-
১৬শ। জ্যাসুরহম্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ
১৭শ। কল্যাণসঙ্গী[১৬] চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ
পূতম্পয়ঃ ॥ [১৫]
দেবগ্রামভবা তস্য পত্নী বহ্মাভিধাভবৎ ॥
অতুল্যা চলয়া ল-
১৮শ। ক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্যমপত্যয়া ॥ [১৬]
সা দেবকীব তস্মাদ্যশোদয়া স্বীকৃতম্পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপালপ্রিয়কারকমসূতপুরুষোত্তমন্তনয়ং ॥ [১৭]
১৯শ। জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রক্লিষ্টকঃ [।]
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ। [১৮]
কুশলো গুণান্বিবেক্তুং বিজিগীষুর্যশ্চ প-
২০শ। শ্চ বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্ত কা তস্য ॥ [১৯]
বাচাম্বৈভব[১৭] মাগমেষধিগমং নীতেঃ
পরান্নিষ্ঠতাং[১৮]।
বেদার্থানুগমাদসী-
২১শ। মমহসো বঙ্‌শস্য[১৯] সম্বন্ধিতাং।
আসক্তিঙ্‌ গুণকীর্ত্তনেষু মহতাম্নিষ্কাত্ততাং
জ্যোতিষো
যস্যানল্পমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারোঽবদৎ ॥
[২০]
২২শ। যস্মিন্মিথঃ শ্রীভূতি বাগধীশে
বিহায় বৈরাণি নিসর্গজানি।

৮ আত্তং বিকটং। ৯ মধুরং বহু। ১০ (ছেদ নিষ্প্রয়োজন)। ১১ সতাং বিস্ময়ঃ। ১২ বিধিবজ্রল্লা। ১৩ সংপীতাংশ্চতুঃ।

১৪ (ছেদ নিষ্প্রয়োজন)। ১৫ কষায়ো। ১৬ কল্যাণসংগী। ‡। পুরুষোত্তমং তনয়ং। ১৭ বাচাং বৈভবং। ১৮ (ছেদ হইবে না)। ১৯ বংশস্য।

উভে স্থিতে সখ্যমিবাধিগত্যা-

বেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতী চ ॥ [২১]

শাস্ত্রানুশীল-

নগভীরগুর্ণৈর্ব্বচোভি-

২৩শ। [র্ব্বি]দ্বৎসভাসু পরবাদিমদাবলেপঃ [।]

উদ্বাসিতঃ সপদি যেন যুধি দ্বিষাঞ্চ

নিস্সীমবিক্রমধনেন [ভ]টাভিমানঃ ॥ [২২]

২৪শ। [আবির্ব্বভূ]ব সহসৈব ফলং ন যস্য

যস্যাদৃশস্ত্যধিত[২০] কর্ণ সুখন্ন কিঞ্চিৎ।

যৎপ্রাপ্য দানপতিমর্থিজনোস্তমেতি

তৎকেলিদানমপি যস্য ন জাতু

২৫শ। — ‿ *[২১] ॥

অতিলোমহষণেষু[চ] কলিযুগ বাল্মীকি

জন্মপিশুনেষু।

ধর্ম্মেতিহাসপর্ব্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতীর্ব্যরণোৎ ॥

[২৪]

অসিন্ধুপ্রসৃতা যস্য স্বর্ধুনী

২৬শ। ‿ — ‿[২২] [ধা]।

বাণী প্রসন্নগম্ভীরা ধিনোতি চ পুনাতি চ ॥ [২৫]

পিতৃত্বং স্বয়মাস্থায় পুত্রত্বমগৎস্বয়ং [।]

ব্রহ্মেতি পুরুষান্ যস্য বঙশে[২২] যশ্চ

প্রপেদিরে॥ [২৬]

শোভো

২৭শ।— ‿ ‿—[২৪] স্বকীয়বপুষোলোকেক্ষণগ্রাহিণি

স্বাভিপ্রায় ইবাতুলোন্নতিমতি স্বপ্রেমবন্ধস্থিরে।

স্পষ্টং শল্য ইবার্পিতে কলিহৃদি সন্তেত্র তে

২৮শ। * * *

* * * ফণিনাং হরেঃ প্রিয়সখস্তার্ক্ষ্যোযমা-

রোপিতঃ।

আস্থাদিগন্তমখিলং গত্বা পাতালমূলমপ্যস্মাৎ।

যশ ইব তস্যোত্তস্থৌ স্তম্ভাহিগরুড়ধ্বজাদমলম্ ॥

[২৮]

২৯শ। সূত্রধারবিষ্ণুভদ্রেণ প্রশস্তি ক্ষণিতং [।]

উক্ত প্রশস্তির ঐতিহাসিক অংশ বিবৃত হওয়ায় বাহুল্য-ভয়ে অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

২০ দৃশ্যং বাধিত। ২১ (মূলে নাই, উঠিয়া গিয়াছে)।
২২ (মূলে নাই, উঠিয়া গিয়াছে)। ২৩ বংশে। ২৪ (মূলে নাই, উঠিয়া গিয়াছে। ২৫ (এখানে তিনটী অক্ষর ও পরবর্ত্তী ছত্রে আদ্য তিনটী অক্ষর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে)।

স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত।*

র প্রবাহমান কালস্রোত একে একে আমাদের সকল রত্নগুলিকেই ভাসাইয়া লইয়া বিস্মৃতি-সাগরের অতল সলিলে নিমগ্ন করিতেছে। শত শত আবর্জ্জনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাহার সহিত একটী অমূল্য নিধি যাইলেই আমরা জগৎ আঁধার দেখি। অকাল জলদে সাহিত্যাকাশের একে একে সকল প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কগুলিকেই ঢাকিতেছে। এ পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তবে, যাহা যায়—সেই স্থানে যদ্যপি সেইরূপ আর একটী প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হই-লেও হয়। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, যে আসনটী একবার শূন্য হইতেছে তাহা প্রায় আর পূর্ণ হইতেছে না; অধিকাংশ স্থলেই একেবারে শূন্য রহিয়া যাইতেছে। আমাদের গৌরব করিবার আর কয়জন রহিল? যে পথে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম ইত্যাদি মহাত্মাগণ গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের আমাদের বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক রজনীকান্তও সেই পথের পথিক হইলেন। দুঃখিনী বঙ্গমাতার নিতান্ত দুরাদৃষ্ট; তাই আজ

* নানা কারণে এই প্রবন্ধটী যথাকালে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।—প্রদীপ সম্পাদক।

এই দুর্দ্দিনে আমরা রজনীকান্তের ন্যায় একজন প্রকৃত সাহিত্যসেবককে হারাইলাম।

বাঙ্গালা ১২৫৬ সালের ভাদ্রমাসের ২৯শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। রজনীকান্ত পিতা মাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। পুণ্যবতী জননী তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও একটী কন্যাকে রাখিয়া পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

রজনীকান্তের বাল্যশিক্ষা তাঁহার গ্রাম্য বিদ্যালয়েই শেষ হইয়াছিল। তাঁহার শৈশব জীবনে এমন একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহার বিষময় ফল আজীবন যন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়ক্রম সাত আট বৎসর, তখন তিনি একবার কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন, জীবনের আশা অতি অল্পই ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে আরোগ্যলাভ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ সময় হইতে চিরদিনের জন্য তাঁহার শ্রবণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া গেল এবং জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত কখন তাহার কিছু উপশম হয় নাই, বরং ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যে অসাধারণ প্রতিভা বলে রজনীকান্ত যশস্বী হইয়াছেন, সেই মহান্ তরুরবীজ শৈশবেই তাঁহার উর্ব্বর মানস ক্ষেত্রে প্রোথিত হইয়াছিল। সেই নাগরিকতার লেশমাত্র শূন্য, পার্থিব লালসা-বিলাসিতা-হীন, সামান্য পল্লিমধ্যেই তাহার জীবন বীণার তন্ত্রীগুলি যথাস্থানে সংবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রোগমুক্ত হইবার পর যথাসময়েই প্রশংসার সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারি টাকা হিসাবে চারি বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইবার তাঁহার অভিভাবকগণ শ্রবণশক্তির অল্পতা বশতঃ অধিক শিক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তী করিয়া দেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার ব্যাকরণে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ হইলেই বৈদ্যশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহাদের আশা পুরিল না। যিনি আজীবন সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কি কখন সাহিত্যসেবা ভিন্ন অপর পথ অবলম্বনে মতি হইতে পারে? রজনীকান্তের শিক্ষকেরা তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন দেখিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতেন। এই সময়ে স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রজনীকান্তের শিক্ষা বিষয়ে আন্তরিক অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকদিগের প্রতি তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, রজনীকান্তের যত্ন কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি অপর সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া মনোযোগের সহিত কেবল সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন।

রজনীকান্ত অল্প বয়সেই বাঙ্গালা রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি ক্লাসের সাধারণ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। জয়দেবচরিত নামক পুস্তকখানি তাঁহার প্রথম রচিত। তৎকালে কোন সমিতি, জয়দেব সম্বন্ধে যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। রজনীকান্তের জয়দেব চরিত উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশায় রচিত; বলা বাহুল্য তাঁহার রচনাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়দেব চরিত, লেখকের প্রথম গ্রন্থ হইলেও উহা বঙ্গসাহিত্যের একখানি উপাদেয় সামগ্রী। তৎকালে ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইলে বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী উহার ভাষা ও রচনার মাধুর্য্য দেখিয়া রজনীকান্তের ভাবি প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। বলিতে গেলে জয়দেবচরিত হইতেই তাহার প্রতিভার বিকাশ। রজনীকান্তের দ্বিতীয় গ্রন্থ পাণিনি বিচার। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ প্রকৃত গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ অতি বিরল। তাঁহার গ্রন্থ সমূহের সমালোচনা করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আর আমাদের সামান্য হৃদয়ে সে ক্ষমতাও নাই। যে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস রজনীকান্তকে অমর করিয়াছে, তাহার প্রথম খণ্ড এই সময়েই রচিত হয়। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস শেষ করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল, মৃত্যুর অতি অল্প দিন পূর্ব্বেই উক্ত পুস্তকের পঞ্চম বা শেষ ভাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার আদরের সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী কিরূপ আদরের

সহিত গ্রহণ করিলেন তাহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

রজনীকান্তের রচনা বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য ঘটাইয়াছে। উজ্জ্বল শুভ্র তাড়িতালোকসম কবি-কল্পনা-প্রসূত কাব্যের প্রেম, উচ্ছ্বাস, বিরহ, মিলনরূপ এক ঘেয়ে প্রখর আলোক হইতে জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির স্নিগ্ধ সমীরে ক্ষণিক বিরামের উপায় করিয়া দিয়া তিনি বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাদিগের পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যরাজ্যের মধ্যে যে মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই নির্জ্জন, অধুনা কোন কোন মহাত্মা সেই পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ে তাঁহার সহযোগীর নিতান্ত অভাব ছিল। সুখের কথা, এক্ষণে অনেকেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, রজনীকান্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অন্য পন্থা অবলম্বন করেন নাই।

জয়দেব চরিত, পাণিনি বিচার, সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, ভারতের ইতিহাস ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। প্রায় সকলগুলিই সাহিত্য সাগরের এক একটী রত্ন তুল্য। প্রথম অবস্থায় রজনীকান্ত দেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ ও মাসিকপত্রে বহুল পরিমাণে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেন; এবং পরে সেই সকল প্রবন্ধই আর্য্যকীর্ত্তি নামে পুস্তকাকারে একে একে তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন। ভারতপ্রসঙ্গ এবং আরও দুই একখানি পুস্তক এইরূপে প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব বাবুর সহিত এই সময়ে তাঁহার আলাপ হয়, এবং ভূদেব বাবুর অনুরোধে 'এডুকেশন গেজেটে' তিনি নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন।

বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রজনীকান্ত যে বৈদ্যশাস্ত্রে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে। বিদ্যালয় ত্যাগের পর যখন তিনি পাণিনি বিচার, সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস ইত্যাদি পুস্তক সকল প্রণয়ন করেন, তখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ব্রজেন্দ্র কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যানুরাগী রজনীকান্ত একমাত্র ভারতীদেবীর অর্চ্চনা ভিন্ন অন্য কোন ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগ স্থাপন করিতে বা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হন নাই।

রজনীকান্ত ধনবানের পুত্র ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে চাকুরী ভিন্ন অর্থোপায়ের অপর কোন উপায় নাই। কবিরাজি শিক্ষাতেও তাঁহার আন্তরিক যত্নের অভাব দেখিয়া আত্মীয়েরা তাঁহার জন্য একটী সব্ ডিপুটী কালেক্টারের পদ যোগাড় করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় যাবজ্জীবন সাহিত্য সেবায় অতিবাহিত করিবার মানসেই তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এবং এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় তিনি তাঁহার প্রধান ও প্রসিদ্ধ সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। জয়দেব চরিত হইতে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়, এবং সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে তাহার পূর্ণতা সাধন হয়। কেবল মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সংসারের আর্থিক অভাব দূর করা বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও হয়। রজনীকান্ত এই অভাব দূর করিয়া কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছায় বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গম্ভীর ও গুরুতর বিষয় সকল লিখিয়া তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন, বালকপাঠ্য প্রবন্ধগুলিতেও সেইরূপ নানা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সকল মহাপুরুষ কোন উচ্চ ও মহত্তর বিষয় লক্ষ্য করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে যশোলিপ্সা, অহঙ্কার ইত্যাদি সামান্য বৃত্তিগুলিও স্থান পায় না। রজনীকান্ত আজীবন অপ্রতিহতভাবে পরিশ্রম করিয়া কয়খানি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে জননী ভারতীর হেমাঙ্গ সাজাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য একদিনও তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে অহঙ্কার বা যশের আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন কেহ দেখে নাই। কেমন করিয়া জগৎ সমীপে আত্মগুণের পরিচয় দিতে হয়, কেমন করিয়া অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থার ব্যক্তিদিগের উপর প্রভুত্ব খাটাইতে হয়, সে চিন্তা করিবার অবসর তিনি কখন পান নাই। তিনি যেমন অমায়িক, তেমনই ধীর, নম্র, বিনয়ী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। পরোপকার তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল, মানবজীবনের উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

রজনীকান্ত বড়ই আড়ম্বর শূন্য ছিলেন, পরের কথায় থাকিতে তিনি কখনই ভালবাসিতেন না। তিনি হুজুকপ্রিয় ছিলেন না। যে বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা প্রাণপণে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। ঐরূপ চরিত্র আমাদের সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

নিজ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে রজনীকান্ত যেরূপ সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কম প্রশংসার কথা নহে। কেবল মাত্র স্বলিখিত পুস্তকের আয় হইতে তিনি পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিয়া কলিকাতা সহরের মধ্যে একটী নাতিক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ও একটী ছাপাখানা রাখিয়া গিয়াছেন। এরূপ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। রজনীকান্ত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি পুস্তকসংগ্রহ করিতে বিরত ছিলেন না। হায়, তাঁহার সেই আদরের পুস্তকাগার এক্ষণে আর সেরূপ যত্নে কে রাখিবে?

সংসারে রজনীকান্তের অসুখের কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর মানসিক সুখে কাটাইতে পারেন নাই। ইদানিং তাঁহার শরীরও সুস্থ ছিল না, কয়েক বৎসর বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া শেষে তজ্জনিত দুষ্টব্রণ রোগে গত ৩০এ জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১॥ টার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্য সমাজে তাঁহার আসন নিঃসন্দেহ অতি উচ্চে, কিন্তু সেই উচ্চতা নির্ণয়ের সময় এখনো আসে নাই।

অতি সংক্ষেপে রজনীকান্তের জীবনের স্থূল কথাগুলি বিবৃত করা গেল। কিন্তু যে জন্য তিনি এত পরিচিত, এত পূজ্য তাহার কথা প্রায় কিছুই বলা হয় নাই; তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলীর কথা, ওজস্বিনী ভাষার কথা, অকৃত্রিম রচনা কৌশলের কথা, প্রায় কিছুই বলিতে পারি নাই। কেন পারি নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দীন হীন সামান্য লেখকের হৃদয়ে সে ক্ষমতার সম্পূর্ণ অভাব, পাঠকগণ তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আপনাদিগকে সে সকল কথা বলিবার জন্য অবশ্যই ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীহরিহর শেঠ।

শব্দ।

শব্দ সাহিত্যের উপাদান। সাহিত্য-পত্রে, সাহিত্যের উপাদান সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করা যাইতে পারে।

শব্দ কি? শব্দ কোথা হইতে আসিল? শব্দকে কে অর্থযুক্ত করিল? শব্দ, কবে কাহার কর্ত্তৃক কিরূপে গঠিত নির্ম্মিত হইল?

আমরা শব্দ লিখি, শব্দ পড়ি, শব্দ বলি, আমরা শব্দের সন্ধি করি, সমাস করি, বিচ্ছেদ করি, ব্যুৎপত্তি করি। আমরা বলি শব্দ-সঙ্গতি, শব্দ-সৌন্দর্য্য, শব্দ-রূপ, শব্দ-চিত্র, শব্দাড়ম্বর, শব্দ সম্বন্ধীয় কত শত কথা! কিন্তু, শব্দ সামগ্রীটীর সৃষ্টি হইল কবে কিরূপে?

আমরা মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে শব্দ শিখি। টোল চৌপাড়িতে যাই শব্দ শিখিতে, স্কুলে কলেজে যাই শব্দ শিখিতে, আমরা য়ুরোপে আমেরিকায় যাই শব্দ পড়িতে, আমাদের মধ্যে যিনি যত বেশী শব্দ শিখিতে পারেন,—বলিতে কহিতে, লিখিতে পড়িতে ও নাড়িতে চাড়িতে পারেন, তিনি তত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিখ্যাত।

আমরা শব্দ-প্রশ্নের শব্দ-উত্তর দিয়া, নিম্ন প্রাইমারি হইতে আরম্ভ করিয়া, য়ুনিবার্শিটীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড প্রচণ্ড পরীক্ষার "প্যাসেবিক" পারবার পাহাড়ী দিয়া পারে আসি; স্বর্গের সুবর্ণ সিঁড়ি "সিভিল সার্বিস" পাস করি। শব্দ, আমাদের সকলকে না হউক,—আমাদের শুভক্ষণে-জন্মাগণকে সিবিল করে, ব্যারিষ্টার করে, বিদ্যাবাচস্পতি করে, বক্তা করে, কবি করে, জজ ম্যাজিষ্টর কলেক্টর করে, কি না করে?

শব্দ দিয়া, আমরা বিষয় কার্য্য করি—ব্যবসা বাণিজ্য করি, ঘর গৃহস্থালী করি, ধর্ম্মকর্ম্ম করি, ঝগড়াঝাটি করি, রাজনৈতিক আন্দোলন করি, ধর্ম্ম প্রচার করি, ধর্ম্মনৈতিক বাদানুবাদ করি, সমাজনৈতিক কোন্দল করি, কোলাহল করি, গালিগালাজ করি, কি না করি? সবি ত করি আমরা শব্দ দিয়া।

শব্দ সাজাইয়া, আমরা গদ্য লিখি, পদ্য লিখি, প্রবন্ধ

লিখি, পুস্তক লিখি, পত্রিকা লিখি;—এই আমিই, শব্দেরই কথা; শব্দ সাজাইয়া সাজাইয়া, "প্রদীপে" লিখিতেছি। অতএব দেখ, আমরা যাহা কিছু লিখি—যত কিছু লিখি সবই শব্দ,—শব্দ ছাড়া আর কিছু না। শব্দ ছাড়া হইয়া, সৃষ্টি সংসারের কোন সামগ্রীই, আমাদের জ্ঞানগোচরে আসিতে পারে নাই; আসিতে পারিবে না। আমরা যাহা খাই, যেখানে যাই, যাহা করি, যাহা কহি, যাহা না-করি, না-কহি, সবই শব্দ বা সবই বুঝায় শব্দে। শব্দ-ছাড়া কিছুই বুঝিবার, বুঝাইবার, বলিবার, শুনিবার যো নাই।—যো আছে কি?

তা, এই যে "আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তিনি তাঁহারা"—এ গুলি কি? এ সব কিসে বুঝাইতেছে, কিসে বুঝিতেছ, কিসে বুঝাইতেছি? বুঝাইতেছে, বুঝিতেছ ও বুঝাইতেছে শব্দে। প্রশ্নটী করিলাম শব্দে, উত্তরও দিলাম শব্দে। তুমি শব্দ শুনিয়া সব বুঝিলে।

আমি শব্দ, কাগজ-শব্দের উপর, কলম শব্দের দ্বারা, কালী শব্দ দিয়া, লেখা শব্দ লিখিতেছি। লিখিতেছি "প্রদীপ"-শব্দের পৃষ্ঠা-শব্দ পূর্ণ করিবার জন্য;—প্রদীপের সম্পাদক-শব্দ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ বা শব্দিত হইয়া। আবার—এই "কর্ত্তৃক" "অনুরুদ্ধ" "শব্দিত" "হইয়া" "আবার"—এ গুলিও শব্দ-ছাড়া আর কিছুই না।

কি লিখিতেছি, কি দিয়া শব্দ লিখিতেছি? বর্ণ বা অক্ষর দিয়া শব্দ লিখিতেছি।—লিখিতেছি বর্ণ,—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। এখন, এই "স্বর" "ব্যঞ্জন" এবং "বর্ণ" ইহারাও এক একটী শব্দ বটে।

বর্ণ, শব্দের বাহক, সংগঠক, সংযোজক। শব্দের ও শব্দাংশের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ, শাখাঙ্গ,—বর্ণ। বর্ণ, শব্দকে—শব্দ-রাশিকে—শব্দ-সাগরকে, বহিয়া লইয়া যায় সর্ব্বত্র—দূরে—সুদূরে—অতি দূরে, দেশ-দেশান্তরে, বংশ-বংশান্তরে।

শব্দ-শোয়ার, বর্ণ-শোয়ারিতে চড়িয়া, পঞ্চ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে, পথ পাইলে, সপ্ত স্বর্গেও কোন্ না যাইতে পারে;—যদি সেখানে শব্দ শুনিবার ও বুঝিবার লোক থাকে?

বর্ণ-পোয়ারির শব্দ-শোয়ার, স্থানের ব্যবধানের মত, কালের ব্যবধানেও, বাধা পায় না। অসীম সময়ের শড়ক বহিয়া, সাগর মহাসাগর পার হইয়া, সত্যযুগ হইতে কলি-যুগে আসিয়া পৌছে। সত্য যুগের শব্দ-শোয়ার সকলকে আমরা এই ঘোর কলিতেও দেদীপ্যমান দেখিতেছি। স্বর্ণ বর্ণ সুবর্ণ কল্পের শব্দ সকল, এই কৃষ্ণবর্ণ লৌহ কল্পেও, আমাদের স্বত্বাধিকারে বর্ত্তিয়াছে।

বেদে, উপনিষদে, আমরা সত্যকালের শব্দ-শোয়ার-গণের সাক্ষাৎ পাইতেছি। বাল্মীকির কাব্যে, ত্রেতার এবং ব্যাসের গ্রন্থে, দ্বাপর যুগের বর্ণারোহী শব্দগণ, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।—এই সকল শব্দ-শোয়ার যে সটান সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ হইতেই এই কলির শেষে আমাদের কাছে এসেছেন ঠিক তাহাও নয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বহু বহু পূর্ব্বেও ইঁহারা বিদ্যমান ছিলেন এবং সময়-স্রোতে অসীম পথপর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং আমাদের পশ্চাৎবর্ত্তী সত্য যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বহু সত্যযুগ পাহাড়ী দিয়া আসিয়া-ছিলেন।—এই সব শব্দ মহাশয় ও মহাশয়াদের এক একটীর বয়ক্রম বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বিহঙ্গ "কাকভুষণ্ডীর" অপেক্ষাও বেশী। ইঁহারা বোধ করি জননী বসুন্ধরারই সম বয়সী।

বর্ণা-রোহী শব্দরূপী এই আসোয়ারগণ, এক সময়ে মধ্য এসিয়ায়, আর্য্য-গৃহের হব্য গব্যে পাহারা দিতেন হোমাগ্নির আহুতি-কালে উপস্থিত থাকিতেন।—দুগ্ধ দোহনে, হলকর্ষণে, সোম-রস-পানে এবং সামগানে সহায়তা করি-তেন। সে আজ তিন সহস্র চারি সহস্র বৎসরের কথা তাহার পূর্ব্বে ইঁহাদের কোথায় স্থিতি, কোথায় বসতি ছিল কেহ তাহা জানে না;—আজও জানিতে পারে নাই কিন্তু, তাহার পর ইঁহারা নানা দেশে, নানা বেশে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা হিন্দুস্থানে ও ম্লেচ্ছ স্থানে সমান সজীব সচেষ্ট ও শশব্যস্ত; সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পুরুষদে একত্বের পরিচয় দিয়া ও দায়িদত্বের দোহাইয়া দিয়া জাতি গঠনের উদ্যোগ করিতেছেন।

বর্ণারোহী এই সব শব্দ-বীর, ইয়ুরোপে আমেরিক জুতো প্যাণ্ট-কোটবুট-আটা এক একটী আস্ত সাহেব,—বিলাতে তিউতনিক রাজ্যে, ইঁহারা এক একটী জল-জীয়ন্ত জনবুল বা এক এক খানি অখণ্ড "পরিপাণ্ডু দুর্ব্বল কপোল সুন্দরম "বিলোল কবরী" লাবণ্যময়ী "লেডিদীপ" বা এক একখানি "কিসলয়মিব মুগ্ধং" "মিসী-বাবা";—ক্যাপ মাথে, চাবুক হাতে, বাইসাইকেল বাহনে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিমর্দ্দন—বিধ্ব

করিতেছেন ;—সম্প্রতি তদর্থে, আফ্রিক রাজ্যে—বুয়র ভূমে শিবির সন্নিবিষ্ট।

পক্ষান্তরে বা দেশান্তরে ইঁহাদের অপরবিধ বেশ ও ব্যবস্থা। দৃষ্টান্ত,—অস্মদ্দেশে হিন্দুস্থানে, —বঙ্গ পল্লীতে—বঙ্গীয় গৃহে, সেই শব্দ মহাশয় মহাশয়াগণ, কোথাও কোপীন চিমটাধারী সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী, কোথায়ও বা নামাবলী গায়, টিকি মাথায়, চটি পায় পৈতা-গলায় সংস্থানহীন সংসারী বা ভিখারী ; পরন্তু, কোথায়ও বা সেই শব্দ মহোদয়গণ গামছা কাঁধে, খারা-হাতে, খালি গায়, খালি পায় খালি মাথায়, মেছোহাটায় অর্দ্ধ পয়সার খোল্‌সে মাছ দর করিতেছেন। আর কোথাও হয় ত তাঁদের কেহ কেহ আধ-ময়লা ও অতি মোলায়েম শয্যায়, আলস্য-গের্দ্দায় স্কন্ধ রাখিয়া, অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে, আরাম-আলবোলা চঞ্চুপুটে চুম্বন করিতেছেন। কেবল বঙ্কিম বাবুর মত ব্যক্তিই বর্ণনা করিতে পারিতেন, সেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে কুণ্ডলিতা সুললিত আলম্বিতা শত হস্ত পরিমিতা, রজত-কাঞ্চন-বিখচিতা এবং সুবর্ণ শরপোসের সুন্দর রাজ মুকুট শোভিতা, নিত্যানন্দ দায়িনী, আরাম আলবোলার মুনি-মন-বিমোহনী-বুলী কেমন, আর অলোকা-বিনিন্দ্য বিলাস কি ? আর তাহা হইতে বিনির্গত, মৃগ-নাভী-বাসিত ধূম-রাশি কিরূপ "কুণ্ডলাকারে" বাবু কক্ষ বিভাসিত ও বিভূষিত করে।

তাহার পরে, এদেশে সে কালের সেই শব্দ মহাশয়াগণ কি সাজে সজ্জিতা, কি কাজে সমাহিতা, তাহা আমাদের পাক-শালা পানে তাকাইলে, কতক অঞ্চলে এবং কতক আধ ঘোমটায় দেখিয়া লইতে পারেন। কিন্তু সে সব সাজের ও সে সব কাজের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া, এখনি বা যখনি হউক, আমি আঁধার মুখ দেখিতে অভিলাষী নই।

বর্ণাক্ষরারোহী সেকালের শব্দদের কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু, বর্ণের কথা বাদ দিয়াই বলিয়াছি। আজ বাদই থাকুক। বর্ণ-বাহাদুর দিগকে বরং আর কোনও দিন দেখা যাইবে। এখানে শব্দের কথা হইতেছে হউক।

তা শব্দেই ত আমাদের সব। শব্দেই ত সমস্ত সংসার চলিতেছে। শব্দই ত ভবসংসার চালাইতেছে।

দেখ, শব্দই ভাব, শব্দই ভাষা, শব্দই সাহিত্য, শব্দই মন্ত্র। শব্দই কাব্য, শব্দই কবিত্ব। শব্দেই কর্ম্ম, শব্দেই ধর্ম্ম। আবার শব্দেই সুখ, শব্দেই দুঃখ। শব্দ ভিন্ন এ সকলের কোন্‌টী সম্ভব ? কেবল আমাদের নয়, সবারই ;—মানুষ মাত্রেরই, জাতি মাত্রেরই।

এই যে আমাদের সুরেন্দ্র বাবু এত বড় বাগ্মী, দেশ-বিদেশ-বিখ্যাত বক্তা, ইহা কেবল শব্দেরই বিক্রমে আর বেগশিলতায়। শব্দের বেগে এবং বাক্যের বিক্রমে, সুরেন্দ্র বাবু, বরফের ভিতর হইতেও বহ্নি ছুটাইতে পারেন।

আর আমাদের রবীন্দ্র বাবু যে এমন দেশ প্রসিদ্ধ কবি, ইহাও কেবল তাঁহার শব্দ সাজাইবার হের ফেরে। শব্দ গাঁথিবার গুণে—শব্দেরই সম্মোহন আকর্ষণে, তাঁহার কবিতায় যুবক যুবতীর মন প্রাণ আকৃষ্ট, উদ্বেলিত, উন্মত্ত ও উদাস হয়। কেবল শব্দেরই মাহাত্ম্যে—চিক্কণতায় ও চাতুর্য্যে, সে কাব্য কথায়, কুসুমের কান্তি ও কচিত্ব, কুসুম-নিশ্বাসের মৃদুত্ব এবং কামিনী-কণ্ঠের মোলায়েমত্ব ও সুমধুর মাদকত্ব পাওয়া যায়। কেবল সুরেন্দ্র ও রবীন্দ্র বাবু বলিয়া নয়। ছোট বড় সবাই শব্দের মার প্যাঁচে ছোট বড়।

শব্দের কেবল অর্থবোধেই যে সুখ তাহা নয়। সদ্ভাব-যুক্ত শব্দের অর্থবোধের অনির্ব্বচনীয় আরাম ত আছেই। কিন্তু, শব্দের অর্থবোধ যদি নাও হয়, তাহাতেও শব্দের শক্তি লোপ হয় না—শব্দ কিয়ৎ পরিমাণেও আত্মপ্রভাবে তোমায় প্রভাবিত করে। কত সময়ে, শব্দের অর্থ না বুঝিয়াও, কেবল শব্দটী শুনিয়া আমরা আরাম পাই, আনন্দ অনুভব করি! কত সময়ে, কথা বা কবিতা কিছুমাত্র না বুঝিয়া,—কথার বা কবিতার ভাবার্থ বা তাৎপর্য্য কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম না করিয়াও, কেবলমাত্র কথাগুলি বা কবিতাটী শুনিয়া মোহিত হইতে হয়! শব্দটী—কথা কটি বা কবিতাটি শুনিয়া—শুনিয়াই কেবল, আমাদের মনে অনির্দ্দিষ্ট কোনও কোমল করুণ বা কঠোর ভাবের উদয় হয়,—অর্থের অভাবে এবং শব্দেরই স্বভাবে,—উহা উদ্রেক হইতে পারে! ইহা কি কম বিস্ময়কর ব্যাপার! শব্দের শরীরে কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক শক্তিই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

আমি এস্থলে সুস্বর সংযুক্ত শব্দের কথা বা সঙ্গীতের কথা বলিতেছি না। সুস্বর সংযুক্ত শব্দের বা সঙ্গীতের অর্থবোধ না হইলেও তদ্দ্বারা আরাম ও আনন্দ অনুভব হয়। সুস্বরের বা সঙ্গীতের সুরের শক্তিই, এই আরাম ও আনন্দের কারণ। কিন্তু, এখানে সুস্বরের ও সঙ্গীতের আলোচনা

হইতেছে না। কেবল বর্ণাত্মক শব্দের কথাই হইতেছে।—কেবল শব্দ শুনিয়াই তুমি সুখী বা দুঃখী হও, অর্থ বুঝ বা না বুঝ।

রবি বাবুর কত কবিতা আছে, যাহা হয়ত তুমি কিছুমাত্র বুঝিতে পার না, অথচ তাহা শুনিয়া বা পড়িয়া তুমি কেমন একরকম কোমল আবল্য বা আরাম অনুভব কর। ইহার কারণ শব্দের শক্তি, কথার নিজের প্রভাব।

কথা কহার প্রভা,—কবিতা পড়ার প্রভা, সে স্বতন্ত্র। কথা কহার গুণে কথা মিষ্ট লাগে, সেত লাগেই। কথা কহার গুণে, কথার অর্থ, ভাব, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য, হাড়ে হাড়ে অনুভব হয়। কবিতা পড়ার প্রভাবে, অনেক অস্পষ্ট কবিতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অনেকানেক উৎকৃষ্ট কবির অনেকানেক উৎকৃষ্ট কবিতা অস্পষ্ট, পড়ার ভাবে, উচ্চারণের ভঙ্গিমায়, পাঠকের স্বর-মাধুরী ও কণ্ঠ-চাতুরীতে, তাহা সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য হইয়া যায়। রবার্ট ব্রাউনিঙের কোন-কোন অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা, অস্পষ্ট, অবোধ্য। বিলাতের ব্রাউনিঙ-সভা, সে সব কবিতা, সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করার জন্য, অন্যান্য উপায়ের মধ্যে, আবৃত্তি-কৌশলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ফলতঃ কাব্য কবিতা, শতটা টিকা টীপ্পনীতে যতটা না বুঝায়, একটা উৎকৃষ্ট আবৃত্তিতে তাহার অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেয়।

ইহার কারণ, শব্দে নিহিত শক্তির সহিত, শব্দকারী কর্ত্তৃক সেই শক্তির তীক্ষ্ণানুভূতি সঞ্জাত শক্তির সংমিশ্রণ। তাহাতেই শব্দকে, কথা এবং কবিতাকে, সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করে; তাহার অর্থ অধিকতর শক্তি-সমন্বিত করে। "অধিকতর শক্তি সমন্বিত করে" না বলিয়া, এমনও বলা যাইতে পারে, বরং ইহা বলিলেই কথাটী সত্য ও সঙ্গত হয় যে, শব্দাবৃত্তিকারী পাঠক বা কথক—শব্দ, কথা বা কবিতা সম্যক্‌রূপে বা সুতীক্ষ্ণরূপে অনুভব বা উপভোগ করিয়া, পূর্ণ মাত্রায় বুঝিয়া ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উচ্চারণ ও আবৃত্ত্যাদির গুণে, শব্দে, কথায় বা কবিতায়, শব্দের, কথার বা কবিতার সম্পূর্ণ ভাব সমগ্র শক্তি সিঞ্চিত করিয়া দেন। সুতরাং শব্দ, কথা বা কবিতা, তাহাদের সমগ্র শক্তি ও সম্পূর্ণ ভাবের সহিত উদ্বোধিত ও উচ্চারিত হইয়া, জাগ্রত ও জীবিত হইয়া, অধিকতর সুবোধ্য, সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। অতএব, স্বীকার করিতে হইতেছে যে, শব্দের তীক্ষ্ণানুভূতি ও আবৃত্তি সঞ্জাত শক্তি শব্দের স্বভাব জাত শক্তি হইতে স্বতন্ত্র নয়,—তাহারই অপরাংশ।

"আহা! কথাগুলি কেমন মিষ্ট, দু দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছা করে।"—ইহার তাৎপর্য্য কথার জন্য, কথা শুনা,—অন্য কিছুর জন্যও নয়।—কথার সদর্থের জন্য নয়, সদ্ভাব ও সদুপদেশের জন্যও নয়; পরন্তু শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা শুনার সুখ ভিন্ন, অন্য কোনও স্বার্থের জন্যও নয়। ইহা কেবল কথার মিষ্টত্ব ও কথা কহার মিষ্টত্বের জন্যই কথা শুনার স্পৃহা। পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েকটী সরল ও সমীচীন বন্ধুর মুখে সর্ব্বদা শুনিয়া থাকি,—পূর্ব্ববঙ্গের আরও কত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলিতে শুনিতে পাই যে, তাঁরা পশ্চিম বঙ্গের কথা শুনিতে খুব ভাল বাসেন, সে কথায় তাঁদের কর্ণ জুড়ায়। ইহা কেবল কথার জন্যই কথা শুনিতে ভালবাসা। কর্ণের তৃপ্তি, অথবা মনের এক রূপ অহেতুক আরাম বা আনন্দের জন্যই কথা-কহা শুনার কামনা। কথা কেবল কথা হইলেই হইল; অর্থহীন কথাই হউক আর এলোথেলো কথাই হউক, তাহাতে হানি নাই। পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা অঞ্চলের শব্দে শব্দিত ও উচ্চারণের ধ্বনিতে ধ্বনিত কথা মাত্র হইলেই হইল। ইহা যাউক।

অতঃপর পুনঃ অনুধাবন করুন, শব্দের কি অসীম শক্তি। শব্দ আগুন জ্বালিয়া দেয়, আবার শব্দই আগুন নিবায়, অন্তর জুড়ায়, সান্ত্বনার শীতল সুবাসিত বারি সিঞ্চন করে। একটা শব্দ শত বৃশ্চিক হইয়া তোমায় দংশন করে, আবার আর একটী শব্দ-কুসুম-কোমল-স্পর্শে তোমা পরতে পরতে পুলকিত করিয়া তুলে। একটা শব্দ শুনি তুমি সমস্ত জগৎ সংসার অন্ধকার দেখ; আবার একা শব্দের হয়ত আধখানা শুনিতে শুনিতেই তোমার সাতখান জগতে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে। সংসারের হায়! কতই দুঃখ, আর কতই না সুখ, শব্দ মাত্রের দ্বারা সৃষ্ট হয়, সঞ্জা ও সঞ্চারিত হয়! বল, দেখি, রাত্রি দিনের মধ্যে, ক কতবার না তুমি, শব্দের দ্বারা সুখী ও দুঃখী হও!

শব্দে, তোমার শোকের সাত সমুদ্র, উথ্‌লে উঠে শব্দে, তুমি শূল বিদ্ধ হও, সন্তপ্ত হও, দগ্ধ বিদগ্ধ হও—কণ্টকিত হও। আবার শব্দই তোমার দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনার ও শান্তির শীতল বারি সিঞ্চিত করে। পুনশ্চ, শব্

তুমি উত্তাপিত হও উত্তেজিত হও, ক্রোধানলে প্রজ্জলিত, অভিমানে উদ্দীপ্ত হও বা নির্ম্মমতায় পাষাণ কঠিন হও; আবার শব্দেই তোমায় এই সব বৃত্তির বা প্রবৃত্তির বিপরীত পারে নীত করে; তুমি শব্দের সুমধুর মলয় নিশ্বনে, নবনীতবৎ দ্রবীভূত হইয়া, স্নেহে, প্রেমে, হর্ষে, পুলকে পরিপূর্ণ হও; তোমার দুই পার্শ্বে দয়া দাক্ষিণ্যের দুগ্ধ স্রোত উছলিতে থাকে।

শব্দ, সমগ্র সৃষ্টির ভাব ও স্বভাব শরীর ও আত্মা, আত্মস্থ করিয়া, যদৃচ্ছা তাহার প্রবাহ ছুটাইয়া, তরঙ্গ তুলিয়া, প্রতি পদক্ষেপে, তোমায় চলিত বিচলিত করিতেছে। তুমি শব্দ সংস্পৃষ্ট হইয়া, মন্ত্রবৎ ঘুরিতেছে। শব্দে, —শব্দের অভ্যন্তরে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমস্ত ভাব স্বভাব প্রবৃত্তি জ্ঞান বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, আলোচনা, অনুশীলন উন্নতি কার্য্য-কলাপ সবই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব তোমার নিজেরও যাহা কিছু ভাব স্বভাব, ভাবনা চিন্তা, কাজকর্ম্ম, প্রবৃত্তি অনুভূতি, তাহাও শব্দের ভিতরে রহিয়াছে, —শব্দ হইতেই ও শব্দের মধ্য দিয়াই, তাহা বাহির হয়। যাহা শব্দিত হয় নাই, তাহা সৃষ্টও হয় নাই;—তাহা ক্রীত ত হয়ই নাই।

কিন্তু তোমার কেবল কর্ম্মই কি শব্দে? তোমার ধর্ম্মও শব্দে। তোমার কেবল সুখ দুঃখ সৃষ্টি সংসারই কি শব্দে? তোমার স্বর্গাপবর্গও শব্দে। শিহরিও না। কথাটা ষোল আনাই সত্য। তোমার প্রণয়ের অতি গোপন সম্বোধন শব্দে বটে; তোমার মন্ত্রণার অতি গোপনীয় "গুপ্তগো"ও শব্দে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, তোমার গোপনীয় বা অগোপনীয়, অতি প্রকাশিত, —ততোধিক শব্দিত গালিগালাজ গুলিও শব্দ,—ষোল আনা রকমই শব্দ, তাহাতে সংশয় নাই। এখন দেখ, তোমার শুভাশীর্ব্বাদ, সুমিষ্ট সম্বোধন এবং অশুভ ও অমিষ্ট গালিগালাজগুলিও যেমন শব্দ, তেমনি তোমার উপাসনা প্রার্থনা, গায়ত্রী সাবিত্রী, প্রণব ও প্রাণায়ামও শব্দ বটে। তবেই হইল তোমার সাংসারিক "সু" "কু" যেমন শব্দে সন্নিবিষ্ট, তেমনি তোমার পারলৌকিক স্বর্গ নরকও শব্দেরই দ্বারা সাধিত ও অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায়, শব্দ নহিলে আমাদের কাহারও কিছুই হয় না। নিঃশব্দে, নিরাকার ঈশ্বরোপাসনাও হয় না। যখন তুমি মৌনী হইয়া ধ্যান কর,—কোনও শব্দ উচ্চারণ কর না, তখনও ভাবরূপী শব্দ বা শব্দরূপী ভাব তোমার চিত্তে জাগরূক থাকে। তুমি যতই সংযত হও, যতই বাক্য সংযমী হও না কেন, তুমি জোর করিয়া জিহ্বাতে না আসিতে দিলেও—জিহ্বাতে না আনিলেও, শব্দ তোমার সঙ্গ ছাড়ে না। শব্দ তোমার আশে পাশে অনবরত ত থাকেই, তোমার অভ্যন্তরে,—ভাবনা চিন্তার ভিতরেও অনুক্ষণ থাকে;—শব্দের সহিত মানব জীবন এতই জড়িত হইয়া গিয়াছে ও রহিয়াছে।

মানব জীবনই এক মহা শব্দ,—শব্দ-সমষ্টিময় এক মহা কোলাহল। জন্মে শব্দ, জীবনময় শব্দ, মরণেও শব্দ! কি সাংঘাতিক শব্দ শব্দিত এই মানব জীবন! কেবল মানব জীবনই বা বলি কেন, জীব মাত্রেই শব্দের সহিত জড়ীভূত!

এখন বলুন এই সব শব্দ, কোথা হইতে কি রূপে আসিল,—কে ইহাদের কি রূপে সৃষ্টি করিল? ইহারা কি আকাশ থেকে পড়েছে, না পাতাল ফুঁড়ে উঠেছে,—এই শব্দ গুলা?

তুমি বলিবে "কেন? বেশ ত, এ আর কি এত বড় "একটা কথা? শব্দ এ ত আছেই। ছোট ছোট শব্দগুলা "আমরা মা বাপের কাছ থেকে পাই; বড় বড় শব্দ বই "প'ড়ে' বক্তৃতা শুনে শিখি।"

তা বটে। "শব্দ এ ত আছেই"। এ কথা যথার্থ। "আছেই" বটে। কিন্তু, "আসিল" কোথা হইতে? মা বাপ হইতে। বই বক্তৃতা হইতে। মা বাপ শব্দ পাইলেন কোথা হইতে? তাঁদের মা বাপ হইতে। তাঁদের মা বাপ কোথা হইতে? তাঁদের মা বাপ হইতে। এইরূপে মানুষের সমস্ত মা বাপের আদি মা বাপ শব্দ পাইলেন কোথা হইতে, যখন জিজ্ঞাসা হয়, তখন আর উত্তর চলে না। মা বাপের মুখ ছাড়িয়া শব্দ মহাশয়দের আদি নিবাস অন্য কোথায় অন্বেষণ করিতে যাইতে হয়। বই, বক্তৃতা বাক্যাদি সম্বন্ধেও কথাটা প্রায় ঠিক ঐরূপ। আদি বই, আদি বক্তৃতা ও আদ্য বাক্যের নাগাল না পাইয়া, কল্পনা করিয়া লইলেও তাহার মধ্যে শব্দ জাতির জনক জননীর সন্ধান না পাইয়া অন্য কোথায়ও তল্লাসে বাহির হইতে হয়।

তুমি আবার বলিতে পার "তা অত অত অধিক দূরেই বা যাওয়া কেন? আমাদের আপন বাড়ীর এই সব

বাঙ্গালা শব্দই দেখা হউক না কেন? ইঁহাদের অনেককেই পাইয়াছি আমরা সংস্কৃত হইতে, অনেককে প্রাকৃত হইতে, কতক কতককে আরবী, পারসী, ইংরেজী হইতে আমরা পাইয়াছি। কথা ত কানে হাঁটে। কত কথা—কত শব্দ, কানে হাঁটিতে হাঁটিতে, কত কত ঠাঁই হইতে, কত কত ভাষা হইতে, আমাদের কাছে এসেছে।

এ কথা খুব ঠিক। শব্দ আর কথা কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে সত্য সত্যই আমাদের কাছে আসে। কিন্তু কোথা হইতে আসে? সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে আসে; আরবী, পারসী ইংরাজী হইতে আসিয়াছে। আরব্য, পারস্য, ইংলণ্ড, আমেরিকা হইতে আসিতেছে। তা বেশ। আসেই ত। আসিবে না? খুব আসুক। এস আমরা সকলে জুটিয়া সর্ব্বদেশ থেকে আরও শত শত, সহস্র সহস্র শব্দ আনি। —এনে আমাদের বাড়ীর বড় আদরের বড় যতনের সুন্দর সজীব বাঙ্গালা ভাষার ভক্তিময়ী প্রতিমাখানিকে সাজাই; প্রতিমার মণ্ডপখানি পরিপূর্ণ করি। তা ত করিব। কিন্তু যে সব জায়গা হইতে, যে সব ভাষা হইতে আমাদের আগেকার ও এখনকার এই সব বাঙ্গালা শব্দ এসেছে, আসিতেছে, সে সব জায়গায় সে সব ভাষায় শব্দ আসিল কোথা হইতে? স্বয়ং সংস্কৃত শব্দ পাইলেন কোথায়? অন্যান্য ভাষাতেই বা শব্দ আসিল কোথা থেকে। এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় শব্দ আসিয়াছে। তা বটে। কিন্তু, মানুষের সর্ব্বাদ্য ভাষা বা ভাষাগুলিতে শব্দ আসিল কিরূপে, শব্দ জন্মিল কেমন করিয়া? সর্ব্বাদ্য ভাষাতেও "শব্দ সেত আছেই।"

বড়ই ফেরে পড়া গেল যে! ফেরে পড়ারই কথা। এ ফের কেটে ওঠাই ভার। শব্দ ভায়াদের আদি উৎপত্তির নির্ণয় করা, সন্ধান পাওয়া একেবারেই দুষ্কর।

তবে এই অসীম শক্তিশালী শব্দ মহাশয়গণ কি সত্য সত্যই আকাশ থেকে নেমেছেন, না, পাতালপুর থেকে উঠে বসেছেন? কিম্বা সকল সামগ্রীর সৃষ্টি কর্ত্তা আমাদের এই শব্দ সকলকেও তাঁহারই সৃজন-যন্ত্রে, সৃষ্টি করিয়া, মানুষ মানুষীর জিহ্বার সঙ্গে জড়িয়া দিয়াছিলেন।

কি জানি তা? সৃষ্টি-রহস্য বড়ই দুর্জ্ঞেয়। ভাষা-বিজ্ঞান, ভাষা-রহস্যের অনেক খানিই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তথাচ সর্ব্বাদ্য ভাষা ও তাহার শব্দোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রায় নির্ব্বাক বলিলেও হয়। শব্দ জাতি এমনি সাংঘাতিক প্রাচীন যে অনন্ত সময়েরই যেন সম বয়সী। বিজ্ঞান এই জাতির জন্ম-কোষ্টি গণিতে বসিয়া কর্ম্মেরই গণনা করেন, জন্ম-লগ্নের ও জন্মের ঠিক করে উঠ্‌তে পারেন না;—জন্মটা এমনি রহস্য-জালে জড়িত। ভাষার উৎপত্তি শব্দের জন্ম সম্বন্ধে, নানা মুনির নানা মত। সে সব মত মানা আর না মানা হউক, জানা চাই। শব্দতেই যখন সংসারের স্রব, তখন শব্দ বংশের কুর্চি-নামা, কিছু কিছু না জানিলে চলিবে কেন? সকলেরই সেটা জানা ভাল। আমরা শব্দ জীবী, শব্দের ব্যাপারী সাহিত্যওয়ালা, সেটা জানা আমাদের ত একান্তই গুরুতর গরজ। 67247

আমাদের সে কালের,—ইতিহাসের অতীত অত্যন্ত আগেকার কালের, অতি বুড়ো থুড়থুড়ে মুনি ঋষি মহাশয়-গণ—আচার্য্য ভট্টাচার্য্য ঠাকুরগণও শব্দতত্ত্বের আলোচন—শব্দ-সাগরের মথন করে গিয়াছেন; অন্ত পান নাই। তার পর, চিরকালই, এই মথন আলোড়ন সমানে চলেছে। এখনকার য়ুরোপীয় বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ দূরবীণ কসিয়া শব্দ সমুদ্রের দিগ নির্ণয়ে রাত্রিদিন রত রয়েছেন।

যে জগৎমান্য জর্ম্মণ আচার্য্য ভারতে ভট্টাক্ষ মহা পণ্ডিত মহাত্মা মোক্ষ মূলরের মৃত্যুতে আজ আমাদের সকলেরই মন খারাপ হয়েছে, যাঁর উদার গম্ভীর বিদ্যা-জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির একটী অতি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল প্রতিলিপি আমরা এই "প্রদীপে"ই সে দিন দেখে সুখী হয়েছিলুম,—তিনি আজন্ম কালই শব্দ তত্ত্বের অনুশীলনে অতীব ব্যস্ত ছিলেন। তিনি শব্দতত্ত্বেই এক অত্যাশ্চর্য্য সত্য আবিষ্কার করে, য়ুরোপের সহিত আমাদের জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করে গেছেন। শব্দবিজ্ঞানে, তাঁর বৈভবরাশি সমগ্র পৃথিবীকে উপকৃত এবং তাঁর আত্মাকে অমর গৌরবে গৌরবান্বিত করে রেখেছে।

কিন্তু শব্দতত্ত্ব নিরস, খুবই কঠিন কটমট। 'প্রদীপের' মোলায়েম মিঠে আলোকময় সাহিত্য পিযুষাস্বাদী পাঠক পাঠিকার মনে কি তাহা ধরিবে?—মুখে কি সে রুক্ষ দ্রব্য রুচিবে? সমস্যা বটে; সন্দেহও ষোল আনা।

কিন্তু সাহিত্যই যদি সরস হয়, তবে শব্দ নিরস হয় কেন? শব্দই ত সাহিত্য। চিনির শরবৎ মিষ্ট, তা চিনি কি অমিষ্ট? তা যাই বলুন। শব্দ ছোড়াছোড়ি এই

খানেই আজ তবে শায়। সহাইয়া সহাইয়া কহা ভাল। যদি সয়।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

জেব্ উন্নিসার কবিতা।

প্রদীপের আশ্বিন সংখ্যায় আমরা সাহজাদী জেব্ উন্নিসার জীবন কাহিনী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়াছি। এবারে তাঁহার কয়েকটী কবিতার সমালোচনা ব্যপদেশে—তাঁহার জীবনের আরও কয়েকটী দুঃখজনক কাহিনী অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

কবিতা অনেক সময়ে কবির মনোভাব প্রকাশ করে। তাঁহার প্রাণের প্রকৃত ভাব রচিত কবিতার সঙ্গে অনেক সময়ে ছায়ার ন্যায় অবস্থান করে। মনের আবেগময়ী উচ্ছ্বাসই যদি কবিতা হয়—তাহা হইলে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করা অনেক সময়ে কবির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কবিতা কবি-হৃদয়ে দর্পণ স্বরূপ। জেবউন্নিসার হৃদ্গত ভাবও বহুল পরিমাণে তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

শিবাজীর সহিত—জেবউন্নিসার প্রেম—এক স্বর্গীয় ব্যাপার। ঔরঙ্গজেবের সমস্ত অন্তঃপুরিকারা যখন দর্পিত শিবাজির অধঃপতনের ও ভাবী দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছিলেন, তখন সাহজাদী জেবউন্নিসা শিবাজির বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অত বড় বাদসাহ—যাঁহার রোষকটাক্ষ, জয়পুর, যোধপুর, বিকানিয়ার, যশল্মীরার প্রদেশের বীর ও সামন্ত রাজগণের পক্ষে ভীতি প্রদায়ক—তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র ভূমিয়া—শিবাজী দর্পিত ভাবে উত্তর করিতেছেন—জেবউন্নিসার নিকট ইহা অমানুষিক বীরত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অত বড় আম-দরবার, তাহার মধ্যে কত ক্ষমতাবান রাজপুত যোদ্ধা, কত বড় বড় মোগল ও পাঠান সৈনিকে সেই দরবার পরিপূর্ণ—সেই দরবারে, হীরা মতি মণি মাণিক্যের অবর্ণনীয় শোভায়, মোগলের ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত। যে দরবারে মহাহব বিজয়ী বীরবৃন্দের, সদম্ভ পদবিক্ষেপ, যে বহুমূল্য তক্তাউসের একাংশ বিক্রয়ে—শিবাজীর সমগ্র রাজ্যের মূল্য হয় না—সেই তক্তাউসের উপর উপবিষ্ট রাজন্যবৃন্দ পূর্ণ দরবারে, মহা প্রতাপান্বিত ঔরঙ্গজেবের সম্মুখে সমানভাবে প্রত্যুত্তর করা—একটা মহা দুঃসাহসিক অমানুষিক কার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কবির হৃদয় অমানুষিক ঘটনাতেই অনেক স্থলে আকৃষ্ট হয়। কাহারই বা না হয়? জেবউন্নিসার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল।

বঙ্কিম বাবু—জেব্উন্নিসার পার্শ্বে মবারকের ও দরিয়ার চরিত্র স্থাপিত করিয়া কল্পনার সাহায্যে জেব্‌কে অতি বিকৃত করিয়াছেন। উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেব্উন্নিসার মুখ দিয়া যে সমস্ত কথা বাহির করিয়াছেন—তাঁহার জীবনকে যেরূপ কলঙ্ক রেখাঘাতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন, জেব্উন্নিসার কবিতাগুলি পড়িলে—তাহা একেবারে মুছিয়া যায়। মেঘান্তরালভেদী পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় জেব্উন্নিসার চরিত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সাধারণের চক্ষে ফুটিয়া উঠে।

জেব্উন্নিসা সে কালের নিয়মে সুশিক্ষিতা ছিলেন। শাস্ত্র জ্ঞান তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কোরাণের কূটার্থ সমূহ, তিনি স্বধর্ম্মানুরাগী ঔরঙ্গজেবের নিকট সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক উলমা মৌলভীর মুখ নিষ্প্রভ করিয়া দিতেন। যে ধর্ম্মই হউক না কেন—ধর্ম্মালোচনায়—নর নারীর হৃদয় স্বভাবতই কলুষবর্জ্জিত হইয়া থাকে। অগ্নি যেরূপ—দহ্যমান বস্তুকে সম্যকরূপে মালিন্যহীন করে—নিখাদ সুবর্ণের মত করিয়া দেয়, ধর্ম্মও সেইরূপ প্রকৃতিগত কলুষ দূর করিয়া নর নারীর হৃদয়কে স্বাভাবিক কলঙ্ক হইতে মুক্ত করে। শাস্ত্রানুরাগিনী, স্বধর্ম্মানুসারিণী—বিদুষী সাহজাদী জেবউন্নিসা যে প্রকৃতই বঙ্কিম বাবুর চিত্রের অনুরূপ ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে এই সকল কারণেই আদৌ প্রস্তুত নহি। যে হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেম ও ধর্ম্মে পূর্ণ ছিল, তাহা যে পাপের কালিমায় কলঙ্কিত ছিল, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

জেবউন্নিসা শিবাজীর প্রতি মনে মনে আসক্তা হইয়াছিলেন। জীবনে কাহাকেও তিনি ভালবাসেন নাই, একমাত্র শিবাজীকে মনে মনে অতি প্রিয় জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। মনের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই—কিন্তু তাঁহার পিতার নিকটে অপ্রস্তুত চক্ষে—একটা

বার মাত্র সে কথা প্রকারান্তরে জানাইয়াছিলেন। যখন বুঝিলেন, বাদসাহ, তাঁহার স্নেহময় পিতা—তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে, ধীরে ধীরে জাগরিত, অতি সন্তর্পণে লুকায়িত ক্ষুদ্র বাসনাটীর পরিপোষণে আদৌ সম্মত নহেন, তখন হইতে তিনি আর কাহারও নিকট মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। ঘটনাসৃজিত অসম্ভব প্রেমের পবিত্রস্মৃতি, বহু যত্ন-লব্ধ রত্নের ন্যায়, দরিদ্রের দ্রবিণের ন্যায়, প্রাণের নিভৃত কক্ষে সঞ্চিত করিয়া কবরের শীতল গর্ভে সকল জ্বালা মিটাইয়াছেন। ধরা না দিয়াও তাঁহার মর্ম্মভেদী কবিতাময় দীর্ঘ নিশ্বাসে—প্রাণের জ্বালা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। শিবাজীর মৃত্যু ও শম্ভোজির প্রাণদণ্ডের পর—শিবাজীর পৌত্র, পবিত্র মারঠা বংশের একমাত্র অবশিষ্ট চিহ্ন সাহজীকে বক্ষে ধারণ করিয়া জেব্‌উন্নিসা, প্রাণের তীব্র জ্বালা অনেকাংশে প্রশমিত করিয়াছিলেন।

জেব্‌উন্নিসার কবিতায় চাঁদ নাই—বসন্ত নাই, জ্যোৎস্না নাই, মলয় নাই, কোকিল কূজন নাই,—সাধারণ নায়িকার হা হতোস্মি নাই—ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা ও নলিনী-দল-ব্যজনের ব্যবস্থা নাই--নদী তীরে নিভৃত মিলন নাই—আছে কেবল—দারুণ জ্বালাময় নিরাশ প্রেমগীতি। সেই গীতির ছত্রে ছত্রে নিরাশ প্রেম, কথায় কথায় নীরব আকাঙ্ক্ষা, সুরে সুরে আলেয়া, পাহাড়ী ও ভৈরবীর মিশ্র করুণ সঙ্গীত। তাঁহার কবিতা অসংখ্য। আমরা তাহার দুই চারিটী মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সহৃদয় পাঠক তাহার প্রকৃত রসাস্বাদন করিয়া জেব্‌উন্নিসার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া সুখী হউন।*

(১) "গরুচে মান্ লয়্লি আসাসম্ দিল্ চো মজনু
দার্ হাওয়াস্ত্।
(২) সর্ বসাহরা মি জানম্ লেকিন্ হায়া
জঞ্জির্ পাস্ত্।
(৩) বুল্‌বুল্ আজ্ সাগির্ দিহম্ হুদ্ হম্ নিশিনে
গুল ববাগ্।
(৪) দার্ মহব্বৎ কামিলম্ পর্‌ওয়ানা হাম্
সাগির্দ্দে মাস্ত্।
(৫) দর্‌মেহা খুনেম্ জাহির গার্‌চে
রঙ্গে নাজকাম্।
(৬) রঙ্গে মন্ দরমন্ সেহা চুন্ রঙ্গে সুরখ্
অন্দার হিনাস্ত্।
(৭) দস্‌কে বারে গাম্ বর্ক অন্দাখ্‌তাম্
(৮) জামা নীলি কারদ্ ইনাক্ বিঁকে পুস্তে
উদোতাস্ত্।
(৯) দোখ্‌তারে সাহাম্ ওলেকিম্ রু বসাকর্
আওর্ দাঅম্।
(১০) জেন্ ও জিনৎ বস্ হামিনম্ নামে মান্
জেব্ উন্নিসাস্ত্।"

মূল পারসী কবিতাটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার ব্যাখ্যার জন্য একটু বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কবিতাগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে লায়লি মজ্‌নুর আখ্যায়িকাটী স্মরণ করিবার জন্য পাঠক পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। অনেকেই বোধ হয়—লায়লি মজ্‌নুর কাহিনী শ্রুত আছেন।

মজনুর আসল নাম "কায়েস্"। ইহাদের প্রেম বড় অদ্ভুত। লায়লি আজীবন অবিবাহিতা ছিল—মজনুকে দেখিয়া মজিয়া ছিল, মজনুতে আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া ছিল—কিন্তু মজনুকে পায় নাই। তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবরে শুইয়াছিল। লায়লির পিতা মাতা তাহাকে অন্য পাত্রে বিবাহিতা করিবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু লায়লি বিবাহ করে নাই। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, নিরাশ প্রেম গীতি, আর আকুল দীর্ঘশ্বাস লইয়া সেই সুন্দরী-ললামভূতা জীবনটা কাটাইয়াছিল।

ইহাদের প্রেমটা কিছু অদ্ভুত ধরণের। আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে তাহা রোমাণ্টিক হইয়া দাঁড়ায়। মজ্‌নুর কোন অসুখ হইলে লায়লি দূর দেশে থাকিয়াও জানিতে পারিত—তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সে প্রান্তরে প্রান্তরে আকুল নিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইত—উদ্যানে উদ্যানে উদাস দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। লোকে তাহাদের এই প্রেমকাহিনীর কথা শুনিয়াছিল। এক দিন এক রমনী লায়লিকে বলিল—"লায়লি! তোর মজনু মরিয়াছে" লায়লি হাসিয়া উঠিল—"বলিল তোমার কথা শুনিতে চাহি না—মজনু মরিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, আমার প্রাণ বলিয়া দিত, সে মরিয়াছে।" এতই বিশ্বাস, এতই প্রাণের আকর্ষণ! এতই তাহাদের পবিত্র প্রেম।

ঘটনাক্রমে মজ্‌নু এক দিন—চিরজীবনের মত চক্ষু মুদিল। লায়লির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মজ্‌নু দূর দেশে। আকুলকুন্তলা—উন্মাদিনী হইয়া লায়লি সেই দেশের সন্ধানে ছুটিল। পথে পরিচিত লোক দেখিলে জিজ্ঞাসা করে--"হাঁ—গা আমার মজ্‌নুর সমাধি কি হইয়া গিয়াছে? কোথায়—কোন নগরে তার গোর হইয়াছে তোমরা জান কি?" ইহাদের মধ্যে একজন লায়লির ভালবাসার কথা জানিত—সে বলিল—"লায়লি! তোমার মজনু তো মরে নাই।" স্ত্রীলোকটী লায়লির মন পরীক্ষার জন্যই এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। লায়লি তাহা বিশ্বাস করিল না। বলিল "আমার প্রাণ জানিতে পারিয়াছে মজনু মরিয়াছে—তোমাদের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করিতে চাহি না। তোমরা কতদিন আমা[য়] মিথ্যা করিয়া মজনুর মৃত্যু কথা বলিয়াছ, কিন্তু আমি তাহা বিশ্বা[স] করি নাই। আজ আমার প্রাণ বলিয়া দিতেছে—ওই মুক্ত প্রকৃতি ওই নীলাকাশ, ওই নির্ঝরিণী, ওই পবনস্বনন্ বলিয়া দিতেছে আমা[র] প্রাণের মজনু আর নাই।"

---

* বোম্বের গবর্ণর সারজন মেকিন্টস জেবউন্নিসার, ভগ্ন প্রায় সমাধি দর্শনে—উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ইহা সমাধি নহে—এক পবিত্র হৃদয় দেবীচরিত্রা রমণীর, পবিত্র প্রেমের স্বল্প কথাময় সুন্দর ইতিহাস।" দাক্ষিণাত্যের এই সমাধি ব্যতীত, রাজধানী আগ্রায় জেবউন্নিসার আর একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিল। রাজপুতানা মালওয়া রেলের পথ নির্ম্মাণ সময়ে তাহা নষ্ট হইয়াছে।

উন্মাদিনী লায়লি মজনুর উদ্দেশে—সেই কবরশায়িত চিরনিদ্রিত তুষারশীতল মৃত-দেহের অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরিল। মজনুর সমাধির সন্ধান পাইল না। একবার জন্মের মত শেষ দেখা, শেষ স্পর্শ করার সুখ, তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। সে আরও কাতর হইয়া—ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে অশ্রু, মুখে বিষাদ—নিশ্বাসে ব্যাকুলতা, প্রাণে সন্তাপ লইয়া যেখানে নূতন কবর দেখে তাহাই আঘ্রাণ করিতে লাগিল। শেষ এক স্থানের কবরের নিকট বসিয়া পড়িল। লায়লি এবার ঠিক ধরিয়াছে—যেখানে তাহার প্রাণের প্রাণ মজনু জন্মের মত চক্ষু বুজিয়াছে, সেই কবরের পার্শ্বে বসিয়া উন্মাদিনী বালা—সকল সন্তাপ ভুলিল।

লায়লি মজনুর এই উপাখ্যানের সহিত জেবউন্নিসার কবিতার প্রথম দুইটী চরণের সম্পর্ক আছে বলিয়াই ইহার অবতারণা করা হইল। এখন সমগ্র কবিতাটীর আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

(১) (২) আমার ইচ্ছা হয়, আমি উন্মাদিনী লায়লির মত, হৃদয়শ্বরের জন্য প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রমণ করি! কিন্তু তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি সাহজাদী—বাদসাহ-কন্যা, লজ্জা ও সম্ভ্রম আমার পদদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়াছে। আমার মন লায়লির মত, আমার অবস্থা কিন্তু মজনুর মত। অর্থাৎ লায়লি মজনুকে জীবন সমর্পণ করিলেও—সে যেমন নিষ্ঠুরভাবে লায়লির আকুল প্রেম প্রত্যাখান করিয়াছিল—আমার প্রিয়তমও আমার সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়াছে। আমি মনে মনে সেই হৃদয়োচ্ছ্বাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া জীবন কাটাইতেছি।

(৩) বুলবুল্ গোলাপের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়।* প্রেমের কথা বলে—কত আদর করে, একদণ্ড তাহাকে ছাড়িয়া যায় না। এই বুলবুল আমার নিকট প্রেম শিক্ষা করিয়াছে।

(৪) এই যে আমার সম্মুখে স্ফটীক দীপাধারের মধ্যবর্ত্তী উজ্জ্বল আলোকের স্নিগ্ধজ্যোতিঃতে বিমুগ্ধ হইয়া কত শত পতঙ্গ অনলে আত্মসমর্পণ করিতেছে—এ আত্মত্যাগ তাহারা আমার নিকট শিক্ষা করিয়াছে।

(৫) (৬) মেহেদি পত্রের বহির্ভাগ সবুজবর্ণ। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে, গভীর লোহিতাভ বর্ণের সমাবেশ। মেহেদি পাতার আভ্যন্তরিণ বর্ণ যেমন তাহার সবুজ আবরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে আছে—আমার বাহ্যপ্রকৃতিতে কোনরূপ আকুলতা লক্ষিত না হইলেও আমার অন্তর দগ্ধ হইয়া মেহেদির আভ্যন্তরিণ আবরণের ন্যায় লোহিত হইয়াছে।

(৭) (৮) আমার প্রাণের ভার (বেদনা) অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে ইহার কিয়দংশ আমি আকাশকে দিয়াছি, তাই আকাশ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে ও তাহার ভারে বঙ্কিম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। (বেশী ভার বহন করিলে, ভারবাহীর মুখ যেরূপ নীলবর্ণ ধারণ করে ও ন্যুব্জ দেহ হইয়া পড়ে—এইরূপ ভাবার্থ)।

(৯) (১০) বাদসাহের কন্যা আমি—কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য-দীপ্তি আমার কিছুই ভাল লাগে না। আমি দরিদ্রের মত বিস্মৃতির তিমির গর্ভে থাকি, এই আমার বাসনা। আমার নাম—"জেব উন্নিসা"* অর্থাৎ সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। এই গৌরবই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

(১) হরকস্ দর আমদ্ দরজাঁহা—
আখির্ ব মত্লব্ হা রসিদ্।
(২) পীর্ শুদ্ জেবুন্নিসা উরা
খরিদারে ন শুদ্।

(১) এই পৃথিবীতে যত নরনারী জন্মিয়াছে—সকলেই জীবনের উদ্দেশ্য একটী বা অধিক পরিমাণে সফল করিয়া গিয়াছে।

(২) কিন্তু অভাগিনী জেব উন্নিসা, স্বামী-বিরহিতা হইয়া, এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ জগতকে বিদায়াভিবাদন করিতেছে। (অর্থাৎ, নিরাশ জীবন লইয়া সে জন্মের মত বিদায় চাহিতেছে।)

(১) মোরগে দিল্রাগুল্সানে বেহ্তার জেকুয়ে এয়ার নিস্ত্!
(২) তালোবে দিদার রা জাত্কে শুলু ও গুলজার নিস্ত্।
(৩) হায়্কেরা দর্পায়ে দিল্ জাগ্নির্ আজ্ জুল্ফেতু নিস্ত্।
(৪) গরচে আঁ মানসুর বাসদ্ মাহ্রমে আস্রার নিস্ত্।
(৫) গরচে সার্ তা পায়্ মন্ দারদ্ আস্ত্ আস্মা সিমানা।
(৬) মিস্লে দারুলে হিজর আজ্ দারদে দিগার আজার নিস্ত্।
(৭) শুক্ তাম্ আজ্ এশ্কে বুঁ তা আর দিল চে হাসেল্ কারদাই।
(৮) শুক্ত্ সারা হাসেলে জুজ্ নালাহায়ে হার্ নিস্ত্।
(৯) নে জে সাদি সাদ্ বাসম্ নে জেগম্ আজোরদা আম্
(১০) পেশ্ আহলে দিদা কারকে দার গুল্ ও দারখার নিস্ত্।
(১১) চান্দ্ রোজি খুনে দিল্ মাখ্কি বারায়ে মাহওশা
(১২) রেব তাম্ বারখাক্ গুল্রা শেবায়ে আৎক্কার নিস্ত্।

(১) (২) পক্ষীরা সুন্দর উদ্যানকেই আরামের স্থল বিবেচনা করে। প্রেম পাত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানই মনরূপ পক্ষীর প্রকৃত আনন্দের স্থান। হে ঈশ্বর! আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার চিন্তায় তোমার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পাইলেই সুখিনী হই। যে তোমার নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা

* আমাদের যেমন নলিনী-ভ্রমর, পারসীক কবিতায়—সেইরূপ গোলাপ-বুলবুল্।

* জেব—সুন্দরী, উন্নিসা—বহুতর সুন্দরী রমণী, অর্থাৎ যিনি বহুতর সুন্দরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বা বরণীয়া।

করে—পৃথিবীর অতি সুন্দর প্রেমপাত্র, বা অতি সুবাসিত উদ্যান তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।

(৩) (৪) আমাদের অন্তঃপুরে দেখিয়াছি—সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা কুঞ্চিত অলককে বড়ই সুন্দর বলিয়া জ্ঞান করে। (পারসীর অনুবাদ কুঞ্চিত জুল্‌ফী) এই কুঞ্চিত অলকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া—প্রণয়ীরা আকৃষ্ট হয়—প্রেম-বন্ধনে পড়ে। আমার বিবেচনায় যে তোমার ভালবাসার কুঞ্চিত অলকে (জুলফীতে) আপনার মনকে আবদ্ধ করে নাই—সে মনসুরের মত মহাজ্ঞানী হইলেও আমার চক্ষে পূজনীয় নহে।

(৫) (৬) আমার সমস্ত শরীর দুঃখের তীব্র বেদনায় জর্জ্জরিত। সেজন্য আমি এই রক্তমাংসময় শরীরের সর্ব্বত্রই বিজাতীয় যাতনা অনুভব করি। আমার শরীরের কোন স্থানে কি কষ্ট তাহা আমি নিজে বুঝিতে পারি। কিন্তু সমস্ত শরীর অপেক্ষা আমার মনের ব্যথাই অধিক। আমি শরীরের সর্ব্বস্থান দেখিতে পাই, কিন্তু মনের অধিকৃত স্থান দেখিতে পাই না, অথচ মনের মধ্যে দারুণ বেদনা অনুভব করি। যে দিন হইতে তুমি আমায় এ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ—সেই দিন হইতে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ হইয়াছে। আমার মনের ব্যথা—তোমার বিচ্ছেদ জন্য ইহাই এখন বুঝিতেছি।

(৭) (৮) আমি এক দিন কৌতুকচ্ছলে মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—রে মন! তুই কেন লোককে ভালবাসিস্? মন উত্তর করিল—আমি কাঁদিতে ভালবাসি, তাই ভালবাসি। না কাঁদিলে—ভালবাসিতে পারা যায় না। যাহাকে চির দিন কাছে পাওয়া যায়, তাহার জন্য কান্না আসে না। যাহার জন্য চোখের জল ফেলিতে হয়—তাহাকে পাইলেই অনন্ত সুখ। এই জন্য—অশ্রুই মিলনের সেতু। আমি মনের কথার প্রতিধ্বনি লইয়াই তোমায় জানাইতেছি, আমি তোমায় ভালবাসি কেবল কাঁদিবার জন্য। তোমার জন্য আজীবন কাঁদিতে পাইলে আমি তোমায় পাইব এই আশা আমার মনে জাগিয়া উঠে।

(৯) (১০) লোকের মনে যাহাতে সুখ হয়, আমার তাহাতে সুখ হয় না। লোকের মনে যাহা দুঃখ, আমি তাহা দুঃখ বলিয়া বুঝি না। লোকে ঐশ্বর্য্যকে মহা সুখ, ও তাহার অভাবকে দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করে। আমি অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য মধ্যে থাকিয়াও মহাদুঃখ অনুভব করিতেছি। লোকে সুখ ও দুঃখ স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করে বলিয়া এত কষ্ট পায়। আমি সুখ ও দুঃখকে এক পদার্থ বলিয়া ভাবি। কারণ এই একটী গোলাপ ফুল—তাহাতে কাঁটা আছে, পাপড়ি আছে, সুবাস আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কেশর আছে। সকলগুলির সমষ্টিই গোলাপ। এই বিভিন্ন অংশ পরিপুষ্ট সমগ্র গোলাপ হইতে প্রকৃতপক্ষে তাহার গুটীকতক অংশ বিভাগ করা অসম্ভব। গোলাপ হইতে তাহার সুবাস কণ্টক, পাপড়ি প্রভৃতি একে একে পৃথক করিলে তাহার গোলাপত্ব লোপ হয়। গোলাপের কণ্টকই দুঃখ—সুবাসই সুখ—ইহারা যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধীকৃত, সেইরূপ সুখ হইতে দুঃখকে স্বতন্ত্র করা অসম্ভব।

(১১) (১২) যাহারা আতর তৈয়ারি করে, তাহারা মাটীতে ফুল ফেলিয়া দেয় না—যত্নে সঞ্চয় করিয়া কুড়াইয়া রাখে। রে চক্ষু! তুই এই পৃথিবীর কমনীয় শ্রী সম্পন্ন প্রেম পাত্রের বিরহে অশ্রুত্যাগ করিস কেন? আমার চক্ষু নির্গত অশ্রুরাশি যে সুগন্ধি পুষ্প রাশির সহিত তুলনীয় যার তার জন্য নিঃসারিত হইয়াঅপব্যয়িত হস্ কেন? তুই যদি ঈশ্বর প্রীতিরূপ আতর প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক থাকিস্—তাহা হইলে—এই সুগন্ধি অতি পবিত্র অশ্রুরাশির অপব্যবহার করিস্ না।

(১) আয়্ যাতু কায়েম্ ওজুদে আস্‌লে হার্ মৌজুদ্ মা।
(২) ওয়্ জেতু রওসন্ চেরাগে গাওহারে মক্‌সুদ্‌রা।
(৩) চুঁ থমিয়ে তিনাত্তে মা জারে রাহ্ মাৎ কার্‌দাই।
(৪) হাম্ যানুতকে ৷শ্ গয়র্দা আকেবাৎ মাহ্ মুদ্‌রা।
(৫) খাহ্ আজ্ তওফে হারম্ থাহি বরোঃহযানানে দায়ের
(৬) হর্ কুজা মা বাদ্ কুনি জাঁজাতুই মাবুদ্ মা।
(৭) নালা হায়ে দিল্ সাহার গাহি কে গায়েরে দুদে আহ্
(৮) নিস্ত্ মোস্‌কিন্ সায়্ কালে আইনারে মক্‌সুদ মা।

*   *   *   *   *

(১) হে ঈশ্বর! জগতের যাহা কিছু উৎপত্তি, তো[মা] হইতেই। এই জগত তোমারই মহাশক্তির বলে স্থা[পিত] হইয়া আছে।

(২) মানবের মনে তোমার বাসনা রূপ যে মতি আ[ছে] তাহার উজ্জ্বলতা তোমার জ্যোতি হইতেই সমুদ্ভূত।

(৩) (৪) হে দয়াময়! তুমি বিশাল জগতের [...]

* মনসুর আরব দেশীয়—অতি প্রাচীন যুগের এক সাধু। তিনি ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত হইয়া—"আমিই সেই ঈশ্বর" এইরূপ বলিয়া উঠিতেন। অন্ধ বিশ্বাসী আরবীয়েরা এই জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড করে।

শিল্পী। শিল্পীরা যেমন কর্দ্দমকে স্বল্প বারিসিক্ত করিয়া অবসাদপূর্ণ মূর্ত্তি গঠন করে, তুমিও সেইরূপ তোমার অনুগ্রহ বারি দ্বারা আমায় সৃজন করিয়াছ। হে প্রভো! যতদিন না আমার জীবনান্ত হয়, ততদিন তোমার সেই অনুগ্রহ রসে যেন তোমার সৃজিত এই দেহ সিক্ত থাকে। আমি যেন তোমার কথা বলিতে বলিতে মরিতে পারি।

(৫) (৬) জানি না—হে প্রভু! হে মহাশক্তিমান্! তুমি কোথায়? তুমি, পবিত্র মক্কাসহরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণকারী সংযমী সাধুদিগের মধ্যে, অথবা হিন্দু দেবালয়ে, সংযতচিত্ত, মৌনব্রতধারী সাধুদের উপাস্য স্থানে—যেখানেই থাক না কেন—যে স্থান তোমার পদচিহ্নে সুপবিত্র, তাহা আমার নিকট অতি পবিত্র ও উপাসনার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত।

(৭) আমি প্রাতঃকালে উঠিয়াই যাতনা ব্যঞ্জক—আঃ উঃ—ইত্যাদি শব্দ করি—

(৮) এই দুই কথায় আমার মনের যাতনা প্রকাশ হয়। সমস্ত দিন এইরূপ আক্ষেপোক্তিতে অতিবাহিত করি। কেন করি তাহা আপনি জানেন কি? যাতনা—অন্তরের উষ্মা। তাহা বাহির করিবার সময় লোকে এইরূপ আর্ত্তনাদ সূচক শব্দ করে। কলঙ্কিত দর্পণ গাত্রে—মুখগহ্বর নির্গত উষ্মাক্ষেপ করিলে (অর্থাৎ হাই দিলে) সেই দর্পণ পরিষ্কৃত হয়—তাহার নিষ্কলঙ্ক মার্জ্জিত গাত্রে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়ে। আমার হৃদয় হইতে ক্রমাগতঃ উষ্মা বাহির হইয়া মনরূপ কলঙ্কিত দর্পনকে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করিতেছে। তোমার সেই অনন্ত সুন্দর রূপ—জ্যোতিঃ সেই দর্পণে ধরিয়া প্রাণের জ্বালা নিভাইব—এই জন্য এত কাতর হই।

জেবউন্নিসার রচিত অসংখ্য কবিতার মধ্যে আমি কয়িটী মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।* মাসিক পত্রের স্বল্প স্থানের মধ্যে এ গুলি উদ্ধৃত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ আমি কবিতাগুলির যে অনুবাদ দিয়াছি, তাহা আক্ষরিক বা শাব্দিক অনুবাদ নহে—মর্ম্মানুবাদ মাত্র। পারসী ও আরবী প্রেমকবিতা এত অনুপ্রাস জড়িত, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি মহম্মদীয় শাস্ত্রের এত জটিল উপমা পরিবেষ্টিত যে, তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা বিশদরূপে করিতে গেলে—পাঠকের সহিষ্ণুতার উপর অন্যায় আক্রমণ করা হইবে। যাহারা মনে করিবেন—আমি বিদ্যা প্রকাশের জন্য মূল পারসী বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন—যেন তাঁহারা আমায় এরূপ অপরাধী বলিয়া বিবেচনা না করেন। আজকালকার বাজারে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে গেলে—রাশি রাশি ইংরাজী ফুট নোট না দিলে তাহার বিশেষত্ব হয় না; কিন্তু আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপকরণ ইংরাজী ভাষার কোন ইতিহাস পুস্তক হইতেই সংকলিত নহে—কাযেই ক্ষেত্রানুসারী ব্যবস্থায় আমার মূল পারসী কবিতাগুলি পাঠকের বিশ্বাসের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, যাঁহারা পারসী জানেন—তাঁহারা এ গুলির গূঢ়ার্থ করিয়া ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন—ইহাই আমার ইচ্ছা।

কবিতা যদি কবি-হৃদয়ের প্রকৃত ভাবের ছায়া হয়, তাহার মনের কথার প্রতিধ্বনি হয়—তাহা হইলে সহৃদয় বিবেচক পাঠক এই কবিতাগুলি হইতেই জেব্‌উন্নিসা বেগমের প্রকৃত চরিত্র অনুভব করিতে পারিবেন। জেব্‌উন্নিসা যদি প্রকৃত কলঙ্কিনী হইতেন—তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় এতদূর ঈশ্বর-প্রেম পূর্ণ হইত না—এত বিরাগপূর্ণ হইত না—এত উদার ভাবময় হইত না। তাঁহার প্রেমগীতিতে যেমন গভীর নিরাশা, তাঁহার পরমার্থ গীতিতেও সেইরূপ গভীর নিরাশা। সেই নিরাশার মূলে, উভয় স্থলেই, এক পবিত্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা। সে প্রেম মানুষের উপর হউক বা ঈশ্বরের উপর হউক, যে দিক্ দিয়া দেখা যায়—তাহা পবিত্র একাগ্রতাপূর্ণ, আবেগময়ী ও উচ্ছ্বাসময়ী। সুগন্ধি গোলাপ হইতে যেমন পুতিগন্ধ বাহির হয় না, দামিনীর উজ্জ্বল জ্যোতিতে যেমন কলঙ্কের চিহ্ন থাকে না—মেঘবারিতে যেমন পঙ্কিলতা ঘটে না—সেইরূপ পবিত্রও কখনও অপবিত্র হয় না। যে জেবউন্নিসার হৃদয় এত পবিত্র, তিনি কখনই কলঙ্কিনী—অভিসারিকা নহেন। সমগ্র হিন্দুস্থানের প্রতাপান্বিত বাদসা আলমগীরের কন্যার যতটুকু আত্ম সম্ভ্রম থাকা উচিত—তাহা তাঁহাতে ছিল। তিনি

* আমার প্রিয় সুহৃৎ মৌলবী সাহেব—আমায় বাদশটী কবিতা বৃত্তি করিতে শিখাইয়াছিলেন। যেরূপ ভাবে কবিতাগুলি বাঙ্গালা করে গ্রথিত করিয়াছি—তাহা মূল পারসীর প্রকৃত উচ্চারণ হিসাবে দেখিলে নিতান্ত আপত্তিজনক। স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ বা হসন্তাদি ভেদ দেখাবার কোন উপায় বাঙ্গালা বর্ণমালায় নাই, কাজেই যতদূর পারি প্রকৃত উচ্চারণ বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

প্রকৃত পাপ পথ বিচারিণী হইলে পদোচিত গৌরব রক্ষার্থে, আত্ম সম্ভ্রম রক্ষার্থে—এমন ভাবে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন যে, বৈদেশিক আশ্রয়-ভিখারি আনুগত্য লাভাকাঙ্ক্ষী, ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা তাহার সন্ধান পাইত না। আমরা মেনুসীর মধ্যে জেবউন্নিসার বিরুদ্ধে কোন কথা পাই নাই—মেনুসীর যে কয়েকটী সংস্করণ হইয়াছিল—যদি কোন সংস্করণে এরূপ বিরুদ্ধ কথা থাকে তাহা আমার পূজ্যপাদ—সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রই জানেন। মেনুসী যে ঔরঙ্গজেবের কোপকটাক্ষে পড়িয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন এটা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি যদি দুই একটা বিরুদ্ধ কথা কোথাও বলিয়া থাকেন তাহাই প্রামাণ্য, আর জেবউন্নিসার পবিত্র জীবন—তাহার তুলনায় কিছুই নয়—ইতিহাসের খাতিরে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

ঔরঙ্গজেবের সহস্র দোষ থাকিলেও, তিনি যে স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন—ঈশ্বরে অতি বিশ্বাসী ছিলেন—তাহার আর সন্দেহ নাই। এই অতিরিক্ত ঈশ্বরানুরক্তি তাঁহাকে স্বধর্ম্মের গোঁড়া করিয়া তুলিয়াছিল।* এই গোঁড়ামির জন্য তিনি হিন্দু সমাজের চক্ষে অত্যাচারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। তিনি পিতাকে অবরুদ্ধ করেন—ভ্রাতাদের শমন সদনে প্রেরণ করেন—অযথা উপায়ে সিংহাসনাধিরোহণ করেন, এটা ইংরাজের লিখিত ইতিহাসের কথা। মুসলমানের লিখিত ইতিহাস হইতে এমন কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, যাহাতে এই পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিনাশ প্রভৃতির সমর্থন করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে প্রদীপেই তাহার আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

ঔরঙ্গজেব কন্যাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। কন্যার বুদ্ধিমত্তার জন্য নহে—পিতৃবৎসলতার জন্য নহে—তাহার ধর্ম্মানুরাগের জন্য। পিতা পুত্রীতে বসিয়া অনেক সময়ে প্রার্থনা করিতেন—শাস্ত্রালোচনা করিতেন—ঈশ্বরের গুণগান করিতেন।* কন্যার মৃত্যুর জন্য ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হন। ইহা যদি সম্ভব হইত যে, তাঁহার প্রধান শত্রু শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করিয়া জেবউন্নিসার হস্ত প্রার্থনা করিতেন—তাহা হইলেও তিনি সাহজাদীকে পাইতেন না। জেবউন্নিসাও যদি শিবাজীর গুণে মুগ্ধ না হইয়া—অন্য কোন রাজপুত রাজের বা রাজকুমারের হস্ত প্রার্থনা করিতেন—ঔরঙ্গজেব তাহাতে বোধ হয় অসম্মত হইতেন না। পরাক্রান্ত শিবাজী ঔরঙ্গজেবের প্রধান শত্রু—যাহার উচ্ছেদসঙ্কল্পে তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন—তাহার হস্তে কন্যা দান—ঔরঙ্গজেবের ন্যায় দাম্ভিক বাদসাহের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই জেবউন্নিসা আজীবন নিরাশভাবে জীবন কাটাইয়াছেন—ও তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে প্রতিধ্বনিত এই অভিনব প্রেমগীতি তাঁহার প্রাণের মধ্যে গুপ্তভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার সহিত সমাধিস্থ হইয়াছে।

বেগমপুরে মহা সমারোহে—ঔরঙ্গজেব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যাকে সমাধিস্থ করেন। আগ্রাতে ইহার অনুরূপ আর একটা সমাধি ছিল। রাজপুতানা-মালব-রেলপথ প্রস্তুতের সময়—রেল কোম্পানী তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া আগরা হইতে জেবউন্নিসার স্মৃতি লোপ করিয়াছেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

---

* ঔরঙ্গজেব এতদূর সংযতচিত্ত হইয়া একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতেন যে, সে সময়ে তাঁহার বাহ্য প্রকৃতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক লোপ হইত। এক দিবস—দেওয়ান খাসের নিভৃত মহলে—সান্ধ্য আজান শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকালব্যাপী প্রার্থনায় তাঁহার চিত্ত ঈশ্বর প্রেমে এতদূর মগ্ন হয় যে, তাঁহার পাদমূলে এক বিষধর বৃশ্চিক দংশন করিলেও, তাহার যন্ত্রণা তখন অনুভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রার্থনাশেষে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন।

দেবাবির্ভাব

রজনীতে

দুরন্ত আহবে ইংরাজ বুয়র মেতেছে ভৈরব বেশে,
নর-রক্ত-নদী বহিছে গর্জ্জিয়া ট্রান্সভাল অরেঞ্জ দেশে।
গর্জ্জিছে কামান ভৈরব আরাবে, ধূমে অন্ধকার দিশি;
অযুত উলঙ্গ কৃপাণ খেলিছে বিদ্যুৎ প্রভায় মিশি।
ভীম আগ্নেয়াস্ত্র শক্তিশেল শত বজ্র বেগ জিনি ছুটে,
সহস্র সতীর সংসার-সৌভাগ্য পলকে যেতেছে টুটে।
আরক্ত-নয়ন উন্মত্ত অধীর দুরন্ত কৃতান্ত নাচে,
নৃমুণ্ড খর্পরে পিশাচ পিশাচী নর রক্ত সুরা যাচে।
ন্যায়, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, দয়া, মায়া, ক্ষমা সেথায় নাহিক কেউ,
শোণিত-তরঙ্গ শোণিত-পিপাসা শোণিতের মহা ঢেউ।
শার্দ্দুল জিনিয়া হিংস্রক মানব, মানব গিয়াছে ঘুচি,
নররক্তে হায় নরের পিপাসা, নরমাংসে হেন রুচি।
লাজে ভয়ে ত্রাসে সহস্র কিরণ পশ্চিমে ঢাকিল মুখ,
ঢাকিতে এ পাপ তমোরাশি আসি ছাইল ধরার বুক।
আজিকার তরে ইংরাজ বুয়র ক্ষান্ত করি রণখেলা,
কলঙ্কিত কর, শোণিতাক্ত দেহ, যে যার শিবিরে গেলা।

অৰ্দ্ধ নিশাভাগে সুপ্ত সৈন্য মাঝে একি হলো আচম্বিত,
সহসা বহিল অপূর্ব্ব সৌরভ, সুগন্ধে পূরিল চিত।
অমনি খুলিল স্বরগের দ্বার, জ্যোতিতে পূরিল দেশ—
শত সূর্য্যতেজে ভাসিল গগন, নাহি অন্ধকার লেশ।
সে জ্যোতির মাঝে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে দাঁড়াল পুরুষ এক,
স্কন্ধে ক্রুশ তার, মস্তকে মুকুট, হস্ত পদে বিদ্ধ প্রেক।

(আমি) তোদেরই তরে নিদারুণ ক্রুশে করেছি দেহপাত,
তোদেরই তরে ধরেছিনু বুকে দারুণ শেলের ঘাত।
তোদেরই তরে অশেষ লাঞ্ছনা সহিছিনু আমি ধীরে,
তোদেরই তরে কাঁটার মুকুট পরেছিনু আমি শিরে।
তোদেরই তরে মরতে নামিয়া পাইনু যতেক ক্লেশ,
তোদেরই তরে দেহ বিকাইয়া এই কি ফলিল শেষ?

সুষুপ্তির মাঝে ইংরাজ যুবক চাহিল সে মূর্ত্তি পানে,
মরণ হইতে বাহিনা যেমতো বাধিত কাতর প্রাণে।

এক হস্তে কেহ করিলে আঘাত অন্য হস্ত দিবে ফিরে,
ধরমের এই সার ধর্মকথা তোদের বলিনি কি রে?

মানব ভ্রাতারে করিলে আঘাত সে আঘাত আমি পাই,
আমার প্রাণের নিগূঢ় এ কথা তোদের কি বলি নাই?
আমার ক্রুশের যাতনার কথা তোরাই গাহিস্ মুখে,
শত ক্রুশ-সম সঙ্গীনের ঘায় বিঁধিস্ আমার বুকে।
হায় রে আমি কি শস্যবীজরাশি পাষাণে ছড়ায়েছিনু,
হায় রে আমি কি মুকুতার মালা শূকরের গলে দিনু।
মাটির বদলে মাণিক বেচিলি, সুধা বেচে নিলি বিষে,
জীবন বেচিয়া মরণ কিনিলি, হৃদয় জুড়াবি কিসে?
এখনও আমি ক্রুশ-কাষ্ঠ-ভার বহিছি তোদের তরে,
এখনও আমি প্রসারিয়া বাহু দাঁড়ায়ে গগন 'পরে।
ছাড়ি' পাপকার্য্য অনুতাপ-জলে ধুয়ে ফেল পাপরাশি,
স্বরগের কূল মরত ভাজিয়া—স্বরগে আয়রে হাসি।
থামিল দেবতা, প্রতিধ্বনি তার ছাইল আকাশময়,
দিগঙ্গনাগণ গাইল উল্লাসে জয় যিশু জয় জয়।
সমস্ত রজনী ইংরাজ বুয়র দেখিল সে মূর্ত্তিখানি,
সমস্ত রজনী সুষুপ্তির মাঝে শুনিল সে দৈববাণী।

প্রভাতে

ইংরাজ বুয়র রক্তে রঞ্জিত যেন কলেবর,
প্রভাতে লোহিত-রাগে সমুদিত দিবাকর।
দারুণ পাপের চিত্র দেখাতে নরক-খেলা,
ধীরে ধীরে অন্ধকার আপনি সরিয়া গেলা।
প্রকাশিল রণক্ষেত্রে, কি ভীষণ চিত্র হায়,
কার না শিহরে প্রাণ, হৃদি ফাটে মমতায়।
কত যতনের নিধি, কত বুক-চেরা ধন,
ধূলায় লুণ্ঠিত হায় চির নিদ্রা-নিমগন।
বাজিলে স্বর্গের ভেরী মহা বিচারের দিন,
জাগিবে খ্রীষ্টান তনু যতেক সমাধি লীন।
আহা সে খ্রীষ্টান দেহ স্বর্গের অমূল্য নিধি,
কাক শৃগালের তরে হায় সৃজিলা কি বিধি?
নিহতের পূতিগন্ধ, আহতের আর্ত্তনাদ,
বিয়োগীর দীর্ঘশ্বাস, রোগীর সে অবসাদ,
দিবসের প্রস্থান, বিপক্ষের ভীমারাব,
রজনীর জ্যোতির্ম্ময় দেবতার আবির্ভাব,
ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত নানা ভাবে হ'ল ভোর,
ইংরাজ বুয়র সৈন্য ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।
স্বর্গের সে কথাগুলি এখনও বাজিছে কাণে,
ক্রুশের যাতনা-ভার এখনো জাগিছে প্রাণে।
অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ লয়ে যেমনি ভাঙিল ঘুম,
অমনি কামানরাশি গর্জ্জিল গুড়ুম গুম্।
সহসা উত্তপ্ত রক্তে ধমনী হইল স্ফীত,
উন্মত্ত দানবদল বিস্মরিল হিতাহিত।
বাজিল সংহার-ভেরী—কৃতান্তের নিমন্ত্রণ,
সাজিল সংগ্রাম সাজে ইংরাজ বুয়রগণ।
বিদারি আকাশতল আবার আলোক-রেখা,
আবার আলোক-মাঝে দেবতা দিলেন দেখা।
হাসি মেঘ-মন্দ্র কামান-গর্জ্জন ছাপি রণবাদ্য উঠিল ধ্বনি,
'আজি হ'তে আমি ত্যেজিনু তোদের—
তোদের প্রতিভূ তোরা আপনি।"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

সেকালের ছাত্র।

এ কালের এক দল ছেলে আমাদের সে কালের ছাত্র জীবনটাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, আমি সে কালের মনুষ্য; আমার কাছে সে কালের ছাত্র জীবন এ কালের ছাত্র জীবন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সজীব বলিয়া বোধ হইত; সে কালের পল্লীবাসী ছাত্রগণের মধ্যে জীবনের লক্ষণটা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণেই বর্ত্তমান ছিল।

সে কাল বলিতে আমি এক শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা; কিন্তু এই চল্লিশ বৎসরই কি কম দিন? দিন যতই হউক, পরিবর্ত্তনটা বড়ই অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়; মনে হয়—এ যেন আর এক দেশ, আর এক সমাজ, আর এক রকমের জীবন যাত্রা; কলেজের কলে ফেলিয়া, ইংরাজী কেতার ছাঁচে ঢালিয়া ছেলেগুলিকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রস্তুত করা হইতেছে; লক্ষণ খুব ভাল, কিন্তু এত ভাল মানুষের মধ্যে দুই চারিটা দুরন্ত, অশান্ত শিষ্টাচারের গণ্ডির প্রতি লক্ষ্যহীন ছেলে না থাকিলে—সেটা সে কেলে লোকের চক্ষে নিতান্ত খাপছাড়া দেখায়, চসমার ভিতর দিয়া বোধ হয়, এ কালের অগণ্য ছাত্রবৃন্দ একটা রুটিনের জীবন্ত সংস্করণ মাত্র; অতিরিক্ত পরিমাণে 'জেণ্টলম্যান।'

সেই চল্লিশ বৎসর আগে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সে কালে, কলিকাতা প্রভৃতি সহরের অবস্থা কিরূপ ছিল বলিতে পারি না, বোধ করি খুব ভালই ছিল, কিন্তু তখন আমাদের পল্লীগ্রামের পাড়ায় পাড়ায় এম, এ, এবং ঘরে ঘরে বি, এ, অবতীর্ণ হইয়া পল্লীগৃহ ধন্য করেন নাই। তখন দুই চারিজন মাত্র বি, এ, পাশ করিয়া পল্লীবাসিগণের নিকট দেবতার শ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাইয়াছিলেন।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে তখন সবে মাত্র আমাদের পল্লীগ্রামে ইংরাজী শিক্ষার সুকোমল উত্তাপ প্রবেশ করিতেছে, সে উত্তাপ পাঠশালা ও বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষাশৈত্যের মধ্যে যতই প্রীতিকর হউক, আমাদের থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের মেঘমন্দ্র হুঙ্কার ও রুক্ষ্মতেই আমাদের নিকট সমভাবে বর্ষাকালের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিত, এবং যখন তাঁহার করচ্যুত অপ্রতিহত অশনি কাহারও পৃষ্ঠে পড়িত, তখন সে বেচারীকে যে ঝাঁকুনি সহ্য করিতে হইত তাহা এ কালের বৈদ্যুতিক ঝাঁকুনি অপেক্ষা লঘুপাক নহে।

এই মাষ্টারটির নাম বেণী চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রত্যহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অহিফেন সেবন করিতেন, কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি কাঁচাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, পাকার প্রতিও তাঁহার আসক্তি ছিল; বলিতে পারি না. কারণ কোন দিন "তোড়জোড় মেজ দণ্ড" সমেত তাঁহাকে হাতে কলমে ধরিতে পারি নাই, তবে তাঁহার 'কাঁচার' কল্যাণে সময়ে সময়ে আমাদিগকে যে রকম ভুগিতে হইত তাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই; এখনও যদি কেহ বলে যমের মধ্যে যমের একটা চেহারা কল্পনা কর; কেন বলিতে পারি না, তৎক্ষণাৎ বেণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মূর্ত্তি চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে। আমাদের মনোরাজ্য হইতে যমকে নির্ব্বাসিত করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেখানে এমনই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন।

থার্ড মাষ্টার মহাশয় আমাদের ভূগোল মুখস্থ লইতেন। তাঁহার ঘূর্ণমান চক্ষু দেখিলে কোন ছেলের মুখ দিয়া কথা সরিত না। অতি ভাল ছেলেরও না। বিপিন আমাদের ক্লাশের মধ্যে খুব ভাল ছেলে ছিল, এখন সে মুন্সেফ; বিপিন একদিন বেঞ্চের ধারে দাঁড়াইয়া উত্তর আমেরিকার হ্রদ গুলার নাম মুখস্থ বলিতেছে, বিপিনের স্মরণ শক্তি বরাবরই বেশ প্রখর; সে সমস্ত গুলি হ্রদের নাম তাহাদের চতুঃসীমার ফিরিস্ত দিয়া ঠিক বলিয়াছে, দুই কি একটি বাকি আছে, এমন সময়ে, দেখা গেল, থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু দুটি সন্ধ্যার কমলদলের ন্যায় ক্রমে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, এবং তিনি

ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকটি নিজের অজ্ঞাতসারে সম্মুখদিকে নত করিতেছেন। সহসা তিনি তন্দ্রাত্যাগ করিয়া মাথা তুলিলেন এবং চক্ষু দুটি বিকশিত করিয়া বলিলেন, "কি বল্লি ? ফের বল"।—আর ফের বল! মাথার মধ্যে সমস্ত ক্রুদ্ধ গোলমাল হইয়া বন্ধুদ্বয়ের চক্ষুর সম্মুখে মাষ্টার মহাশয়ের আতঙ্কজনক প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। বিপিন বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, মাষ্টার মহাশয় কণ্ঠস্বর চতুর্গুণ ভীষণ করিয়া হাঁকিলেন "বেতখানা কৈ রে।"

বেতখানা তখন চতুর্থ শ্রেণীতে কোন প্রথিত নামা বালকের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল ; সুতরাং আমাদের মাষ্টার মশাইকে মিনিট দুই বিলম্ব করিতে হইল। সেই দুই মিনিট কাল মাষ্টার মহাশয় তাঁহার বিকট মূর্ত্তিতে যে রৌদ্র রসের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা যে না দেখিয়াছে সে কিছুতেই কল্পনা করিতে পারিবে না, এবং যে দেখিয়াছে সে কখন ভুলিতে পারিবে না ; কিন্তু আমরা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক বেত আসিল। বিপিনের হাতে পিঠে মাথায় সর্ব্বাঙ্গে শপাশপ বেত্র বর্ষণ হইতে লাগিল, একে ত এই প্রকার বর্ষণ তাহার উপর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় হুঙ্কার। আমাদের অদৃষ্টাকাশের কোন দিকেও একটু পরিষ্কার দেখা যাইত না।

বেণী মাষ্টারের প্রহারের একটি অসাধারণ গুণ ছিল, তাহাতে দেহ-চর্ম্ম ত ক্রমে স্থূল হইতই, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সঙ্কোচ ভয়ও অন্তর্হিত হইত। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ছিল, আমাদের অন্যতম সহাধ্যায়ী কৈলাশ। কৈলাশ আমাদের সঙ্গেই পড়িত, বয়সে সে আমাদের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বড় ছিল, নামের সহিত দেহের কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই কেহ কেহ তাহাকে কৈলাশ পর্ব্বত বলিয়া ডাকিত ; কৈলাশ আমাদের পল্লীগ্রামের 'এন্ সাইক্লো পিডিয় ব্রিটানিকা' ছিল, কেবল লেখা পড়াটা বাদ। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহার পিণ্ড রক্ষার আয়োজন মহা-সমারোহ সম্পন্ন হইয়াছিল, সে ক্লাশের মধ্যে বসিয়া তাহার বাসর ঘরের রসালাপের মনোহর কাহিনী বর্ণনা করিত, আর আমরা দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক প্রেম-স্বর্গের সুধাস্বাদন বঞ্চিত হতভাগ্য মানবক সেই মর্ত্ত্য নন্দনে অনন্ত সুখের অশ্রান্ত কল্পনায় আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতাম। কৈলাশ লাঠৌষধি সেবনেই যে কেবল আমাদের ক্লাশে অগ্রগণ্য ছিল তাহা নহে, লাড়ু গোপাল হইবার যোগ্যতাও সে ক্লাশের মধ্যে সকল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছিল। এবং তাহাকে লাড়ু গোপাল করিবার জন্য 'স্পেসাল' বন্দোবস্ত ছিল, অর্থাৎ হাটু গাড়িয়া বসাইবার পূর্ব্বে তাহার হাঁটুর নীচে ইটের কুচি ও প্রসারিত উভয় হস্তে আধ ডজন শ্লেট রক্ষিত হইত, অবস্থাটি যে বিশেষ আরাম জনক নহে তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা সত্ত্বেও কৈলাশের চক্ষে নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব হইত, কেবল আবির্ভাব নহে, সেই সর্ব্ব সন্তাপহারিনী দেবীর করুণায় বিহ্বল হইয়া কৈলাশ সর্ব্ব সমক্ষে ধরণী-তলে নিপতিত হইত, এবং বেণী মাষ্টারের বেত্রের অবিরল স্পর্শ কিছু-কালের জন্য তাহার উপর 'ষ্টিমুলান্টের' কাজ করিত।

পূর্ব্বে চতুর্থ শ্রেণীর যে ছাত্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম মদনমোহন, পিতা মাতা বিশেষ আদর করিয়াই তাহার প্রতি এই নামটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই নাম তাহার দেহের সঙ্গে কোন রূপে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে নাই। তাহার দেহ দীর্ঘ, উদর স্থূল, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ গুচ্ছ কদম্ব কেশরের ন্যায় উর্দ্ধ মুখ। মদনমোহনের দন্ত অতি বৃহৎ কি ওষ্ঠাধর অতি ক্ষুদ্র ছিল তাহা বলা কঠিন, তবে দেখা যাইত তাহার দন্তগুলি স্বমহিমা প্রকাশে কখন উদাসীন ছিল না। এবং ওষ্ঠ হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া তাহার হস্তস্থিত শ্লেট ও পুস্তক পবিত্র করিত। লেখা পড়ার প্রতি মদনমোহনের অসাধারণ অনুরাগ ছিল, এজন্য পুস্তক খুলিলেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত, এবং শ্লেটে অঙ্ক কসিতে গেলেই অংশগুলি ঘোটক কিম্বা হস্তী চিত্রে রূপান্তরিত হইত ; এজন্য অনেক বার তাহার পৃষ্ঠে বেত্রধারা বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সেই ধারাপাতে মদন-মোহন চিরদিনই অবিচল ছিল, সহস্র বেত্রাঘাতেও কেহ তাহার চক্ষে বিন্দুমাত্র জল দেখিতে পাইত না, তৎপরিবর্ত্তে তাহার ওষ্ঠ লালার সঞ্চার হইত ; বিধাতার এমনই বিচিত্র বিধান।

এক দিন বেণী মাষ্টার চতুর্থ শ্রেণীতে অঙ্ক কসাইতেছেন, ছেলেরা অঙ্ক কসিয়া শ্লেট বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, মাষ্টার মহাশয় একে একে সকলের শ্লেট পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, ক্রমে তিনি মদন মোহনের শ্লেটের কাছে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মদন, অঙ্ক হয়েছে ত ?—"আজ্ঞে।" বলিয়া মদন শ্লেটখান বুকের মধ্যে ভাল করিয়া লুকাইল। মাষ্টার মহাশয় জোর করিয়া শ্লেটখান ছাড়াইয়া লইয়া অঙ্ক দেখিতে গেলেন, যে অঙ্ক দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির। তিনি দেখিলেন শ্লেটে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে :—

হেড্ মাষ্টার মদে কামড়
তার নীচেতে নবনে বানর ;
নবনে বানর বেড়ায় গাছে
বেণী বাঘ তার নীচে আছে।
বেণী বাঘের দাঁত খিটমিটি
ফোর্থ মাষ্টার বামা টিক্‌টিকি,
গুপে পণ্ডিত নষ্টের গোড়া
বিদ্যা বুদ্ধি কচু পোড়া।"

গ্রামের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মদনমোহনের কবিত্ব শক্তির খ্যাতি ছিল। গুণ বর্ণনাও যে অতি চমৎকার হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বেণী মাষ্টার এমন মনোহর কবিতাটি কিছুমাত্র "এপ্রিসিয়েট" করিতে না পারিয়া কবিতা সমেত মদনমোহনকে হেড্ মাষ্টারের সম্মুখে হাজির করিলেন। হেড্ মাষ্টার স্বয়ং কেবল ফরিয়াদী নহেন, বিচারকও। সুতরাং তাঁহার বিচারে মদনমোহনের প্রতি পিনালকোড দুর্লভ দণ্ডের আদেশ হইল। প্রথমে একবার তাহার হাত পা বাঁধিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিছুতিলতার দ্বারা ঝাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহার পর হেড্ মাষ্টার বলিলেন, সাতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে স্কুলের বারান্দায় রৌদ্রে দুই ঘণ্টা ধরিয়া লাড়ু গোপাল হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, দুই হাতে লাড়ুর পরিবর্ত্তে এগার ইঞ্চি লম্বা থান ইট ধারণ করিতে হইবে।—মদনমোহন সকল শাস্তি নির্জ্জল-চক্ষে গ্রহণ করিল।

তিন দিনের দিন মদনমোহনের মাথায় চট্ করিয়া একটা ফন্দি আসিয়া হাজির হইল। স্কুলের চাকর ত্রৈলোক্য বেলা চারিটার সময় ইস্কুলঘর বন্ধ করিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মদনমোহন ইস্কুল ঘরের বারান্দায় আসিয়া একটা লম্বা পেরেকের সাহায্যে একটা দরজা খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর প্রথমে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রাচীর বিলম্বিত পৃথিবীর মানচিত্রের পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়া যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিল। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে বেঞ্চির উপর টুল চাপাইয়া ব্র্যাকেট হইতে ঘড়িটা পাড়িল, এবং তাহা ইস্কুলঘরের পাশে একটা চিতার ঝোপের মধ্যে তাহার ঢাকনী খুলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গেল। কেন বলা যায় না, সেই অরণ্যে বসিয়া থাকিতে অসম্মত হইয়া ঘড়িটা তীব্রস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, ক্রমাগত শব্দ হইতেছে ঠং ঠং ঠং। ইস্কুলের সেক্রেটারী জমিদার ভুবনবাবু ইস্কুলের নিকটস্থ সদর রাস্তা দিয়া সেই সময়ে সান্ধ্যবায়ু সেবনে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে দণ্ডধারী অনুচর রামকল পাঁড়ে। জঙ্গলের মধ্যে ঘড়ির ঠনঠনি শুনিয়া ভুবনবাবু রাম-কলকে ব্যাপারটা কি দেখিয়া আসিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, রামকল ডাল রুটি খায়, প্রকাণ্ড জোয়ান, কিন্তু তাহার ভোজন দক্ষতার অনুরোধে ভগবান্ তাহাকে নির্ভীক প্রকৃতি প্রদান করেন নাই। তাহার আহার ও সাহস এই দুইটি

জিনিষের মধ্যে 'ইমজায়ন্ রেসিও' বর্ত্তমান ছিল। রামকল ইহা একটা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিল, সুতরাং অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। অবশেষে কর্ত্তাবাবুর যৎপরোনাস্তি উৎসাহবাক্যে ভরসা পাইয়া সে জঙ্গলের সন্নিকটবর্ত্তী হইল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভীতি বিহ্বল-চিত্তে সেখানে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য ঘটিকা যন্ত্রের উপর তাহার পাঁচ হাত লম্বা তৈলপক্ক দরোয়ানি বংশদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত করিল। ঘড়ির কাঠাবরণ সেই আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, তাহার আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল। তখন রামকল সেই অর্দ্ধ-চূর্ণ ঘটিকা-যন্ত্র কুড়াইয়া আনিয়া 'কর্ত্তাবাবু'র সম্মুখে স্থাপন করিল, দেখিয়া তিনি নির্ব্বাপিত অগ্নিরাশির ন্যায় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রত্যূষে ইস্কুলঘরে মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইল। সেক্রেটারি রাগ করিয়া হেড্ মাষ্টারের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, ইস্কুলের চাকর বলিল আমি রীতিমত দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছি, ঘরে চোর আসিলে আমি কি করিব? মদনমোহনের প্রকৃতি গ্রামে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কিছু জানিনে মশাই।" মদনমোহন কিছুতেই একরার করিল না, হেড্ মাষ্টার থার্ড মাষ্টারকে বলিলেন, 'যেমন করিয়া পার রাস্কেলকে কনফেস্ করাও।' একরার করাইতে বেণী মাষ্টারের পুলিসের দারোগার মত বিশেষ দক্ষতা ছিল।

মদনমোহনের উপর বেণী মাষ্টারের বড় রাগ ছিল, আজ তিনি সেই রাগটা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করিবার অবসর পাইলেন। বেণী মাষ্টারের বিশ্বাস ছিল সুধা উৎপন্ন করিবার জন্য সত্যযুগে দেবগণ যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানসুধা উৎপন্ন করিবার জন্য কলিযুগে মাষ্টার মহাশয়দিগেরও ছাত্রকুলের দেহ মন্থন করা আবশ্যক, সুতরাং তিনি মন্দর পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে কখন বাঁশের বাখারি, কখন বা আধ শুক্নো বেতের গোড়া মন্থন দণ্ডরূপে ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাহাতে অমৃত উৎপন্ন না হইয়া কেবল হলাহলের উৎপত্তি হইত; মন্থনের ফলে এবারও হলাহল উৎপন্ন হইল এবং নীলকণ্ঠ না হইলেও তাহা তাঁহার ভাগে পড়িল। কথাটা আগাগোড়া বলিতে হইতেছে।

বেণী মাষ্টার হেড্ মাষ্টারের কথায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া জলের ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক তামাকে দম্ দিলেন, তাহার পর ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ক্লাশে আসিয়া বলিলেন, "মদনমোহন, নীল ডাউন অন্ দি বেঞ্চ।"

তখন অঙ্কের ঘণ্টা, মদনমোহন শ্লেটখানি হাতে লইয়া বলিল, "নীল ডাউন হব কেন, মাষ্টার মশাই?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমার হুকুম।"

মদনমোহন বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে, তাহার উপর, বিধবা পিসিমার নয়ন-মণি; অকারণে নীলডাউন হওয়া সে অনাবশ্যক জ্ঞান করিল, বলিল, "শুধু শুধুই হুকুম দেবেন, আমি আপনার করেছি কি?"

"আবার আমার সঙ্গে মুখো মো, ইষ্টুপিড, ফুল, রকহেড্, নীল ডাউন অন দি বেঞ্চ, আই সে (I say)"—হুঙ্কারে মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহনের পৃষ্ঠে বজ্রাঘাত হইল, বজ্রটা অবশ্য বেত্ররূপেই নিপতিত হইয়াছিল। বিদ্যুতেরও অভাব ছিল না, বেণী মাষ্টারের 'দন্তরুচি কৌমুদী'র খ্যাতি ছিল।

মদনমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বেঞ্চির উপর লাড়ুগোপাল হইল, সে জানিত বেণী মাষ্টারের হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল করিয়া কোন ফল নাই, আরজি পেশমাত্র তাহা ডিস্মিশ হইবে। বেণী মাষ্টারও ইজিষ্ট সাহেব বাঙ্গালার মসনদে বসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই 'No conviction, no promotion' নামক থিয়োরীতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন—যদিও চাকরী ত্যাগ-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রমোশনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। হেডমাষ্টারের সহযোগীতা করিয়া তিনি এক বিষয়ে প্রমোশন পাইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না, সে প্রমোশন থার্ড মাষ্টারী হইতে সেকেণ্ড মাষ্টারীতে নহে, আফিং হইতে মদে। বৃদ্ধ বয়সে বেণী মাষ্টার সুরাপানের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সকল অবান্তর কথা, এখন আসল কথা বলা যাউক।

ক্লাসের সকল ছাত্রই অঙ্ক কষিবার জন্য হাতে স্লেট লইয়াছিল, বেণী মাষ্টার চেয়ারে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, ইলেভন সিলিংস, সেভেন পেন্স, থ্রি ফারদিংস যদি এক হণ্ড্রেড ওয়েট—পাশ হইতে একটি ছেলে মদনমোহনের শ্লেটখানি খপ করিয়া টানিয়া লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল—শ্লেট দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় মুখখানি হণ্ড্রেড্ ওয়েট অপেক্ষা অনেক অধিক ভারি করিয়া সেই শ্লেটের কাঠ দ্বারা লাড়ুগোপাল অবস্থায় উপবিষ্ট মদনমোহনকে নির্দ্দয়রূপে পিটাইতে আরম্ভ করিলেন। এবার মদনমোহন এক লম্ফে গাত্রোত্থান করিল, তাহার পর বেণী মাষ্টারের বুকের উপর গিয়া পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে সবলে শ্লেটখানি ছিনাইয়া লইল এবং চক্ষুর নিমিষে তাহার দপ্তর তুলিয়া লইয়া সবেগে ইস্কুল পরিত্যাগ করিল। বেণী মাষ্টার ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্কুলের চাকরকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'ত্রৈলোক্য, শীঘ্র ছোঁড়াকে ধর, এখানেই আমি ওর গোর দেব।' ত্রৈলোক্য মদনমোহনের নিকট দোলে রথে পার্ব্বণী লাভ করিত, বিশেষতঃ সে তাহার পিতার রায়েৎ, তাহার অগ্রসর হইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, সাহসেও কুলায় নাই। সুতরাং মদনমোহন অবাধে ইস্কুল ত্যাগ করিয়া ইস্কুলের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল, এবং স্পর্দ্ধাভরে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, যে কোন নিকট কুটুম্ব তাহাকে ধরিতে আসিবে,. তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের পৈত্রিক ভিটায় শর্ষপ নামক শস্য বপন করিবে। তাহার পর সে নিরাপদে গৃহে চলিয়া গেল। ক্রোধে ক্ষোভে বেণী মাষ্টার অন্তর্দ্দাহগ্রস্ত মাত-ঙ্গের ন্যায় চাকল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্লাশের অনেক নিরপরাধ ছাত্র সে দিন তাঁহার হস্তে নিপীড়িত হইল।

ইস্কুলের ছুটির পর আমি বাড়ী গিয়া জল খাইতেছি, এমন সময় মদনমোহনের পিসিমার নিকট হইতে এত্তেলে লইয়া হরিমতি ঝি আমাদের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল, বলিল, পিসিমা আমায় তলব দিয়াছেন। ব্যাপার কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম, মদনমোহনের বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়, খড়ম পায়ে দিয়া পিসিমার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম রাগে তিনি আগুণ হইয়া বসিয়া আছেন। মদনমোহনের মুখে তাহার প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া পিসিমা বেণী মাষ্টারের বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রায়ে বেণী মাষ্টারের পিতা মাতা এবং তাঁহার বংশের উপর অনেক গুরুতর দোষা-রোপ করা হইয়াছিল। পিসিমাকে শান্ত করিবার চেষ্টা আমার বৃথা হইল, জ্বলন্ত তৈলে জল ঢালিলে যেমন তাহা অধিক পরিমাণে জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ আমার সান্ত্বনাবারি বর্ষণে পিসিমার জ্বলন্ত ক্রোধ সমধিক জ্বলিয়া উঠিল, সে ঝাঁঝ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তফাতে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

মদনমোহনের অপরাধটা কি ইস্কুলে তাহার কতক কতক আভাস পাইয়াছিলাম, ঠিক সংবাদ জানিবার জন্য মদনমোহনের ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার শ্লেটখানা টানিয়া বাহির করিলাম, দেখিলাম তখনও বেণী মাষ্টারের মুখ নিঃসৃত সেই ইলেভেন সিলিংস, সেভেন পেন্স থ্রি ফারদিং পরিবর্ত্তে একটি অনিন্দ্য সুন্দর সম্পূর্ণ অরিজিনাল কবিতা লেখা রহিয়াছে—

"ফোর্থ ক্লেলাসে থার্ড মাষ্টার থার্ড জানুয়ারী
করে দিলে বেঞ্চির উপর মোহন বংশিধারী।
বেণী মাষ্টার মানুষ বাঘ সবাই থাকে চোটে,
চক্ষু দুটি মুদিত সদা পাছে দেখা ছোটে।
আর জন্মে মোলতা ছিল বেণী মাষ্টার * *,
এ জন্মে তাড়-ছলের ফিরে প্রাণটা ঝালা পালা।।"

পিসিমা কবিতা শুনিয়া একেবারে জল। একগাল হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে, যেমন লোক তার উপযুক্ত লেখা হয়েছে, বাবাঃ মঙ্গলের আমার কত বুদ্ধি, এখন বেঁচে থাকলে হয়। ছেলেকে এমন করেও কি কেউ ঠেঙ্গায়? মেরে হাতের নুলোটা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে, ঐ মারের জন্তেই ত তার বাড়ীতে পড়াতে আসা বন্ধ করে দিয়েছি, লক্ষীছাড়া, হতভাগা, হাড়হাবাতে মিন্‌সে।"—পিসিমা এক নিশ্বাসে কতকগুলা অভিধান বহির্ভূত বিশেষণে বেণী মাষ্টারকে বিভূষিত করিলেন।

মদনমোহনের বাপ বিষ্ণু বাবু ফৌজদারী আদালতে মোক্তারী করিতেন, জমীদারীও কিছু কিছু ছিল। তিনি অপরাহ্নে কাছারী হইতে বাসায় ফিরিয়া চাপকানের বোতাম খুলিতে না খুলিতে পিসিমা তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের প্রতি বেণী মাষ্টারের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বিষ্ণু বাবুর বড় রাগ হইল, তিনি নিজেকে একেলে লোক বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং সেকেলে প্রহার প্রথার উপর তাঁহার আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল; তিনি সন্ধ্যার সময় হেড মাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি মশাই আপনার বেণী মাষ্টারকে সাবধান ক'রে দিবেন, যদি তিনি এভাবে ছেলে ঠেঙ্গান, ত তাঁকে এ মুলুক ছেড়ে পলাতে হবে, পেয়াদা পাড়ায় ছুটো মুসলমান পাইককে লেলিয়ে দেব, তারা তাঁর হাড় কখানা হাউলের জলে রেখে আসবে।"

হেড মাষ্টার কিছু ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন, একে তিনি পল্লী-গ্রামে অপ্রচলিত সুধাপান প্রথায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাহার উপর স্কুলের সেক্রেটারী ভুবন বাবুর সহিত বিষ্ণু বাবুর ভয়ঙ্কর ভাব, বিষ্ণু বাবু ভুবন বাবুর দক্ষিণ হস্ত বলিলেই হয়, পরামর্শদাতা, আমমোক্তার, পাশার নৈশ আড্ডার প্রধান এয়ার ইত্যাদি সমস্ত। হেড্ মাষ্টার ভয়ে আধখানা হইয়া বেণী মাষ্টারকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন; এ কথা শুনিয়া বেণী মাষ্টারের মনে কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহার পর দিন হইতে মদনমোহনের প্রতি তাঁহার ক্রোধের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান রহিল না। সমস্ত অপমান তিনি বেমালুমভাবে পকেটস্থ করিয়া সহিষ্ণুচিত্তে তাহাকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

মদনমোহনের বুদ্ধি কখন সোজা পথে চলিত না। একবার মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব দিন রাত্রে মদনমোহন ডাক মুন্সীর ফুল বাগানে গাঁদাফুল চুরী করিতে গিয়াছিল। গাঁদাগুলি খুব বড়, ডাক মুন্সীর বড় সখের ফুল। ফুল চুরী যাইবার ভয়ে তিনি দুজন ডাক রণারকে বাগানের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; মদনমোহন তাহা জানিত না, কতকগুলি ফুল তুলিবার পর 'রনার' দ্বয় তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ডাকমুন্সী উমাশঙ্কর বাবু দেখিলেন, এটি বিষ্ণু বাবুর সুযোগ্য বংশধর, তাহাকে অধিক শাসন করা নিরাপদ নহে, সুতরাং তিনি মদনমোহনের কর্ণ মর্দ্দন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মদনমোহন অত্যন্ত ভাল মানুষের মত ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, কাহাকেও কোন কথা বলিল না। কিন্তু এ অপমান সে সহজে ভুলিল না, তাহার মাথা বেশ পরিষ্কার ছিল, অতি অল্প চিন্তাতেই পোষ্ট মাষ্টারের প্রদত্ত শাস্তির প্রতিবিধান বিধানের পন্থা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

প্রায় এক সপ্তাহ পর এক দিন প্রভাতে একজন পিয়ন ডাকবাক্স খুলিয়া দেখে তাহার ভিতর একখানি পত্রও নাই, টিকিটওয়ালা, বেয়ারিং (তখন পোষ্ট কার্ডের প্রচলন হয় নাই) সমস্ত পত্রই মহাদেবের কোপানলে দগ্ধীভূত রতিপতির ন্যায় ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কখন কোন্ ছুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মদনমোহনের ক্রোধানল টিকার আগুন রূপে সেই ডাকবাক্সের হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক এই অনর্থপাত করিয়াছিল তাহা মদনমোহনই বলিতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপারের পৌনঃপুনিক অভিনয়ে নিরীহ ডাকমুন্সীটিকে অগত্যা গ্রাম হইতে বদলী হইতে হইল।

মদনমোহনের এইরূপ বাল্যলীলা অনেক ছিল, আরও দুই একটির উল্লেখ না করিলে তাহার চরিত্রমাধুর্য্য সম্যক উপলব্ধি হইবে না।

একবার গ্রামে শৃগালের উপদ্রব হয়। সেই উপদ্রব প্রশমনের জন্ত মদনমোহন তাহার বয়স্তবৃন্দের সহায়তায় এক নিরালাবাঙ্গা ফাঁদ নির্ম্মাণ করে। ফাঁদটি তাহাদের বাড়ীর কাছে বাগানের মধ্যে পাতা হইল। একালের নগরবাসী পাঠকগণের নিকট সেই ফাঁদের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রথমে মাটিতে একটা ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে কিছু খাবার রাখা হয়, গর্ত্তটি বেষ্টন করিয়া একটা খুব শক্ত দড়ি এভাবে পাতিয়া রাখা হয় যে, গর্ত্তের খাদ্য দ্রব্যে মুখ স্পর্শ করিবামাত্র সেই ফাঁস শৃগালের গলায় আটকাইয়া যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নহে, ফাঁসটা একটি লম্বা দড়ির সঙ্গে বাঁধা, এই দড়ি একগাছি সমুন্নত বংশের অগ্রভাগের সহিত আটকানো, দড়ির দৈর্ঘ্য এরূপ যে তাহার টানে বাঁশের মাথা অনেকখানি নোওয়াইয়া থাকে। শৃগালের গলায় ফাঁস বাধিবা মাত্র বাঁশ সজোরে, সোজা হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দড়িতে আবদ্ধ হইয়া শৃগাল মহাশয়কেও উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শূন্তে ঝুলিতে হয়। কিন্তু শৃগালেরা এতই বুদ্ধিমান জন্তু যে কোন গ্রামে ফাঁদে একটা শেয়াল পড়িলে, অন্ত শেয়ালেরা আর সে দিকে অগ্রসর হয় না; কিন্তু সেজন্ত মদনমোহন কিম্বা তাহার বন্ধুবর্গের চেষ্টায় ক্রটী ছিল না, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ফাঁদের কাছে বসিয়া ভাত, পাকা আম, কাঁঠালের ভুতুড়ি প্রভৃতি শৃগাল জাতির লোভবৃদ্ধিকর বহু পদার্থ ফাঁদের গর্ত্তে রাখিয়া শৃগাল-মেধ-যজ্ঞের সুদীর্ঘ আয়োজন চলিতে লাগিল।

এই সময়ে বেণী মাষ্টার কিছুদিনের জন্ত মদনমোহনের 'প্রাইভেট টিউটার' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা তিনি মদনমোহনকে পড়াইতে আসিয়া ক্রমাগত ডাকিয়াও তাহাকে পাইলেন না; হীরে খানসামা সংবাদ দিল, শ্রীমান বাগানের মধ্যে বসিয়া শৃগাল বধের আয়োজন করিতেছে। ছাত্রের অবাধ্যতায় বেণী মাষ্টারের মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি স্বয়ং সরজমিনে উপস্থিত হইয়া মদন-মোহনকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবেন স্থির করিয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন; তাঁহাকে অদূরে দেখিয়াই বিনোদ, বিপিন, চুণী, মতি, নেপাল প্রভৃতি মদনমোহনের সখাবৃন্দ ফাঁদের অদূরে বাঁশ বনের আড়ালে গিয়া লুকাইল, নিকটে একটা আতা গাছ ছিল, মদনমোহন এক লম্ফে তাহার শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাষ্টার মহাশয় সক্রোধে ফাঁদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, ফাঁদের মহিমা বোধ করি তিনি পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। "হতভাগা ছোঁড়ারা একেবারে উচ্ছন্নে গেল, ফাঁদ পেতে আবার খেলা!"—বলিয়াই তিনি সেই ফাঁদের মধ্যে পদাঘাত করি-লেন।

অচেতন ফাঁদ, শৃগাল হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই তাহার সমান ব্যবহার! বেণী মাষ্টারের পদ স্পর্শ মাত্র ফাঁদের ফাঁস তাঁহার শ্রীচরণে বাধিয়া গেল, নত মস্তক বাঁশখানা সোজা হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে পনর হাত উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিল, তিনি নতমস্তকে লম্বমান হইয়া শক্ত দড়িতে ঝুলিতে ঝুলিতে গভীর আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।—তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মদনমোহন ও তাহার বন্ধুবর্গের ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না, মদনমোহন আতা গাছ হইতে নামিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, বাঁশ ঝাড়ের আড়াল হইতে তাহার সঙ্গীগণও অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রায় দশ বার মিনিট পরে দুই তিনজন চাকর ও প্রতিবেশী ছুটিয়া আসিয়া বেণী মাষ্টারকে ফাঁদের কবল হইতে রক্ষা করিল।

গোলমাল শুনিয়া গ্রামের শিরোমণি ঠাকুর মদনমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের গোলমাল রে মদনা?" মদন একদিন শিরোমণি-মহাশয়ের মেটে কোঠার উপরে আশ্রয় গ্রহণের জন্ত ছুটিয়াছিল; মদন বলিল,—"ফাঁদে জানোয়ার পড়েছে, পণ্ডিত দাদা।"

"কি জানোয়ার রে! শিয়াল?"

"না পণ্ডিত দাদা, একটা বাঘ।"

"বাঘ? বলিস্ কিরে! দিনের বেলা ফাঁদে বাঘ পড়লো কি করে? এ যে ঘোর কলি উপস্থিত!"

মদনমোহন হাসিয়া বলিল, "এ বাঘ দিনের বেলাতেই পড়ে পণ্ডিত দাদা, এ বনের বাঘ নয়, আমাদের স্কুলের বাঘ, বেণী মাষ্টার!"

শিরোমণি ঠাকুর "রাম, রাম" বলিয়া ব্যাঘ্র সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করিলেন।

মদনমোহনের মাথাটা খুব ক্লিয়ার ছিল স্বীকার করিতেই হইবে, তবে মন্দ বিষয়ের আবিষ্কারেই সেটা ঘুরিত।—একদিন মাঘ মাসের প্রভাতে মদনমোহন এক লাঠি ঘাড়ে লইয়া একাকী এক বাঘের খাঁচা দেখিতে গিয়াছে। দিন কত হইতে বারুই পাড়ায় বাঘের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। তাই গ্রামের লোক বনের ধারে একটা সংকীর্ণ রাস্তার পাশে একটা বাঘের খাঁচা বসাইয়া রাখিয়াছিল। ব্যাঘ্রকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য একটি ছাগ শিশুও সেই পিঞ্জর মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছিল। মদনমোহন দেখিল বাঘ খাঁচায় পড়ে নাই, ভীত ছাগ শিশু একটা ছোট কুঠুরীতে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছে। মদনমোহন বাড়ী ফিরিয়া যাইবে, এমন সময়ে দেখিল গোঁসাই পাড়ার নিতাই দাস বৈরাগী ভিক্ষার বাহির হইয়াছে, তাহার মস্তকে একটি পক্ষিরূপের টুপি, হস্তে করতাল, গাত্রে একখান লাল বনাত, বহির্ব্বাস খানি তাহাতেই ঢাকা।

মদনমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কি, নিতাই দাস যে! এত সকালে কোন দিকে যাওয়া হচ্চে?

নিতাই দন্তোন্মীলন পূর্ব্বক হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে এই ভিক্ষের বেরিয়েচি, একবার অধিকারী পাড়ার দিকে যাব।"

"ভিক্ষের যাচ্ছ? আমি তোমাকে এখনি এক টাকা ভিক্ষে দিতে পারি, কিন্তু যদি একটা কাজ কর।"

নিতাই প্রলুব্ধ চিত্তে বলিল, আজ্ঞে করুন, আমি ত আপনাদের পেয়েই মানুষ।"

মদনমোহন বলিল, "ঐ ঝোপের আড়ালে একটা বাঘের খাঁচা আছে, একবার তার মধ্যে যেতে হবে।"

নিতাই বলিল, "হরে কৃষ্ণ, তাকি পারি?" বাঘে খেয়ে ফেলবে যে!"

মদনমোহন বলিল, "বাবাজি ক্ষেপেচ, ওর মধ্যে বাঘ থাকলে কি আর তোমাকে যেতে বলি! খাঁচার মধ্যে বাঘটাগ নেই। একটা পাঁঠা আছে, সেও আর একটা কুঠুরীতে, পাঁঠাকে ভয় কি, বাবাজী? পাঁঠাত তোমাদের কাছে গরু!"

বাবাজী কর্ণে হাত দিয়া বলিলেন, রাধেকৃষ্ণ!—তা টাকাটা দেবেন ত?"

মদনমোহন একটি চক্‌চকে টাকা বাহির করিয়া বাবাজীকে দেখাইয়া বলিল, "আলবৎ দেব, বিশ্বাস না হয় এটা তুমি হাতে করে নিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়। বাঘের খাঁচায় মানুষ গেলে খাঁচার কেমন শোভা হয় তা দেখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছে, আবার এখনি বেরিয়ে আসবে!"

বাবাজীর গ্রহ! সে প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া বড় জোর দুগণ্ডা পয়সার চাউল সংগ্রহ করে, আর প্রভাতে উঠিয়াই একটি চক্‌চকে টাকার মুখ দেখিতে পাইল, এত বড় একটা প্রলোভন সে কি করিয়া ত্যাগ করে? টাকাটি হস্তগত করিয়া বাবাজী ব্যাঘ্র পিঞ্জরে প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ মহাশব্দে পিঞ্জর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

মদনমোহন আর সে অঞ্চলে নাই। একেবারে গ্রামের বাজারে আসিয়া ঘোষণা করিল খাঁচার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাঘ পড়িয়াছে।—শুনিয়া দলে দলে লোক বাঘ দেখিবার জন্য বারুই পাড়ার দিকে ছুটিয়া চলিল, কিন্তু মনুষ্যাকার ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এদিকে মদনমোহনের বন্ধুবর্গ সমস্ত গ্রামের মধ্যে রটাইয়া দিল, নিতাই বাবাজী রাত্রে গোপনে পাঁঠা চুরি করিতে আসিয়া খাঁচার মধ্যে আটক পড়িয়াছে। বাবাজীর একক্ষণে চৈতন্যোদয় হইয়াছে। সে রাগে লজ্জায় অধীর হইয়া খাঁচার মধ্যে লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল, কিন্তু হায়! ভিতর হইতে তাহা খুলিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। গ্রাম্য দর্শকগণের হস্তে বাবাজী দীনবন্ধু বাবুর 'হোঁদল কুৎকুতের'—অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মাঘ মাসের শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল, বাবাজী কাঁদিয়া বলিল, "হে নারায়ণ, হে মধুসূদন হরি, রক্ষা কর। আমার এ কলঙ্ক মোচন কর।"

কিন্তু নারায়ণ তাঁহার লুব্ধ ভক্তের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। গ্রামের প্রধান জমীদার ত্রিলোচন বাবু যুবা পুরুষ, তাহার উপর তিনি একজন প্রচণ্ড শাক্ত। তিনি বাবাজীর এই বিপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই বহু অনুচর সঙ্গে সেখানে পদার্পণ করিলেন, বাবাজীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আমোদ বোধ হইল, তাঁহার অনুমতি ক্রমে বিশ পঁচিশজন বেহারা খাঁচা সমেত বাবাজীকে স্কন্ধে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

মদনমোহনের কবিতা কাহাকেও মার্জ্জনা করিত না, পাড়ায় পাড়ায় ছড়া আরম্ভ হইল:—

"বোষ্টম টম টম
পাঁঠা খাবার লোভে
বাঘের খাঁচায় আগমন।
ঝোলায় মাঝে মালা রেখে
পাঁঠা খাবার যম।"

একাল হইলে এই গ্রামিকর ছড়ার জন্য একটা মানহানির মামলা রুজু হইত, এরূপ আশা করা যায়।

কিন্তু সুখের কথা এই যে এই দুর্দ্দান্ত বালক মদনমোহনের পরকাল নষ্ট হয় নাই। মদনমোহন মফস্বল আদালতের একজন খুব বড় মোক্তার। এখন তিনি অত্যাচারীর শত্রু ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, গ্রাম্য সমাজে মদনমোহনের বাল্য প্রতাপ অক্ষুন্ন রহিয়াছে এবং যদিও তাঁহার বাল্যকালে বেণী মাষ্টার তাঁহার হস্তে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তথাপি আমরা আশা করি সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর মদনমোহনের সেই শিশুসুলভ দুষ্টামি মার্জ্জনা করিয়াছেন। বেণী মাষ্টারের বিধবা পত্নী যতদিন জীবিতা ছিলেন ততদিন মদনই তাঁহার প্রতিপালন ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং একালে মদন যে সকল সৎকার্য্য করেন, সংবাদপত্রে তাহার আলোচনা না হইলেও তাঁহার ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইবার পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না।

তরু আর অরু।*

কলারাজ্যে দুটি রাণী;
প্রতিভার বুঝি যমক কন্যা রমা আর বীণাপাণি
একজন তারি,— রূপেরে নিঙ্গাড়ি
আঁকে স্বর্ণ-তুলি ল'য়ে;
অন্যে কথা কয় স্বপনের সনে বাঁশরীর তান-লয়ে!

স্বদেশী ভকত কবি
মায়ারাজ্যে পশি দেখিয়া লয়েছে তোমাদের ছায়া-ছবি

---

* রামবাগানের ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরলোকগতা কন্যাদ্বয়।

উরি মধুমাসে কল্পকুঞ্জবাসে
ফুটালে সেফালিরাশি,
না লুটি সৌরভ, যুগ্মস্বপ্ন সম মিলাইলে পাশাপাশি।

কেন ভেঙ্গে দিলে খেলা?
তোমাদের রবি ডুবেছিল বুঝি থাকিতে অনেক বেলা!
আছ কিম্বা নাই, জানিতে না পাই;
ফুলবালিকার যথা,—
গগনে পবনে খচিত রটিত তোমাদের ব্রত-কথা।

হাসে শূন্যে শত তারা;
তোমরা কোথায় সহস্রের মাঝে রয়েছ রহস্যে হারা!
ধ্যান-নিমগন ও মহাভুবন
সাধকের প্রিয় দেশে,
চলেছ কি ছুটি অপূর্ণ অতৃপ্ত ভাবের আবেশে ভেসে?

মাঝে মাঝে আমি তাই
নিশীথ গগনে চাহিয়া চমকি,—যেন কার সাড়া পাই!

বাঁধি যবে শ্লোক, দূর স্বপ্নলোক
দেখা দেয় অকস্মাৎ;
তোমরা তরুণী মেঘে মেঘে সেথা বেড়াও কি হাতে হাত!

ধরার কাঙ্গাল কবি
তবে ত না জানি তোমাদের বলে আঁকিয়াছে কত ছবি!
রহি অসীমায় কল্পনা খেলায়
এখনো কি ফের মাতি;
অথবা সকল হারায়ে আঁধারে ঘুমাইছ দিবারাতি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

তিলোত্তমা।

না জানি গো কত দূরে তোমার রহস্য-পুরী
হে সৌন্দর্য্য-রাণি,
যেথায় গোপনে বসি' বিস্তারিছ এ মোহন
ইন্দ্রজালখানি।

আকুল মানবমন মুগ্ধ প্রজাপতি সম
তারি পাশে ঘুরে,
জাগায়ে অতৃপ্তি তৃষা তুমি মরীচিকামরী
থাক দূরে দূরে!
নীলাম্বর প্রাঙ্গনেতে ছড়াইয়া কত দীপ্ত
রতন ভূষণ,
অন্ধকার যবনিকা ফেলিয়া নিশায় কেন
করগো রোদন?
সে অশ্রু শিশির হয়ে পড়ে ধরণীর বুকে
মুকুতা নিন্দিয়া;
কোমল মাধুরী তব সদ্যস্ফুট পুষ্পদলে
ওঠে বিকশিয়া!
সযতনে নীলাকাশ রাখে তব পদতলে
অরুণ কমল,
সুকুমার লঘুস্পর্শে আনন্দে খুলিয়া যায়
কিরণের দল!
ললিত লাবণ্য তব বসন্ত মুঞ্জরি' তোলে
তরু লতিকায়;
পূর্ণিত যৌবন নব, বরষার নদীনীর
উছলিয়া যায়!
অঙ্গের সৌরভ তব কুসুম ভরিয়া রাখে
আপন হিয়ায়,
মৃদুল নিঃশ্বাস তব মলয় অনিল আনে
মানবের গায়;
বসিয়া পল্লব ঘন বিজন বিপিন মাঝে
সাধে যত্নে পিক,
তোমার মধুর স্বর অশ্রান্ত করুণ কণ্ঠে,
মুগ্ধ করি দিক।
তোমার সঙ্গীত-তান বীণাতন্ত্রী বেঁধে রাখে
আপন পরাণে;
অঙ্গুলির আবাহনে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ঝরে
সুধাধারা কাণে।
তব গতি তালে তালে সমুদ্র তরঙ্গ রাশি
উঠিছে পড়িছে;
তোমারি উজ্জ্বল হাসি রক্তিম অধরে উষা
ফুটায়ে তুলিছে।
চাঁদের মুকুরে যবে দেখ নিজ প্রতিবিম্ব
জ্যোৎস্নাময়ী মায়া,
ব্যগ্র বাহু বিস্তারিয়া প্রকৃতি হৃদয়ে ধরে
তব রূপ-ছায়া।
কবি হেরি' নারীমুখে তোমার মধুর শোভা
গাহে স্তব তার,
আলো, ছায়া, রেখা বর্ণে আঁকে ধীরে চিত্রকর
আভাস তোমার।
প্রকৃতি মানবে মিলি তোমারে ধরিতে চায়
শত রূপ ফাঁদে,
বিদ্যুত-বসন-প্রান্ত চমকি চলিয়া যাও
প্রাণ শুধু কাঁদে।
কোন্ জ্যোতি-অন্তঃপুরে লুকায়েছ আপনায়
অয়ি নিরুপমে,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য হ'তে দাঁড়াবে কি দেবীবেশে,
কভু তিলোত্তমে?

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রদীপ প্রকাশিত হইল। এবারে অতিরিক্ত ১২ পৃষ্ঠা দিয়াও আমরা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু প্রভৃতির প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত। মাঘ মাসের প্রদীপে তাঁহাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

২৯শে পৌষের পর আর কাহাকেও ২৲ টাকায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করা হইবে না। কি নূতন, কি পুরাতন, সকলকেই ২৷০ আড়াই টাকা দিতে হইবে। আশা করি—অবশিষ্ট গ্রাহক ও গ্রাহিকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

টাকাকড়ি চিঠিপত্র সমস্তই আমার নামে প্রেরিতব্য।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস, প্রকাশক,
২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চতুর্থ ভাগ। } মাঘ, ১৩০৭। { ২য় সংখ্যা।

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি।

মনুষ্যের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ হইল কিরূপে ইহা একটা উৎকট সমস্যা। বড় বড় পণ্ডিতে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া হারি মানিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ এই বিষয়ের আলোচনা মাত্র, মীমাংসার কোন আশা দিয়া পাঠককে প্রতারিত করিব না।

অন্যান্য মানবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বিকাশ লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। ইংরাজীতে যাহাকে ইউটিলিটি বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহাই দেখিয়া চলে। ইউটিলিটির বাঙ্গালায় অর্থ হিতকারিতা, উপকারিতা, উপযোগিতা, কাজে লাগা। যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবন সংগ্রামে অনুকূল, কোন না কোনরূপে জীবন সংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, প্রকৃতি তাহাই নির্ব্বাচিত করিয়া অভিব্যক্ত করেন। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, মানুষের মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত দুই খানা অস্ত্রনির্ম্মাণ ও অস্ত্রব্যবহারের উপযোগী, মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের জীবন রক্ষার উপযোগী ও অনুকূল। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এ সকল ধর্ম্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের গায়ের জোর কম, কাজেই বুদ্ধির জোরে সেটা পোষাইয়া লয়। কাজেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। মানুষের গায়ের জোর কম, কাজেই তাহাকে দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; কাজেই মানুষের সামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে আত্মসংবরণ করিতে হয়। বর্ত্তমান আকাঙ্ক্ষা, লালসা প্রবৃত্তি প্রভৃতি দমনে রাখিতে হয়, এই জন্য মনুষ্যমধ্যে নীতি ধর্ম্মের উদ্ভব। ইহাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কাজ। কেন না, যাহা কিছু জীবনরক্ষার সাহায্য করে, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা ব্যতীত জাতিগত জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষা আছে; বংশরক্ষার অনুকূল ধর্ম্ম সকল ডারুইনের মতে যৌন নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত হয়। ফলে যৌন নির্ব্বাচন প্রাকৃতিক

নির্ব্বাচনেরই প্রকারভেদ মাত্র। ওয়ালাস প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিৎ কেন যৌন নির্ব্বাচন লইয়া এত হাঙ্গামা করিতে যান, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। উভয়ের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ থাকিলেও মূলতঃ কোন বিরোধ নাই।

যাবতীয় মানবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন স্বীকার করা যাইতে পারে। এমন এক দিন ছিল যখন মনুষ্য মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার বানরজাতীয় পূর্ব্ব পুরুষে পশুত্ব মাত্র বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিবিধ মানব ধর্ম্ম তাহাতে বিকশিত করিয়া তাহাকে মানব পদবীতে স্থাপিত করিয়াছে। বেশ কথা, কিন্তু সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি একটা মানব ধর্ম্ম। মানব ধর্ম্ম এই হিসাবে, যে মানবেতর প্রাণী এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে একেবারে বঞ্চিত। ইতর জীবের সৌন্দর্য্যবোধ একেবারে নাই। ইংরাজীতে যাহাকে fine art বলে, বাঙ্গালাতে যাহাকে সুকুমার কলা বলা পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে, আমি সেই সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। ইংরাজীতে যাহাকে ইসথেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিম বাবু যাহার চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই সৌন্দর্য্যের কারবার। ইতর জীবের মধ্যেও এক রকম সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা আছে, কিন্তু তাহা সাধারণ জীবধর্ম্ম; তাহাকে বিশিষ্ট মানব ধর্ম্ম সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। যেমন বিহগ গান গাহিয়া বিহগীর মন ভুলায়, কপোত মণিতানুকারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায়, ময়ূর কলাপশোভা বিস্তার করিয়া কেকারব সহকারে নাচিয়া ময়ূরীর মন ভুলায়। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, সাধারণ জীবধর্ম্মের অন্তর্গত। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, যৌন নির্ব্বাচনে উহার উৎপত্তি। জীবের বংশরক্ষা বিষয়ে এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার উপযোগিতা আছে। এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জাতিরক্ষা ও বংশরক্ষা বিষয়ে আনুকূল্য করে। ময়ূরের সৌন্দর্য্য ও ময়ূরীর সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ, উভয়ই জীবন রক্ষা বিষয়ে হিতকর। ব্যক্তিগত জীবনরক্ষায় না হউক, জাতীয় জীবন রক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় হিতকর। সুতরাং যৌন নির্ব্বাচনে উহার অভিব্যক্তি; এবং যৌন নির্ব্বাচন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেরই প্রকারভেদ। মনুষ্যের মধ্যেও এই রূপ সৌন্দর্য্যের ও এই রূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অসদ্ভাব নাই। নারী দেহের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ইহা হইতেই উৎপন্ন, এবং সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষের অনুরাগ বা আকর্ষণ তাহাও এই যৌন নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। কেন না, এক পক্ষে সৌন্দর্য্যবিকাশ, অন্য পক্ষে সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ, মানব বংশ রক্ষার অনুকূল। কিন্তু তদ্ভিন্ন মনুষ্য যেখানে সেখানে অকারণে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তুমি আমি যেখানে মুগ্ধ হইবার কোন কারণ দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ অকারণে সেইখানে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবিকুল এইজন্য বিজ্ঞসমাজে নিন্দিত। কালিদাস মারুতপূর্ণরন্ধ্র কীচকধ্বনিতে অর্থাৎ বাঁশবনে বাতাসের ডাকে বনদেবতাগীতি শুনিতে পাইতেন; ওয়ার্ডসোয়ার্থ কোকিলের ডাক শুনিয়া অশরীরী আত্মার সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন; এই শ্রেণীর অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-বোধ অপর সাধারণের হৃদ্গত হয় না। এবং এই সৌন্দর্য্য-বোধের জীবনরক্ষায় কোন কার্য্যকারিতা আছে, তাহাও বোধ হয় কেহ প্রমাণ করিতে যাইবেন না। বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বথা প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচ রকমের বর্ণের বিন্যাস করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন; কলাবৎ নানা রকমের স্বর বিন্যাস দ্বারা বিবিধ ভাবের উদ্বোধন করিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন; কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সকল সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথা হইতে কিরূপে কেন উৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না; সকলের চোখ কোথায় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারেও সমর্থ হয় না; অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমজদার, তিনি এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন। কেন তাঁহার এই মোহ, তাহা বুঝান যায় না। জীবনসংগ্রামে এই মোহ কোনরূপ আনুকূল্য করে, বলিতে গেলে বাতুলের প্রলাপ হইবে। কাজেই এই সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তির প্রাকৃতিক হেতু নির্দ্দেশ এক রকম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন রূপ মহামন্ত্রের অন্যতর ঋষি আলফ্রেড রসেল ওয়ালাস এইজন্য নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন, মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধ যখন মানবত্বের

একটা প্রধান লক্ষণ, হয়ত অনেকের মতে মানবত্বের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ, সৌন্দর্য্যবুদ্ধিবর্জ্জিত মনুষ্যকে যখন পূর্ণ মানবত্ব দিতে পারা যায় না, তখন মানবত্বই যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনপ্রসূত একথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। অতএব পূর্ণ মানবত্বের অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। মানবত্বের অভিব্যক্তির জন্য অন্য কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাকৃতিক শক্তি ব্যতীত কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি হয়ত মানবত্বের অভিব্যক্তির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমরা তাহা জানি না। ডারুইন তাঁহার Descent of Man নামক পুস্তকে মনুষ্যকে যে প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচন এতদুভয়ের ফলে বানর হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে ডারুইনের মত গ্রহণ করিতে পারা যায় না। মানবোৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়ালাসের চরম সিদ্ধান্ত কতকটা এইরূপ।

ওয়ালাসের এই চরম সিদ্ধান্ত অন্যান্য পণ্ডিতে গ্রহণ করিতে রাজি হয়েন নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যবুদ্ধির যখন জীবনসংগ্রামে কোন কার্য্যকারিতাই নাই, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধি জন্মাইতে পারে, এই কথা স্পষ্টতঃ বলিতেও কাহারও সাহসে কুলায় নাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ব্যতীত অন্য কোন কারণে এই সৌন্দর্য্য বুদ্ধির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, ইহাই দেখাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই সকল চেষ্টা বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। একটা চেষ্টার এখানে উল্লেখ করিব।

পক্ষিজাতি সৌন্দর্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ময়ূরের কলাপশোভা কাহার না মনোহরণ করে? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছের মোহন চূড়া বাঁধিয়া গোপাঙ্গনাদের মনোহরণ করিতেন। ভক্ত বৈষ্ণব আজ পর্য্যন্ত সেই মোহন চূড়ার কল্পনায় দিশাহারা হইয়া যান। তেমনি অন্যান্য পক্ষীও দেহসৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। স্ত্রী পক্ষী অপেক্ষা পুরুষ পক্ষী অধিক সুন্দর; ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর সুন্দর; কপোতী অপেক্ষা কপোত সুন্দর। ডারুইনের মতে এই সৌন্দর্য্যের কারণ যৌন নির্ব্বাচন। স্ত্রী পাখী সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া আপনার সহচর নির্ব্বাচন করিয়া লয়। পুরুষ পাখীর মধ্যে যে অধিক সুন্দর, তাহারই সহচরী জুটে, তাহারই বংশ রক্ষা ঘটে। যাহার সৌন্দর্য্যের অভাব, সে অপমানিত ও ধিক্কৃত হইয়া সহচরী লাভে বঞ্চিত হয়। তাহার বংশরক্ষা ঘটে না। এইরূপে বংশপরম্পরায় পুরুষ পাখী ক্রমশঃ সৌন্দর্য্য লাভ করে; এইরূপে পুরুষ পাখীর মধ্যে ক্রমশঃ রূপের বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহারই নাম যৌন নির্ব্বাচন। কিন্তু জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মধ্যে সকলে ডারুইন-নির্দ্দিষ্ট এই যৌন নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, এই সৌন্দর্য্যটা একটা bye-product of evolution জাতীর অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক ফল মাত্র। পাখীর সৌন্দর্য্য পাখীর ব্যক্তিগত জীবন রক্ষায় অর্থাৎ তাহার জীবন সংগ্রামে বিশেষ কোন কাজে লাগে না, ইহা স্বীকার্য্য, তবে তাহার জাতিগত জীবন রক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, তাহারও তেমন প্রমাণাভাব; ডারুইন যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন বা সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং এই সৌন্দর্য্যে পাখীর কোন লাভ নাই। তাহার নিজের ব্যক্তিগত লাভ নাই, তাহার বংশেরও কোন লাভ নাই। তবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহার শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, জীবন রক্ষার অনুকূল বিবিধ ধর্ম্ম তাহাতে বিকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনও দুই একটা ধর্ম্ম বিকাশ পাইয়াছে, যাহার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। শরীরের এক অংশে একটা কোন বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, অন্য অংশে অনুরূপ বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই সকল আকস্মিক বা আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন জীবন রক্ষার অনুকূল না হইতেও পারে, জীবন রক্ষার প্রতিকূল না হইলেই হইল। তেমনি পক্ষিজাতির অভিব্যক্তি সহকারে, তাহার শরীরে নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধিকাংশ পরিবর্ত্তনই তাহার জীবন রক্ষার অনুকূল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত কোন জৈবিক নিয়মবশে আর পাঁচ রকম পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকিবে, যাহা জীবন রক্ষায় তেমন কার্য্যকারী না হইতেও পারে। পাখীর যে সৌন্দর্য্যের কথা বলা যাইতেছে, তাহা এইরূপ আকস্মিক আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন মাত্র। তবে ইহাতে তাহার যে সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে তাহা দৈবক্রমে। তাহাতে তাহার লাভ এমন কিছু নাই, তবে আকস্মিক ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে এই পর্য্যন্ত।

মনুষ্যের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিটাও এইরূপ একটা আকস্মিক

লাভ মাত্র; জীবন রক্ষার অনুকূল বিবিধ মানবধর্ম্মের বিকাশের সহকারে দৈবক্রমে এই বুদ্ধিটারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে তাহার অন্য লাভ কিছুই নাই; কেবল বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটিয়াছে মাত্র। মনে কর, সুখাদ্য ভোজনে, সুপেয় পানে, মানুষের আনন্দ ঘটে; তাহা বেশ বুঝা যায়, কেন না এই আনন্দ জীবনের অনুকূল; এই আনন্দানুভব শক্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। কিন্তু মদ খাইয়া তাহার নেশাতেও মানুষের এক রকম তীব্র আনন্দলাভ ঘটে; এ আনন্দে মানুষের কোন লাভ নাই, বরং লোকসান আছে; এই আনন্দলাভ-শক্তি জীবন রক্ষার প্রতিকূল; এবং মনুষ্য পদে পদে এই অহিত-কর প্রবৃত্তির জন্য অনিষ্ট ভোগ করিতেছে। অথচ আর পাঁচটা হিতকর প্রবৃত্তির সহকারে এই সম্পূর্ণ অনিষ্টকর প্রবৃত্তিটাও মানুষের জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার উপায় নাই। মানুষের সৌন্দর্য্যানুরাগও এইরূপ একটা নেশা, ইহার কোন উপকারিতা নাই; তবে অন্য নেশার মত জীবনের বিশেষ অপকার করে না; বরং সময়ে সময়ে আনন্দ জন্মাইয়া উপকার করে। অন্যান্য নেশার মত এ নেশাটাও দৈবক্রমে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের আনুষঙ্গিক আকস্মিক ফল মাত্র। ইহার জন্য মনুষ্য প্রকৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে করুক। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারের ভীষণ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যাহার ছেলে খেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, যে বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার অবকাশ নাই, এবং বিরহজ্বর-সন্তপ্ত হইয়া চন্দ্রকিরণকে গালি দিবার সময় নাই, সে প্রকৃতিদেবীর এই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে একটু ইতস্ততঃ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুক্কুটের মাথায় শিখার মত যেমন পুরুষ মানুষের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক দাড়ি গোঁপ গজাইয়াছে,—ডারুইন হয়ত বলিবেন যাহার উদ্দেশ্য নারী-জাতির মনোরঞ্জন, তথাপি যাহার অনাবশ্যকতা প্রতি-পাদনের জন্য নাপিতের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে,—তদ্রূপ স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই এই অনর্থক সৌন্দর্য্য নেশাটার উৎপত্তি হইয়াছে। তবু ভাল যে সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।

ফলে ইউটিলিটি লইয়া যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার-বার, এবং ইউটিলিটির সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা মনুষ্যের কবিত্বের স্ফূর্ত্তি, বা সৌন্দর্য্য বোধের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যার প্রয়াস পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এইখানে একটা ভাবিবার আছে; জীবন রক্ষায় যে কিসে কিরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করিয়া বলা কঠিন। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, যে ভাবের প্রমাণ অপেক্ষা অভাবের প্রমাণ সর্ব্বদাই কষ্টসাধ্য। এই বিষয়টাতে আমার কোন উপকার নাই, কখনও উপকার হইতে পারে না, ইহা জোর করিয়া বলা নিতান্ত দুঃসাহসিকের কাজ। সৌন্দর্য্যবুদ্ধিও মানবজীবনে আনুকূল্য করে না, একবারে এত বড় কথাটা বলিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এবং যদি মানবজীবনে ইহার কোন উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অমনি ইউটিলিটির দোহাই দিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আনিয়া ফেলা যাইতে পারে। এই বিষয়টা যে এখনও আলোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

জাব-কীট বা পিপীলিকা-ধেনু।

জাব-পোকা বা এই কীটের নামান্তরের সহিত বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণ পরিচিত আছেন,—ইহাদের অসংখ্যক সুবৃহৎ উপনিবেশগুলির আহার সংস্থানের জন্য প্রতি বৎসর যে কত অপক্ক শস্য ও কত নবোদ্গত বৃক্ষাঙ্কুর ধ্বংস হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করাও কঠিন। আমাদের দেশে শীতকালে জাব-কীট দেখিতে পাওয়া যায় না; ফাল্গুনের প্রারম্ভে বৃক্ষ সকলের নব পত্রোদ্গম আরম্ভ হইলেই, মুকুল ও অঙ্কুরের কোমলাংশ উক্ত কীট দ্বারা আবৃত হইয়া যায়।

মশকের ন্যায় ইহাদের ক্ষুদ্র হুল থাকে, সেগুলি বৃক্ষাঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহারা নিশ্চিন্তভাবে রস শোষণ করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর আক্রান্ত অংশটী রসহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে, কীটগুলি সরস অঙ্কুরান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে। ইহাদের এই প্রকার কার্য্য, বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎকালের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আম্র-মুকুলের একটা ভয়ানক শত্রু। মুকুলোদ্গমকালে যে আম্র কাননে এই কীটের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তথায় মুকুল ফলশালী হওয়ার আশা অতি অল্পই থাকে। উদ্যানপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ জাব-কীটের অনিষ্টকারিতার সহিত অবশ্যই বিশেষ পরিচিত আছেন;—কার্ত্তিক মাসে শিশু কফি গাছগুলিকে এবং ফাল্গুন মাসে শাক সব্জি ও নানা পুষ্প মুকুলসকলকে ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তামাকের জল প্রয়োগাদি নানা ব্যবস্থা করিয়াও উদ্যানপালকগণ ইহাদের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পায় না। পার্শ্বস্থ ১ম চিত্রে একটী গোলাপ-কোরক এই কীট দ্বারা কি প্রকারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্কিত হইল। উদ্ভিজ্জ-জীবি কীট পতঙ্গের ন্যায় জাব-কীটের বর্ণ সবুজ বলিয়া, নবোদ্গত হরিৎ পত্রাদিতে ইহাদের অস্তিত্ব সহসা নয়ন-গোচর হয় না। এই জন্য পক্ষী ইত্যাদির কবল হইতে, ইহারা অনেক সময় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

পাঠকপাঠিকাগণ জাব-কীটের "পিপীলিকা ধেনু" আখ্যা দেখিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছেন;—কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, গাভী দুগ্ধদানে যে প্রকার মানবজাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে, জাব-কীটও বাস্তবিক কয়েক জাতীয় পিপীলিকাকে তদ্রূপ "দুগ্ধ-ননী-সর" অকাতরে দান করিয়া থাকে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, গ্রীষ্মকালে জাব-কীট অধ্যুষিত আম্রাদি বৃক্ষের পত্র এক প্রকার 'আঠাল' স্বচ্ছ পদার্থে লিপ্ত দেখা যায়,—ইহাই জাব-কীটদিগের শরীরনির্গত পিপীলিকাভোগ্য দুগ্ধ বা মধু। পত্রাদিলিপ্ত মধুবৎ পদার্থের সহিত জাব-কীটের যে এতদূর নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা আমরা সহসা বুঝিতে পারি না, এজন্য এটাকে একটী স্বতন্ত্র জিনিস ভাবিয়া উক্ত পদার্থলিপ্ত পত্রকে আমরা সাধারণতঃ "মধু-লাগা-পাতা" বলিয়া থাকি।*

ক্ষুদ্র জাবকীটের ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস আমূল অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাপরম্পরায় পূর্ণ। ইহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু প্রভৃতি সকলই অদ্ভুত। স্বার্থান্বেষী মানব সমাজে ইহারা অনিষ্টকারী ও ঘৃণিত হইলেও সত্যান্বেষী প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের নিকট ইহাদের জীবন বড়ই আদরের সামগ্রী। এইজন্য মানব-সুখ-স্বচ্ছন্দতার একটা প্রধান অন্তরায় জাব কীটের অদ্ভুত জীবনাখ্যায়িকা আজ "প্রদীপের" পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিব।

জাবকীটের জীবনের আরম্ভ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ হয়। শীতের আধিক্য প্রযুক্ত অচিরাৎ সমগ্র কীটের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া, পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত পক্ষহীন স্ত্রীকীটসকল বসন্তাগমে বৃক্ষাদির যে অংশ হইতে প্রথম মুকুল বা পত্রাঙ্কুর উদ্গত হইবার সম্ভাবনা, তথায় ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে,—২য় চিত্রে ইহার একটী প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল। জাব কীটের একটা বিশেষত্ব এই যে, স্ত্রীকীট মাত্রেরই অণ্ড-প্রসব-শক্তি থাকে না,—উদ্ভিদের পত্রোদ্গমের ন্যায় এক অদ্ভুত পদ্ধতিক্রমে কুমারী মাতার শরীর হইতে প্রতি ঋতুতে সহস্রাধিক পিতৃহীন কীট প্রসূত হইতে দেখা যায়। এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন জাবকীট প্রায়ই বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে জন্মগ্রহণ করে;—শরদাগমে শৈত্যতা প্রযুক্ত কীটসংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিলে, যে সকল কীট উৎপন্ন হয়, সাধারণ পতঙ্গের ন্যায় তাহাদের যৌন নির্ব্বাচন শক্তি থাকে। পূর্ব্বে যে স্ত্রী কীটের অণ্ড প্রসব

* যে কীটের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল,—নদীয়া জেলার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে তাহা "জাব-কীট" নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের বিভিন্নাংশে ইহার নামান্তর প্রচলিত থাকার সম্ভাবনা,—আশা করি উপরোক্ত বিবরণ পাঠে, লেখকের বিবৃত কীটটী কি, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন।

করার কথা বলা হইল —তাহা এই শরৎ-কালীন কীট।

দ্বিতীয় চিত্রের উর্দ্ধাংশে অবিকশিত পত্রাঙ্কুরে যে সকল অতি ক্ষুদ্র বিন্দু দৃষ্ট হইতেছে, সেগুলি জাব কীটের ডিম্ব,—এগুলি বাস্তবিকই এত ক্ষুদ্র যে নগ্ন চক্ষুতে দেখিলে তাহাদিগকে কতক গুলি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিন্দু ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। শীতকালে সমগ্র জাব-কীট ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, বসন্তাগমে উক্ত ডিম্বসকল ফুটিয়া নূতন জাব-কীট উৎপন্ন করে। শীত ঋতুর ভয়ানক শৈত্য, প্রশাখার অঙ্কুর-মধ্যবর্ত্তী অণ্ডের কীটোৎপাদন শক্তির বিশেষ কোনও হানি করিতে পারে না। ২য় চিত্রের উর্দ্ধাংশস্থ কোন একটী অঙ্কুরকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে বহ্বায়তন-বিশিষ্ট করিয়া চিত্রের নিম্নার্দ্ধ অঙ্কিত হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় কাতরা এবং বংশরক্ষার উদ্বেগে ক্লিষ্টা একটী স্ত্রীকীট সহস্র সহস্র ডিম্ব প্রসবজনিত অবসাদ উপেক্ষা করিয়া কি প্রকারে মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণেও মাতৃকর্ত্তব্য পালন করিতেছে, ইহাতে পাঠক পাঠিকাগণ তাহা চিত্রিত দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শীতকালে জাব-কীট মাত্রেই এক কালীন লোপ প্রাপ্ত হয়, তারপর ফাল্গুন মাসে নাতি-শীতল দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে, তিন মাস পূর্ব্বেকার সেই ডিম্বসকল বৃক্ষ অঙ্গে পরিণতি লাভ করিয়া প্রচুর কীট উৎপাদন করিতে থাকে। সদ্য-জাত ক্ষুধিত কীটের খাদ্যের অভাব হয় না;—বৃক্ষের যে অঙ্গ হইতে প্রথমেই কোমল প্রশাখা বহির্গত হইবার সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎদর্শী সন্তান-বৎসল মাতা বহুপূর্ব্বে কীটোৎ-পাদক ডিম্বগুলিকে সেই স্থানেই সঞ্চিত রাখিয়া দেয়,—কাজেই মাতৃহীন শিশু কীট প্রচুর খাদ্য লাভ করিয়া লালন পালনাভাবেও শীঘ্রই স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে।

এই নবজাত জাব-কীটের জাতি সম্বন্ধে একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডিম্বোৎপাদক শরৎ-কালীন কীটদিগের মধ্যে যেমন একটা স্ত্রী পুরুষ ভেদ দেখা যায়,—তদুৎপন্ন বাসন্তী কীটে সেই ভেদ অণুমাত্র দৃষ্ট হয় না। সকলেই ভ্রাতৃহীনা ভগ্নী ও পতি-হীনা কুমারী প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, পুরুষ সঙ্গীর সাহায্য ও প্রাথ-মিক ডিম্ব প্রসব ব্যতীত, ইঁহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে সহস্র সহস্র শিশু কীট প্রসূত হইতে থাকে। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে,—শারদীয় জাব-কীটের স্ত্রী পুরুষ ভেদ ও ডিম্বপ্রসব প্রভৃতি কার্য্য একটা নৈমিত্তিক বিধান বলিয়া বোধ হয়,—কীট বংশকে দুরন্ত শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। এক জাতীয় অণ্ডজ কীট হইতে পুং কীটের সাহায্য ব্যতীত নিরণ্ড কীটের উৎপত্তি, প্রাণিবিজ্ঞানের একটা অতি দুর্ল্লভ ঘটনা। উদ্ভিদের পত্রোদ্গমের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—একই শাখার অংশ বিশেষ হইতে যেমন নানা প্রশাখা ও পত্র মুকুলাদি উদ্গত হয়, জাব-কীটের সন্তান জনন কার্য্যটাও কতকটা তদ্রূপ।

একটী কীট হইতে কি প্রকারে বহু কীট উৎপন্ন হয়, পার্শ্বস্থ ৩য় চিত্রে তাহা অঙ্কিত হইল। বলা বাহুল্য এস্থলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে কীট ও তদাশ্রিত বৃক্ষের অংশটী বহ্বায়তন বিশিষ্ট করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নূতন কীট সকল প্রসূত হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা-দের অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড বা হুল বৃক্ষের কোমল অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া, রস শোষণ করিতে থাকে। এই উপায়ে কীটশিশুসকল সবল ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তাহারাই আবার সহস্র সহস্র জাব-কীটের জননী হইয়া

দাঁড়ায়। আমরা যে বহু চেষ্টাতেও উদ্যানবৃক্ষস্থ জাব-কীটের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারি না,—তাহার কারণ ইহাদের এই অদ্ভুত বংশবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রীষ্ম বা বসন্ত কালের একটী কীটের কন্যা দৌহিত্রী ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া তাহার পরিবারস্থ কীট সংখ্যা কত হইয়া পড়ে, তাহা অনুমান করাও কঠিন,—বলা বাহুল্য জাব-কীটের সন্তানপ্রাচুর্য্য ইহাদের শরীর পোষক খাদ্যের প্রাচুর্য্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

জীব স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষত রাখিবার জন্য যতই প্রয়াস করে, তাহার আদিম সংস্কার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির ততই উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। জীব-বিজ্ঞানের এই চিরন্তন সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নিকৃষ্ট জীবেও দেখা গিয়া থাকে। প্রচুর আহার্য্য ও জীবন নির্ব্বাহের অপরাপর প্রয়োজনীয় পদার্থ সম্মুখে আজীবন সজ্জীকৃত পাইলে অধ্যবসায় ও উদ্যমশীল অতি উন্নত জীবও দুই এক পুরুষের মধ্যে সংসার সংগ্রামের সম্পূর্ণ অনুপযোগী অতি নিকৃষ্ট অলস প্রাণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। তৃতীয় চিত্রের ঊর্দ্ধাংশস্থ কীটটী সেই ডিম্বপ্রসূত একটী প্রথম বাসন্তী কীটের প্রতিকৃতি, এটী উদ্যমশীল কার্য্যক্ষম পিতামাতার উপযুক্ত বংশধর—কাজেই ইহার প্রাথমিক জীবনে উচ্চ শ্রেণীর পতঙ্গোচিত নানা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়—আবার ডিম্ব হইতে বহির্গত হওয়ার পর সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্ট সপক্ষ কীটে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত সময় মধ্যে রেশম কীটের ন্যায় ইহার দেহের নানা পরিবর্ত্তনও দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু প্রচুর আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া পতঙ্গ সুলভ গুণাবলীর প্রয়োগাভাবে ইহা ক্রমেই অপকৃষ্ট জীবে পরিণত হইয়া পড়ে। ইহাদেরই সন্তানাদি য ক্রমে আরও অবনতি প্রাপ্ত হইয়া শেষে সন্তানোৎপাদন ব্যাপারে উদ্ভিদ্ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষিত করিবার জন্য পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন অসংখ্যক অলস সন্তান প্রসব করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্মের মধ্যকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময় মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সকল কুমারী-র্ভজাত পিতৃহীন স্ত্রী জাব-কীট উৎপন্ন হয় তাহাদের আর কটা বিশেষত্ব আছে,—ইহাদের অধিকাংশেরই পক্ষ কে না। জন্মক্ষণেই তাহারা জাতস্থানে অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া বৃক্ষের রস পান করিতে থাকে, তা'র পর কয়েক সহস্র সন্তান প্রসব করিয়া, যথা সময়ে দেহত্যাগ করে,—কাজেই ইহাদের পক্ষ ব্যবহারেও বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। এই সহস্র সহস্র কীটের মধ্যে যে কয়েকটী পক্ষবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনাগমন করিয়া উদ্যানস্থ বৃক্ষ মাত্রেই জাব-কীটের উপনিবেশ স্থাপন তাহাদের জীবনের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। ৪র্থ চিত্রে একটী পক্ষ বিশিষ্ট পুষ্ট জাবকীটেরপ্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল। ইহার শরীরের পশ্চা

দর্দ্ধের প্রায় প্রান্তদেশে যে দুইটী শৃঙ্গের ন্যায় অংশ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই সেই পূর্ব্বোক্ত পিপীলিকা-ভক্ষ্য দুগ্ধ বা মধুর ক্ষরণ পথ। চিত্রের ঊর্দ্ধাংশে কীট শরীরের যে অংশটী বহ্বায়তন বিশিষ্ট করিয়া অঙ্কিত আছে, সেটী জাব-কীটের রস শোষণ যন্ত্র বা শুণ্ড। ইহাতে একটী নলাকার কোষমধ্যে চারিটি সূক্ষ্মাগ্র নল আবদ্ধ থাকে। জাব-কীটসকল বৃক্ষত্বক্‌ভেদোপযোগী শোষক দ্বারা বৃক্ষরস পান করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মধুক্ষরণ নলিকাযুগল ও রস-শোষক শুণ্ড কেবল চিত্র লিখিত সপক্ষ কীটেই যে সজ্জীকৃত থাকে, এ কথা পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিবেন না,—এই উভয় যন্ত্র জাব-কীট মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা একখানি স্থূল-মধ্য কাচখণ্ড (magnifying glass) দ্বারা বৃক্ষত্বক্‌লগ্ন জাব কীট পরীক্ষা করিলে,সদ্যজাত কীট রস শোষণ করিয়া কি প্রকারে অতি অল্পকাল মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাগণ তাহা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

প্রকৃতির শাসন পদ্ধতিতে, আমরা প্রতিপদেই আশ্চর্য্য

লক্ষণ দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবী কোন এক জাতীয় সন্তানের প্রতি অসম্ভাবিত স্নেহ বর্ষণ করিয়া, অপর সন্তান-গুলির জীবন কণ্টকিত করিতেছেন, এ প্রকার ঘটনার উদাহরণ সংসারে অতীব দুর্লভ। প্রকৃতি, যে প্রাণীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যত অনুকূল, তাহাদের অবাধ অস্তিত্বের পক্ষে তিনি ততই প্রতিকূল। প্রকৃতির রাজ্যে যে জাতির বৃদ্ধির যত সুব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ক্ষয়ের জন্য সেই প্রকার সহস্র নৈসর্গিক উপায় দেখা গিয়া থাকে। জাব-কীটের জীবনেতিহাসে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই,—প্রকৃতিদেবী একটী ক্ষুদ্র কীট হইতে কোটী কোটী কীটের উৎপত্তির সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। যাহাতে এই ক্রমবর্দ্ধমান অসংখ্যক কীট শত শত বলবান্ শত্রুর কবলিত হইয়া, সংসারে আবর্জ্জনার হ্রাস করিতে পারে, স্নেহময়ী প্রকৃতি তাহারও ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। জাব-কীটের অত্যাচারে উত্যক্ত উদ্যানপালকগণ কীটাধ্যুষিত বৃক্ষে তাম্রকূটবারি সিঞ্চনাদি উপায়ে যে পরিমাণ কীট নাশ করিতে সমর্থ হয়,—প্রাকৃতিক শত্রু দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক কীট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কয়েক জাতীয় পতঙ্গ ও কীট জাব-কীটের পরম শত্রু,—তন্মধ্যে এক উৎকুন জাতীয় পরভুকের (Parasite) সহিত ইহাদের জাত-শত্রুতা দেখা যায়। এই পরভুক্ গুলির আসন্নপ্রসবা মাতা কোন প্রকারে জাব-কীটের শরীরাভ্যন্তরে ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। তা'রপর যথা সময়ে ডিম্বগুলি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ উৎপন্ন হইয়া, আশ্রয়-দাতা কীটের দেহ ক্রমশঃ উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করে। ৫ম চিত্রের নিম্নাংশে এক পরভুকপূর্ণ স্ফীতোদর জাব-কীটের প্রতিকৃতি অঙ্কিত
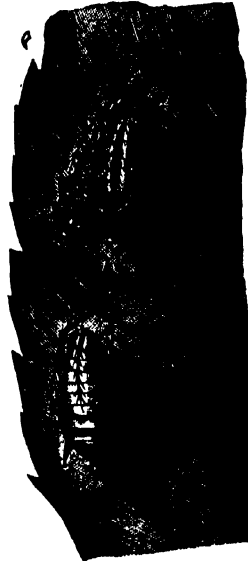
হইল, এবং তাহারই ঊর্দ্ধাংশে সেই কীটেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম চিত্রিত আছে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন, ইহাতে পরভুক্‌সকল হতভাগ্য জাব-কীটের দেহাভ্যন্তরীণ সমগ্র কোমলাংশ ভক্ষণ করিয়া, তন্মধ্যে একটী মৃত জাব-কীটের অন্তঃসার শূন্য দেহাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আকাশের আকস্মিক অবস্থা পরিবর্ত্তন, বারি ও তুষারপাত এবং ক্ষুদ্র বোল্‌তা জাতীয় কয়েকটী পতঙ্গ জাবকীটের পরম শত্রু। ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া প্রজাপতি ও বোল্‌তা প্রভৃতির যে প্রকার আকার হয় সেই আকারেই এক বোল্‌তা-শিশু কি প্রকারে জাব-কীট ভক্ষণ করে—৬ষ্ঠ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক পাঠিকা-গণ তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এই বোল্‌তা শিশুগুলি এত ভোজন-প্রিয়, যে ইহাদের প্রত্যেক ঘণ্টায় ১২০টী জাব-কীট অনায়াসে উদরসাৎ ক-রিতে পারে। দেহের পশ্চাৎস্থিত পূর্ব্ব-বর্ণিত নলদ্বয় সাহায্যে ইহারা কি প্রকা[রে] মধু-ক্ষরণ করে, চিত্রের নিম্নাংশে তাহাও দৃষ্ট হইবে।

এখন দেখা যাউক পিপীলিকার প্রিয় ভক্ষ্য কীট-শরী[র]জ সেই মধুর ব্যাপারটা কি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আ[মাদের] বৃক্ষাদি জাব-কীট দ্বারা অধ্যুষিত হইলে তাহার পত্রকাণ্ড[াদি]তে যে এক প্রকার নির্য্যাসবৎ রসে লিপ্ত দেখা যায়, তাহা সেই কীট-শরীরজ মধু। এই মধুই প্রথমতঃ প্রাণিত[ত্ত্ব]বিদ্‌গণের দৃষ্টি ক্ষুদ্র জাব কীটের প্রতি আকর্ষণ করিয়া[]ছিল, এবং ইহারই উৎপত্তি স্থির করিতে গিয়া তাঁহারা এ[ই] অদ্ভুত কীটের অদ্ভুত জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—জাব-কীটের মধুক্ষরণ ব্যাপার, গাভী[র] দুগ্ধ দানের ন্যায় নিঃস্বার্থ কার্য্য নয়, আপনার শারীরিক স্বা[স্থ্য] বিধানের জন্যই কীট সকল মধুক্ষরণ করিয়া থাকে। পাঠ[ক]

পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, প্রাণিদিগের শরীর পোষণের জন্য নাইট্রোজানের বিশেষ আবশ্যক ;—এইজন্য মৎস্য, মাংস, ডাল ইত্যাদি নাইট্রোজানবহুল খাদ্য জীব শরীরের বিশেষ পুষ্টিকর। জাব-কীটগণের এক মাত্র খাদ্য বৃক্ষরসে উক্ত নাইট্রোজান অতি অল্পই মিশ্রিত থাকে—ইহাতে শর্করার উপাদান অঙ্গার (Carbon) এবং জলজানেরই (Hydrogen) প্রাচুর্য্য দেখা যায়। জাব-কীটসকল ভুক্ত খাদ্য হইতে শরীর পোষণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী শর্করা নিষ্কাশিত করিয়া, সেই অত্যল্প নাইট্রোজানকে কার্য্যকরী করিবার জন্য, উদ্বৃত্ত অঙ্গার ও উদজানকে মধুর আকারে শরীর হইতে নির্গত করে। ইহাই সেই পিপীলিকাভোগ্য মধু।

কীট-শরীর-নির্গত উক্ত পদার্থটী শর্করা-বহুল ও আঠাল বলিয়া, ইহা পত্রাদি বা বৃক্ষত্বকে ক্ষরিত হইলে, কীটদিগেরই অসুবিধাকর হইবে ভাবিয়া ইহারা সহসা পত্রাদিতে ক্ষরণ করে না,—মধুপ্রিয় পিপীলিকাদির সমাগম প্রতীক্ষা করিতে থাকে। পিপীলিকাগণ মধুদোহন ব্যাপারে বেশ অভ্যস্ত। যথাসময়ে জাব-কীটদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাহারা মধুনিঃসারক নলদ্বয়ের নিকটস্থ কীটদেহ ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতে থাকে। ইহাতে কীটসকল পিপীলিকার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া মধুক্ষরণ করিতে আরম্ভ করে এবং পিপীলিকাগণ আকণ্ঠ মধুপান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে থাকে। ৭ম চিত্রে পিপীলিকার মধুদোহন কার্য্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল।

যথেচ্ছা মধুপানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ...বিহারী পিপীলিকা- ... এক অদ্ভুত ...য় অবলম্বন করিয়া ...ক। আমরা আব- ...মত দুগ্ধপ্রাপ্তির ...যে প্রকার গো- ...ন করিয়া থাকি, ...পীলিকাগণও বাস্ত- ...ই তদ্রূপ জাবকীট ...ন করিয়া থাকে। ...কগুলি পিপীলিকা ... হইয়া—এক দল কীটকে আয়ত্তাধীন রাখে এবং তজ্জাত মধু স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। ইহারা এত সতর্কভাবে সেই জাব-কীটদিগের প্রহরীর কার্য্য করে যে, একটী কীটও দলভ্রষ্ট হইতে পারে না,—কীট লইয়া দুই দল পিপীলিকার মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া থাকে। জগৎ বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ সার্ জন্ লবক্ (Lubbock) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—জাতি অনুসারে পিপীলিকারা একত্র হইয়া এক এক নির্দ্দিষ্ট জাতীয় জাব-কীট পালন করিতে ভালবাসে। উদ্যানবিহারী কৃষ্ণ পিপীলিকাগণ, পত্র ও প্রশাখাবলম্বী জাব কীটের কিছু পক্ষপাতী, আবার হরিদ্রা ও বাদামী রঙ্গের পিপীলিকাগণ যথাক্রমে মূল ও ত্বক্ বিহারী জাব-কীট পালনে ব্যস্ত থাকে।
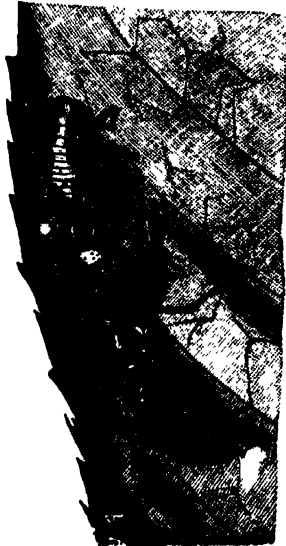
পিপীলিকাগণ এত কীট-মধুপ্রিয় যে ভবিষ্যতে কাহার ভাগ্যে কতগুলি জাব-কীট আসিয়া জুটিবে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও তাহারা থাকিতে চায় না। শীতাগমের পূর্ব্বে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পত্রাঙ্কুরে জাব কীটের অণ্ড সঞ্চিত হইলেই, পিপীলিকাগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিম্বগুলি অধিকার করিয়া ফেলে এবং সমগ্র শীতকাল সেগুলিকে নিরাপদে রাখিয়া বসন্তাগমমাত্রেই উষ্ণতর সৌরকিরণ সংস্পর্শে সেগুলি হইতে যাহাতে শীঘ্র কীট বহির্গত হইতে পারে তাহারও চেষ্টা দেখিতে থাকে। পিপীলিকার উচ্চ বুদ্ধির পরিচায়ক এই সকল কৌশল এবং দূর ভবিষ্যৎ-জ্ঞান বড়ই বিস্ময়কর। গো, মেষ, মহিষ ও অশ্বাদি কয়েকটী মাত্র জীবকে বশীভূত করিয়া মানুষ গার্হস্থ্য কার্য্যের সুবিধা বিধান করিতেছে—অধ্যাপক লবক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পিপীলিকাগণ অনূ্ন ৫৮৪ জাতীয় ক্ষুদ্র পতঙ্গ ও কীটাদিকে বশীভূত করিয়া তাহাদের এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

জাব কীটগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে রসশোষণ, মধুদান ও সন্তানপ্রসব করিয়া ফাল্গুন হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অতিবাহন করে। তার পর অগ্রহায়ণ মাস উপস্থিত হইলেই ইহাদের প্রসূত তৎকালিক সন্তানগুলির একটা বিশেষত্ব দেখা গিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গ্রীষ্মোৎপন্ন জাব-কীটের মধ্যে পুরুষ কীট প্রায়ই দেখা যায় না, কীটমাত্রেই স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াই আবার পূর্ণাবয়বসম্পন্ন স্ত্রীকীট প্রসব করিতে থাকে। কিন্তু অগ্রহায়ণমাসজাত কীটে এই

পদ্ধতি আর দেখা যায় না,—এই সময়ে প্রসূত কীটগুলির মধ্যে কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট পুরুষ ও কতক পক্ষহীন স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পক্ষবিশিষ্ট পুরুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, নানা স্থানে যথেচ্ছা উড়িয়া স্বীয় মনোমত পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লয়, এবং কিছুকাল মহাসুখে বিচরণ করিয়া গর্ভিণী পত্নী রাখিয়া দেহত্যাগ করে। স্নেহময়ী গর্ভিণী কীট তার পর সেই প্রথমোক্ত প্রথায় শীতত্রাণোপযোগী পত্রাঙ্কুরে ভবিষ্য সন্তানের বহু অণ্ড সঞ্চিত রাখিতে আরম্ভ করে, এবং অল্প দিন মধ্যে কঠোর মাতৃকর্ত্তব্যে অবসন্ন হইয়া পতির পথ অনুসরণ করে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

স্বর্গীয় কালীকান্ত।

সে আজ ২৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকাতে ডিটেক্‌টীভ পোলিষ ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর ও পেন্‌শান্‌ গ্রহণ করিয়া কাশীধাম যান, এবং জীবনের অবশিষ্ট কুড়ি বৎসরকাল সেই স্থানেই অতিবাহিত করেন। তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, সেও আজ তিন বৎসর। যদিও তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ এ দেশ ছাড়া ছিলেন, এবং এই ২৩ বৎসরের মধ্যে যদিও এ দেশের কেহ তাঁহাকে দেখেন নাই, তথাপি তাঁহার সেই সুনাম, সেই সাধু চরিত্রের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এ অঞ্চলের কি ছোট, কি বড়, কি ভদ্র, কি অভদ্র, স্ত্রী পুরুষ সকলের নিকটই "কালী দারোগা" এই নামটী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যুবকগণ ডিটেক্‌টীভের গল্পে, প্রৌঢ়গণ পোলিষ চরিত্র সমালোচনায়, বৃদ্ধগণ সাধুতার দৃষ্টান্তে সর্ব্বদাই কালীকান্তের নাম উল্লেখ করেন। ফলতঃ পোলিষ বিভাগে কর্ম্ম করিয়াও সাধু চরিত্র গুণে কালীকান্ত যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটে। আজ আমরা এই মহাত্মার আদর্শ জীবন সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গাব্দ ১২২০ সনের ১৪ই আশ্বিন তারিখে বিক্রমপুর আকসা গ্রামে কালীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺রামজয় চক্রবর্ত্তী। রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মাধবচন্দ্র, কমলাকান্ত, রঘুনাথ, কালীকান্ত ও স্বরূপ চন্দ্র এই পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সাধুতা, পরোপকার, নিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ গুণে জনসাধারণ লোকে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিত। ইঁহাদের পূর্ব্ব নি[illegible]

৺কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী

মুরসিদাবাদ। নবাব আলীবর্দীখাঁর সময়ে ইঁহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এ দেশে আগমন করেন। কতক ব্রহ্মোত্তর জমী পাইয়া ও বিবাহ করিয়া তিনি এ দেশে অবস্থান করেন। সেই অবধি ইঁহাদের বাসস্থান এ দেশে। রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। যে সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমি তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল, একবার গৃহদাহে গৃহস্থিত দ্রব্য সামগ্রী ও জমীর দলীলাদি তাবৎ একবারে নষ্ট হয়। তাহাতে অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তর জমী হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি অতি কষ্টে কাল যাপন করেন।

তৎকালীক প্রথানুসারে কালীকান্ত ভ্রাতৃগণ সহিত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। লেখা পড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন তাহা সম্পন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব দেখিয়া গ্রামবাসী প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ, কালীকান্ত সময়ে যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবে, এই অনুমান করিয়াছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালার পড়া শুনা সমাপন করিয়া কালীকান্ত ঢাকাতে আসেন। বাটীর অবস্থা শোচনীয়, ঢাকাতে সাহায্যকারী আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেহই নাই; এইরূপ অবস্থায় ঢাকা আসিয়া তিনি প্রথমে অতিশয় কষ্টে পতিত হন। এই সময় বিক্রমপুর বেতকানিবাসী ডিপুটী কালেক্টার হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় ঢাকাতে ছিলেন। তিনি বহুতর দরিদ্র ভদ্র সন্তানের প্রতিপালন করিতেন। কালীকান্তের দুরাবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজ বাসায় আশ্রয় দিলেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। ডিপুটী বাবুর বাসায় থাকিয়া কালীকান্ত পার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ইংরেজী ভাষার তাদৃশ আদর ছিল না; কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র ইংরেজী শিক্ষা করিবার সুবিধাও ছিল না। রাজকীয় তাবৎ কার্য্য পার্সী ভাষাতেই সম্পাদিত হইত।

১২৪৪ সনে গবর্ণমেণ্ট সেটল্‌মেণ্ট আফিসে ৫৲ টাকা বেতনে কালীকান্ত প্রথমে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং অল্পকাল পরেই ১০৲ টাকা বেতনে মহাফেজ হ'ন। কার্য্যতৎপরতা ও সাধুতা তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই ছিল। এই সমস্ত গুণের কথা অবগত হইয়া মাজিষ্ট্রেট্ আর্-এবার্-ক্রুফ্‌ট্ সাহেব কালীকান্তকে ফৌজদারীর নায়েব নাজীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ১০০৲ টাকা বেতনে জিলার প্রথম শ্রেণীর দারোগা পদে কালীকান্ত উন্নতি লাভ করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময়ের পোলিষ কর্ম্মচারীদিগকে বর্ত্তমান সময়ের লোকে "সে কেলে পোলিষ কর্ম্মচারী" বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবেই সে সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার অনেক পার্থক্য হইয়াছে। সে সময় পোলিষের উৎকোচ গ্রহণ ততটা নিন্দার বিষয় ছিল না। তখন এত সংবাদ পত্রের ছড়াছড়ি ছিল না, কাজেই পোলিষ একটা অন্যায় কার্য্য করিলেও তাহা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কোন লোকের বাটীতে তদন্ত উপলক্ষে দারোগা উপস্থিত হইলে সে বাটীতে ধুমধাম পড়িয়া যাইত। চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদির দ্বারা দারোগা বাবুর রসনা তৃপ্তির জন্য গৃহস্বামীকে ব্যস্ত হইতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে ভোজন দক্ষিণাটার ব্যবস্থাও উন্নত প্রণালীর ছিল। এখনকার মত সংক্ষেপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না। তবে এখন যেমন কোন কোন কর্ম্মচারী বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া হস্তকে বিশেষরূপে কলঙ্কিত করেন, পরিশেষে প্রকৃত সাহায্যের সময় কোন পক্ষেরই সাহায্য করিতে সাহসী হন না, নিরপেক্ষ সাক্ষী গোপালটীর মত থাকেন, তখন প্রায় এইরূপ ছিল না। দারোগা-পূজার বন্দোবস্ত কঠিন ছিল বটে, কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে একবার পূজা করিতে পারিলেই পূজকের কিছু না কিছু উপকার হইত। মফঃস্বলে দারোগার এতাদৃশ প্রতাপ ছিল, লোকে জানিত যে দারোগাই এক মাত্র হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। বোধ হয় এই জন্যই একটী বৃদ্ধা স্ত্রী খুনি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত তাহার পুত্রের মুক্তি সংবাদ শুনিয়া জজ্ সাহেবকে দারোগা হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। কোন কোন কর্ম্মচারীর এইরূপ নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং ঐ পক্ষ হইতে যে কিছু পূজা গ্রহণ করিয়া সে দিকে সাহায্য করিতেন। ন্যায় চক্ষে যদিও ইঁহারা দোষী, কিন্তু প্রলোভন-পূর্ণ পোলিষ বিভাগে ইঁহারা যে অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান্ ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ উৎকোচগ্রাহী হইলেও ইঁহাদের দ্বারা সত্যের অপলাপ ঘটে নাই।

কালীকান্তের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। ন্যায় পক্ষই হউক কি অন্যায় পক্ষই হউক, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা তিনি মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। তদন্ত উপলক্ষে মফঃস্বলে কাহারও বাটীতে উপস্থিত হইতে হইলে তিনি আহার্য্য তাবৎ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যাইতেন। মোকদ্দমা সংসৃষ্ট কাহারও বাটীতে পান তামাক খাওয়াতেও তাঁহার সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল। ক্রমে জন সাধারণের মধ্যে এই সাধু ব্যবহার ও নিরপেক্ষ তদন্তের বিষয় এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, তদন্তের ভার কালীকান্তকে দিবার জন্য উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের নিকট লোকে দরখাস্ত করিত।

কালীকান্তের চরিত্রের বিষয় উর্দ্ধতণ কর্ম্মচারিগণও অবগত ছিলেন। লএল্, এফ্ বি-সিম্‌সন, আর-এবার-ক্রম্বি, রামপের্নী, এ-এবার-ক্রম্বি, জর্জ্জ গ্রেহাম, পছি, চার্লস্ প্রভৃতি কমিশনার, জজ্, মাজিষ্ট্রেট্ সকলেই কালীকান্তকে সাধু ও প্রধান ডিটেক্টিভ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতেন।

লেপ্‌ট্যানেণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রে মহোদয় যখন পরিদর্শনার্থে ঢাকাতে আগমন করেন, সেই সময় কালীকান্তের কৃতকার্য্যতা ও সাধু চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে ঢাকা জিলার ডিটেক্‌টিভ পুলিষ ইন্‌স্‌পেক্টার পদে উন্নীত করিয়া যান। তখন বেতন ২০০৲ টাকা হয়। সেই সময় হইতে কালীকান্তের আর পোলিষের পোষাক পরিধান করিতে হয় নাই ও সাধারণ কোন তদন্তে যাইতে হয় নাই। বিশেষ বিশেষ সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে চোগা, চাপকান, শামলা ইত্যাদি ব্যবহার ভিন্ন সর্ব্বদা ধুতি চাদর ব্যবহার করিয়া কার্য্য করিতে হইত। খুনি, ডাকাতি, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতি মোকদ্দমা অথবা যে সমস্ত মোকদ্দমার তদন্ত অপর কোন কর্ম্মচারী দ্বারা নিষ্পত্তি হইত না, সেই সমস্ত কঠিন কঠিন স্থলে যাইতে হইত।

মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার শক্তিও কালীকান্তের যথেষ্ট ছিল। কৃতকার্য্যতার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কখন ৫০৲ টাকা, কখন ১০০৲ টাকা, কখন ৫০০৲ টাকা এইরূপ পুরস্কার তিনি বহুবার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফকির, বৈষ্ণব, চাষা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া নির্ণয় করিতেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলেও এমত কয়েকটী ঘটনার অবতারণা করিতে হয় যাহাতে কয়েকটী ডিটেক্‌টীভের সুন্দর গল্প হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে স্থানাভাবে পাঠকবর্গকে এই সমস্ত গল্প আমরা উপহার দিতে সমর্থ হইলাম না।

তখন ছোট বড় সকলেই অবগত ছিলেন যে, কালীকান্ত যে মত প্রকাশ করিবেন, জিলার কমিশনার, জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলেই তাহাতে দ্বিধা না করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এইজন্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেই কালীকান্তকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ধনিগণ,—হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতেন। ধন্য কালীকান্তের হৃদয়ের বল! ধন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের নির্লোভতা! যদি তিনি এই সাধুতার দৃষ্টান্ত না দেখাইতেন, তবে তাঁহার পুত্র তরণীকান্তকে ধনী করিয়া যাইতে পারিতেন বটে, উচ্চ অট্টালিকাবাসী লক্ষপতি করিয়া যাইতে পারিতেন বটে, কিন্তু আজও কি লোকে "কালীকান্ত" নাম লইত? আজও কি লোকে তাঁহার জন্য কাঁদিত? তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তখন ভিক্ষুকেরা পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে গান করিত-

* * * *

"যিনি হাজারে হাজার রিস্‌ফৎ কতবার
ঠেলিয়া ফেলিলেন পায়॥

* * * *

দেখ জঘন্য নগণ্য আমলা-কত জন
ঘুস খেয়ে সদা কাজ করে।
বাবু পুরীষ সমান এই সব জ্ঞান
করিতেন নিরন্তরে॥

* * * *

দেখ দশ মুদ্রা বেতনে কত অভাজনে
পাকা দালান গড়িতেছে।
বাবু এত মোশরায়* হেরি সমুদায়
যেমনি প্রায় তেমনি আছে॥"

কালীকান্ত চরিত্রবান্ লোক ছিলেন। চরিত্রদো[ষ] তাঁহার শরীরে এক দিনের জন্যও স্পর্শ করে নাই। অহ[ঙ্]কার কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। জীবনে কখন[ও] কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। কোন গুরুতর অপ[...]

রাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিও যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেন। ভারতেশ্বরীর রাজ্যে শত দোষী ব্যক্তি অব্যাহতি পাউক; কিন্তু একজন নির্দ্দোষও যেন দণ্ডিত না হয়, এই ভাব মনে রাখিয়া তিনি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। এইজন্য ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ঢাকার নবাব আব্দুল গনি কে, সি, এস্, আই, ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ও এতদ্দেশীয় যাবতীয় জমীদারের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

দরিদ্র দীন দুঃখীর প্রতি কালীকান্তের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। কোন দরিদ্র সন্তান কার্য্যপ্রার্থী কি সাহায্যার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিলে তিনি পার্য্যমাণে কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের নিকট অনুরোধ করিয়া কার্য্যের সংস্থান করিয়া দিতেন। পাঠার্থী অনেক দরিদ্র ভদ্র সন্তানকে বাসায় রাখিয়া ভরণ পোষণ করিতেন। এইজন্য জীবনে কিছু মাত্র অর্থ সংস্থান করেন নাই এবং প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা লোকের উপকার করাই পরম ধর্ম্ম মনে করিতেন। তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই পোলিষ বিভাগে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ও কেহ কেহ পোলিষ ইন্‌স্পেক্টার পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

১২৮৫ সনে কালীকান্ত ৪১ বৎসর কার্য্য করিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর ও পেন্‌শান্ গ্রহণ করেন। অনেক দিবস পূর্ব্ব হইতেই অবসর গ্রহণ করিবার মনন করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন। কালীকান্ত পেন্‌শান্ গ্রহণ করিবে, এই কথা শুনিলে মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত কাঁদিতেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে, পেন্‌শান্ লইলে কালীকান্ত আর বেশী দিন বাঁচিবে না। এইজন্য মাতাঠাকুরাণী যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন, সে পর্য্যন্ত কালীকান্ত পেন্‌শান্ লওয়ার মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী ১০৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিলে পর তিনি পেন্‌শান্ গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আর এদেশে বেশী দিন থাকেন নাই। তাঁহার পরিচিত বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী, তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের জমীদারীর ম্যানেজার হইয়া থাকিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালীকান্ত তাহা স্বীকার করেন নাই। বৈষয়িক দুশ্চিন্তা, সাংসারিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমার্থ চিন্তার জন্য, পেন্‌শান্ নেওয়ার কয়েক মাস পরেই, কাশীধামে চলিয়া যান।

জীবনের অবশিষ্ট ২০ বৎসর কাল কাশীতেই অতিবাহিত করেন। এই ২০ বৎসরের মধ্যে তিনি এ দেশে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বহু লোকের অনুরোধে কয়েক দিবসের জন্য একবার মাত্র আসিয়াছিলেন, আর আসেন নাই। জীবনের অবশিষ্ট কাল অত্যন্ত নিরীহ ভাবে যাপন করিতেন। আহারাদি বেশ ভূষা যৎসামান্য, শরীর ধারণোপযোগী মাত্র ছিল। এক মাত্র পুত্র তরণীকান্ত তখন নাবালক। সংসারে উপার্জ্জনশীল আর কেহ ছিল না। তিনি পেন্‌শানের টাকার অর্দ্ধাংশ ঢাকাতে সাংসারিক খরচ বাবদ পাঠাইতেন। অপর অর্দ্ধাংশ হইতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদানোপযোগী যৎসামান্য রাখিয়া অবশিষ্ট দীন দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে অথবা অন্য কোন কারণে এতদ্দেশীয় লোক কাশীধাম গেলে প্রায় সকলেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতেন। তিনিও দেশীয় লোক দেখিলে অত্যন্ত সুখী হইতেন। ঐ স্থানের অবস্থা ও লোকের রীতি নীতি অবগত করাইয়া ও তাঁহাদের বাসের জন্য নিরাপদ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। সময় সময় এতদ্দেশীয় কোন কোন লোক কাশীধামে গুণ্ডার হাতে পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন। তিনি জানিতে পারিয়া, ঐরূপ অনেক লোককে এই ভীষণ বিপদ হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। তত্রত্য পোলিষ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ সকলেই কালীকান্তকে চিনিতেন এবং বেরোয়া পোলিষ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। নিরপেক্ষ ও নির্লোভ বলিয়া কাশীধামেও তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল।

কালীকান্ত জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। শৈশবে দরিদ্রতা, পিতৃবিয়োগ, ক্রমে ভ্রাতৃগণের অভাব, ক্রমান্বয়ে দুই বিবাহ ও দুই স্ত্রীর অভাব, অকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগ, দৌহিত্র বিয়োগ, কনিষ্ঠা কন্যা ও দৌহিত্রীর অকাল বৈধব্য ইত্যাদির জন্য তিনি শোকে জর্জ্জরিত ছিলেন। বৈষয়িক জীবনেও সুখী হইতে পারেন নাই, কঠিন কঠিন তদন্ত উপলক্ষে সর্ব্বদাই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ...

হইত। যাঁহার পরোপকারের বিষয় মনে করিয়া অসংখ্য লোকে যাঁহার নাম প্রাতে স্মরণ করে, যাঁহার নির্লোভতা ও সাধু ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া লোকে যাঁহার জন্য এখনও ক্রন্দন করে, ভগবান তাঁহাকে কেন সুখী করিলেন না, তিনিই জানেন।

১৩০৫ সনের ১৬ই বৈশাখে কালীকান্ত ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গধাম গমন করেন। দুই দিবস পূর্ব্বে সামান্য জ্বর হয়, দ্বিতীয় দিবস জ্বর ভোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যে ফটো তোলা হইয়াছিল, সেই প্রতিমূর্ত্তি এখানে দেওয়া গেল।

অভাগিনী।

১

কেন অন্ধকার হইল সংসার?
আকাশে ছায়িল জলদ-জাল।
জনক চিন্তিত, জননী শঙ্কিত,
আইল আমার বিবাহ-কাল।

বৃদ্ধা মাতামহী গর্জ্জে যেন অহি,
নয়নে নয়নে সতত রাখে;
নদীর কিনারে বাগানের ধারে
কে কোথায় যদি লুকায়ে থাকে।

***

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বরষা বিষম,
পলে পলে যেন আকাশ গলে।
চপলা ছলিছে, কুলিশ খলিছে,
দাপটে ঝাপটে ঝটিকা চলে।

দিক আকুলিয়া মেঘ ঘনাইয়া,
ভিজে দাঁড়াইয়া তরুর সারি।
কলসী লইয়া বন পথ দিয়া
ধীরে ধীরে যাই আনিতে বারি।

ছি ছি ছি, কুমার, কি রীতি তোমার,
আমি তব ক্ষুদ্র প্রজার মেয়ে।
এমন করিয়া আঁচল ধরিয়া

"কি ভয়, সুন্দরী, এই পথ ধরি
চল দেশান্তরে পলায়ে যাই—"
ছাড়, কাজে যাব, এখনি চেঁচাব,
ছি ছি ছি তোমার সরম্ নাই!

***

মেঘ পরিষ্কার, শুভ্র চারি ধার,
নীরব নিসুপ্তি গভীর যাম।
মরি ভয়ে লাজে, কেন বাঁশী বাজে
শ্বসিয়া শ্বসিয়া আমার নাম!

দূরে পিকরব, শেফালি-সৌরভ,
জোছনা হাসিছে আকাশময়।
জাগে যদি আই কি বলিবে ছাই,
ছি ছি অপমানে নাহি কি ভয়?

"কৌটা ভরপুর এনেছি সিন্দূর—"
কি বিষম জ্বালা হইল মোর!
"হরিণী-নয়না, তুমি তো জান না
কত করী-বল নয়নে তোর!

"তোমারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া
ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন আছে—"
যাও, ঘরে যাও, ওকি—যেতে দাও,
কালি জানাইব রাজার কাছে।

***

অমা-অন্ধকার, স্তব্ধ চারি ধার,
ধরণী আবৃত কুয়াসা-বাসে;
আকাশ মলিন, ঝরিছে তুহিন,
শিশু ভাই দুটি ঘুমায় পাশে।

বহে হুহু ঘন তীক্ষ্ণ পবন,
রোগে শীতে আই বিকল-প্রায়;
রুদ্ধ বাতায়নে সেই ক্ষণে ক্ষণে
মৃদু করাঘাত—ছি ছি কি দায়!

কেন এত ছল— করিবে পাগল,
দেশে কি থাকিতে দিবে না ছাই?
"রোষ পরিহরি দেখ লো সুন্দরি,
মরিবার মম বিলম্ব নাই।"

বল, কিবা চাও? না না, ঘরে যাও,
পাগলের মত বকিছ কেন?
দিব্য দেবতার— এই পথে আর
কভু যদি এসো, মরিব জেনো।

***

ফুলে ফুলময় দিক সমুদয়,
মধুর মলয় বহিছে ধীরে;
শির্ শির্ শির্ ঝরিছে শিশির,
কালো মেঘ আলো শিখরী শিরে।

ভ্রমর-গুঞ্জন, খঞ্জন-নর্ত্তন,
নবীন তপন আরক্ত আঁখি;
চারিদিকে মুহু কুহু কুহু কুহু,
নারী-কুলমান গরবে রাখি।

বনে বনে বুলি, ফুল তুলি তুলি
গাঁথিয়া গাঁথিয়া কবরী বেড়ি;
বসি নদী-কূলে ভুলে ভুলে ভুলে
আপনার ছায়া আপনি হেরি।

লতার দোলনে দুলি আনমনে,
কভু পথপানে চাহিয়া থাকি;
চেয়ে চেয়ে চেয়ে, গেয়ে গেয়ে গেয়ে
কে জানে কখন সজল আঁখি!

***

দীর্ঘ অতি দিন, তরু পুষ্পহীন,
নীরস বিবশ লতিকা-কায়;
পিক ভগ্নস্বর, অরণ্য ধূসর,
শ্বসিয়া দহিয়া বহিছে বায়।

সাদা মেঘরাশ ভরিছে আকাশ,
তপন-কিরণ প্রখর অতি;
হরিণী শ্বসিছে, শকুন ভাসিছে,
বহিছে তটিনী অলস-গতি।

করে রণ শেষ! এসগো, প্রাণেশ,
কত ছলে আর আপনে ছলি!
মরমে মরিয়া কাঁদি গুমরিয়া
কারে ডাক ছেড়ে এ জ্বালা বলি!

এত বুঝ রণ, শাসন পালন,
রমণীর মন বুঝ না নাথ!
মুখে বলে যাক, প্রাণে বলে থাক,
আকুল আহ্বান ভ্রুকুটি-সাথ!

২

আইল বরষা চাতকী ভরসা,
ছুটিল তটিনী গভীর রোল।
জলদ জমিছে, ঝরিছে, থামিছে,
ফিরিছে কুমার পড়িল গোল।

ফিরিছে বিজয়ী নববধূ লয়ি,
গলে মুক্তামালা, কিরীট শিরে।
কাতারে কাতার ঘেরিয়া দুধার
গজ বাজি সেনা চলিছে ধীরে।

সাজিয়া সুবেশে সবে দ্বারদেশে,
কেহ বা মঙ্গল কলস ল'য়ে;
বাজে শঙ্খ ঘন, পুষ্প বরিষণ,
কেহ বা দেখিছে অবাক্ হ'য়ে।

দুখে অভিমানে, কি জানি কি প্রাণে,
দাঁড়ায়ে বালিকা তরুর তলে।
নবীন দম্পতী প্রীতিফুল্ল অতি,
চড়ি শ্বেতকরী গরবে চলে।

কহিল কুমার বধূরে তাহার—
"দেখ প্রাণপ্রিয়া", দেখিল রাণী।
সকলে প্রণমে, নীরবে সম্ভ্রমে
বালিকার গেল যুড়িয়া পাণি।

"এই সে রমণী!" কি কঠোর ধ্বনি!
প্রতিধ্বনি বুকে শিহরে ত্রাসে।
শুকাইল-মুখ, প্রভাত কিংশুক,
নয়নের জল উছলি আসে।

কি দৃষ্টি ভীষণ!— জ্বলিছে নয়ন!
কি ঘৃণার হাসি অধর ভরি!
স্তব্ধ সমীরণ, বিলুপ্ত তপন,
পদতলে ধরা যেতেছে সরি।

কাঁপে থর থর নীরস অধর,
হৃদয়ের রক্ত মাথায় ছুটে।
"ক্ষম, মহারাণি!" ফুটিল না বাণী,
শ্বসিল গভীর, পড়িল লুটে।

***

কখন বকুল, এক রাশি ফুল
একখানি ছায়া বিছায়ে দিল!
কে জানে কখন, বিষণ্ণ পবন
শ্লথ কেশ বাস গুছায়ে দিল!
কে জানে কখন সায়হ্ন তপন
কপোলের অশ্রু মুছায়ে দিল!

***

চলেছে দম্পতী প্রীতিফুল্ল অতি,
গজ বাজি সেনা চলিছে ঘেরি;
উঠে জয়নাদ, শুভ আশীর্ব্বাদ,
উড়িছে নিশান, বাজিছে ভেরি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

আবহ ও চন্দ্র সূর্য্য।

গত কার্ত্তিক মাসের "প্রদীপে" "বায়ুনভো-বিদ্যা" নামক একটি প্রবন্ধের নাম পড়িয়া, উহা কি বিদ্যা, তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে।

আমাদের দেশে স্থলবিশেষে এই প্রবৃত্তি বিপত্তি জন্মায়। কেহ কেহ মতবৈষম্য আদৌ সহ্য করিতে পারেন না, এবং তাঁহাদের কোন মত লইয়া তর্ক করিলে তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করা হইতেছে। ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল, আশা করি তাহা বায়ুনভোবিদ্যা-লেখকও স্বীকার করিবেন।

এই ভূমিকা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বায়ুনভোবিদ্যা-লেখকের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিতে যাইতেছি। অন্ততঃ লেখকের অনেক উক্তিতেই সন্দেহ করিতেছি।

প্রথমে, "বায়ুনভোবিদ্যা" নামটাতেই আপত্তি। জানি, বাঙ্গালায় কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের অত্যন্তাভাব বোধ করিতে হয়। অনেক স্থলে নূতন শব্দ রচনা করিতে হয়, কিংবা যাহা এক শব্দে ব্যক্ত হইত, তাহা প্রকাশের নিমিত্ত অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে হয়। বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা করা আদৌ সহজ নহে। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়া এক একটা শব্দ আমাদের এমন হইয়া গিয়াছে যে, মনে হয় যেন তাহার কোন বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হইতে পারে না। অথচ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ চাই। নূতন শব্দ রচনার সময় রচয়িতার দায়িত্ব মনে পড়ে। দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন হইয়া সমাজে ভাববিশেষ প্রবেশ করাইতে নাই, তেমনই বিশেষ ভাব ব্যঞ্জক শব্দ প্রবেশ করানও উচিত নয়। এক শব্দ "বায়ু" জানি, অপর শব্দ "নভঃ" জানি। কিন্তু উভয়ের সমবায়ে উৎপন্ন বায়ু-নভঃ কি বস্তু, তাহা জানি না। প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিতেছি, 'বায়ুনভোবিদ্যা' অর্থে লেখক আবহবিদ্যা করিয়াছেন। এই নামটাও নূতন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমার রচিত নহে। প্রাচীনেরা আবহ অর্থে atmosphere বুঝিতেন। উহার নামান্তর ভূবায়ু, সামান্যতঃ বায়ু।

প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতেই আবার আর দুইটি শব্দ পাইলাম। "বায়ু ও আকাশের উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন"—বায়ু কি, আকাশ কি? বোধ হয় লেখক নভস্ শব্দের প্রতিশব্দ আকাশ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইলে, বায়ুনভোবিদ্যা অর্থে বায়ু ও আকাশ বিষয়ক বিদ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু শূন্য আকাশ বিষয়ে কি বিদ্যা হইয়াছে, জানি না। অবশ্য এখানে আকাশ অর্থে পাশ্চাত্য ঈথর হইতে পারে না। যাহাই হউক, উহাদের "উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন" লিখিতে লিখিতে এক পংক্তি পরে লেখক বলিতেছেন, "চির নিয়মিত বিশ্বের কার্য্যের এই বিশৃঙ্খলা."

"পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দুইবার পূর্ণাবর্ত্তন করিয়া"—এস্থলে প্রাচীনেরা আবর্ত্তন শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। আবর্ত্তন অর্থে rotation, পরিবর্ত্ত ও প্রদক্ষিণ অর্থে revolution আছে।

"নির্ম্মল শারদীয়া রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে বাতব্যাধিক্লিষ্টের বেদনা বৃদ্ধি" হয়। বাতব্যাধি অর্থে কবিরাজ মহাশয়েরা আক্ষেপ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া গণনা করেন। যাহা হউক, যদি সামান্য বাতের (আমবাত) পীড়া ধরা যায়, তাহা হইলেও "নির্ম্মল, শারদীয়া রজনীর" পূর্ণিমা তিথিতেই যে ঐ রোগের বৃদ্ধি হয়, এমন ত নয়। শরৎকালের কেন, বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমাতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমা কেন, অমাবস্যা তিথিতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। আমি চিকিৎসক নই, এবং কোন্ তিথিতে ঐ রোগের বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয়, বলিতে পারি না।

"বিষুব প্রদেশে" দুইটী বৃহৎ বায়ুপ্রবাহ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে।

এখানে বোধ হয় লেখক বিরক্ত প্রদেশ মনে করিয়াছেন। বিষুবৎ মণ্ডল আকাশে, নিরক্ষ মণ্ডল ভূপৃষ্ঠে। বিষু—দিবারাত্রির সমতা হয় বলিয়া বিষুবৎ; অক্ষ—ক্ষিতিজ (horizon) হইতে অক্ষোন্নতি (elevation of the polar axis) থাকে না বলিয়া নিরক্ষ। উপরের ভুলটি অনেকে করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারাই অক্ষাংশ শব্দটি ঠিক প্রয়োগ করেন।

এই সকল শব্দ বিচার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে করিতে দিয়া এখন মত বিচার করা যাইতেছে। লেখক বলেন, "দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্ষা-কালে, ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।" এ বৎসর ১৩০৭ সাল। দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৩০৫ সালে (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) "ভারতে" যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, তবে মধ্যভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ কি ছিল? অবশ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও শস্য হানি হইতে পারে। শস্যের নিমিত্ত বৃষ্টিপাত প্রচুর হইলেই চলে না, সাময়িক হওয়া চাই। নতুবা গত পূজার সময় যে ঘোর বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশের শস্যের অমঙ্গল না হইয়া মঙ্গল হইত। কেবল বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও বঙ্গদেশের কৃষকেরা সন্তুষ্ট হয় না। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে দুই এক পসলা না হইলে ধানের ক্ষতি হয়। বস্তুতঃ আবশ্যক সময়ে, আবশ্যক পরিমাণে বৃষ্টি না হইলেই দেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। এ বৎসর বঙ্গদেশে মোটের উপর বৃষ্টি কম হয় নাই, অথচ লেখক বলেন, "এ বৎসর প্রচুর বর্ষাভাবে লোকে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দেখিতেছে।" এখানে লেখক বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সমগ্র ভারতখণ্ড মনে করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

লেখক বলেন, "স্মরণীয় শারদীয়া পঞ্চমীতে প্রলয় সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ কেন স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিছুকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সকল সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখনই কি উত্তর দিতে পারিয়াছেন? আবহবিদ্যা এখনও বিজ্ঞান পদবীতে উঠিতে পারে নাই। গত বৎসর শারদীয়া পঞ্চমীতে বঙ্গদেশে ঝড় হয় নাই; এ বৎসর কেন হইল, তাহা কে বলিতে পারিয়াছেন? প্রশ্নটা সরল হইলে এতদিন উত্তর পাওয়া যাইত। "আধু-নিক দার্শনিকগণ" (বোধ হয়, বাঙ্গালায়, বৈজ্ঞানিকগণ) কোন উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। জানি না, কোন্ "দার্শনিকগণ" বর্ষাবাতাদির সূক্ষ্ম কার্য্য কারণ অবগত হইয়া আগামী বর্ষের বর্ষাবাতাদির সম্ভাবনা বলিয়া দিতে পারেন। অন্ততঃ দুই চারি জনের নাম পাইলেও [illegible] নিজেই সুবিদ্বান আছেন। তাই [illegible]

বাষ্পের অবস্থা তুলনা করা কঠিন হইত না। আশা করি, লেখক এই বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, কিংবা জলীয় বাষ্পের উপর চন্দ্রের প্রভাব অন্ততঃ এদেশে দেখা যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান করি-বেন। আমি কতক কতক বিশ্বাস করি, তিথির সহিত আবহের কিছু সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবার সুযোগ বা অবসর পাই নাই। এদেশের অনেকের নিকট এই প্রকার সম্বন্ধের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু প্রমাণসহ সম্বন্ধের বিশ্লেষণ পাই না। তাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের মূল্য কিছু নাই।

লেখক বলেন, "ক্রান্তিপাত সময়ে"—(বিশুব দিনে) চন্দ্রের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাহা হইলে ২১ মার্চ্চ ও ২২ সেপ্‌টেম্বর দিবসে আবহের কিছু না কিছু উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে? বোধ হয়, ভুল বুঝিলাম। লেখক বলেন, বিশুব দিনে "চন্দ্র রবি মার্গস্থ হইলেই, আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।" তাহা হইলে ত চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ সম্ভাবনা হইবে। অতএব চৈত্রে আশ্বিন মাসে গ্রহণ সময়ে ঐ প্রভাব লক্ষ করিবার কথা। কিন্তু কি লক্ষ্য, তাহাই বুঝিলাম না। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা দেখিয়াই মনে হয়, চন্দ্র কর্ত্তৃক আবহেরও জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে; কিন্তু মনে করা এক, আর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ করা আর এক। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা প্রতিদিনই দেখিতে পাই, আবহের জোয়ার ভাটার কোন নিদর্শন পাই না। বায়ু চাপের দৈনন্দিন হ্রাস বৃদ্ধির সহিত চন্দ্রের স্থিতির সম্বন্ধ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অবশ্য বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু ফল কতটুকু ও কি প্রকারের, তাহা না জানিলে বিশ্বাসটা অন্ধবিশ্বাসের প্রায় তুল্য হয়। এই সম্বন্ধ স্বীকারের বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই যে, একই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র না হউক, অন্ততঃ বহু স্থানে চন্দ্রের ফলে আবহের অবস্থা এক হইত। কিন্তু এ পাড়ায় বৃষ্টি হইলে ও পাড়ায় হইবে, এমন কথা নাই; মান্দ্রাজ উপকূলে ঝড় বহিলে নিকটবর্ত্তী ওড়িশায় ঝড় বহিবে, এমন দেখা যায় না। এখানে অমাবস্যার দিন ঘোর বৃষ্টি হইলে, ওখানে হইবে এমন নিয়ম দেখা যায় না। অথচ অমাবস্যা এখানেও ঘটে, ওখানেও ঘটে। বস্তুতঃ লেখক বিষয়টি যত সহজ বা সরল মনে করিয়াছেন, আমি তত দুরূহ ও জটিল মনে করিতেছি।

লেখক বলেন, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্য হইতে দুই রাশি [illegible] বিকীর্ণ হইতেছে [illegible] সেই দুই জাতীয় তেজের ধর্ম্ম [illegible]

[illegible]রিমতির জলদ গম্ভীর স্বর সমুদ্রের শব্দ কল্লোল, ঝটিকার [illegible]ভীষণ গর্জ্জন, বহুদূরবর্ত্তী জীব জগতের মিশ্র কোলাহল [illegible] করিয়া আমার কর্ণে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হয়। আমি [illegible]নিতে পাই সে ক্রমাগত আমাকে ডাকিতেছে "প্রমোদ, [illegible]প্রমোদ, প্রমোদ!" ঐ শোন—"

কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, মুষলধারে বারি[illegible]র্ষণ আরম্ভ হইল, ঝটিকাবেগে সমস্ত প্রকৃতি ক্রন্দ্যমান কণ্ঠে [illegible]ত্থিত হইতে লাগিল, বাতায়ন পথে হঠাৎ উদ্দাম বায়ুর [illegible]কটা ঝট্‌কা আসিয়া গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিল। [illegible]ধার সেই সলিলসিক্ত বিরস সন্ধ্যার অন্ধকারময় কক্ষে [illegible]সিয়া বহিঃ প্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ বক্ষে অবিরল ধারাপাতের [illegible]কে লক্ষ্য করিয়া আমি গবাক্ষ পথে শূন্যে চাহিয়া রহিলাম। [illegible]মোদ [illegible] কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঐ শোন হরিমতি [illegible]

[illegible] ছিলেন। লিখিয়াছিলেন যে হরিমতির ছায়াময়ী মূর্ত্তি তাঁহার সন্ধানে ততদূর পর্য্যন্ত ধাবিত হয় নাই। এবং তাঁহার দেহ ও মন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছে।

তাহার পর এই তিন বৎসর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বারাণসীর পথে।

গৃহ-মার্জ্জার প্রকৃতি-বিশিষ্ট বাঙ্গালী পূজার সময় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে চাহে না। যে যেখানে দূরে [illegible] থাকে, এই সময়ে [illegible] আসিয়া জুটে। [illegible] [illegible] মধুর পরিবর্ত্তন [illegible]

শুনিয়া আসিতেছি যে, বায়ুচাপবৈষম্যই বাতাসের কারণ। তবে, বায়ু-চাপ সকল সময় কেন সমান থাকে না, তাহা মোটামুটি জানা থাকিলেও সুস্পষ্টরূপে জানা নাই। লেখকের ভাষায়, “শারদীয়া পঞ্চমী তিথি আসুক নীরবে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে, গ্রহ নক্ষত্র পর্ব্বত সাগরাদির অবস্থানের ত কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই,—তবে কেন সেই স্মরণীয় শারদীয়া পঞ্চমীতে প্রলয়-সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হইয়াছিল?” আমিও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেই শারদীয়া পঞ্চমী তিথিতেই কি সৌরকলঙ্ক বহির্গত হইয়াছিল? তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই “ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে স্তম্ভিত” হয় নাই কেন? আশ্বিন শুক্লপঞ্চমী ২৯ সেপ্‌টেম্বর গিয়াছে। কিন্তু সে দিন ত কোন সৌরকলঙ্ক দেখা যায় নাই। যখনই সৌরবিম্বে কলঙ্ক প্রকাশিত হয়, তখনই কিংবা তাহার পরেও ত “ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হয় না। সেপ্‌টেম্বর শেষ হইয়া অক্টোবর মাসের ৭ই তারিখে নিষ্কলঙ্ক সৌরবিম্বে অনেক দিনের পর কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কই গত অক্টোবর মাসে ঝড় বৃষ্টির ত চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই। ১৬ই অক্টোবর আবার আর কতকগুলি কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ঝড় বৃষ্টির সংবাদ পাই নাই।

চুম্বক শলাকার একটু আধটু বিচলন (variation) প্রতিদিন হইয়া থাকে, কিন্তু সৌরবিম্বে ত প্রতিদিন কলঙ্ক দেখিতে পাই না। চুম্বক-শলাকার বলনের কারণ সম্বন্ধে, বোধ করি, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও ‘যে তিমিরে সেই তিমিরেই’ আছেন। অন্ততঃ কোলাবা মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ সৌর কলঙ্কের আবির্ভাব তিরোভাবের সহিত চুম্বকশলাকার দৈনন্দিন বলনের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পান নাই। “অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবী উৎপাত” সকলের মূলে যে সৌরশক্তি বর্ত্তমান তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কিন্তু সৌরশক্তি প্রকৃত কি বিকৃত, তাহা বিপর্য্যস্ত চৌম্বক শক্তি, কি তাড়িত শক্তি, কি অন্য কোন অজ্ঞাত শক্তি; তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় কি? লেখক বলেন, “অনিয়মিত প্রবল ঝটিকা ও আকস্মিক ঘূর্ণাবর্ত্তের উৎপত্তিতত্ত্বও স্থিরীকৃত হইয়াছে।” যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিতে চাই ঢাকার প্রসিদ্ধ ঘূর্ণী ঝড়ের (tornado) কারণ কি ছিল? আরও দেখুন, বিক্রমপুরে দুইবার ঘূর্ণী ঝড় বহিয়া গেল, কিন্তু বঙ্গদেশের অনেক স্থানে একবারও বহিল না।

শেষে লেখক লিখিয়াছেন. “ভারত-গবর্ণমেণ্টও আমাদের কবি-

[illegible]

একখানি ছায়া বিছায়ে দিল!

কে জানে কখন, বিষণ্ণ পবন

শ্লথ কেশ বাস গুছায়ে দিল!

কে জানে কখন সায়হ্ন তপন

কপোলের অশ্রু মুছায়ে দিল!

***

চলেছে দম্পতী প্রীতিফুল্ল অতি,

গজ বাজি সেনা চলিছে ঘেরি;

উঠে জয়নাদ, শুভ আশীর্ব্বাদ,

উড়িছে নিশান, বাজিছে ভেরি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কিন্তু উহাদের সহিত সৌরকলঙ্কের নিত্যসম্বন্ধতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা গিয়াছে। গত আশ্বি[ন] মাসে কেবল বঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি বন্যা হয় নাই, ভারত ছাড়িয়া ক্রান্সে[র] মধ্য ও দক্ষিণস্থ প্রদেশে সেই প্রকার প্রবল ঝড়, বন্যা ও জলপ্লাবন হইয়া ছিল। অষ্ট্রিয়াতে, আইসলাণ্ডে ঝড়, ইটালীতে ঝড় বন্যা হইয়াছিল বলিতে গেলে পৃথিবীর অনেক খানি স্থানে আবহের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সৌরকলঙ্কাধিক্যের কাল নহে যদি একাদশ বৎসর অন্তর কলঙ্কাধিক্য কাল ধরা যায়, তাহা হইলে ডা[ঃ] উল্‌ফের নির্দ্দেশানুসারে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ আধিক্যকাল গি[য়া] ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আবার আসিবার কথা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সৌর কলঙ্কের প্রবল আবির্ভাবের লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না। এবৎসর যদি সৌরকলঙ্ক অধিক দেখা যাইত, তাহা হইলে ঝড় বৃষ্টি ও কলঙ্কের সম্ব[ন্ধ] কতকটা প্রমাণিত হইত। তাই বলি, ডাঃ স্কটের (Dr. Scot[t] F. R. S.) কথাই ঠিক। ইনি ইংলণ্ডের আবহবিদ্যা সভা[র] সম্পাদক ছিলেন। ইনি লিখিয়াছেন, “It can scarcely be sai[d] that the close relation between solar and terrestria[l] phenomena is capable of accurate demonstration.”

অবশ্য এমন কেহ বলিবেন্ না যে, যাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই তাহা নাই বা হইতে পারে না। কোন বিষয় সত্য হইতে পারে, অথ[চ] তাহার প্রমাণ দেওয়া সহজ হয় না। অন্ধ আলোর বর্ণভেদ দেখিতে পায় না বলিয়া বর্ণভেদ মিথ্যা হয় না। অবশ্য অন্ধের পক্ষে বর্ণভে[দ] নাই। এইরূপ কোন কোন বিষয় কাহারও নিকট সত্য, কাহারও নিক[ট] মিথ্যা বোধ হইতে পারে। কিন্তু জড় বিজ্ঞানে এই প্রকার যুক্তি চলে না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল ব্যতীত ইঁহার উঁহার মত বা অনুমানকে বৈজ্ঞানিক মত বলিতে পারা যায় না।

আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই বিষয় শেষ করা যাইতেছে ইংলণ্ডে এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা রবি শশী ছাড়িয়া অন্যান্য গ্রহের স্থিতি অনুসারে পার্থিব ব্যাপারের পরিণাম গণনা করিতে প্রয়াসী। পূর্ব্বকালে সকল দেশেই বোধ করি, জ্যোতিষ সংহিতা কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান ছিল, এবং সেই ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বিদ্যা এখনও সকল দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই। আমাদের বরাহমিহি[র] এ বিষয়ের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার বৃহৎ সংহিতায় ও অন্যা[ন্য]

হয় লেখক [illegible] করিয়াছেন। তাহা হইলে, বায়ুনভোবিদ্যা অর্থে বায়ু ও আকাশ বিষয়ক বিদ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু শূন্য আকাশ বিষয়ে কি বিদ্যা হইয়াছে, জানি না। অবশ্য এখানে আকাশ অর্থে পাশ্চাত্য ঈথর হইতে পারে না। যাহাই হউক, উঁহাদের “উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন” লিখিতে লিখিতে এক পংক্তি পরে লেখক বলিতেছেন, “চির নিয়মিত বিশ্বের কার্য্যের এই বিশৃঙ্খলা.”

“পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দুইবার পূর্ণাবর্ত্তন করিয়া”—এস্থলে প্রাচীনেরা আবর্ত্তন [illegible] প্রয়োগ করিতেন না। আবর্ত্তন অর্থে rotation, পরিবর্ত্ত ও প্র[illegible] revolution আছে।

“নির্ম্মল শারদীয়া রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে বাতব্যাধিক্লিষ্টের বেদনা বৃদ্ধি” হয়। বাতব্যাধি অর্থে কবিরাজ মহাশয়েরা আক্ষেপ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া গণনা করেন। যাহা হউক, যদি সামান্য বাতের (আমবাত) পীড়া ধরা যায়, তাহা হইলেও “নির্ম্মল, শারদীয়া রজনীর” পূর্ণিমা তিথিতেই যে ঐ রোগের বৃদ্ধি হয়, এমন ত নয়। শরৎকালের কেন, বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমাতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমা কেন, অমাবস্যা তিথিতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। আমি চিকিৎসক নই, এবং কোন্ তিথিতে ঐ রোগের বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয়, বলিতে পারি না।

“বিষুব প্রদেশে” দুইটী বৃহৎ বায়ুপ্রবাহ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে।

বলিল, "ছিঃ, এই অসার রমণী যৌবনের জন্য মা বাপ, ভাই বোন, সংসারের সকলকে ছাড়িবে? তুমি কি স্বার্থপর!"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার যৌবনের মোহে মুগ্ধ নই, তুমি রূপসী আমি স্বীকার করি, কিন্তু তোমার মত এত গুণবতী নারী আমি আর দেখি নাই, রমণী কুলে তুমি রত্ন।"

হরিমতি নিষ্ঠুর, অতি অপ্রেমিকা, সে অনায়াসে বলিল, প্রমোদ, আত্ম প্রবঞ্চনা করিও না, আমাকে ভাল বাসিয়া তুমি অনেকের পরিতাপের কারণ হইবে, তোমার উদ্দেশ্যে অনেকের অভিসম্পাতের অশ্রু বর্ষিত হইবে, তাহার ফল কখন মঙ্গলদায়ক হইবে না।

আমি অপ্রসন্নভাবে বলিলাম, "হরিমতি তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার মন পাইবার মত আমার কিছু নাই স্বীকার করি, কিন্তু আমি সত্যই নিস্বার্থভাবে তোমাকে ভালবাসি, নতুবা তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতাম না।"

হরিমতি বলিল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। তুমি আমার জন্য এত করিয়াছ, আমার জীবনের এ পরিবর্ত্তনই তোমা হইতে, আমি কি তোমার এত দয়া ভুলিয়া যাইব? নিজের সুখের জন্য তোমার জীবন বিষময় করিব?—যদি বিবাহ করিয়া আমাদের কখন ছেলেপিলে হয়, তাহারা জারজ সন্তানের মত সকলের নিকট ঘৃণিত হইবে।

হরিমতির জলদ গম্ভীর স্বর সমুদ্রের শব্দ কল্লোল, ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জন, বহুদূরবর্ত্তী জীব জগতের মিশ্র কোলাহল মগ্ন করিয়া আমার কর্ণে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হয়। আমি শুনিতে পাই সে ক্রমাগত আমাকে ডাকিতেছে "প্রমোদ, প্রমোদ, প্রমোদ।' ঐ শোন—"

কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, মুষলধারে বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল, ঝটিকাবেগে সমস্ত প্রকৃতি ক্রন্দমান কণ্ঠে মুখরিত হইতে লাগিল, বাতায়ন পথে হঠাৎ উদ্দাম বায়ুর একটা ঝট্‌কা আসিয়া গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিল। বর্ষার সেই সলিলসিক্ত বিরস সন্ধ্যায় অন্ধকারময় কক্ষে বসিয়া বহিঃ প্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ বক্ষে অবিরল ধারাপাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি গবাক্ষ পথে শূন্যে চাহিয়া রহিলাম। প্রমোদ [illegible] কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঐ শোন হরিমতি চিরদিন কাঁদিয়া মরিব। তাহাতে সংসারে কাহার কি ক্ষতি? আমার কথা শোন, মা বাপকে অসুখী করিও না, তোমার সোণার সংসারে আগুণ জালিও না, সমাজের নিয়ম ভাঙ্গিবার জন্য তোমার কুটতর্ককে অভ্রান্ত মনে করিও না। নিজের সুখ সকলেই খুজিয়া মরে, পরের সুখের দিকে চাহিয়া যে মরিতে পারে সে দেবতা। তুমি দেবতা হও, আমাকে ভুলিয়া যাও, হৃদয়কে সংযত কর।"

হরি, হরি, এই কুসুম কোমলা বালিকার হৃদয় বজ্র কঠোর, সে অনায়াসে আমার মস্তকেই বজ্রাঘাত করিল। ভারি রাগ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৫

"সংক্ষেপে সব কথা বলিয়া যাই। হৃদয়ের ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। মা বাবা পুনঃ পুনঃ আমাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাদের সে অনুরোধ পালন করিতে পারিলাম না। আমি বিবাহ করিলে তাঁহারা সুখী হইবেন সত্য, কিন্তু বিবাহ করিয়া আর একটী নারীকে অভাগিনী ও অসুখী করিব কেন? হরিমতি আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ব্লটিং কাগজের মত শুষিয়া লইয়াছিল।

অবশেষে হঠাৎ একদিন এক টেলিগ্রাম পাইলাম—মা'র ভয়ানক পীড়া, অবিলম্বে বাড়ী গিয়া না পৌঁছিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবার আশা নাই।

হইলেন। সেখান হইতে তিনি আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন যে হরিমতির ছায়াময়ী মূর্ত্তি তাঁহার সন্ধানে ততদূর পর্য্যন্ত ধাবিত হয় নাই। এবং তাঁহার দেহ ও মন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছে।

তাহার পর এই তিন বৎসর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বারাণসীর পথে।

গৃহ-মার্জ্জার প্রকৃতি-বিশিষ্ট বাঙ্গালী পূজার সময় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে চাহে না। যে যেখানে দূরে থাকে, এই সময়ে বাড়ীতে আসিয়া জুটে। [illegible] ছবির [illegible] মধুর পরিবর্ত্তন [illegible]

নাম না। হরিমতি আমার কে? কেহ নয়, জীবনে তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মনের ভুলে একবার তাহার কণ্ঠে আমার জীবন কুসুমে বিরচিত মাল্যদাম সমর্পণ করিতে গিয়াছিলাম, সে তাহা অবহেলা ভরে ছিঁড়িয়া পদ-তলে দলিত করিয়াছে, বিদীর্ণ হৃদয়ে আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিলাম আর সে পথে যাইব না। যাহাকে বিবাহ করিয়াছি তাহাকেই সুখী করিবার চেষ্টা দেখিব, এ হৃদয় সংযত করিব; বিস্মৃতিতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার পরিতৃপ্তি। হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু উপায় ছিল না।

এই ভাবে দু মাস কাটিয়া গেল। হরিমতির মা, সেই জেলেনী, মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাহার কথা কানে তুলিতাম না। তখন পরীক্ষা সাগর পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, অবসরও অধিক ছিল না।

শেষে 'মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট আসিল'; হরিমতি আমাকে একখানি পত্র লিখিল। তাহাকে একবার দেখা দিবার জন্য সে কাতরভাবে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। আবার তাহার কাতরতা কেন? সে ত ইচ্ছা করিয়াই আমার প্রেম প্রত্যাখান করিয়াছে! একদিনত আমি তাহার হস্তে আমার জীবন যৌবন, আমার ধনমান, আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণের জন্য লালা[illegible] হইয়া উঠিয়াছিলাম!

তখন সংসারী হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলাম না, তাই বিবাহ করিয়া সংসারী সাজিয়াছি। আমার পিতা মাতা, সমাজ সংসার সব আপনার হইয়াছে, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ করিয়াছি; দুদিনের স্বপ্ন ভুলিয়া যাও, তোমার আমার পরিচয়ের কথা বিস্মৃত হও; তুমি স্বহস্তে যে আগুণ নিবাইয়া ফেলিয়াছ, তাহা পুনঃ প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিও না। তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না।"

মাসখানেক পরে শুনিলাম হরিমতির বড় জ্বর। বিকার ঘোরে সে রাত্রিদিন কেবল আমারই নাম করিতেছে। জেলেনীর একটি বিধবা প্রতিবেশিনীর মুখে এ সংবাদ পাইলাম। জেলেনী নিজে আসে নাই, সে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছে আমার মত পাষণ্ডের বাড়ীর মাটি দলাইবে না। সংবাদ পাইলাম যদি একবার গিয়া হরিমতিকে না দেখিয়া আসি তাহা হইলে আর দেখা হইবে না, তাহার জীবন-দী[illegible] নির্ব্বাণ প্রায়। একবার আমার সঙ্গে দেখা করাই তাহা[illegible] অন্তিম কালের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাহার অন্তি[illegible] আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিবার শক্তি আমার নাই; সেই দি[illegible] সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বিচলিত হৃদয়ে আমি হরিমতির গৃহে[illegible] দিকে অগ্রসর হইলাম। সেই সন্ধ্যাকালে জনপূর্ণ রাজপ[illegible] দিয়া চলিতে চলিতে আমার মনে হইল আমি আমার প্রথ[illegible] যৌবনের সুখ স্মৃতির শ্মশান অভিমুখে ধাবিত হইয়াছি।

৬

[illegible]

একখানি ছায়া বিছায়ে দিল!

কে জানে কখন, বিষণ্ণ পবন

শ্লথ কেশ বাস গুছায়ে দিল!

কে জানে কখন সায়াহ্ন তপন

কপোলের অশ্রু মুছায়ে দিল!

* *

চলেছে দম্পতী প্রীতিফুল্ল অতি,

গজ বাজি সেনা চলিছে ঘেরি;

উঠে জয়নাদ, শুভ আশীর্ব্বাদ,

উড়িছে নিশান, বাজিছে ভেরি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

[illegible] আস্থা ছিল না। [illegible] হয় লেখক [illegible] করিয়াছেন। তাহা হইলে, বায়ুনভোবিদ্যা অর্থে বায়ু ও আকাশ বিষয়ক বিদ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু শূন্য আকাশ বিষয়ে কি বিদ্যা হইয়াছে, জানি না। অবশ্য এখানে আকাশ অর্থে পাশ্চাত্য ঈথর হইতে পারে না। যাহাই হউক, উহাদের "উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন" লিখিতে লিখিতে এক পংক্তি পরে লেখক বলিতেছেন, "চির নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের কার্য্যের এই বিশৃঙ্খলা."

"পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দুইবার পূর্ণাবর্ত্তন করিয়া"—এস্থলে প্রাচীনেরা আবর্ত্তন [illegible] প্রয়োগ করিতেন না। আবর্ত্তন অর্থে rotation, পরিবর্ত্ত ও প্রদ[illegible] revolution আছে।

"নির্ম্মল শারদীয়া রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে বাতব্যাধিক্লিষ্টের বেদনা বৃদ্ধি" হয়। বাতব্যাধি অর্থে কবিরাজ মহাশয়েরা আক্ষেপ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া গণনা করেন। যাহা হউক, যদি সামান্য বাতের (আমবাত) পীড়া ধরা যায়, তাহা হইলেও "নির্ম্মল, শারদীয়া রজনীর" পূর্ণিমা তিথিতেই যে ঐ রোগের বৃদ্ধি হয়, এমন ত নয়। শরৎকালের কেন, বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমাতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমা কেন, অমাবস্যা তিথিতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। আমি চিকিৎসক নই, এবং কোন্ তিথিতে ঐ রোগের বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয়, বলিতে পারি না।

"বিষুবা প্রদেশে" দুইটী বৃহৎ বায়ুপ্রবাহ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে।

একাকী শয্যায় বসিয়া নীরব সুপ্তিমগ্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর মর্ম্মভেদী কণ্ঠস্বরের ন্যায় সেই দূরাগত আর্ত্তনাদ চিনিতে পারি—তাহা হরিমতির কণ্ঠস্বর!

আবার এক এক সময়ে স্বপ্ন দেখি, আমি সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করিতেছি, এক দিকে অনন্ত বীচিমালা সংক্ষুব্ধ সুনীল মহাসমুদ্র, বহুদূরে সমুদ্রজল ও আকাশ পরস্পরের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ, অন্য দিকে সুবিস্তীর্ণ সৈকত ভূমি, শুভ্র বালুকা কণা মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, বালুকারাশি প্রতিবিম্বিত প্রচণ্ড সূর্য্যকর চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, উত্তপ্ত বালুকায় পদতল জ্বলিয়া যাইতেছে, ভীষণ উত্তাপে সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিতেছে, নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; আমি কাতর ভাবে ঊর্দ্ধদিকে চাহিতেই দেখি নবীন নীল নীরদ জাল সৌরকর প্রদীপ্ত আকাশ পথে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার উপর হরিমতির ছায়াময়ী মূর্ত্তি, তাহার হস্তে বীণা কিন্তু সে বীণা হইতে ক্রমাগত বজ্র নির্ঘোষ ধ্বনিত হইতেছে, তাহার হাস্য বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় মেঘের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার কৃষ্ণ কুন্তলরাশি মেঘের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আসন রূপে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; আর আকাশের বহু ঊর্দ্ধে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের জ্যোতির্বিম্ব তাহার মস্তকের উপর জ্যোতির্ম্ময় মুকুটরূপে প্রতিভাত হইতেছে। সপ্তবর্ণ সমুজ্জ্বল রামধনু তাহার কণ্ঠে বিচিত্র বর্ণের পুষ্প নির্ম্মিত নিরূপম মাল্যদামের শোভা পাইতে থাকে; হরিমতির জলদ গম্ভীর স্বর সমুদ্রের শব্দ কল্লোল, ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জন, বহুদূরবর্ত্তী জীব জগতের মিশ্র কোলাহল [illegible] করিয়া আমার কর্ণে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হয়। আমি চিনিতে পাই সে ক্রমাগত আমাকে ডাকিতেছে "প্রমোদ, প্রমোদ, প্রমোদ।" ঐ শোন—"

কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, মুষলধারে বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল, ঝটিকাবেগে সমস্ত প্রকৃতি ক্রন্দ্যমান কণ্ঠে [illegible]ত হইতে লাগিল, বাতায়ন পথে হঠাৎ উদ্দাম বায়ুর [illegible] ঝট্‌কা আসিয়া গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিল। [illegible]র সেই সলিলসিক্ত বিরস সন্ধ্যার অন্ধকারময় কক্ষে [illegible]সিয়া বহিঃ প্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ বক্ষে অবিরল ধারাপাতের [illegible]কে লক্ষ্য করিয়া আমি গবাক্ষ পথে শূন্যে চাহিয়া রহিলাম। [প্র]মোদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঐ শোন হরিমতি আমাকে ডাকিতেছে, আমি তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, তাহার ঐ হাসি,—বিদ্যুচ্ছটা দেখিতেছ না? কি তীব্র! আমি আর সহ্য করিতে পারি না, আমি পাগল হইয়া যাইব, স্বপ্নে, জাগরণে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র হরিমতির সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তি; আমি কি করিব, কোথায় গিয়া শান্তি পাইব ভাই, বলিয়া দাও।"

প্রমোদ আবার উভয় হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সমস্ত ব্যাপার একটি রহস্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ চিন্তার পর আমি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলাম, "হরিমতিকে তুমি সত্যই ভাল বাসিতে, তাহার অকাল মৃত্যুতে তোমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার পর বহরমপুরে আসিয়া সেই পুরাতন স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই তুমি এই সকল অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছ, বস্তুতঃ ও সকল কল্পনার বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

বলিলাম বটে, কিন্তু বুঝিলাম বহরমপুর না ছাড়িলে প্রমোদের মঙ্গল নাই, তাঁহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে এখানে দীর্ঘকাল বাস করিলে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তিনি যাহাতে অন্যত্র বদলী হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে প্রমোদ চট্টগ্রামে বদলী হইলেন। সেখান হইতে তিনি আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন যে হরিমতির ছায়াময়ী মূর্ত্তি তাঁহার সন্ধানে ততদূর পর্য্যন্ত ধাবিত হয় নাই। এবং তাঁহার দেহ ও মন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছে।

তাহার পর এই তিন বৎসর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বারাণসীর পথে।

গৃহ-মার্জ্জার প্রকৃতি-বিশিষ্ট বাঙ্গালী পূজার সময় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে চাহে না। যে যেখানে দূরে থাকে, এই সময়ে [illegible] আসিয়া জুটে। [illegible] প্রকৃতির মধুর পরিবর্ত্তন [illegible]

কাশী—বেণীমাধবের ধ্বজা।

আকর্ষণ! আবার অন্য পথে সেই অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানি, তাহার হৃদয়ের অতি নিভৃতে উদিত ও বিলয় প্রাপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসটীও মন হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব হইল। যাত্রা ত করিতে হইবে—আর ভাবিয়া ফল কি? গাড়ীতে ইতিপূর্ব্বেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উঠিয়াছিল—আমি বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ীর মধ্যে দেখি—মিঃ পিঃ—আগে হইতেই উঠিয়া বসিয়াছেন। পাঠক মিঃ পিঃ—আমার দীর্ঘ প্রবাসের অনুগত সঙ্গী। কায়া হইতে ছায়া যেরূপ পৃথক করা অসম্ভব দুগ্ধ হইতে জল পৃথক করা যেরূপ অসম্ভব—মিঃ পিঃ হইতেও আমার দীর্ঘ প্রবাস পথে বিচ্ছিন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। তাঁহাকে "মিষ্টার" বলিয়া সম্বোধন করিলাম ইহাতে পাঠক হয়তঃ মনে করিতে পারেন তিনি বিলাত ফেরত—বা তদনুরূপ আর কিছু। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে—তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার না হইয়া এই শস্য শ্যামলা সুফলা মলয়জ-শীতলা, বাঙ্গলা দেশে থাকিয়াই "মিষ্টার" বনিয়াছেন। আমাদের দেশী "মিষ্টার"দের গায়ে কিছু ছাপ থাকে না। পোষাকের জোরেই—চাল চলনের জোরেই তাঁহারা জাহির হন। এ দিক দিয়া ধরিতে গেলে মিঃ পিঃ—র কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি ছিল না। ধপ্‌ধপে উঁচু কলার—তাহার পার্শ্বে বাঁধা রেশমী নেকটাই, সার্জ্জের ওয়েষ্ট কোট, কোট ও প্যাণ্ট, তার উপর দেড় মণ ভারি একটা কাশ্মীরার অলষ্টার, মাথায় নাইট ক্যাপ্, চোখে সোণা বাঁধান চস্‌মা, সেই চস্‌মার মধ্য দিয়া উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া, চুরুটের ধূমোদ্গার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছড়ি ঘুরান—বাঁকা হিন্দুস্থানীতে চাকর বাকরের সহিত কথা—প্রভৃতি যত কিছু অনুষ্ঠান—সবই মিঃ পি'র আধ্যায় হইয়াছিল। তার উপর তিনি আমায় প্রবাস যাত্রার সঙ্গী। তিনি অনেকবার পশ্চিম গিয়াছেন—আমি প্রথম যাইতেছি। তজ্জন্য তাঁহার একটা মস্ত অভিজ্ঞতা

যখন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আনন্দ কোলাহল জাগাইয়া দেয়, পরিজনবর্গের বিষণ্ণ মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া দেয়—প্রকৃতি যে সময়ে নব প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম, সুগন্ধি শেফালির অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বর্ষার বিষণ্ণতা ও স্থির গম্ভীর ভাব ভুলিয়া আনন্দে হাসিতে থাকেন—সুনীল আকাশে যখন পূর্ণ শশী ষোল কলা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়া রজত ধারা বৃষ্টি করে—সমগ্র বৎসরের সুখের স্মৃতি যে সময়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, আমি সেই সুন্দর শোভাশালিনী পূর্ণচন্দ্রালঙ্কৃতা যামিনীতে পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলাম। সে দিনের সকল কথা ভুলিতে পারি, কিন্তু পরিজনবর্গের স্নেহবিপ্লুত গণ্ডবাহী পবিত্র অশ্রুধারা, হৃদয়ের বিজন কন্দরে স্নেহের ঘাত প্রতিঘাতে উত্থিত আকুল অথচ মৃদু দীর্ঘশ্বাস—আর প্রবাসীকে কিছু দীর্ঘ দিনের বিদায় দিবার আশঙ্কায় একটা ব্যাকুলভাব, এগুলি ভুলিতে পারিব না।

সেই সুন্দর রজনীতে—নীলাকাশে নিষ্কলঙ্ক শারদচন্দ্রমা হাসিতেছে—প্রকৃতি হাসিতেছে—আর একটী সুন্দর মুখ দ্বারান্তরালে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া, হৃদয়ে দীর্ঘ শ্বাস লইয়া মনে মঙ্গলকামনা পোষিত করিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। এ ভাবটা বড়ই বিরুদ্ধ বোধ হইল। তবু প্রকৃতির হাসি—চাঁদের হাসি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। জানি না, বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত মানব হৃদয়ের কি গূঢ় ঘনিষ্ট

ভাণ, আর তাহার উপর সাহেবী পোষাক, আমার বড় অভিভূত করিয়া তুলিল। আমি, আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, পঞ্জাব, মধ্য ভারতবর্ষ, মধ্য প্রদেশ, রাজপুতানা, ভরতপুর, এবং উত্তর পশ্চিমের যেখানে যেখানে গিয়াছি—মিঃ পিঃ ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিয়া আমার সকল বিষয়ে অযাচিত উপদেশ দিয়া, অসহনীয় মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া—আমায় হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়াছেন। তিনি এখন সুদূর পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে। বাঙ্গলা মাসিক পত্রে তাঁহার চরিত্রের তীব্র সমালোচনা পড়িয়া, সেখান হইতে যে ভ্রুকুটি করিবেন, তাহাতে আমার বড় একটা ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি জানি তিনি আমায় যথেষ্ট ভালও বাসেন, কাজেই আমার ভীত হইবার ততটা প্রয়োজন নাই।

হাবড়ায় পৌঁছিলাম। মিঃ পিঃ গাড়ী হইতে বিদ্যুৎ গতিতে সাহেবদের মত লাফাইয়া পড়িয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিলেন। আমি "নেটিভত্বের" পুরা ভোগটা দাঁড়াইয়া ভুগিলাম। সব জিনিস পত্র কুলী দিয়া নামাইয়া দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখি—এক তুষারশুভ্র, হুইস্কি-সেবিত ইংরাজ দৌবারিক গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিতেছেন "Not this way Babu." কথাটা শুনিয়া বড় রাগ হইল। বলিলাম—"সাহেব সেকেণ্ড ক্লাশে যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইব বলিয়া দাও।" তখন ব্রিটন-সন্তান আর আপত্তি করিলেন না—আমি টিকিট ঘরের কাছে গেলাম।

সেখানে মিঃ পিঃ ওষ্ঠাধর টিপিয়া হাসিতেছেন দেখিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল। তাঁহার সেই স্কাই-কলারের সোণা বাঁধান চস্‌মার মধ্যগত, তীব্র অথচ সরস দৃষ্টি যেন বলিতেছে "কেমন—আমায় সাহেব বলিয়া যে ঠাট্টা কর—হাতে হাতে নেটিভত্বের সুখ পাইয়াছ ত ?" আমি রাগ করিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝিলাম—রেলওয়ে রাজ্যে "নেটিভত্ব" মহানিগ্রহ। মিঃ পিঃ জোর করিয়া আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে এক সুট সাহেবী পোষাক পুরিয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু সং সাজিতে হইবে বলিয়া তাহা প্রথমে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হই নাই। এখন মনে হইল—অবসর পাইলেই—সুটটী পরিয়া সাহেব সাজিব।

ষ্টেশনে অত্যন্ত জনতা। কর্ড-মেল ছাড় ছাড় হইয়াছে। স্বর্গের পরীর ন্যায়, শ্বেতকায় ইংরাজ মহিলারা আত্মীয় স্বজনের সহিত বিদায়কালীন অস্ফুট সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্লাট ফরমের শেষে দুরন্ত রাক্ষসকায় এঞ্জিনটা, যুদ্ধের ঘোড়ার ন্যায় ভয়ানক চঞ্চল হইয়া যেন আভ্যন্তরীণ তেজ লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ধাবমান হইবার অপেক্ষা করিতেছে। কুলিদের ছুটাছুটি—হিন্দুস্থানীদের হাঁকাহাঁকি, গার্ড ও টিকিট কলেক্টারের ধীর পদবিক্ষেপ—আর প্লাট্‌ফরমের বিমিশ্র কোলাহল, এই সব উপভোগ করিতে করিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আলস্য পূর্ণ ব্যস্ততা বিহীন বাঙ্গালী জীবনে ষ্টেশনের এই সজীব বিরাট ব্যস্তভাব দেখিয়া প্রাণটা যেন ক্ষণিক উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সব থামিল। শেষ ঘণ্টা পড়িলে ট্রেণখানি দ্রুতবেগে হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিল। আমরা একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয়, তাহা একখানি ফার্ষ্ট ক্লাশের অর্দ্ধাংশ এবং তাহাতে ইংরাজ যাত্রী ছিল না। আমার সঙ্গী ক্ষুদ্র বাঙ্গালী ইংরাজটী দেখি—ইতিমধ্যে চুরুট ধরাইয়া গম্ভীর হইয়া গদীর উপর অঙ্গ ঢালিয়াছেন। আমি তখন গায়ের ঝাল ঝাড়িতে লাগিলাম—মিষ্টার পিঃ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

হুগলী ছাড়াইলাম—কামরায় আর কেহ উঠিল না। দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধমান ছাড়াইল। বাল্যকালের সেই "বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটির" কথাটা মনে পড়িল। মিঃ পিঃ "রাঙ্গা মাটির" কথা ভাবিয়াছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু সেই অতি শুভ্র, সুমিষ্ট সীতাভোগ, আর বড় বড় দানাদার মতিচুরগুলি, যে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সাহেবী খানার স্বাদ ভোজী রসনায় উপর আধিপত্য করিয়া তাহা একটু রসসিক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিলাম। কেন না তিনি আমায় বলিলেন—"ভায়া! গাড়ী এখানে বেশীক্ষণ থামিবে, কিছু মতিচুর ও সীতাভোগ কিনিয়া লও। পাঁউরুটিখানার সদ্গতি করিবার সময় বড় কাজে লাগিবে।" সীতাভোগ সংগ্রহ করা হইলে মিষ্টার পিঃ—অতি প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন তাপমান যন্ত্রের পারদের ন্যায় দুই চারি ডিগ্রী নীচে আসিয়া পৌঁছিল।

আসানসোলে যখন গাড়ী পৌঁছিল—তখন রাত্রিটা বাহিরের প্রকৃতির কোল হইতে, অধিক পরিমাণে শীতল বাতাস আনিয়া যেন কামরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

আমি স্ফটিক জানালাগুলি তুলিয়া দিলাম। মিঃ—পি, এক পেয়ালা চা খাইবার জন্য—এক খানসামাকে ডাকিলেন।

সেই শীতের রাত্রে, সেই কন্‌কনে মাঠের হাওয়ার মধ্যে, এক পেয়ালা উষ্ণ চা,—মিঃ পিঃ'র পক্ষে বড়ই সুখকর বোধ হইল। তিনি আমার জন্য আর এক পেয়ালা আনিবার হুকুম করিলেন, কিন্তু আমি আবশ্যক বোধ না করায় ফিরাইয়া দেওয়া হইল। আসানসোলে এঞ্জিন বদ্‌লান হয়, ব্রেকসম্যান ও গার্ড বদলী হয়, কয়লা লওয়া হয়—এ সকল কারণে একটু দেরীও হয়। আসানসোলেই আমরা উপরের শয্যা আশ্রয় করিলাম। রাত্রি অধিক হইয়াছে, নিদ্রাও একটু দরকার।

রাণীগঞ্জ হইতে আসানসোলের পথে দেখিলাম, মাঠের মধ্যে সেই নিশীথ অন্ধকারের জমাট ভাব একটু শিথিল করিয়া দিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত হইয়াছে। কোথাও একটা, কোথাও বা দুই চারিটা—কোথাও বা দশ বারটা একত্রে জলিতেছে। যেন নিভৃত চিন্তার উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর দল—গভীর রাত্রে মাঠের মধ্যে "ধুনী" আলাইয়া শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। অন্ধকার সমুদ্রে আলোকবিকাশের এ দৃশ্যটী দেখিতে বড়ই সুন্দর। মিঃ পিঃ বলিলেন—কোক্ কয়লা প্রস্তুত করিবার জন্য পাথুরিয়া কয়লার স্তূপে অগ্নিসেক করা হয়—তাহাতেই জলন্ত অগ্নিস্তূপের সৃষ্টি।

রাণীগঞ্জ হইতেই বাঙ্গালার সমতল ভূমির যেন একটু পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি বিভাগের মধ্য পথে যেমন সমতল ক্ষেত্র দেখিয়া আসিয়াছি রাণীগঞ্জ ছাড়াইবার পর তাহার যেন বিরাম হইয়াছে। রাত্রি দুইটার পর মধুপুরে পৌছান গেল। মধুপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের করুণায়, এখন একটী ছোট খাট নগরে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালী ও সাহেবেরা অনেক বাড়ী তৈয়ার করিয়া মধুপুরে বাস করিতেছেন। এখানকার জল হাওয়া খুব ভাল।

এখন আকাশ একটু পরিষ্কার। গাড়ী অবিরাম গতিতে চলিতেছে। মাঝে মাঝে যদি এক একটি ষ্টেসনে [illegible] থামিত [illegible] মনে হইত [illegible] গতিতে [illegible] [illegible] পরিভ্রমণ করে, ট্রেনখানা তাহারই [illegible]

মত গতি বিশিষ্ট হইয়া কে জানে—কোন্ অলক্ষ্য পথে চলিয়াছে। উষার অস্ফুট আলোকে, রজনীর শেষভাগে, সিমুলতলা, নওয়াদি, প্রভৃতি স্থানের ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে দ্রুতগামী ট্রেণের দর্পিত গতির ঘাত প্রতিঘাতে, সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে এক সুন্দর প্রতিধ্বনি উঠিতে ছিল। আমি ইহার পরে যে সমস্ত বড় বড় পাহাড় দেখিয়াছি তাহার তুলনায় নওয়াদির সীমা বেষ্টিত পাহাড় কিছুই নহে।

বেনারস ও হাবড়ার মধ্যে দুইটী বড় বড় পুল পার হইতে হয়। একটী লক্ষ্মীসরাইএর ও অপরটী শোণের। শোণের পুলটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। আর্য্যদিগের প্রাচীন "সুবর্ণভদ্রার" আর সে শক্তি নাই—সে তরঙ্গ ভঙ্গময়ী প্রবল স্রোত নাই। এখন কেবল্ বালুকারাশি নদী গর্ভের আদ্যোপান্ত অধিকার করিয়া রৌদ্রালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর কলেবর, ক্রমশঃ ম্যালেরিয়া রোগীর মত বিশীর্ণ হইয়া কলিকাতার টালিস্ নালার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আগে নাকি শোণের বালুকামিশ্রিত জলস্রোতের সহিত সোণার গুঁড়া ভাসিয়া আসিত, তাই আর্য্যেরা সাধ করিয়া ইহার সুবর্ণভদ্রা নাম দিয়াছিলেন। শোণ ও নর্ম্মদা এক ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন—একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া সুবর্ণভদ্রা আপন মনে চলিয়াছে। সুবর্ণভদ্রার সে প্রাচীনকালের তেজ নাই, তরঙ্গায়িত বক্ষে দুকুল ভাঙ্গিবার সামর্থ্য নাই। রেল কোম্পানী এই পুল বাঁধিতে অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন। চারি দিক হইতে ছোট বড় অনেক খাল কাটাইয়া মাঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া শোণের স্রোত-বেগ কমান হইয়াছে। এখন শোণের শীর্ণ বক্ষের আশে পাশে, বামে দক্ষিণে বালুকাময় চড়া। চড়ার উপর বালিরাশি, আর হীন তেজ তরঙ্গগুলির প্রতিঘাত জনিত শুভ্র ফেণরাশি। কোথাও সেই শুভ্র ফেণধারা—স্রোতমুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। শোণের উপরে পুল, সর্ব্বোপরি নীলাকাশ, ও নদবক্ষে শুভ্র ফেণরাশি দেখিয়া আমার মনে সহসা—

> বৈদেহি পশ্যা মলয়াৎ বিভক্তং
> মৎসেতুনা ফেণিলমম্বুরাশিম্।
> ছায়াপথেনেব [illegible]
> আকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্।

[illegible] এই শ্লোকটী জাগিয়া উঠিল

বক্সার হইতে মিঃ পিঃর সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। ডুমরাওন রাজবাড়ীতে তাঁহার কি কাজ আছে, তজ্জন্য তিনি থাকিয়া গেলেন। তিনি এলাহাবাদে আমার সহিত মিলিত হইবেন এ আশ্বাসে কতকটা মন বাঁধিলাম। আমি কাশীর ঠিকানা তাহাকে দিয়া আসিয়াছি, তিনি সেখানেও আসিতে পারেন।

দিলদারনগর পার হইয়াই দেখি রেলের পথ আর যেন শেষ হইতে চাহে না। গাড়ি ক্রমাগতই চলিয়াছে। হুস্ হুস্, চটাপট্ শব্দের আর বিরাম নাই। কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষায় থাকে না। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মোগলসরাই পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা।

তখন, বোম্বে মেল, পঞ্জাব মেল, ছিল না। বেঙ্গল নাগ-পুরল তখনও হয় নাই। সে আজ পনের বৎসরের কথা। তখন মোগলসরাই হইতে বরাবর রাজঘাটে যাইতে হইত। এখন মোগলসরাই হইতে কাশী পর্য্যন্ত সরাসর যাওয়া যায়। আউধ্—রোহিলখণ্ড কোম্পানির ব্যয়ে এখন বারাণসী পার্শ্ব প্রবাহিতা সুরধুনী পুলের বাঁধনে, পথিকের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

সেই তামসী রাত্রে গঙ্গা পার হওয়া বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার মনে করিলাম। নূতন যাত্রী, বারাণসীর পথ ঘাট তত জানা নাই, আর মাঝিদেরই বা বিশ্বাস কি? দেখিলাম আরও দুই চারি জন ওপারের যাত্রী ছিলেন। তাঁহারা সে রাত্রে পার না হইয়া ষ্টেসনের বারান্দায় দরী বিছাইয়া আড্ডা গাড়িলেন। Discretion is the best part of valour, এই ভাবিয়া আমিও আশ্রয় স্থান খুঁজিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

দুঃখের স্মৃতি সহজে যায় না। সে রাত্রে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম। সে কষ্টের কথাটা আজও মনে আছে—কারণ আমার কষ্টের মূল কারণ আমারই একজন স্বদেশী। এই পুরুষপুঙ্গব—রাজঘাটের ষ্টেসন মাষ্টার। আমার কাছে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট। কাজেই প্লাটফরমে সামান্য মুসাফিরের মত সতরঞ্চ বিছাইতে বড় ঘৃণা বোধ হইল। "ওয়েটিংরুম" খুঁজিতে গিয়া দেখি—সব ঘরে চাবি বন্ধ। ষ্টেসন মাষ্টার বাবু বাঙ্গালী জানিয়া, তাহার সঙ্গে দেখা করিলাম। কিন্তু এই মনুষ্যত্বশূন্য বাঙ্গালী, কোন ক্রমেই ঘর খুলিয়া দিল না। তাহার আপত্তি কি তাহা বুঝিলাম না। কেবল একটা প্রভুত্ব দেখান তাহার উদ্দেশ্য। একটী ভদ্রলোক পরিবার লইয়া তাহার এ খাম খেয়ালির জন্য সারারাত বাহিরে কাটাইলেন। পরে এই ঘটনা আমরা D. T. S. সাহেবকে জানাই। তাহাতে ঐই ষ্টেসন বাবুটী সাত ঘাটের জল খাইয়াছিলেন। ঘটনাটা কি শুনুন। কাশীতে আমাদের এক বন্ধুর বাটীতে তাস পাসা খেলা হইতেছে। দেখি বাবুটী সহসা উপস্থিত। আমার সেই বন্ধুটী পরিচয় করাইয়াদিলেন—ইনি রাজঘাটের ষ্টেসন মাষ্টার। সে শ্রীমুখ দেখিয়া তখনই চিনিতে পারিলাম। তিনি আমায় দেখিয়া একটু থতমত খাইলেন। আমি শেষ সকলের সম্মুখে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিলাম। বাবুটী আমাদের নিকট মার্জ্জনা চাহিয়া বলিলেন—"মহাশয়, সব ভুলিয়া যান। আপনারা যে একটা খোঁচা দিয়াছেন তাহাতেই আমায় বদলী হইতে হইল।" একথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল।

এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। দুর্দ্দিনও থাকিল না। মেঘ চলিয়া গেল, বৃষ্টি গেল, প্রভাতে ধরণী সুবর্ণময় সূর্য্য কিরণে স্নাত হইল। আমরা সৈকতভূমিতে গিয়া সর্ব্ব প্রথমে সূর্য্যালোক ঝলসিত মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশের নীচে, সুরধুনীপার্শ্বপ্রতিষ্ঠিতা—সেই সোণার কাশীর অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। পর পার হইতে প্রভাতী হাওয়ায় ভৈরবীর সুর বহিয়া আনিতেছে—বড় মিঠাসুরে নববৎ বাজিতেছে, দামামার মৃদু ধ্বনি উঠিতেছে, কলকল ছলছল শব্দে ভাগিরথীর একটানা স্রোত শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে। গঙ্গা বক্ষে নৌকা গুলি ধীর পবনে দুলিতে দুলিতে এদিক ওদিক চালতেছে। ও পারের প্রস্তরময় দশাশ্বমেধ ঘাটে কাশীবাসী, নর নারীগণ প্রাতঃ স্নান করিয়া পবিত্র হইতেছে—এ দৃশ্য বড় সুন্দর লাগিল। এই স্বপ্ন রাজ্যের মনোমোহন দৃশ্যে অতীতের কষ্ট ভুললাম, প্রবাসের কষ্ট ভুলিলাম—মনে স্বর্গীয় শান্তির আবির্ভাব হইল।

নৌকায় উঠিলাম। সলিল রাশির উপর নাচিতে নাচিতে তরঙ্গ মাথা হইয়া আমাদের নৌকা খানি পাল তুলিয়া ধীর গতিতে পর পারে চলিল। সেই অদূরশ্রুত ভৈরবী সুরে সানাইয়ের আওয়াজ আরও পরিস্ফুট হইয়া কাণে বাজিতে লাগিল। হাওয়ার উপর জাহ্নবী বক্ষে সুরের তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। গৃহের উপর গৃহ—ঘাটের উপর ঘাট, চূড়ার উপর চূড়া, লোকের পাশে লোক—

হইল এমনটী আর কোথাও দেখি নাই। বারাণসীর শোভা দেখিয়া কত কালের সাধ পূর্ণ হইল।

পর পারে বেণীমাধবের ধ্বজা কত উর্দ্ধে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া সেই হিন্দুকীর্ত্তিনাশক ঔরঙ্গজেবের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। পর পারে দশাশ্বমেধ ঘাটে নানা রঙ্গের বস্ত্র পরিয়া কত কুল মহিলা জাহ্নবী সলিলে দেহ প্রক্ষালন করিতেছে। এ জীবনে যাহা দেখি নাই তাহা দেখিলাম। আগামী বারে বারাণসীর অন্যান্য কথা বলিব।

রাজ্ঞীরাজত্বের অবসানে।

চিররবিকরোদ্ভাসিত, মহাদেশত্রয়-বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়া এখন লোকান্তরিতা। সভ্যজগতের রাজন্যবর্গ তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত, তদীয় নানাদিকদেশবাসী অসংখ্য প্রজাপুঞ্জ শোকার্ত্ত। শোক-তরঙ্গ দুস্তর আতলান্তিক পার হইয়া কেনেডায়, প্রশান্ত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায়, ভারত সাগর বাহিয়া আফ্রিকায় ও ভারতে আসিয়া লাগিয়াছে। কি ইংলণ্ডীয়, কি কেনেডীয়, কি অষ্ট্রেলীয়, কি আফ্রিকীয়, কি ভারতীয় সকল হৃদয়ই উদ্বেলিত। শুধু দুর্দ্দণ্ড ব্রিটিস প্রতাপের কেন্দ্র বলিয়া ত ভিক্টোরিয়া সম্মানীতা নহেন, শুধু অগণিত প্রকৃতি-পুঞ্জের ভাগ্যনিয়ন্ত্রীরূপে সমাদৃতা নহেন, পিতৃমাতৃপরায়ণা কন্যারূপে, পতিপ্রাণা সতীরূপে, আদর্শ জননীরূপে, পরদুঃখকাতরা রমণীরূপে, রাজধর্ম্মপরায়ণা রাণীরূপে পুজিতা। এ হেন রমনীর মণি রাণীর বিয়োগে যে দিগন্ত ব্যাপিয়া শোকোচ্ছ্বাস দেখা দিবে খুবই স্বাভাবিক।

এই মহীয়সী রমণীর দীর্ঘ জীবন ত পরিবারের ক্ষুদ্র-গণ্ডিতে আবদ্ধ বা শুধু জাতিবিশেষের ভাগ্যের সহিত সম্বদ্ধ নহে, বিবিধ জাতির নিয়তির সহিত জড়িত! যে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপালনে পুরুষের পুরুষকার হার মানে, যিনি কোমলহৃদয়া নারী হইয়াও আপন মহত্বগুণে তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া গেলেন, তিনি শুধু বিস্তীর্ণ ভূভাগের নয়, মানবহৃদয়েরও রাণী। মানবইতিহাসে তাঁহার রাজত্ব চির-প্রতিষ্ঠিত রহিল। ভিক্টোরিয়ার রাজধর্ম্ম পালন দেখিয়া মনে হয় বুঝি বা রাজলক্ষ্মী স্বয়ং নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া সে ধর্ম্ম আপনি আচরণ করিয়া মানুষকে শিখাইয়া গেলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইংরেজের যে সর্ব্বতোমুখী জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, ইংরেজ তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রাক্কালে ইংলণ্ডের অবস্থা কি দেখি? ইংরেজ রাজদরবার দুর্নীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত, আর ইংরাজসমাজে পাপের স্রোত অপ্রতিহত। ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত রাজা চতুর্থ জর্জ্জের দরবার, দুর্নীতি-পরায়ণতায়, রাজা দ্বিতীয় চার্লসের দরবারের সমকক্ষ ছিল। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নীতিও কলুষিত ছিল। তবে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একটু সাবহিত হইয়াছিলেন মাত্র। রাজার ও রাজদরবারের কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া ও সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজ অভিজাতবর্গের মধ্যেও নীতির বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান রাজদরবার ও ইংরাজ সমাজের অবস্থার সহিত সেই অবস্থায় তুলনা করিলে দেখি স্বর্গ নরক প্রভেদ। ভিক্টোরিয়ার দরবারের দ্বার ছিন্নবিবাহ-বন্ধন পুরুষ কি রমণীর পক্ষে চিররুদ্ধ। তাঁহার পবিত্র সিংহাসন-তলে কলুষিতচরিত্রের জন্য সূচাগ্র ভুমিরও অসম্ভাব। মরকত ভুমে রাজোপম প্রভাবসমন্বিত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পার্নেলের বিড়ম্বনা ও ডিল্কীর ক্ষমতাবিপর্য্যয়ে ইংরাজের যে বিশোধিত নীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মূল উৎস ভিক্টোরিয়ার শুল্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কাঞ্চনশৃঙ্গে। পতিত পাবনী সুরধুনীর ন্যায় ভিক্টোরিয়া-চরিত্রসম্ভূতা নীতি অর্দ্ধ শতাব্দ্যাধিক কাল ইংরাজ সমাজে প্রবাহিত হইয়া ইংরাজ রুচিকে মার্জ্জিত ও ইংরাজ নীতিকে বিশোধিত করিয়াছে।

এই ত গেল নীতির কথা। রাজনীতিতেই বা কি দেখি? ভিক্টোরিয়া রাজত্বের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কালিমাময় ও শোচনীয়। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের প্রারম্ভে দেখা যায় মন্ত্রীদলই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজার ক্ষমতা ও প্রজার স্বত্ব তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র। পার্লেমেণ্ট জাতি-সাধারণের নহে, দেশের প্রধানবর্গেরই মুখপাত্র। তাহার সভ্যপদ অর্থ বিনিময়ে ক্রীত বিক্রীত হইতেছে। রাজকর্ম্মচারী নিয়োগব্যপদেশে মন্ত্রিগণ স্বীয় স্বীয় দলের লোকে মহাসভাপূর্ণ করিতেছেন। ইহাতে অনু-গত প্রতিপালনও হইতেছে, আবার মহাসভায় তাঁহাদের প্রতাপ দীর্ঘকাল একচ্ছত্র ও প্রভুত্ব অটুট থাকিয়া যাইতেছে। উৎকোচের সাহায্যে ওয়ালপোলের বিংশতি বৎসরব্যাপী মন্ত্রীত্ব ও পার্লেমেণ্টের নেতৃত্ব সর্ব্বজন-বিদিত। কথিত আছে প্রস্তাব বিশেষের অনুরোধে স্বীয়

ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত সার রবার্ট ওয়ালপোল একজনকে পাঁচ হাজার এবং অন্ত একজনকে চারি হাজার মুদ্রা উৎকোচ স্বরূপ দেন। কিছুকাল পরে দেখিতে পাই সুচতুর তৃতীয় জর্জ্জ আপন বুদ্ধিজাল বিস্তার করিয়া, কখন অর্থের লোভ দেখাইয়া, কখন বা বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোক সমবায়ে মন্ত্রীদল গঠিত করিয়া পরে ভেদ নীতির সাহায্যে তাঁহাদিগকে হীনবল ও উপেক্ষার বস্তু করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজানুগতবর্গের ক্ষমতা মহাসভায় অপ্রতিহত, পার্লেমেণ্টে মন্ত্রীদল শিখণ্ডিত্ব প্রাপ্ত। কোন্ প্রস্তাব সমর্থন আবশ্যক, কোন্ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ প্রয়োজন রাজা স্বয়ং তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। মন্ত্রীদলের কে কোন বিভাগের মন্ত্রী হইবেন তাহা রাজাজ্ঞা সাপেক্ষ। রাজশক্তির আত্যন্তিক প্রাবল্যে প্রজাশক্তি ক্ষীণ ও নিয়মতন্ত্র কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট, ততোধিক রাজতন্ত্রের ভূতাবিষ্ট। বাগ্মীবর বার্ক, ফক্স প্রভৃতি কয়েক উদারমতি জাতিসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। কিন্তু রাজচক্রান্তে তাঁহারা বিফল-প্রযত্ন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ছলে বলে স্বাভিষ্ট সাধনে রত। বৈধাবৈধ বিচার নাই। কখন বা ভয় দেখাইতেছেন, কখন বা বলিতেছেন তদনভিপ্রেত প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন, কদাপি বা তাঁহার মন্ত্রি-গণকে এই বলিয়া শাসাইতেছেন যে তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পার্লেমেণ্টে বিধি বদ্ধ আইনে স্বাক্ষর করিবেন না। এই কি নিয়মতন্ত্র শাসন?

চতুর্থ জর্জ্জ পিতার ন্যায় ক্ষমতাশালী না হইলেও সুযোগ পাইলে যথেচ্ছাচার করিতে ছাড়িতেন না। তিনি তাঁহার মন্ত্রীদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং মন্ত্রীরাও তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহার অশ্বক্রীড়ারত অগ্রজের অপেক্ষা রাজকার্য্যে অনেক অধিক মনোযোগী ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি প্রজার স্বত্ব ও পার্লেমেণ্টের ক্ষমতা লোপ করিতে বিধিমত প্রয়াস পান নাই সত্য, কিন্তু তিনিও সময় সময় পার্লেমেণ্টের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা পরিচালিত হইয়া মন্ত্রীপরিবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথমতঃ রিফর্ম্ম বিলের সমর্থন করিয়া পরিবারবর্গের ও অবৈধ সন্তানগণের কুপরামর্শে বিরুদ্ধাচরণ করেন। ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত তুলনায় সেই রাজনৈতিক অবস্থা আসমান জমিন তফাৎ। মন্ত্রীগণ কাইসরপত্নীর ন্যায় সন্দেহের অতীত স্থানে অবস্থিত। প্রজার স্বত্ব সুরক্ষিত। রাজ ক্ষমতা সুব্যবহৃত। তাই বলি ভিক্টোরিয়া রাজত্বের নির্ম্মলতা, উদারতা, সুখ স্বচ্ছন্দতা, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা ইংরাজ ভুলিতে পারিবে না। যতকাল ইংরাজ-জাতি থাকিবে ততকাল ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিবে। ভিক্টোরিয়া নাম কণ্ঠের হার করিয়া রাখিবে।

ইংলণ্ড ছাড়িয়া এবার ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। ভিক্টোরিয়ার মত ন্যায়ধর্ম্ম-পরায়ণা রাণী সিংহাসনাধিরূঢ়া না থাকিলে ভারতভাগ্যে কি ঘটিত জানি না। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য যখন প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় ইংরাজকুল "রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল বলদৃপ্ত ইংরাজের কোপদাবানলে পুড়িয়া এদেশ ছারখার হইয়াযাইবে। দয়ার অবতার লর্ড ক্যানিং শত চেষ্টায় এ অনল নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিতে যাইয়া রাণী লিখিতেছেন—"ভারতবাসীদিগের প্রতি এবং বিশেষতঃ —দোষী, নির্দ্দোষী, শত্রু মিত্র এবং সৎ অসৎ নির্ব্বিশেষে সিপাহীগণের প্রতি ইংলণ্ডের জন সাধারণেও অখৃষ্টানভাব প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে লর্ড ক্যানিংএর মত মহারাণীর প্রাণে যে যাতনা ও ক্রোধের উদয় হইতেছে ইহা তিনি সহজেই বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। নিরপরাধিনী অবলা এবং কোমলমতি শিশুগণের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়াই লোকের মনে এই ভীষণ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে। এই সকল ভীষণ নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠাতৃ-গণের পক্ষে কোন দণ্ডই অযথারূপে কঠোর হইতে পারে না, এবং এইরূপ কঠোর দণ্ডবিধান করিবার সময় প্রাণে ক্লেশ হইলেও সমুদায় দোষী ব্যক্তিদিগকে ন্যায়ের কঠোর-তম শাসনে শাসিত করিতে হইবে। কিন্তু জাতি সাধারণের প্রতি—দেশের শান্ত অধিবাসিগণের প্রতি—যে সকল সুহৃদ্ ভারতবাসী আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইংরাজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন—তাঁহাদিগের সকলের প্রতি যার পর নাই সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জানিতে দেওয়া

উচিত যে, তাম্র ত্বকের প্রতি আমাদের কোনও ঘৃণা নাই, বিন্দুমাত্রও নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সুখী, সন্তুষ্ট এবং বর্দ্ধিষ্ণু দেখাই তাঁহাদের রাজ্ঞীর প্রাণের ঐকান্তিকী ইচ্ছা।”

কি মহত্ব! কি উদারতা! কি বিচক্ষণতা! কোমলতা ও দৃঢ়তার কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! ভিক্টোরিয়া! ভিক্টোরিয়া! তুমি কি ভারতের দুর্দ্দিনের বন্ধু, অসময়ের সহায় হইবে বলিয়াই ভারতের বিধাতৃকর্তৃক প্রেরিতা ও রাজপদে অভিষিক্তা হইয়াছিলে? বংশপরম্পরায় ভারতবাসী তোমার এই করুণা-কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। কিন্তু এই কি সব? তা ত নয়। বিদ্রোহান্তে সাক্ষাৎ ভাবে স্বহস্তে ভারতশাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে যে ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল, যে স্বত্বের সনন্দকে আমরা কি কংগ্রেসমঞ্চে কি সংবাদপত্রস্তম্ভে আমাদের 'ম্যাগনা কার্টা' বলিয়া সগর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাতেও যে রাণীরই হস্তাঙ্ক পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিগণরচিত ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপির ভাব ও ভাষা তাঁহার নিকট আপত্তিজনক ও ক্ষেত্রানুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি জর্ম্মাণ প্রবাসে থাকিয়াও লর্ড মামসবারীর দ্বারা মন্ত্রীবর লর্ড ডার্ব্বীকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

“ভারতের ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মহারাণীর কি কি আপত্তি আছে, তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লর্ড ডার্ব্বীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড ডার্ব্বী স্বয়ং তাঁহার সুমার্জ্জিত ভাষায় এই ঘোষণা পত্রখানি রচনা করিলে মহারাণী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন। দেশব্যাপী ভীষণ আত্মদ্রোহের অবসানে, সাক্ষাৎভাবে তাহাদের মাতৃভূমির শাসনভার গ্রহণ করিবার সময়, মহারাণীর রাজত্বের ভাবীকালে যে সমুদায় প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সেই সকল প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়া কি রীতি অবলম্বনে তিনি রাজ্য শাসন করিবেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য, তাঁহার কোটি কোটি পূর্ব্বদেশীয় প্রজাবর্গের নিকটে এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইতেছে, এই সকল কথা উজ্জ্বলরূপে স্মরণ রাখিয়া যেন এই পত্রখানি রচনা করা হয়। বিশেষতঃ এই ঘোষণা পত্র একজন রমণীর নামে প্রচারিত হইতেছে, এই কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়া ইহা লিখিত হয়, মহারাণীর এই বিশেষ অনুরোধ! এইরূপ একটি ঘোষণা পত্রের প্রতি পংক্তির মধ্য দিয়া উদারতার এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার ভাব বহির্গত হওয়া প্রার্থনীয় এবং এতদ্বারা যে ভারতবাসিগণ মহারাণীর ইংরাজ প্রজাবর্গের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমান অধিকার ভোগ করিয়া, সভ্যতার পদাঙ্কচারী সর্ব্বপ্রকারের সুখ সম্পদ লাভ করিবে, এই ঘোষণা পত্রে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ইহ তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।”*

রাণীর এই ইঙ্গিত অনুসরণে ও তদীয় ভাবাবলম্বনে বর্ত্তমান ঘোষণা পত্র রচিত। এই শিলাভিত্তির উপরে ইংরাজের ভারতরাজ্যের বিশাল সৌধ প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে আবার ভারতের রাজন্যবর্গের সিংহাসন ও প্রকৃতিপুঞ্জের ভদ্রাসন সুরক্ষিত। এই সেদিনকার মণিপুর হত্যাকাণ্ডের শোণিতাবর্ত্তে পড়িয়া মণিপুর সিংহাসন কোথায় লুকাইত কেহ খুঁজিয়াও পাইত না। কিন্তু এই ঘোষণা পত্র সেতুস্বরূপ হইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। ড্যালাইসীর সর্ব্বগ্রাসিনী লোলজিহ্বা করাল কালী নীতির স্থলে ইহা অভয়দা, শুভদা বরদা, রক্ষাকালীরূপে বিরাজমানা। ইহাতে ভারতে অনিয়ন্ত্রিত শক্তিযুগের অবসান করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট স্বত্বযুগের সূচনা করিয়াছে। অনিশ্চয়তার উদ্বেগ নাই, অরাজকতার বিশৃঙ্খলতা নাই। দেশে পরমা শান্তি বিরাজিতা। সাধে কি ভারতবাসী মহারাণী বলিতে রাজভক্তিতে গদগদ! দেশব্যাপী এই শান্তির ক্রোড়ে মূর্ত্তিমতী জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষারূপিণী জাতীয় সমিতির জন্ম। ভারতে ভিক্টোরিয়া রাজত্বের এ কি সামান্য গৌরব! রাম রাজ্যে, যুধিষ্ঠিরের একচ্ছত্রে, অশোকের সময়ে বা আকবরের আমলে যাহা সম্ভব হয় নাই ভিক্টোরিয়া রাজত্বে তাহা সম্ভাবিত হইল। এ কীর্ত্তির নিকট সেতুবন্ধ ও শিলালিপি, ইন্দ্রপ্রস্থ ও আগ্রা হার মানিয়াছে। প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় ভারতের নবজীবনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি মুদ্রিত রহিল। ভারত ইতিহাস চিরকাল ভৃগুপদ চিহ্নের ন্যায় এ মুদ্রাঙ্ক সাদরে আপন বক্ষে ধারণ করিবে। ভারতের সুদূর ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও 'পুণ্যশ্লোক ভিক্টোরিয়া' বলিয়া রাণীর পবিত্র ও মহৎ নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়া পিতৃগণের ন্যায় তাঁহার তর্পণ করিবে। মহালয়ায় এই মহামায়ারূপিণী মহিয়সী রমণীর মূর্ত্তি ও স্মৃতি বিস্মৃত হইবে না।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

* উদ্ধৃত অংশগুলি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র প্রণীত ভিক্টোরিয়া চরিত হইতে গৃহীত।—লেখক।

চতুর্থ ভাগ। } ফাল্গুন, ১৩০৭। { ৩য় সংখ্যা।

দাঁড়াও।

দাঁড়াও সুন্দরি ! চক্ষের সম্মুখে ছায়াবাজিপ্রায়
এই বিবর্ত্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চলে যায়—
তার মাঝে তুমি দাঁড়াও সুন্দরি !
একবার দেখি দুটি নেত্র ভরি,'
প্রেমের প্রতিমা, প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি !
দাঁড়াও হেথায়।

আমি তরঙ্গিত আবর্ত্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি,
উচ্ছৃঙ্খল;—করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি ;
তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী !—নীরব,
সহ্য কর ; বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,
সহ নিরবধি—;

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক ;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শান্তি, স্নেহ, একটুক ;
শুষ্ক অবসাদে, এস মাথা রাখি
ও কোমল অঙ্কে ; এস চেয়ে থাকি
ও আনত নেত্রে ; তুমিই একাকী
ফিরায়োনা মুখ।

সব দুঃখ হ'তে, সব পাপ হ'তে, অন্তর ফিরাই
তোমা পানে যেন ; সেথা যেন সদা তোমারেই পাই !
তব ব্রত হোক, প্রীতি পুণ্যভরা,
ওগো শান্তিময়ী, ওগো শ্রান্তি-হরা—
শুধু ভালবাসা, শুধু সেবা করা,
নীরবে সদাই।

যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি নাক,
সব কর ক্ষমা ; হাস্যমুখে দেবী তুমি চেয়ে থাক।
পাতকী নারকী আমি যদি হই,
তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি !
এ অধমে তবু সোহাগে চুম্বয়ি
বুকে করে রাখ।

স্বর্গীয় দিগম্বর সান্ন্যাল।

বনার অন্তর্গত গাঁড়দহ গ্রামে মাতুলালয়ে দিগম্বর সান্ন্যাল মহাশয় ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ভূমি রাজসাহীর অন্তঃপাতী সোমস কলসী গ্রাম এবং ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতা ৺রাজীব চন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় একটি খুনের মোকদ্দমায় পড়িয়া পলাতক হন। সান্ন্যাল পরিবার অতি বৃহৎ ছিল, এই দুর্ঘটনায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। সহসা পরিবারস্থ অনেক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং নানারূপে বিপন্ন হইয়া রাজীবচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের স্ত্রী জগদম্বা দেবী স্বগ্রামের ভদ্রলোকগণের সাহায্য প্রার্থিনী হন। সাহায্য লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই সুযোগে সান্ন্যালদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিয়া বসেন। জগদম্বা দেবী চিরকালের জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিত্রালয়ে আগমন করেন। মাতার নিষেধে দিগম্বর স্বীয় পৈত্রিক গ্রামে আর জীবনে পদার্পণ করেন নাই। মাতুলবর্গ অবস্থাপন্ন ছিলেন, কিন্তু শিশু দিগম্বর ও তাঁহার মাতাকে তাদৃশ আদর দেখান নাই। তেজস্বিনী মাতা সেই গ্রামে পৃথক্ এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে দিগম্বরের ফেরার পিতা ছদ্মবেশে যাতায়াত করিতেন ও অতি কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া পাঠাইতেন, তদ্দ্বারা কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিয়া যাইত।

স্বদেশ-তাড়িত।

আঘাতে আঘাতে লৌহ ইস্পাত হয়, উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে দিগম্বরের চরিত্রবল ও মনের তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এক আনা বেতন মাপ।

দিগম্বর গ্রামের পাঠশালায় পড়িতেন, ও তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন, কিন্তু পাঠশালার /০ আনা বেতন চালাইতে পারিতেন না। কয়েক মাস ক্রমাগত বেতন না দেওয়াতে পণ্ডিত মহাশয় দিগম্বরকে একদিন বিশেষ ভর্ৎসনা ও বেত্রাঘাত করেন। দিগম্বর বলিলেন, "গুরু মহাশয় আমি কোন রূপেই এক আনা বেতন চালাইতে পারি না, আমাদের দুটি সন্ধ্যা ভাতই চলে না," বলিতে বলিতে শিশু দিগম্বর হৃদয়াবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তদবধি তাঁহার মাহিয়ানা লইতেন না।

আশ্রয় চ্যুত।

এই অবস্থায় তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন এবং পড়িবার জন্য বহরমপুরে উপস্থিত হন। এখানে গাঁড়দহ নিবাসী প্রেমলাল নাগ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগম্বরকে আশ্রয় দান করেন। দিগম্বর বৃত্তির চারিটি টাকা মাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতেন এবং প্রেম বাবুর বাসায় দুটি খাইতে পাইতেন; কিন্তু এ সুখ তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন রহিল না। প্রেম বাবুর বাসায় অনেকগুলি ছাত্র থাকিয়া পড়া শুনা করিত। তন্মধ্যে বাবুর নিতান্ত আত্মীয় একটি ছাত্রপ্রবর গণিকালয়ে চুরি করিয়া অপরাধগ্রস্ত হওয়ায় নাগ মহাশয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাসার সমস্ত ছাত্রকেই তাড়াইয়া দেন। কেবল দুঃখের সহিত দিগম্বরকে বলেন—"দিগম্বর, শুধু তোমাকে অন্যত্র যাইতে বলিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমি বড় ভাল ছেলে; কিন্তু কি করিব, আমি এরূপ অবস্থায়ই পড়িয়াছি যে, এক জনকে তাড়াইয়া অপর কাহাকেও আমার রাখিবার উপায় নাই।"

সহাধ্যায়ীর সহানুভূতি

অন্যান্য বালক যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল, নিঃসহায় দিগম্বর স্কুলের পুস্তক কয়েকখানি লইয়া প্রাতে বাহির হইয়া গেলেন ও এদিক সেদিক ঘুরিয়া স্কুলের সময় স্কুলে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে স্কুল ছুটি হইল, সারাদিন উপবাস করিয়া দিগম্বর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেলা অবসানে দিগম্বর চতুর্দ্দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? এতদবস্থায় শীর্ণ ও শুষ্ক মুখে তাঁহাকে রাস্তায় বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার একজন অবস্থাপন্ন সহপাঠী তাঁহাকে বলিল, "দিগম্বর, তুমি স্কুলের পর বাসায় যাও নাই? তোমায় এমন দেখাইতেছে কেন?" দিগম্বর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কষ্টের সহিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বলিলেন। সহপাঠী শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন—"তোমার কোন কষ্ট আর ভোগ করিতে হইবে না, এস আমাদের বাড়ীতে

থাকিবে।" বন্ধু অতি যত্নে তাঁহাকে হাত ধরিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন; এবং তাঁহাকে বিশেষ আদরে তথায় রাখিলেন। দিগম্বরের আহারের ও থাকিবার সমস্ত সুবিধাই হইল।

যে ঘরে দিগম্বর শুইতেন, সেই ঘরে তাঁহার সহাধ্যায়ীও একটি বড় বিছানায়, অপর পার্শ্বে, শুইতেন। একদিন দিগম্বর প্রাতঃকালে তাঁহার শয্যার অনতিদূরে একটি বড় মুক্তার মালা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিস্মিত বালক ঝিকে মুক্তার মালা দেখাইয়া বলিলেন, "একি?" ঝি মৃদু হাস্যে রহস্য চাপা দিয়া "আমাকে দাও" বলিয়া মুক্তার মালাটি লইয়া চলিয়া গেল। দিগম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইলেন, ভৃত্যটিকে এই ঘটনার গূঢ় মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে সে এক জঘন্য অভিনয়ের বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইল। সেই বাড়ীর পার্শ্বে তাঁতি বাবুদের বাড়ী ছিল, তাঁহারা আঢ্য লোক ও তাঁহাদের একটি বউ দুশ্চরিত্রা ছিল। সহাধ্যায়ী বন্ধু-প্রবরের এই কীর্ত্তি অবগত হইয়া দিগম্বর দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, আমি অতি গরিবের ছেলে, আমার ভাত জোটে না। তোমরা বড় মানুষ, তোমাদিগকে সকলই সাজে। তবে যে পথে চলেছ, সে পথ ভাল নহে, উহা ত্যাগ কর। আমি বড় ভীত হইয়াছি, এখানে থাকা আমার সাহসে কুলায় না; আমায় ক্ষমা করিও, আমি চলিলাম।" বন্ধুবরের নানারূপ অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া দিগম্বর আহারাদি না করিয়াই পুঁথি কয়েকখানি লইয়া আবার রাস্তার উপর দাঁড়াইলেন। কে কোথায় স্থান দিবে, আহার দিবে, এ চিন্তা বালকের মনে একবারও হয় নাই; যে ধর্ম্মনীতিপ্রসূত ভীতি ও সাবধানতা তাঁহার চরিত্রটিকে সমাজের ভূষণস্বরূপ করিয়াছিল, তাহা, তাঁহাকে বিপদ ও দুঃখ তুচ্ছ করিয়া বিলাসের গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া আসিল। সারাদিন স্কুলে পড়া শুনা করিয়া অনাহারে অবসন্ন অবস্থায় দিগম্বর সন্ধ্যাকালে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্র। কোথায়ও থাকিতে স্থান না পাইয়া আসিয়াছি। যদি মহাশয় দয়া করিয়া বাসায় আশ্রয় দেন।" অনুসন্ধানে গৃহস্বামী জানিলেন, দিগম্বর স্কুলের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে, সুতরাং যত্নের সহিত তাহাকে বাসায় রাখিলেন। এ বাসায় আহারের বড় অসুবিধা ছিল, রাত্রি ১২টা কি ১টার সময় রান্না প্রস্তুত হইত। বাসার অপরাপর সকলে নিজ পয়সায় খাবার খাইতেন। দিগম্বর কিছুই খাইতেন না, পরন্তু বালক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রাত্রি ১০টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। কেহ তাঁহাকে জাগাইত না, এ অবস্থায় অনেক দিন রাত্রিকালে দিগম্বরকে উপবাসে যাপন করিতে হইত। সে হাঁপানি কাশিতে দিগম্বর ভবিষ্যতে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই উপবাসজনিত কষ্টেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। এক দিন বালক স্কুল হইতে আসিয়া ঝিকে বলিল "ঝি, আজ আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে আমার কিছু খাবার দিতে পার?" ঝি বলিল "কি দিব বাছা? কিছুই নাই, রাত্রে রান্না হইলে খাইবে।" অনাহারে শুষ্ক মুখে পড়িতে পড়িতে দিগম্বর ঘুমাইয়া পড়িলেন, কেহ তাঁহাকে জাগাইয়া খাওয়াইল না। পরদিন প্রাতে দিগম্বর দাঁড়াইতে পারেন নাই,—ঝিকে বলিলেন "আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমায় চারিটি চাল দেও, আমি রান্না করিয়া খাই।" ঝি চারিটি চাল দিল, দিগম্বর তাহা চড়াইয়া দিয়া মনে করিলেন, বাসার গাছে বড় বড় করমচা হইয়াছে, তাহার কয়েকটা ভাতে দিলে খাইতে পারিবেন। এই মনে করিয়া করমচা ভাতে পাক করিলেন। আহার করিতে বসিয়া ঝির নিকট একটুকু লবণ চাহিলেন। ঝি বলিল "নুন বাসায় নাই, বাজার হইতে আনিতে দেরি হইবে।" দিগম্বর ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন, লবণাভাবে ভাত অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়াছে। নুন পাইবেন না জানিলে তিনি করমচা ভাতে দিতেন না। এখন আর খাইতে পারেন না। উপবাসী দিগম্বরের ভাত মুখে তুলিতে চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। ভাত আর খাওয়া হইল না। সেই দিন বড় কষ্ট হইল, দিগম্বর পুঁথি কয়েকখানি লইয়া আবার তাঁহার প্রথমকার আশ্রয়, আদি মুরব্বি প্রেম লাল নাগ মহাশয়ের নিকট যাইয়া কাতরভাবে বলিলেন, "আমার কোন স্থানে থাকিবার সুবিধা হইল না, আমাকে আশ্রয় দিন্। প্রেম বাবু সাশ্রুচক্ষে দিগম্বরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাছা তোমাকে তাড়াইয়া দিয়া আমি বড়

মুক্তার মালা-রহস্য।

নূতন আশ্রয়।

করমচা ভাতে।

বন্ধু প্রেম লাল নাগ মহোদয়।

অনুতপ্ত হইয়াছি, তুমি আমার এইখানেই থাক।"* এই অবধি দিগম্বরের বাসস্থানের কষ্ট দূর হইল।

লুচি ভাজায় বিঘ্ন।

দিগম্বর এই সময় পূজার ছুটিতে একবার মাতুলালয় গিয়াছিলেন। তিনি লুচি ভাজায় অতি সুদক্ষ ছিলেন। মাতুল মহাশয় একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "দিগম্বর, কল্য প্রাতে তোমায় লুচি ভাজিতে হইবে, সকাল সকাল স্নান করিয়া প্রস্তুত হইও।" প্রাতে একটুকু মেঘ হওয়াতে রৌদ্র উঠে নাই, দিগম্বর কাপড় খানি পরিয়া স্নান করিয়া চাদর খানি পরিলেন ও কাপড় শুকাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রৌদ্র না উঠাতে বিলম্ব হইতে লাগিল, দেরি দেখিয়া মাতুল মহাশয় দিগম্বরকে খুঁজিতে বাহির হইলেন; দূর হইতে মাতুলকে দেখিতে পাইয়া দিগম্বর অতি তাড়াতাড়ি অর্দ্ধ সিক্ত কাপড় খানি পরিয়া ফেলিলেন এবং মাতুল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতুল মহাশয় কাপড়ে হাত দিয়া বুঝিলেন, উহার অনেকটাই শুকায় নাই ও ভিজা কাপড় ত্যাগ করিতে বলিলেন। দিগম্বর নিরুত্তর রহিলেন; মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক খানি কাপড়?" বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে দিগম্বর বলিলেন, "আমার এক খানি কাপড় ও একখানি চাদর।" ইহাই তাহার স্কুলে যাওয়ার ও সর্ব্বদা পরিবার সম্বল এবং ইহাতেই তাঁহার বৎসর কাটে। মাতুল মহাশয় হৃদয়াবেগে দিগম্বরের গলা জড়াইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন এবং তখনই নিজে বাজারে যাইয়া ৪ জোড়া কাপড় এবং ৪ জোড়া চাদর কিনিয়া তাঁহাকে দিলেন। দিগম্বর বাবু বলিতেন, "সেই অবধি আমি কাপড়ের কষ্ট পাই নাই।"

৪ জোড়া কাপড় ও ৪ জোড়া চাদর

হস্ত লিখিত পুঁথি।

এই দরিদ্র কিন্তু দুঃখ-সহিষ্ণু বালকের অদম্য অধ্যবসায়ের বিষয় কি বলিব, এল্ এ, পর্য্যন্ত তিনি যত পুস্তক পড়িয়াছেন, তাহার এক খানিও ছাপা পুস্তক নহে, ছাপা বহি কিনিবার অর্থ সংস্থান ছিল না। দিগম্বর নিজ হাতে সমস্ত পাঠ্য পুস্তক নকল করিয়া লইয়াছিলেন! বহু কৃচ্ছ্র লিখিত বহু বর্ষের পুঁথি গুলি তিনি অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং সাহিত্য ভূগোল প্রভৃতি সকল পুস্তকই তিনি হাতে লিখিয়া লইয়া ছিলেন। উদীয়মান প্রতিভাকে দারিদ্র্য আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, দিগম্বরের জীবনে আমরা সর্ব্বদা ইহা লক্ষ্য করিবার সুবিধা পাই।

পায়ে ফোস্কা।

তিনি যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন সহপাঠিগণ তাঁহাকে জুতা পরিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ক্লাসের সকল ছেলেরই পায় জুতা, দিগম্বর তাহাদের সাগ্রহ অনুরোধ অর্থাভাবে রাখিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে উঠিলে সহপাঠিগণ বিশেষ পীড়ন আরম্ভ করিলেন ও চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে জুতা কিনিয়া দিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অগত্যা দিগম্বর ॥৵০ আনা মূল্যে এক জোড়া জুতা কিনিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু দিগম্বর বলিয়াছেন, তিনি সে জুতা দু এক দিন পরিয়া আর পরিতে পারেন নাই,—'আমি জীবনে জুতা ব্যবহার করি নাই, প্রথম জুতা পরিয়া পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়িল, তাহা সারিতে ২।৩ মাস লাগিয়াছিল।"

নিজ মুখে বলিতেন।

এই আখ্যায়িকার সমস্ত বৃত্তান্তই আমরা তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি। যখন এগুলি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তখন তাঁহার আয় রাজার মত। নিজের পূর্ব্ব জীবনের দৈন্যের বিষয় উল্লেখ করিতে সাংসারিক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিগণ লজ্জাবোধ করেন,—কিন্তু দিগম্বর হীন অবস্থাতেও যেরূপ ছিলেন, অবস্থাপন্ন হইয়াও সেইরূপই ছিলেন। তাঁহার সারল্য, দৈন্য ও একান্ত আড়ম্বরশূন্যতা, এই জন্যই তাঁহার বন্ধুবর্গের অকপট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

দারিদ্র্যের শিক্ষা।

শৈশব ও প্রথম যৌবনে দিগম্বর অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইয়াছিলেন, এজন্য তিনি শেষে অন্ন বস্ত্র দানে এরূপ মুক্তহস্ততা দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি শুনিতেন, কেহ খায় নাই, কাহারও পরিবার কাপড় নাই, দিগম্বর তখন উতলা হইয়া পড়িতেন; সে কথা আমরা পরে লিখিব।

একুনে ১৪ ্ টাকা বৃত্তি।

দিগম্বর ৪ ্ টাকা ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বৃত্তি ৪ বৎসরের জন্য ছিল; কিন্তু তিনি তিন বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পাছে পীড়া কিংবা অন্য কোন বাধায় এক বৎসর নষ্ট হয়,

* দিগম্বর বাবু শেষ সময়ে এই নাগ মহাশয়ের বহু তীর্থ পর্য্যটনের সমস্ত খরচ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন।

াহা হইলে পড়া চলিবে না, এই আশঙ্কায় এক বৎসর াতে রাখিয়া দিগম্বর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা ত্তি পাইলেন; এখন এক বৎসরের জন্য তাঁহার ছাত্র- ত্তি ৪৲ টাকা এবং এণ্ট্রান্সের বৃত্তি ১০৲ টাকা, একুনে ১৪৲ কা মাসিক বৃত্তি পাওয়ার কথা; কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব লিলেন, "দুই বৃত্তি এক সঙ্গে পাওয়ার নিয়ম নাই, ৪৲ কার ছাত্রবৃত্তি রহিত হইবে।" কয়েক জন প্রফেসর ়্য পড়িয়া প্রিন্সিপাল সাহেবের দ্বারায় এ বিষয়টি ডিরে- র এ্যাটকিনসন সাহেবের বিচারাধীন করাইলেন। ডিরে- র আদেশ করিলেন, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নিয়ম নাই, সুতরাং এই ছাত্রটি দুই বৃত্তিই পাইবে। ভবিষ্যতে কেহ এভাবে দুই বৃত্তি পাইবে না, এ বিষয়ে তখনই সরকুলার হইল। এই ১৪৲ টাকার সমস্তই তিনি মাতাকে পাঠাই- তেন।

পিতার মৃত্যু।

ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ছদ্মবেশ- ধারী পিতা দিগম্বর বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দিগম্বরকে পাইয়া তিনি কত সুখী হইয়াছিলেন,— কিন্তু সেই দিনই তাঁহাকে সন্ন্যাস রোগে ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হয়। দিগম্বরের নিজের মৃত্যুও এইরূপ শোচনীয় ভাবে ঘটিয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

পাঠত্যাগ ও চাকরী আরম্ভ।

তিনি ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার সময় জ্বর রোগে আক্রান্ত হন, তথাপি কোনও রূপে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন; অঙ্কের পরীক্ষার দিন কোন সহাধ্যায়ী বন্ধুপ্রবর দিগম্বরের লিখিত উত্তরগুলি চুরি করিয়া এক বিভ্রাটের অভিনয় করেন। এইরূপ নানা কারণে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ হইল না। যদিও পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার ভাগ্যে এবার বৃত্তি লাভ ঘটিল না। পরীক্ষার পর দিগম্বরের মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে চাকরী লইতে বাধ্য করিলেন। ৬০৲ টাকা বেতনে তিনি বহরমপুর স্কুলের হেডমাষ্টারী পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, এই ৬০৲ টাকা বেতনে চাকরী করার কালে তিনি যেরূপ সুখী ছিলেন, জীবনে আর সেরূপ সুখ ঘটে নাই। এক বৎসর মাত্র তিনি মাতৃপাদপদ্ম পূজা করিতে পাইয়াছিলেন, মাতার কথা কহিতে বৃদ্ধকালেও তাঁহার কণ্ঠ স্নেহে কম্পিত হইত, তিনি শিশুর মত হইয়া যাইতেন। এক বৎসর পরে মাতৃ- বিয়োগ হইলে, তিনি ওকালতি পাশ করিয়া প্রথমতঃ ২৪ পরগণায় আসিলেন। তথায় হাঁপানি রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় দিগম্বর ফরিদপুরে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করি- লেন।

ফরিদপুরের তদা- নীন্তন অবস্থা।

তখন ফরিদপুর নূতন জেলা হইয়াছে। মোক্তারগণের অসাধারণ পসার এবং প্রতিপত্তি। বড় বড় উকিলগণও মোক্তারবর্গকে তোষামোদ ও যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদান করিয়া স্বীয় পসার অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। অনেক স্থলেই মোক্তারগণ উকিল- দিগের প্রাপ্য হইতে শতকরা ৭৫৲ টাকা কাটিয়া রাখিতেন। নবযৌবনদৃপ্ত, সাহসী ও প্রতিভাশালী দিগম্বর নানারূপ বিঘ্ন ও শত্রুতা দলিত করিয়া অতি শীঘ্র উকিলগণের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমতঃ প্রতিপক্ষীয়গণের বাধায় তিনি ফরিদপুর ছাড়িয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শুধু মোক্তারবর্গ নহেন, বৃদ্ধ উকিলগণ পর্য্যন্ত দিগম্বরকে অপদস্থ করিয়া তাড়িত করিবার জন্য বিশেষ যত্নপর ছিলেন। কেহ কেহ হাকিমগণের নিকট বিচারালয়ে এই ভাবে বক্তৃতা করিতেন, "হুজুরের অবিদিত কোন আইন নাই, এই বালক হুজুরকে আইন শিখাইতে আসিয়াছে, ইহার প্রত্যেক কথা ধৃষ্টতাপূর্ণ, হুজুর ইহাকে কখনই প্রশ্রয় দিবেন না।" কিন্তু

হুজুরকে এ বালক আইন শিখাইতে চায়।

ষড়যন্ত্র বিফল হইল, ফরিদপুরে যে সকল হাকিম আসিয়াছেন, প্রত্যেকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ আইনজ্ঞ প্রতিভাশালী উকিল আর নাই। নজির প্রদর্শনে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল—তথাকার শ্রেষ্ঠ উকিলগণের নিকট শুনিয়াছি—দিগম্বর বাঁবু নথি পত্র দেখিয়া মোকদ্দমা এরূপ নূতন ভাবে দাঁড় করিতেন, তাহা আইনের এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইত যে, প্রতিপক্ষের উকিল- গণ তাঁহাদের অচিন্তিত এক নূতন মূর্ত্তিতে মোকদ্দমাটিকে দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন এবং হাকিমবর্গ তাঁহার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হইতেন। গৃহে তিনি মৃদু ও কমনীয় স্বভাবের জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কথা সলজ্জ সম্ভ্রমে একেবারে বাধ বাধ হইয়া যাইত; বিনয়াম্বিত

পূর্ব্ববঙ্গের অদ্বি- তীয় উকীল

ভাষা অতিশয় ভদ্রতায় কণ্ঠে বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু বিচারালয়ের সান্নিধ্যে এই মৃদুস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিটি সিংহ-বিক্রান্ত হইতেন। তিনি জজ এবং সবজজের আদালত ভিন্ন কখনও ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ কিম্বা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়ে যান নাই। প্রচুর অর্থের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় সম্মান অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অপর্যাপ্ত অর্থে উপেক্ষা করিয়া তিনি কখনও মফস্বলে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তির কার্য্য অনেক সময় অর্থ গ্রহণ না করিয়া নিজে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সম্পন্ন মক্কেলের নিকট তাঁহার দাবীর এক কপর্দ্দকও হ্রাস করেন নাই। তাঁহার rate এত বেশী ছিল যে, তাহা একরূপ নিষেধাত্মক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তাঁহার কার্য্যের অবধি ছিল না। তিনি যাহার কার্য্য হাতে লইতেন, প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহার হাতে মোকদ্দমাটি দিতে পারিলে মক্কেল একবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে কাঞ্চনপুরের সাহাদের মোকদ্দমার জন্য অপরিমিত পরিশ্রমই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ। প্রাতঃকালে তিনি কাহারও সহিত বাক্যব্যয় করিতেন না। যাঁহার ভদ্রতার খ্যাতি দেশ-ব্যাপক ছিল, তিনি কর্ত্তব্য এবং ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন না করিয়া উভয় বিষয়েরই কিরূপে আদর্শ হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

তাঁহার আয় এবং ব্যবসায়ে উদারতা ও মহত্ব।

দিগম্বর বাবু প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জেলা কোর্টে এত অর্থ উপার্জ্জন অল্প সংখ্যক উকিলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যে বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়, সে বৎসর তাঁহার অনূ্যন ৫০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। কাঞ্চন পুরের সাহাদের মোকদ্দমায় তিনি রোজ ১০০৲ টাকা হিসাবে ৩৬০০০৲ টাকা ও অপরাপর কার্য্যে ১৫।১৬ হাজার টাকা অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। এক সবজজ ও জজের কোর্টে যাইয়া তিনি এই রাজযোগ্য উপস্বত্ব লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি অর্থলোভী ছিলেন না, অর্থ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। কর্ত্তব্য ও সুনীতিই তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। একবার এক মক্কেলের কাজের জন্য তিনি ২৫০০৲ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার উকিল বন্ধু হরবিলাস বাবু আসিয়া বলিলেন, "দিগম্বর বাবু, আমার একটি নিজের কার্য্যে আপনাকে এই দুই তিন দিন খাটিতে হইবে।" দিগম্বর বাবু ইহার পূর্ব্বেই অন্যের মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিয়া অর্থ লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বন্ধুকে আপ্যায়িত করিতে তাঁহার ক্রটী হইল না। তিনি হর বিলাস বাবুর অবৈতনিক কার্য্য লইলেন এবং বলিলেন "আমারও একটি কাজ আপনার করিতে হইবে।" গোপনে মক্কেলকে ডাকিয়া ২৫০০, টাকা ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমাদের মোকদ্দমার সমস্ত পরিশ্রম নিজে করিয়া উপদেশ দিব, হর বিলাস বাবু তোমাদের কাজ করিবেন; ইঁহাকে ৫০০৲ টাকা দিলেই হইবে। আমার উপদেশাদির সুবিধা পাইবে, অথচ তোমাদের ২০০০, টাকা বাঁচিয়া যাইবে।" তিনি বন্ধুদের জন্য এইরূপ ত্যাগপরায়ণ ছিলেন। তিনি বিচারালয়ে স্বীয় মোকদ্দমার কথা ব্যতীত হাকিমের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য কখনও একটি কথাও বলেন নাই। একবার জজ পসফোর্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁহার একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। তিনি তদবধি তাঁহার এজলাসে আর যান নাই। সেই কোর্টের মোকদ্দমার জন্য মক্কেলগণ তাঁহাকে যে কয়েক সহস্র টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন, তাহা তিনি ফিরাইয়া দেন। পসফোর্ড দীর্ঘ কাল ফরিদপুরে ছিলেন, সে সময়ের জন্য দিগম্বর বাবু শুধু সবজজের আফিসে কাজ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার আয় যেরূপ, সেইরূপই ছিল। তাঁহার ওকালতী ব্যবসায়ে মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত আমরা অনেক জানি, সে সকল এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহার দেবপ্রতিম দয়া যাহা চন্দ্র রশ্মির ন্যায় জীর্ণ কুটীর ও কাঙ্গালের ঘরে পড়িয়া শোভা পাইয়াছে, তাঁহার

উন্নত চরিত্র।

উন্নত চরিত্রমাধুর্য্য অমর বর্ণে আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিনিয়া খাইতে কষ্ট হয় না।

তিনি দাড়িম, আম, আক, জাম প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ বাটীর ভিতরে রোপন করিতে দিতেন না। তাহার বাসার বাহিরে রাস্তার ধারে যে গুলি ফলবান হইত ও দর্শকগণ ইচ্ছাক্রমে তাহা পাড়িয়া লইয়া যাইত। মুকুলিত আম্র ও জাম, শিশু মণ্ডলীর দ্বারা, ফলের পরিপক্কতা লাভ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা উপদ্রব

ছত। তিনি বলিতেন—"যে ফলটি যাহার ভাল লাগিবে, াহার সেবায় তাহা অর্পিত হইলে কত আনন্দের বিষয়। গবান আমাদিগকে এমন অবস্থায় রাখিয়াছেন যে, ামাদের কিনিয়া খাইতে কষ্ট হয় না।"

তাঁহার তিনটি ছাগ ছিল, কাছারি হইতে আসিলে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সেই পুণ্যচিত্র ঋষির আশ্রমের একটি দৃশ্যের মত দেখাইত। তাঁহার বৈকালে জল খাবার ২টি রসগোল্লার ১২টি আগে তাহাদিগকে ভাগ িরিয়া তার পর আধখানি নিজে খাইতেন! এদিকে বিপুলদহ অপর্য্যাপ্ত রূপে সুস্থ ও বলিষ্ঠ ১৬ জন ঘরামি, ৮ জন বহারা এবং বহুসংখ্যক ভৃত্য লুচি মণ্ডা ও সন্দেশের স্তূপ াজভোগের জিনিস খাইত, তিনি তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট ইতেন। একদা অসুস্থতা হেতু ডাক্তারের উপদেশে ্প প্রস্তুত করার জন্য একটি পাঁঠা কিনিয়া আনিয়া াড়ীতে গোপনে কাটা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া দিগম্বর াবু যেরূপ বিরক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সেরূপ বিরক্তি কহ কখনও দেখে নাই। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে াহিয়াছিলেন ও অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "অন্যে াহা বিবেচনা করে করুক, আমি বড় দুঃখী, এই দুঃখময় চ্ছ জীবনরক্ষার জন্য, যে ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইত, তাহার াণ নষ্ট করিব? তাহার অগ্রে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

ছুটিয়া খেলিয়া ড়াইত, তাহাকে ় করিব?

তাঁহার ভৃত্য, ঘরামি, বেহারা প্রভৃতিকে সর্ব্বদা বলিতেন,— "তোমাদের বাড়ীর লোকদের খাইবার ও পরিবার জন্য যেন কষ্ট না হয়"—অনেক সময়েই সে টাকা তাহাদের বেতন হইতে াটা যাইত না। তাঁহার বাড়ীতে বৎসরে প্রায় দুই হাজার াকার কাপড় ক্রয় করা হইত। তিনি অনেক সময়ই, শেষতঃ গ্রহণাদি উপলক্ষে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান করিতেন। াহার বাড়ীতে যে ব্যক্তি কোনও কালে কয়েক দিনের ন্যও থাকিয়া গিয়াছে, পূজার সময় তাহাদিগকে বস্ত্রাদি াঠাইয়া দিতেন। বৎসর বৎসর এই প্রভূত বস্ত্র ফরিদপুরের দ্রকুমার নাথ নামক বস্ত্র-বিক্রেতার দোকান হইতে ানীত হইত, অথচ তাঁহার লোক সর্ব্বদা কলিকাতায় তায়াত করিত।—ফরিদপুরে এই কাপড় গুলি কলিকাতা ইতে আনিলে তাঁহার অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি স্থানীয় দোকানদারগণের আশা নষ্ট করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি চিরদিনই খড়ের ঘরে জীবন কাটাইয়া গেলেন। তাঁহার দু তিন মাসের আয়েই দিব্যি বাড়ী হইতে পারিত, বহুসংখ্যক খড়ের ঘর একত্র করিয়া অগ্নি ও চোরের ভীতি সহ্য করিয়া তিনি আজীবন কষ্টে ছিলেন। মৃত্যুর বৎসরে তাঁহার আয় ৫০,০০০৲ টাকা হইয়াছিল, অথচ হঠাৎ মরিয়া গেলেন পরে সিন্দুকে মাত্র ২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এরূপ অজস্র ব্যয়ী হইয়াও তিনি নিজ সুখের জন্য এক কপর্দ্দকও খরচ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "কোটা বাড়ী দিলে ঘরামিগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে, কোটা বাড়ীর কথা শুনিলে ইহাদের মুখ কাঁদ কাঁদ হয়, আমি ইহাদিগের বহু দিন হইতে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।"

আশ্রিতের প্রতিপালন।

তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফও নাই। যেখানি এই প্রবন্ধসহ দেওয়া হইল, তাহা কানাইপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সিকদার মহাশয় শ্মশান ঘাট হইতে তাঁহার মরণান্তে তুলিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ বোরণ এবং সেফার্ড কোম্পানীর দ্বারদেশে গাড়ী স্থগিত করিয়া তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ তোলার জন্য এক দিন কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে এ কার্য্যের সার্থকতা বুঝাইতে পারেন নাই। "এই জন্য যে টাকা খরচ করিতে, তাহা গরীবকে দেওয়া যাইবে" বলিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন।

শরীরের প্রাপ্য।

এই স্বীয় সুখচিন্তাবর্জ্জিত একান্ত অনাড়ম্বর ব্যক্তিটি যখন দরিদ্রদিগকে দান করিতেন, তখন মহারাজার ন্যায় মুক্তহস্ততা দেখাইয়াছেন। বৎসর বৎসর অসংখ্য দরিদ্র তাঁহার বাড়ীতে খাইতে পরিতে পাইত। সেই মহোৎসব-চিত্র-উদ্ভাসিত দয়াপূর্ণ দীন দুঃখীর অযাচিত বন্ধু দিগম্বরের মূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার মানসপটে তাহা চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। অসংখ্য দরিদ্রমণ্ডলী যেন তাঁহার বড় এক পরিবার, তিনি যেন তাহাদের ভরণপোষণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। একান্ত অশক্ত শরীরে তিনি নিজে অনেক সময়ে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন ও কোন দীন দুঃখীর নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তি এবং খাইবার আগ্রহ দেখিলে

দরিদ্রদিগকে দান।

সাশ্রু-নেত্র হইতেন। এ জীবনে সেই দেবমূর্ত্তি ভুলিবার নহে।

তেজ ও বিনয়

তাঁহার বিনয় ও দৈন্যের সীমা ছিল না। একজন সামান্য ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে গেলেও তিনি নিজে উঠিয়া হাত ধরিয়া তাকিয়ার নিকট বসাইতেন। অভ্যাগত গুরুতুল্য, তাঁহার এই নীতি-অনুষ্ঠান আমাদের চক্ষে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সামান্য এ্যাপ্রেণ্টিস কি কেরাণীকেও কত সম্মান ও আদর দেখাইয়া নিজ হাতে তাম্বূল দিতেন। এদিকে কোন জজ ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহার বাড়ীতে পূর্ব্বে না আসিলে তিনি আগে দেখা করিতে যাইতেন না!

স্ত্রীজাতির সম্মান।

দিগম্বর বাবুর সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল—স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাব। স্ত্রীলোককে এত সম্মান করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার ভাষা শিশুর ন্যায় কোমল হইয়া যাইত, কোন স্ত্রীলোকের কথা পাড়িলে তাঁহার মূর্ত্তি কেমন সুন্দর দেখাইত, যেন তাহাতে মাতৃভাবটি সজীব হইয়াছে। এমন নির্ম্মলতা ও সুকুমারতা, আমাদের ইন্দ্রিয় তাড়িত সমাজে বড় বিরল দৃশ্য। একদিন দিগম্বর বাবু মনে করিলেন, বেশ্যারা সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া অবশ্য মনে মনে একটুকু কষ্ট পায়; সকলে যখন নিমন্ত্রণ খাওয়ার কথা বলে, তখন তাহারা মুখ ছোট করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কোন গৃহস্থ খাওয়ায় না। তাহারা যাহাই হউক না কেন, তাহারা স্ত্রীলোক। আমি মায়ের মতনই দেখি, আমি তাহাদিগকে খাওয়াইব।" সহরের সমস্ত বেশ্যা নিমন্ত্রিত হইল, তিনি শিশুগণকে দিয়া তাহাদের পরিবেশন করাইলেন, ভোজনান্তে বেশ্যাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহারা বলিল "আপনি আমাদিগকে ঘৃণা করেন না"। ইহা শুনিয়া দিগম্বর সাশ্রুনেত্র হইয়াছিলেন। জীবনে আমি পঞ্চাশোর্দ্ধে এই একটি মাত্র বালক দেখিয়াছি। যাহাদের স্বভাব খারাপ এবং যাঁহারা নীতি ধর্ম্ম ও চরিত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নির্লজ্জভাবে কুকার্য্যে রত হইয়াছেন, দিগম্বর বাবু তাহাদের প্রধান ভয়ের কারণ ছিলেন। কুনীতির অকুণ্ঠিত-ভাবে সেবাপরায়ণ সরল বক্তা একটি পদস্থ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, তিনি যে দিন মদ বেশী খাইতেন ও প্রকাশ্যভাবে কুকার্য্য করিতেন, সে দিন দিগম্বর বাবু শুনিয়া কি বলিবেন ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেন, অথচ তিনি স্বীয় পিতাকেও এ বিষয়ে গ্রাহ্য করেন নাই।

আত্মতৃপ্তির সুখ

দিগম্বর বাবু, তাঁহার চরিত্র ও বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর কীর্ত্তন শুনিতে চাহিতেন না। আত্ম-প্রশংসাসূচক কোন প্রসঙ্গ শুনিলে নিতান্ত লজ্জিত হইতেন, এবং "আমি ইহা করিয়াছি" এই ভাবের কোন কথা তাহার মুখে কখনও শুনিতে পাই নাই; তাঁহার আমিত্ব যেন লোপ পাইয়াছিল। যে অর্থ তিনি বিতরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি সাধারণের নিকট বিখ্যাত ও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপ আদৃত হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি নিন্দা ও প্রশংসার উর্দ্ধে যে আত্মতৃপ্তির এক স্থনির্ম্মল রাজ্য আছে, তাহারই অধিবাসী ছিলেন। গোপনে সুকাজ করিয়া সুখী হইতেন। যে মুহূর্ত্তে সৎকাজের ঘোষণা আরম্ভ হইল, সেই মুহূর্ত্তেই নিজের মনের তৃপ্তিজনিত সুখটুকু ঘুচিয়া যায়। তিনি একটি অমৃতকুণ্ডের মক্ষিকার ন্যায় পরহিতব্রতে আত্মহারা ছিলেন,—বাহিরের ভনভন্ প্রকৃত সুখের আস্বাদনের ব্যাঘাত-কর। যাহারা তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিত, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বৎসর বৎসর দোলযাত্রার উপলক্ষে সমস্ত সহরের লোকবৃন্দ তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার, তাঁহার বিপুল আয়োজন অপেক্ষাও নিমন্ত্রিতদিগকে বেশী আপ্যায়িত করিত। দোলযাত্রা উপলক্ষে তাঁহার বাসায় প্রতি বৎসর কীর্ত্তন গান হইত। প্রতি বৎসরই শৃঙ্খলার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দোল যাত্রায় কয়েক জন

শেষ দোলোৎসব।

দুশ্চরিত্র ছাত্র কীর্ত্তনওয়ালীদিগের সঙ্গে একটুকু গোলযোগ করে। এই ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। দিগম্বর বাবু নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমেও কর্ত্তব্যানুরোধে ছাত্রদিগের নাম হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে দোল যাত্রায় ছাত্রদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। দিগম্বর বাবু ছাত্রগণকে নিতান্ত ভাল বাসিতেন, আমার নিকট তিনি এই সম্বন্ধে অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—"আমি চিরদিন ছাত্রদেরে ভালবাসি, তাহারাও আমার প্রতি অনুরক্ত, কে এবার তাহারা এরূপ করিল। ভগবান আমায় আর

বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া কেন তাহাদিগকে শাস্তির ভাজন করিলেন ও আমায় এরূপ মনোকষ্ট দিলেন! ভবিষ্যতে ইহাদিগকে ছাড়া দোল করিব কিরূপে, আমার বড় কষ্ট হইবে।" কিন্তু তাঁহার আর দোল করিতে হইল না;— দুই মাস পরেই তিনি ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন।

অনাসক্তি।

দিগম্বর বাবু অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। সে টাকা তিনি নিজ হাতে রাখেন নাই; অজস্রভাবে তাহা ব্যয় হইয়াছে, তিনি অর্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও অনুরক্ত ছিলেন না। তাঁহার নিজের ছেলে পিলে হয় নাই, তাঁহার শ্যালকপুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ইনি রাজসাহীর স্বনাম-খ্যাত কবিরাজ) এবং তৎকনিষ্ঠ হৃদয় বাবু, শরৎ বাবু, যোগেশ বাবু (ইঁহারা তিন জনই ফরিদপুরের জজকোর্টের উকীল) পুত্রনির্ব্বিশেষ যত্নে তাঁহার গৃহে লালিত পালিত হইয়াছেন, তিনি ইঁহাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, পিতা পুত্রের জন্য তদপেক্ষা কিছু বেশী করিতে পারেন না। তাঁহার মোহরের জানকী, যাদব এবং উপেন বাবু, পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গঙ্গাদাস ইঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট পিতার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ পাইয়াছে, অথচ দিগম্বর বাবু কাহারও উপর আসক্ত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তাঁহার পত্নী দ্রবময়ী দেবীর* সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি প্রগাঢ় ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। অথচ তিনি ছয় মাস হয়ত বাহিরের ঘরেই কাটাইয়া দিতেন! ফলতঃ কাহারও উপর তাঁহার বিশেষ মায়া আমি বুঝিতে পারি নাই, অথচ যে ব্যক্তি একদিনও তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা [illegible]ত, সেই তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করিত, তিনি নিজে যেন কাহাকেও ধরা দেন নাই।

ঠাট্টা বুঝিতেন না।

হৃদয়ের একান্ত ঔদার্য্য ও সারল্যের জন্য তিনি ঠাট্টা বিদ্রূপ বুঝিতেন না। অনেক সময় বন্ধুবর্গের শ্লেষ কথা তিনি সত্য মনে করিতেন। এই জন্য তাঁহার অনেক অর্থাদিরও ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে 'এপ্রিল ফুল' করা সহজ ছিল। এক দিন, হরবিলাস বাবু উকীল, সহরের সমস্ত লোককে তাঁহার নামে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বাজারে তাঁহার নামে লুচি সন্দেশ ও বিবিধ মিষ্টান্নের বায়না দিতেও ভুলেন নাই। একদিকে অসংখ্য লোক, অপর দিকে তাঁহাদের গ্রাসোপযোগী মিষ্ট দ্রব্যের সম্ভার, উভয়েই এক সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে পৌছিয়া তাঁহার বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। এই ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি কি হরবিলাস বাবু এতদুভয়ের কোন্ ব্যক্তি বেশী আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

মৃত্যু

দিগম্বর বাবু একরূপ চিররুগ্ন ছিলেন। ফরিদপুরে আসা অবধি তাঁহার হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু গত ১২।১৩ বৎসর যাবৎ তিনি উৎকট বৃক্ক (kidney) রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। এই পীড়ার জন্য তিনি সময়ে সময়ে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। কয়েকবার মুমূর্ষু অবস্থা হইতে তিনি সারিয়া উঠিয়াছিলেন, অনেক সময়েই ডাক্তারদের উপদেশ অনুসারে জলের পরিবর্ত্তে বিস্বাদ লিথি-ওয়াটার খাইতেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সোমবার তিনি প্রাতঃকাল হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত রীতিমত আফিসের জন্য খাটিয়াছিলেন, কাঞ্চনপুরের মোকদ্দমার নথী পত্র গুলি দেখিয়াছিলেন, উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্রেয় ও মথুরানাথ মৈত্রেয় দ্বয় তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার কোনও রূপ উদ্বেগ লক্ষ্য করেন নাই। আহারের পর কাছারী যাইবার জন্য বাহির বাড়ীতে আসিতে পথে স্নেহাস্পদ গঙ্গাদাসকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এত বেলা হইয়াছে, স্নান কর নাই যে!" ইহা তাঁহার শেষ কথা; পরমুহূর্ত্তেই তিনি হঠাৎ কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ফিঙ্ক এবং অপরাপর ডাক্তার কবিরাজগণ তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কাছারী যাইবার পোষাক ও পাল্কী পড়িয়া রহিল। তৎস্থলে গরদের ধুতি ও শ্মশান-শয্যা আনীত হইল!

শ্মশান যাত্রীর হাসি।

তাঁহার মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—যেন একটি বালক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! এই যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহার বিভীষিকা ও যন্ত্রণা কোথায়? ফটোগ্রাফে দেখুন, দিগম্বর শ্মশান-শয্যায় শুইয়া হাসিতেছেন। এ অবস্থাতেও তাঁহাকে সুখ স্বপ্নে বিভোর হাস্যমধুরমুখ নিদ্রিত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিবে! এই সহাস্য আনন আমরা চন্দনাক্ত করিয়া দিয়াছিলাম,

* ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকলিয়া গ্রামনিবাসী ৺পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা।

প্রচার করিতেছিল, তাহা হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকিবে। সেই দিন ফরিদপুরের শিরোরত্ন খসিয়া পড়িয়াছে, চরিত্রবান্ ব্যক্তি শুধু স্বীয় পরিবারের জন্য নহেন, বিশ্বপ্রেমে তাঁহার সহিত সংসারের এক আশ্চর্য্য বন্ধন হয়, ইহা সে দিন সম্যক উপলব্ধি হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র সমস্ত আফিস বন্ধ হইয়াছিল, দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়াছিল, আর সকলেই মনে করিতেছিল, "আমার পরম বন্ধু গেল!" পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্র হৃদয়, শরৎ এবং যোগেশ বাবুর যেরূপ শোক হইয়াছিল, আমরা তাঁহার কেহ না হইয়াও আমরাও সেদিন সেইরূপ শোক অনুভব করিয়াছিলাম। ফরিদপুরের উকিলগণ তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই। হরিশ বাবু দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, স্বনামখ্যাত বাগ্মীপ্রবর অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের শ্বেত শ্মশ্রু বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার বাগ্মিতা কোথায় ভাসিয়া গেল, নীরব শোকের অভিব্যক্তি যেন শব্দবিহীন মুখরতা দ্বারা সভাটিকে আকুলিত করিয়া তুলিল।

তাঁহাকে গরদের ধুতি পরাইয়া গলদেশে রঙ্গন ফুলের মালা দোলাইয়া দিয়াছিলাম। যখন সুন্দর খট্টায় রঞ্জিত মসারি শোভিত হইয়া হাসি মুখে মাল্য কণ্ঠে দিগম্বর শ্মশানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সে দেব মূর্ত্তি দেখিয়া সকল লোককেই বলিয়াছিল—"কি সুখকর মৃত্যু! যম তাহার স্বাভাবিক বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া এই দেবপুরুষকে দেবধামে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।"

ফরিদপুরের শোকোচ্ছ্বাস

সে দিনের শোকোচ্ছ্বাস ভুলিব না, সমস্ত বাজারের লোক "বাবারে, কোথায় গেলি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াছিল। আম্রবিক্রেতৃগণ বালকের ন্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিল; রোজ ১৫।২০, টাকার আম এক দরে তাহারা আর কোথায় বিক্রয় করিবে? দরিদ্র পঙ্গু অন্ধ, "আজ অনাথ হইলাম" বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাঁহার স্বর্গারোহণে সমস্ত ফরিদপুরবাসী লোকবৃন্দের ব্যাকুলতা, তাঁহার শ্যালক-পুত্র শরতের তীব্র চীৎকার, গাভী ও ছাগগুলির সাশ্রুনেত্র নিস্পন্দতা প্রভৃতি সে স্থানটিকে যেরূপ করুণ রসের সজীব প্রতিকৃতি করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। আর শোকের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা ম্রিয়মাণা অনাথিনীর ছবি খানি, আমাদের নিকট যে হৃদয়বিদারক শোকের কথা নীরবে

সান্ধ্য সম্মিলন।

সেই সান্ধ্য সম্মিলনের কথা মনে পড়ে। দিগম্বর বাবু মধুর কথায় তীর্থযাত্রার কথা কহিতেন। তিনি অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঋষির আশ্রমের কথা, তীর্থবাসিনী পরদুঃখকাতরা রমণীগণের কথা, প্রাকৃতিক বিচিত্র দৃশ্যাবলীর কথা, বৃন্দাবনের শেঠদের দৈন্যের কথা, প্রভৃতি কত কথা কহিতেন। তিনি শান্ত মধুর ভঙ্গীর সহিত যে নীতি ও ধর্ম্মের কথা বলিতেন, তাঁহার চরিত্রের জ্যোতিতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, সেই সান্ধ্য সম্মিলন কি মধুর ছিল! কত সঙ্গীত, কত

ভূতা, কত আমোদ-মুখরিত সভা-সমিতিতে গিয়াছি কিন্তু একনিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া এই একান্ত সজ্জন মহোদয়ের নিকট যে উপদেশময়ী কাহিনী শুনিয়াছি, ও তাহাতে যেরূপ চিত্ত নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে, এরূপ আর কিছুতে হয় নাই। এখনও সংসার ক্লেশে পীড়িত, চিন্তা মথিত চিত্ত সেইরূপ একটি শান্তি ও সান্ত্বনার স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়। সেই একান্তশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মলচরিত্র বন্ধুর বাক্যগুলির মত এমন সরস কবিতা যেন আর কর্ণে ধ্বনিত হয় নাই। পীড়ায় কষ্ট পাইয়া, সংসারে লাঞ্ছিত হইয়া জুড়াইবার জন্য তাহার নিকট যাইতাম। মনে হইত যেন শোকনিশ্বাস-কলুষিত নিম্নস্তরের বায়ু ছাড়িয়া কোন উর্দ্ধরাজ্যের অতি নির্ম্মল ও মধুর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছি। সেখানে হিংসা দ্বেষ ও কাম বিচূর্ণ হইয়া যাইত; সংসারের অলীকতা ও কর্ত্তব্যপ্রণোদিত নির্লিপ্ত কর্ম্মঠতার দৃষ্টান্ত যেন চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আমরা পাপী তাপী, তাঁহার সান্নিধ্যে ক্ষণেকের জন্য ভাল হইয়া যাইতাম; পরের দুঃখ নিজের দুঃখের মত বোধ হইত, নিজের দুঃখ পরের দুঃখের মত বোধ হইত; লোকের অন্নাভাবের কথা বলিতে যাইয়া দিগম্বর সরল কথায় আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেন, কঙ্কাল-সার মানুষ আমাদের একান্ত পরিজনের মত বোধ হইত, ও তাহাদের কথা ভাবিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। মনুষ্যের সেবার জন্য কিরূপে প্রাণ দিতে হয়, দিগম্বর তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন! তাঁহার আত্মীয়েরা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, হায়! তিনি আমাদের সেবার জন্য দেহপাত করিলেন, কি আমাদের সেবা ত একদিনের জন্যও গ্রহণ করিলেন না!"

হায়! সেই সান্ধ্য সম্মিলনের সুখ, যাহা শাস্ত্রকারের নির্দ্দেশানুসারে সংসার সমুদ্রের দুই অমৃতোপম সুখের একতম, সেই সজ্জন সঙ্গ যে এত শীঘ্র স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা কে জানিত? আবার সংসারের পঙ্কে মন ও দেহ অনুলিপ্ত হইতেছে, রমণীজাতির প্রতি সেই মহান্ মাতৃভাব, অক্লান্ত কর্ম্মঠতা, পরদুঃখকাতরতা ও দরিদ্রের ব্যথায় তেমন ব্যথিত হইতে আর কে শিখাইবে?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অল্-বেরুণী।

...দ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বৌদ্ধ মত সমগ্র এসিয়া খণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সূত্রে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, সভ্যতা ও সদাচার, শিল্প ও বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে সকল বৌদ্ধাচার্য্য মহাচীন হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে তীর্থ যাত্রা করিতেন, তাহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—তৎকালে ইরাণ, তুরাণ গান্ধার প্রভৃতি এসিয়ার সম্পন্ন জনপদমাত্রেই বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর হইতে আরবীয় মরু-মরীচিকা অতিক্রম করিয়া ইস্লামের নবোত্থিত বিজয় কোলাহল পারস্য তাতার প্রভৃতি পুরাতন বৌদ্ধ রাজ্য হইতে বৌদ্ধমত বিলুপ্ত করিতে আরম্ভ করে। যাহারা একদা পালিভাষানিবদ্ধ বৌদ্ধত্রিপিটকের সূত্রভাষ্য অধ্যয়ন করিবার জন্য শত সহস্র বৌদ্ধ বিহারনিবাসী স্থবিরগণের পাদমূলে উপবেশন করিয়া চিত্ত সংযম অভ্যাস করিত, কালক্রমে তাহাদের বংশধরগণ আরবীয় দুরূহ ভাষানিবদ্ধ কোরাণ কণ্ঠস্থ করিতে নিরত হইয়া পূর্ব্বশিক্ষা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একদা বন্যাবিতাড়িত জলস্রোতের ন্যায় বৌদ্ধমত সমগ্র এসিয়া খণ্ড প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল; ইস্লাম আবার সেইরূপ আচম্বিতে বৌদ্ধশিক্ষা ভাসাইয়া লইয়া গেল!

বৌদ্ধমত সহস্র বৎসর মাত্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে জন্মভূমির পুণ্যক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইস্লাম যখন মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধমত নির্ব্বাসিত করে, ভারতবর্ষের বৌদ্ধপ্রতাপ তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইস্লামের বিজয়-বাদ্য সিন্ধুতীরে প্রতিধ্বনিত হইবার সময়ে, সিন্ধু, গান্ধার, কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান ছিল না;—আবার যাগ, যজ্ঞ, পূজা মহোৎসব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল,—তাহা

জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়? সুবিখ্যাত মোসলমান পণ্ডিত অল্ বেরুণী তাহার কথা কিয়ৎ পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে গ্রন্থের নাম—"ইণ্ডিকা"। তাহা দুরূহ আরবীয় ভাষায় রচিত; সম্প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কৃপায় উহা বহুভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে।

অল্ বেরুণীর জীবনের ইতিহাস নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। বর্ত্তমান খিভা নগরের নিকটে খ্রীষ্টীয় ৯৭৩ অব্দে অল্ বেরুণীর জন্ম হয়। তিনি স্বদেশে আবু রৈহাণ নামে পরিচিত হইয়া দর্শন, বিজ্ঞান গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁহার জন্মভূমি পুরাতন বাহ্লীকরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তথায় ইস্লামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বৌদ্ধশিক্ষা প্রচলিত ছিল। আবু রৈহাণ খিভার অধিপতির মন্ত্রিত্বপদে আরূঢ় হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১০১৭ অব্দের বসন্ত সমাগমে গজনীর দিগ্বিজয়ী সুলতান মহমুদ খিভার স্বাধীনতাহরণ পূর্ব্বক রাজ-পরিবারবর্গের সঙ্গে আবু রৈহাণকেও বন্দী করিয়া গজনী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজ-পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না; কিন্তু সুপণ্ডিত বলিয়া আবু রৈহাণ্ সুলতানের কৃপায় কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানালোচনার স্বাধীনতা পাইয়া মুলতান নগরে নির্ব্বাসিত হইলেন। আবু রৈহাণ্ এই সুযোগে ত্রয়োদশবর্ষকাল সংস্কৃত শিক্ষায় অতিবাহিত করিয়া সুলতান মহমুদ পরলোকগামী হইবা মাত্র "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত হন।

"ইণ্ডিকা" কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও লোকাচার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অল্-বেরুণী ভারতীয় শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও সদাচার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি "ইণ্ডিকায়" তাহাই গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "ইণ্ডিকা" ভিন্ন আরও বহু গ্রন্থে অল্-বেরুণী ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষের আলোচনা করেন; তদ্দ্বারা আরবীয় সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

এই সকল গ্রন্থ অল্ বেরুণীর পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে অদ্যাপি সুধীবর্গের সাধুবাদ লাভ করিতেছে। আরবীয় সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং উত্তর কালে সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অল্-বেরুণী গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার সারসঙ্কলনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ে "ইণ্ডিকা" পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

অল্ বেরুণী ভারতবর্ষকে যথারীতি অধ্যয়ন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি রাজবংশমালা বা সমর কাহিনী লইয়া সময় নষ্ট করেন নাই। কেবল হিন্দু সভ্যতার নিদানভূত দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও বিবিধ আচার ব্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে কাশ্মীর ও বারাণসী সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল; কিন্তু "ম্লেচ্ছ মোসলমানের" পক্ষে তখনও পর্য্যন্ত কাশ্মীর বা বারাণসীতে পদার্পণ করিবার উপায় ছিল না;—অল্-বেরুণী তজ্জন্য কত না আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন! তিনি সিন্ধু প্রদেশের অধ্যাপকবর্গের নিকট অধ্যয়ন করিয়া যথা-সাধ্য সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন; খিভার পদবিচ্যুত রাজমন্ত্রী সকল সময়ে অর্থাভাবে ইচ্ছানুরূপ গ্রন্থ সংগ্রহে সমর্থ হইতেন না বলিয়া "ইণ্ডিকার" স্থানে স্থানে আভাষ দিতেও ত্রুটি করেন নাই।

অল্ বেরুণী সুপণ্ডিত হইয়াও অধ্যয়নপরায়ণ; মোসলমান হইয়াও হিন্দুবিদ্বেষবিরহিত ছিলেন;—তাঁহার "ইণ্ডিকা" পাঠ করিতে করিতে তাঁহার উদারতা ও সমালোচনার সমীচীনতায় সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি আমাদের আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতিকূল সমালোচনা করিবার সময়ে মূল সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই; এবং প্রতিকূল সমালোচনাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া অনেক স্থলে এমনও বলিয়া গিয়াছেন,—"হয়ত উদ্ধৃতাংশের কোনও সুসঙ্গত অর্থ আছে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণ গোচর হয় নাই!" অল্-বেরুণী আরবীয় ও গ্রীসীয় বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া সংস্কৃত গ্রন্থাদি যথারীতি অধ্যয়নপূর্ব্বক "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার "ইণ্ডিকার" সহিত সংস্কৃতা-নভিজ্ঞ ভারতভ্রমণপরায়ণ ইংরাজ লেখকবর্গের অসংযত লিপিকণ্ডূয়নের তুলনাই হইতে পারে না।

অল্ বেরুণী যখন "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত, তখন ইস্লামের নিকট ভারতবর্ষ "কাফের স্থান" বলিয়া ঘৃণিত ও পরাজিত দেশ বলিয়া উপেক্ষিত;—ভারতবাসীর নিকট

মোসলমান "ম্লেচ্ছ" বলিয়া তিরস্কৃত ও বিজেতা বলিয়া পরিচিত। তৎকালে গজনীর সুলতান ও তদীয় পার্শ্বচরগণ বিজয়োল্লাসে স্ফীত বক্ষে অসি হস্তে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সৌভাগ্য খণ্ড বিখণ্ড করিবার জন্যই উদগ্রীব! এরূপ সময়ে একজন মোসলমানের পক্ষে "কাফেরের" ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করা বা সমালোচনা করিতে বসিয়া ধীরতার সহিত দার্শনিক প্রণালীতে প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা, যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়। ইণ্ডিকাপাঠে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দু "কাফের" হইলেও, অল্ বেরুণীর বিচারে জ্ঞানগৌরবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—ইহার যথেষ্ট কারণ ছিল। সুলতান মহমুদ অল্ বেরুণীর জন্মভূমির স্বাধীনতা হরণ করিয়া ভারতবর্ষের বিজিত রাজ্যে খিভার ভূতপূর্ব্ব রাজপুত্রকে নির্ব্বাসিত করায় ভারতবর্ষের প্রতি অল্ বেরুণীর সহানুভূতি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। যে কারণেই হউক, —অল্ বেরুণী ইস্লামের মাহাত্ম্য ঘোষণায় কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না করিয়াও সেই হিংসাবিদ্বেষের যুগেও হিন্দুগণকে যে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা করেন নাই, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

অল্ বেরুণী পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতেন না; তাঁহার সামসময়িক সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপকবর্গও পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন যে, জনসাধারণের জন্যই পৌত্তলিকতা; পণ্ডিতের জন্য একেশ্বরবাদ। সুতরাং সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত যে অল্ বেরুণীর আরাধ্য ইস্লামের একেশ্বরবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নহে,—একথা অল্ বেরুণী বহুবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যে সময়ে ইণ্ডিকা রচনায় নিযুক্ত হন, তাহা এসিয়া খণ্ডের বিপ্লব-যুগ। এক দিকে বৌদ্ধ ও হিন্দুর সংঘর্ষে বৌদ্ধদল বিতাড়িত; অপর দিকে বৌদ্ধ ও ইস্লামের বিসম্বাদে ইস্লাম জয়োল্লাসে স্ফীতবক্ষঃ; মধ্যে মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান ও ইস্লামের কলহ কল্লোলে খ্রীষ্টীয়ান এসিয়া হইতে পলায়নপর। এই বিপ্লবের যুগে দর্শন বিজ্ঞানের স্থলে ছুবল এবং সমালোচনার স্থলে খরশান প্রচলিত হইতেছিল। ইহাতে কিছুদিনের জন্য উচ্চশিক্ষা বিলুপ্ত হইয়াছিল,—অশিক্ষিত সেনাদলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। সুতরাং বিজয়োন্মত্ত মোসলমান সেনাপতি ভারতবর্ষকে "কাফের স্থান" বলিয়াই মনে করিতে শিখিয়াছিলেন; তাহারই বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার যে আরবীয় সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া "বেদুইনকে" বিদ্বান করিয়াছে, সে কথা অল্ বেরুণীর ন্যায় দুই চারি জন সুপণ্ডিত ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না বা শুনিলেও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিল না। অল্ বেরুণী কি জন্য ভারতবর্ষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পলিত কেশে সংস্কৃত শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে আরবীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক।

আরবীয় ভাষা বহু পুরাতন হইলেও আরবীয় সাহিত্য গ্রীক বা হিন্দুর সাহিত্যের ন্যায় বহু পুরাতন নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে একথা অনেকেই স্বীকার করিতেন না; কিন্তু জর্ম্মাণ পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-পরায়ণ অধ্যবসায়শীল সুধীবর্গ এক্ষণে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

আরবীয় পুরাতন সাহিত্যে কেবল কবিতার প্রগল্ভতাই বর্ত্তমান ছিল; তাহাই মরুময় দেশের কঠোর কর্ম্মক্লান্ত জাতির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার সহিত কোরাণ ও তাহার টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত হইয়াও সমগ্র আরবীয় সাহিত্যকে অল্পসংখ্যক গ্রন্থে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও আরবীয় সাহিত্যে ইহার অধিক আর কিছু প্রবেশলাভ করে নাই। আরবীয় মরুমরীচিকায় ইস্লামের অভ্যুদয়,—কিন্তু সে দেশে ইস্লামের জ্ঞানগৌরব সমুজ্জ্বল হয় নাই। বোগদাদের বিচিত্র রাজধানীই আরবীয় সাহিত্যের গৌরব-ক্ষেত্র।

স্মরণাতীত কাল হইতে বোগদাদের নিকট দিয়া ভারতীয় পণ্যভাণ্ডার ভূমধ্যসাগর তীরে বাহিত হইত। তৎসূত্রে ভারতবর্ষ হইতে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়ার সকল স্থানেই ভারতীয়গণের গতিবিধি প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণ সেই পুরাতন বাণিজ্য পথ অবলম্বন করিয়া এসিয়া খণ্ডের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বৌদ্ধমত প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারকৌশলে ভারতীয় সাহিত্য দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইস্লাম আসিয়া বৌদ্ধমত বিতাড়িত করিবার সময়ে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হন নাই; যাঁহারা বৌদ্ধ, তাঁহারাই মোসলমান হইয়া-

ছিলেন। মোসলমান সাম্রাজ্যের প্রথম কেন্দ্র দামাস্কস্ নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়;—তখনও রাজ্যসংস্থাপনের কোলাহল প্রবল ছিল। সেই জন্য দামাস্কসের রাজধানীতে সাহিত্যচর্চ্চা শক্তিলাভ করে নাই। মোসলমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় কেন্দ্র বোগদাদ নগরেই ইস্‌লামের জ্ঞানপিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে আরবীয় সাহিত্যের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র শক্তির নিকট ভারতীয় বিপুল সাহিত্যশক্তি মহাশক্তিরূপে প্রতিভাত হয় এবং বোগদাদের খলিফাগণ ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার করতলগত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। দুইটি কারণে এই ব্যাকুলতা ঘনীভূত হইয়াছিল।

ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থাতেই ইরাণ মোসলমানের করতলগত হয়। বোগদাদ বাহুবলে বলীয়ান হইলেও জ্ঞানবলে ইরাণের সমকক্ষ ছিল না। ইরাণ এক সময়ে বৌদ্ধশিক্ষায় সমুন্নত হইয়াছিল, তজ্জন্য পরাজিত হইলেও বোগদাদের নিকট জ্ঞানবলে ইরাণ সমুন্নত দেশ বলিয়া প্রতিভাত হইত। ভারতবর্ষের শিক্ষাই যে ইরাণের জ্ঞানোন্নতির মূল, তাহা জ্ঞাত হইবা মাত্র বোগদাদ ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার করতলগত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিন্ধুপ্রদেশ কিছুদিনের জন্য বোগদাদের করায়ত্ত হওয়ায় খলিফাগণ ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করেন। তদুপলক্ষে ব্রহ্মগুপ্তের "ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত" এবং "খণ্ডখাদ্য" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় আরবীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া মোসলমান রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

এ পর্য্যন্ত যত জনপদ ইস্‌লামের করতলগত হইয়াছিল, তাহার সকল স্থানেই অল্পাধিক মাত্রায় ভারতীয় জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশিত ছিল। ইস্‌লাম তখন নবোত্থিত মহাশক্তিমাত্র—তাহার পূর্ব্বগৌরব কিছুই ছিল না। ভারতবর্ষ বহু পুরাতন সভ্যদেশ, তাহার অতীত সৌভাগ্যের নিদানভূত জ্ঞানভাণ্ডার হস্তগত করিবার জন্য যে ইস্‌লাম ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই সময় হইতেই যে আরবীয়গণ জ্যোতির্ব্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রাপ্ত হন,—এ কথা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক তথ্যরূপে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে।

বোগদাদাধিপতি সুবিখ্যাত হরুণ-অল্-রসীদের শাসনসময়েই আরবীয় সাহিত্য বিপুলতা লাভ করে। তৎকালে প্রাচীন বাহ্লীকরাজ্যের "নব বিহার" নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠের "পরমক" নামক বৌদ্ধযতির বংশধর মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "বরমক গোত্রীয়" নামে পরিচিত ও হরুণ অল্-রসীদের মন্ত্রিপদে আরূঢ় হন। ইঁহার চেষ্টায় ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান ও বিষচিকিৎসা বিদ্যা আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিশর ও গ্রীসের পুরাতন সাহিত্য সংযুক্ত হইয়া আরবীয় সাহিত্যকে দিন দিন সমুন্নত করিতে লাগিল।

অল্ বেরুণী জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আরবী সাহিত্য এইরূপে বিপুলতা লাভ করিয়াছিল; অল্ বেরুণী তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য লালায়িত ছিলেন। ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার সে আশা সফল হইয়া গেল। ভারতীয় সাহিত্যের আরবীয় অনুবাদ অধ্যয়নকালে অল্ বেরুণী মুগ্ধচিত্তে ভারতীয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া দিন দিন তাঁহার সংস্কৃতানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল। আরবীয় অনুবাদে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের মাধুর্য্য রক্ষিত হয় নাই বলিয়া অল্ বেরুণীর ধারণা ছিল;—সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই সময়ে জনৈক সাহিত্যসুহৃদের সঙ্গে অল্ বেরুণীর তর্ক বিতর্ক চলিত। বন্ধুর বিশ্বাস ছিল—মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়নার্থ ক্লেশ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, আরবীয় সাহিত্যে যে সকল অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। অল্ বেরুণীর বিশ্বাস ইহার বিপরীত ছিল। সুতরাং উভয়ের বাদ প্রতিবাদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইলে, অল্ বেরুণী নবমতসংস্থাপন কামনায় মূল সংস্কৃত শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত হন।

"ইণ্ডিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়,—অল্ বেরুণী "ইণ্ডিকা" রচনার পূর্ব্বে অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও গীতা; পুরাণে—বিষ্ণু, মৎস্য, বায়ু ও আদিত্য; জ্যোতিষে পুলিশ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদ্য, উত্তর খণ্ডখাদ্য বৃহৎসংহিতা, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক, করণসার, করণতিলক ও ভুবনকোষ; এবং আয়ুর্ব্বেদে—চরক সবিশেষ উল্লেখের যোগ্য। এতদ্ব্যতীত, রামায়ণ,

মহাভারত, মানবধর্ম্মশাস্ত্র ছন্দঃ শাস্ত্র ও হস্তিচিকিৎসাদি বিষয়ক গ্রন্থও যে অল্ বেরুণী কিয়ৎপরিমাণে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত "ইণ্ডিকার" স্থানে স্থানে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ম্যাক্স মূলর।

(২)

(দেববিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা।)

—:-:—

দেববিজ্ঞানের উৎপত্তি।

নবীন ধর্ম্মের বিবর্ত্তনে, সোপানবিশেষে দেবতায় বিশ্বাস স্বাভাবিক। আত্মতত্ত্বের সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে, জ্ঞানের সরল শৈশবে, সহজেই মানব নৈসর্গিক বিষয়ে প্রাণশক্তি আরোপ করিয়া দেবতার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি ভিন্ন শক্তির জ্ঞান তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। নৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া দর্শনে সন্ত্রস্ত মানুষ, তখন, সেই শক্তির পশ্চাতে ব্যক্তি কল্পনা করিয়া থাকে। ক্রমে জ্ঞানবিকাশ সহকারে, অল্পে অল্পে এই সকল কল্পিত দেবদেবীতে অবিশ্বাসের উদয় হয়। এই অবিশ্বাস হইতেই দেববিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইলে একদল লোক দেববাদের ও তৎসংসৃষ্ট কর্ম্ম কাণ্ডের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেন; ইঁহারাই প্রত্যেক ধর্ম্মের আদি সংস্কারক। আর একদল এই প্রতিবাদের শক্তি ও যুক্তি সম্যক উপলব্ধি করিয়াও, সমাজস্থিতি সংরক্ষণার্থ প্রাচীন ধর্ম্মকে রক্ষা করা সঙ্গত ভাবিয়া, পুরাতন দেববাদের ও লোকপ্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডাদির অভিনব ও সদ্যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে, যুক্তি ও শাস্ত্রের সমন্বয়সাধনে প্রযুক্ত হয়েন। ইঁহারাই প্রকৃত পক্ষে দেববিজ্ঞানের আদিপ্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন হিন্দু-আর্য্যের দেববিজ্ঞান।

প্রাচীনতম বৈদিক ধর্ম্মে দেববাদের প্রকৃত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এই দেববাদেরই সঙ্গে জড়িত, এই দেববাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহাই হিন্দু আর্য্যগণের শৈশব ধর্ম্ম। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে হিন্দু আর্য্যগণের অন্তরে বৈদিক দেববাদের উপরে অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই অবিশ্বাস হইতেই উপনিষদের উৎপত্তি। এই অবিশ্বাস হইতেই ভারতীয় দেববিজ্ঞানের সৃষ্টি। আদি উপনিষদ সকল একদিকে "নেদং যদিদমুপাসতে"—লোকে যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে,—এই বলিয়া বৈদিক দেববাদের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; অন্য দিকে পরা ও অপরা এই দুই শ্রেণীতে সমুদায় বিদ্যাকে বিভাগ করিয়া, "তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ"—তাহার মধ্যে ঋগ্বেদাদিকে অপরা বিদ্যায় অন্তর্ভূত করিয়া, দেবোপাসনাবহুল বৈদিক ধর্ম্মের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বোপরি "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" —যাঁহারা কাম্যকর্ম্মের অনুসরণ করে, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে, এই বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। পরবর্ত্তী উপনিষদে জ্ঞান ও কর্ম্মের একটা সমন্বয়-চেষ্টা দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু আদি উপনিষৎকর্ত্তৃগণ, বৈদিক ধর্ম্মের আমূল সংস্কারেচ্ছু ছিলেন। তদানীন্তন সমাজে তাঁহারা উন্নতিশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা প্রাচীনকে একরূপ বর্জ্জন করিয়াই নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু নিরুক্তকারেরা অন্যরূপ লেখক ছিলেন। তাঁহারা তদানীন্তন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। উপনিষৎকারদিগের ন্যায় তাঁহারাও প্রাচীনতম বৈদিক দেববাদের অসারতা ও অসঙ্গতি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারাও বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারপ্রার্থী ছিলেন। তবে প্রাচীনকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া নহে, কিন্তু যথাবিধি ও যথাযোগ্য তাহার সংশোধন করিয়া তাহারই উপরে নূতনের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য বশতঃ তাঁহারা অভিনব ব্যাখ্যা দ্বারা, নূতন জ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কারের সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে নিরুক্তকারেরাই দেব-বিজ্ঞানের আদি প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবতঃ এ জগতেও তাঁহারাই দেববিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের পূর্ব্বে আর কোথাও কেহ দেববিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিল বলিয়া, ইতিহাসে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বৈদিক দেববাদের চারি প্রকার ব্যাখ্যা।

প্রাচীন হিন্দু নিরুক্তকারগণ বৈদিক দেববাদের চারিপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যাস্কের নিরুক্তে এই চতুর্ব্বিধ ব্যাখ্যারই উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান সায়ণাচার্য্যের বেদভাষ্যেও এই চারি প্রকারের ব্যাখ্যাই দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সায়ণের পদাঙ্কানুসরণে ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া তাহাতেও বিবিধ শ্রেণীর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, কোনও অজ্ঞাত সময়ে যাস্কের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেববিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছিল, ইহা একরূপ নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

প্রাচীন নিরুক্তকারগণের মধ্যে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধি-যাজ্ঞিক, এবং ঐতিহাসিক, এই চারি প্রকারের বৈদিক দেববাদের ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। আধিভৌতিকগণ নৈসর্গিক বিষয় ও ঘটনাদির রূপক রূপে বৈদিক দেবত্বের ব্যাখ্যা করিতেন। ইঁহাদের মতে বেদের দেবতাগণ ভৌতিক শক্তি ও নৈসর্গিক ব্যাপারের রূপক মাত্র। অশ্বিনীকুমার-দ্বয় প্রদোষ এবং উষার রূপক, সারমেয় সকল সূর্য্যকিরণের রূপক। যে নৈসর্গিক শক্তি প্রভাবে মেঘ বারি বর্ষণ করে, ইন্দ্র তাহারই রূপক। এইভাবে আধিভৌতিকগণ বৈদিক দেববাদের একটা সদর্থ করিতে চেষ্টা করেন। আধ্যাত্মিকগণ বৈদিক দেবতত্ত্বকে মানবের দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনোবৃত্তি সকলের রূপক রূপে ব্যাখ্যা করিতেন। আধিযাজ্ঞিকগণ ঠিক দেবতায় বিশ্বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু বেদ মন্ত্রের ও বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের অলৌকিক শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। জৈমিনী প্রভৃতি পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ অনেকেই এই দলভুক্ত। তাঁহাদের মতে বৈদিক মন্ত্রে যে সকল দেবতার নাম দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ঠিক দেবতা নহেন; এই সকল মন্ত্র দেবোদ্দেশে রচিতাহয় নাই। দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বেদের শক্তিহীনতা সপ্রমাণ হয়। বেদে পুরোহিতের সম্মুখস্থ মৃদঘটে ইন্দ্রাদি দেবতার আহ্বান করিবার বিধি আছে। ঐরাবত-বাহন-সহ ইন্দ্র মৃদঘটে আসিয়া আবির্ভূত হইলে ঘট চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে। ঘট যখন বিনষ্ট হয় না, তখন ইন্দ্র ঘটে আসিয়া আবির্ভূত হন না, ইহাই বলিতে

হইবে। যদি ইন্দ্র নামে সত্য দেবতাত্মা থাকেন, আর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আবাহন করিলে যদি তিনি তখনি আসিয়া উপস্থিত না হন, তবে মন্ত্র শক্তিহীন ও বেদ নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু বেদ নিষ্ফল হইতে পারে না। সুতরাং বেদে ইন্দ্র নামে কোনও দেবতাত্মার উল্লেখ নাই। বেদ অপৌরুষেয় মন্ত্রসমষ্টি মাত্র। এই মন্ত্রের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে, তাহা উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিলে ইহ পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। এই রূপে আধিযাজ্ঞিকগণ শুদ্ধ যজ্ঞার্থে বৈদিক দেবতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন। ঐতিহাসিকগণের মতে বেদে যাঁহাদিগকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময়ে তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসী মানব ছিলেন, তপঃ প্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে হিন্দু নিরুক্তকারগণ বৈদিক দেববাদের একটা সদ্‌যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। ইঁহারাই আমাদের দেশের দেববিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন হেলেনীয় আর্য্যের দেববিজ্ঞান।

হিন্দু আর্য্যগণের ন্যায় হেলেনীয় আর্য্যগণও, খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে, আপনাদিগের মধ্যে এক প্রকারের দেববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈদিক দেববাদের সদ্‌যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করা যেমন হিন্দুর দেববিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল, সেইরূপ হোমরীয় দেববাদের সঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস হইতেই হেলেনীয় দেববিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে যেমন উচ্চতর জ্ঞানালোচনা ও গভীরতর আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে সঙ্গেও বালস্বভাবসুলভ দেবোপাসনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন হেলেনীয় আর্য্যগণের মধ্যেও ঠিক তাহাই দৃষ্ট হয়। হেলেনীয় সাধনা জ্ঞানের অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। আজিও সেই হেলেনীয় জ্ঞানগরিমাতেই য়ুরোপীয় সাধনা গৌরবান্বিত। যে শিক্ষা ও সাধনার প্রসাদে বর্ত্তমান সভ্য জগতের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে, সেই শিক্ষা ও সাধনার আদি গুরু যাঁহারা, তাঁহাদের চক্ষে, যে হোমর বর্ণিত দেবকাহিনীর হীনতা ও অযৌক্তিকতা কখনও প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ কল্পনা করাও সুকঠিন। ফলতঃ যেমন হিন্দুগণের মধ্যে, সেইরূপ হেলেনীয় সমাজেও জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশ প্রচলিত দেববাদে অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। আমাদিগের পৌরাণিক দেবকাহিনীর ন্যায়, হোমরের দেবতাদিগের সম্বন্ধেও চৌর্য্য পরদার প্রভৃতি মহাপাতকের বর্ণনা আছে। এই সকল কুৎসিত উপকথার রটনা নিবন্ধন হেলেনীয় জ্ঞানিগণের অন্তরে হোমরের দেববাদে কেবল অবিশ্বাস নহে, কিন্তু গভীর অভক্তিরও উদয় হইয়াছিল। ভারতে রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি একাধারে কদাপি কেন্দ্রীভূত হয় নাই। এই জন্য ধর্ম্মের সংস্কার, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মের বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করা এদেশে সহজ ছিল। কিন্তু হেলেনীয় সমাজে, হোমরীয় দেববাদ রাজনীতি ও রাজ-শক্তির সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য হোমরের প্রতিবাদ করা রাজদ্রোহিতার মধ্যে পরিগণিত হইত। সুতরাং অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করিয়াও, প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচার, বা বিপরীত আচরণ অবলম্বন করিতে অনেকে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইতেন। যাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না, তাঁহাদিগকে দণ্ডভোগ করিতে হইত। প্রোটাগরাস বলিয়াছিলেন, হোমরীয় দেবতাদিগের অস্তিত্ব, প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। এই গুরুতর অপরাধের জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসিত এবং প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহার গ্রন্থাবলী স্তূপীকৃত করিয়া দগ্ধ করা হয়। জ্ঞানিপ্রবর সক্রেটিস সাক্ষাৎভাবে হোমরীয় দেববাদের প্রতিবাদ করেন নাই। তথাপি তিনি এ সকলে সরল ভাবে বিশ্বাস করেন না বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই, তাঁহাকে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়া, আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণেই, সম্যক স্বাধীনভাবে আলোচনার অভাব বশতঃ হেলেনীয় সমাজে হিন্দুদিগের ন্যায়, অতি প্রাচীন কালে দেববিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কিন্তু সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে, এথেন্সে রাজনৈতিক স্বাধীনতার খর্ব্বতার সঙ্গে সঙ্গে, তাহারই ক্ষতিপূরণস্বরূপ, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা কথঞ্চিৎ সম্প্রসারিত হইয়াছিল। তখন হইতেই, প্রকৃতপক্ষে, হেলেনীয় সমাজে দেববিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। হোমরীয় দেববাদের অনেক স্থলেই একটা নিগূঢ় রূপকাত্মক অর্থ আছে, প্লেটো এই মত ব্যক্ত করেন। তৎপরে হিন্দু আর্য্যদিগের ন্যায় হেলেনীয় আর্য্য সমাজেও বিবিধ সম্প্রদায়ের দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যাতার অভ্যুদয় হয়।

হোমরীয় দেববাদের চারি প্রকার ব্যাখ্যা।

হিন্দু দেবতত্ত্বব্যাখ্যাতা নিরুক্তকারগণ যেমন চারি সম্প্রদায়ের ছিলেন, সেইরূপ হেলেনীয় দেবতত্ত্বব্যাখ্যাতাদিগকেও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মাক্স মূলর তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তবে আমাদের আধ্যাত্মিক নিরুক্তকারগণের ন্যায় যে সকল হেলেনীয় ব্যাখ্যাতা আধ্যাত্মিক রূপকরূপে হোমরের দেববাদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, মাক্স মূলর তাঁহাদিগকেও আধিভৌতিক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, নতুবা মূলতঃ হেলেনীয় দেবব্যাখ্যাতাগণও চারি সম্প্রদায়েই বিভক্ত হইতে পারেন। হিন্দু আধিভৌতিকগণের ন্যায় পাইথেগোরাসের শিষ্য এপিকার্মাস গ্রীক দেবদেবী সকলকে বায়ু, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, অগ্নি এবং নক্ষত্রের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইঁহার কিছুকাল পরে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, এম্পিডোক্লিস্ জিউস্, হিরি, আইডোনিস্, এবং নেষ্টিয়া, এই চারি জন প্রধান হেলেনীয় দেবতাকে ক্ষিতি, অপ্ তেজ, ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের নামান্তর বলিয়া প্রচার করা হয়। মিত্রডোরস কেবল জিউস্ প্রভৃতি হোমরীয় দেবতাকেই নহে, কিন্তু হেক্টর প্রমুখ হোমরীয় অধিনায়ক সকলকে পর্য্যন্ত আধিভৌতিক বিষয় ও ঘটনাদির প্রচ্ছন্ন রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। ইঁহারা সকলেই হেলেনীয় দেবব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে আধিভৌতিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এনেক্সেগোরাস এবং তদীয় শিষ্যগণ আধ্যাত্মিক অর্থে হোমরীয় দেববাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মতে জিউস বুদ্ধিবৃত্তির রূপক, এথিনী শিল্পের রূপকমাত্র। হিন্দুদিগের আধিযাজ্ঞিক নিরুক্তকারগণের ন্যায়, হেলেনীয় সমাজে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দেব ব্যাখ্যাতা ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু লোকভয় নিবারণার্থ এই সকল দেবোপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, একদল পণ্ডিত এরূপ মনে করিতেন। ইঁহাদিগকে নৈতিক ব্যাখ্যাতা বলা যাইতে পারে। মাক্স মূলর ইঁহাদিগকে Ethical উপাধি প্রদান করিয়াছেন। জনগণের অন্তরে ভীতির সঞ্চার, এবং জনসমাজে বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দ্বারা শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনে লৌকিক ধর্ম্ম যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, সমাজস্থিতি রক্ষার্থে দুষ্টের দণ্ডদাতা ও শিষ্টের পুরস্কর্ত্তারূপে দেবদেবীরা কল্পিত হইয়াছেন, হেলেনীয় সমাজের নৈতিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যাতারা, এইরূপ মনে করিতেন। মহামতি এরিষ্টোটল্ পর্য্যন্ত মানবীয় ধর্ম্মের গভীরতর ভিত্তি আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও হেলেনীয় দেববাদ যে সমাজস্থিতি রক্ষার্থ কল্পিত হইয়াছিল, এরূপ ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের দেশে যেমন, গ্রীসেও সেইরূপ, এক শ্রেণীর দেবব্যাখ্যাতৃগণ ঐতিহাসিক রূপক বলিয়া হোমরীয় দেববাদের একটা সমর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় ইউহিমারাসের (Euhemerus) নামে পরিচিত। তবে ইউহিমারাসের পূর্ব্বেও এই শ্রেণীর দেবব্যাখ্যার নিদর্শন হেলেনীয় সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউহিমারাস দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দরের সমসাময়িক লোক ছিলেন। তাঁহার মতে হোমরবর্ণিত দেবদেবীগণের অতিপ্রাকৃত সত্তা কিছু নাই। তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসী রাজা, সেনানায়ক কিম্বা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ধার্ম্মিক ছিলেন। মরণান্তে লোক সমাজে সমাদৃত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আধুনিক দেববিজ্ঞান।

বর্ত্তমান যুগে দুই কারণে দেব বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। ...ক দল পণ্ডিত জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের মর্ম্ম উদ্ঘাটনে ব্রতী হইয়া, ...বতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। আর এক দল মানবীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ...ল অন্বেষণে যাইয়া, প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম বিকাশের স্তরবিশেষে দেবতায় ...বিশ্বাস দেখিতে পাইয়াছেন, এবং এই সার্ব্বভৌম বিশ্বাসের বিশ্লেষণ ...করিতে যাইয়া, দেবতত্ত্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতেছেন। এই ...কল পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত ...হইয়াছে। এক মতে জ্ঞানবিকাশের নিম্নতম স্তরে, প্রাণহীন পদার্থে ...প্রাণ ও নৈসর্গিক শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা মানব মনের স্বাভাবিক ...ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ দেবতার সৃষ্টি করে, এবং দেব...তায় বিশ্বাস করে। অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের সুপ্র...সিদ্ধ অধ্যাপক টাইলার এই মতের প্রধান পরিপোষক। তাঁহার ...Early History of Mankind এবং Primitive Culture, গ্রন্থদ্বয় ...পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এই গ্রন্থে তিনি এই ...মতের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। মানব মনের এই স্বাভাবিক ...ধর্ম্মকে animism এনিমিজিম্ বা প্রাণীকরণ কহে। হেলেনীয় আর্য্য ...সমাজে প্রাচীনতমকালে কোনও বৃক্ষ শাখার আকস্মিক পতনে কাহারও ...অঙ্গহানি বা প্রাণহানি হইলে, সেই বৃক্ষের যথাবিধি বিচার হইত, এবং ...অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, যথানিয়মে তাহার দণ্ড হইত। ইংলণ্ডের ...প্রাচীন রাজবিধানে এইরূপে শকটচক্রের দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ...বহুকাল পূর্ব্বে কোচিন চীনের এক রাজা এক অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করা...ইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে ...সমুদ্র রোগে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। এই অপরাধে পরিব জাহাজের ...পরে বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়াছিল। এই সকল ঘটনাই প্রাণীকরণের ...দৃষ্টান্ত।

প্রাণীকরণ।

এই প্রাণীকরণের প্রকৃতি ও অর্থ কি? জ্ঞানের শৈশবে মানব প্রাণ...হীন পদার্থে প্রাণ আরোপ করে বলিয়া জড় এবং চেতনের বিভেদজ্ঞান ...তাহার থাকে না, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। এই কারণে প্রাণী...করণের উৎপত্তি হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা মানুষকে ইতর ...জন্তু অপেক্ষাও হীন বলিয়াই প্রমাণ করিতে চাহেন। ইতর জন্তু ...জন্তু যখন সচেতন ও অচেতনে বিভেদ করিয়া থাকে, শৃগাল কুক্কুরাদি ...জন্তু যখন সুষুপ্ত ও মৃতের প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারে, তখন মানুষ ...কখনও চেতন ও অচেতনের পার্থক্য বুঝিত না, এরূপ কল্পনাও করা ...যায় না। তাহা করিতে গেলে মানবের মানসিক শক্তিকে শৃগাল ...কুক্কুরাদির সহজজ্ঞান অপেক্ষাও হীন বলিয়া মনে করিতে হয়। ফলতঃ ...প্রাণীকরণ এই কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রাণীকরণের ধর্ম্ম এরূপ ...নহে। স্পেন্সারের মতে মানব আপনার ছায়া দেখে, সুষুপ্তিকালে ...স্বপ্নেও আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই ছায়া ও স্বপ্নের ...অভিজ্ঞতা হইতে, দেহাতিরিক্ত প্রাণশক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তৎপরে ...এই নবজাত প্রাণশক্তিকে সে চতুর্দ্দিকস্থ বিষয় ও ঘটনাদিতে আরোপ ...করিয়া প্রাণীকরণের সৃষ্টি করে। কিন্তু ছায়া ও স্বপ্ন হইতে আত্ম...তত্ত্বকে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, চিন্তাশক্তির যেরূপ বিকাশের প্রয়োজন, ...মানসিক বিবর্ত্তনের সেইরূপ স্তরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মানব দেবোপা...সনাদি করিয়া থাকে। সুতরাং ছায়া এবং স্বপ্ন হইতে সমুদ্ভূত আত্ম...জ্ঞানের দ্বারা যে প্রাণীকরণ সম্ভব হয়, একথাও বলা সঙ্গত নহে। ...এই প্রাণীকরণের মূল কি? মানবের মনে স্বভাবতঃই কার্য্যকারণ ...সম্বন্ধের একটা জ্ঞান নিহিত আছে। অভিজ্ঞতা দ্বারা এই জ্ঞান ...প্রকাশিত হয় সত্য, আপনি কর্ত্তারূপে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে, এই কর্ত্তৃত্বশক্তির জ্ঞান, এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধের অবধারণ মানব অন্তরে প্রকাশিত হইত না, ইহাও নিশ্চিত। কিন্তু শুদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে এ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। ভিতরে যাহা নাই, বাহিরের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা কদাপি অন্তরে প্রকাশিত হইতে পারে না। যাহার স্বরবোধ নাই, সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে কখনও তাহা ফুটিয়া উঠে না; যাহার অন্তরে সঙ্গীতের শক্তি বীজাকারে নিহিত আছে, সুসঙ্গীত শ্রবণে, তাহারই সে শক্তি জাগরুক হইয়া থাকে। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" সুতরাং কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার অভিজ্ঞতা হইতে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না, কেবল অন্তর্নিহিত, গুপ্ত জ্ঞান, ব্যক্ত হয় মাত্র। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ অন্বেষণ করা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জ্ঞানের শৈশবে, মানব এই সাধারণ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই নৈসর্গিক কার্য্যনিচয়ের কারণ অন্বেষণে নিযুক্ত হয়। স্বীয় অভিজ্ঞতাতে সে আপনাকে ও আত্মসদৃশ অপর প্রাণি-দিগকেই কেবল কর্ত্তা বলিয়া জানে। প্রাণী ভিন্ন এ জগতে সে কুত্রাপি কাহাকেও কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং কোনও নৈসর্গিক ঘটনা দেখিলেই তাহার কারণ অন্বেষণে যাইয়া সে সহজেই যে বস্তু অবলম্বনে সে কার্য্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রাণশক্তি আরোপ করিয়া থাকে। দহনরূপ কার্য্য অগ্নিসংযোগে প্রকাশিত হয়। সুতরাং অগ্নিতে প্রাণ আরোপিত হয়। দিনকর সহযোগে এ জগতে আলোকের প্রকাশ হয়। সুতরাং সূর্য্যে প্রাণ আরোপিত হয়। বৃক্ষ এক ঋতুতে পত্র পল্লব বিহীন, অপর ঋতুতে বা পত্র পল্লব শোভিত হইয়া উঠে, সুতরাং এই সকল কার্য্যের কর্ত্তারূপে বৃক্ষে প্রাণ কল্পিত হয়। নদী ধাবিত হয়, সুতরাং তাহার গতি দর্শনে, সহজেই গতির কর্ত্তারূপে তাহাতেও প্রাণ কল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত পক্ষে প্রাণীকরণের অর্থ। এইরূপ প্রাণীকরণ হইতেই ক্রমে দেবতার উৎপত্তি হয়।

উপমা হইতে প্রতিমার উৎপত্তি।

কিন্তু প্রাণীকরণের দ্বারা যে দেবতার উৎপত্তি হয়, ম্যাক্সমূলর ইহা অস্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে মানবীয় ভাষার বিকৃতি হইতেই দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ম্যাক্সমূলরের পূর্ব্বে এবং পরে আরো অনেক ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, উপমা হইতেই প্রতিমার সৃষ্টি হইয়াছে। এক বস্তুর নাম অপর বস্তুতে প্রযুক্ত হইলেই উপমার উৎপত্তি হয়। এবং মানবীয় ভাষাতে সর্ব্বদাই এক ধাতু হইতে বিবিধ বস্তু ও বিষয় প্রতিপাদক শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জ্ঞানের আদিম অবস্থায়, মানুষের মন শুদ্ধ ইন্দ্রিয় ব্যাপারেই নিবদ্ধ থাকে। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ভাবাদির অভিজ্ঞতা জন্মিতে আরম্ভ করিলে, সেই সকল অভিনব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হয়। পূর্ব্ব-জ্ঞাত বস্তুর সাহায্যেই সর্ব্বদা মানবীয় জ্ঞানে ও ভাষাতে অপূর্ব্ব জ্ঞাতের ভাব ও প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ব্যাপারপ্রকাশক শব্দাদির সাহায্যেই অভিনব অভি-জ্ঞতার অতীন্দ্রিয় ভাবাদি ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে দুই বা ততোধিক বস্তুতে কোনও সাধারণ ধর্ম্ম দর্শন করিয়া, একই শব্দের দ্বারা, তাহাদের নামকরণ হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে এক শ্রেণীর উপমার সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর উপমাকে ম্যাক্সমূলর ধাতুগত উপমা—Radical Metaphor—কহিয়াছেন। বস্ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বল হওয়া; এই উজ্জ্বলতা, দিবা, দিবাকর, এবং স্বর্গের সাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং এই সাধারণ ধর্ম্ম অবলম্বনে এই একই "বস্" ধাতু হইতে বাসর, বিবস্বৎ, এবং বসু এই তিন বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞাপক তিনটি পদ সিদ্ধ হই-য়াছে। ইহাই ধাতুগত বা ধাতবী উপমার—Radical Metaphor এর—দৃষ্টান্ত। আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। অর্ক ধাতুর অর্থও উজ্জ্বল হওয়া, এবং উজ্জ্বল করা। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতে এই উজ্জ্বল

করার অনেক অর্থ ছিল। মানুষে প্রযুক্ত হইয়া, এই অর্ক ধাতু, আনন্দিত করা, প্রফুল্ল করা, এবং তদর্থে স্তুতি বন্দনা করা পর্য্যন্ত বুঝাইত। এই ধাতুর মৌলিক অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা উজ্জ্বল করা এবং অতি সহজেই এই অর্থে, এই ধাতু সূর্য্য, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, প্রযুক্ত হইতে পারিত, এবং অর্কা বা ঋচ অতি প্রাচীনতম কালে, আর্য্যদিগের মধ্যে হয়ত এই সমুদায় বস্তুকেই ব্যক্ত করিত। কিন্তু বর্ত্তমান আর্য্য ভাষায় ঋচ কেবল স্তুতি বন্দনা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঋচ অপর যে সকল অর্থ ব্যক্ত করিতে পারিত, তাহার সঙ্গে ঋচের সকল সম্বন্ধ যে একেবারে লোপ পাইল, এমনও নহে। কেবল ঐ একই ধাতুর বিভিন্ন প্রকারের পারিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া, ঐ সকল বিবিধ অর্থজ্ঞাপক বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হইল। যেমন, কিরণ কিম্বা আলোক অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য ঐ ধাতু হইতেই পুংলিঙ্গে অর্চিঃ শব্দ স্ত্রীবে অর্চিস্ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। কিন্তু অর্চি বা অর্চিসের আর স্তুতি বন্দনা অর্থ রহিল না। আবার ঐ অর্ক বা অর্চি ধাতু হইতেই পুংলিঙ্গ অর্কঃ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। এই অর্কেরও অর্থ কিরণ বা আলোক, এবং ক্রমে ইহা কিরণাধার দিবাকরের এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গেল। অন্য দিকে স্তুতি-বন্দনা-বাচক এই অর্ক বা অর্চ ধাতু হইতে এই একই প্রক্রিয়া অবলম্বনে ঠিক একই লিঙ্গের একই আকারের আর একটী অর্কঃ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। এই অর্কের অর্থ স্তুতিবন্দনা, এবং ক্রমে ইহা বেদের স্তুতি বন্দনাদিতে বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইল। ইহাও ধাতুগত বা ধাতবী উপমার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত। এই উপমা হইতেই বেদের একটা দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্কঃ অর্থ সূর্য্য; অর্কঃ অর্থ বেদের স্তুতিবন্দনা। অতি প্রাচীন কালে, যে বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে এই একই আকারের দুই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছিল, যত দিন পর্য্যন্ত লোক-স্মৃতিতে তাহা জাগরূক ছিল, ততদিন কোনও দেববাদ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে এই অর্কঃ দ্বয়ের জন্মবৃত্তান্ত লোকে ভুলিয়া গেল। এবং একই শব্দে দুই বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইল। এইরূপে এই ধাতবী উপমা অবলম্বনে বেদের ঋচের সঙ্গে সূর্য্যের একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এই সম্বন্ধের মূল অন্বেষণে যাইয়া সূর্য্যই বেদের প্রকাশক, সূর্য্য দেবতা বেদ-প্রচার ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এই বৈদিক দেববাদের সৃষ্টি হইল। ম্যাকসমূলর প্রভৃতি বলেন যে, এইরূপ ধাতবী (radical) উপমা অবলম্বনে, শব্দের মৌলিক অর্থের বিস্মৃতিজনিত ভাষার বিকৃতি হইতে, এক প্রকারের দেববাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু ধাতুগত উপমাই (Radical Metaphor) দেববাদোৎপত্তির এক মাত্র কারণ নহে। সাধারণতঃ আমরা উপমা বলিতে যাহা বুঝি, ম্যাক্সমূলর যাহাকে Poetical metaphor—কাব্যরচিত উপমা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার এবং অপরাপর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের নক্ষত্রকে যখন ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলি,—"দেখ ঐ নীলবাগানে কত ফুল ফুটিয়াছে"; কিম্বা গতিশীল মেঘের সঙ্গে যদি দ্রুতগামী দূতের তুলনা করিয়া, মেঘকে কালিদাসের মত, বিরহ বিধুরা প্রণয়িনীর দৌত্যে নিযুক্ত করি; কিম্বা সূর্য্যকে যদি অশ্বারোহী, তেজস্বী যোদ্ধার সঙ্গে তুলনা করিয়া, সূর্য্যরশ্মি সকলকে, তাঁহার শকট-যোজিত অসংখ্য শুভ্র অশ্ব রূপে বর্ণনা করি, তাহা হইলেই এই শ্রেণীর কাব্যোপমার সৃষ্টি হয়। শিশির-সিক্ত পত্র পল্লবাদির মধ্যে তরুণ অরুণের ক্রীড়া দর্শনে মোহিত হইয়া, অরুণ কিরণজালকে সূর্য্যের হস্ত বলিয়া কল্পনা করা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই স্বর্ণাভ কিরণজালকে উপমাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, সূর্য্যকে হিরণ্যপাণি উপাধি প্রদান করাও অতি স্বাভাবিক ছিল। এই রূপেই সবিতার এই নামকরণ হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদে (১, ৩৫, ৯,১০) তাহাকে হিরণ্যপাণি, হিরণ্যহস্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু যে সূত্র অবলম্বনে প্রথমে অতি স্বাভাবিক ভাবে, এই মনোহারি উপমা সূর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে, তাহা লোকস্মৃতি হই লুপ্ত হইল। তখন হিরণ্যপাণি শব্দের একটা সার্থকতা প্রতিপন্ন ক প্রয়োজন হইল। ইতিমধ্যেই বৈদিক সমাজে সূর্য্যোপাসনা প্রতিষ্ঠি হইয়াছে। সবিতা আপনার যজমানকে ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। প্রজাগণ তাঁহা হইতেই ধন রত্ন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং হিরণ্যপাণি আপনার প্রাচীন স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করিল। বৈদিক দেববাদে যজমানের পোষণার্থ সবিতা স্বর্ণাদি প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহার হস্তে সর্ব্বদাই অশেষ স্বর্ণ রহিয়াছে, অতএব তিনি হিরণ্যপাণি, এই কাহিনীর উৎপত্তি হইল। এইরূপ ভাবে কাব্যোপমা (Poetical Metaphor) অবলম্বনে বহুল পরিমাণে দেববাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য ম্যাকসমূলর প্রভৃতি বলেন, প্রাণীকরণ হইতে নহে, কিন্তু উপমার মৌলিক অর্থের বিস্মৃতি হইতে, ভাষার বিকৃতির ফল স্বরূপই, দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

উপমার দ্বারা যে দেববাদ কিয়ৎ পরিমাণে পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সকল প্রকারের উপমা হইতেই তো আর দেবোৎপত্তি হয় না। আকাশকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্পোদ্যানের সঙ্গে তুলনা করিয়া নক্ষত্ররাজিকে পুষ্পরূপে কল্পনা করা যায়, ততক্ষণ, এই উপমা হইতে কদাপি দেবতার উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু নক্ষত্র সকলকে মানব চক্ষুর সঙ্গে তুলনা করিয়া, নক্ষত্র খচিত আকাশকে সহস্রাক্ষরূপে কল্পনা করিলেই, এই উপমা হইতে দেবতার উৎপত্তি সম্ভব হইল। এবং ইহার অর্থ এই যে, আকাশকে সহস্রাক্ষ বলাতেই আকাশে প্রাণ আরোপিত হইল। অতএব প্রাণীকরণ ব্যতিরেকে শুদ্ধ উপমার দ্বারা দেবোৎপত্তি সম্ভব নহে। প্রাণী করণকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া, শুদ্ধ উপমার সাহায্যে, ভাষার বিকৃতি ঘটিয়া সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, ম্যাকস মূলর প্রভৃতির এই মত সর্ব্বত্র সমাক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দেবোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাণীকরণের কার্য্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করা সাধ্যায়ত্ত নহে; করিলে দেববাদের নির্ব্বিবাদ ব্যাখ্যা হইতেই পারে না। ম্যাকস মূলর প্রভৃতির দেববিজ্ঞানে আর একটা ভ্রান্তি এই যে, তাঁহারা সকল দেববাদকে শুদ্ধ আধিভৌতিক কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। ম্যাকস মূলরের এই ভ্রান্তি বিস্ময়কর, কারণ হিন্দু আর্য্যদিগের সাহিত্যে পিতৃযান ও দেবযান, এই উভয় পন্থারই বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে; এ অবস্থায় তিনি যে কিরূপে পিতৃযানকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া, শুদ্ধ দেবযান অবলম্বনেই দেব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন।

নিসর্গ দেবতা ও কুলদেবতা।

ফলতঃ নিসর্গ হইতে যেমন এক শ্রেণীর দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে সেইরূপ পিতৃপুরুষগণের স্মৃতি ও তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি হইতেও আর এক শ্রেণীর দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। মানুষ আদিম কাল হইতে সামাজিক জীব। মানুষ কখনও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত না এমন অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং অতি আদিমকাল হইতেই নিসর্গ এবং জনসমাজ, এই দ্বিবিধ বিষয় মানব মনকে অধিকার এবং নৈসর্গিক ও সামাজিক এই দ্বিবিধ শক্তি তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল। সুতরাং একদিকে নিসর্গের প্রাণী করণের দ্বারা নিসর্গ দেবতা সকলের উৎপত্তি হয়। অন্য দিকে সমাজশক্তির পশ্চাতে পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠি করিয়া, কুলদেবতাদিগের সৃষ্টি হয়। দেবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে, এই উভয় শ্রেণীর দেবতারই আলোচনা করা প্রয়োজন। য়ুরোপীয় দেববিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে ম্যাকসমূলর প্রমুখ একদল কেবল নিসর্গ দেবতারই আলোচনা করিয়াছেন। আর স্পেন্সার প্রমুখ অন্য দি

ই কুলদেবতাদিগের আলোচনা করিয়াছেন, নৈসর্গিক দেববাদের অন্বেষণে সম্যক্ সচেষ্ট হন নাই। কিন্তু হিন্দুর দেববাদ কেবল র্গ দেবতাদিগের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। পিতৃযান ও দেবযান, উভয় যানের তত্ত্বান্বেষণ না করিলে বৈদিক দেববিজ্ঞানকদাপি াকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন দেববাদ আছে, হাতে নিসর্গ দেবতার প্রাধান্য আদৌ নাই, যাহা বহুল পরিমাণে দেবতাদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। চীনের দেববাদ এই াবোক্ত শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং ম্যাক্সমূলরের প্রণালী অবলম্বনে চীনের বাদের সঙ্গত ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এই কারণে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বিজ্ঞান এখনও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে নাই। ম্যাক্সমূলরের এবং ন্সারের মতের সমন্বয় সাধিত হইলে য়ুরোপায় প্রকৃত দেববিজ্ঞানের তিষ্ঠা হইবে।

দেবোৎপত্তির বিবিধ কারণ।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দেববিজ্ঞানের আর একটা ভ্রান্তি এই যে, সকলেই টী মাত্র মূল কারণ হইতে সর্ব্ব প্রকারের দেববাদের উৎপত্তি নির্দ্দেশ রিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতা নিবন্ধনই ম্যাক্সমূলর শুদ্ধ ষার বিকৃতি হইতে দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, প্রাণপণে এই মত প্রতিষ্ঠা রিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলতঃ কিন্তু একই কারণ হইতে দেব-দের উৎপত্তি হয় নাই। যেমন নৈসর্গিক ও সামাজিক কারণে নিসর্গ তা ও কুল দেবতা, এই দ্বিবিধ শ্রেণীর দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, মনি শুদ্ধ কল্পিত কাহিনী হইতেও কিয়ৎপরিমাণে দেববাদের ষ্ট হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সভ্যযুগেই যে কেবল কল্পনা-চরীকে সঙ্গে লইয়া কাব্য উপন্যাসাদি রচনা করিতেছি, আর মাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে তাহা করিতেন না, এমন নহে। না মানব মনের চির সহচরী। এই কল্পনার বলে আদি মানুষও বধ গল্প রচনা করিত। এই সকল প্রাচীন গল্প হইতেও দেববাদের ষ্ট হইয়াছে। তারপর বর্ব্বর জাতির বিজ্ঞান হইতেও এক শ্রেণীর বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের দেশে পারদ এবং অভ্রের উৎপত্তি ন্ধে যে সকল দেবকাহিনী প্রচলিত আছে, এ সকল সেই শ্রেণীরই র্গত। ভূকম্প সম্বন্ধেও নাগকচ্ছপাদির যে কাহিনী অজ্ঞ লোকে াস করিয়া থাকে, তাহাও বর্ব্বরবিজ্ঞানোৎপন্ন দেবকাহিনী। ীয়তঃ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনেও কখনও কখনও দেববাদের অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়। কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকা লোহিত বর্ণের। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের শোণিতে কুরুক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া-ন, ইহাই বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের লোহিত বর্ণ মৃত্তিকার কারণ। এই কাহিনী (Myth) ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ার বর্ব্বর সমাজের ভূগোলজ্ঞান হইতেও নানাবিধ দেবকাহিনী পন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের পুরাণোক্ত ক্ষীরোদাদি সাগরের পত্তি কি এইরূপে হয় নাই? সুতরাং একই কারণে যে সর্ব্বপ্রকারের বাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। বিবিধ কারণে দেববাদের পত্তি হইয়াছে। বিবিধ ভাবে তাহার সদর্থ করিবার চেষ্টা করিলে তবে কৃত দেববিজ্ঞান রচিত হইতে পারিবে। নতুবা সমুদায় দেবতত্ত্বকে বল এক নিসর্গের ছাঁচে বা কুলদেবতার ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিলে বে কেন? ম্যাকসমূলর এই ভ্রম করিয়াছেন বলিয়া, অশেষ শ্রম করিয়াও তিনি বর্ত্তমান যুগের দেববিজ্ঞানকে সম্যকরূপে চিত করিতে সমর্থ হন নাই।

র্ত্তমান দেববিজ্ঞানক্ষেত্রে ম্যাকসমূলরের কার্য্য।

কিন্তু এই ত্রুটী কেবল ম্যাকসমূলরের নহে; ম্যাকসমূলর যাহা রেন নাই, য়ুরোপীয় অপর কোনও পণ্ডিতও আজ পর্য্যন্ত তাহা করিতে চেষ্টা করেন নাই। এবং য়ুরোপীয় দেববিজ্ঞানের মৌলিক অপূর্ণতা অপনোদন করিতে পারেন নাই বলিয়া, ম্যাক্সমূলরের দ্বারা যে সাধনার এই অঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। দেববিজ্ঞানে তিনি নূতন তত্ত্ব কিছুই আবিষ্কার করেন নাই সত্য, কিন্তু আর্য্যজাতির দেববিজ্ঞান, কি হিন্দু, কি হেলেনীয় উভয়ই যে এক আদি মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পট, বর্ণুফ প্রভৃতির এই মত তিনি সবিস্তারে প্রচার ও কিয়ৎপরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ও হেলেনীয় নিসর্গ দেবতাগণ যে একই জাতীয়, বেদে যিনি দ্যুঃপিতর, হোমরে তিনিই জুপিটার, বেদের সারমেয় যে হোমরের হার্মিস্, এই সকল তত্ত্ব ম্যাকসমূলরের মত আর কেহ বহুলভাবে লোকমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিয়া যান নাই। গত শতাব্দীতে হোমরবর্ণিত দেবকাহিনীর সহিত ইহুদীয় ধর্ম্ম বিধানের একটা কাল্পনিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। ম্যাকসমূলর জনমণ্ডলীর মধ্যে বহুল ভাবে হিন্দু ও হেলেনীয় দেববাদের মৌলিক একত্ব প্রচার করিয়া, সে উদ্ভট চেষ্টার মূল কাটিয়া দিয়াছেন। এখন আর কেহ ঐরূপ ভাবে হেলেনীয় দেববাদের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে না। দেববিজ্ঞান সম্বন্ধে ধরিতে গেলে, ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ম্যাকসমূলর।

যেমন দেববিজ্ঞানের সেইরূপ ভাষাতত্ত্বের আলোচনাতেও ম্যাক্স-মূলরের কোনও মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না। এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপরের আবিষ্কৃত সত্য সমূহ বহুলভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন মাত্র, স্বয়ং কোনও অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া যান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার পরিচর্য্যা দ্বারা বর্ত্তমান যুগের এই অভিনব বিজ্ঞা-ন কিছুই পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, ইহা বলা অসঙ্গত হইবে। পট, গ্রিম্ ও বর্ণুফ প্রভৃতি যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, ম্যাকসমূলর, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়া, বর্ত্তমান ভাষা বিজ্ঞানকে বিশেষ পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আর এই সকল তত্ত্বের বহুল প্রচারে ভাষা বিজ্ঞানের ভবিষ্য উন্নতির পন্থা পরিষ্কার হইয়াছে। এই পরিচর্য্যার জন্য, ভাষাতত্ত্বান্বেষিগণ ম্যাকসমূলরকে চিরদিনই কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবেন।

ভাষার উৎপত্তি।

সকল ভাষাই কতিপয় মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা কিঞ্চিদধিক সপ্তদশ শত মূল ধাতু হইতে সমুদায় সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলর বলেন যে, বর্ত্তমান ভাষা বিজ্ঞানে ধাতু বলিতে যাহা বুঝায়, সেরূপ শব্দ সংস্কৃতে প্রায় ছয় শত মাত্র পাওয়া যাইবে। এই ছয় শত মৌলিক ধাতু হইতে বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য শব্দ রচিত হইয়াছে। হিব্রু সাহিত্য এইরূপ প্রায় পাঁচ শত মূল ধাতু দ্বারা গঠিত হইয়াছে। চীন ভাষায় সাড়ে চারি শত মূল ধাতু পাওয়া যায়। এই সাড়ে চারি শত মূল ধাতু হইতেই চীন ভাষার প্রায় পঞ্চাশ সহস্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে শব্দের বিশ্লে-ষণ সম্ভব নহে, যাহাতে বিভক্তি প্রভৃতি যুক্ত হইয়া বিভিন্ন পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই নাম ধাতু। ভাষার উৎপত্তি ধাতু হইতে; কিন্তু ধাতুর উৎপত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের দুই উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। এক দল বলেন—প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণে মানব আপনার ভাষা রচনা করিয়াছে। অর্থাৎ মানুষের আদি অবস্থায় কোনও ভাষা ছিল না, সে বাক্যের দ্বারা আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না। ক্রমে পশুর চীৎকার, পাখীর গান, বজ্রের নিনাদ, বায়ুর নিস্বন, সমুদ্রের সাঁ সাঁ, তটিনীর কলকল, এইরূপে জীব কণ্ঠ-নিঃসৃত ও প্রাকৃতিক শক্তি সমুৎপন্ন বিবিধ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়; এবং

এই অনুকৃত শব্দের সঙ্গে তত্তৎ শব্দ প্রকাশক বস্তুর সংযোগ করিয়া, ক্রমে তদ্দ্বারাই তাহাদের নামকরণ করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মানুষ একটা গো দেখিল। গো শার্দ্দূল নহে, আকার ও বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিল। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে গরুর বর্ণ আকৃতি, সকলই জানিল; জানিয়া গরুর এমন একটা বিশেষত্ব মনে মনে অন্বেষণ করিতে লাগিল, যাহা দ্বারা সে এই বিশেষ জন্তুকে চিরদিন চিহ্নিত করিতে পারিবে। গো তখন ডাকিয়া উঠিল,—এই ডাকই গোর বিশেষত্ব হইল। গো যেরূপে ডাকিল, সেই ডাকের অনুকরণে গোর নামকরণ হইল। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই এক মত প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই মতের সমালোচনা করিতে যাইয়া ম্যাকসমূলর বলেন যে, যদিও প্রত্যেক ভাষাতেই কতিপয় অনুকৃত শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সমুদায় শব্দ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা অসাধ্য। ফলতঃ মর্ম্মর, কুকুট প্রভৃতি কতিপয় শব্দ ব্যতীত অধিকাংশ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অনুকৃতির মত প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ আমরা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাই যে, এই অনুকৃত শব্দ হইতে, সাক্ষাৎভাবে অন্য কোনও শব্দ উৎপন্ন হয় নাই। সংস্কৃতে কুকুট কোনও মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, এবং তাহা হইতেও কোন পদ নিষ্পন্ন হয় নাই। কেবল কুকুটের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য, ফরাসী ককেট (coquet) প্রভৃতি কতিপয় শব্দ কুকুট হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোনও পূর্ণ বিকশিত ভাষার শব্দ সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া, তত্তৎ মৌলিক ধাতুতে উপনীত হইলেই, এই মতের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইয়া যায়।

হা! হতোস্মি! হইতে ভাষার উৎপত্তি।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, মানুষ ইতর প্রাণীর শব্দ বা প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণ করিয়া আপনার ভাষা রচনা করিয়াছে, এরূপই বা মনে করিব কেন? মানব তো নিজেই কখনও ক্রন্দন করে, কখনও হাস্য করে, কখনও চীৎকার করে, কখনও হাহাকার করে। এই সকল হা হতোস্মি হইতেই মানবীয় ভাষা রচিত হইয়াছে। এই মত খণ্ডন করিতে যাইয়া ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন যে, আজি পর্য্যন্ত আমরা কোনও মানবীয় ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া কেবল হা হতোস্মি প্রাপ্ত হই নাই। ফলতঃ হা, হতোস্মিতে, মানবের ভাষা আরম্ভ হওয়া দূরে থাকুক, হা, হতোস্মি বর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত ভাষার সূচনাই হয় না। যেখানে হা হতোস্মির শেষ, সেইখানেই ভাষার আরম্ভ। রুদ্ ধাতু আর উঁ উঁতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বিশেষতঃ যদি অনুকৃতি বা হা হতোস্মিই মানবীয় ভাষার মূল হইত, তবে ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যেকেন ভাষা রচিত হইতে পারিত না, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। তোতা, কাকাতুয়া, ময়না, দয়েল প্রভৃতি সে অবস্থায় সহজেই সাহিত্য রচনা করিতে পারিত; এবং মার্জ্জারশিশু কোমল গীতি কাব্য রচনা করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। মোট কথা, মানবীয় ভাষার উৎপত্তি যেখান হইতে, যে উপায়েই হউক না কেন, শুদ্ধ অনুকরণ বা হা হতোস্মি হইতে তাহা উৎপন্ন হয় নাই, ইহা স্থির নিশ্চিত।

শব্দ বাদ।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে ভাষার অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ শব্দকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন, এক স্ফোটাত্মক শব্দ, ও অপর বর্ণাত্মক শব্দ। বর্ণাত্মক শব্দ উৎপত্তি—বিনাশশীল; ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। তাহা নিত্য নহে। এই স্ফোটাত্মক শব্দই প্রকৃত শব্দ। এই শব্দ অপৌরুষেয় ও নিত্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ভারতীয় স্ফোটবাদের সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক বস্তুর যেমন একটা জাতি আছে; যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই; (কিন্তু ব্যক্তিরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয় মাত্র, জাতি নিত্য ও অবিনশ্বর); সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুজ্ঞাপক এক একটা স্ফোটাত্মক শব্দ আছে; যাহা নিত্যভাবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত। ঐ স্ফোটাত্মক শব্দ হইতেই, এই বস্তুজ্ঞাপক বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হেগেলীয়দিগের যেমন লগসবাদ হিন্দুর সেইরূপ এই স্ফোটবাদ একই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ম্যাকসমূলর প্রভৃতির মতে, এই স্ফোট হইতেই ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। ধাতু সকল কেবল শব্দ নহে, কিন্তু চিন্তার অচ্ছেদ্য আধার। মানুষ ভাষা ভিন্ন চিন্তা করিতে পারে না, ম্যাকসমূলর এই মত পোষণ করিতেন। সুতরাং প্রত্যেক মানসিক ভাবের সঙ্গে তদভিব্যঞ্জক শব্দের অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন ধাতু যেমন বিভিন্ন ভাবে বাজিয়া উঠে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিন্তাও বিভিন্ন ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই সকল বিভিন্ন ধ্বনিই ধাতু। যেমন আলোক দেখিলেই চক্ষের পাতা খুলিয়া যায়, সেইরূপ ধরিবার ইচ্ছা হইলেই "ধৃ" ধ্বনি অন্তরে জাগ্রত হয়, বা "ধৃ" শব্দ শুনিলেই ধরিবার জন্য হাত আপনি বস্তু বিশেষের প্রতি ধাবিত হয়। ধাতু হইতেই ভাষার উৎপত্তি। ধাতু সকল চিন্তার মূল উপাদান, মানব চিন্তার সঙ্গে নিত্যভাবে বিরাজিত, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ; মানব প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই ম্যাকসমূলরের মত। এই মতের সবিস্তার সমালোচনা এস্থলে অসম্ভব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জীবনে মরণে।

আমার বাল্য সঙ্গিনী সুধা আমাদের প্রতিবেশীর এক মাত্র কন্যা। আমরা সৃষ্টির দেশ হইতেই যেন এক সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া এক গ্রামে এক পাড়ায় আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ছেলেবেলার কথা এখন সুস্বপ্নের মত মনে হয়। আকাশে চাঁদ উঠিলে, অদূরে বাঁশী বাজিলে সুধাদের বাড়ী ছুটিতাম। উঠানে মাদুর পাতা; সুধার দিদিমা রূপ-কথার ভাণ্ডার। তাঁহার মুখনিঃসৃত কথার টুকরাগুলিকে আমরা দুইজনে প্রাণপণে গ্রাস করিতে থাকিতাম। কখন চাঁদ মাথার উপরে আসিত, কখন নিশীথের কোলে সমস্ত জগত ঘুমাইয়া পড়িত, জানিতাম না। প্রভাতে চিরপরিচিত গৃহ, আলুথালু শয্যা, আর মার মুখ দেখিয়া রাত্রির কথা নিতান্তই ধাঁধাঁর মত ঠেকিত। ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিত। আমারও মাথায় টনক্ পড়িত। দুরন্তপনার জায়গা ছিল সুধাদের বাড়ী। কত হাসি, কান্না, সোহাগ, আব্দার, খেলাধূলার সরস স্মৃতি সেই ক্ষুদ্র পল্লীভবনটির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। একদিন সুধা আমাকে ফেলিয়া ননির

সঙ্গে খেলিতে গিয়াছিল। এই গুরুতর অপরাধে তাহার সঙ্গে এমনতর আড়ি হইয়া গেল, যে ভাব হইতে সম্পূর্ণ একটি দিন লাগিল। যেমন একবৃন্তে যুগ্ম ফল ফলে, এক সন্ধ্যার এক প্রভাতে, ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে, কেহ কাহাকে লক্ষ্য করে না!—আমরাও তেমনি বাড়িতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে জীবনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল, এখন, দুজনেরই তেমন প্রাণ খুলিয়া মিশিতে কেমন বাধ'বাধ' ঠেকিত। আমার মা এবং সুধার মা বলাবলি করিতেন,— আমাদের দুটির বিবাহ হইলে বেশ হয়, কিন্তু তাহা ত হইবার নহে! যখন এরূপ বলাবলি হইত, তখন আমরা বালক বালিকা। আমাদের ঘনিষ্ঠতা যে অবশেষে প্রেমে পরিণত হইয়াছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বাল্য-কালের ভালবাসা বড় সরল, বড় ভালমানুষ, সে আপনি সাধিয়া যার তার কাছে ধরা দেয়; বয়সের সঙ্গে যতই পরিপক্কতা লাভ করে, ততই সাবধান হইয়া চলে!

আমাদের কেন বিবাহ হইতে পারে না, তাহার সকল কারণ আমি জানিতাম না। কিন্তু বিবাহ অসম্ভব একথা সুধা এবং আমি উভয়েই নিশ্চিতরূপে জানিতাম। এখন আমরা আর ছোটটি নহি। আমার বয়স কুড়ি, সুধা সপ্তদশবর্ষীয়া। সুধা স্বভাবতই বড় লাজুক, বড় চাপা, তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ভালবাসার কথাও হয় নাই। কেবল তাহার করুণাকোমল শান্ত দৃষ্টিতে তাহার শুভ্র স্বচ্ছ অন্তর খানি বড় স্পষ্ট প্রতি-বিম্বিত হইত! আমি তাহা জলের মত পাঠ করিতাম। এক দিন স্থির করিলাম, বিবাহসম্বন্ধে সুধার মনের ভাব পরীক্ষা করিতে হইবে। সুধাদের বাড়ীর পাশেই বাগান। সুধা প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা সেখানে বেড়াইতে আসে। আমি গিয়া দেখিলাম, সুধা একটা গাছের তলায় বসিয়া আছে। নিঃশব্দে তাহার কাছে গিয়া বসিলাম। সেদিন চৈত্র-পূর্ণিমা। গাছের পাতার মধ্য দিয়া সম্মুখস্থ দীঘির কাল জলে জ্যোৎস্না নামিয়াছে। একটা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আজ অন্তরে বাহিরে কি যেন একটা চঞ্চল আনন্দোৎসব চলিতেছিল। আমি ডাকিলাম,—সুধা! আমার স্বর কম্পিত—কিঞ্চিৎ বেদনা-জড়িত। কোন উত্তর পাইলাম না, কেবল একখানি কুসুমকোমল করতল আমার করতলের মধ্যে আশ্রয় লইল। উহার মধ্যে এমন একটা নির্ভরশীলতা ছিল, যাহা আজন্মব্যাপী এবং আমরণসঙ্গী। সহসা তাহার অধরে আমার অধর মিলিল। প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ ও জ্যোৎস্নার লীলা-হাস্যের মধ্যে সেই প্রথম প্রেমের প্রথম চুম্বন! ভালবাসা যেন মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া ভক্তের পূজা সেই প্রথম গ্রহণ করিলেন। সুধা কি মনে করিয়া আসিয়াছিল, জানি না। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত মিলন-ব্যাপারের জন্য যে একটি মোহমধুর পূর্ণিমা রাত্রির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কথাটি মাত্র না বলিয়া দ্রুত পদে বাড়ী ফিরিলাম। সেই অবধি, আমাদের দুজনারই সঙ্কোচের ভাবটা শত গুণে বাড়িয়া গেল। এখন পরস্পরের দেখা শুনা পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিল।

এইবার সুধার পিতার পরিচয়টা দেওয়া আবশ্যক। সুধার পিতার নাম লোকনাথ দত্ত। লোকটী উদার, শিক্ষিত, কিছু উদাসীন, কিছু এক গুঁয়ে। দেশাচার ও লোকাচারের উপর হাড়ে চটা! বন্ধুরা তামাসা করিয়া তাঁহাকে Reformed Hindoo বলিতেন। লোকনাথ বাবু বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী। তাই সমাজের অনেকগুলি খোঁচা পরিপাক করিয়া যুবতী কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন। একদিন সুধাদের বৈঠক-খানায় বসিয়া আছি, লোকনাথ বাবু ও তাঁহার বাল্য-বন্ধুর মধ্যে সমাজসংস্কার, দেশ-উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে; আমি মাঝে মাঝে তাঁহাদের মুখ হইতে দু'একটা কথা কাড়িয়া লইয়া মহা ভালমানুষের মত উভয়ের মন রক্ষা করিতেছি। অনেক কথার পর বন্ধু সুধার কথা পাড়িলেন। রূপ গুণের সুখ্যাতি আরম্ভ করিয়া ছোটখাট speech দিয়া ফেলিলেন। আমার সমস্ত মুখটা লাল হইয়া উঠিল। বন্ধু বলিলেন, সুধা ত আর এখন বালিকা নহে, যোগ্য পাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দাও। মেয়ে চির কুমারী থাকে, এটা বোধ হয় তোমার ইচ্ছা নয়। লোকনাথ বাবু হঠাৎ একটুকু অন্যমনস্ক হইলেন। খানিক পরে কিঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—নিশ্চয় না। আমি ঐ মতটাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। শীঘ্রই সুধার বিবাহ দিব। তুমি একটি বর দেখিয়া দাও না!" আমার সমস্ত মুখে কে যেন কালী মাখাইয়া গেল! ভাগ্যি রাত্রিকাল, প্রদীপও তত উজ্জ্বল ছিল না, নহিলে আমার

ভাবান্তর বোধ হয় তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিতেন। কাহাকেও সম্ভাষণ মাত্র না করিয়া চলিয়া আসিলাম। পৃথিবী প্রবল বেগে আমার পায়ের নীচে ঘুরিতেছিল, কখন বাড়ী পৌছিয়া বিছানা লইলাম, জানি না। আমার বালিকা ভগ্নী আহারের জন্য ডাকিতে আসিলে, তাহাকে এমন তাড়া করিয়া উঠিলাম যে, সে কাঁদিয়া পলাইয়া গেল; আর আসিল না। সে রাত্রি আবার নিদ্রা? আমার মনে হইতেছিল, যেন বাহিরে আমার সর্ব্বনাশের জন্য একটা বিষম আয়োজন চলিতেছে। সমস্ত সংসার যেন একটা গভীর চক্রান্তচক্র ও ষড়যন্ত্রে সুধাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছে। হায়, হায়, সুধার বিবাহ!—কেন, তাহার কি বিবাহ হইতে নাই? তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া সে কি চিরকুমারী থাকিবে? কিন্তু এ চিন্তা মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইত না। সুধা পরের হইবে, ইহা আমার নিকট অসহ্য। আমার বুকে বসিয়া অভিমান অগ্নি জ্বালাইতেছিল! অভিমানটা সুধার উপর, কি সুধার পিতার উপর, কি সমাজের উপর জানি না—বোধ হয় সকলের উপরই। আহা সুধার কি দোষ? সে কি করিতে পারে?

এখন সুধাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কতকটা প্রণয় অভিমান, কতকটা নৈরাশ-জনিত লজ্জা, কতকটা অকারণ অপমান-জ্ঞান হেতু সুধাদের বাড়ী যাইতাম না সত্য, কিন্তু নিত্যকার খবর লইতাম। প্রেম এমনি করিয়া বঞ্চিতের খুঁটিনাটির সন্ধান লইয়া থাকে! সংসার যখন আপনাকে কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, প্রেম তখন নিশ্চিন্তমনে বাঞ্ছিতের পশ্চাতে ছায়ার মত ফিরিতে থাকে। একদিন শুনিলাম, বিবাহে সুধার বড় আপত্তি, এজন্য পিতা পুত্রীতে একটুকু মনোমালিন্যও হইয়াছে। বিবাহে আপত্তি কেন, সুধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ তাহার উত্তর পায় নাই। লোকনাথ বাবু মনে করিলেন, মেয়ে লেখা পড়া শিখিয়া চির-কৌমার ব্রতে উৎকট কল্পনাকে মনে স্থান দিয়াছে। মাতা বুদ্ধিমতী; কিন্তু হাজার হোক্ মা!—মনে করিলেন, আজন্মের স্নেহাশ্রয় পিত্রালয়ের মায়া কাটান কি সহজ কথা? আসল কারণটী জানিতাম, শুধু আমি। আমার বুঝিতে বাকী ছিল না; আমারি জন্য সুধা এই কঠিন পণ করিয়াছে। কিন্তু আমার সহিত ত তাহার মিলন অসম্ভব। তবে কি সুধা আমারি মত একটা অলৌকিক কল্পনার মোহে মুগ্ধ হইয়া ইহলোককে এমনি করিয়া অগ্রাহ্য করিতেছে! চির উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া পরলোকে প্রিয় সম্মিলনের স্বপ্ন দেখিতেছে! কিন্তু সুধার সমস্ত মনের ভাবগুলির সহিত আমি তত সুপরিচিত ছিলাম না। সুধার নিকট আমি এতটা প্রত্যাশাও করিতাম না; সে যে আমারই জন্য তাহার সুকুমার শক্তি লইয়া এতগুলি বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, এই চিন্তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আর একদিন শুনিলাম, লোকনাথ বাবু একটি পাত্রের বাড়ী লোক পাঠাইয়াছিলেন। বরের বাড়ী হইতে মেয়ে দেখিতে আসিলে সুধা হঠাৎ জ্বর করিয়া বসিল! এইরূপ দুই তিন বার হইল। আর কতদিন ভাণ চলে? বারবার বিফল মনোরথ হইয়া লোকনাথ বাবুও বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। এবার সুধার হার্ হইল। সহসা একটি পাত্রও জুটিল। শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব হইবে কেন? পরশুই বিবাহ। আমি ত আপনার লোক, শুভ কর্ম্মের আয়োজন উদ্যোগের আংশিক ভার আমারও উপর না পড়িবে কেন? ভাবিয়াছিলাম, সুধার বিবাহরাত্রে একটা ছুতা করিয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় লইব। দূরস্থিত মিলনের বাঁশী শুনিতে শুনিতে মুমূর্ষু প্রাণটাকে আপনার হাতে জ্বলন্ত চিতায় সঁপিয়া দিব।

আজ বিবাহ; সমস্ত দিন ধরিয়া আনন্দের সুরে সানাই বাজিতেছে। আমার চারিদিকে পল্লী স্ত্রীগণের উলুধ্বনি ও হাস্যকৌতুক মুহুর্মুহু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আমি বুকের মধ্যে শেল লইয়া হাসি ছড়াইতে লাগিলাম। শেষে শ্রান্তির ভাণ করিয়া একটা নির্জ্জন ঘরে শুইয়া পড়িলাম। সে রাত্রে আমার অন্তরে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, সেই হাস্য মুখরিত উৎসব ভবন কি তাহার সন্ধান লইয়াছিল? বেশ টের পাইলাম, বর-কনে বিবাহমণ্ডপে আসিয়াছে, এখনই সম্প্রদান শেষ হইয়া যাইবে। আমি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলাম। দুই হাতে মাথা টিপিয়া কতকটা কাঁদিয়া লইলাম।

সহসা বিবাহ সভার দিক দিয়া একটা রোদনের রোল উঠিল। ছুটিয়া গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। সুধা বিবাহ-আসনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আমার মনে সহসা সেই অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তার আনিতে ছুটিলাম; ফিরিতে বিলম্ব হইল।

ডাক্তার যখন আসিল, তখন সুধা আর ইহলোকে নাই। বিষ কোথায় পাইল?—খোঁজ হইতে হইতে দিদিমার আফিমের শূন্য কৌটাটি সুধার বালিসের নীচে পাওয়া গেল। দিদিমা তাহার এক মাসের খোরাক কৌটায় পুরিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ হইতেই আমার মাথায় আগুণ জ্বলিতেছিল, এবার চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। পড়িয়া যাইতেছিলাম, কষ্টে আপনাকে সামলাইলাম। আর বাড়ী ফিরিলাম না; সেই রাত্রেই দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। কলিকাতায় কিছু টাকা পাওনা ছিল, তাহা লইয়া সেই দিনই মুঙ্গের যাত্রা করিলাম। বিশেষ করিয়া মুঙ্গের যাওয়াই যে স্থির ছিল, তাহা নহে। ষ্টেশনে যখন বেড়াইতে ছিলাম, তখনও ভাবি নাই, কোথায় যাব। একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু, তুমি কি মুঙ্গের যাইবে? আমিও সেখানে যাইতেছি। আমি কলের পুতুলের মত বলিলাম হাঁ মুঙ্গের যাইব। তিনি বলিলেন, টিকিটের ঘণ্টা ত অনেকক্ষণ পড়িয়াছে। আমি টীকিট লইয়া তাড়াতাড়ি একটা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম; ভদ্রলোকটির জন্য যে অপেক্ষা করিবার কথা ছিল, তাহা মনেই হইল না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, অন্তর হইতে এরূপ অনেক ব্যাকুল ব্যথিত প্রশ্ন উঠিল। জগৎ নিরুত্তর, চারিদিক্ অন্ধকার, শুধু অন্ধকার! সেই অপার অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। যথাসময়ে মুঙ্গেরে পৌঁছিলাম; সহরের এক প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া কিছুদিন কাটাইলাম। সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। সেখানে একটি ক্ষুদ্র কর্ম্ম লইলাম; বেতন সামান্য। আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল, কেবল জীবনধারণের জন্য।

দেখিতে দেখিতে সুধার মৃত্যুর পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন রবিবার, ছুটি। একখানা উপন্যাস খুঁজিতে গিয়া অনেকগুলি পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া আমার কবিতার খাতাটি বাহির করিলাম। সুধার মৃত্যুর পর সেই প্রথম কবিতার খাতা হাতে লইলাম। কবিতাগুলি অনেক দিনের রচনা। কস্মিন্ কালেও কবি নামে পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা রাখি নাই। জীবনের মধ্যে একটা বয়েস আছে, যখন সকলেই হঠাৎ কবি হইয়া উঠে; আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমি আঠার বৎসরের সময় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। যশের জন্য কখনও লিখি নাই। সুধাকে শুনানই আমার রচনার একমাত্র সার্থকতা ছিল। কবিতা শুনিয়া যখন সুধার মুখে একটি উদার হাস্য ফুটিয়া উঠিত, সেই মুহূর্ত্তেই যেন আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করিত। আমার লেখাগুলির প্রতি তাহার একটা স্নেহজনিত পক্ষপাতছিল। অনেকবার পড়িয়া পড়িয়া প্রায় সকলগুলিই তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। একটা নূতন কবিতা লিখিলেই, খাতা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। আমি লিখিতাম,—বিদুষী সুধা শুনিত, শুধুই শুনিত না, কখনও কখনও সংশোধন করিয়া দিত। একটা স্থান খুলিয়া দেখিলাম—হায় সে আজ কতদিন!—আমি লিখিয়াছিলাম "দেহের মিলন" সুধা "দেহের" কাটিয়া "আত্মার" করিয়াছে! তাহার সুন্দর হস্তাক্ষরটি তেমনি জলন্ত মহিমায় শোভা পাইতেছিল। তখন বুঝি নাই, সুধার প্রেমের আদর্শে কতটা উচ্চতা, কতটা আন্তরিকতা ছিল! একবিন্দু অশ্রুজল গড়াইয়া সুধার হস্তাক্ষরের উপর পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে কত কথা মনে উঠিতে লাগিল। আমি ভাবের আবেগে একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। কবিতার মধ্যে আমার সমস্ত বর্ত্তমানটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম। ভাষা ছন্দে, অলঙ্কার অনুপ্রাসে একটি সুধাস্মৃতি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। যেন সেই আত্মহারা সঙ্গীত কোন দূরলোক-প্রবাসী বাঞ্ছিতের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছিল। কবিতার নাম দিয়াছিলাম "প্রবাসিনী।" তুমি এখন যেখানে আছ, সেই খানেই কি প্রণয়ের পূর্ণ পরিণতি? পৃথিবীতে আমরা তাহারই আভাস মাত্র দেখিতে পাই? তুমি কি এখনও আমাকে ভালবাস? সস্নেহে স্মরণ কর? কবিতার মধ্যে এই রকমের অনেক আকুল প্রশ্ন ছিল। তুমি কি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া থাক? শুধু,একবার—একবার মাত্র আমি তোমার দর্শনকরুণাপ্রার্থী। তুমি আসিও, হে দয়াময়ী, তুমি আসিও!—এই রকমের বহু ব্যাকুল মিনতি ছিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল; সেদিন ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা। আমি খাতা লইয়া ছাদে উঠিলাম। তখন চাঁদ উঠিয়াছে; গঙ্গা পূর্ণযৌবনে কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে; নিকটে উপবনে স্তবকে স্তবকে দ্রাক্ষা ফলিয়াছে; দূর আম্রকানন হইতে একটা তর্ তর্ সর্ সর্ ধ্বনি যেন বিশ্ববেদনা বহিয়া আনিতেছে। আমি অপার রহস্যনিলয় আকাশের নীচে

দাঁড়াইয়া "প্রবাসিনী" কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম। একবার, দুইবার, বহুবার আবৃত্তি করিলাম। আমার কণ্ঠ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। ক্রমে সেই ধ্বনি যেন মেঘলোক স্পর্শ করিল। যেন নিবিড় নীলিমাবরণ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে কোন ছায়াময়ীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। আমার মনে হইল, যেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের পার হইতে কেহ আমার করুণ আহ্বান শুনিতে পাইল। ধীরে ধীরে খাতাটি বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। তখন নিশীথের গভীরতা সমস্ত কোলাহলকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছে। শুধু জাহ্নবীর, মৃদু মিষ্ট সঙ্গীত নৈশ পবনে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি একটা স্বপ্নভার বুকে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কখন জাগিলাম, জানি না। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, শিয়রে দাঁড়াইয়া রমণীমূর্ত্তি! কুলুঙ্গিতে কেরোসিনের আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছিল; ম্লানালোকে তাহাকে তেমন স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না; কিন্তু আমার সমস্ত অন্তরাত্মা এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়া দিব্য দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া লইল। আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল; ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া ডাকিলাম, সুধা! সুধা! কোন উত্তর পাইলাম না। ঠিক সেই সময়ে প্রদীপ নিবিয়া গেল। ঘরে ভোরের আলো প্রবেশ করিল। ছায়ামূর্ত্তি কখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, জানিতে পারি নাই। তাহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; আমি আমার সেই মানসীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া আছি এবং প্রতিক্ষণে মিলনের দেবতা মঙ্গলময় মৃত্যুর জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈত।

বর্ত্তমান সনের প্রথম সংখ্যক "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষার শব্দদ্বৈত সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ এ ধরণের প্রবন্ধ এক জনের চেষ্টায় নিখুঁত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তথাপি রবি বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শে সেই অসম্ভবও সম্ভব প্রায় হইয়াছে। প্রবন্ধের বেশীর স্থলে সামান্য ত্রুটী আছে বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

তিনি লিখিয়াছেন যে, 'চার চার,' 'তিন তিন'—এ সকল স্থলে দ্বিত্ব প্রকর্ষ বাচক। "চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির—অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।"

আমাদের মতে এখানে অন্যরূপ অর্থ—প্রত্যেকের জন্য বা প্রতি বারের জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির; যথা "তাহাদিগকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির," অথবা "যখনি কোন ছাত্র অনুপস্থিত হইত, তখনি গুরু মহাশয়ের আদেশ অনুসারে চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির হইত।" যেখানে একজন লোকও এক বার মাত্র বুঝায়, সেখানে 'চার চার পেয়াদা হাজির' এরূপ বলা যায় না; যথা নিম্নলিখিত বাক্যে—"তখন তাহাকে ধরিবার জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির হইল," এরূপ বলা যায় না। ফলতঃ 'চার চার পেয়াদা' অর্থ 'ইহার জন্য চার, উহার জন্য চার,' অথবা এবারে চার, সেবারে চার। এইরূপ 'চার চার গ্রামে একজন চৌকিদার' 'পাঁচ পাঁচ বেত দেওয়া হইল' (অর্থাৎ প্রত্যেককে পাঁচ বেত দেওয়া হইল, (বিভক্ত বহুলতাজ্ঞাপক—distributive numeral)

রবি বাবু লিখিয়াছেন, "সকাল সকাল" প্রকর্ষভাব ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে, দ্রুতরূপে সকাল বুঝাইতেছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহার অর্থ অন্যরূপ। 'রোজ সকাল সকাল উঠিবে,' অর্থাৎ প্রতিবারে সকাল সকাল উঠিবে। এইরূপ 'তোমরা কা'ল সকাল সকাল উঠিও—' অর্থাৎ প্রত্যেকে সকাল সকাল উঠিও। একজন ও একবারের বেলা 'সকাল সকাল উঠিবে বলা যায় না।* এখানেও পূর্ব্ববৎ দ্বিত্ব বিভক্তবহুলতাজ্ঞাপন করিতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন, 'গরম গরম' শব্দে দ্বিত্ব প্রকর্ষবাচক। তাহার মতে 'গরম গরম জল খাইবে,' ইহার অর্থ 'খুব গরম জল খাইবে'। কিন্তু আমাদের মতে উহার অর্থ 'প্রতিবারে গরম জল খাইবে,' অর্থাৎ 'যখন জল খাইবে গরম জল খাইবে'; অথবা 'প্রত্যেকে গরম জল খাইবে'। মাত্র একজন ও একবারের বেলা 'গরম গরম জল খাইবে' এরূপ বলা যায় না। ফলতঃ 'গরম গরম' শব্দে দ্বিত্ব পূর্ব্বের ন্যায়

---

* "আমি আজ একটু সকাল সকাল আফিসে যাইব, মনে করিতেছি" এখানে সমালোচক মহাশয় কিরূপ অর্থ করিবেন?—প্র-সং।

বিভক্ত বহুলতাজ্ঞাপক। কয়েকজন লোককে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে, "তোমরা গরম গরম জল খাইবে;" কিম্বা একজনকে লক্ষ্য করিয়াও বলা যাইতে পারে, "তুমি রোজ গরম গরম জল খাইবে।"

রবি বাবুর উল্লিখিত প্রকর্ষ অর্থ 'গরমাগরম' শব্দে আছে। উহার অর্থ 'গরমের উপরে গরম,' 'অতি গরম', এইরূপ 'ঝমাঝম্ বৃষ্টি'। এ গুলির সহিত 'সংস্কৃত পরাৎপর', 'সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম,' 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র' প্রভৃতি শব্দের বেশ সাদৃশ্য আছে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ ইহা অনুধাবনীয় যে, অভ্যস্ত শব্দের পূর্ব্বাংশের দীর্ঘস্বরত্ব অনেক স্থলেই উৎকর্ষবাচক; যথা কড়াকড়্, পুরাপুরি (অতিপূর্ণতা), বাড়াবাড়ি (অতিবৃদ্ধি)। কখন কখন শেষার্দ্ধের স্বর দীর্ঘ হইয়াও উৎকর্ষ বুঝাইয়া থাকে; যথা, লাল ডগ্‌ডগা, লবণে কটকটা, বুদ্ধিতে টন্‌টনা। পশ্চিম বঙ্গে এই সব স্থলে 'কট্‌কটে,' টন্‌টনে' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

রবি বাবু লিখিয়াছেন, টলটল শব্দের দ্বিত্ব প্রকর্ষ বুঝাইতেছে। আমাদের মতে এই দ্বিত্ব পৌনঃপুন্য-জ্ঞাপক frequentative) বলিয়া ধরিয়া টলমল শব্দের দ্বিত্ব প্রকর্ষজ্ঞাপক ধরিলে অর্থ অধিকতর সঙ্গত হয়। 'পদ্মপত্রে জল টলটল করিতেছে,' এস্থলে 'পুনঃপুনঃ টলিতেছে' অর্থ ধরিলে ভাল হয়; আর "দেবাসুরের যুদ্ধে পৃথিবী টলমল করিয়াছিল," এস্থলে প্রকর্ষ অর্থ ধরিলে ভাল হয়। এইরূপ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে' বলিলে পৌনঃপুন্য ও 'ঝকমক করিতেছে' বলিলে প্রকর্ষ বুঝায়।

এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পৌনঃপুন্য ও প্রকর্ষের অর্থ বড় কাছাকাছি,—যাহা বারংবার ঘটে, তাহা প্রকৃষ্টরূপেও ঘটে বটে। এই জন্যই সংস্কৃত যঙ্ প্রত্যয় যোগে যেখানে ধাতু অভ্যস্ত হয়, সেখানে প্রত্যয় উক্ত উভয় অর্থই জ্ঞাপন করে বলিয়া বৈয়াকরণগণ লিখিয়া গিয়াছেন; যথা পুনঃ পুনঃ বা অতিশয় জ্বলে যাহা—জাজ্বল্যমান।

রবি বাবু লিখিয়াছেন, কাঠে কাঠে, মানুষে মানুষে—এ সব স্থলে দ্বিত্ব পরস্পর-সংযোগবাচক। আমাদের মতে প্রথমোক্ত স্থলে ঐ অর্থ ঠিক্ বটে, কিন্তু শেষোক্ত স্থলে নহে। 'কাঠে কাঠে ঘর্ষণ', এস্থলে দুই কাঠের সংযোগ (contact) বুঝাইতেছে; কিন্তু 'মানুষে মানুষে শত্রুতা'র অর্থ—এই মানুষের সহিত ঐ মানুষের এবং ঐ মানুষের সহিত এই মানুষের শত্রুতা। এইরূপ, "চোরে চোরে মাসতুত ভাই" অর্থ—এই চোরের সহিত ঐ চোরের, ও ঐ চোরের সহিত এই চোরের মাসতুত ভাই ভাই সম্পর্ক। এ সব স্থলে 'পরস্পর সংযোগ' অর্থ—তত ভাল বোধ হয় না; শুধু অন্যোন্য অর্থ ধরিলে অর্থটীকে টানিয়া উহার স্থিতিস্থাপকত্ব নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না।

তিনি লিখিয়াছেন "কথায় কথায়—পুনরাবৃত্তি বুঝাইতেছে," অর্থাৎ উহার অর্থ 'প্রতি কথায়'। আমাদের মতে "কথায় কথায় ইংরেজ নিন্দা"—এরূপ স্থলে ঐ অর্থ ঠিক্; কিন্তু "কথায় কথায় বিবাদ বাধিয়া উঠিল"—এ স্থলে ঐ অর্থ সঙ্গত নহে। এ স্থলে 'কথায় কথায়' অর্থে 'এক কথার পরে অন্য কথায়'—'নানা কথায়'। এইরূপ 'হাতে হাতে ব্যাগটী চলিয়া গেল'—ইহার অর্থ 'এক হাতের পরে অন্য হাতে, এইরূপে নানা হাতে,' এ সকল স্থলে ক্রমানুবর্ত্তিতা (succession) বুঝাইতেছে। এইরূপ 'মুখে মুখে সংবাদটী রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে'; 'কথায় কথায় ব'লে ফেললে'। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত "শুনাশুন্ শুন্‌লাম," এ স্থলেও ঐ অর্থে দ্বিত্ব হইয়াছে—'এক জন শোনার পরে অন্য জন শুনিল, তাহার নিকট হইতে অন্য একজন শুনিল, —এই প্রণালীতে শুনিলাম।'

রবি বাবু লিখিয়াছেন, "পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে—প্রভৃতির স্থলে দ্বিত্ব নিয়তবর্ত্তিতাবাচক, অর্থাৎ এ গুলিতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করিতেছে"। আমাদের মতে উহাদের মধ্যে প্রথম দুটীর বেলা ঐ অর্থ ঠিক্ বটে, কিন্তু অপর দুটীর বেলা প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে। 'তাহার পেটে পেটে কুবুদ্ধি'—ইহার অর্থ 'তাহার অতি পেটে—গূঢ় পেটে—অতি লুক্কায়িত স্থানে—কুবুদ্ধি।' এইরূপ ভিতরে ভিতরে ষড়্‌যন্ত্র' অর্থ—অতি ভিতরে, অতি গোপনে ষড়্‌যন্ত্র। এইরূপ 'মনে মনে গালি' 'তলে তলে পরামর্শ' স্থলেও রবি বাবু নিয়তবর্ত্তিতা অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রকর্ষ অর্থ করি।

হাড়ে হাড়ে চটা—রবি বাবুর মতে এ স্থলে দ্বিত্ব পুনরাবৃত্তি-বাচক, অর্থাৎ উহার অর্থ 'প্রতি হাড়ে চটা।' আমাদের মতে উহা প্রকর্ষবাচক; এবং বাক্যটীর অর্থ—'হাড় পর্য্যন্ত অর্থাৎ অতিশয় চটা।' তাঁহার অর্থ আমাদের কাছে সঙ্গত বোধ না হইবার কারণ এই যে, তাঁহাতে, চর্ম্ম

মাংস রক্ত না লইয়া হাড় লইবার সার্থকতা থাকে না। এইরূপ 'কড়ায় কড়ায়' স্থলেও তাঁহার অর্থ লইলে টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে কড়া লইবার তাৎপর্য্য থাকে না; অতএব "কড়ায় কড়ায় হিসাব' অর্থ 'প্রতি কড়ার হিসাব' নহে,— 'কড়া পর্য্যন্ত হিসাব'।

তিনি লিখিয়াছেন, "ঘোড়া ঘোড়া খেলা, চোর চোর খেলা'—এ সব স্থলে ঈষদূনতা বুঝাইতেছে। অর্থাৎ তাঁহার মতে 'ঘোড়া ঘোড়া খেলা' অর্থে সত্যকার ঘোড়া নহে। তাহারি নকল করিয়া খেলা। আমাদের মতে উহার অর্থ "একবার তুমি-ঘোড়া, আর একবার আমি ঘোড়া, এইরূপ পরস্পর ঘোড়া হইয়া খেলা," এস্থলে 'পরস্পর-ভাব' বা পর্য্যায়ক্রম বুঝাইতেছে। এখানে ঘোড়ার অনুকরণ ভাবটি দ্বিত্ব দ্বারা সূচিত হইতেছে না, 'খেলা' শব্দ দ্বারা হইতেছে। যদি দ্বিত্ব দ্বারাই উহা সূচিত হইত, তাহা হইলে 'জামাই-বৌ খেলা' 'হর-গৌরী খেলা' প্রভৃতি স্থলে দ্বিত্ব না থাকা সত্বেও অনুকরণ বুঝায় কিরূপে? ফলতঃ খেলা শব্দ দ্বারাই অনুকরণ জ্ঞাপিত হইতেছে, দ্বিত্ব দ্বারা নহে। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, একাধিক লোক না হইলে বাঘ বাঘ বা চোর চোর খেলা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ সব স্থলে যেন পরস্পর-ভাব বুঝাইল; কিন্তু এক জন লোকে তো সাহেব সাহেব খেলিতে পারে; যেমন, 'তিনি বম্বে হইতে আসিয়া কয়েক দিন সাহেব সাহেব খেলিয়াছিলেন'। এ সব স্থলে পরস্পরভাব কেমন করিয়া খাটিবে?

ইহার উত্তর—এই শেষোক্ত স্থলে দ্বিত্ব দ্বারা পৌনঃপুন্য সূচিত হইতেছে, পূর্ব্বের উদাহরণগুলির ন্যায় পরস্পর-ভাব ব্যক্ত হইতেছে না। 'খেলা' শব্দও এক স্থলে প্রচলিত অর্থে ও অন্যত্র আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সাহেব সাহেব খেলা' অর্থ 'সাহেব সাহেব ক'রে মত্ত হওয়া' পুনঃ পুনঃ (বা দীর্ঘ কাল) সাহেবী ভাবে মত্ত হওয়া। এই রূপ পৌনঃপুন্য-জ্ঞাপক দ্বিত্ব নিম্নলিখিত স্থলেও দৃষ্ট হয়;—তিনি টাকা টাকা ক'রে পাগল, মরিবার অল্প আগে তিনি জল জল করিয়াছিলেন, বাঁশী রাধা রাধা বলে ইত্যাদি। (নিম্নে লিখিত ৭ম অনুবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

এক্ষণে রবিবাবুর প্রবন্ধে যে কয়েক রকমের শব্দ-দ্বৈতের উল্লেখ নাই, সংক্ষেপে সে গুলি বিবৃত করিতেছি।

(১) দেখিতে দেখিতে বাড়ী খানা পুড়িয়া গেল, "দেখিতে দেখিতে লুকাইল",—এস্থলে স্বল্প-সময় জ্ঞাপক এখানে 'দেখিতে দেখিতে অর্থ যেন 'দেখিতে না দেখিতে, 'অতি অল্প সময়ের মধ্যে'। এইরূপ "পুলিশ আস্‌তে আস্‌তে ডাকাতেরা চম্পট দিল;" "নুন আন্‌তে আন্‌তে পান্তা ফুরাইল"। কিন্তু 'কষ্টে কষ্টে হাড়ে দূর্ব্বা জন্মাইয়াছে'— এস্থলে দ্বিত্ব দীর্ঘকাল জ্ঞাপন করিতেছে, অর্থাৎ ঠিক উহার বিপরীত অর্থ বুঝাইতেছে।

(২) কোণা কোণি—কোণা অভিমুখে। এই রূপ লম্বালম্বি, আড়াআড়ি,—এ সব স্থলে দ্বিত্ব দিগভিমুখ (direction) বুঝাইতেছে।

(৩) গোলগাল মুখখানা—দিব্যি গোল মুখ খানা, এ স্থলে দ্বিত্ব সৌন্দর্য্য-বোধক। মোটা সোটা, নাদুষ নুদুষ ছেলে ছুলে, ছোট খাট, এবং পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রচলিত চিকন চাকন, পাত্‌লা পুত্‌লা প্রভৃতিও ঐ অর্থ-বাচক।

(৪) তেল্‌ তেলা মুখ—তৈলের মত (তৈলাক্তবৎ) মুখ।

এই রূপ, পাগল ছাগল মানুষ—পাগলের মত।

মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—মূর্খ সদৃশ।

তুলা তুলা ক'রে দিয়েছি—তুলার মত।

এ গুলি সাদৃশ্য বাচক।

(৫) পরে পরে আর কত সাহায্য কর্‌বে? এ স্থলে পরে পরে = পরেরা।

আপনা আপনি ঝগড়া করিও না = আপনারা।

মহামহা পণ্ডিত—মহা পণ্ডিতেরা।

এ গুলি বহুলতাজ্ঞাপক।

(৬) মারামারি—এ উহাকে মারে ও সে ইহাকে মারে। এ স্থলে পরস্পর অর্থ বুঝাইতেছে। এইরূপ হাতাহাতি, কাড়াকাড়ি, ঠেলাঠেলি। কিন্তু সাধাসাধি, চেঁচামেচি প্রভৃতির স্থলে পৌনঃপুন্য অর্থ ব্যক্ত হইতেছে, অথবা কর্তৃ-বহুলত্ব জ্ঞাপিত হইতেছে; (নিম্নের ১৭ চিহ্নিত অর্থ দেখুন)। পিঠাপিঠি ভাই—এ উহার পিঠে, সে ইহার পিঠে (ঐ পরস্পর অর্থ-জ্ঞাপক)।

এইরূপ বনিবনাও—পরস্পর বনা।

অদলবদল—পরস্পর বদল।

পাশাপাশি—এ উহার পাশে, সে ইহার পাশে।

মিট্‌মাট করা—পরস্পর মিটাইয়া ফেলা।

উলট্ পালট্‌—ইহা উল্‌টিয়া উহার স্থানে, উহা উল্‌টিয়া ইহার স্থানে।

এইরূপ 'চারিজনে ভাগাভাগি করিয়া লও'=পরস্পর ভাগ করিয়া লও।

আধা আধি, কাণাকাণি, বলাবলি,—উক্ত রূপ।

(৭) পেন্ পেনানি—পৌনঃপুন্য ও দীর্ঘ কালব্যাপকতা-বাচক। এইরূপ ঘেন্ ঘেনানি; বৌ বৌ ক'রে পাগল, সাহেব সাহেব খেলিয়াছিলেন। ছি ছি—পুনঃ পুনঃ ছি। এইরূপ থুথু, ভো ভো, ঝা ঝা শো শো,

টোটো করা, হো হো, গন্ধে ঘর ম'ম' করা। এইরূপ ঝক্ ঝক্ করছে, ঠন্ ঠন্ শব্দ। চাকচিক্য শব্দের দ্বিত্বও ঐ অর্থবাচক। (লালা শব্দের দ্বিত্বও কি এই অর্থজ্ঞাপক?)

চেচা চেচি করিও না—পুনঃ পুনঃ চেচিঁওনা। দুর্গা দুর্গা বল মন—পুনঃ পুনঃ দুর্গা বল। এইরূপ সাধা সাধি, ডাকা ডাকি, পীড়াপীড়ি, জেদা জেদি। এই রূপ কষ্টে কষ্টে, কেঁদে কেঁদে জীবন গেল, জল জল করে প্রাণ বাহির হইল, দাদা দাদা করে অস্থির, রাধা রাধা বলে বাঁশী।

(৮) জর জারি—জর প্রভৃতি, যেমন জর পেটের অসুখ ইত্যাদি।

রাজা-রাজ্‌রা—রাজা প্রভৃতি, যেমন রাজা, মহারাজা ইত্যাদি। এ সব স্থলে দ্বিত্ব প্রভৃতি বাচক।

ঠিক এইরূপ—কাঁদাকাটি (ক্রন্দন অনুনয় প্রভৃতি), পাজিপুথি, ফলফলানি, নাম গাম, চালচলন, খাম খেয়াল, ঠায় ঠিকানা, আশে পাশে, কেটে কুটে, ভাব সাব, অলি গলি, আম্‌লা-পায়লা, সাধা সাধনা, ইত্যাদি।

(৯) তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না—অণুমাত্র শব্দ পাইলাম না। তাহার জ্ঞানগম্য নাই—অণুমাত্র জ্ঞান নাই। এগুলি নিষেধজ্ঞাপক, এবং অভাবাত্মক (negative) বাক্যের মধ্যেই প্রযুক্ত।

(১০) কটমট—অত্যন্ত কট, বিকট (ইহা উৎকর্ষ বাচক)। এইরূপ সাদাসিদে—অত্যন্ত সিদে (অর্থাৎ সোজা)। ধুমধাম, গোলমাল, হুলস্থূল, হুড়মাড়, লুট পাট, জাঁকজমক, কিষ্টবিষ্টু, এলোমেলো (ইংরেজী topsy turvy, hugger-mugger এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে)। ঝমাঝম, কড়াক্কড়, হোমরাচোমরা মানুষ (অতি বড় আমীরের মত), ফিটফাট, আঁকাবাঁকা (বিশেষরূপ বাঁকা), ধপ্‌ধপে সাদা, ডগ্‌ডগা লাল, চুপচাপ্, আখালি পাথালি, শুধুশুধু মেরেছে, খামখা খামখা রাগ করে, তাড়াতাড়ি (অতি তাড়িত ভাবে—অতি ত্বরা), বাড়াবাড়ি (বিশেষ বৃদ্ধি), কড়াকড়ি, আবল তাবল—এগুলিও পূর্ব্ববৎ উৎকর্ষ-বাচক। সংস্কৃত ওতপ্রোত শব্দেও উৎকর্ষ বুঝায়; বাঙ্গলা এলোমেলো, আথালি পাথালি শব্দের সঙ্গে ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে।

বরাবর শব্দও উৎকর্ষ বাচক (=exactly in the direction of.)

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, চূর্ণবিচূর্ণ, খণ্ডবিখণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন, লণ্ডভণ্ড—পূর্ব্ববৎ। পাকাপাকি বন্দোবস্ত—অত্যন্ত পাকা বন্দোবস্ত (উৎকর্ষ-বাচক)। এইরূপ—সোজাসুজি, মিছামিছি।

(১১) এ বিষয়ের টুন্‌টুনি আমরা অনেক আগেই শুনিয়াছি—ঈষৎ টুনি (অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে টের) পাইয়াছি। (ঈষদর্থ বাচক)।

আব্‌জাব্—ঈষৎ জাব্ অর্থাৎ ঝাপ্‌সা।

এইরূপ, কমসম করিয়া খাও—ঈষৎ কম, (কিন্তু, 'কম কম ক'রে খাও'—প্রতিজনে বা প্রতিবারে কম ক'রে খাও—বিভক্ত বহুলতা-বাচক)।

বড়সড় হয়েছি—প্রায় বড়, একরূপ বড়।

(১২) টিক্‌টিকী, গিরগিটী, কুকুর, কুক্কুট—এগুলি স্ব স্ব মুখধ্বনি, বা তদ্রূপ অন্য কোন ধ্বনি-জ্ঞাপক।

বোবা—বো—বো—করে যে।

ঠেটা—ঠে ঠে করে যে।

দর্দ্দুর, মর্ম্মরিয়া তরুকুল, কঙ্কণ, বুদ্‌বুদ, প্রভৃতি এইরূপ বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণ-জ্ঞাপক।

থুথু—(নিষ্ঠীবন ফেলিবার কালে জাত শব্দ হইতে উৎপন্ন)।

(১৩) এ বিষয়ে আবার হারাহারি কি—হার জিৎ কি? এস্থলে দ্বিত্ব দ্বারা শব্দের প্রথমাংশের বিপরীতার্থ সূচিত হইতেছে)। এ বিষয়ে আবার জানাজানি কি? ইহাতো আন্দাজেই বলা যায়—জানা-অজানা কি? কিন্তু "এ বিষয় ঢের আগে জানাজানি হইয়াছে—বহু লোকে জানিয়াছে (কর্ত্তৃবহুলত্বজ্ঞাপক। নিম্নের ১৭ প্যারা দেখ)। এইরূপ—এ বিষয়ে চাপাচাপিতে সমান ফল—অর্থাৎ গোপন রাখা ও খুলিয়া বলার সমান ফল। কিন্তু এ

বিষয়ে চাপাচাপিতে ফল নাই—বেশী চাপ দিয়া ফল নাই (উৎকর্ষ-জ্ঞাপক)।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত শব্দগুলি এতৎ সঙ্গে বিচার্য্য—কলাফল, পারাপার, কালাকাল, পাত্রাপাত্র, শুদ্ধাশুদ্ধ, সম্পর্কাসম্পর্ক।

ধর্ম্ম টর্ম্ম—ধর্ম্ম ও তদ্বিপরীত অর্থাৎ ধর্ম্ম ও পাপ (বিপরীতার্থ সূচক।) এইরূপ পুণ্যটুণ্য, ছেলেপিলে।

(১৪) এই মাসের মাঝামাঝি—মাঝে বা তাহারই কাছে In or about the middle of this month) (সামীপ্য-বাচক)। এইরূপ মোটামুটি।

(১৫) আমি তাহাকে চোখে চোখে রাখিতেছি—সর্ব্বদা চোখে রাখিতেছি। (অবিরতি-বাচক)।

একলা একলা ভাল লাগে না—সর্ব্বদা একলা ভাল লাগে না। (পশ্চিম বঙ্গে একলা স্থলে একেলা বলা হয়)।

(১৬) সে কেবল দেইদিচ্ছি করছে—দীর্ঘকাল যাবৎ দিচ্ছি বল্‌ছে। (দীর্ঘকালব্যাপকতা জ্ঞাপক)।

এইরূপ—"যাই-যাচ্ছি কর্‌ছে," গয়গচ্ছ করিও না, দিব দিব ক'রে এক বৎসর কেটে গেল, যাই যাই ক'রে যাওয়া হচ্ছে না।

(১৭) এ বিষয়ে জানাজানি হয়ে গেছে—বহু লোকে জানিয়াছে (কর্ত্তৃবহুলত্বজ্ঞাপক)। কাড়াকাড়ি, মারামারি প্রভৃতির স্থলে যেমন পরস্পর অর্থ বুঝাইতেছে,—এখানে সেরূপ নহে।

এইরূপ,—তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ী লইয়া গেল—বহু লোকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল।

(১৮) ধীরে ধীরে বলিবে—একবার ধীরে বলিবে, আবার ধীরে বলিবে; যখন যাহা বলিবে ধীরে বলিবে, (বিভক্ত কার্য্যজ্ঞাপক, অথবা রবি বাবুর নামকরণ অনুসারে, বিভক্ত বহুলতাজ্ঞাপক)। তিল তিল করে মৃত্যু—আজ এক তিল, কাল এক তিল, এইরূপে (অর্থাৎ ক্রমশঃ) মৃত্যু।

এইরূপ অল্পে অল্পে আয়ু ফুরায়—আজ অল্প কাল অল্প।

(১৯) সে শুয়ে শুয়ে পড়্‌ছে—শয়িত অবস্থায়; (অবস্থা জ্ঞাপক।) কিন্তু শুয়ে শুয়ে ব্যারাম এনেছে—দীর্ঘ কাল শুয়ে। ব'সে ব'সে গান গাচ্ছে—বসা অবস্থায়। কিন্তু ব'সে ব'সে কমর ধরেছে—দীর্ঘ কালীনতা জ্ঞাপক।

(২০) নিম্ন লিখিত উদাহরণগুলিতে শব্দের দুই অংশের আকার ভিন্ন, কিন্তু অর্থ এক; এ সকল স্থলে স্বার্থে দ্বিত্ব হইয়াছে; যথা সদা সর্ব্বদা, ক্রিয়া কর্ম্ম, অল্প স্বল্প, ছাই ভস্ম, মাথা মুণ্ডু। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কিন্তু চিঠি পত্র—চিঠি প্রভৃতি, যথা চিঠি বুক পোষ্ট ইত্যাদি। দান দাতব্য—দান প্রভৃতি, যথা দান ও অনুরূপ সাহায্য সহানুভূতি প্রভৃতি। এগুলি প্রভৃতি অর্থবাচক।)

আবার, বাও বাতাস—নানা রূপ বাতাস।

অসুখ বিসুখ—নানারূপ অসুখ। (বিবিধত্ব জ্ঞাপক।)

(২১) নিম্নলিখিত স্থলে শব্দের দুই অংশের অল্পাধিক পার্থক্য আছে:—

কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করিব—নিতান্ত ক্রান্তিতে (to the last Farthing.)। পূর্ব্বোল্লিখিত 'হাড়ে হাড়ে চটা'র ন্যায় এখানেও উৎকর্ষ বুঝাইতেছে। এই রূপ লম্ফ ঝম্ফ—উৎকর্ষ বাচক।

সভ্য ভব্য, ছিটা ফোটা—এ গুলি আবার স্বার্থ জ্ঞাপক। নাম কাম (নাম প্রভৃতি), গাল গল্প, মাল মশলা, গাছ গায়রান্ (গয়রান্ গহন বন),—এ গুলিতে দ্বিত্ব 'প্রভৃতি' অর্থ বাচক। তর তরকারী, সাজ গোছ, পয় পরিষ্কার—এ গুলিতে শব্দের একার্দ্ধের অর্থ নাই বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের প্রথম দুটী 'প্রভৃতি' অর্থ জ্ঞাপক, শেষোক্তটী উৎকর্ষজ্ঞাপক।

(২২) নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছের (phrases) দুই অংশের অর্থ-পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এ গুলিকে অনেকে শব্দদ্বৈতের উদাহরণ না বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ বলিতে ইচ্ছুক হইবেন; এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। আপাততঃ শব্দগুচ্ছ গুলি ও তাহাদের অর্থ দিতেছি:—তালা তালুক—তালা (নগদ টাকা) ও তালুক (ভূসম্পত্তি।) চালা চুলা—চালা (থাকিবার স্থান ঘর) ও চুলা (চুল্লী অর্থাৎ খাদ্য সংস্থান।) এই রূপ দান ধ্যান, কালে কোলে, দর দস্তর, গুণ জ্ঞান, বিদ্যা সাধ্যি (learning and power or influence.) এইরূপ, তাহার রাম রহিম্ জ্ঞান নাই—হিন্দু ও মুসলমানের দেবতার পার্থক্য জ্ঞান নাই, অর্থাৎ সে শাস্ত্র-জ্ঞান-বিরহিত।

মন্তব্য—তালা তালুক, চালা চুলা প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ, এবং এই প্রবন্ধে উদাহৃত তদ্রূপ আরও কতকগুলি শব্দগুচ্ছ (যথা কড়া ক্রান্তি, হুল স্থূল, কিষ্ট বিষ্টু, আবল তাবল, এলো মেলো, আশে পাশে ইত্যাদি) আকারে দ্বৈ

াবাপন্ন না হইলেও প্রয়োগে তদ্ভাবাপন্ন বলিয়া আমরা সে লিকেও আনিয়া শুনিয়া এই প্রবন্ধে আনয়ন করিয়াছি। লতঃ রবি বাবু যে হিসাবে জল টল, কাপড়-চোপড় ভৃতিকে তাঁহার প্রবন্ধের আস্‌বাবের মধ্যে আনিয়াছেন, ামরাও ঠিক্ সেই হিসাবে ও-গুলিকে শব্দদ্বৈতের উদাহরণ ধ্যে গণ্য করিয়াছি।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাপ্রয়াণ।

কি ব'লে কাঁদিবে, কাঁদরে লেখনী
আমি যে কাঁদিতে পারি না আর।
এ মহাপ্রয়াণে, জগতের প্রাণে
উঠিয়াছে হায়! কি হাহাকার!
শত শত কোটী কণ্ঠ হ'তে আজি
উঠিছে দারুণ শোকের গাথা,
শত শত কোটী, হৃদয় আসন
যে জনার তরে রয়েছে পাতা;
রমণী-কুলের, শিরোমণি যিনি
জগতে তুলনা কোথায় পাই,
হায় কি অভাগা, জগৎ জননী,
মহারাণী আর জগতে নাই!
নাট্যমঞ্চে হায়, নিভিলে দেউটী
সহসা, আঁধারে উঠে কোলাহল,
সকলের মুখে, "কি হলো কি হলো,"
সকলের চিত্ত সমান বিহ্বল।
ভবনাট্যশালে, নিভেছে দেউটি
আঁধারে জগৎ ঢেকেছে তাই,
জগৎ-জোছনা, নারীকুল-মণি
মহারাণী আর জগতে নাই।
অস্তাচল শিরে, ডুবিলে তপন
পশ্চিমের হয় যামিনী ভোর,
পশ্চাতে পড়িয়া পূরব গগন
মলিন বদন আঁধারে ঘোর।
সম্মুখ স্বরগ করি আলোকিত
পশ্চাৎ জগৎ আঁধারে ঢাকি,
চলিলেন অই, রাণী ভিক্‌টোরিয়া
সমস্ত সংসারে বিষাদ মাখি'।
জগতে উঠিল হাহাকার ধ্বনি,
কি আনন্দ অই গগন মাঝে,
ধরায় উঠিল, শোকের সঙ্গীত
স্বরগে আনন্দ-বাজনা বাজে,
অমনি খুলিল, স্বরগের দ্বার
ইন্দ্রাণী আইলা বিমানপথে,
"এসো ভিক্‌টোরিয়া" বলিয়া আপনি
তুলিয়া লইলা পুষ্পক-রথে।
নিজ হাতে করি, মন্দারের মালা
মরাল গ্রীবায় পরালা হাসি,
চপলায় বাঁধি, চিকণ-চিকুর,
সর্ব্বাঙ্গে ঢালিলা জোছনা রাশি।
ছুটিল পুষ্পক, উজ্জ্বল গগনে
ছাড়ি রবি শশী উঠিল দূরে,
কোটী চন্দ্র রবি— কিরণ-মণ্ডিত
উতরিল এক অপূর্ব্ব পুরে।
"এই সুখরাজ্য, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার"
কহিলা সুস্বরে বাসব-জায়া,
"শুন ওগো রাণী, সংসার-সৌভাগ্য
হেথাকার শুধু ক্ষণিক-ছায়া।
হেথায় বাসনা ফল-অনুগামী
হেথায় আনন্দ আতঙ্ক-হীন,
রতন-বিভায়, উজ্জ্বল এ লোক
চির-পৌর্ণমাসী নিশি কি দিন।
এ লোকের নাম "দিব্য রাজলোক"
হেথা বসে সব রাজ ঋষিদল,
তোমার প্রতাপে, তোমার প্রভায়
আজি এই লোক অধিক উজল।
কোটী কহিনুর— বিভায় মণ্ডিত
অই সিংহাসন তোমার লাগিয়া,
ধরার ইন্দ্রাণী, তুমি মহারাণী
এই সিংহাসনে বসো ভিক্‌টোরিয়া।"
বসিলা সেথায়, রাজরাজেশ্বরী
শোভাময় করি রত্ন-সিংহাসন,

"এই সতী লোক দিব্য ধাম, হেথা
জড়ের বন্ধন নাহিক লেশ,
বহু দূরে ঘুরে রবি চন্দ্র তারা
সতী অঙ্গ বিভা উজলে দেশ।
পতি প্রেমে যারা, সদা মাতোয়ারা
এই লোকে তারা বসে আসিয়া,
তুমি ত সতীর শিরোমণি রাণী
এইখানে তুমি বসো ভিক্‌টোরিয়া।
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী, দময়ন্তী সীতা
এই লোকে তাঁরা বসেন আসি,
নিশ্বাসে তাঁদের, মন্দার বিকাশে
স্বর্গের জোছনা তাঁদের হাসি।
চির বিচ্ছেদের মিলন এ লোকে,
হেথায় মিলন বিচ্ছেদ-হীন।
হেথায় প্রণয়ি- যুগল-কুসুম
এক বৃন্তে ফুটে নিশি কি দিন।
হেথা প্রেমময় অশরীরি-তনু,
হেথায় নাহিক যৌবন জরা,
হেথায় প্রণয় সংশয়-বিহীন
পাপেতে মলিন এ নহে ধরা।
হেথা ভালবাসা সুধু ভাল বাসা
অন্য আশা কিছু নাহিক তায়।
হেথায় না বসে বণিক-প্রণয়ী
দানে প্রতিদান কেহ না চায়।
তব প্রতীক্ষায়, এ লোকের দ্বারে
অই কে দাঁড়ায়ে দেখ গো রাণী,
যুগ যুগান্তের বিচ্ছেদের পরে
মিলনে জুড়াও তাপিত প্রাণী।"
বাঞ্ছিত দেবতা, নিরখিয়া রাণী
বক্ষমাঝে তাঁর লুকা'লা মুখ,
তটিনী ডুবিল সাগর সঙ্গমে
মুগধা না জানে দুখ কি সুখ।
চির-তপ্তপ্রাণ, হইল শীতল
প্রেম-বারিনিধি বারেক ছুঁয়ে,
এক ফোটা অশ্রু, যুগ যুগান্তের
বিষাদ-কালিমা ফেলিল ধুয়ে।

সম্ভ্রমে দাঁড়াল, রাজর্ষি মণ্ডলী
সানন্দে গাইল স্বর্গ-বন্দিগণ,
"জয় ভিক্‌টোরিয়া, রাজরাজেশ্বরী
জয় ভিক্‌টোরিয়া ভবের ইন্দ্রাণী,
যাঁর রাজ্যে রবি সদা রয় বাঁধা
জয় ভিক্‌টোরিয়া জয় মহারাণী,"
ক্ষণেকে উন্মনা, হইলা সম্রাজ্ঞী,
সে ঐশ্বর্য্যলোকে কি যেন নাই,
বুঝিয়া ইন্দ্রাণী, কহে "ওগো রাণী
অন্য দিব্যলোকে চলগো যাই।"
দেব মনোরথ— পুষ্পক সুরথ
উঠিলা উভয় সে রথপরে,
পলকে ভেটিলা, অন্য দিব্যলোক
কহিলা ইন্দ্রাণী মধুর-স্বরে।

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ বিরহ বেদনা
ক্ষণিক-স্বপন-স্মৃতির প্রায়,
হাসিল কুমুদী চাহি শশী পানে
সুধাংশু ঢালিল পীযুষ-ধারা।
কহিলা ইন্দ্রাণী, "শুন ওগো রাণী,
আর (ও) এক লোকে যে'তে সে হবে।
সে লোকে তোমায় ডাকিছে সন্তান
ত্বরা করি দোঁহে চল গো তবে।"
লইয়া দম্পতি. চলিলা ইন্দ্রাণী
অন্য দিব্য লোক ভেটিলা গিয়া,
জিনি বীণাবাণী, জয়ন্ত-জননী
কহিলা মধুরে বাসব-প্রিয়া ;—
"ক্ষীরোদ সাগর প্রবাহিত হেথা
এই মাতৃলোক সু-পুণ্য ভূমি।
এইখানে তুমি, বসো ভিক্টোরিয়া
কোটী সন্তানের জননী তুমি।
জননীর স্নেহ স্তন্যরূপে হেথা
পীযূষের নদী সতত বয়।
কল্পতরু হেথা, শোভে সারি সারি
ফল ধরে সদা অমৃত-ময়।
নিয়ত হেথায়, কল্পতরু হ'তে
স্নেহামৃত ফল আপনি ঝরে।
নিয়ত হেথায়, সুরভির স্তনে
পীযূষের ধারা আপনি ক্ষরে।
মাতৃভাবে যারা, আত্ম-সুখ হারা
এই লোকে তারা বসে আসিয়া।
কোটী সন্তানের জননী ও রাণী,
এইখানে তুমি বসো ভিক্টোরিয়া।"
শ্যাম তৃণদলে, বিছায়ে অঞ্চল
মাতৃলোকে সেথা বসিলা জননী।
জয় মহারাণী জয় মা জননী
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া উঠিল এ ধ্বনি।
পূরবে পশ্চিমে কোটী কোটী কণ্ঠে
কাতরে ডাকিল জননী ব'লে।
জয় মা জননী জয় ভিক্টোরিয়া
উঠিল সে ধ্বনি গগন তলে।
কহিলা ইন্দ্রাণী, "শুন ওগো রাণী,
ধরায় এমন সৌভাগ্য কার ?
ত্রিদিবে আসিয়া, তোমার মতন
তিন লোকে তিন আসন যার ?
বহু পুণ্য ফলে, একলোকে লোকে
পায় না আসন ত্রিদিব-ধামে,
তিনলোকে তব, সম অধিকার
ধন্য ধরা আজি তোমার নামে।"
ধন্য ধরা আজি, তব নামে রাণী
গাইল তারকা সুধাংশু রবি,
ধন্য ধরা আজি, ভিক্টোরিয়া নামে
সুদূরে গাইল এ দীন কবি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

হতভাগ্য।

(গল্প)

শনিবার সকাল সকাল আপিসের ছুটি হইলে কাল যখন সকলে আসিয়া ট্রামে চাপিলাম, তখন সপ্তাহের কার্য্য ও কোলাহলময় জীবনের পর একটি সমগ্র দিনের আরাম উদ্দেশে অনুভব করিয়া স্কুলের ছেলেদের ন্যায় আমোদ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যই যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের পক্ষে ছুটির দিন কেবল উদ্দেশেই আরামদায়ক, প্রকৃত পক্ষে ছুটির দিন তাহাদের তেমন ভাল কাটে না। কেমন একটা উদাস অলসতায় শরীরটা যেন অসার বলিয়া মনে হয়; তাহার পরে যন্ত্রের মত ১০ টায় আপিস করা, ৫ টায় বাড়ী ফেরা ও শেষ চুপ চাপ পড়িয়া থাকা একরূপ মন্দ লাগে না। আজ এই চৈত্র মাসের মধ্যাহ্নে—রুদ্ধ গৃহে সময়টা কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছে না। তাহাতে এবারে সহরে কিছু অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে, গগন-কেন্দ্রে রবি অনল বর্ষণ করিতেছেন—সূর্য্যদেব যেন সহস্র করে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া আপনার অনলময় বক্ষের সন্নিহিত করিতে চাহিতেছেন। বায়ু-তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিচলিত বালুরাশি বহু দূর ব্যাপিয়া আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছে। উপরে নীলাভ রজত আকাশ সৌরকরে ঝলসিতেছিল। আর তাহার মধ্য দিয়া কতকগুলি রজতশুভ্র মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ

ভাসিয়া যাইতেছিল। পথ পার্শ্বের বৃক্ষবিলম্ব আতপতপ্ত বায়সের বিকৃত স্বরে পথিকের অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু কচিৎ উন্নমিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে ফিরিওয়ালার অবসাদপূর্ণ চীৎকার ক্ষীণ হইতে স্পষ্টতর হইয়া আবার বহু দূরে ক্ষীণ হইয়া মিলাইতেছিল।

সিমলার একটি কবাট জানালাবদ্ধ নিম্নতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া, শুইয়া এবং মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে নানা প্রকার সুখের কল্পনা করিয়া আরাম করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। হস্ত-সন্নিহিত হোয়াটনটের ভিতর থেকে দুই একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টাও করিলাম কিন্তু কিছুতেই মন সংযত হইল না। অবশেষে একটা স্থূল তাকিয়ায় আমার স্থূলতর দেহভার ন্যস্ত করিয়া আলবোলায় তামাক চড়াইয়া রবারের নলের শব্দ বৈচিত্র্যে কথঞ্চিৎ আরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল এইরূপে কাটাইয়া যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল, তখন সম্মুখের একটা জানালা খুলিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ঘরের সম্মুখেই এক ভদ্র লোকের বাড়ী। রোয়াকের নিম্নে এক রাশি ইট রহিয়াছে এবং তাহার উপরে বসিয়া একটি বৃদ্ধ অন্তমনে ইট চূর্ণ করিতেছে। হতভাগ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজের অশান্তি যেন অনেকটা কমিয়া গেল। মনে হইল, এই বৃদ্ধ এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে এত পরিশ্রম করিতেছে, আর সহস্র গুণে শীতল গৃহে, কোমল শয্যায় শুইয়া আমার এত দুঃখ! ঐ বেচারী এবং আমার মধ্যে প্রভেদ কি? আমার পিতার কিছু বিত্ত ছিল, তিনি আমাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, তাই আমি আফিসের কেরাণী বাবু। আর উহার পিতা হয়ত দরিদ্রতায় প্রপীড়িত ছিল, তাই ও মজুর!

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে বোধ হয় রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাহার হাতুড় লইয়া গাত্রোত্থান করিল। সে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলনা, বৃদ্ধ অতি কষ্টে গিয়া রোয়াকের উপর দুখানি হাতে ভর করিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিলাম তাহার দুখানি পদই শুগ্ন, কোনরূপে চলিতে পারে মাত্র। সে আমার দিকে ফিরিয়াই বসিয়াছিল। দেখিলাম তাহার ললাট বাহিয়া ঘর্ম্ম বারি পড়িতেছে আর কষ্ট নিঃসৃত শ্বাসে তাহার কঙ্কাল উদ্বেলিত হইতেছে। তাহার কোটরগত এবং সঙ্কুচিত চক্ষু দুটী লক্ষ্যশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার ললাটের শিথিল চর্ম্ম গভীর রেখা বাহুল্যে পরিণত হইয়াছিল। আর অতি ক্ষীণ মাংসপেশী ব্যাপিয়া স্ফীত শিরা-জাল তাহার কৃশ দেহে ফুটিয়া উঠিয়া ছিল। বৃদ্ধের ভ্রুকুটি আনত মুখ মণ্ডল যেন এই মর্ত্ত্য জীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করিতেছিল।
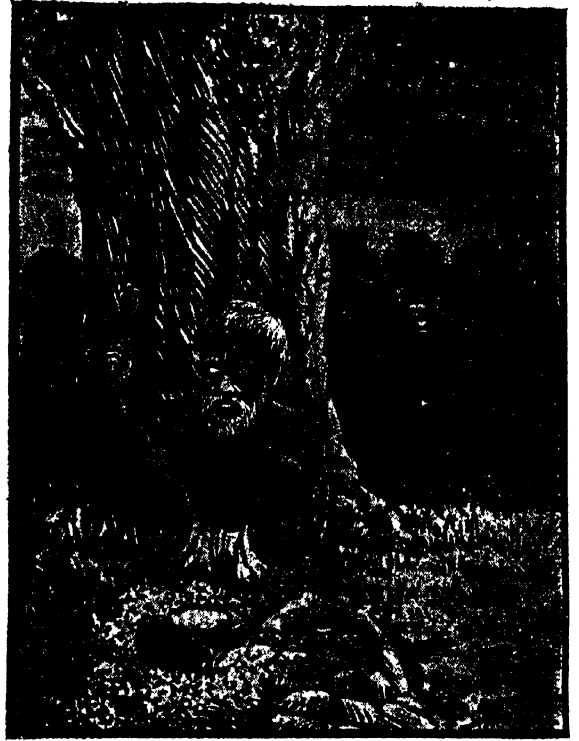
বৃদ্ধের বিশ্রাম করা হইয়া গেল। সে আবার হাতুড়ি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখনও তাহার কপালে স্বেদ বিন্দু দূর হইতে লক্ষিত হইতেছিল। অর্দ্ধসেবিত কলিকার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল, কলিকার কুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জে পার্শ্বের দেয়াল কম্পিত দেখাইতেছিল। বৃদ্ধ তামাক খাইলে সুস্থ হইবে মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকি

নাম। সে আমার দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার দৃষ্টিতে যেন একটা তীব্র উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান ছিল, যেন কাহারও অনুগ্রহ পাইতে সে অভ্যস্ত নহে; পাইবার জন্যও কিছুমাত্র যত্নবান নহে। আমি আবার ডাকিলাম, এবারে সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া আমার বারান্দায় বসিল। তাহাকে আমার কলিকাটী দিলাম। বৃদ্ধ যথেচ্ছ ধূম পান করিয়া কলিকাটী নামাইয়া রাখিয়া জল খাইতে চাহিল। ইহার মধ্যে আমি তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়া একটিরও উত্তর পাইলাম না। জলপান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমি তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বৃদ্ধ আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আবশ্যকতা বোধ করিল না। সে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ভাষায় কত কি বলিল। তাহার অর্থ সংগ্রহে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার সেই ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আসিতেছিল, প্রাণের অসম্বদ্ধ চিন্তার স্রোত ভাষার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে না। দরিদ্র ভাষা তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আমি তাহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'বুড়ো তোমার ছেলে মেয়ে কি ?' বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া, পুনরায় কলিকাটী তুলিয়া লইয়া ধূম পানে প্রবৃত্ত হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার আর কে আছে ?' বৃদ্ধ উপরের দিকে হাত তুলিয়া দেখাইল। 'তোমার বাড়ী কোথায় ?' 'সঙ্গে সঙ্গে বাবু' তাহার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে যেন কত অনিচ্ছা, কত বিরক্তি মাখান ছিল। কিন্তু আমি ইহাতে যতই তাহার দুঃখের গুরুত্ব বোধ করিতে লাগিলাম, ততই তাহার অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য আমার ব্যগ্রতা বাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও কোথাও সহানুভূতি পায় নাই। সে প্রথমে আমাকে কতকটা বিস্ময় ও কতকটা বিরক্তির চক্ষে দেখিতেছিল। এবং আমার এই অযাচিত যত্নের জন্য কিছু মাত্র কৃতজ্ঞতা দেখান সে আবশ্যক মনে করে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার প্রাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শোকের, দারিদ্র্যের, অত্যাচারের তীব্র নিষ্পেষণে ধৈর্য্যহারা মানবের হৃদয় শেষে নিরুপায় হইয়া এক বিন্দু সান্ত্বনার জন্য আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু এমনই বিড়ম্বনা যে ঠিক তাহাই সে পায় না। জগতের নিষ্ঠুর ঔদাস্য, ক্রূর উপহাস, মরণোপম উপেক্ষাই তাহার কাল হইয়া উঠে। তখন সে একমাত্র মরণ শান্তির নিদান মরণকেই সাধনার ধন বলিয়া মনে করে। বৃদ্ধের সমগ্র জীবন যেন ইহারই বিস্তৃত দৃষ্টান্ত স্বরূপে কাটিয়াছে। আজ তাই আমার সামান্য সহানুভূতি পাইয়া হতভাগ্য গলিয়া গেল। তাহার কঙ্কালসার বক্ষের জীর্ণ আবরণ আন্দোলিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল, তাহার অনভ্যস্ত নয়নে স্বচ্ছ অশ্রু দেখা দিল, সে অনেক বার থামিয়া, অনেকবার সামলাইয়া সরলভাবে তাহার আত্ম-জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল।

'বাবু, আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে ? ভগবান যাহাকে মারেন তাহাকে কেহ রাখিতে পারে না, তাহা না হইলে এই কাঠ ফাটা রোদে—এই বৃদ্ধ বয়সে—আমি খাটিয়া মরিব কেন ? আমার কর্ম্মের ফল আমিই ভোগ করিতেছি। তাহা না হইলে আমার বাড়ী ছিল, ঘর ছিল, একদিন আমার সবই ছিল, বুদ্ধির দোষে সে সব খোয়াইয়া বসিব কেন ?—সাবাজপুর চেন বাবু ? সাবাজপুরের কাছে আমার বাপের ভিটা ছিল। অতি ছোট কালে আমার বাপ মরিয়া যায়। আমার মা'র হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাহাতেই আমাদের চলিয়া যাইত। মা আমার বড় বুদ্ধিমতী ছিল, আর আমাকে যেমন ভাল বাসিত, সকল মায় তেমন বাসিতে পারে না। বাঁবার মৃত্যুর পরে তাহাকে নিকা করিবার জন্য অনেকে তোষামোদ করিয়াছিল, কিন্তু আমার অযত্ন হইবার ভয়ে মা কখনও সম্মত হয় নাই। ছেলে বেলায় আমার গায়ে খুব জোর ছিল, আমার বয়সের কেহই আমার কাছে দাঁড়াইতে পারিত না। সে সময়ে অন্নের জন্য ভাবিতে হইত না। কেবল 'গায়ে ফুঁ দিয়া' বেড়াইতাম, আমার তেড়ী ফিরাণ কাল মিচমিচে বাবরি চুল ছিল; রঙ্গীন গামছা কাঁধে লইয়া, আর রিং ঝুলান পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া যখন বেড়াইতাম, তখন সকলে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। এমন দিনও আমার ছিল ! যখন শরীরে কষ্ট সহিত তখন আমি আলস্য করিয়াছি, তাই এই বয়সে ইঁট ভাঙ্গিয়া খাই, সকলই অদৃষ্টের ফল !

"সাবাজপুরে বছর বছর মেলা হয়, ওখানকার বড়লোক আহম্মদ মিঞারা সেই মেলায় একটী কলসী টানাইয়া ঢেঁড়া পিটিয়া দিত। কুস্তীতে আর লাঠিতে যে জিতিতে পারে, সে সেই কলসী পায়। ঐ কলসী জিতিয়া আনিবার জন্য সকলে একবার আমাকে ধরিল। মাও

তাহাদের কথায় সায় দিলেন। চাদর কোমরে আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া মেলায় চলিলাম। মা সেই সময়ে কাঠ কাটিতে গিয়া পা কাটিয়া ফেলিলেন, সে দিকে লক্ষ্যও করিলাম না। মেলায় আমার চেহারা দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, আমিই ঐ কলসী পাইব। সেখানে দেশ বিদেশের লোকের ভিড় দেখিয়া আমার মনে একটা ত্রাস হইল, প্রথম প্রথম মনে ভয় হয়। আর ভয় করিয়া চলিতে হয় দুষ্টলোকদের। তাহারা নানা প্রকার 'গুণজ্ঞান' 'মন্ত্র-তন্ত্র' জানে। না পারিলে শেষে ধূলা পড়িয়া কত

লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়। দুই এক 'হাত' কুস্তী লড়িয়া আমার সাহস বাড়িয়া গেল। কিন্তু শেষ বেলায় কোথা হইতে একটা সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা বিকট আকারের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আর লোকজন ত সব হৈ হৈ করিয়া উঠিল। সেও বেশ দুই চারি পাক খেলিয়া আমার নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইল। প্রথমতঃ আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শেষে আল্লার নাম করিয়া আমিও হাত বাড়াইয়া দিলাম। আমি নীচে পড়িয়া গেলাম, লোকে খুব গোলমাল করিয়া উঠিল। মনে করিল আমি হারিয়াছি। কিন্তু, বাবু, জোর বেশী থাকিলে কি হয়; সে লোকটা কৌশল একেবারেই বুঝিত না। আমি তাহার দুই পায়ের মাঝে মাথা দিয়া এমন ভাবে উপর মুখে ধা[ক্কা] দিলাম যে ঐ বড় জোয়ানটা দশ হাত দূরে ছটকাই[য়া] পড়িল। সব লোক চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি করি[য়া] উঠিল। আহম্মদ মিঞা নিজে হাতে করিয়া আমাকে কলসীটি দিলেন, আর তাঁহার বাড়ীতে আমাকে রা[ত্রে] খাইতে বলিয়া গেলেন।"

বৃদ্ধ থামিল, যেন কিছু স্মরণ করিয়া লইবার চে[ষ্টা] করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তারপর?' বৃদ্ধ বলিল—"বাবু সেই ত আমার কাল হইল। আহম্মদ মিঞার সংসা[রে] তাহার এক বিধবা কন্[যা] ছিল। অমন শ্রী চেহারা মেয়ে আমাদের দেশে আ[র] ছিল না। সকলেই তাহা[র] ব্যাখ্যা করিত। আ[মি] খাইতে বসিয়া দেখিলা[ম] দরজার আড়াল থেকে সে আমাকে দেখিতেছে। আমি আগে কখন[ও] তাহাকে দেখি না[ই]। মিঞাদের মেয়েরা কখন বাড়ীর বাহির হয় না। কিন্তু তাহার ফুটফুটে র[ং] ও পটলচেরা চোক দেখি[য়া] স্থির করিলাম যে এ আহম্মদ মিঞার কন্যা। আমি তাহার দিকে চাহিলে [সে] দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আবার পরক্ষণেই চাহি[য়া] দেখি সে দরজা ঈষৎ খুলিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আমার আর বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। রাত্রি যখ[ন] দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে তখনও আমি আহম্মদ মিঞার বাড়ী[র] পার্শ্বে একটা গাছ তলায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, জোছনা ফুট ফু[ট] করিতেছিল, মাঝে মাঝে একটা ঘরের জানালা নিঃশ[ব্দে] খুলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইতেছিল। জানালার পা[র্শ্বে] ছটুর মুখ দেখিলাম (আহম্মদ মিঞার মেয়ের নাম ছটু) জোছনা যখন অস্ত গেল তখন আস্তে আস্তে দরজা খুলি[য়া] ছটু বাহির হইয়া আসিল। সে দিন মনে হইয়াছিল যে

াময় জীবন এমনই কাটিবে, সে দিন মরিলেও বুঝি দুঃখ াধ হইত না। ইহার পর প্রত্যহ ছটুর সঙ্গে গোপনে দখা করিতে আসিতাম। এইরূপে ২।৩ মাস কাটিয়া গেল। একদিন একটা বাগানে বসিয়া আমরা কথা কহিতে ছিলাম। াত্রি অন্ধকার, কোথাও আর কেহ ছিল না। হঠাৎ পিছন াক থেকে আমার মাথায় কে বাড়ি দিল। সে আঘাত াইয়া আমার বোধ হইল যেন পায়ের তলা হইতে মাটি িয়া যাইতেছে; ছটুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলাম এই ্ব জানি, তাহার পর আর আমার জ্ঞান ছিল না। সেই ময় যদি আমার মরণ হইত তবে বাঁচিয়া যাইতাম।

"তিন দিন তিন রাত পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, া দেখিলাম আমি একটা গোয়াল ঘরে মার কোলে শুইয়া া, পার্শ্বে ছটু বসিয়া মাথায় ঔষধ বাঁধিতেছে। অসুখ া আরাম হইলে শুনিলাম যে আহম্মদ মিঞা সেই রাত্রেই ার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে। মা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া- ন। আর শুনিলাম সেই রাত্রে যখন লাঠির আঘাতে আমি পড়িয়া গেলাম, তখন আমার রক্ত তীরের মত ছুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাই দেখিয়া খুন হইয়াছে মনে করিয়া দুষ্টেরা পলাইয়া গিয়াছিল। শেষে ছটু আমাকে এক বুড়ীর গোয়াল ঘরে আনিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। মা আর ছটু তিন দিনের মধ্যে কিছু মাত্র খায় নাই। বুড়ীর বাড়ী গ্রামের শেষ সীমায় ছিল বলিয়া কেহ বড় একটা সন্দেহ করে নাই। কলঙ্কের আশঙ্কায় আহম্মদ মিঞাও আর কোন অনুসন্ধান করে নাই। বুড়ী ঔষধ কুড়াইয়া আনিয়া দিত ও শেষে আমাদের ভাত খাওয়াইয়া যাইত। সারিয়া উঠিবার আগেই পলাইবার চিন্তা করিতে লাগিলাম, কারণ আহম্মদ মিঞারা বড় লোক, তাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ও দেশে থাকা যায় না। তাহারা একটু সন্ধান পাইলেই বোধ হয় আমাদের নিকাশ করিয়া দিত। কাজে কাজেই আমরা তিনটী প্রাণী সংসার সাগরে ভাসিলাম। ছটুর গায় যে গহনা ছিল তাহাই আমাদের সম্বল; তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা রওনা হইলাম। দুই দিন কি তিন দিন পরে আমরা কাশীপুর আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে একটা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া তিন জনে থাকিলাম। আমার মাথার ঘা আরাম হইলে বোর্ণিও কোম্পানির চটের কলে ঠিকা চাকরী লইলাম। কিছু দিন পরে ছটুর একটি মেয়ে হইল, মেয়ে যে ঠিক মার মত হয়, তাহা জানিতাম না, চোক মুখ হাত পা সবই যেন মায়ের মত। নিজের কপাল দোষে সব হারাইলাম আর দোষ দিব কা'র? মেয়েটাও যদি থাকিত!"

বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহার মর্ম্মের অন্তস্তল হইতে যেন আত্মার অব্যক্ত কাতর ধ্বনি উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ একটু সামলাইয়া লইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

"আমি যেমন মন্দ অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়া ছিলাম, শত্রুরও যেন এমন না হয়। বাবু, জীবন ত এক রূপ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন দুঃখকে আর ভয় নাই। এত দিন ইচ্ছা করিলে ছার জীবনের অন্ত করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু আমি যে পাপ করিয়াছি তাহার দণ্ড ভোগ না করিয়া

মরিলেও যে শান্তি হইবে না। এখন এই কষ্ট পাইয়াই আমার সুখ, কষ্ট পাইলেই মনে হয় আমার কর্ম্মের প্রতিফল হইল। সেই জন্যই এত কষ্ট পাইয়াও বাঁচিয়া আছি। কিন্তু বাবু এত দুঃখ পাইয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে কেমন করিয়া বলিতে পার? আমি ছেলে বেলায় বড় সৌখীন ও বড় অলস ছিলাম; এক মায়ের এক ছেলে যেমন হয় আমারও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন ঐ তিনটীকে লইয়া নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হইল, তখন যেন বড়ই জঞ্জাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে আসিবার পরে নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতাম তাহার দ্বারা কিছুতেই চলিত না, ছটুর গায়ে ২.৩ খানা গহনা ছিল তাহাই বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া এত দিন কোনও রূপে চলিয়াছে। মেয়েটী হইবার পর হইতে আমার পরিশ্রম শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। ঠিকা কাজ, পরিশ্রম কম করিলেই উপার্জ্জনও কম হয়। মেয়েটী হইবার কিছু দিন পরে মা রোগ শয্যায় পড়িল, এমন টাকা কড়ি ছিল না যে তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারি, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আলস্য পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, কেবল আমার অযত্নেই তিনি ভুগিয়া ভুগিয়া মারা গেলেন। কিন্তু সহস্র কষ্টের মধ্যেও ছটু আমার মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে। আমার আলস্যের জন্য সকল দিন তাহার আহার জুটিত না। আমি দেখিয়াও দেখিতাম না। মনে করিতাম, এসব খোঁজ লইতে গেলেই আমাকে বেশী খাটিতে হইবে। খাটুনিও আমার একেবারেই ভাল লাগিত না। এইরূপ এক দিন নয়, দুই দিন নয়, তিন বৎসর ধরিয়া অনাহারে জীর্ণ বস্ত্রে অসহ্য ক্লেশে তাহার কাটিয়া গেল। তাহার পর তাহার শরীরে রোগ প্রবেশ করিল, বড় লোকের মেয়ে কখনও কষ্ট পাওয়াত অভ্যাস ছিল না। তবু যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সব সহ্য করিয়াছিল তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাহার যেমন রোগ বাড়িতে লাগিল আমারও তেমনি আলস্য বাড়িতে লাগিল। আমি যে কলে কাজ করিতাম সে কলের সকলেই আমাকে তিরস্কার করিত, আমার তাহা ভাল লাগিত না। অবশেষে সাহেব আমাকে জবাব দিল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, ছটু শুনিয়া কত কাকুতি মিনতি করিয়া আবার কাজে যাইতে বলিল, কিছুতেই শুনিলাম না। আমি আবার গেলেই সাহেব আমাকে লইত, কিন্তু সে মতি আমার থাকিলে ত! কিন্তু কাজের হাত এড়াইয়া যে শান্তি পাইলাম, বাড়ীর ঘ্যাণের ঘ্যাণোর শুনিয়া তাহার চতুর্গুণ বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। শেষে ছটু আমাকে এক কথা বলিলে আমি যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিয়া দিতাম। সে কখনও কাঁদিত, কখনও রাগ করিত, কখনও পায় ধরিত। তখন আমার চৈতন্য হয় নাই। আমি গরীবের ছেলে, সেই ভাল মানুষের মেয়েকে অত সহজে পাইয়া ছিলাম, তাই তাহার গৌরব বুঝি নাই। সে আমাকে বাঁদীর ন্যায় সেবা করিত, আর আমি সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম. যে, সে আমারই জন্য সব ত্যাগ করিয়া শেষে আমারই হাতে এত কষ্ট পাইতেছে। এক দিন সকাল বেলায় মেয়েটী ক্ষুধায় কাঁদিতেছিল, তাহার আগের রাত্রে আমাদের অন্ন জুটে নাই। ছটু মেয়েটীর হাত খানি ধরিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'একবারটী বাছার মুখের দিকে চাও, এ যে না খাইয়া মরিবে একবার তাহা ভাবিয়াছ কি? সাহেবের হাত পায় ধরিয়া বলিলে এখনও তিনি শুনিবেন।" আমার মেয়ে ক্ষুধার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ছিল, আমার অপমান বোধ হইল। রাগে অন্ধ হইয়া গেলাম, মেয়েটাকে মারিতে লাগিলাম। ছটু বাঘিণীর মত ছুটিয়া আসিল, তাহাকেও ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। তাহার গায়ে সেই প্রথম হাত তুলিলাম। দুজনে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

"সমস্ত দিনমান পথে পথে ঘুরিলাম। সন্ধ্যা হইলে একবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অভিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তবুও কতদূর গেলাম দেখিলাম আমার গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, আবার ফিরিলাম অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া শেষে গঙ্গার চাতালের উপর গিয়া বসিলাম; ছেলে বেলার কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। গঙ্গার জলে জোছনা ঝিকমিক করিতে ছিল মনে পড়িল এমনই এক জোছনা রাত্রে আমাদের প্রথম দেখা। আর আজ এই গঙ্গার জলে ডুবিতে পারিলে যেন শরীরটা জুড়াইত। একদিন ত মরিতে বসিয়াছিলাম সেদিন ছটু আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, আর আমি আজ তাহাদের ভুলিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ক্ষুধা কাতর একটি শিশু মেয়েকে ফেলিয়া আসিয়া

এই চিন্তা তখন মনে হইতে লাগিল। মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। আর ইতস্ততঃ না করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। আমার ঘরে তখনও প্রদীপ জলিতেছিল। মেঝেয় একটা শপের উপর ছটু মেয়েটীকে বুকের উপর করিয়া শুইয়া আছে—পাছে মেয়েটী জাগিয়া ক্ষুধার জন্য আবার কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু ছটুর মুখের দিকে হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া গেল। তাহার মুখে যেন কালি মাখিয়া দিয়াছিল। গণ্ড বাহিয়া ফেন পড়িয়াছে, চক্ষু চালের দিকে স্থাপিত। আমি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। মেয়েটীকে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখি মারও যে দশা, মেয়েরও সেই দশা। জীবনে অত কষ্ট দিয়াছি বলিয়া তাহার আদরের মেয়েকে আমার কাছে রাখিয়া যাইবে বিশ্বাস হয় নাই। তাই সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল! আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু চোকে এক বিন্দুও জল আসিল না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া দরজায় খিল দিয়া আসিলাম। সেই শপের উপর তাহাদের দুজনকে একবার জন্মের মত কোলে লইয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম যদি তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারি, কিন্তু আমার মত পাপীর ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়? অত দুঃখের মধ্যেও আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য হইল তখন দেখিলাম আমার শিয়রে দুজন পাহারাওয়ালা, আমার হাতে হাতকড়ি, দরজা ভগ্ন, প্রদীপ জ্বালা রহিয়াছে। বেড়ার মধ্য দিয়া রৌদ্র ঘরে আসিয়াছে।

পুলিশের কাছে আমি বলিলাম যে আমিই ইহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি। দায়রায়ও সেই কথা বলিলাম। সত্য সত্যই আমি তাহাদের মৃত্যুর কারণ, আমার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ফাঁসি হইল না। আমার দ্বীপান্তর হইল। দশ বৎসর সেইখানে ছিলাম তারপর আমাকে কলিকাতায় আনিয়া ছাড়িয়া দিল। কিন্তু জেলই বা কি? আর খালাশই বা কি? আমার সবই সমান। একবার সেই বাড়ীর সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যখন জেলে ছিলাম তখন ইট ভাঙ্গাই আমার কাজ ছিল। দুপর রোদে ইট ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আমার শরীর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে কি বাবু? এখন আর কোন কাজই করিতে পারি না। যেখানে ইট ভাঙ্গার কাজ পাই সেইখানেই যাই—বাবু আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে? যে পাপ করিয়াছি শত জন্ম এমন করিয়া খাটিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহার এই মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস, এই তীব্র যন্ত্রণা আমার হৃদয়ে অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া দিল। কত কি ভাবিতে লাগিলাম। জানালার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম—তখন শ্রান্ত রবির শেষ কিরণ-রেখা উচ্চ সৌধশির হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আকাশে যেন নীল ঢালিয়া দিয়াছে, আর শুভ্র মেঘের পরিবর্ত্তে লাল লাল ছোট ছোট মেঘ খণ্ড আকাশের নীল পটে নানা মূর্ত্তি গড়িতেছিল।—আর ইটের উপর বসিয়া বৃদ্ধ আপন মনে তখনও ইট ভাঙ্গিতেছিল।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র।

সাহজাহান বাদসাহের দৈনিক জীবন। *

"রাজাগণের মধ্যে যিনি সূর্য্য স্বরূপ (অর্থাৎ সম্রাট), যিনি রাজ্যের পক্ষে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতিদায়ক চন্দ্রমারূপী, অথবা যিনি পৃথিবীর অতি প্রাচীনকালের গৌরবান্বিত বাদসা জামসিদের (১) ন্যায় অসীম শক্তি-সম্পন্ন—সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা তাঁহার গৌরব ও জ্যোতিঃ আরও উজ্জ্বলিত করুন।"

(মঙ্গলাচরণ)

প্রভাতের কর্ত্তব্য।

* * উষার আলোক সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে সাহান-সা, সাহজাহান, শয্যা ত্যাগ

---

* মূল পারসী গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ। মূল পারসী গ্রন্থে অনেক বর্ণনার আড়ম্বর ও শব্দ-বিন্যাস-কৌশল আছে। আমরা ইহার যথাযথ অনুবাদ না করিয়া, আবশ্যক মত প্রয়োজনীয় স্থান গুলি বাছিয়া লইয়াছি। যাহা ত্যাগ করিয়াছি—সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা নীরস।

(১) মুসলমান শাস্ত্র মতে জামসিদ পৃথিবীর চতুর্থ বাদসা—লেখক।

করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি করিতেন। কৃতশৌচ হইয়া তিনি খোদাতাল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃতার্থমন্য হইতেন। প্রার্থনান্তে স্থিরচিত্তে, পরিষ্কার স্বরে, মুসলমানের মহা পবিত্র গ্রন্থ "কোরাণ" পাঠ করিতেন। কোরাণের শ্লোকগুলি তিনি অতি সুন্দররূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এইরূপে তাঁহার উষাকৃত্য সমাপ্ত হইত। তাঁহার দান অসীম, তাঁহার হৃদয় অতি উদার, কাজেই দিবালোক বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার ভাণ্ডার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইত। সুস্বাদু সুপরিপক্ক ফল, সুমিষ্ট মদিরা, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি আশ্রিত আমীর ওমরাহ ও দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরিত হইত। ফলসমূহের মধ্যে—বাল্খের খরমুজা, কাশগর ও গোড়ের নানাবিধ কুল, "হুক্সী" ও "সাহেবী" জাতীয় আঙ্গুর, সমরকাণ্ডজাত নানাবিধ সুমিষ্ট ফল, ইরেজ ও জেলাবাদের বেদানা, গুজরাটের সুমিষ্ট আম্র, কাশ্মীরের তরমুজ, কমলালেবু আনারস, ইক্ষু, নানা জাতীয় তোরেন্দ ও তুঁদফল প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সুবার উৎকৃষ্ট ফলসমূহ প্রত্যহ তাঁহার দরবারে প্রেরিত হইত। রাজকীয় উদ্যান সমূহ হইতেও অনেক সুমিষ্ট ফল আসিত। পদমর্য্যাদা অনুসারে রাজকুমার, আমীর ওমরাহদের মধ্যে এই সমস্ত রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে বিতরিত হইত। গ্রীষ্মকালে—বহুদূর হইতে আনীত বরফও সকলে পদমর্য্যাদানুসারে পাইতেন। * *

ঝরোকা-দর্শন।

মোগল বাদসাহদিগের চিরন্তন প্রথানুসারে—বাদসাহ প্রতিদিন "ঝরোকায়" (ক্ষুদ্র দ্বার) সাধারণকে দেখা দিতেন। বাদসাহকে দেখিবার জন্য প্রতিদিন অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। রাজা আমীর ওমরাহ, দরিদ্র, ভিখারি কাহারও পক্ষে এই সময়ে সম্রাট-দর্শনে বাধা ছিল না। সাজিহানাবাদ (দিল্লী), আকবরাবাদ (আগরা) ও লাহোরের রাজপ্রাসাদ সমূহে, এইরূপ দর্শন দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। নদী তীরে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, অসংখ্য প্রজাবৃন্দ সেই প্রাতঃকালে সমবেত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত। এই সময়ে হস্তীযুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকও প্রদর্শিত হইত। বাদ্যকরেরা নিয়মিত সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণরঞ্জন সুমধুর স্বরনিক্কণে দিক্‌বলয় প্রফুল্লিত করিত। দেশের অতি দীন দরিদ্র প্রজা, এই সময়ে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করিত। এবং কাহারও কোন আবেদন, অভিযোগ থাকিলে, সে সেই ক্ষেত্রে বাদসাহের নিকট তাহা দিতে পারিত।

ঝরোকা-খাস্-ও-আম্।

রাজ্যের ও অপরিমিত সৌভাগ্যের সূর্য্যস্বরূপ—ঈশ্বরের ছায়া স্বরূপ, বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ, মহা প্রতাপান্বিত বাদসাহ ঝরোকা দর্শনের কার্য্য সমাপনান্তে, ঝরোকা খাস্-ও-আমে, আগমন করিতেন। (২)

ঝরোকার পশ্চাতে বাদ্যকর সম্প্রদায় অপেক্ষা করিত। বাদসাহ সভায় আগমন করিবার সময়—সেখান হইতে দামামা বাজিয়া উঠিত। বাদসাহ "খাস্-আমে" উপস্থিত হইলে—সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার সম্মুখ দিয়া দলবদ্ধ অশ্বসাদিগণ তীরের ন্যায় বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার পশ্চাতে হস্তীচালকেরা সুশিক্ষিত, সুচিত্রিত, রত্নাদিতে বিভূষিত সুবৃহৎ রাজহস্তিগণকে যূথবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইত। ইহার পর—রাজকুমার ও রাজবংশীয়গণ সম্রাটের রত্নময় সিংহাসনের নিকট উপবেশনের জন্য আদিষ্ট হইতেন। তৎপরে, ইরাণ ও তুরাণের প্রধান প্রধান খাঁ সাহেবেরা * ১ মির্জ্জা সাহেবেরা * ২ ওমরাহগণ, রাজমন্ত্রিগণ, সম্ভ্রান্ত উজীরগণ, সাধারণ রাজকর্ম্মচারিগণ—অসিজীবি ও

---

(২) খাস্ (সম্ভ্রান্ত)—আম্—(সাধারণ)=যেখানে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোকে, বিনা বাধায় সমান প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ।

* (১) পাঠানগণের "খাঁ" ও মোগলদিগের "মির্জ্জা" উপাধি ছিল।—উল্লিখিত বর্ণনা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন—আমখাসের বিস্তৃত দরবার, জগতের সমস্ত সম্রাটগণের দরবার অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যময় ছিল। এই ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা ও বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া রো, করিয়াট, ফিচ, ফ্রায়ার, বার্ণিয়ার, টাভার্নিয়ার ও জেসুট মিশনরীগণ মোহিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে শত শত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা দিল্লী ও আগরার বিস্তৃত "আম খাস" দেখিয়াছেন—তাহার পরিসর ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন—তাঁহারাই বুঝিবেন দিল্লীর বাদসাহের দরবার অপেক্ষা কোন রাজ দরবারই শ্রেষ্ঠ ছিল না। নানা দেশের, নানা শ্রেণীর লোকে এই দরবারগৃহ পরিপূর্ণ থাকিত। অথচ—সামান্য সূচীপতন শব্দও সকলে শুনিতে পাইত। জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, যশল্মীর, কোটা, বুঁদী, সেকাবত্তী, নিমচ প্রভৃতি দেশের মহা প্রতাপান্বিত রাজপুত রাজন্যবর্গ—বড় বড় মোগল পাঠান আমীর ওমরাহ হইতে—দীন হেনী দরিদ্র পর্য্যন্ত এই দরবারে স্থান পাইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত পাঠক যত অগ্রসর হইতে থাকিবেন, বাদসাহের দৈনিক জীবনের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ জানিতে পারিয়া তাঁহারা ততই আশ্চর্য্য হইবেন।

মসীজীবিগণ, বিজয়ী সেনাপতিগণ, এবং সম্রাটের বিশ্বস্ত শরীর-রক্ষিগণ, নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইতেন।

ইহাদের পরে অন্যান্য শরীররক্ষী সেনাগণ, পতাকাধারিগণ, ধনুর্দ্ধারী ও বন্দুকধারী সেনাগণ, পদস্থ সেখ ও সৈয়দগণ, রাজবৈদ্য, রাজসভাসদ ও পণ্ডিতগণ ধীরে ধীরে আসীন হইতেন। তুরস্ক, তেজেক (আরবের সীমা বহির্ভূত স্থান), আজম (পারস্য), খুর্দ্দ, তাতার, ইথিওপিয়া (উরস্) সারকেশিয়া (সরখাস্), মিশর, ইরাক্ প্রভৃতি দেশের অসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া আম-খাসের শোভা বৃদ্ধি করিত। এতদ্ব্যতীত লোদি, রোহিলা, খিলজী, ইউসফ্‌জী জাতীয় আফ্‌গান সর্দ্দারগণ, রাণা, রাজা রাও, রায়রায়াঁ প্রভৃতি পদবী বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ, রাঠোর শিশোদিয়া কচ্ছওয়াহা গোরস্, চৌহান, ঝালা, চন্দ্রায়ৎ তুমার, বর্গুজীর, পুনওয়ার ভাদুহরিয়া, সালেখী, বুন্দেলা, সকুরাওল প্রভৃতি—বিভিন্ন শ্রেণীর রাজপুতগণ এই সভার অলঙ্কার স্বরূপ হইতেন। সাত হাজার হইতে, এক হাজারী মন্সবদার, রাজবারা ও মধ্য ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশের ভুঁইয়াগণ, বাঙ্গালা, মগ (ব্রহ্ম), আসাম, শ্রীনগর, তিব্বত প্রভৃতি করদ ও মিত্ররাজ্য সমূহের জমীদারগণও এই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইতেন। এত লোক সমাগম হইলেও এই বিরাট দরবারে শব্দমাত্র হইত না।

এই দরবারের শান্তি রক্ষার জন্য, মীর তুজেক, ইসাউল প্রভৃতি খিদ্‌মতীয়া শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ চারিদিকে স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত আশাশোটা—ও নানাবিধ রাজচিহ্ন লইয়া দরবার গাহের সম্মুখে পাদচারণা করিত। দরবারের বহিঃপ্রাঙ্গণে এক দল পদাতি সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিত। তুরস্কের সম্রাট, ইরাণ ও তুরাণের সর্ব্ব ক্ষমতাবিদ্ রাজদূত সমূহ, বাদসাহের নিকটে যথোপযুক্ত স্থানে আসন পাইত। এতদ্ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজগণের প্রতিনিধিবর্গ পেশ্‌কস্ ও উপহারাদি লইয়া সম্ভ্রমে দরবারে উপস্থিত থাকিত। এতদ্ব্যতীত, ইরাণ, খারাসান, রুম (তুরুস্ক), সিরিয়া, চীন, মে-চীন, পাতিয়া (?) খুতন, তুর্কীস্থান, প্রভৃতি দেশের ও অনেক প্রকাণ্ড প্রপুঞ্জের বড় বড় সওদাগর, ব্যবসায়ী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ নানাবিধ আশ্চর্য্য উপঢৌকনাদি লইয়া দরবারে

সাহজাহান বাদসাহ।

বাদসাহের আদেশ অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। উপযুক্ত সময়ে তাহারা আদেশ প্রাপ্ত হইলে, নানাবিধ বহু মূল্য মণি রত্ন ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি সেই আম খাসের বিস্তৃত দরবারে সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। বিজ্ঞানবিৎ পাণ্ডতগণ, দার্শনিকগণ শাস্ত্রাভিজ্ঞ মনীষিগণ, উৎকৃষ্ট লেখক,বক্তা এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ, কনষ্টান্টিনোপল, বসোরা, হামদান, শিরভান সামাকি, জিলান্, মাজেন্দারান, আস্ত্রাবাদ, গুঞ্জে, বারদা, তাব্রিজ, আর্দেবিল, কাজভিল্ কম, সাওয়া, কাসান, তিহারণ, ইয়েজ্, ইস্পাহান, শিরাজ, নিশাপুর, মেশেদ্, হিরাট, বাখরাজ, কান্দাহার, বাল্খ্ ও বদাক্শান, বোখারা, সমরখন্দ, তিব্বত, কাশগার প্রভৃতি দেশের বীরকান্তি যোদ্ধ্গণ রাজদরবারে কর্ম্ম প্রাপ্তির আশায় উপস্থিত থাকিত।*

এই প্রকাণ্ড দরবারে, কার্য্যের ও গুণের উপযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ যোগ্য ব্যক্তিদিগকে মুন্সব্ (জাইগির ও উপাধি) খেলোয়াত, রাজপ্রসাদ স্বরূপ নানাবিধ মণি খচিত পোষাক, স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদি খচিত নানাবিধ উপঢৌকন দ্রব্য, অশ্ব, হস্তী, সাহানসার তস্বীর প্রভৃতি বিতরিত হইত। এতদ্ব্যতীত জিগা (বস্ত্র) নানাবিধ

* এই সমস্ত দেশের অনেক নাম, আধুনিক ভূগোলে অপরিচিত। তবে যে গুলি আজও চলিয়া আসিয়েছে, পাঠক সেগুলি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। মুসলমান লেখকেরা অনেক নাম তাঁহাদের নিজ জ্ঞানানুসারে লিখিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ উল্লিখিত নাম গুলি এসিয়ার ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের। ইউরোপের মধ্যে এক তুরস্ক ছাড়া আর কাহারও নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। কত দূর দেশবাসী দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকিত, ঐ নাম গুলিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তরবারি, জুবার (খড়্গ) খুঞ্জার (দ্বি-মুখ বিশিষ্ট ছোরা) রাজ পতাকা, দামামা ও অন্যান্য সম্মান চিহ্ন পুরস্কার প্রাপ্তি যোগ্য লোক দিগের মধ্যে বিতরিত হইত। যাঁহারা মনসব্ পাইতেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের "তস্লিম্" দিতে হইত। যাঁহারা "রুদ্ররাজ" প্রভৃতি মতির মালা, রত্নবলয়, মুক্তাহার পাইতেন, তাঁহাদের যোড় হস্তে রাজোপহার গ্রহণ করিতে হইত। ইঁহাদেরও তস্লিম্প্রথা পূর্ব্বরূপ। যাঁহারা কোনরূপ শিরোপা বা পরিচ্ছদ পাইতেন, পাইবার সময় তাঁহাদের চারি বার "তস্লিম" করিতে হইত। পোষাক পরিবার পর আবার চারিবার করিতে হইত। অস্ত্রাদি যাহারা পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিত, একবার তাহাদের উপহার দ্রব্য হস্তে লইয়া তস্লিম করিতে হইত—দ্বিতীয় বার—সেই সমগ্র অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া বাদসাহকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইত।

এই দরবারে উপাধি বিতরণ করা হইত। হিন্দু ও মুশলমান দিগের জন্য স্বতন্ত্র উপাধি ব্যবস্থা ছিল। সাহী, সুলতানী, সিপাহি সালারী, খাঁ-খানান্নী, আমিরি, আমীর উল্-ওমরাই, রাজ-গী, (রাজপদ) মহারাজ-গী, রাঁয়া, রায় রাঁয়ানী, প্রভৃতি উপাধি, অবস্থা ও কার্য্য বিচারে উপযুক্ত রাজন্য বর্গ, ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত হইত। বিভিন্ন প্রদেশ ও সুবা সমূহের জন্য, কাজি (ফৌজদারি ম্যাজিষ্ট্রেট) এহ্তে সাবৎ (হিসাব রক্ষক), কানুনগো, চৌধুরাই-প্রভৃতি উপাধি বড় বড় জমীদার ও উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইত। রক্ষিত রাজ্য সমূহের কিল্লাদার, ফৌজদার, দেওয়ান, আমিন, আমিল, প্রভৃতির নিয়োগপত্র বা পরোয়ানা—এই আমদরবার হইতে বাহির হইলে, তাঁহারা নিজ নিজ সুবা, পরগণা, কিল্লা, ও মহলে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন। যে সকল কর্ম্মচারী সুবা বা মহল হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইতেন, এই আমদরবারে সর্ব্ব সমক্ষে তাহাকে কৃতকর্ম্মের বিচারাদি হইত। কার্য্য সমাপনান্তে যে সকল রাজকর্ম্মচারী বিদায় প্রাপ্ত হইত—তাহারা পদমর্য্যাদা, গুণ, ও অবস্থা অনুসারে বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমি চুম্বন করিত। যাহারা অতিরিক্ত অনুগ্রহলাভে সমর্থবান হইত—বাদসাহ তাহাদের পৃষ্ঠে, হস্তস্পর্শ করিয়া সম্মানিত করিতেন। কখনও কখনও—বাদসাহ ভ্রূভঙ্গি করিয়া, বা করুণাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, কোন কোন আমীর ওমরাহকে সম্মানিত করিতেন। রাজ্য, জমীদারি, বা অর্থাদি সম্বন্ধে সনন্দ পত্র, মন্সব, জাইগীর, মাসিক বৃত্তি, দৈনিক বৃত্তি, সৎকার্য্যে দান খোরাকি-বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কাগজ পত্রাদি বাদসাহ ছুইবার দেখিয়া দিতেন। মন্সবদার, শান্তিরক্ষক, ফৌজদার, গুপ্ত প্রতিনিধি, প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা এই দরবারে বাদসাহকে প্রত্যেক সুবার গোপনীয় ও আবশ্যকীয় সংবাদ সমূহ প্রদান করিতেন। অবাধ্য জমীদার ও প্রজাদের বিদ্রোহ দমন, রাজ্যের শাসন ও বিচার বিভাগের ন্যায্য বিচার বিতরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আদেশ, এই দরবার হইতে দেওয়া হইত। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, কর সংগ্রাহক ও হিসাব রক্ষকগণ, দেওয়ানগণ রাজকার্য্যের সাধারণ তত্ত্বাবধারকগণ,—সকল বিভাগ হইতে আসিয়া এই আসমুদ্র বিস্তৃত রাজ্যের—কার্য্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত কথাই লিখিত আরজী দ্বারা বাদসাহের গোচরীভূত করিত ও এতদসম্বন্ধে তাঁহার আদেশ পাইয়া কৃতার্থ্যমন্য হইত। রাজ্যসম্বন্ধে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত রাজকার্য্যই—সাহানসার সূক্ষ্ম মনোযোগ আকর্ষণ করিত। সকল কথাই তাঁহার শ্রবণপথে উঠিত—সমস্ত ঘটনাই তিনি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিচার করিয়া যথাযথ আদেশ দিতেন। মদদে-মা-আস্ (সাধু ও ফকিরদের জন্য বৃত্তি) মিল্কিয়েৎ (নিষ্কর দান) আলতুম্‌খা (সম্মানার্থে দান) প্রভৃতি সম্বন্ধে সমস্ত আবেদন পত্র মদরুস্-সদরের (সদর ফৌজদারির বিচারক —বা শেসন জজ) মারফৎ প্রেরণ করিতে হইত। এ গুলির আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া বাদসাহ—নিঃস্ব, প্রজা সাধারণ ও পণ্ডিতদের জন্য দান ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। *

---

* মোগল রাজত্বের-বিস্তৃতি ও পরিমাণ বড় অল্প ছিল না। ধরিতে গেলে সমগ্র হিন্দুস্থানই বাদসাহের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। বাদসাহগণ এক পক্ষে যেমন বিলাসী ও ভোগ সুখপরায়ণ ছিলেন, বৈভবী ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা রাজ কার্য্যে আদৌ অমনযোগী হইতেন না। ভোগ বিলাসের ও রাজ কার্য্যের সময় বিভিন্ন করা ছিল। রাজ্যের সামান্য ঘটনাটী—সামান্য সংবাদটী, সামান্য কার্য্যটীর দিকে—বাদসাহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমরা জাঁহাগীর সাজাহান প্রভৃতি বাদসাহকে এ পর্য্যন্ত ভোগ সুখনিরত নরপতি বলিয়াই জানিতাম কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা গুলিতে আমাদের সে বিশ্বাস টলিয়াছে।

২০ নং, কর্ণ্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
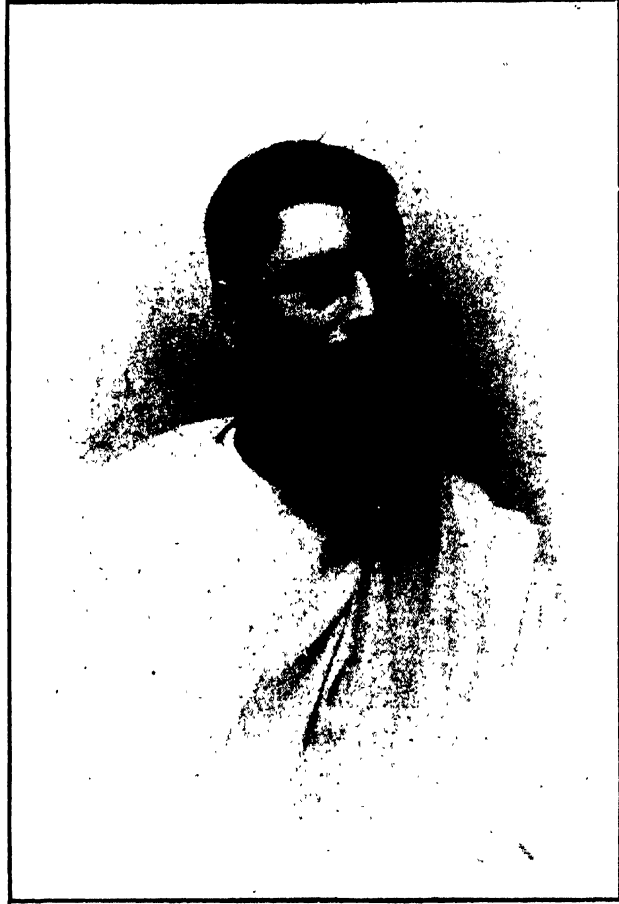
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ।

KUNTALINE PRESS.

চতুর্থ ভাগ। } চৈত্র, ১৩০৭। { ৪র্থ সংখ্যা।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

(টেকচাঁদ ঠাকুর)

পিতা ও পিতামহের পরিচয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র কলিকাতার বিখ্যাত ধনী রামদুলাল দের কারবারের অংশীদার ছিলেন; নিমতলা ষ্ট্রীটে এখনও ইঁহার শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। গঙ্গাধরের পুত্র রামনারায়ণের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল এবং রামনারায়ণ স্বয়ং কাব্যানুরাগী ও সুকবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাধামোহন সেনের সহিত একত্র ভাবে "সঙ্গীততরঙ্গিণী" নামক কাব্য প্রণয়ন করেন, সেকালে এই পুস্তক খানির বিশেষ আদর হইয়াছিল।

ছাত্র জীবন।

রামনারায়ণের চতুর্থ পুত্র প্যারীচাঁদ ১৮১৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় নিমতলা-[illegible] জন্ম গ্রহণ করেন। কতকদিন পড়া শুনার পর (১৮[illegible] খৃঃ অঃ) তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন; সেখানে [illegible] ও [illegible] জন্য ইঁহাকে বড় লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ইঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া পড়ে। স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; প্যারীচাঁদ সহাধ্যায়ী দিগম্বর মিত্র ও অপরাপর প্রতিভাশালী ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া তাহা লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীতে পাঠের সময় তিনি ১৬৲ টাকার মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার চিন্তাশীলতার সুখ্যাতি করিয়া অধ্যাপক ডাক্তার টাইটলার সাহেব তাঁহাকে সেই অল্প বয়সেই "দার্শনিক" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। এস্থলে বলা উচিত, প্যারীচাঁদ অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না।

সংসারে প্রতিপত্তি।

পাঠ ত্যাগের পর প্যারীচাঁদ কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর ডিপুটি লাইব্রেরিয়ান পদ গ্রহণ করেন (১৮৩[illegible] খৃঃ) এবং অল্প দিন পরেই তিনি লা[illegible]নের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি যখন স্বেচ্ছায় এই পদ ত্যাগ করেন, তখন লাইব্রেরির অবস্থা

৺প্যারীচাঁদ মিত্র।

অতীব সন্তোষকর ছিল। এই কারণে তাঁহাকে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও হইয়াছিল। এই পাঠাগারে প্যারীচাঁদ শুধু কর্ত্তব্য পালন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই, তিনি অধ্যয়নের প্রচুর সুবিধা পাইয়া নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। লাইব্রেরিয়ানের পদত্যাগ করিয়াও তিনি লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহার অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া প্যারীচাঁদ কারবার আরম্ভ করেন; ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন। সাহেব মহলে তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বহুসংখ্যক বিদেশী কোম্পানী তাঁহাকে তাঁহাদের ডাইরেক্টার মনোনীত করিয়াছিলেন, বিদেশীয় বণিক্ সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। স্যার এডোয়ার্ড র‍্যান এবং ক্যামিরণ সাহেব তাঁহাকে সরকারী চাকুরী (প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছাড়িয়া দিলে—সরকারী মেম্বরের পদ) গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্যারীচাঁদ তাহাতে সম্মত হন নাই।

সভা সমিতি ও লোক হিতকর অনুষ্ঠান।

সে কালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সভা সমিতি স্থাপনের চেষ্টা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত। সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন; প্যারীচাঁদ মিত্র এই দলের একজন অগ্রণী ছিলেন। ১৮৩৭খৃঃ অব্দে তিনি বাগ্মী জর্জ্জ টমসনের সহযোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি সংস্থাপিত করেন। প্যারীচাঁদ এই সভার সম্পাদকের পদে বরিত হন। 'পশুর প্রতি অত্যাচার-নিবারণী' সভার অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে তাঁহার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কোলেশ ওয়ার্দি গ্রাণ্ট সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি সেই সভার সম্পাদক হন। মেটকাফ্ হলের জন্য চাঁদা আদায় করিতে যাইয়া প্যারীচাঁদ দিবা রাত্রি কঠোর শ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটির প্রথম সম্পাদক এবং হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত সভার স্থাপয়িতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল সায়েন্স এসোসিয়েসন, সোসাইটি ফর্ দি একুইজিসন অব্ জেনারেল নলেজ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, প্রভৃতি বহু সংখ্যক সভা সমিতির সভ্যরূপে প্যারীচাঁদ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সাধারণের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড ডালহাউসির সময় একবার পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেই সময়ে প্যারীচাঁদ নির্ভীকভাবে পুলিসের অত্যাচার কাহিনী প্রচারিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা এবং অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের জুন হইতে ১৮৭০ খৃঃ অব্দের জুন পর্য্যন্ত তিনি মাননীয় ছোট লাট বাহাদুরের সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

পত্রিকার প্রবন্ধ লেখা এবং গ্রন্থ রচনা।

প্যারীচাঁদ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং রাম গোপাল ঘোষ ও রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের সাহায্যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম "মাসিক পত্রিকার" প্রকাশক। এই পত্রিকার মুখপত্রে লিখিত থাকিত—"এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই"। প্যারীচাঁ

'ইংলিশম্যান,' 'বেঙ্গল হরকরা,' 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'কলিকাতা রিভিউ' এবং আমেরিকার 'দি ব্যানার অব লাইট' প্রভৃতি পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। কলিকাতা রিভিউ পত্রে "প্রজা ও জমিদার" সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা লর্ড এলবোমারল কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের হাউস অব্ লর্ডস্ সভায় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়া আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।* তাঁহার রচিত বহু সংখ্যক ইংরাজী পুস্তক ও প্রবন্ধ আমরা দেখিয়াছি; তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের জীবনী, রামকমল সেনের জীবনী, 'ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাবাবলী' প্রভৃতি পুস্তক সারগর্ভ ও তৎকালে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। এই সকল পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে সেকালের যে সকল সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতূহলকর এবং শিক্ষাপ্রদ। আমরা প্যারীচাঁদের বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর বিস্তারিতভাবে আলোচনা পরে করিব।

চরিত্রে শান্তভাব।

প্যারীচাঁদ কারবার করিয়া প্রায় দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অর্থ কষ্টে পতিত হন। প্যারীচাঁদ মিত্র অর্থশালী হইয়াও যেরূপ ছিলেন, অর্থশূন্য অবস্থাতেও তদ্রূপ ছিলেন; তাঁহার শান্ত সমাহিত চিত্তের প্রসন্নতা কখনও নষ্ট হয় নাই; তাঁহার নীতি ও চরিত্র সাংসারিক আলোক ও ছায়ার সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় পুণ্য কর্ত্তব্য পালনে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। উদরী রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়; অনেকবার তাঁহার উদরে ছিদ্র করিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হইয়াছে, সে কষ্টও তিনি প্রশান্তচিত্তে সহ্য করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে উদরে ছিদ্র করিবার সময়েও তিনি সহাস্য বদনে বলিয়াছিলেন, "দেখ কি? আমার পেট হইতে এবার বরুণদেব বাহির হইতেছেন।"

দয়া।

এরূপ চরিত্রে দয়া এবং উদারতা কিয়ৎ পরিমাণে স্বতঃসিদ্ধ গুণ। একদা তাঁহার বাটীর চাকরের অসুখ হইয়াছিল। এদিকে প্যারীচাঁদকে বাটীর সকলে সারারাত্রি খুঁজিয়া শ্রান্ত হইল; পরদিন জানা গেল, রুগ্ন ভৃত্যটির পাশে বসিয়া কর্ত্তা সারারাত্রি কাটাইয়াছেন। পাঠত্যাগের পর নিজ গ্রামে তিনি এক অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ডিরোজিও এবং হেয়ার সাহেব এই স্কুলটি পরিদর্শন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেন। ১৮৬৬—৬৭ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষের সময় প্যারীচাঁদ নিজের বাটিতে অন্নছত্র খুলিয়াছিলেন।

ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। এই দুর্ঘটনার পর তাঁহার হৃদয় গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ তিনি তত্ত্ববিদ্যার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি এবং কর্ণেল অলকটের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা চিঠি পত্র চলিত। প্যারীচাঁদকে বর্ত্তমান কালের তত্ত্ববিদ্যার প্রসিদ্ধ অধিনায়কগণ কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি করিতেন, তাহা সেই সকল পত্র পড়িলে জানা যায়। ঈশ্বরোপাসনায় তিনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। এই ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার পরবর্ত্তী রচনায় সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তিনি জন্মান্তর মানিতেন না।* তাঁহার বিশ্বাস ছিল—এই নশ্বর বপু ত্যাগ করিয়া আত্মা জ্যোতিঃবিমণ্ডিত অধ্যাত্ম জগতে আরোহণ করে; সে স্থানে ক্রমে ক্রমে সে শোক দুঃখাতীত চির-প্রসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মৃত স্বজনবর্গকে আবার সে স্থলে ফিরিয়া পাওয়া যায়। "গংকিঞ্চিৎ" নামক পুস্তকে তিনি কোন পুত্রশোকাতুরা জননীকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় হৃদয়ের বিশ্বাসানুসারে সান্ত্বনাস্থলে এই কথা বলিয়াছেন—"মা! উত্থান কর। শান্ত ও সমাহিত হও। বিয়োগ ক্ষণিক, সংযোগেই দীর্ঘকালের জন্য। যে কিছু পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, কত শীঘ্র তাহা সংযুক্ত হইতেছে। সংযোগেতেই এই অনন্ত সৃষ্টি নিয়োজিত হইতেছে। কোটী কোটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে ও ঐ সকল পুষ্পের রেণু বায়ুদ্বারা সহস্র সহস্র ক্রোশান্তরে প্রেরিত হইতেছে, তথাচ ঐ রেণু সকল যে পুষ্পকে ফলবান করিতে পারে, তাহাতেই বায়ু দ্বারা আবার সংযুক্ত হইতেছে। যখন সেই প্রেমাধার পুষ্পরেণুর প্রেম পরিতৃপ্ত করিতেছেন, তখন তুমি কি নয়নবারি প্রদান করিয়া সান্ত্বনা বারি পাইবে না? তোমার পুত্র জন্য স্নেহ, প্রেম ও রোদন কি ব্যর্থ হইবে? তুমি অবশ্যই আপনার অঞ্চলের ধন পাইবে।"

* London Times, 5th July, 1853.

* The light which we in modern India, have received, inclines us not to accept the doctrine of transmigration or reincarnation, because we know psychically through our own souls, that progression in the spirit land is more natural and more to the advantage of the spirits, than progress through transmigratory existences.

Spiritual stray leaves. P. 37.

প্যারীচাঁদ মিত্র যোগের অসাধারণ ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেন। অদৃশ্যদর্শন, শূন্যে আরোহণ প্রভৃতি তাঁহার নিকট সম্ভবপর বোধ হইত। এমন কি তিনি লিখিয়াছেন যে, বহুসংখ্যক ভূতযোনির সঙ্গে তিনি কথাবার্ত্তা কহেন ও তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস সুদৃঢ় করে।*

মৃত্যু এবং স্মারক চিহ্ন ও প্রবন্ধাদি।

শেষ বয়সে প্যারীচাঁদ ধর্ম্মজীবনের কঠোর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, মৎস্য মাংসাদি ছাড়িয়া দিয়া দিবা রাত্রি ঈশ্বরোপাসনা এবং ধর্ম্মকার্য্যে নিরত হন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ২৩শে নবেম্বর তিন পুত্র † ও এক কন্যা রাখিয়া উদরী রোগে প্যারীচাঁদ ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর ইংরাজ ও বাঙ্গালী একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশার্থ কয়েকটি সভা আহ্বান করেন; মেটকাফ্ হলে তাঁহার একখানি সুন্দর তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং টাউনহলে তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক সাহেব প্যারীচাঁদের প্রসঙ্গ লইয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে পাদ্রি ডল সাহেবের প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্যারীচাঁদ ডল সাহেবের গির্জ্জায় উপাসনা শ্রবণার্থ যাইতেন, কিন্তু একদিন ডল সাহেব খ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলাতে প্যারীচাঁদ আর সেই গির্জ্জায় যান নাই। উদারচরিত পাদ্রি সাহেব এই ঘটনায় প্যারীচাঁদের বিশ্বাস ও সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তৎপ্রণীত বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী।

আমরা এ পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদ প্রণীত বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করি নাই। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, তদ্রচিত বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট ইংরেজী পুস্তক ও প্রবন্ধ, সাধারণের হিতার্থ জীবনব্যাপী অধ্যবসায়, এমন কি তাঁহার সাধু চরিত্রের কথাও ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অঙ্কে নিমগ্ন হইতে চলিয়াছে; কিন্তু তিনি বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন—তাঁহার 'আলালী' ভাষার গৌরব তাঁহার কণ্ঠে যে অমর যশোমাল্য প্রদান করিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র ভাবেও বিস্তৃতরূপে উল্লেখযোগ্য। তৎপ্রণীত বাঙ্গলা পুস্তকগুলির মধ্যে "আলালের ঘরের দুলালই" সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই পুস্তকে তিনি নিজের নাম গোপন করিয়া "টেকচাঁদ ঠাকুর" নাম অবলম্বন করিয়াছিলেন। "আলালের ঘরের দুলালের" ইংরেজী অনুবাদক G. D. Oswell সাহেব এই নামে প্রতারিত হইয়া গ্রন্থকারের জীবনী খুঁজিতে ঠাকুর বাবুদের বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। "আলালের ঘরের দুলাল" ছাড়া প্যারীচাঁদ মিত্র "অভেদী," "কৃষিপাঠ", "যৎকিঞ্চিৎ" "বামাতোষিণী", "রামারঞ্জিকা" "আধ্যাত্মিকা" প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক বাঙ্গালায় প্রণয়ন করেন।

পূর্ব্বকালের রচনায় গদ্যের প্রতি অনুরাগ।

অনেকের বিশ্বাস, রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গলা গদ্যের প্রবর্ত্তক। একথা আংশিকভাবে সত্য। পদ্য অপেক্ষা গদ্যই যে কতকগুলি বিষয় রচনায় বেশী উপযোগী, ইহা ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণই প্রথম উপলব্ধি করেন; রাজা রামমোহন রায় ইঁহাদের অগ্রণী। পূর্ব্বে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কের সূত্র, চিকিৎসা গ্রন্থ, এমন কি অভিধান পর্য্যন্ত পদ্যে রচিত হইত। গদ্য লিখিবার প্রণালী আদরণীয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচলিত থাকিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস কখনই পদ্য ছন্দে চৈতন্য জীবনী প্রণয়ন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না; এবং নরোত্তমবিলাস ও ভক্তি-রত্নাকরের ন্যায় ঘটনাবহুল ইতিহাস গ্রন্থ পদ্যে লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেন না। নরোত্তমবিলাসের একটুকু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রসাদী পাকায় সব লৈয়া ধরে ধরে।
অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসা ঘরে।
সকল মহান্ত প্রতি কহে বারেবার।
কালি এ খেতরি গ্রাম হবে অন্ধকার।
পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে।
করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে।
তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাকান্ন।
বুধরী গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন।
আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন।
সেই সঙ্গে পাক কর্ত্তা করিবে গমন।
রামচন্দ্রাদি এ সঙ্গে যাইবেন তথা।
বুধরি হইতে তারা আসিবেন এথা।"

এ কথাগুলিও পয়ার বাঁধিয়া লিখিতে হইয়াছিল। সুতরাং

---

* "For the last sixteen years I have been associated with spirits who are not away from me for a moment and I am not only being spiritualized by them, but I am talking with them as I talk with those who are in flesh."

The spiritual stray leaves P. 53.

† অমৃতলাল মিত্র, চুণীলাল মিত্র এবং নগেন্দ্রলাল মিত্র।

স কালের লোকেরা বাটলারের হুডিব্রাসের ন্যায় কবিতা-দেবীর প্রতি যে উৎকট ভালবাসা দেখাইতে অঙ্গীকার-বদ্ধ ছিলেন, * দুঃখের বিষয়, আমরা তাহার আদৌ সুখ্যাতি করিতে পারি না।

কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গলা গদ্য বহু দিনের জিনিষ। রাজা রামমোহন রায় নিজে যেরূপ গদ্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বহু পূর্ব্বে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গদ্য প্রচলিত ছিল। এ কথা স্বীকার্য্য যে, নিতান্ত সাহসী ও স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অপর কেহ কবিতাদেবীর মোহিনী শক্তি এড়াইতে পারিতেন না। কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডীদাসের "গদ্যময় গীতের" কথা পদকল্পতরুতে উল্লিখিত আছে; কিন্তু অত প্রাচীন গদ্যের নমুনা আমরা পাই নাই। তিন চারি শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গলাগদ্যে লিখিত কতকগুলি তাম্রফলক আমরা দেখিয়াছি। সেগুলি ত্রিপুরায় পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন মহাভারত এবং রামায়ণ প্রভৃতি বাঙ্গলা পুঁথির শেষ পত্রে লেখকের পরিচয় স্থলে অনেক স্থানে আমরা ৩।৪ শত বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গলা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি; তাহা সহজ ও মনোভাব জ্ঞাপনের অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমার যে সকল বাঙ্গলা চিঠি লিখিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর হইল, বেভারিজ সাহেব তাহার কয়েক খানি ন্যাসনাল ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সে গদ্যের নমুনা অনেকেই দেখিয়াছেন; তাহা প্রাঞ্জল, সাবেকী ধরণের কাজ কর্ম্মের উপযোগী ও অতিশয় অনাড়ম্বর। সম্প্রতি ৺দুর্গা প্রসাদ মিত্র মহাশয়ের কতকগুলি বাঙ্গলা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।† সেই পত্র সমূহের ভাষা এখনকার চলিত চিঠি পত্রের ভাষা হইতে বহুদূরবর্ত্তী নহে। প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সেগুলি লিখিত হইয়াছিল। সে ভাষার নমুনা এইরূপ:—

"তোমার পত্র পাইয়া তুষ্ট হইয়াছি, ইংরাজী এবং বাঙ্গলা অক্ষর এবং পত্রের বাক্যপ্রবন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে, তুমি লিখন পঠনে অনাবিষ্ট নহে। বিবেচনা করিয়া মনোযোগ করিয়া শ্রমকরণের কি অপূর্ব্ব ফল! আপনি গুণবিশিষ্ট হইয়া আত্মীয়বর্গের প্রিয় এবং প্রশংসার্হ হইব। ইহার বিপরীতাচারণের যে ফল, তাহা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মিত্র বাবাজিকে যে পত্র লিখিতেছি, তাহাতে অবগত হইবা।" অনেকেই "দেহ কড়চ" গ্রন্থ দেখিয়াছেন, এই গদ্য পুস্তকখানি তিন শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা। এই শ্রেণীর গদ্য পুস্তক বাঙ্গলা বৈষ্ণব 'সাহিত্যে' বিরল নহে। কৃষ্ণদাসের "রাগময়ী কণ" এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেকগুলি পুঁথির মধ্যে গদ্যাংশ দেখা যায়; উহাদের ভাষা একই প্রকার—বড় সহজ ও বাক্যগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, চলিত কথাবার্ত্তায় রচিত। তাহাতে সমাসের খেলা ও সংস্কৃতের কুহক আদৌ নাই। স্মৃতিগ্রন্থের একখানি প্রাচীন গদ্যানুবাদ পাওয়া গিয়াছে, অনুবাদ রচয়িতার নাম রাধাবল্লভ শর্ম্মা। এই অনুবাদ পুস্তকের ভাষাও বড় সরল। সম্প্রতি নবদ্বীপের বর্ণনাসূচক একখানি দেড় শত বৎসরের প্রাচীন গদ্য পুঁথি আমরা পাইয়াছি, তাহাও অতি সহজ চলিত কথায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮১১ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরে প্রকাশিত রাজীবলোচন রায়ের "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" নামক যে একখানি বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ দেখা যায়, তাহাতে লেখকের ভাষা ও শব্দাধিকার বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তদ্দারা অনুমান করা যায় যে, গদ্য লেখার পদ্ধতি এ দেশে বিশেষরূপ প্রচলিত না থাকিলেও তাহা অনেকটা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি চলিত কথায় লিখিত, ইহার ভাষা-সম্পদ ও গদ্য রচনার প্রণালী—ইংরাজী নবিস প্রথম গদ্য-প্রবর্ত্তনাভিমানী ব্যক্তিগণের অনেকের লেখা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মৎপ্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন "কামিনীকুমার" নামক পদ্য গ্রন্থের অন্তর্বর্ত্তী "হর বল্লভের তামাক সাজা" নামধেয় অধ্যায়টি উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তাহা পড়িলে দৃষ্ট হইবে যে, প্যারীচাঁদ মিত্র আলালী ভাষার প্রবর্ত্তক নহেন, স্বীয় পুস্তকে উহার তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, গদ্য রচনার যখন এরূপ সুন্দর ও যোগ্য নিদর্শন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তখন ইংরাজের আগমনের পরে "পুরুষপরীক্ষা" "প্রবোধচন্দ্রিকা" 'প্রতাপাদিত্য চরিত' প্রভৃতির ন্যায় উৎকট গদ্য সম্বলিত

প্রাচীনকালের বাঙ্গলা গদ্য।

টুলো পণ্ডিতের হাতে বাঙ্গলা গদ্যের দুর্গতি।

* "For rhetoric he could'not ope
His mouth, but out flew a trope"
Hudibras

† কলিকাতা—৯৮নং হেরিসনরোড, হরহুন্দর মেসিন প্রেসে মুদ্রিত।

পুস্তক লিখিত হইয়াছিল কেন? "ঐহিক পারত্রিক নিস্তার-কর্ত্তৃক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর," "পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীর-তীর-নিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত" প্রভৃতি ভাবের সমাস যোজনার ব্যঙ্গ এবং "রে পাষণ্ড ষণ্ড, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ড ভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ" প্রভৃতি ভাবে যমক অলঙ্কারের শ্রাদ্ধ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কোন্ অকৃত্রিম সুহৃৎ গদ্য রচনার এই বিকট মূর্ত্তি আবিষ্কার করিলেন? অনেকের বিশ্বাস, প্রাচীনকালের গদ্য এইরূপই ছিল, রাজা রামমোহন রায় এবং তৎপথাবলম্বী লেখকগণই আধুনিক সহজ গদ্যের প্রবর্ত্তক। এই ধারণা যে ভুল, তাহা আমরা বিস্তৃত ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইংরেজের আগমনের পর "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" স্থাপিত হয়। এই শিক্ষালয়ে সাহেবদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহারা মনে করিলেন, এত বড় বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা যে গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে, তাহাতে প্রভূত পরিমাণে পাণ্ডিত্যের নিদর্শন থাকা আবশ্যক, তাঁহা-দের প্রণীত বাঙ্গলা পুস্তক সাধারণের অধিগম্য হইলে এবং একান্ত দুর্ব্বোধ্য না হইলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি থাকিবে না। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থ যত দূর কঠিন ও সমাসবিড়ম্বিত করা যাইতে পারে, তাঁহারা তজ্জন্য চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। পরবর্ত্তী সময়ে এই শ্রেণীর এক পণ্ডিত সহজ বাঙ্গলায় লিখিত কোন প্রবন্ধ শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এ কি হয়েছে! এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়"*। অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রবোধচন্দ্রিকা লিখিয়া বাঙ্গলা ভাষায় এক অত্যুৎকট প্রহেলিকার সৃষ্টি করিলেন। সাহেব ছাত্রগণ মনে করিল,—পূর্ব্বদেশীয় ভাষা সমূহের ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের ব্যূহ ভেদ করিয়া অর্থ পরিগ্রহ করা তাহাদের কর্ম্ম নহে। এই হাস্য ও বীভৎস রসের অজস্র প্রস্রবণকে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ তাঁহাদের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পঙ্কতার প্রভাধারী একান্ত অপরিপক্ব ও অসার বস্তু আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত নহে, ইহা আমাদের দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রববিহীন। হর্ষচরিত্র, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থের এই বিকট অনুকৃতি, পণ্ডিতম্মন্যদের কয়েকজন মূর্খের সৃষ্টি। পাঠকগণ এই সকল রচনা বাঙ্গলা গদ্যের আদিরূপ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িবেন না।

রাম মোহন রায়ের গদ্য

রাম মোহন রায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সরল বাঙ্গালা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গীয় গদ্যে সরসতা, সরলতা ও এক-রূপ স্তিমিত সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা কচিৎ হাস্যরসে মুখর হইয়া উঠিত। সে রচনা প্রণালীতে লিপি-নৈপুণ্যেরও অভাব ছিল না। কিন্তু সমাজ সংস্কার উদ্দেশে যে তূরী ভেরী বাজাইয়া তীব্র নিনাদ করিতে হয়, যে উদ্যম সহকারে ভাষাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা প্রাচীন গদ্য সাহিত্যে ছিল না। এই জন্য রাজা রাম মোহন রায় সরল গদ্য লিখিবার পথ অবলম্বন করিয়াও তাহাতে ইংরাজী ভাষার ভঙ্গী প্রবেশ করাইয়া তৎপ্রণীত পুস্তকগুলির ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিলেন; ইংরেজী ভাষায় ব্যাকরণ প্রণালী ও বাক্যগুলি বিন্যাস করিবার নিয়ম বাঙ্গলা গদ্যের হঠাৎ আয়ত্ত হয় নাই। এই জন্য সহজ শব্দগুলিও বিদেশী প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ সহজ বোধ্য হয় নাই।

গ্রন্থ সমালোচন, অঙ্কননৈপুণ্য

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষা অনেকটা এ দেশ প্রচলিত প্রাচীন গদ্যের অনুরূপ। তবে কথা বার্ত্তার চলিত শব্দগুলি তাহাতে একটু বেশী স্ফূর্ত্তিশালী ও সজীব হইয়াছিল টেকচাঁদের লেখা কৌতূহলোদ্দীপক ও বেগশালী। কোন বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বিষয় ভুলিয়া ভাষা সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই—এইজন্য ভাষাটি আপনা হইতেই স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে লেখনী পরিচালিত করিয়া তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাজার, আদালতের ভিড়, বিবাহোৎসব, লম্পটদের মিলন, জেলখানা, প্রভৃতি শত শত নিত্যদৃষ্ট চিত্রের অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ইহসংসারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তাঁহার প্রতি কথার বর্ণ ফলিয়াছে,—প্রতি ছত্রে বর্ণিত বিষয়ের এক একটি অঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে। গৃহকোণে হঠাৎ আলো পড়িলে যেরূপ আঙ্গিনার ক্ষুদ্র গুল্মটি, প্রাচীরবা

* রামগতি ন্যায়রত্ন 'কৃত বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ১৫৮ পৃঃ

গাবু লতাটি, গবাক্ষ কোণের আলমারি ও খট্টার একাংশ চক্ষুর সম্মুখে জাগিয়া উঠে, প্যারীচাঁদের লেখনীতে ঐরূপ ক্ষিপ্র আলো প্রক্ষেপে বর্ণিত বিষয়টির মূর্ত্তি যথাযথরূপে জাগাইয়া দেয়। তাহাতে ক্ষুদ্র জিনিষ ইতাদৃত হয় এবং বড় জিনিষের প্রতি মনোযোগ বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হয় না। পাঠককে যেন একবারে ঘটনার মধ্যস্থলে পঁহুছিয়া দেয়। এই গুণের জন্যই 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িতে কুত্রাপি ধৈর্য্যচ্যুত হইবার আশঙ্কা নাই। নিত্য পরিচিত দৃশ্যগুলি কথা বলিবার আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতে সজীব হইয়া উঠিয়াছে; যে স্থানে মিয়াজান গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে, সেই স্থলে মিয়াজানের মুখের অর্দ্ধোচ্চারিত "শালার গরু চল্‌তে পারে না" এবং তৎসঙ্গে "শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই" এইগানের অংশ, গরুর লেজ মোচড়ান, ও গাড়ীচলার "কেঁয়স ক্যঁয়ন্" শব্দ ফুটিয়া উঠিয়া একখানি গোশকটের ন্যায় একান্ত অসার ও কবিত্বহীন পদার্থকেও যেন কাব্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্রই এইরূপ স্বভাবের চিত্রাবলীর একখানি মূল্যবান প্রতিলিপি, বিশুদ্ধ ও আদিম রাগিণীর একটি সরস প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়!

বস্তুতঃ টেকচাঁদ ঠাকুরের বর্ণনায় অতিমাত্র অকৃত্রিমতা হেতুই নিতান্ত গ্রাম্য শব্দের এত অধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। লেখক আদৌ ভাষার উপর দৃষ্টি করেন নাই; উৎকৃষ্ট গল্পবাজ

ভাষা বিষয়ের উপযোগী।

যেরূপ নানা ভঙ্গিতে কথা কহিয়া চিত্রটী সজীবভাবে উপস্থিত করেন,—এ লেখা সেইরূপ; ভাষা লেখকের হুকুম তামিল করিয়া নিয়ত আজ্ঞাকারী; বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে যাইয়া প্যারীচাঁদ কখনও উর্দ্দু, কখনও নিতান্ত খেলো রকমের বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থ লিখিবেন, কথাটি যেন একবারও ভাবেন নাই, গল্পটি ভাল করিয়া বলিবেন, এই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার বর্ণিত পথ ঘাট দেখিয়া যাইতে যাইতে নানারূপ বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, শৃঙ্খলাবিহীন বিবিধ চিত্র মনের কৌতূহল উদ্দীপিত করে, প্যারীচাঁদের হাতের একটি রাস্তা বর্ণনা এইরূপ;—ইহাতে গাম্ভীর্য্যের অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত নাটকীয় সংস্থান-নৈপুণ্য বর্ণনাটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে:—

'বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে—পথ ঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে মধ্যে হুড়, মড় হড়, মড় শব্দ করিতেছে। বেং গুলা আশে পাশে যাঁওকোঁ যাঁওকোঁ করিয়া ডাকিতেছে। দোকান পশারীরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতে ছ—বাদলার জন্য লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ। কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়া "হাংগো বিসখা সে বিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্য বাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েকঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্য আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক একবার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক একবার গুণ গুণ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—ঘর কন্নায় কর্ম্মে কিছু থা পাইনে—ছেদে। ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর, এদিকে বাসন মাজা হয়নি, ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তার পর রাঁদা বাড়া আছে, আমি একলা মেয়ে মানুষ এ সব কি করে করব, আমি কোন্ দিকে যাব? আমার কি চাটে হাত চাটে পা? নাপিত অমনি ক্ষুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া বলিল, এখন ছেলে কোলে করিবার সময় নয়, কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। নাপ্তানী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা আমি কোজ্জাব? বুড়ো ঢোক্সা আবার বে করবে। আহা এমন গিন্নি—এমন সতী লক্ষ্মী; তার গলায় আবার একটা সতিন গেঁতে দিবে, মরণ আর কি? পুরুষ জাত সব করতে পারে। নাপিত আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ও সব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল।"

এইরূপ লেখাই সর্ব্বত্র; বর্ণনার প্রত্যেক অংশে জীবন আছে, তাহা মনের ভিতরএমন এক একটি ছবি আঁকিয়া দেয়, যাহা চক্ষু দেখিতে পায় নাই, লিপিনৈপুণ্যে মন তাহা দেখিতে পায় এবং পুরাতন জিনিষগুলি নব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়। স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্তার কথা বলিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা (যথা কাশীর বর্ণনা প্রসঙ্গে), বর্ণনার ক্ষিপ্রকারিতা ও বাক্যবাহুল্যে কথকদিগের শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কবিওয়ালাগণের ছড়া পাঁচালী যেরূপ সতত উজ্জ্বল ও সজীব, প্যারীচাঁদের গদ্য স্থানে স্থানে সেইরূপ। দাশু রায়ের পর প্যারীচাঁদ বাঙ্গলা রচনায় আর এক হাত দেখাইয়াছেন। দাশু রায় পয়ার বাঁধিয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ গদ্যে সেই ভঙ্গীটি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

পরিহাসরসিকতা প্যারীচাঁদের একটি বিশেষ গুণ, ইহা তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী। এই রসিকতা সম্যক্‌রূপে দ্বেষ-বর্জ্জিত।

পরিহাস শক্তি।

ইংরেজী রসিকতায় ব্যক্তিবিশেষ কি শ্রেণীবিশেষের উপর অনেক সময় তীব্র কটাক্ষপাত করা হয়, বিদ্বেষ এক পক্ষকে দারুণ ক্ষোভিত করিয়া অপর পক্ষের দন্তরুচি-কৌমুদীর বিকাশ করাইয়া দেয়। এই বিদ্বেষনিষ্ঠুর রসিকতা একদলের নিকট বড় সুস্বাদু ও অপর দলের নিকট বড় বিস্বাদ বোধ

।। ফলতঃ উহা সকল লোকে সমানরূপে উপভোগ করিতে পারে না। বাটলারের হুডিব্রাস কি বাইরণের স্কচ রিভিউয়ার ব্যক্তি বিশেষ কি শ্রেণীবিশেষকে নির্য্যাতন করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কথিত আছে, কবি বারণ্‌সের এক একটি রসিকতা দশটি করিয়া শত্রু সৃষ্টি করিত। এতাদৃশ কবি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে তাঁহার ভূমণ্ডলে টিকিয়া থাকা ভার হয়। বারন্‌সকেও স্বীয় পল্লী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। বাইরণ southeyর সঙ্গে droutheyর মিল দিয়া যে রসিকতা করিয়াছিলেন, তাহা বন্ধুবর southey বড় মুখরোচক মনে করেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে পরগ্লানিকর রসিকতা স্থান পায় নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের রসিকতা সর্ব্ববাদিসম্মত, অথচ তাহা বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই। তাঁহার পরিহাস সর্ব্ব শ্রেণীর উপভোগ্য ও নিরাড়ম্বর। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। বাবুরাম বাবুর মৃত্যু আসন্ন, তখন "বৈদ্যবাটীর যাবতীয় লোক বাবুরাম বাবুকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, মহাশয়! আমাকে চিনিতে পারেন কি? আমি কে বলুন দেখি?"

"রায় মহাশয়ের মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ, গোঁপও পেকে গিয়াছে, কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না।" 'স্নেহপ্রযুক্ত' কথাটি অতিশয় আড়ম্বরশূন্য ও হাস্যোদ্দীপক।

বৃদ্ধ বরের চসমা চখে পরিয়া চারি চক্ষের প্রথম মিলন এবং "তিনি আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশার্থ কোচার কাপড় দিয়া গোপ ভুরু নাক ও মুখ পুছিতে লাগিলেন" প্রভৃতি কথা আমরা যখন তাঁহার গল্পে পড়িয়াছিলাম, তখন হাসি রাখিতে পারি নাই। প্যারীচাঁদের গল্পের সর্ব্বত্রই কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসের খেলা আছে। আর একটি অংশ এ স্থলে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রাদ্ধের আসরে পণ্ডিতগণ একত্র হইয়াছেন ও বিচার চলিতেছে—

"একজন অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রের একটা ফোক্‌ড়া উপস্থিত করিলেন—"ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাভাব বহ্নিভাবে ধূমা, ধূমাভাবে বহ্নি।" উৎকলনিবাসী একজন পণ্ডিত কহিলেন—"যৌটি ঘটিয়া বচ্ছস্তি ভার প্রতিযোগা সৌটি পর্ব্বত বহ্নি নামে ধিয়া!" কাশীজোড়া নিবাসী পণ্ডিত বলিলেন,— —"কেমন কথা গো বাকাটি প্রিমিধান কর নাই —যে ও ঘটকে পট করে, পর্ব্বতকে বহ্নিমান ধূম, শিত্তমণি যে মেকটি মেড়ে দিয়েছেন।" বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিলেন —ঘটিয়াবচ্ছিন্ন চাব প্রতিযোগা হুমা বাব অগ্নিবাবে ধুমা অগ্নি না হলে দুমা কেমনে লাগে।" সময়ে সময়ে এ রসিকতা উচ্ছলিত অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ উপমাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গদাধর, মতিলাল, হলধর প্রভৃতি বন্ধুবর্গ ম খাইয়া চলিয়াছেন, "কোন দিকে দৃষ্টিপাত নাই, একেবারে ফুল্লারবিন্দ, মত্ততায় মাথাভারি, গুমরে যেন গড়িয়া পড়েন।"

রচনার বিবিধ সদ্‌গুণাবলী।

স্বভাবের প্রকৃত প্রতিলিপির ন্যায় সরস বর্ণনা, আদ্য কথাবার্ত্তার ভাষার উপর এরূপ অসা অধিকার, গল্প বলিবার অদ্বিতীয় সু ভঙ্গী এবং রস কৌতুকের অনা প্রবাহ, 'আলালের ঘরের দুলাল'কে একখানি উপাদেয় ও র রমণীয় গল্প গ্রন্থের শ্রেণীতে অভিষিক্ত করিয়াছে। বা বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন—"তিনি (প্যারীচাঁদ) প্র দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, ঘ সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।"

এই সকল পুস্তকে কি নাই?

কিন্তু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস অথবা কাব্যে কে মহৎ গুণের অপূর্ব্ব আদর্শ চরিত্রবিশে প্রতিফলিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও এমন কি বহুপত্র ব্যাপী বর্ণ অনেক সময় নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর ন্যায় হইলে সেগুলি স্বর্গে উঠিবার সোপানের ন্যায়; স্বর্গের দি চাহিয়া পাঠক কষ্টে সৃষ্টে উত্তীর্ণ হইবেন। কাঞ্চনজ দেখিবার জন্য অনেক দুরূহ শৈল অতিক্রম করি হয়, কিন্তু পরিণামে পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার আ বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের অনেক গুলিই 'আ লে'র ন্যায় আদ্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে; দুর্গেশনন্দিনী বিমলার রূপ বর্ণনা, বিষ বৃক্ষের নগেন্দ্র বাবুর অ বর্ণনা প্রভৃতি কোন কোন স্থলে বোধ হয় যেন বাবুকেও লেখনী নিংড়াইয়া বর্ণনা করিতে হইয়াছি টেকচাঁদঠাকুরের কষ্টকল্পনা কুত্রাপি নাই, 'আলালে'র হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইবে, তাহাই সুন্দর কৌ সরস ও স্বাভাবিক; কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসে যে অত্যুজ্জ্বল চরিত্র আছে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে অমর বলী আছে, প্যারীচাঁদের গ্রন্থে তাহার একান্ত অভাব। ক গুলি চরিত্র খুব স্বাভাবিক হইয়াছে, বর্ণনা-নৈপুণ্য

মামরা তাহাদিগকে ক্ষণেকের জন্ম ভাল বাসিলাম, তাহা ড়িবার কালে হাসিতে হাসিতে গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিলাম, ই পর্য্যন্ত ; তাহাদিগকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে পারিলাম । বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি কাব্য সংজ্ঞার বাচ্য, প্যারী-দের উপন্যাসগুলি শুধুই গল্প। শুধু নীতি কথা থাকি-লই সাহিত্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না, ইসপের গুলির মত নীতিপূর্ণ জিনিষ সাহিত্যে কোথায়? স্তু সে গুলিতে কাব্যের সৌন্দর্য্য নাই। কাব্যের তি ও সামাজিক নীতি এক নহে। যখন সাহিত্যিক রিত্র দয়া কিম্বা নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা বা বিদ্বেষ প্রভৃতি কোন গুণের উচ্চতম গ্রামে যাইয়া দাঁড়ায়, তখন হিত্যে উহা সুন্দর কিম্বা মহান্ হয়। লেডি ম্যাকবেথ, াডিন ইয়াও, জিন ভালজিন সুকুমার বৃত্তি দলন রিলেও এই হিসাবে অমর চিত্রাঙ্কন ; এবং অপরদিকে কুমার কলার অপূর্ব্ব বিকাশে প্রতাপ, কুন্দনন্দিনী, ায়েসা, কপাল কুণ্ডলা, সূর্য্যমুখী, প্রফুল্ল প্রভৃতি বঙ্কিম বাবুর সংখ্যক নায়ক নায়িকা সৌন্দর্যের সৃষ্টিস্বরূপ সাহিত্যে তিভাত হইতেছে। আলালের অন্তর্গত সাধু চরিত্র-লিকে ঠকচাচা "কেতাবী বাবু" আখ্যা প্রদান করিয়াছে ; মরা এই সংজ্ঞাই মানিয়া লইলাম। সেই সকল চরিত্র শ্লেষণ করিলে মনে হয়, যেন গ্রন্থকার নীতিসূত্র মুখস্থ রিয়া দৃষ্টান্ত আঁকিয়াছেন ; তাহারা যেন কতকগুলি কৃতার সমষ্টি, গির্জ্জায় ধ্বনিত উপদেশের মত তাহাদের থা আমাদের কর্ণে পৌঁছে, কিন্তু মর্ম্ম স্পর্শ করে না। লালের একমাত্র চরিত্র 'ঠকচাচা' সাহিত্যিক দক্ষতার

চাচা ও বাহুল্য।

নিদর্শন, কিন্তু দুরেখায় টানা 'বাহুল্য' ঠকচাচা অপেক্ষাও খানিকটা উচ্চ মঞ্চে ড়াইয়াছে। যখন দুজনেই নির্ব্বাসিত, জাহাজ চলিতেছে—খন "ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে, "মোদের সিব বড় বুরা, মোরা একবারে মেটি হলুম, ফিকির কিছু রোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে, াকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না, ার বড় ডর তেনা বি পেলেট সাদি করে।" "বাহুল্য লল—"দোস্ত! ও সব বাৎ দেল থেকে তাফাৎ কর। নিয়াদারি মুসাফিরি সেরেফ আনা যানা, কোই কিসকা হি, তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জাহান্নমে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর তার তদ্বির দেখ।" বাতাস হু হু বহিতেছে, জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে—তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছেন, "দোস্ত —মোর বড় ডর ডর মালুম হচ্ছে। আন্দাজ হয়, মৌত নজদিগ।" বাহুল্য বলিল—"মোদের মৌতের বাকি কি? মোরা মেমদো হয়ে আছি—চল মোরা নিচু গিয়া আল্লা মির দেবাচা পড়ি—মোর বেলকুল লোক—জাবান আছে —যদি ডুবি ত পিরের নাম নিয়ে চেল্লাব।" ঠকচাচার ব্যাকুলতা ও বাহুল্যর নির্ভীকতা দেখিলে মনে হয়, দুজনেই দুষ্কর্ম্মান্বিত, কিন্তু একজন ভীরু, অপর ব্যক্তি বীর।

মতিলাল।

মতিলাল একান্ত খেলো রকমের নষ্ট ছেলে, তাহার দুরন্তপনা এবং অসদ্ব্যবহারগুলি কোন নাটকীয় নৈপুণ্যের পরিচায়ক হয় নাই। শেষ কালে যখন তাহার মতিগতি ধর্ম্মের দিকে প্রবর্ত্তিত হইল, তখন বরং চরিত্রটা কতকটা সজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে এই হাস্যরস-প্রবল গল্পটা একান্ত সকরুণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

ভাষা অতি তরল বিষয় গৌরবজনক

টেকচাঁদের ভাষা নিতান্ত তরল, শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ভাষা গ্রহণ করেন নাই, সাধারণ উপ-ন্যাস ও গল্পেও এরূপ তরল ভাষা আর ব্যবহৃত হয় না। "বেল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন টাটকা টাটকা রং চাই।" গল্পের ভিতরে গ্রন্থকারের এবংবিধ অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়। এ ভাবের লেখা সাহিত্যের নিতান্ত ইতর শ্রেণীতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবু টেকচাঁদের ভাষা সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নাই, তদুপরি সংস্কৃতের রং ফলাইয়া, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রভৃতি মহাকবির মহাকাব্যের শব্দৈশ্বর্য্য ঢালিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়াছেন। টেকচাঁদের ব্যবহৃত অনেক কথা এখন আর ভাষায় সেরূপভাবে প্রচলিত নাই। "তুষ্টজনক" "এলোমেলো লোক" "শরীর তাজা হৈয়া উঠিল," "টালমাটাল," "সে স্থানকে ক্লাইব ষ্ট্রীট বলিয়া ডাকে," "লোকে ধর্ম্মে বাড়িতে পারে না।" "শিক্ষা দেওনের," "অর্থকে অগ্রাহ্য করেন, "ঠক চাচা ভারি ব্যাঘাত দেখিল," "যাওন কালীন" "পতনে পেলে" প্রভৃতি ভাবের

প্রয়োগ প্যারীচাঁদ মিত্রের যাবতীয় গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। প্যারীচাঁদের ভাষা খুব তরল, উহাকে 'বাজারে ভাষা' সংজ্ঞা দিলেও অন্যায় হয় না। শবদেহ অলঙ্কারে সাজাইবার ন্যায় যাঁহারা মৃত ভাষাকে শুধু শব্দচ্ছটায় বিভূষিত করেন, তাহাদের পাণ্ডিত্যাভিমান মিথ্যা। চপলতা ও লঘুতার মধ্যেও যদি সজীব রসের ধারা প্রবাহিত হয়, তবে এক হিসাবে ভাষার সৌন্দর্য্যও স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ বঙ্গভাষা তৎকালে পণ্ডিতগণের হস্তে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতেছিল, তাহাতে কঠিন ও অচল প্রস্তর হইতে সহসা ক্রীড়াশীল ও চঞ্চলা নির্ঝরিণীর ন্যায় আলালী ভাষার স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াশীলতা ও মাধুর্য্য আমাদের প্রীতিকর বোধ হইয়াছে। প্যারীচাঁদের ভাষা তরল ও নিতান্ত গ্রাম্যতাদোষ-দুষ্ট হইয়াও অচেতন পদার্থের ন্যায় হয় নাই। উহাতে তেজোময়ী লেখনীর স্ফূর্ত্তিশালী আবেগ দৃষ্ট হয়। তাহার আর একটি প্রধান গুণ এই যে, প্যারীচাঁদের তরল ভাষা প্রকৃত সুনীতির মর্য্যাদায় মহিমান্বিত। এরূপ দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বড় বিরল—তাঁহার ভাষায় চপলতার একশেষ থাকিলেও তাহা নীতির সমর্থনকারী ও কুনীতির বিরুদ্ধে উদ্যতায়ুধ;—সুতরাং ভাষা খেলো হইলেও উদ্দেশ্য এবং বিষয় গৌরবে প্যারীচাঁদের গ্রন্থগুলি সম্মানার্হ। 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া ইঁহার অপরাপর গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' পুস্তকে নায়ক আগড় ভামর বিবাহ-চেষ্টা ও নানারূপ লাঞ্ছনাপ্রাপ্তি দ্রুত ও মুখর রসিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া পাঠকগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আনন্দ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মভাব।

স্ত্রীপাঠ্য ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ণ পুস্তকগুলি পড়িলে দৃষ্ট হইবে, প্যারীচাঁদের হৃদয়ের অন্তঃপুর মহান ধর্ম্মভাব ও জীব-হিতৈষণার ক্রীড়া ভূমি ছিল। ভাষার তরলতা ও বাহ্য রসিকতা এক ভাবগম্ভীর তত্ত্বপিপাসু চিত্তের বহিরাবরণমাত্র। এই ধর্ম্মপ্রাণতা ও সুনীতির আদর্শই তাঁহার গল্পগুলির কৌতুকপূর্ণ রচনারও প্রধান অবলম্বন এবং এই উচ্চ আদর্শই তাঁহার 'আধ্যাত্মিকা', 'রামরঞ্জিকা' প্রভৃতি পুস্তককে ধর্ম্ম-সাহিত্যের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সামাজিক চিত্র।

প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলীতে সামাজিক আচার ব্যবহার ও প্রথার সম্বন্ধে অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা ভবিষ্যৎকালের ইতিহাস লেখকগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে এবং সেগুলি বেশী দিনের কথা না হইলেও তাহার কতকগুলি আমাদের নিকটও বেশ আমোদকর বলিয়া বোধ হয়। সে কালের পল্লীগ্রামের বড় মানুষের ছেলেদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে সহসাপ্রাপ্ত ডডো পাখীর ন্যায় অধুনা একান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। "চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক গলায় মাদুলী, কাণে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু" এরূপ ছেলে এখন মাড়োয়ারী পাড়া ভিন্ন বাঙ্গালা মুল্লুকের অন্যত্র সুলভ নহে। ছেলেদের পার্শী পড়াইবার জন্য মুন্সি নিযুক্ত হইত, তাহার বেতন সচরাচর ছিল,—"তেল, কাঠ ও মাসিক ১॥০ টাকা।" সে কালের সাহেবগণ বাঙ্গালীদের সঙ্গে খুব মিশিতেন—"সয়বোরণ সাহেবের শরীর মোটা—ভুরুতে রোঁ ভরা, গালে সর্ব্বদা পান, বেত হাতে এক একবার স্কুলে বেড়াইতেন ও এক একবার চৌকীতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বর্ণনায় আছে—তিনি দু পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেন ও গুড়গুড়ি টানিতেন। সাহেবদের দু পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবার অভ্যাসটী এখনও আছে, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে পান, তামাক খাওয়া এখন আর নাই। সেই সময়ে এণ্টুনি ফিরিঙ্গী যাত্রার দল করিয়াছিল এবং অপর দলের অধ্যক্ষ ঠাকুর সিংহ তাহাকে কুর্ত্তি ও টুপি ছাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় এণ্টুনি এমন একটী কবিতা বাঁধিয়া উত্তর দিয়াছিল, যাহার অর্থে ঠাকুর সিংহ সাহেবের স্ত্রীর ভ্রাতৃত্ব পদে বরিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সেই গার্হস্থ্য আমোদ প্রমোদে সাহেবের যোগদান এখন সুখস্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্যারীচাঁদের সময় বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত অনাদৃত ছিল, হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত সভায় প্যারীচাঁদের প্রবর্ত্তনায় অক্ষয়কুমার দত্ত সর্ব্ব প্রথম যে বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে অনেক সভ্যই বিস্মিত হইয়া পড়িলেন এবং পরবর্ত্তী বক্তা এই অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও নিজের কথাগুলি বাঙ্গলায় বলিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময়ে প্যারীচাঁদের মত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষায় এতগুলি সারগর্ভ

টপাদের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অল্প সাহস ও দেশীয় ভাষার প্রতি সামান্য অনুরাগের পরিচায়ক নহে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত বাঙ্গলা গ্রন্থের আদর তৎসময়ে এবং পরেও বিশেষভাবেই ঘটিয়াছে।

গ্রন্থাবলীর আদর।

বঙ্কিম বাবুর প্রশংসা বাক্য তাঁহার উদারতার পরিচায়ক হইলেও সত্য হইতে দূরবর্ত্তী নহে। তিনি লিখিয়াছেন, "আলালের ঘরের দুলালে"র দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।" কলিকাতা রিভিউ পত্রে ইংরাজ সমালোচক প্যারীচাঁদের রহস্যশক্তি ফিল্ডিংএর তুল্য মনে করিয়াছিলেন, অপর কয়েক জন বিজ্ঞ সমালোচক তাঁহাকে মলিয়ার এবং ডিকেন্সের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। জি, ডি, ওসওয়েল সাহেব বলেন "থ্যাকারীকে যেরূপ পাশ্চাত্য প্রদেশে সংযত রহস্যকারীদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান দেওয়া যায়, প্যারীচাঁদেরও সেইরূপ স্থান এদেশে প্রাপ্য। বিষবৃক্ষের অনুবাদক সিভিলিয়ান ফিলিপ্স সাহেব 'আলালের ঘরের দুলালকে একখানি প্রকৃত গার্হস্থ্য উপন্যাস বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। জন বিমস্ সাহেব বলেন, "প্যারীচাঁদ মিত্র (যিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন) বাঙ্গলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।" সাহেব মহলে এই পুস্তকখানির বিশেষ আদর হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কাউএল সাহেব এই পুস্তকখানির একটী ইংরেজী অনুবাদ প্রণয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় দুরূহ মনে করিয়া শেষে সে চেষ্টায় বিরত হন। জি, ডি ওসওয়েল সাহেব সম্প্রতি আলালের যে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অনেকটা মূলানুযায়ী হইয়াছে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করিয়া যে সকল সাহেব এতদ্দেশে আসেন, বিভাগীয় পরীক্ষার জন্য 'আলালের ঘরের দুলাল' তাঁহাদের পাঠ্য। এজন্য সাহেবগণ এই পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচিত,—সম্প্রতি পেনেল সাহেব তাঁহার অদ্ভুত নোয়াখালি মোকদ্দমার রায়ে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ঠকচাচার সঙ্গে আসামী বিশেষের তুলনা করিয়া প্যারীচাঁদের এই গ্রন্থের প্রতি আবার আমাদের সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অধ্যাপক ম্যাক্স মূলর।

(৩)

(ধর্ম্মবিজ্ঞান ও জাতীয় আর্য্যধর্ম্মের বিকাশ)

ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনায় ম্যাক্স মূলর।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনাই ম্যাক্স মূলরের জীবনের প্রধান কার্য্য। তাঁহার ভাষাতত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ বিশেষজ্ঞেরাই পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহার ঋগ্বেদাদি কেবল পণ্ডিত সমাজেই সমাদৃত। তাঁহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আজি পর্য্যন্ত পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী ইংলণ্ড, আমেরিকায় এবং ভারতে বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের দ্বারাই তিনি সাধারণ শিক্ষিত সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রাচীন ইতিহাস।

ধর্ম্মবিজ্ঞান নূতন কথা—সাধনার অতি নূতন অসি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মোগল সম্রাট আকবর হিন্দু, ইস্লাম ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া, একটা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সময়ে বিজ্ঞানের বিচার প্রণালী সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। য়ুরোপীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউমই ধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। হিউমই সর্ব্বপ্রথমে মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, ধর্ম্ম বিকাশের একটা সার্ব্বভৌমিক প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। হিউম সন্দেহবাদী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই মানব জ্ঞানের মূল উপাদান বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার মতে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সমূহ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; তাহাদের সম্বন্ধে আমরা অস্তি নাস্তি কোন কথাই বলিতে পারি না। ঈশ্বর তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, প্রভৃতি সকলই ইন্দ্রিয়বোধের অতীত, সুতরাং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্বের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াও হিউম ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অস্তিত্ব মানিতেন। এই প্রবৃত্তি যে মানব প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, এবং অপরাপর অন্তঃপ্রবৃত্তির ন্যায় ইহা যে সত্য, হিউম একথা স্বীকার করিতেন। এমন কি ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া মানিয়াও, হিউম সমাজ রক্ষার্থে, সমাজ বিবর্ত্তনের নিম্নস্তরে এবং অজ্ঞজনগণের পক্ষে সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগিতায় সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মের মূল ও প্রকৃতি অনুসন্ধানে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। বলিতে গেলে, বর্ত্তমান যুগ হিউমই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে মানবীয় ধর্ম্মের আলোচনার সূত্রপাত করেন। এইজন্য তাঁহাকেই য়ুরোপে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু হিউম বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। খৃষ্টীয়, ইস্লাম, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া হিউম আপনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। পরবর্ত্তী ধর্ম্মবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিউম কেবল ধর্ম্মের অন্তঃপ্রকৃতিই সামান্যভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রেতপূজা হইতেই মানবীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি। তৎপরে প্রাকৃতিক শক্তি ও বিষয়াদিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেববাদের সৃষ্টি হয়। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে বলি পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে বহুদেববাদের মধ্য দিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহাই ধর্ম্মবিবর্ত্তনের চরম সোপান নহে। একেশ্বরবাদের পরে

মূল—ইদংএর এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি হইতে। প্রকৃতির উপরে নির্ভর, প্রাকৃতিক শক্তির অধীনতা ও তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হইতে দেবপূজা, এবং সমাজের উপর নির্ভর, সমাজশক্তির অধীনতা ও তাহার সঙ্গে সখ্যস্থাপনের আবশ্যকতা হইতে প্রেতপূজা—কিম্বা কোন সামাজিক চিহ্ন ধারণ, এই দুই আকারে মানবের ধর্ম্ম সর্ব্বাংশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে আত্মরক্ষা ও বংশ রক্ষা এই দুই প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তি হইতেই মানবের ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে।

ধর্ম্মের বিচিত্রতার কারণ।

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য মানবের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা হইতেই তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল উৎপন্ন হইয়া, নিসর্গ পূজা ও সমাজ শাসনের বশ্যতা ও প্রেতপূজা, এই দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু সকল সময়ে ত সমভাবে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রয়াস পাইতে হয় না। সকল অবস্থাতেও এই দুই বিষয়ের উপরে সমান দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হয় না। যে জাতি অপরাপর বিরুদ্ধ জাতি হইতে দূরে থাকিয়া, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চিত্ত নিসর্গের শক্তি দ্বারাই সমধিক অভিভূত হইয়া থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক। সে যে সমাজশাসন মানে না তাহা নহে; বংশ রক্ষার জন্য যে সমাজের বশ্যতা ও সামাজিক রীতি নীতির যথাযোগ্য অনুসরণ তাহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না, তাহা নহে; কিন্তু এ সকল সে কলের মতই করিয়া যায়। এ বিষয়ে তাহাকে কিছু চেষ্টা চরিত্র করিতে হয় না। অপর দিকে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে সে গলদঘর্ম্ম; সুতরাং সেই দিকেই তাহার চিন্তা ও ভাবনা নিয়ত ছুটিয়া যায়। এইজন্য তাহার সে অবস্থায় ধর্ম্মে ও নিসর্গের উপরেই বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। নিসর্গ দেবতাদের প্রাধান্য সে ধর্ম্মে দৃষ্ট হয়। আবার আর এক জাতি অপর বিরোধী জাতির সান্নিধ্যে বাস করিতেছে। কেবল প্রকৃতি দ্বারা নহে, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষা তাহারা শতগুণে এই বিরোধী সমাজের সমবেত শক্তি দ্বারা সংহত হইতেছে; সততই দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এজন্য দলপতির বশ্যতা স্বীকার প্রয়োজন হইয়া উঠে। দলপতি সমাজ শক্তিরই আধার; সুতরাং সমাজবন্ধন দৃঢ় হইতে থাকে। এ অবস্থায় তাহার ধর্ম্মে নিসর্গ অপেক্ষা সমাজেরই উপরে বেশী দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। এই জাতির আদি ধর্ম্মে নিসর্গ পূজা অপেক্ষা প্রেত পূজার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যাইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপে কোথাও বা কোন জাতির ধর্ম্মে, নিসর্গের প্রতি দৃষ্টি বেশী; কোথাও বা সমাজের প্রতি দৃষ্টি বেশী, আর কোথাও বা সমভাবে সমাজ ও নিসর্গ উভয়েরই প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এবং এই কারণে এক দিক দিয়া ধর্ম্মে বিচিত্রতা উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া ধর্ম্মের বিচিত্রতার আরও কারণ আছে। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিন্তাপ্রণালীর সমাজ গঠনের বিভিন্নতাই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তাহার সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব।

ধর্ম্মবিবর্ত্তনের সাধারণ প্রণালী।

ধর্ম্ম বিবর্ত্তনের সবিস্তার আলোচনাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব। সংক্ষেপতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানব ধর্ম্মের আদি সোপানে সামাজিক বিধানের বশ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নদী, বন, সরিৎ, বৃক্ষ, প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের, সর্প, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর, দাবানল, বন্যা, ভূকম্পন প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতের এবং বিবিধ শারীরিক ব্যাধি ও মহামারী প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, তাহাদের অভ্যন্তরে, প্রাণীবর্গের দ্বারা, আত্মশক্তি সদৃশ, ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া কখনও বা বলি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের তুষ্টি সম্পাদন, কখনও বা উচ্চাটনাদি মন্ত্রের দ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে।

ক্রমে জঙ্গল কর্ত্তন কার্য্য সমাধা হইলে, মানব পশুপালন এবং যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে, এবং কৃষি কার্য্যাদিতে নিযুক্ত হয়। এই অবস্থায় রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতিই তাহার ভাবনার প্রধান বিষয় হয়। ক্রমে পার্থিব পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সে আকাশ দেবতাদিগের পূজাতে প্রবৃত্ত হয়। অন্য দিকে সামাজিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রেতাত্মার পূজা আরম্ভ হয়। এই স্তরে দিবা ও রাত্রির আশ্চর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন, সূর্য্য চন্দ্রের প্রভাব, ও তাহাদের দ্বারা অন্ধকারের বিনাশ, এই সকল নৈসর্গিক ঘটনাও মানবের ভাবনার বিষয় হয়। ক্রমে মঙ্গল এবং অমঙ্গলের সঙ্গে আলোক ও অন্ধকারের সমন্বয় সাধিত হইয়া আলোক-দেবতা সামাজিক জীবনের মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা সমাজধর্ম্মের আবহরূপে কল্পিত হন।

তৎপরে বহুদেববাদ হইতে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাই মানবীয় ধর্ম্মের চরম অবস্থা নহে। এই একেশ্বরবাদের পরে ক্রমে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিকাশ হইয়া, সর্ব্বশেষে মানব ধর্ম্ম চরম অবস্থায় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

এই প্রণালী অনুসারেই মোটামোটি, ভারতীয় ধর্ম্মও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেদে আর্য জীবনের যে চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই জঙ্গল কর্ত্তনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ঋগ্বেদের কোনও কোনও স্থলে সে প্রাচীন অবস্থারও ঈষদুল্লেখ দেখিতে পাই। আর্য্যেরা তখন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, সুতরাং আকাশ দেবতাগণই ঋগ্বেদের প্রধান উপাস্য। সে সময়ের দেবতারা বিশিষ্টভাবেই আরাধিত হইতেন: কিন্তু ক্রমে বহুদেববাদ পরিহার করিয়া, প্রাচীন আর্য্যগণ একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থায়, আর্য্যেরা যখন যে দেবতার স্তুতি করিতেন, তাঁহাকেই সর্ব্বময়, সর্ব্বাধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এই অবস্থার ধর্ম্মকে ম্যাক্সমুলর henotheism নাম দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বৈদিক ধর্ম্মে যে বহুদেববাদ আছে, ম্যাক্স মুলর ইহা স্বীকারই করেন না। বৈদিক ধর্ম্মে তাঁহার মতে, একেশ্বরবাদও নাই, বহু ঈশ্বরবাদও নাই। ইহার মাঝামাঝি একটা অবস্থা—যাহার নাম henotheism. ক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম এক প্রকারে একেশ্বরবাদে পৌঁছিয়াছিল। তথাপি মোটামোটি ইহাকে ম্যাক্স মুলর নিসর্গ ধর্ম্ম Physical Religion এরই অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

উপনিষদ বেদান্ত।

উপনিষদে ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রধানতঃ আত্মাতে অনন্তকে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করে। বেদে যে অনন্ত নিসর্গে প্রকাশিত, উপনিষদে সেই অনন্তই আত্মাতে অভিব্যক্ত। কিন্তু এখানেই ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ লাভ হইল না। অনন্ত ত আর দুই হইতে পারে না। সুতরাং নিসর্গে অনন্তের যে প্রকাশ দেখা গিয়াছে, আত্মাতে তাহার যে অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইয়াছে, এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। বেদান্তে সে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এইজন্য বেদান্তকেই ম্যাক্স মুলর ভারতীয় ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে ইহাই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিদ্গণ, মহম্মদীয় সূফী সাধকগণ হিন্দু বৈদান্তিকের ন্যায় এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। বেদান্তের মূল সত্যেই সকল সত্যের সমন্বয়।

পুরাণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

বেদান্তেই জাতীয় আর্য্যধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে বলি

কস বুলয় পৌরাণিক বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনও বিশেষ আলো- করেন নাই। পুরাণেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিলেও, পৌরাণিক যে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের আরও উচ্চতর বিকাশ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব মার্গেই যে হিন্দুধর্ম্ম চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, একথা কোনও পীয় পণ্ডিত আজি পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখেন নাই। মাক্স ও তাহা করেন নাই বলিয়া, তাঁহার দোষ দিই না। তবে মাক্স রের সূচিত কার্য্য যাঁহারা সমাধা করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে ণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা না করিলে চলিবে না।

(সমাপ্ত)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বারাণসী।

(১)

বালার্কের স্বর্ণ করোজ্জ্বলিত কাশীর বক্ষে অবতীর্ণ হতে না হইতে, অত আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। ধুচক্র-বেষ্টনকারী মক্ষিকাকুলের মত, এক দল যাত্রা- য়ালা ও গঙ্গাপুত্র আমাকে যুগপৎ বেষ্টন করিল। গঙ্গা- ত্রেরা স্নানের ঘাটে মন্ত্র পড়াইয়া যাত্রীদের নিকট পয়সা দাব করে। আর যাত্রাওয়ালারা কাশীর সকল স্থান ত্রীদিগকে দেখাইয়া আনে। ধরিতে গেলে যাত্রা- য়ালারা guide এর কাজ করে। এক সময়ে ঙ্গাপুত্রদের ভয়ানক অত্যাচার ছিল। যখন নদী পথে াকে কাশী যাত্রা করিত, যখন রেল পথ সুগম হয় নাই, ন এই গঙ্গাপুত্রেরা ধর্ম্মের আচ্ছাদনে অনেক অধর্ম্মাচরণ রত। ধনীর নৌকার সন্ধান পাইলে তাহারা দলবল মত তাহাকে ডাকিয়া সুযোগ বুঝিলে লুটপাট পর্য্যন্ত রিত, নৌকা ডুবাইয়া দিত। জলপন্থী ঠগ জাতীয় য়াদের সহিত ইহাদের ব্যবসার সংস্রব ছিল। সেকালের কজন সুদক্ষ মাজিষ্ট্রেট—স্যামুয়েল সাহেব অনেক চেষ্টা রিয়া ইহাদের দমন করেন।

যাহা হ'ক, আমি যাত্রী নই এই কথাটা তাহাদের বুঝা- ।দিলাম। তাহারা নিরুপায় হইয়া আমায় ছাড়িয়া দিল। হারা নিতান্ত নাছোড়বান্দা তাহারা আমার এক্কার পিছনে ছনে দৌড়াইতে লাগিল। দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া ক্লান্ত য়া শেষ গালাগালি দিতে দিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে আমার আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট য়াছিল। এখানে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান—বাস করিতেন। বারাণসীতে তিনি অনেক দিন কাটাইয়াছেন ও লাভজনক চাকরী করিয়া তিনি সেখানে বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেইখানে গিয়া উঠিলাম। তিনি সহসা আমায় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই দিন বারাণসী ক্ষেত্রে প্রথম অন্ন গ্রহণ করিলাম।

ক্যাণ্টনমেণ্টটী বেশ নির্জ্জন স্থান। সহর হইতে আগে ক্যাণ্টনমেণ্টে যাইতে হইলে এক্কা বা পাল্কি গাড়ির আশ্রয় লইতে হইত। এখন ক্যাণ্টনমেণ্টে ষ্টেসন খুলিয়াছে। এখানে গোরাবারিক, কাশীরাজের পুরাতন টঙ্কশালা, জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের বাঙ্গলা গির্জ্জা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। বারাণসী সহরের সহিত তুলনায় এ অংশ অতি নির্জ্জন। প্রসর খুটিম বাঁধান পথের দুইধারে বড় বড় ছায়াময় গাছ—শেষ ভাগে ক্ষীণকায়া বরুণা ও তাহার উপরে লৌহময় সেতু—জন সমাগম বিরল প্রসারিত রাজবর্ত্ম —ইউরোপীয়গণের দ্রুত চালিত শকট-নেমীর ঘর্ঘর নিনাদ —এই সব লইয়াই ক্যাণ্টনমেণ্টের অস্তিত্ব।

দিন কতক খুব আনন্দে কাটিল। এ আনন্দটা অবশ্য ক্যাণ্টনমেণ্টে বসিয়া উপভোগ করি নাই। প্রতি দিন প্রাতে উঠিয়া দশাশ্বমেধে স্নান করিতে যাইতাম। স্নান করিয়া বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার দর্শন করিতাম। মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত রৌদ্র মাথায় লইয়া বাটীতে ফিরিতাম। দিবাভাগে আহা- রান্তে নিদ্রার পর সান্ধ্য বায়ুসেবন ও সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের আরতি সন্দর্শন। আনন্দময়ের আনন্দ-কাননে এইরূপ আনন্দেই দিন কাটিত।

আনন্দকানন প্রকৃতই আনন্দ কানন। কাশীতে যাহা আছে, তাহা কাশীরই উপযুক্ত। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বারাণসী প্রাচীনতমা নগরী। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অবন্তিকা, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অমরাবতী, গঙ্গাসাগর সঙ্গম, সরস্বতী, সিন্ধুসঙ্গম, ত্র্যম্বক, গোদাবরী, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম মহালয়, ওঙ্কার, পুরুষোত্তম, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর, শ্রীপর্ব্বত, মানসতীর্থ, গয়া প্রভৃতি কয়েকটী তীর্থ মুক্তিদায়ক বলিয়া উল্লিখিত। বারাণসী, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র ভারতবর্ষে বারাণসীর ন্যায় প্রাচীনতমা নগরী আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্মগ্রন্থে, শাস্ত্রে, পুরাণে, উপকথায়, সাহিত্যে কবিতায় দর্শনে, বিজ্ঞানে,

বারাণসীর নাম সর্ব্বতোভাবে সংযোজিত। বারাণসী সমগ্র ভারতবর্ষের জ্ঞানের প্রবেশদ্বার। বিলাতেযেমন অক্সফোর্ড—ভারতবর্ষের সেইরূপ বারাণসী, সাধনার কেন্দ্র, মুমুক্ষুর প্রিয়, বাণীর বিলাসকানন, জ্ঞানের বিকাশক্ষেত্র, কর্ম্মের ক্রীড়াভূমি। বারাণসী—অতীতের পরিস্ফুট কীর্ত্তি কাহিনী—যুগ পরিবর্ত্তনের জাগ্রৎ ইতিহাস, হিন্দুর ক্রমিক অধঃপতনের সাক্ষী, আর হিন্দু, বৌদ্ধ, মোগল, পাঠান ও ইংরাজ এই পঞ্চাধিকার কালের গাথাময় পরিস্ফুট ইতিহাস। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, লৌকিক, রাজনীতিক—সর্ব্ববিষয়ক ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা যেন বারাণসী একাই বলিতে পারে। কত পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকের দেহ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কত মণিময় মুকুট-মণ্ডিত মস্তক মণিকর্ণিকার কাহিনীময় শ্মশান ভস্মে মিশাইয়াছে—কত প্রস্ফুট প্রতিভা কালের বিনশ্বর স্রোতের উপর ভাসিয়া গিয়াছে। সেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, অযোধ্যা, গান্ধার, মগধ, উজ্জয়িনী, দ্রাবিড়, কর্ণাট, ইন্দ্রপ্রস্থ—যাহাদের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আজও বারাণসী যুগ যুগান্তরের স্পর্দ্ধা বহন করিতেছে—আজ কোথায় সেই সব লোকবিশ্রুত জনপদ। তাহারা সকলেই গিয়াছে—আছে কেবল বারাণসী।

বারাণসী যেন উত্তাল তরঙ্গময় কালসমুদ্রে একমাত্র স্পর্দ্ধাবান উন্নতমস্তক সমুদ্র-গিরি। সে সময়ে প্রাচীনতম নগরী বেবিলন নিনেভের সহিত প্রাধান্য লইয়া বিবাদে ব্যাপৃত টায়ার যখন নূতন উপনিবেশ স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এথেন্স যখন ধীরে ধীরে বল সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত, বীরপ্রসবিনী রোম যখন জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই, তখনও এই বারাণসী সমগ্র ভারতের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া অতীতের গৌরব স্বরূপ যাহারা ছিল—তাহারা সঙ্গে গিয়াছে; কিন্তু বারাণসী আজও সেই সব অতীতের সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, কীর্ত্তি অকীর্ত্তি, উন্নতি অবনতির কাহিনীস্তম্ভরূপে অবিনশ্বর ভাবে দণ্ডায়মান। তোমার প্রাণে যদি একটু মহত্ত্ব থাকে, এই বিশাল জম্বু দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া যদি আপনাকে সৌভাগ্যবান বোধ করিয়া থাক, তোমার হৃদয়ে যদি একটু জাতীয় গৌরব থাকে, জাতীয় ইতিহাসের প্রতি তোমার যদি একটুও আন্তরিক অনুরাগ থাকে, এই পুণ্য ক্ষেত্রে আর্য্যভূমিতে জন্মিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আত্মহারা না হইয়া যদি এখনও তোমার মনে হিন্দুত্বের কোন গৌরব বা আত্মাভিমান থাকে—তবে একবার বারাণসী দেখিয়া আইস। তোমার দেশে যাহা ছিল, যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর দেখিতে পাইবে না—যাহা অতীতের স্বপ্ন, বর্ত্তমানের দুরাশা, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন—তাহাই বারাণসীতে বর্ত্তমান। নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বারাণসীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলেও কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহা হইতে তুমি যে শিক্ষা লাভ করিবে—শত শত খণ্ড ইতিহাস পাঠে তাহার অর্দ্ধেক শিক্ষা পাইবে কিনা সন্দেহ। কূপমণ্ডুকের আত্মমহত্ত্বে স্ফীতগ্রীব না হইয়া একবার তোমার ভারতবর্ষের কোথায় কি আছে, দেখিয়া আইস—তোমার যুগযুগান্তর সাধনার ফল ফলিবে।

বারাণসী নামটী কোথা হইতে আসিল এখন তাহারই একটু আলোচনা করা যাউক। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে সর্ব্বপ্রথমে কাশী শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "অতঃ কাশয়ো হগ্নীনা দহং" ইত্যাদি সূক্তে কাশী নামের অতি প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক কেবল প্রাচীন নহে—কাশী সেই সময়ে একটী বিস্তৃত জনপদ ছিল। রামায়ণের সময়ে কাশী ঐশ্বর্য্য লোক বিশ্রুত।

> তত্রবানদা কাশেরপুরীং বারাণসীং ব্রজ।
> রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্।
> * * * *
> প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশি রাজো মহাযশাঃ :—

প্রভৃতি শ্লোকে কাশীর ঐশ্বর্য্যময়ী অবস্থা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। এক্ষণে বারাণসী এই নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করা যাক্। কেহ কেহ বলেন কাশীতে বরণার নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহার নামানুসারে বারাণসী হইয়াছে। তিনি "বারাণসী" নামে এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আজও কাশীতে বর্ত্তমান। কিন্তু কাশীখণ্ডের বিবরণ অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—

> বরণা পিঙ্গলা নাড়ী তদন্তস্ত্ব বিমুক্তকং
> সা সুষুম্না পরা নাড়ীত্রয়ং বারাণসী ত্বসৌ,

অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা জড়িত সুষুম্না নাড়ীর ন্যায় বর

অসি এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কাশী বারাণসী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা—

অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে।
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনেঃ।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা।

অর্থাৎ সত্যযুগে যখন এই কাশী ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য অসি ও বরণা নদী উৎপন্ন হইয়াছে—হে মুনে! সেই দিন হইতেই এই কাশী বরণা ও অসি নদীর সঙ্গম লাভ করিয়া বারাণসী নামে বিখ্যাত হইয়াছে।"

যে, তাঁহার সময়ে বারাণসী উন্নতির অভিমুখে ক্রমশঃ ধাবিত হইতেছিল—এই উন্নতি অবশ্য একদিনে সংসাধিত হয় নাই। যদি কেহ একটী প্রাচীনতম আর্য্যনগরীর চিত্র মানস পটে দেখিতে চান, তিনি বারাণসীর মুসলমান কীর্ত্তিগুলি বাদ দিয়া দেখিলেই সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন।

যে বারাণসীতে বসিয়া কপিল সাংখ্য সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যে মহাক্ষেত্রে বসিয়া মহামতি যাস্ক "নিরুক্ত" ও পণ্ডিতপ্রবর পাণিনি গভীর গবেষণাপূর্ণ স্বীয় ব্যাকরণ সূত্রগুলি জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, যে স্থানে বসিয়া কুল্লুক ভট্ট হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র মনুর টীকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া মহামতি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধ ধর্ম্মের শান্তিময় সূত্রগুলি সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া সাধকপ্রবর তুলসীদাস স্বীয় মধুময় রামায়ণ গানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই বারাণসী বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে কাহার না হৃদয়ে আঘাত লাগে?

মণিকর্ণিকা।

বৌদ্ধদিগের আধিপত্য কালে শাক্যসিংহ এই বারাণসী প্রদেশের মৃগদাব নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বারাণসীর অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল। হিউয়েন্থসাংএর বর্ণনা হইতে জানা যায়, তাঁহার সময়ে সমগ্র বারাণসী রাজ্য ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) ও বারাণসী নগরী—দীর্ঘে দেড় ক্রোশ ও বিস্তারে অর্দ্ধ ক্রোশ ছিল। হিউয়েন্থসাং তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণীতে বারাণসীকে "পোলনিশি" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই সময় বারাণসী প্রদেশ বিস্তারে তিন শত ক্রোশেরও উপর ছিল।

হিউয়েন্থসাংএর লিখিত বিবরণ হইতে এই প্রতিপন্ন হয়

সমসময়িক প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে কাশীর হিন্দু প্রধান কালের এক একটী উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। আমি একবার একখানি প্রাচীন তামিল নাটকের অনুবাদ পড়িয়াছিলাম। নাটককার কে, তাহার নাম নাই; কিন্তু সিংহলের খ্যাতনামা বারিষ্টার মুথুকুমার স্বামী তাহার অনুবাদক। তিনি নাটকের ভাষা বিচার করিয়া পুস্তকখানি যবনাধিকারের বহু পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং তাহাই সম্ভবপর বোধ হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ছলনায়

রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া কাশী প্রবেশ করিবার সময়ে রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"প্রিয়তমে! ঐ দেখ ভারতের পবিত্রতম তীর্থ ক্ষেত্রের রাজপ্রাসাদের ন্যায় গৃহগুলির উন্নত চূড়া অদূরে দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ, আমরা মেখলার ন্যায় নগর-বেষ্টনকারী উচ্চ প্রাচীরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ দেখ! কত শত গগনস্পর্শী গৃহচূড়া সগর্ব্বে উত্থিত হইয়া মেঘের ক্রোড় স্পর্শ করিতেছে। আবার দেখ দেবদেব বিশ্বনাথের মণি-মুক্তাময় ধ্বজ পতাকাদিশোভিত মন্দিরের চূড়া সার্ব্বভৌমিকত্ব লাভ করিয়া সকলের উপরে উঠিয়াছে। কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবাদিদেবকে প্রণাম কর। * * * * * এই দেখ প্রিয়ে! আমরা নগর দ্বারের নিকটস্থ হইয়াছি। দেখ কতশত অস্ত্রধারী বর্ম্মাবৃত বীর পুরুষেরা নগর দ্বার রক্ষা করিতেছে। ভীমকায় দৌবারিকগণের অসি ফলক সৌরকরে প্রদীপ্ত হইয়া দুষ্টের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। * * (নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া) "আহা কি সুন্দরী নগরী! এই বারাণসী সকলের শ্রেষ্ঠ। ধন-দেবতা কুবেরের এত ঐশ্বর্য্য আছে কিনা সন্দেহ। গৃহে গৃহে পূজা-পাঠ-পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্রধ্বনি আমরা স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছি। আহা! এই পবিত্র ক্ষেত্র কাশী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ভগবতী বীণাপাণির বিচিত্র ক্রীড়া-ক্ষেত্র। এস্থানে কেবল বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ স্মৃতি ও বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির প্রতি নিয়ত আলোচনা হইয়া থাকে। * * অদূরশ্রুত সুকঠিন জ্যা নির্ঘোষ ও তরবারির ঝন্‌ঝনা শব্দে বোধ হইতেছে এখানে ক্ষত্রিয়ের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে। * * এই দেখ! এক্ষণে আমরা লক্ষ্মীর বরপুত্র বৈশ্যদিগের শ্রী-সম্পন্ন প্রাসাদের সন্নিকটস্থ হইয়াছি। ইহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিলে চিত্ত বিমোহিত হয়। পথিপার্শ্বে কতশত বিপণিরাজি বহুমূল্য দ্রব্যজাত পরিপূর্ণ হইয়া নগরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। দেখ বণিকেরা স্তূপাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া বসিয়া আছে। নাগরিকেরা বিনিময় করিতেছে। মুদ্রাদির ক্রমাগত সঞ্চালন শব্দ এই ক্রেতা বিক্রেতাদিগের ক্ষেত্র ছাড়াইয়াও আমাদের কর্ণ পথে প্রবেশ করিতেছে। এই দেখ! এখন আমরা ঐশ্বর্য্যের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদের মৃৎকুটীরের সন্নিহিত হইয়াছি। ঐ দেখ! শ্রমজীবীরা কেহ গোচারণ করিতেছে, কেহ বা ভূমিকর্ষণার্থে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে—কেহ বা হলনিযুক্ত অবাধ্য বৃষযূথকে অযথা তাড়না করিতেছে? আবার দেখ রাখাল বালকেরা সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিয়া কেমন মধুর বংশীধ্বনি করিতেছে। * * * * এই দেখ! আমরা ভূতভাবন ভবানীপতির মন্দির প্রকোষ্ঠের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছি। চল, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সার্থক হই।"

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয়, যবনাধিকারের পূর্ব্বে বারাণসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চতুর্ব্বর্ণের আবাসস্থান ছিল ও তাহা ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল।

কাশীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত একটু আলোচনা করিলে বোধ হয়, আমাদের পাঠকবর্গের বিরক্তিকর হইবেনা। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে—আয়ুবংশীয় সুহোত্র রাজার পুত্র কাশ—কাশীর প্রথম হিন্দু রাজা। তাঁহার পুত্র কাশিরাজ কাশ্য। এই "কাশিরাজ হইতেই সম্ভবতঃ "কাশী" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে! নিম্নে একটী বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পুরুরবা বংশীয় ছাব্বিশ জন রাজা হিন্দুপ্রধান কালে কাশীতে রাজত্ব করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা—ভার্গভূমি। ভার্গভূমির পর আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না। শাক্য চূড়ামণি ভগবান বুদ্ধদেবের সমসময়ে দেবদত্তনামক এক নৃপতি কাশীতে রাজত্ব করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে বারাণসী মগধরাজগণের শাসনাধীন হয়। প্রদ্যোত বংশীয় রাজগণ এক শত বৎসরের উপর রাজত্ব করিলে—শিশুনাগ নামক জনৈক নরপতি বারাণসীতে অধিকার স্থাপন করেন। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে কাশী-রাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার সময় নির্ণয় করা অতি কঠিন। মগধ রাজ্যের পতন হইলে সম্ভবতঃ বারাণসী গুপ্তরাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। ঐ বংশীয় প্রকটাদিত্য সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীতে কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণ কাশীতে আধিপত্য স্থাপন করেন। গৌড়াধিপ মহীপালই কাশীর পালবংশীয় প্রথম নরপতি। সারনাথে আজিও একটি বৌদ্ধস্তূপ বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে মহীপালপ্রদত্ত একখানি শিলালিপি (১০৮৩ সম্বৎ=১০২৬ খ্রীঃ অব্দ) পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কাশী বাঙ্গলা ও বিহারের অনেক নরপতির রাজ্যাধীন ছিল।

বারাণসী হইতে কিছু দূরে আমরা এক্কা করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ "সারনাথ" দেখিতে গেলাম। আধুনিক স

দখিলে ইহাতে স্পষ্টতঃ শিল্পের কোন চাতুর্য্যই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দেশের ইতিহাসের দিক দিয়া দখিতে গেলে ইহার শিল্প কৌশলের মূল্য অত্যন্ত অধিক। হার ভিত্তি প্রস্তর মণ্ডিত। এই ভিত্তির পরিসর ৯৩ ফুট এবং উচ্চতা ৪৩ ফিট। ইহার উপরেই ইটের গাথনি। ইহাও প্রায় ১১০ ফিট উচ্চ। নীচে দাঁড়াইয়া দেখিলে মানুষ ইহার নিকট আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করে। ই স্তূপটী ঐতিহাসিকের চক্ষু ভিন্ন সাধারণের চক্ষে অতি তৃপ্তিকর দৃশ্য। সারনাথের প্রাচীন "বিহারাদির" আর দান চিহ্নই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হি উয়েন্থ সাং এই স্তূপচিহ্ন বিহারের বর্ণনা ব্যপদেশে লিয়াছেন—"বেষ্টিত সীমা মধ্যে দুই ত ফিট উচ্চ এক "বিহার" সংস্থাপিত ল। এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তর । কিন্তু চূড়া ও সোপানাবলী ইক নির্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যস্থলে দ্ধদেবের এক প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি াছে।" ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়, -সারনাথের বিহারে অনেক "শ্রমণ" "ভিক্ষু"গণ আশ্রয় পাইত—এবং হারটি আয়তনে বড় কম দীর্ঘ ছিল । বারাণসীর প্রাচীনত্ব আলোচনার দ্দেশ্যে আমরা উপরে যাহা বলিলাম, ধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা নীরস াধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে ক্ষার ও আলোচনার অনেক কথা াছে।

অতঃপর বারাণসীতে মুসলমান ধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের আত্ম-বিগ্রহই ভারতে াদেশিক অধিকার স্থাপনের প্রধান ত্র, ইতিহাস-পাঠক তাহা উত্তম- প জানেন। বারাণসী প্রদেশও নাজরাজ জয়চন্দ্রের শাসনাধীন ছিল। তিরৌরীর বিখ্যাত দ্ধে পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন—সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেনাপতি কুতবউদ্দিনও জয়চন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিলেন। জয়চন্দ্রের অগণিত সৈন্য—বারাণসীতে যবনাধিকার রোধ করিতে পারিল না। হৃদয়হীন কুতবউদ্দিন ও তাঁহার সহকারীরা বারাণসীর সহস্রাধিক দেবালয় ভাঙ্গিয়া দেন।

ইহার পর আকবর সাহের সময়, বারাণসীর অবস্থা অত্যন্ত উন্নত হয়। আকবর হিন্দুধর্ম্মের প্রধান রক্ষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে মির্জ্জা কলিজ নামক এক জন শান্ত প্রকৃতি সুবেদার বারাণসী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মির্জ্জা সাহেবের পর বুন্দীর সর্দ্দার রাজপুতকুলগৌরব রাও
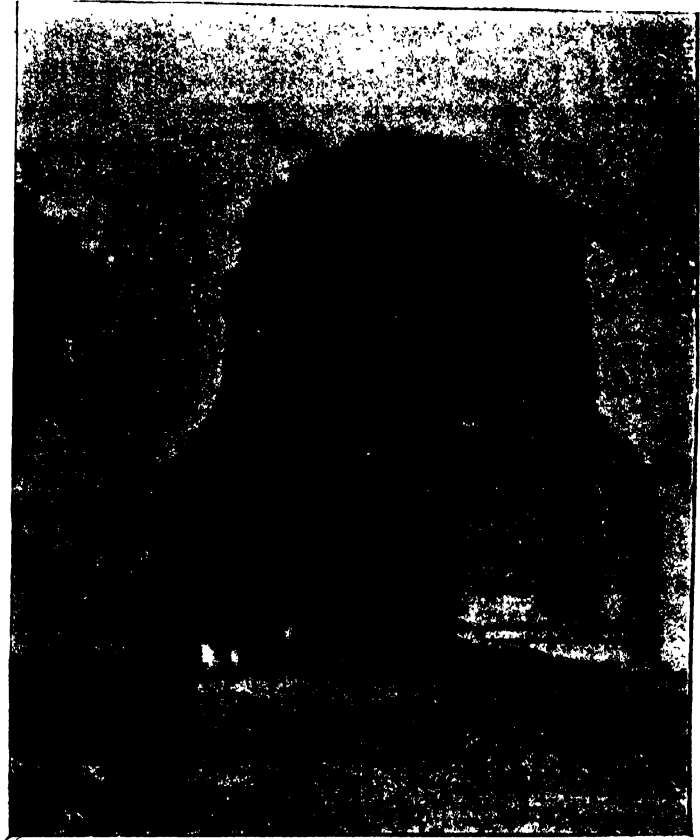
সারনাথ স্তূপ।

সজ্জন সিংহ বারাণসীর শাসনকর্ত্তা হন। রাও সাহেবের আমলে বারাণসীর হিন্দুগণ নিঃশঙ্কভাবে জীবন যাপন

করিয়াছিল। অনেক স্থানের বন জঙ্গল কাটাইয়া, রাও সজ্জন সিংহ, বিচিত্র মন্দির ও অন্নসত্রাদি সংস্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে জাহ্নবীর কূলে কয়েকটী প্রস্তরময় সুবৃহৎ ঘাটও নির্ম্মিত হয়। তাঁহার শাসনের কথা শুনিলে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। গুণ্ডাপ্রধান বারাণসীর রাজপথে পথিকেরা নিঃশঙ্ক চিত্তে বহু মূল্য দ্রব্যাদি লইয়া পড়িয়া থাকিলেও কেহ তাহা অপহরণ করিতে সাহসী হইত না।

বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের শাসন বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই—"বারাণসীতে ১৫০০ মন্দির, অগণ্য প্রাসাদ, বহুদূরব্যাপী অজগরবৎ বঙ্কিম রাজপথ, আর সেই বিস্তৃত রজেবর্ত্মের দুই পার্শ্বে বিপণিশ্রেণী। জাহাঙ্গীর বারাণসীকে তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে "মন্দিরময়ী নগরী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

তার পর সাহ জাহানের আমল। সাহজাহান বাদসাহ—দিল্লী আগরা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। বারাণসীর দিকে অতি অল্পই দৃষ্টি রাখিতেন। তবে তাঁহার সময়ে অনেক বিখ্যাত স্থপতি আগরায় সমবেত হওয়ায়, হিন্দু রাজন্যবর্গ ইহাদের সহায়তায় বারাণসীতে মন্দির ও দেউলাদি নির্ম্মাণ করিয়া লয়েন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের আমলে বারাণসীর যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। এই সময়ে ঔরঙ্গজেব, বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির, বেণীমাধবের মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করেন। বেণী মাধবের মন্দিরের বর্ত্তমান আকৃতি দেখিলেই পাঠক ঔরঙ্গজেবের কীর্ত্তির জলন্ত নিদর্শন পাইবেন। ঔরঙ্গজেব বারাণসীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "মহম্মদাবাদ" রাখেন।

দিল্লীর বাদসাহের প্রতাপ নাশের সঙ্গে সঙ্গে বারাণসী অযোধ্যার নবাব বংশের শাসনাধীন হয়। দিল্লীর হীনবল বাদসাহ মহম্মদ সাহ বারাণসীকে হিন্দু শাসনাধীন রাখিবার বাসনায়—১৭০০ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গাপুর গ্রামের জমীদার মনসারামকে রাজা উপাধি দিয়া বারাণসীর শাসনভার প্রদান করেন। মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিংহ—রামনগরে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া মহাপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। তখন বারাণসী অযোধ্যার শাসনাধীন ছিল। অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব ও দিল্লীশ্বরের উজীর সফ্‌দারজঙ্গ বলবন্তের প্রতাপবৃদ্ধিদর্শনে আশঙ্কিত হইয়া তাঁহার দমনে মনোযোগ করেন। কিন্তু বলবন্তকে তিনি কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। সফ্‌দারজঙ্গের পুত্র সুজা উদ্দৌলাও বলবন্তকে ক্ষমতাহীন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। যে সময়ে দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ আলি ও সুজা উদ্দৌলা, বাঙ্গলার নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিবার জন্য বাঙ্গলায় যুদ্ধ যাত্রা করেন, সে সময়ে রামনগর দুর্গাধিপতি বলবন্ত সিংহ বাঙ্গলার নবাবের বিশেষ সহায়তা করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ২৬ ডিসেম্বর দিল্লীর সাহ আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন। সুজা উদ্দৌলার সহিত সন্ধির পর কোম্পানি—১৭৬৬ খৃঃ অব্দে আবার বারাণসী অযোধ্যার নবাবকে ছাড়িয়া দেন। এই সময় হইতেই বলবন্ত সিংহ—ইংরাজের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে বলবন্ত সিংহ পরলোক গমন করেন। ইহার পর চেৎ সিংহ বলবন্তের উত্তরাধিকারী হন। চেৎ সিংহের সহিত হেষ্টিংসের বিগ্রহ ইতিহাসবিশ্রুত কাহিনী। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হইলে, বলবন্তের কন্যা হেষ্টিংস সাহেবকে জানান তাঁহার পুত্র মহীপ নারায়ণ রাজ্যের একমাত্র অধিকারী। হেষ্টিংস মহীপ নারায়ণকেই বারাণসীর রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। এই মহীপ নারায়ণের বংশধর মহারাজ শ্রীপ্রভু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর বারাণসীর বর্ত্তমান অধিপতি।

কাশীর পর পারেই রামনগরের রাজবাটী—দেখিবার জিনিস। বর্ত্তমান কাশী-নরেশ প্রভু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এখানে প্রায়ই অবস্থিতি করেন।

রামনগরে মহারাজের বাস ভবন অতি সুন্দর। ইংরাজী ধরণে তাহা সজ্জিত হইলেও তাহার মধ্যে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। নৌকা করিয়া রামনগরে যাইতে হয়। এ পারে কাশী—পর পারে রামনগর। রামনগরে রাজার হস্তীশালা, অশ্বশালা, রাজভবন প্রভৃতি দেখিবার যোগ্য।

সৃষ্টির বিশালত্ব।

(১)

বায়ুতে যেমন ধূলিকণা ভাসে, আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সেইরূপ অতি দীন ভাবে অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। এই সামান্য ধূলিকণার অধিবাসী আমরা।

ততটুকু ক্ষুদ্র কীট, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ামরা আজ যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, াহার বিশালতার উপলব্ধি করিবার পক্ষে আমাদের এই দ্রতা একটি মহৎ অন্তরায়। আমরা ক্ষুদ্রকে দেখিয়া হজেই বিস্মিত হই, কিন্তু বাস্তবিক যাহা মহৎ, তাহা ামাদের বিস্ময়ের অতীত। আমরা কতটুকু দীর্ঘ ময়ের ধারণা করিতে পারি? বড় অধিক নহে। আমাদের দ্র জীবনটুকু যে পরিমাণ কাল অধিকার করে, তাহাকেই ামরা ভাল করিয়া ভাবিতে পারি না। সহস্র বৎসর, লক্ষ ৎসর, কোটি বৎসর—এ সকল কালের কথা লেখা হজ, বলাও সহজ। কিন্তু একবার পরিষ্কাররূপে বুঝিতে ষ্টা করা যাউক, দেখি যে, কোটি বৎসর বলিলে বাস্তবিক তখানি সময়কে বুঝায়। তখন দেখিব যে, আমাদের রণা শক্তিতে কুলায় না।

সময় সম্বন্ধে যেরূপ, বস্তুর আয়তন সম্বন্ধেও সেইরূপ। জার মাইল কিম্বা কোটি মাইল বলিলে বাস্তবিক কতখানি া জিনিসটার কথা হইল, তাহার একটা পরিষ্কার ছবি ন আনিতে আমরা একেবারেই অক্ষম।

এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া অনন্তের পরিমাণ করিতে যাওয়া পেক্ষা কঞ্চিদ্বারা সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা অধিক লপ্রদ হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক ভগবান্ যদি তাঁহার হ্মাণ্ডকে খুব ছোট করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তবে বোধ হয় ামরা তাহার মহত্ত্ব এতদপেক্ষা সহজে বুঝিতে পারিতাম। হা হউক, সৃষ্টির বিশালতা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা ামাদের সাধ্যের অতীত হইলেও আমাদের প্রাণে তাহার বোধ লইবার জন্য অসীম আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। আমাদের ই পৃথিবীটা কি? চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, এ সকলই বা কি? াদের গতিবিধি এরূপ অদ্ভুত কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন াহাদের মনে উদয় হয় নাই এরূপ মানুষ অধিক জন্মিয়াছে না সন্দেহের বিষয়।

এ সকল প্রশ্ন সকল সময়েই মানুষের মনে উঠিয়াছে, বং তাহার তৎকালোচিত এক একটা মীমাংসারও ত্রুটি য় নাই। পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সুতরাং ইহার থা প্রথমে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পৃথিবী কাহাকে বলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, এই কথাটা অতি াচীন কাল হইতেই উঠিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখনকার লোকেরা ইহাকে কচ্ছপ, হস্তী এবং সর্পের হস্তে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। * এ কথা তাঁহাদের মনে হয় নাই যে, কচ্ছপের খোলা যতই মজবুত হউক না কেন, তাহারও একটা দাঁড়াইবার স্থানের দরকার হয়। বাস্তবিক এ প্রশ্নের শেষ নাই। পৃথিবী কোথায় আছে? সাপের মাথায়। সাপ কোথায় আছে? হাতীর ঘাড়ে। হাতী কোথায় আছে? কচ্ছপের পিঠে। আর কচ্ছপ কোথায় আছে? এ কথার উত্তর নাই। সুতরাং চিন্তাশীল লোকেরা দেখিলেন যে, শেষ কালে এক জনকে শূন্যে দাঁড়াইতেই হয়। তাহাই যদি হইল, তবে মাঝখানে এই তিনটা প্রাণীকে রাখিয়া এত ক্লেশ দেওয়া কেন? এ কাজটা পৃথিবী নিজে করিলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়!

কিন্তু জিনিসকে শূন্যে রাখিলে যে তাহা পড়িয়া গুঁড়া হইবে না, একথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? পৃথিবীকে যদি শূন্যে ছাড়িয়া দেও, তবে সে কি পড়িয়া যাইবে না?

এরূপ প্রশ্নকারীকে প্রাচীন কালের জ্যোতির্ব্বিদ আর একটি প্রশ্ন দিয়া নিরুত্তর করিয়াছিলেন।

"সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে?"

চারিদিকেই আকাশ সমান ভাবে রহিয়াছে, পৃথিবী কোথায় পড়িবে?

যাহা হউক, এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা এখানেই হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবস্থা আজ এতদূর উন্নত হইতে পারিত না। প্রাচীন কালের চিন্তাশীলগণ জিনিস পড়িয়া যাইবার কথাটা লইয়া অনেক ভাবিয়াছেন, কিন্তু জিনিস পড়ে কেন? এরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে আসে নাই।

প্রবাদ আছে যে, বৃক্ষ হইতে একটি ফল পড়িতে দেখিয়া মহাপণ্ডিত নিউটনের মনে প্রথমে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল; এবং সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া তিনি 'মাধ্যাকর্ষণ' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। †

* "তখনকার লোকেরা"—কখনকার লোকেরা? অতি প্রাচীন কালের লোকেরা কি? অতি প্রাচীন কালে বা বৈদিক কালে হস্তিকচ্ছপাদির কল্পনা ছিল না,—ঋগ্বেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও গোপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবী গোলাকৃতি ও নিরাধারা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য যুগে বা পৌরাণিককালে গজকচ্ছপাদির উদ্ভট কল্পনা আবিষ্কৃত হয়। তখন প্রাচীন আর্য্যপ্রতিভা বহুপরিমাণে মলিন হইয়া গিয়াছিল ও অজ্ঞতার রাজ্য ভারতে বিস্তৃত হইতেছিল।—প্রদীপ সম্পাদক।

† নিউটনের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করা-

বিধাতা জড় মাত্রকেই এই সাধারণ ধর্ম্ম দিয়াছেন যে, তাহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে। ইহারই নাম 'মাধ্যাকর্ষণ'। সামান্য ধূলিকণা হইতে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকলেই এই আদেশের অধীন। এই মুহূর্ত্তে যদি ভগবান্ তাঁহার এই আদেশ রহিত করেন, তবে মুহূর্ত্তেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। সূর্য্য তখন আর গ্রহগণকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। আমাদের পৃথিবী সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে; এবং আমরা সূর্য্যের উত্তাপ এবং আলোকের অভাবে ত্বরায় বিনষ্ট হইব।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলেই পৃথিবী কেন ছুটিয়া পলাইবে? আর মাধ্যাকর্ষণের যদি এতই প্রভাব, তবে আপাততঃ আমরা ঐ সূর্য্যে গিয়া পড়ি না কেন? সূর্য্য এবং পৃথিবী নিশ্চয়ই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; তবে কেন তাহারা ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হয় না?

দড়ির এক প্রান্তে পাথর বাঁধিয়া, সেই দড়ির অপর প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, ঐরূপ অবস্থায় পাথরটি দড়ি শুদ্ধ ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, এবং হঠাৎ দড়ি ছাড়িয়া দিলে বাস্তবিকই ছুটিয়া চলিয়া যায়।

জড়ের প্রতি পরমেশ্বরের অপর একটি আদেশ এই যে, তাহাকে একবার ঠেলিয়া দিলে সে ক্রমাগত সোজা পথেই চলিতে থাকিবে। অন্য কোন জিনিসের চারিদিকে তাহাকে ঘুরাইতে হইলে বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। সেরূপ বল প্রয়োগ সে কিছুতেই পছন্দ করে না, এবং সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার জন্য বিধিমত টানাটানি করে। দড়ি এবং প্রস্তরের এই দৃষ্টান্তই সে কথার প্রমাণ।

পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহা গণিতসিদ্ধ সত্য ঘটনা। ঐরূপ ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা সোজা পথে চলাটা যে পৃথিবী অধিক পছন্দ করে, একথাও সহজেই অনুমেয়। সুযোগ পাইলে যে সে অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন করিবে, তাহাতেও সন্দেহমাত্র নাই। তবে যে এত দিন সে এরূপ করে নাই, তাহার কারণ এই যে, মাধ্যাকর্ষণরূপ রজ্জু তাহাকে সূর্য্যের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এস্থলে পৃথিবী দুই শক্তির অধীন। একটি মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ইহা কেন্দ্রাভিসারিণী অর্থাৎ ইহাতে তাহাকে সূর্য্যের দিকে টানিয়া লইতে চাহে। অপরটি তাহার নিজের সরল পথানুসরণের প্রবৃত্তি। ইহা কেন্দ্রাপগামিনী অর্থাৎ ইহার প্ররোচনায় সে সূর্য্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে।

এই দুই শক্তির প্রভাবে আমাদের পৃথিবী যথেচ্ছা বিচরণ না করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাদের একটি অযথা প্রবল হইলে পৃথিবী তাহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে। অপরটির আধিক্য হইলে সূর্য্য তাহাকে টানিয়া লইয়া ভস্ম করিবে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপচুন প্রভৃতি গ্রহগণ, চন্দ্র প্রভৃতি উপগ্রহগণ, সৌরজগৎভুক্ত ধূমকেতু এবং উল্কাপুঞ্জ, সকলেই এই দুই নিয়মের বশীভূত হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং এই দুই নিয়মের গুণেই আপন আপন পথে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

বিধাতার আদেশ সৌরজগতের সীমার ভিতরেই আবদ্ধ নহে। এই আদেশ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শাসন করিতেছে। অসংখ্য সৌরজগৎ এই অমোঘ আজ্ঞার অধীন হইয়া বিচরণ করে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর এই যে দুইটি আদেশ বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই বিশ্বময় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজমান। আর্য্য ঋষি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন,—

"কো হ্যে বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

"এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

"কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন" "ইনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থ সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন।"

ইহা কি কেবলই কবির কল্পনা? না এ সকল কথার কোন প্রমাণ আছে? কেন্দ্রাভিসারিণী, কেন্দ্রাপগামিনী ইত্যাদি কথা শুনিতে ভালই শুনায়। কিন্তু এই সকল বাক্যের মূল্য কতটুকু? পণ্ডিতেরা কি কেবল অনুমানের উপরেই নির্ভর করিয়া এই দুইটী কথাকে এত বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, না বাস্তবিক ইহাদের কোন ভিত্তি আছে?

আর্য্যরা ভারতবর্ষে "মাধ্যাকর্ষণ" শক্তির বিষয় যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাহা উল্লিখিত হইলে ভাল হইত। প্রং সং।

এই কথাটার এ স্থলে কিঞ্চিৎ সমালোচনা হওয়া দর-কার। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ অসম্ভব; কেন না, মাধ্যাকর্ষণকে রজ্জুর ন্যায় চাক্ষুষ করিবার উপায় নাই।

মাধ্যাকর্ষণের তত্বানুসন্ধান গণিত শাস্ত্রের বিষয়; তাহার ভার আমরা পণ্ডিতদিগের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সুতরাং ইহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলেই আমাদের উপস্থিত কাজ চলিয়া যাইবে।

সর্ব্ব প্রথমে ইহার অস্তিত্ব শুদ্ধ অনুমান মাত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু সেই অনুমান অচিরেই পণ্ডিতগণের আস্থা লাভ করিল। গণিতবিদ্‌গণ অবিলম্বে ইহার প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধ্যাকর্ষণ যদি সত্য হয়, তবে ইহার অধীন হইয়া সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি কিরূপ হওয়া উচিত? আর বাস্তবিক উহারা ঐরূপ পদ্ধতিতে বিচরণ করে কি না, কেপ্লার্ লাপ্লাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেও এ বিষয়েরও আলোচনা করি-লেন। তাহাতে প্রমাণ হইল যে, জ্যোতিষ্কগণ মাধ্যাকর্ষণের বিধি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলে। ইহা অপেক্ষা এ বিষয়ের উৎকৃষ্টতর প্রমাণ অনাবশ্যক, কিন্তু তাহাও আছে।

হঠাৎ শুনিলে হেঁয়ালীর মত বোধ হইতে পারে, কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে, যে সকল স্থলে জ্যোতিষ্কগণ গণিতের হিসাব মানিয়া চলে নাই, অনেক সময় সেই সকল স্থলেই মাধ্যাকর্ষণের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বিষয়টা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

ইউরেনস্ গ্রহের যখন প্রথম আবিষ্কার হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাহারা গতি বিধি অতিশয় সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইউরেনস্ কিরূপ বেগে, কোন্ পথ ধরিয়া চলে, তাহা যত্নপূর্ব্বক গণিয়া স্থির করা হইল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইলে কোন্ সময়ে আকাশের ঠিক কোন্ স্থানে তাহার অবস্থিতি করা আবশ্যক, তাহারও হিসাব করিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে, ইউরেনস্ সকল সময় সে হিসাব মানিয়া চলে না। গণিত এবং মাধ্যাকর্ষণ তাহাকে যে স্থানে থাকিতে বলে, সে তাহার দুই এক পদ ব্যত্যয় করে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র কিছু কালের জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তবে কি মাধ্যাকর্ষণ মিথ্যা? না, এরূপ ঘটনার অন্য কোন কারণ আছে!

মাধ্যাকর্ষণ মিথ্যা হইতে পারে, একথা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। সুতরাং এরূপ ঘটনার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেকে বলিলেন যে "ইউরেনস্ যে দৃষ্টতঃ মাধ্যাকর্ষণ বিধির অবাধ্য হইতেছে, ইহার কারণও সেই মাধ্যাকর্ষণ! এমন কোন গ্রহ থাকা আশ্চর্য্য নহে, যাহার কথা লোকে এখনও জানিতে পারে নাই। ইউরেনসের পথ নির্দ্দেশ করিবার সময় তাহার উপর অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণের কথা ভাবিতে হইবে এবং সেই আকর্ষণের জন্য তাহার গতির কি পরিমাণ ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা, তাহাও হিসাব করিয়া স্থির করিতে হইবে। এখন কথা এই যে, এমন একটা গ্রহও ত থাকিতে পারে, যাহা ইউরেনসের নিকটবর্ত্তী, অথচ তাহার কথা না জানাতে তাহার কার্য্যের হিসাব হয় নাই। অর্থাৎ ইউরেনস্‌কে কোন অজ্ঞাত গ্রহ টানিয়া পথভ্রষ্ট করিতেছে; সেই গ্রহটীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই হিসাব মিলিয়া যাইবে।

যদি তাহাই হয়, তবে সে গ্রহ কিরূপ? সে কোথায় থাকে? সে কোন্ পথে চলে?

ইংলণ্ডে পণ্ডিত আডাম্‌স্, এবং ফ্রান্সে লাভেরিয়ে, উভয়ে প্রায় একই সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর বাহির করেন। নূতন গ্রহটিকে কোন্ সময়ে কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাঁহারা তাহারও গণনা দ্বারা স্থির করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া সেই নূতন গ্রহটিকে দেখিতে পাওয়া গেল। এই গ্রহটী এখন 'নেপ্-চুন নামে প্রসিদ্ধ।

যে অনুমানের সাহায্যে একটা গ্রহের আবিষ্কার হয়, তাহাকে নিতান্তই অনুমান বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। সুতরাং প্রথমে ইউরেনস্‌কে কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের উপরে যদি লোকের বিশ্বাস একগুণ কমিয়া থাকে, নেপচুনের আবিষ্কারের পর তাহা দশগুণ বাড়িয়া গেল। মাধ্যাকর্ষণকে এখন আর কেহ অনুমান বলিয়া মনে করেন না। পৃথিবীর মেরুতে কেহই এ পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই; সে স্থানটি কি প্রকার, তাহা আমরা

[illegible]। কিন্তু তথাপি এ কথা অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, সেখানে বায়ু আছে। সেইরূপ অকুতোভয়ে একথাও বলা যায় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের শাসনাধীন।

সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যেও যে মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই বা ততোধিক নক্ষত্র ঠিক পরস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া ঘুরিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম 'মৃগব্যাধ'। ইংরাজীতে ইহাকে Sirius কহে। ইহার উজ্জ্বলতার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৃষ্টি বারংবার ইহার উপর পতিত হয়। ইহাকে দেখিলে আপাততঃ স্থির বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই নক্ষত্রের একটা গতি আছে, তাহার পরিমাণ গড়ে মিনিটে প্রায় সহস্র মাইল। 'গড়ে' সহস্র মাইল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই গতির বেগ সকল সময় একরূপ থাকে না; তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। জড় বস্তুর এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা সে নিজের গতির কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। তাহাকে চালাইয়া দিলে সে সোজা পথে ঠিক সমান বেগে চলিতে থাকে; বক্রপথে চলিতে পারে না, বিনা বাধায় থামিতে পারে না, গতির বেগ বদলাইতেও পারে না। সুতরাং সিরিয়সের ঐরূপ লঘুমন্দ গতি স্বভাবতঃই আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। সেই আলোচনায় স্থির হইল যে, সিরিয়সের একটা প্রদক্ষিণকারী সঙ্গী আছে। সেই সঙ্গী যখন সিরিয়সের চারিদিকে ঘোরে, তখন এক একবার তাহার সম্মুখে তাহাকে আসিতে হয় এবং এক একবার পশ্চাতে পড়িতে হয়; সম্মুখ হইতে টানিলে সিরিয়সের গতি কিঞ্চিৎ বাড়ে; পশ্চাৎ হইতে টানিলে একটু কমে।

এইরূপ করিয়া সিরিয়সের এক সঙ্গী খাতায় জমা হইল। সেই সঙ্গী কখন সিরিয়সের কোন্ দিকে থাকিবে তাহারও একটা নির্ঘণ্ট হইল—কিন্তু তখনও সেই সঙ্গীটিকে কেহ দেখে নাই।

আমেরিকায় য়্যাল্‌ভান্ ক্লার্ক নামক অতি প্রসিদ্ধ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাতা আছেন। ইঁহারা পিতা পুত্রে মিলিয়া এই কার্য্য করেন। ১৮৬২ সালে ইঁহাদের কারখানায় একটি বড় দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হয়। কনিষ্ঠ ক্লার্ক ঐ দূরবীক্ষণের পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাকে সিরিয়সের অভিমুখে স্থাপন করেন। ঐরূপ করিবার কিঞ্চিৎ পরেই তিনি তাঁহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, ইহার যে একটা সঙ্গী আছে!" যে সঙ্গীটি প্রথমে কেবল পুস্তকেই ছিল, এত দিনে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া তৎ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের গণনা সপ্রমাণ করিল। ঐ সময়ে ঐ জ্যোতিষ্কটির যে স্থানে থাকিবার কথা খাতায় লেখা ছিল, কার্য্যতঃ দেখা গেল, যে সে ঠিক সেই স্থানে আছে।

অনেক স্থলে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে জ্যোতিষ্কগণের সম্বন্ধে এমন সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, যাহা অন্য উপায়ে জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আকাশে যে সকল গ্রহ বিচরণ করে, তাহাদের কোন্‌টার কত ওজন, এরূপ প্রশ্ন হঠাৎ শুনিলেই বড়ই অদ্ভুত বোধ হয়। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে এরূপ প্রশ্ন কেহ উত্থাপন করিলে তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে লোকের গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইত। কিন্তু এখনকার পণ্ডিতেরা ওরূপ প্রশ্নকে কিছুমাত্র কঠিন মনে করেন না। গ্রহ নক্ষত্র ওজন করা নিতান্তই আশ্চর্য্য ব্যাপার, এবং তাহা নিষ্পন্ন করিতে অতিশয় গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল প্রণালীটির কিঞ্চিৎ আভাস গ্রহণ খুব কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। একবার চেষ্টা করা যাউক।

এই স্থলে আর একবার সেই দড়িতে বাঁধা পাথরের দৃষ্টান্ত স্মরণ করা ভাল। পাথরটিকে যত তাড়াতাড়ি ঘুরান যায়, দড়িতে ততই বেশী টান পড়ে, এবং তখন দড়ি ছাড়িয়া দিলে পাথরটি ততই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। একটা আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া একটা জিনিসের চারি দিকে ঘুরিবার জন্য ঐ পাথরে কেন্দ্রাপগামিনী শক্তির সঞ্চার হইল; এবং সেই কারণে দড়িতে ঐরূপ টানের আমরা অনুভব করিলাম। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বুঝা গেল যে, পাথর যত তাড়াতাড়ি ঘোরে, তত জোরে টান পড়ে।

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সিরিয়সের সঙ্গীটির সাহায্যে সিরিয়সের ওজন ঠিক করা হইয়াছে। উক্ত সঙ্গী উনপঞ্চাশ বৎসরে একবার সিরিয়সকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূরে, সিরিয়স হইতে তাহার সঙ্গী তাহার প্রায় সাঁইত্রিশ গুণ দূরে।

সিরিয়সের সঙ্গী উনপঞ্চাশ বৎসরে একবার সিরিয়সের চারিদিকে ঘোরে। ইহার দরুণ যে পরিমাণে কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি উৎপন্ন হইতেছে, সিরিয়স্ তাহা পরাস্ত করিলে তবে ঐ সঙ্গীটিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন, নচেৎ সঙ্গী হাত ছাড়া হইয়া যায়। আবার বেশী জোরে টানিলেও মুস্কিল; কারণ তাহা হইলে সঙ্গী আসিয়া ঘাড়ে পড়িবে।

সুতরাং এবিষয়টিই সিরিয়সকে ওজন করিবার তুলা দণ্ড। এই ঘটনার উপর মাধ্যাকর্ষণের সূত্র প্রয়োগ করিলেই সিরিয়সের ওজন বাহির হইবে। এই ওজনের বাটখারা—আমাদের সূর্য্য। অর্থাৎ সিরিয়সে আমাদের সূর্য্যের কয়টার মতন বস্তু আছে, এই ঘটনা হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিব।

সূর্য্যের চারিদিকে যে গ্রহগুলি ঘোরে, তাহারা নিজের সুবিধামত যত খুসী দূরে থাকিয়া যেমন ইচ্ছা ছুটিয়া চলিতে পারে না। ওরূপ করিলে যে কাজ চলিবে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, ভয়ানক বেগে ঘুরিলে শেষটা একেবারেই ছুটিয়া পালাইবার, আর যথেষ্ট বেগে না ছুটিতে পারিলে সূর্য্যের উপরে গিয়া পড়িবার, ভয় আছে। ইহার উপর আবার, মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য কাছের জিনিসের উপরে যত প্রবল, দূরের জিনিসের উপরে তত নহে। সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত দূরে, সূর্য্যের আকর্ষণ তাহার উপর তত কম, সুতরাং ঐ গ্রহের যদি সূর্য্যের সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাকে নিজের বেগ সংযত করিয়া লইতে হয়। সূর্য্যের পরিবারভুক্ত যত জন আছেন, তাঁহাদের কেহই এই নিয়মের এক চুল অবাধ্য হইতে সাহস করেন না। বাস্তবিক গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি এতই অটল যে, তাহার সহিত তুলনা করিবার দৃষ্টান্ত জগতে আর নাই। এই জন্যই ইঁহাদের গতির সঙ্গে মিলাইয়া ঘড়ী ঠিক করা হয়।

সে যাহা হউক, সূর্য্যের চারিদিকে যাহারা ঘোরে, তাহাদের প্রত্যেকের দূরত্ব অনুসারে এক একটা বেগের হিসাব বাঁধা আছে। সূর্য্য হইতে কোন্ গ্রহটা কতদূরে আছে, ইহা জানিতে পারিলেই বলিয়া দেওয়া যায় যে, তাকে ঠিক এতখানি বেগে ঘুরিতে হইবে। পক্ষান্তরে, সূর্য্যের একটা অনুচরকে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিতে দেখা যায়, তবে আর একথা জানিতে বাকি থাকে না যে, সে সূর্য্য হইতে কতখানি দূরে?

সিরিয়সের সঙ্গী সিরিয়স্ হইতে যত দূরে, সূর্য্যের যদি ঠিক ততখানি দূরবর্ত্তী একটা সঙ্গী থাকিত, তবে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে তাহার ২২৫ বৎসর লাগিত। এই ২২৫ বৎসরের কাজ সিরিয়সের সঙ্গী উনপঞ্চাশ বৎসরেই শেষ করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহার বেগ এবং তদুৎপন্ন কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি কত বেশী; আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সিরিয়সের কত খানি বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। আমাদের সূর্য্যের ন্যায় কুড়িটা সূর্য্য একত্র না করিলে এত শক্তির সংগ্রহ হয় না। সিরিয়স আমাদের কুড়িটা সূর্য্যের সমান ভারি। আবার দেখুন, উহার সঙ্গীটা উহা হইতে এত দূরে থাকিয়াও ত উহাকে কম ব্যস্ত করে না! সুতরাং সেই সঙ্গীটাও যে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯২৭০০০০০ নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে এবং সিরিয়স্ এই বিশাল দূরত্বেরও অন্ততঃ দশ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত। সে মিনিটে হাজার মাইল ছুটিতেছে, তথাপি তাহাকে আমরা সাধারণ চক্ষে স্থিরই দেখিতেছি, ইহাও তাহার দূরত্বের আর একটি নিদর্শন! আর সেই খানে থাকিয়া তাহার সঙ্গী যে এতটা টানাটানি করিতেছে, এই খানে থাকিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তারা তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। এ বড় সামান্য কর্ম্ম নহে! আমাদের গ্রহগুলির ত এত ক্ষমতা নাই;—আমাদের সূর্য্যেরও তাহা নাই! সিরিয়সের ঐ সঙ্গীটি সাতটি সূর্য্যের সমান বড়!

এত বড় জিনিসটাকে দেখিতে প্রথমে এত কষ্ট হইবার কারণ এই যে, উহার উজ্জ্বলতা নিতান্তই কম। জিনিসটা সাতটা সূর্য্যের ন্যায় বড় বটে, কিন্তু উহার উজ্জ্বলতা সূর্য্যের একশত ভাগের একভাগও হইবে না।

সিরিয়সের আরো সঙ্গী আছে কিনা, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। একটি সঙ্গী যে আছে, তাহা দেখা গেল। অতঃপর একথা মনে করা কি স্বাভাবিক নহে যে, আমাদের এই ক্ষীণপ্রাণ সূর্য্যটির অধীনে যতগুলি প্রজা আছে, তাহা অপেক্ষা কুড়িগুণ বৃহৎ সূর্য্যের অধীনে তদপেক্ষা অনেক বেশী আছে? আমাদের সূর্য্যকে সিরিয়সের নিকটে লইয়া গেলে তাহার কি দশা হইত? আমরা কি তখন তাহার এই সকল অনুচরকে দেখিতে পাইতাম? বলা বাহুল্য কখনই না। সূর্য্যকেই হয়ত অতি কষ্টে দেখিতে পাইতাম, কারণ সে

অতিশয় উজ্জল। ওরূপ উজ্জল না হইলে তাহাকেও দেখা যাইত না, অন্য গ্রহগণের কথা আর কি বলিব।

কিন্তু বাস্তবিক অবস্থাটা যেরূপ হইত, এ কথায় তাহা পরিষ্কার বুঝা গেলনা। 'সূর্য্য অথবা গ্রহগণকে দেখা যাইত না' ইহাত তেমন একটা বিস্ময়কর কথা নহে। সূর্য্য উজ্জল বটে, কিন্তু আসলে জিনিসটা অনন্ত আকাশের হিসাবে নিতান্তই ছোট। এমন কি, এই সৌর জগৎটাই যে কতটুকু ক্ষুদ্র জিনিস, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। একবার একটু হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝা যইবে।

যে জিনিস যত লম্বা চওড়া তাহার পাঁচ হাজার গুণ দূরে লইয়া গেলে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, একথা পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য জিনিসটি যদি জ্যোতিষ্মান্ হয়, তবে আমরা ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী দূর হইতেও তাহার জ্যোতিঃ দেখিতে পাই; কিন্তু আসল জিনিসটাকে তাহার আয়তনের পাঁচ হাজার গুণ দূর হইতে দেখা যায় না। এই হিসাবে ধরিলে এক ফুট লম্বা চওড়া একটা জিনিস এক মাইল দূরে গেলে অদৃশ্য হইয়া যায়; চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে মন্দিরটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। চারি কোটি মাইল দূর হইতে পৃথিবী অদৃশ্য হয়। চারি শত পঁচিশ কোটি মাইল দূর হইতে সূর্য্য এবং তৎসহ সৌর-জগৎটা অদৃশ্য হয়। সমস্ত সৌরজগৎটাকে যদি একটা বিশাল হাঁড়ির ভিতরে পোরা যাইত, তবে সেটা নাজানি কত বড় মস্ত হাঁড়ি হইত। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে, তাহাও দুই পদ্ম, আটাত্তর নিখর্ব্ব, মাইল দূরে থাকিলে অদৃশ্য হইয়া যায়। কথাটা যে নিতান্ত সামান্য হইল না, সৌরজগতের গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়।

গৌতম আশ্রম।*

Art, glory, freedom fail, but Nature still is fair!
Byron

হেথা কিছু নাহি পুরাতন—
শ্যামল প্রান্তর নিরজন!
নাহিক পাষাণ-স্তূপ
কালজয়ী অপরূপ,
যুগান্তের হর্ম্মারাজি, শিলায় লিখন।
কেবল আকাশে বসি'
পুরাণো সে রবি শশী
নবীন জগতে করে আলো বিতরণ।
আর ধরণীর বুকে
মুরছি' মনের দুখে
'সরযূ পাতকী' শুধু পড়ি অচেতন।
ইহাই কি পরিণাম—
ভারতে পবিত্র ধাম,
মহামুনি গৌতমের পুণ্য তপোবন!
এই কি সে স্থল হায়!
জগত বিহ্বলপ্রায়
শুনিল প্রথমে যথা ন্যায় দরশন!
এই সরযুর তীরে
নামিয়া আসিত ধীরে
নিশি দিন অহল্যার চকিত চরণ;
তটিনীর স্বচ্ছ গায়
সুন্দরী মুকুর-প্রায়
হেরিত লাবণ্যরাশি, অতুল যৌবন।
নিরুপম শোভা মাঝে
প্রকৃতির হেন সাজে
মোহিল কি বিরাগিনী তাপসীর মন!
তেয়াগি' বিভূতি হায়!
কালিমা লেপিয়া গায়
অবহেলে কুলমান দিলা বিসর্জ্জন।
সে ঘোর কলঙ্ক কথা
আজ (ও) বুঝি তরুলতা
রাখিয়াছে অঙ্গে হেথা করিয়া লেপন!
আজ (ও) নভ-নীলিমায়
সে গান ভাসিয়া যায়—
পাপিয়ার কলকণ্ঠে, কোকিল কূজন!
একদিন এই পথে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সাথে
ভাঙ্গিবারে হর ধনু করিলা গমন;

---

* আধুনিক ছাপরা সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও এ অঞ্চলে 'গোদ্‌না' নামে প্রসিদ্ধ।

পুণ্য রঘুকুল-সুত
চরণ কমল-পূত
আজিও ভারতে খ্যাত এ বন ভবন।
উঠিয়া উষার সনে,
এই স্থানে এক মনে,
সরযুর কলস্বনে মিলাইয়া তান—
মুনির বালক সবে
সুমধুর উচ্চ রবে
শুনাইত প্রতিদিন সামবেদ গান।
এবে সে কোথায় সব ?
সলিল প্রবাহ রব—
ধ্বনিত আজিও হায় এ মহাশ্মশান!
কোথা সে অক্ষয় কীর্ত্তি ?
পাষাণের প্রতিমূর্ত্তি—
শেষ চিহ্ন পড়ি' হেথা পুণ্য জনস্থান!

শ্রীমন্মথনাথ দে বি, এল্.

বর্ষশেষ।

বরষের আজি শেষ দিন!
সুদীর্ঘ জীবন-পথ,
বহি' আসিয়াছ কত,
দেখ দেখি একবার হে পান্থ নবীন।
বরষের আজি শেষ দিন।

কোথা তব শৈশব সরল ?
প্রভাতের স্নিগ্ধ ফুল,
আজি মাখা মাটী ধূল,
মরু-মারুতের তাপে মলিন-বিকল,
কোথা তব শৈশব সরল ?

শ্বেত-স্বচ্ছ হৃদয় তোমার—
দেখ দেখি, মসীরাগ,
কত চিহ্ন—কত দাগ,
কত মলা ধরিয়াছে—সীমা নাহি তার!
শ্বেত-স্বচ্ছ হৃদয় তোমার!

পড়ে মনে কত স্নেহ মুখ!
কত করুণার ছবি,
কত আঁধারের রবি,
গেছে চলি অস্তাচলে, পিছে রেখে দুখ,
পড়ে মনে কত স্নেহ-মুখ।

বুকভরা স্নেহ-প্রেম-রাশি!
আছে কতখানি তার,
দেখ দেখি, একবার,
কত বা গিয়াছে তার কালস্রোতে ভাসি'।
বুকভরা স্নেহ প্রেম রাশি।

হৃদয়ের সখা কত জন!
এবে কোথা গেল তারা,
সুখে দুখে আত্মহারা,
জীবনের সহযাত্রী কোথায় এখন ?
হৃদয়ের সখা কত জন!

বরষের আজি শেষ দিন!
অই ডুবিতেছে রবি,
দিনের করুণ ছবি,
আধ ধরা পানে চেয়ে বিষাদ-মলিন!
বরষের আজি শেষ দিন!

ম্লানমুখী সন্ধ্যা নামে ধীরে!
সুপ্তি শান্তি বরষিয়া—
স্নেহের অঞ্চল দিয়া—
ঢেকে দিবে দয়াময়ী তাপিত প্রাণীরে!
ম্লানমুখী সন্ধ্যা নামে ধীরে!

খসাইয়া করের কুঠার!
দিবে মুছে রাগ দ্বেষ,
হিংসা অহঙ্কার লেশ,
পর-গ্লানি পর-নিন্দা নিষ্ঠুর আচার!
খসাইয়া করের কুঠার!

ওগো, সন্ধ্যে ভুলাইয়ে ভেদ—
দে মা দয়া,—দে মা শান্তি,

দে মা সুখ—দে মা শান্তি,
মুছে দে মা, হৃদয়ের পাপ-তাপ-ক্লেদ !
ওগো সন্ধ্যে ভুলাইয়ে ভেদ !

শত্রু মিত্র নহে চির দিন ;—
সুখ দুখ, আগে-পিছে,
চক্র মত ঘুরিতেছে,
এক যায় আর আসে নিয়ম অধীন !
শত্রু মিত্র নহে চির দিন।

শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিসম্বাদ—
কত লঘু—কত ক্ষীণ,
দেখি, বুঝি অনুদিন,
তবু মানবের কেন মিটে না'ক সাধ !
শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিসম্বাদ !

ভুল তবে আজিকার মত !
ক্ষুদ্র স্বার্থ অভিমান,
ভেঙ্গে কর খান্ খান্,
শুভাশুভ লয়ে দেখ অই বর্ষ গত।
ভুল তবে আজিকার মত।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সাহজাহানের দৈনিক জীবন।

গুশলখানা।

(২)

দেওয়ান আমের কার্য্য শেষ হইবার পর, বাদসা গুশলখানায় প্রবেশ করিতেন। ইহার অপর নাম ছিল—"দেওয়ান—খানে—খাস," বা সোজা কথায় দেওয়ান খাস। দেওয়ান খাসের একখানি চিত্র প্রদীপের এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। গুশলখানার অভিধান-প্রচলিত অর্থ স্নানাগার। কিন্তু এখানে তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। গুশলখানা, প্রকৃত পক্ষে গোপনীয় বিশ্রামগৃহ। আম দরবারে বাদসাহ অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন—সে ক্লান্তি এই গুশলখানায় দুর হইত। এই গুশলখানায় একখানি সিংহাসন থাকিত। বাদসাহ আসিয়া সেই সিংহাসনে বসিতেন। এখানেও প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের আবশ্যক কার্য্যাদির সমাধা করা হইত। যে সকল কাজ অত্যন্ত জরুরি, সেইগুলি এই সময়ে বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। গুশলখানায় বিশেষ অনুগৃহীত রাজমন্ত্রীরাই থাকিতেন।

ভারতের নানা প্রদেশের পরাক্রান্ত ওমরাহ ও দেশাধিপতিগণ যে সমস্ত আরজী এবং অভিনন্দনপত্র বাদসার নামে প্রেরণ করিতেন, তাহাতে রাজ্য সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় কথা থাকিত। বাদসাহ সেগুলির শীলমোহর ভাঙ্গা হইলে—নিজ হস্তে লইয়া পাঠ করিতেন। রাজ্য সংক্রান্ত যত সাধারণ চিঠি পত্র আসিত—তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে বাদসাহের নিকট উপস্থিত করা হইত। যে গুলি গোপনীয় ও বিশেষ জরুরি, সেগুলির কোন অংশই পরিত্যক্ত হইত না। অনেক দরখাস্তের,—অভিনন্দনপত্রের বা আর্জীর উপর সম্রাট নিজ হস্তে হুকুম প্রদান করিতেন। সেকস্তা, নস্তালিক প্রভৃতি বিবিধ অক্ষরে স্বীয় রুচি ও ইচ্ছানুসারে এই সকল হুকুম লিখিয়া বাদশাহ অর্থী প্রত্যর্থীদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেন। সাধারণতঃ দ্রুতলেখক সুদক্ষ মুন্সীরা তাঁহার বজ্র নির্ঘোষ আদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। মুন্সীরা অতি সাবধানে কার্য্য করিতেন। সাহানাসার আদেশগুলি লেখা হইলে তাহা তাঁহারা পুনরায় আবৃত্তি করিয়া বাদশাহকে শুনাইতেন। কাহারও কোনরূপ ত্রুটি ঘটিলে যথেষ্ট লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইত। মুন্সীদিগের সতর্ক দৃষ্টি লেখার দিকে থাকিলেও, কর্ণদ্বয় অতি সাবধানতার সহিত সম্রাটের আদেশবাণী শ্রবণের জন্য প্রস্তুত থাকিত।

মোগল সম্রাটের অধীনতায় অনেক আশ্রিত, করদাতা রাজা ও জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব, এই গুশলখানায় পঠিত হইত। "জেকাৎ" "তন্‌খা" প্রভৃতি আদায়ের সম্বন্ধে নানাবিধ আদেশ প্রচারিত হইত। যাহাতে সওদাগর, ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীরা নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে পারে, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের উপর কোনরূপ জবরদস্তি না করেন, তৎসম্বন্ধে আদেশও এইখানে দেওয়া হইত। যদি কোন আমিলদারের শাসনাধীন প্রদেশে, কোন ব্যবসায়ী

দেওয়ান খাস (অন্তর্দৃশ্য)।
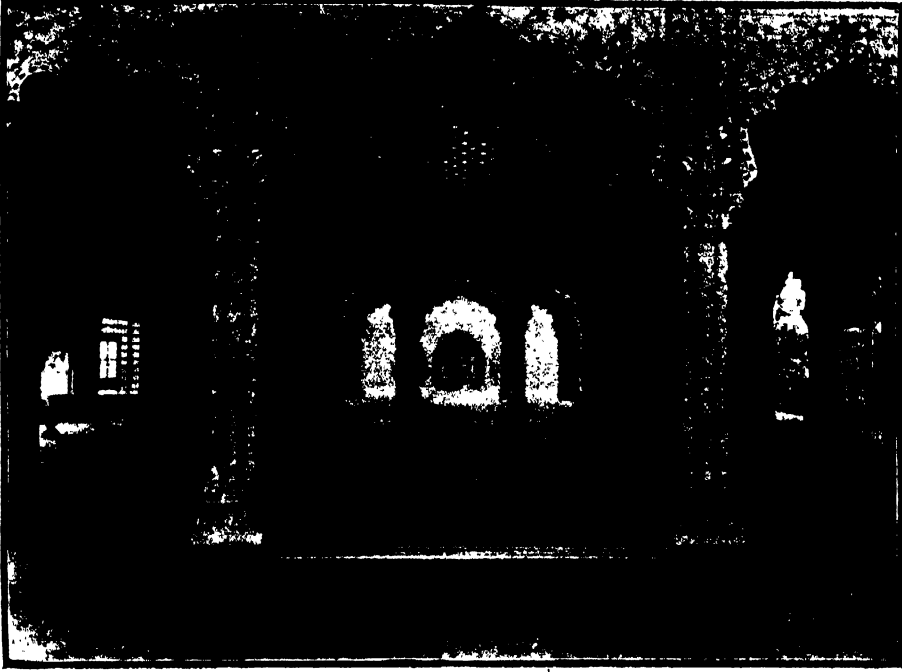
কোন দ্রব্য অপহৃত হইত, তাহা হইলে তাহার আরজী দরবারে পৌঁছিত। বাদসাহের আদেশে আমিলদার—ব্যবসায়ীর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেন ও কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগের জন্য সরকার হইতে তাঁহার অর্থ দণ্ড হইত।

গুশলখানায় রাজ্যের ও ব্যবসায়ীদের হিতার্থে আরও অনেক কার্য্যের সূচনা হইত। সেগুলিরও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। হীরকের যত প্রকার কাজ হইতে পারে, বস্ত্রাদির উপর সোণা মতির যতদূর কাজ হইতে পারে—প্রত্যেক সুবা হইতে তাহার উৎকৃষ্ট নমুনা ব্যবসায়ীরা রাজধানীতে পাঠাইয়া দিতেন। বাদসাহ তাহাদের প্রত্যেকগুলি সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কোনটী কি হইলে ভাল হইবে—কোন স্থানে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ লিখিয়া রাখিতে আদেশ করিতেন। যেগুলি পছন্দ হইত, সেগুলি রাজভাণ্ডারে রক্ষিত হইত। এতৎসম্বন্ধে সমস্ত আদেশ, শিল্পকার ও ব্যবসায়ীরা যথাসময়ে সদর সুবাঁর নিকট হইতে জানিতে পারিত। এই গুশলখানার এক স্থানে রাজকীয় পাঠাগার হইতে গ্রন্থকারগণের স্বহস্তে লিখিত পুস্তকাদি আনীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইত। সেকস্তা, নস্তালিক প্রভৃতি বিবিধ শিল্পকলাময় অক্ষরে সুচিত্রিত গ্রন্থসমূহ উপযুক্ত হইলে বাদসাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার সময়ে ইয়াকুৎ, সারেফী, মোল্লা মীর আলি, সুলতান আলি মীর আম্মদ, মোল্লা দরবেশ প্রভৃতি সিদ্ধহস্ত লিপিকুশল লেখকগণের সুন্দর হস্তাক্ষরে রঞ্জিত নানাবিষয়িণী গ্রন্থাবলী বাদসাহের মনোরঞ্জনের জন্য প্রেরিত হইত। মনি, রেজাদ, নাদির উল্ জামান্ প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকরগণের হস্তপ্রসূত, মনোহর চিত্রাদিও, এই সময়ে সম্রাটের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই গুশলখানায় বাদসাহের ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনাদি হইত। কূট তর্কযুক্ত বিষয়সমূহ দিল্লীশ্বর নিজে সকলকে সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। রাজকবি ও ভট্টগণ এই সময়ে বন্দনা ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া গুণানুসারে পুরস্কার লাভ

করিত। হাকিম, হিন্দু ভিষক্ ও ইয়াণী চিকিৎসকগণ এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের নূতন তথ্যগুলি বাদসাহের কর্ণগোচর করিতে আদিষ্ট হইতেন। জ্যোতির্ব্বিদ গ্রহাচার্য্যগণ এই সময়ে সম্রাটের সমীপে আপনাদের গুণ-পণা প্রকাশ করিতেন। অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত এই সময়ে স্ব স্ব অধীত ও আলোচ্য বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া পুরস্কার লাভ করিতেন। শেলেখানার, তোপখানার কর্ম্মচারিগণ এই সময়ে আপনাদের অধীন কর্ম্মকারকের প্রস্তুত রত্নখচিত, অসি, বর্ম্ম, চর্ম্ম, বন্দুক প্রভৃতি বাদসাহের দর্শনের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট বীর পুরু-ষেরা উপস্থিত থাকিয়া এই সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রের কার্য্য-শক্তি পরীক্ষা করিত। এই গুশলখানায় স্বর্ণখচিত রজ্জুসংলগ্ন স্বর্ণময় ঘণ্টা দোদুল্যমান থাকিত। এই ঘণ্টার রজ্জু বাহিরের রাজদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সামান্য প্রজা বিচারার্থী হইয়া এই ঘণ্টার রজ্জু আকর্ষণ করিলে দুনিয়ার অধীশ্বর তাহা বুঝিতে পারিতেন ও তৎসম্বন্ধে যথাযথ আদেশ প্রদান করিতন। রাজকার্য্যাবসানে কলাবৎ (পুরুষগায়ক) তওয়া এফ্ (ধর্ম্মসঙ্গীতগায়িকা) প্রভৃতি আহুত হইত। অতি অল্প ক্ষণেই সেই মন্ত্রণাগার বিচিত্র মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত।

বিচারের জন্য আইনজ্ঞ বিচারক সমূহ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু বাদসাহ সকল প্রকার অভিযোগ স্বকর্ণে শুনিবার জন্য সপ্তাহে একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই দিন তিনি সিংহাসনে আসীন হইয়া প্রত্যেক বাদী প্রতিবাদীর আরজী স্বকর্ণে শুনিতেন। এই দিনে ছিন্নকন্থা দরিদ্র হইতে কৌষের পরিহিত আমীর ওমরাহ পর্য্যন্ত সকলই সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হইতে পারিত। অপরাধীরা বজ্রনির্ঘোষবৎ কঠোর রাজাদেশ শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। দণ্ডিত অপরাধী ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, সাহানসা অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিতেন। তাহারা জয়োচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে বাদসাহ মৃগয়া প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দূরতর স্থানে যাইতেন। সে সময়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট, জনপূর্ণ গ্রামের মধ্যে তাঁহার শিবির স্থাপিত হইত। কেবল মৃগয়ার আনন্দ নহে, সাধারণ প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দেখাও এই মৃগয়া যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্যছিল। যখন বাদসাহ সফরে বাহির হইতেন —তখন অতি দীন দরিদ্র প্রজা হইতে মহাপরাক্রান্ত আমীর পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আরজী পেশ করিত।

মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত বাদসাহ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকি-তেন। সূর্য্যকিরণ প্রখর হইয়া উঠিলে দামামা ধ্বনি দ্বারা বাদসাহের অন্তঃপুর-প্রবেশবার্ত্তা বিঘোষিত হইত। বাদ-সাহ হারেমসরাই (অন্দর মহলে) প্রবেশ করিয়া আরাম বোধ করিতেন। এই স্থানে তাঁহার আহারের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত থাকিত। প্রধানা মহিষীরা সযত্নে তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া দিতেন। স্বর্ণখচিত বস্ত্রাবরণের উপর সমস্ত সুবা হইতে সংগৃহীত—রসনার তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি, কাশ্মীর হইতে আনীত সুবাসিত তুষার বারি, নানা-বিধ ফল মূল ও পলান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি স্তরে স্তরে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে, তাঁহার জন্য রক্ষিত হইত। সুন্দরী ব্যজনকারিণীরা মুক্তা খচিত স্বর্ণাভ ব্যজন লইয়া স্বর্ণকক্ষবৎ আহার গৃহে বাদসাহের সেবার নিযুক্ত হইত। সমস্ত আহার দ্রব্য লোহিত মখমলে আবৃত থাকিত। পিতা-মহের গৌরবান্বিত নিয়মানুসারে, বাদসাহ সেই আস্তরণ খুলিয়া বিবিধ মুখরোচক খাদ্যের প্রতি একবার সহাস্য দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার একাংশ অভুক্ত দরি-দ্রের, ও অপরাংশ, তাঁহার সভাসদ বর্গের ও অন্তঃপুরিকা-দিগের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজের শরীর পোষণার্থ গ্রহণ করিতেন। আকবর সাহের ন্যায়—তিনি ফলমূলা-দির প্রতি অতি অনুরক্ত ছিলেন। আহার কার্য্য সমাপ্ত হইলে দরিদ্রদিগের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজবাহকেরা বাহিরে পৌঁছাইয়া দিত। তাহা প্রতিদিন নিয়মিত রূপে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হইত। অন্তঃপুরিকাদের ভাগ—প্রত্যেক বেগমের গৃহে প্রেরিত হইত। সকলে রাজপ্রসাদ অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেন। যখন বাদসাহ তাঁহার আমীর ওমরাহ ও রাজকুমারগণের সহিত একত্র ভোজন করিবার ইচ্ছা করিতেন, তখন বহিঃকক্ষস্থ কোন গৃহে তাহার আয়োজন হইত। এরূপ আয়োজন বাদসাহের ইচ্ছা বা মরজির উপর, অথবা কোন উৎসব পর্ব্বাদির উপর নির্ভর করিত।

দেওয়ান খাসের নিভৃত পুষ্পসজ্জিত কক্ষে, স্বর্ণ খট্টার সুবর্ণাস্তরণমণ্ডিত শয্যায় সুকোমল উপাধানে

মস্তক স্থাপন করিয়া বাদসাহ নিদ্রিত হইতেন। তাঁহার নিদ্রার সময়ও নির্দ্দিষ্ট ছিল; ঠিক সেই সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। যে দিন ঘটনা ক্রমে, বা রাজকার্য্য-জনিত ক্লান্তিবশে, নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, সে দিন পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে, সুমধুর বাদ্যনিক্বণে অথবা কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতের সহায়তায় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা হইত। নিদ্রা ভঙ্গের পর সুবাসিত বারিতে মুখ প্রক্ষালন করিয়া, বাদসাহ দিনান্তের ঈশ্বরোপাসনায় ব্রতী হইতেন। তিনি একাকী সেই নিভৃত প্রাসাদ কক্ষের মর্ম্মর ফলকাস্তরণে বসিয়া দিলীশ্বরঃ খোদা আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া শুদ্ধ চিত্ত হইতেন। প্রার্থনা শেষ হইলে দেওয়ান খাস-সংলগ্ন একটি বহিঃকক্ষে, খাদ্যাদির আয়োজন হইত। এই স্থানে অনেক আমীর ওমরাহ ও রাজকুমারগণ উপস্থিত থাকিতেন। বাদসাহের পার্শ্বে রাজকুমার এবং সম্মুখে পদস্থ উজীর ও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ বসিতেন। বাদসাহ স্বহস্তে সকলকে আহার্য্য দ্রব্য তুলিয়া দিতেন।

দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার সেই দেবলোক-সদৃশ প্রাসাদতলকে নিমজ্জিত করিত, তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে নানাবিধ দীপাবলী প্রজ্জ্বলিত হইয়া সে অন্ধকারকে বিনাশ করিত। প্রতি কক্ষ সুগন্ধি দীপাবলী, সুগ্রথিত পুষ্পমাল্যে ও পুষ্পস্তবকে শোভিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইত। দুর্গদ্বারে সন্ধ্যার সময় নহবৎ বাজিয়া উঠিত। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বাদসাহ উন্মুক্ত ছাদে উঠিয়া আজ্জান দিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত হইতেন। তাহার পর পুনরায় গুশলখানার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিতেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুমার নবীন কিশোর গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর থিয়েটার নামক কল্পপাদকের একটি শাখা তাঁহার বাসস্থান স্বরূপপুর গ্রামে প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মাটির দোষে তাহা বিষ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীমান্ নবীন কিশোর বাহাদুর জমীদারের সন্তান, বিবাহ সত্বেও তিনি কুমার নামে অভিহিত হইতেন। তাহার পিতা রাজা ছিলেন না, তথাপি ভক্ত প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে রাজস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, নবীন কিশোরকে 'কুমার' বলিত। অর্থ পণ্যে তাঁহাকে এই খেতাব ক্রয় করিতে হয় নাই, তাঁহার সেরূপ উচ্চাভিলাষও ছিল না।

ভদ্র লোকের সহিত মিশিবার অবসর কুমার বাহাদুরের বড় অল্প ছিল। কারণ সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ধারণা ছিল, ভদ্রলোকদের ধারণা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তদ্ভিন্ন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করা তিনি তাঁহার 'পজিসনের' পক্ষে অত্যন্ত বাহুল্য মনে করিতেন। শৈশবে ও যৌবনে তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ভদ্রতার সহিত তাহার কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না।

নবীন কিশোর শৈশবে মাতৃহীন হন, তাঁহার পিতা চন্দ্রকিশোর বাবু একমাত্র পুত্রকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পিণ্ড-দানের যোগ্য পাত্র বিবেচনা না করিয়া 'পুত্র পিণ্ড-প্রয়োজনার্থ' দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ পিণ্ডদাতার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বিধাতা তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিলেন। অতঃপর নবীন কিশোর পিসিমার রাজত্বে বাস করিতে লাগিল। তখন তাহার বয়স বার বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর নবীন কিশোরের নিকট বিশ্ব সংসারটা নিতান্ত অন্ধকারময় বোধ হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিনের অভিজ্ঞতাতেই সে বুঝিতে পারিল, এ জগৎ বিধাতা বড় অপরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্রমে এই পৃথিবী তাহার নিকট স্বর্গের ন্যায় মনোরম বোধ হইতে লাগিল। তাহার সহচরবর্গ ক্রমে তাহাকে সকল স্বর্গে ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার পঁচিশ বৎসর বয়সেই দুর্লঙ্ঘ্য কামনা পাড়ি জমাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, আশার পার নাই। তাই সহসা এক নব বসন্তের আম্র মুকুল গন্ধামোদিত প্রভাতে স্বরূপপুরের ফুলবাগানে এক খানি পালঙ্কে শয়ন করিয়া বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতে করিতে নবীন কিশোর বলিলেন, "মালিনী মাসি!"

"কেন গো বোন পো?" বলিয়া কক্ষান্তর হইতে এক গৌর বর্ণ যুবক বাহির হইয়া আসিলেন। ইনি নবীন কিশোরের মাতৃস্বসারপুত্র বলরাম, নামে নবীন কিশোরের প্রাইভেট সেক্রেটারী, কার্য্যে তাঁহার রহস্যাবৃত ডিপার্টমেন্টের সর্দ্দার

খানসামা। বাল্যকাল হইতেই ইনি নবীন কিশোরের মস্তকচর্ব্বণের দন্তস্বরূপ হইয়া গাঙ্গুলি বাড়ীতে বিরাজ করিতেছেন।

নবীন কিশোর বলিলেন, "মালিনী মাসি, আর ত বাপু পারা যায় না, কত কাল আর এরকম নকল অভিনয় করা যাবে? একবার আসল অভিনয় আরম্ভ কর না, জীবনটা যে একদম দমে গেল। রেনল্ডের মিষ্ট্রী ফিষ্ট্রী গুলো ত সব পড়ে ফেলেচি,পড়া শুনাতে আর আমোদ নেই; কলকাতায় বসে রোজ রোজ থিয়েটার দেখা, সেও বড় সুবিধের কথা নয়; চারদিকে অনেক মাছি এসে জোটে, যেন পাকা কাঁটাল ভাঙ্গা পায়। তাই বলেছলেম, এসনা একটা থিয়েটারের দল খোলা যাক, বিদ্যা সুন্দর পড়তে পড়তে আইডিয়াটা চট্ করে মাথার মধ্যে এসে পড়েছে। ভারি একটা 'সাব্লাইম আইডিয়া', নয়? গাঙ্গুলী বংশে যা কেউ কখন পারেনি, স্বরূপপুরে কেউ কোন পুরুষে দেখেনি, তাই করা হবে, চার দিক হতে লোকে বাহবা দেবে।"

বলরাম ঠিক পটের বলরামের মত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া বলিল, "আর দেখ্তে দেখ্তে আমাদের বুকের ছাতি এত খানি ফুলে উঠ্বে, চাই কি স্বর্গেও বাতি জ্বলতে পারে।"

নবীন কিশোর মহা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করা নয়, আজ দুপুরে যখন পাশার আড্ডা পড়বে, তখন কি অভিনয় করা যাবে, স্থির কর। আর সিন, সাজ, ষ্টেজ প্রভৃতির বিষয় কি করা কর্ত্তব্য তাও স্থির করতে হবে।"

বলরাম বলিল, "ষ্টেজটা খুব জমকালো হওয়া দরকার। 'আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী'।" নবীন বলিল "তা বটে কিন্তু আপাততঃ বেশী টাকা খরচ ক'রে দরকার নেই। যদি 'প্রোফেসনে,' দাঁড় করান যায়, তবে তখন দেখা যাবে। চাইকি এখান হ'তে কল্কাতাতেও দল করে 'ট্রান্সফার' করে নিয়ে যেতে পারি। যত ব্যবসাদার থিয়েটার গুলো একেবারে কানা হয়ে যাবে।"

বলরাম—"কানা!—কানা ত ভাল,একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে, দুটি চক্ষুতে সাফ্ অন্ধকার দেখবে! আঃ, তখন কি মজাই হবে, আমি কিন্তু দাদা, 'বিজনেস্ ম্যানেজার' হব।"

নবীন—"সে পরের কথা পরে হবে, আপাততঃ যে বড় একটা মুস্কিল।"

বলরাম—"যাঁহা মুস্কিল, তাঁহা আসান'—রূপচাঁদ যার সহায়, তার আবার মুস্কিল কি?"

নবীন "এক্ট্রেসের কি করা যাবে?"

বলরাম—এক্ট্রেসের ভাবনা কি? গুপে কামার, পরাণে মুদী, কেলা তাঁতি, গোকুলো গাঁড়ার এরা সবাই বড্ড ভাল এক্ট করে! মস্ত মস্ত এক্টর, সেবার মনসার ভাষাণের পালা দেখনি বুঝি! গুপে মনসা সেজে যে বক্তৃতা করেছিল, একেবারে বলিহারি; কিবে গানের তাৱিপ, এক একটা গান গায়, আর চার দিক হতে ছুশো 'এনকোর' পড়ে।"

নবীন—"আরে ছ্যাঃ—পুরুষ মানুষে এক্ট্রেস সাজ্বে! সে সব হবে টবে না। মরাল করেজ চাই, মালিনী মাসি, মরাল করেজ, আর্টের ডেভেলাপমেণ্ট!—কথা হচ্ছে, এক্ট্রেস সংগ্রহ করা যায় কোথা হ'তে? that's a difficult job." (গম্ভীরভাবে মস্তকান্দোলন)।

বলরাম—'কুচ পরোয়া নেই দাদা, গোটা কত ঢপের দল কুরলেই ঠিক হবে, কলকাতা সহরে টাকা হ'লে সব মেলে। গোটাকত কীর্ত্তনওয়ালীকে গ'ড়ে পিটে আয়েসা, তিলোত্তমা, কুন্দনন্দিনী, হীরে মালিনী সাজানো যাবে, ও সব কাজে আমি খুব একস্পার্ট আছি।"

পাশার আড্ডায় ঠিক হইয়া গেল, স্বরূপপুরে গাঙ্গুলীদের চণ্ডীমণ্ডপের আঙ্গিনায় রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হইবে, তাহার নাম হইবে "ত্রিদিব রঙ্গালয়।"—সাজ পোষাক সমস্ত কলিকাতা হইতে নূতন আমদানী করা হইবে। বলরাম দশটী একট্রেস সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। সেই সঙ্গে একজন মাষ্টারও আনা হইবে, তিনি সঙ্গীত ও অভিনয় শিখাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয় সহস্র বলিতে পারি না, তবে কয়েক সহস্র বটে, মুদ্রা ব্যয় করিয়া দুই সপ্তাহ মধ্যে বলরাম কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পাঁচখানি পাল্কী বিকট হুঙ্কারে তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক কুঞ্জবাগানে প্রবেশ করিল। সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ বলরাম কলিকাতা হইতে ত্রিদিব রঙ্গালয়ের জন্য যে কয়েকটি অপ্সরার আমদানী করিয়াছিলেন, তাহাদের আবির্ভাবসংবাদ নবীন কিশোরের ধর্ম্মপত্নী বিরাজমোহিনী দেবীর অজ্ঞাত রহিল না। ক্রোধে তিনি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কাব্যকলার প্রতি তাঁহার

স্বামার এই প্রকার অনুরাগ, তাঁহার মানসিক বিরাগ সংবর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

পত্নীর ক্রোধাতিশয্যে সে দিন নবীন কিশোরের বিন্দু মাত্র চিন্তারও অবসর ছিল না। তিনি অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন, বিশেষতঃ বাহন-বর্জ্জিত কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবান্ একটি যুবা বন্ধু লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। এই পার্থিব কার্ত্তিকটির নাম গণেশ বাবু, তিনি থিয়েটারের দলে শিক্ষক হইয়া আসিয়াছেন। মূর্খ জমীদারের দলে প্রতিপত্তি বিস্তারে গণেশ বাবুর আশ্চর্য্য দক্ষতা ছিল।

অতঃপর থিয়েটারের দল পুষ্টির জন্য গ্রামে রূপবান্ ছেলে সংগ্রহ হইতে লাগিল। ছুকড়ি মুদীর ছেলে পটলা দিবা তেল নুন বিক্রয় করিত। বৃদ্ধ ছুকড়ি বাতের রোগী, বাড়ীতে পড়িয়া রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে। গ্রামের বাজারে তাহার একখান দোকান ছিল। তেব বৎসরের ছেলে পটোল বাপের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান সহায়। হঠাৎ এক দিন ছুকড়ির দোকান বন্ধ দেখা গেল, ক্রেতাগণ অগত্যা অন্য দোকান হইতে জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। দুদিন পরে যদি বা পটলাকে দোকানে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল, কিন্তু তখন সে দাঁড়ি ত্যাগ করিয়া একখান খাতা হাতে লইয়া কেবলই মুখস্ত করিতেছিল,—

"ভাই রে লক্ষ্মণ,
এই কিরে রাজ্য ধন!"

সীতার বনবাসে সে রাম সাজিবে, গণেশ বাবু তাহাকে পাঠ দিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ছুকড়ি দত্তর দোকান নাটকের আড্ডায় পরিণত হইল। রামগাছু নাপিতের ছেলে বটকেষ্টো দাড়ি কামানোটা এক রকম শিখিয়াছিল, সে ভাঁড় ফেলিয়া লবকুশের কুশ সাজিতে গেল। যাহারা বোধোদয় ধরিয়াই ইস্কুল ছাড়িয়া ছিল, তাহারা আবার নূতন করিয়া সরস্বতীর উপাসনায় মনঃসংযোগ করিল— অবশ্য প্রকারান্তরে। কাব্যকলা বিকাশের কোলাহলে ক্ষুদ্র স্বরূপপুর গ্রামের কানে তালা লাগিয়া গেল। কলিকাতার বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলিতে পর্য্যন্ত নবীন কিশোরের উৎকট প্রতিভার প্রশংসাবাদ আরম্ভ হইল; নবীন কিশোরের রত্নভাণ্ডারে মফঃস্বলের সংবাদদাতা-রূপ উজ্জ্বল রত্নের অভাব ছিল না।

গ্রাম কিরূপ 'সর গরম' হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা এই অকিঞ্চিৎকর লেখকের নাই। ফুলবাগান নামক উদ্যান-ভবনে সপ্তাহে তিন দিন "রিহার্সাল" চলিতে লাগিল। নবীন কিশোর পূর্ব্বে বাড়ী আসিবার বড় অবসর পাইতেন না, এখন বাড়ীর সংস্রব প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব ভার প্রধানতঃ গণেশ বাবুর উপরই ন্যস্ত হইল। তাহার সহিত নবীন কিশোরের প্রণয় বৎসরোনাধিক প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল; সেই অধিকার গর্ব্বে গণেশ বাবু সময়ে সময়ে বৃদ্ধ দেওয়ানজীর প্রতিও চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেন।

বিরাজমোহিনী অন্তঃপুরে বসিয়া বৃথা আক্ষেপ করিতেন। বিশেষ কোন আবশ্যক বশতঃ নবীন কিশোর দৈবাৎ গৃহে পদার্পণ করিলেও গৃহিণীর তর্জ্জনে অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে সাহসী হইতেন না; সুতরাং গৃহিণী বহির্ব্বাটিতে আসিয়াই বর্ষণ করিয়া যাইতেন। হীরে খানসামা গুরুচরণ বেণের দোকানে বসিয়া একদিন গল্প করিতেছিল—সে অশ্রু বর্ষণ নহে, তাহা তদপেক্ষা সারবান্ এবং তীক্ষ্ণতর পদার্থ।

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে "ত্রিদিব রঙ্গমঞ্চে" অভিনয় আরম্ভ হইল। পল্লী-দর্শকগণ করতলে চন্দ্র লাভ করিল। কি নাচ, কি শ্রবণ-মনোমোহন গান, অভিনেত্রীগণের কি শুভ্র চূর্ণানুলিপ্ত বদনকমল, বিদীর্ণ-পটোল-নেত্রের কি মোহময় বঙ্কিম ভঙ্গী। দর্শকগণ স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক কাব্যকলার সুমধুর বিকাশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমাগত 'এন্‌কোর', 'বিউটিফুল', 'ভেরি নাইস' প্রভৃতি শব্দ-কুসুম বিদ্যাধরীগণের উদ্দেশে বর্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত গ্রামে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত সুধা রসের আস্বাদনে জীবন সফল করিল। যে সকল পিতৃ মাতৃ-পরিত্যক্ত যুবক বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধচ্যুত হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিতেছিল, তাহারা লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক ফুলবাগানের বৃক্ষ শাখায় উপবেশন করিল। কন্‌সার্ট পার্টিতে কাহারও স্থান হইল, কেহ বা নাটক রচনার ভার গ্রহণ করিল। 'সরকারী হুকুম মতে' গ্রামের সরাপের দোকানদার হরিশচন্দ্র সাহা একখানি দোতলা বাড়ী নির্ম্মাণের আয়োজন করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবীন কিশোরের সহধর্ম্মিণী বিরাজমোহিনী দেবীর বয়স একবিংশ বৎসর। দশ বৎসর হইল, নবীন কিশোরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। পিসিমা অনেক সাধ করিয়া পঞ্চদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিরাজের বিবাহ দিয়াছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, বৌটি তাঁহার মনের মতই হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান মকর-কেতনের রহস্য কে বুঝিবে! বধূ নবীন-কিশোরের মনের মত হইল না। বিরাজমোহিনী ধনাঢ্যের সুন্দরী কন্যা। আশৈশব তাহার কেবল বিলাসিতাই শিক্ষা হইয়াছিল, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা সে কোন দিন পায় নাই। তাহার উপর নবীন কিশোরের কিছুমাত্র সুশিক্ষা হয় নাই, সুতরাং অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা লইয়া সংসার করা অপেক্ষা অরণ্যে গমনই তাহার নিকট শ্রেয়ঃ জ্ঞান হইয়াছিল। তাহার পিতা বাল্যকালে তাহাকে চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করাইয়াছিলেন; কিন্তু অরণ্যে গমন না করিয়া নবীন কিশোর ফুলবাগানে গমন করিল। সেখানে কেবল উদ্ভিজ্জাত পুষ্পই ছিল না, একটি সচেতন পুষ্পও বর্ত্তমান ছিল। এই পুষ্পটি তাহার হৃদয় অরুণের সূর্য্যমুখী স্বরূপ দিবারাত্রি বিরাজ করিত এবং বিরাজমোহিনীর অন্তর্জ্জ্বালা বাষ্পাকারে তাহার হৃদয়াকাশে পুঞ্জীভূত হইয়া অশ্রুরূপে বর্ষিত হইত, কখন কখন দুর্লভদর্শন পতির পৃষ্ঠে বজ্রাঘাতও হইত।

গণেশ বাবুর কুঠুরী নবীন কিশোরের বৈটকখানার পাশেই। ফাল্গুনের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে গণেশ চন্দ্র চন্দ্রালোক বিধৌত বারান্দায় চেয়ারখানা টানিয়া একটা বিরহ সঙ্গীত গাহিতেছিলেন. গানটি অদূরবর্ত্তী বেড়ার ধারে নব প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ গন্ধের সহিত নৈশ সমীরণ হিল্লোলে ঊর্দ্ধ পথে ভাসিয়া যাইতেছিল।

সহসা গণেশ বাবুর অদূরে একটি নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। গণেশ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে ওখানে?"—গান তখন থামিয়া গিয়াছিল, সমস্ত প্রকৃতি নীরব।

নারী মূর্ত্তি বলিল, "আমি দামিনী।"

দামিনী বিধবা, বয়স পঁচিশের অধিক নহে। সে চুড়ী ও পেড়ে কাপড় পরে, দাঁতে মিশি দেয়, সকলের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলে, বেশ বিন্যাসে ও প্রভুপত্নীর মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়া; দামিনী বিরাজমোহিনীর প্রধানা কিঙ্করী।

দামিনী বলিল, "বাবু গানটা আর একবার গান।"

গণেশ বাবু বলিলেন, "কেন রে দামিনী, আবার গাব কেন, তোর কি এত ভাল লেগেছে?"

আমার ভাল লাগার জন্যে আপনাকে বলতে ত আমার ভারি মাথা ব্যথা। বৌ দিদিমণি বলছেন, খুব ভাল গান। আপনি এত ভাল গাইতে পারেন, তা কে জানতো।"

"কেন, জানলে কি তোমাদের বৌ দিদিমণি আমাকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন না?"

দামিনী বলিল, "বৌ দিদিমণি বলেছেন, আপনি ত আমাদের কাঁধে চড়ে নেই; এখন গান, তাঁর বড় ভাল লেগেছে।"

গণেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর একটা গাই, এটা আরও ভাল। একটু কাশিয়া সুমধুর স্বরে গাহিতে লাগিলেন,

এমন মধুর মধুনিশি মাঝে
সে যদি গো পাশে রহিত,
একবার শুধু সুধা হাসি হেসে
স্নেহে আঁখি তুলে চাহিত।
তাহ'লে আমার পরাণের মাঝে
দেখাতেম তারে কি ব্যথা বিরাজে;
তৃষিত হৃদয় কত ভয়ে লাজে
কি বিষাদ গাথা গাহিত।
জোছনায় ঐ ভাসে ধরাতল
সমীর বহিছে ফুল পরিমল
শিহরি ঝরিছে সেফালিকা দল
আজি, নিখিল প্রকৃতি মোহিত।
আমারই কেবল নয়নের জল
নয়ন ছাপায়ে করে টলমল,
সারা নিশি ধরি কাঁদিয়ে কেবল
আঁখি দুটি হ'ল লোহিত।

গানের সুর, বিরাজ মোহিনীর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার প্রতিবর্ণ তাহারই অতৃপ্ত বাসনারূপে ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল। এমন নবীন যৌবন, এমন শশধর কিরণ-বিধৌত ধরাতল, এমন স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ-সমাকুল রাত্রি এবং বসন্তের সুখস্পর্শ সমীরণ তাহার সেই একুশ বৎসরের বাসনাব্যাপ্ত বেদনাবিদ্ধ যৌবনের প্রতি প্রকৃতির তীব্র

বিদ্রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কি এক মোহময় স্বপ্ন চঞ্চল রক্তস্রোতের ন্যায় খরবেগে তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ পূর্ব্বক উন্মাদনাময় মাদকতা রসে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বিরাজ মোহিনী তাহার নির্জ্জন কক্ষে একখানি সোফায় বসিয়া বাতায়ন পথে হাস্যময়ী প্রকৃতির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—

"এমন মধুর মধু নিশি মাঝে
সে যদি গো পাশে রহিত ?
একবার শুধু সুধাহাসি হেসে
স্নেহে আঁখি তুলে চাহিত।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্নে দামিনী তাহার বৌ দিদিমণির চুল বাঁধিতেছিল, বিরাজ মোহিনী আরসিতে মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "হ্যাঁলো দামিনি, তুইত নাটক দেখে এসে ভারি সুখ্যাতি কচ্ছিলি, গানটান গুলো কি রকম হয়, বল দেখি।"

"খুব ভাল বৌ দিদি, তোমাকে এক মাস হতে সাধ্চি, যদি একবার দেখ ; কত ভদ্দোর লোকের ঝি বৌ দেখ্তে যায়, আর তোমার ত বলে ঘরের জিনিষ ; দেখে একবার চক্ষুদুটা স্বার্থক কর বৌ দিদিমণি। আমাদের বাবু নিজে লক্ষ্মণ সাজেন, আর মেঘনাদ সাজে ঐ গণেশ বাবু, কেমন মানায়, ঠিক যেন কার্ত্তিক গণেশ। আর প্রেমিলার গান-গুলি প্রাণ একেবারে কেড়ে নেয়। যাবে বৌ দিদি ?"

"আবার কবে নাটক হবে, মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিস্ তো।"

শুক্রবারে বিরাজ মোহিনী থিয়েটার দেখিতে গেল। সে দিন বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশ নন্দিনীর অভিনয়। অভিনয়ে কিছু নূতনত্ব ছিল। শ্রীমতী বেলা দেবী অর্থাৎ যে অপ্সরাটী কলিকাতার অপ্সর-লোক হইতে স্খলিত হইয়া নবীন কিশোরের মর্ত্ত্য-উপবনের সজীব পুষ্পরূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তিনি জেদ করিয়াছেন, দুর্গেশ নন্দিনী নাটকে তিনি আয়েসার অংশ অভিনয় করিবেন। সুতরাং জগৎসিংহ নবীন কিশোর ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানাইল না।

এই অভিনয়ের দিন বাহিরের বাজে লোকদিগকে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না, নিকটস্থ বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অভিনয় দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। তাঁহাদের অনেকেই জমীদারের পুত্র, কেহ অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ মিউনিসিপাল কমিশনার, কেহ বা লোকাল বোর্ডের মেম্বর। সকলেই স্বদেশের গৌরব দীপের পলিতা স্বরূপ। সেই পলিতায় উপযুক্ত পরিমাণে তৈল সঞ্চার করিবার জন্য কেল্নারের বাড়ী হইতে কয়েকটা পার্শেলও আসিল।

সে দিনের অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। আয়েসা জগৎসিংহ, ও ওসমান যেন কাব্য জগৎ হইতে উড়িতে উড়িতে এই সুখদুঃখ-সঙ্কুল,আশা-ভয়-বিষাদ-বিজড়িত বাস্তব জগতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ওসমানের হৃদয় আয়েসার প্রেমে পরিপূর্ণ, কিন্তু আয়েসা জগৎসিংহের অনুরাগিণী, ওসমান আয়েসার চক্ষুশূল। বিরাজ মোহিনীর মনে হইতে লাগিল, আয়েসার একি বিবেচনা ! ওসমানের কাছে জগৎসিংহ, সূর্য্যের তুলনায় চন্দ্র ; ওসমানের এমন অচঞ্চল গাঢ় প্রেম আয়েসা কেন এ ভাবে উপেক্ষা করিল ? আর জগৎসিংহই বা নবাব-পুত্রীকে ভাল বাসিলেন না কেন ? আয়েসার ত রূপের অভাব ছিল না। বিরাজ মোহিনী স্পন্দমান বক্ষে অভিনয় দেখিতে লাগিল। তাহার বোধ হইল সে সম্মুখে যাহা দেখিতেছে তাহাই সত্য, আর সব মিথ্যা। সে বাল্যকালে কালিকাতায় পিত্রালয়ে থাকিতেছই একবার অভিনয় দেখিয়াছিল, কিন্তু তখন ইহার রস মাধুর্য্য, উন্মাদনার আস্বাদন, প্রেম রঙ্গের উদ্দাম তরঙ্গ তাহার হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। তাহার অতৃপ্ত, প্রেমামৃত-বঞ্চিত, তৃষিত হৃদয় এতদিন শুষ্ক হইয়াছিল, আজ সে সম্মুখে প্রথম বারিপাত নিরীক্ষণ করিল। সে ভাবিতে লাগিল, পৃথিবী যদি ঐ রঙ্গভূমির মত সমুজ্জ্বল হইত তাহার সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছে, সে যদি ঐ প্রেমময় ওসমানের ন্যায় তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইত, তাহা হইলে তাহার জীবনে আর কি অভাব থাকিত ? ওসমান্ হতভাগ্য, তাহার হৃদয়ে কি উন্মাদনাময় ভালবাসা ! আগুনের মত তাহা দগ্ধ করে, অথচ তুষারের মত তাহা শীতল করিতে পারে। এমন হৃদয় ঢালা প্রেম লাভ করিয়াও আয়েসা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল ! আয়েসা মন্দ ভাগিনী।

বিরাজ মোহিনী আবার ভাবিতে লাগিল,—আমি যদি আয়েসা হইতাম, তাহা হইলে কি এমন করিয়া প্রেমপ্রকাশ

করিতে পারিতাম না? আমার কি ঐ রূপ দুখানি কোমল চরণ নাই? মৃণাল বাহু নাই? আরত নেত্রের দীপ্তি কি এই প্রথম যৌবনেই নিভিয়া গিয়াছে, আমার ওষ্ঠাধরের বর্ণ বিম্ব-বিনিন্দিত না হইতে পারে, কিন্তু ইহা পবিত্র। আমি যদি আয়েসা হইতাম, তাহা হইলে ওসমানের ঐ হৃদয় ভরা প্রেমের প্রতিদান দিতাম, তাহাকে সুখী করিতাম। আমি হতভাগিনী আয়েসা অপেক্ষাও মন্দভাগিনী। আয়েসাকে ত একজন ভাল বাসিবার ছিল, কিন্তু আমার? —বিশ্ব সংসারে আমি যে কাহারও প্রেম লাভ করিতে পারিলাম না। আমার কোন অভাব নাই, তথাপি আমি অভাগিনী। পৃথিবীতে সকল সম্পদ লাভ করিয়াও যে কাহারও হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে নাই, তাহার নারী যৌবন বৃথা।

পট পরিবর্ত্তন হইল, উপেক্ষিত প্রেমিক ওসমান করুণস্বরে একটি কার্ণ প্রেমের গান গাহিতে গাহিতে রঙ্গভূমে অবতরণ করিলেন। সেই সঙ্গীতের প্রতিশব্দ বিরাজের হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল, মর্ম্মবেদনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। গণেশ বাবুর গান কি মিষ্ট!—গণেশ বাবুই ওসমান্ সাজিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিরাজমোহিনী দিবারাত্রি ভাবে। কি ভাবে তা সেই বলিতে পারে। সে বড় লোকের বধূ, সংসারের কোন ভাবনা নাই। সে সকল ভাবনা ভাবিবার জন্য অনেক ঝি, চাকর ছিল; সুতরাং চিন্তার অন্য বিষয় না থাকায় নিজের ভাবনা লইয়াই বিরাজ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার জন্য ভাবিবার আরও একজন লোক ছিল, সে দামিনী। দামিনী বিরাজের দক্ষিণ হস্ত।

কিন্তু দামিনীর সঙ্গেও বিরাজ আজ কাল বড় বেশী মন খুলিয়া কথা বলে না। চতুরা দামিনী তাহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিত, কিন্তু আসল কথার বড় সন্ধান পাইত না। অবশেষে দামিনী হা'ল ছাড়িয়া দিল; দামিনী যখন হা'ল ছাড়িল, তখন বিরাজ তাহা চাপিয়া ধরিল। কিন্তু নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল, তরিও প্রায় ডুবু ডুবু। বিরাজ কোন মতে সামলাইতে পারিল না।

একদিন মধ্যাহ্নে দামিনী বিরাজের পিঠের দিকে বসিয়া তাহার নিবিড় কুন্তলরাশির ভিতর অঙ্গুলি চালাইতে চালাইতে নানা রকম গল্প করিতেছিল, শেষে থিয়েটারের কথা উঠিল।

বিরাজমোহিনী বলিল, "আচ্ছা দামিনী বল্ দেখি সে দিন যে আয়েসা সেজেছিল, তার চুল ভাল না আমার চুল ভাল।"

দামিনী বলিল, "তা কি আর বল্‌তে বৌ-দিদিমণি! এ যেন চাঁচর কেশ, আর সে মাগীর মাথায় যেন কালি মাখানো একটা খড়ের বোঁদলা, কতকগুলা গুছির রাশ বৈত নয়!"

বিরাজ যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া বলিল, "দামিনী তোর পছন্দ খুব, হাজার হোক, বড় লোকের ঘরে আছিস কি না! আচ্ছা, আর একটা কথার জবাব দে দেখি নাটক ত দেখ্‌লি, বলত ওসমানের সঙ্গে কার ভাব?

"কেন, বিদ্যে দিগ্‌গজ ঠাকুরের!

"আমর, আমি কি পুরুষ মানুষের কথা বল্‌ছি?

"বিদ্যে দিগ্‌গজ বুঝি পুরুষ! পুরুষ মানুষের অং ভূতের ভয়?

"দূর ছুঁড়ি, তুইত নাটকে অনেক মেয়ে লোক দেখ্‌লি তার মধ্যে ওসমানের প্রাণের টান কা'র উপর বুঝ্‌লি?"

দামিনী বলিল, "কেন তিলোত্তমা? আমি কি এত হ্যাকা দিদি ঠাকুরণ?

বিরাজ বলিল, "নাটকের যদি তুই কিছু বুঝিস! খালি চাবির গোছা ঘুরিয়ে দাসী মহলের সর্দ্দারী করে বেড়াস্।"

দামিনী বলিল, "বৌ দিদিমণি, রাগ ক'রো না, সকলে চাবির গোছা এমন ক'রে ঘুরোতে পারে না, সত্যি, বলতে কি, তুমিও না; যদি পারতে তবে কি আর বাবু গোল্লায় যায়?"

বিরাজ বলিল, "জানি সে ফিরবে না, কিন্তু আমি তাকে এখন শিক্ষা দেব!"

"তা তুমি পারবে না বৌদিদি! ওর জন্যে আলাদা শিক্ষার দরকার। সেদিন নাটক দেখ্‌তে গিয়েছিলাম দেখ্‌লাম শ্রীরাধিকে কৃষ্ণের পায়ে ধ'রে বল্‌ছিলেন,—

"বঁধুহে পায়ে ধরি ব্রজ ত্যেজে যেও না
তোমার প্রেমের আমি ভিখারিণী রাই"।

তুমি ত সে রকম পারবে না।"

বিরাজ কথা ঘুরাইয়া বলিল, "আবার কবে নাটক হবে জানিস্?"

"কেন?"

"কেন কি জানি, নাটকের রাজ্য বড় ভাল লাগে। মনে হয় এ যেন সত্যি, আর বাইরের যা কিছু সব মিথ্যা, খালি দুঃখ, কষ্ট, শোক! যে যা'কে চায়, সে তা'কে নাটকেও পায় না বটে, কিন্তু তাকে প্রাণ খুলে ভাল বাসতে ত পায়। আচ্ছা দামিনী, আমি যদি আয়েসা হতেম, তা হলেও কি ওসমান্ আয়েসাকে ভাল বাস্তো?"

"না, তা আবার বাসতো না! ভালবাসার লোক বদলে গেলেও ভালবাসা থাকে।"—দামিনী এই উত্তর দান করিল।

নিশীথে বন্দি সহবাসে আয়েসা, ওসমানকে বলিয়াছিল, 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!' বিরাজের মনে পুনঃ পুনঃ সেই কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল। 'আয়েসার কি সাহস, কি তেজ, আমার কি সাহস নাই? দেখা যাউক।'—বিরাজের চিন্তার বিরাম নাই। বেশ বিন্যাস করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একটা সুদৃশ্য স্ফটিক পাত্রে গোলাপবাসিত জলে বিরাজমোহিনী মুখ মার্জ্জনা করিতে করিতে শুনিল, অদূরবর্ত্তী কুসুমোদ্যান হইতে স্তব্ধ সন্ধ্যাকাশ স্বরলহরীতে প্লাবিত করিয়া কে গাহিতেছে—

> তোরা যাগো ফিরে আমি আর যাব না,
> কলঙ্ক সাগরে কভু কুল পাব না।
> যৌবন তরণী মম ভাসিছে তরঙ্গে
> কাণ্ডারী নাহিক কেহ কে যাইবে সঙ্গে।
> অকূলে ভাসিল তরি আকুল পরাণ,
> তবু জানি সখি মম বৃথা এ ভাবনা।

বিরাজমোহিনী বাতায়ন প্রান্ত হইতে চাহিয়া দেখিল, গায়ক স্বয়ং গণেশ বাবু। সঙ্গীতাকৃষ্টা মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সে বসিয়া বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। তাহার প্রবল বাসনা মোহে পরিণত হইয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিরাজ স্থির করিল, 'আমার এ যৌবন তরণী অকূলে ভাসাইব, দেখি কোথাও কূল পাওয়া যায় কি না! যদি ডুবিবার হয় ডুবিবে, কত দিন আর এ ভাবে তাহা সুখহীন, আশাহীন জীবননদীর শুষ্ক বালুকাময় চড়ায় বাঁধিয়া রাখিব?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী কুল ত্যাগ করিয়া অকুল সমুদ্রে তাহার যৌবন-তরি ভাসাইয়াছে।—মাষ্টার গণেশচন্দ্রও অন্তর্হিত। কাণ্ডারীগিরিটা বোধ করি, তাহারই ভাগ্যে জুটিয়াছিল। কুলত্যাগিনী হতভাগিনী বিরাজ সঙ্গে যে অলঙ্কার লইয়াছিল, তাহার মূল্য দশ সহস্রের কম নহে।

যথা সময়ে এ সংবাদ নবীন কিশোরের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিয়া অবিচলভাবে বসিয়া রহিল, কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না। আজ সর্ব্ব প্রথম তাহার মনে হইল, তাহার স্ত্রীর কুলত্যাগের জন্য সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী, এতদিনে সহসা তাহার অন্ধ নয়ন উন্মীলিত হইল। নবীন কিশোর অনুতপ্ত হৃদয়ে ফুলবাগান হইতে গৃহে ফিরিল. সমস্ত দিন শয়ন কক্ষে রুদ্ধ দ্বারে পড়িয়া রহিল। প্রায় দশ বৎসর পরে সে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সকল স্মৃতি একদিন তাহার নিকট সুখের স্মৃতি ছিল, আজ তাহা ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না, সকল দুর্ভাবনা তাহার হৃদয়ে সূচি বিদ্ধ করিতে লাগিল।

পুলিশে কোন সংবাদ দেওয়া হইল না। বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠান দেওয়ানজীর অভিপ্রায় ছিল, নবীন কিশোর তাঁহাকে নিরস্ত করিল। দেওয়ানজি ব্যাকুলভাবে কুলপুরোহিত মাধব চন্দ্র স্মৃতিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্মৃতিভূষণ মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না হবে কেন? সিংহ সিংহশাবকই প্রসব করে, কত বড় পিতার পুত্র! কুলকলঙ্ক কি বাহিরে প্রকাশ করিতে আছে? কুমার বাহাদুর ইচ্ছা করিলে ত কল্যই পঞ্চবিংশতিটি রূপসী কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিতে পারেন,—আজ্ঞার অপেক্ষামাত্র, ভাল কন্যার অনাটন কি?"

নবীন কিশোরের হিতৈষী অমাত্যবৃন্দ তাহার আর একটা বিবাহের কল্পনায় আনন্দ উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া উঠিল।

কিন্তু নবীন কিশোর বিবাহ করিল না, ফুলবাগানের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। অর্দ্ধপথে অভিনয় বন্ধ

হইয়া গেল, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিদায় হইল। নবীন কিশোর ভাগিনের নৃপেন্দ্র কুমারকে উইল করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিল; সংসারে আর তাহার স্পৃহা রহিল না।

লোকে ভাবিল, কুমার বাহাদুর উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সদুপদেশ দান করিতে আসিল, কিন্তু নবীন কিশোর কাহারও সহিত দেখা করিল না। গুরু ঠাকুর আসিলেন, তাহাকে বলিল, 'আপনার উপদেশের সময় অতীত হইয়াছে। অনর্থক বাক্য ব্যয় করিতেছেন; আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি।'—কি কর্ত্তব্য, তাহা সে কাহার নিকট প্রকাশ করিল না।

দুই তিন দিন পরে নবীন কিশোরকে আর গৃহে দেখা গেল না, কোথাও দেখা গেল না, নৃপেন্দ্র অনেক স্থানে লোক পাঠাইয়া সন্ধান লইল, কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। মামা অদৃশ্য! নবীন কিশোর সংসারের দোকান পাট তুলিয়া ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী বিরাজমোহিনীর চিত্র আঁকিতে পারিব না। সে আয়েসা সাজিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অবশেষে তাহাকে পান সাজিয়া দিনপাত করিতে হইল।

দশ বৎসর পরে একদিন বিরাজমোহিনী মদনমোহনের দোল দেখিতে গিয়াছিল। সেদিন বসন্ত পূর্ণিমা। সানাই দেবদম্পতির মিলন সঙ্গীত গাহিতেছিল। সেই স্বর লহরীতে যেন গগন প্লাবিত হইতেছিল, উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক শুভ্র দেখাইতেছিল। সেই আলোকে পথের গ্যাসালোক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং চিত্রবৎ পরিস্ফুট রাজপথে জনস্রোত বহিয়া যাইতেছিল।

একখানি গাড়ী হইতে একটি সম্ভ্রান্ত রমণী নামিয়া দেবদর্শনের জন্য দোল মঞ্চের সন্নিকটে গমন করিলেন, সঙ্গে একটি পরিচারিকা, প্রৌঢ়া তথাপি সৌখিন বেশ-ধারিণী—এ সেই সেই দামিনী।

চলিতে চলিতে দামিনী সহসা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। সেই উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে পথপ্রান্তবর্ত্তিনী একটি বর্ষিয়সী রমণীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিল। তাহার পর তাহাকে নৃপেন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলিনীকে বলিল, "বৌ দিদিমণি, ঐ দেখ তোমার স্বামী-শাশুড়ী,—যিনি স্বামী ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

অত্যন্ত বিস্ময়ভরে কমলিনী দুইহাত সরিয়া দাঁড়াইল। হতভাগিনী বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "দামিনী, তোকে চিনিতে পারিয়াছি, আজ তুইও আমাকে ঘৃণা করিতেছিস্!"—কমলিনীর দিকে ফিরিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'বৌমা, আমার পরিচয় দিবার পথ আমি রাখি নি, আমি বুঝিতে না পারিয়া নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।"

কমলিনী বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য, যে আজ দেবদর্শনে আসিয়াছিলাম। যাঁহার স্বামী হইতে আমার সর্ব্বস্ব, যিনি আমার প্রধান ভক্তির পাত্রী, আজ তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না।"

বিরাজ বলিল, "বৌমা আমি জলিয়া মরিলাম, আমার কোন সান্ত্বনা নাই, একবার তোমার হাত খানি আমার এই কলঙ্কভরা জলন্ত হাত দুখানার মধ্যে লইতে দাও।"

কমলিনী বলিল, আমাকে সে অনুরোধ করিবেন না। আপনি গৃহত্যাগিনী, কুলটার অঙ্গে আমি অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিব না।"

"হায়, দেবতার পদছায়াও আমাকে পবিত্র করিতে পারে না, এত অপবিত্র আমি! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সংসারে আমার স্থান নাই। হরি হে, লোকে তোমায় দয়াময় বলে, আমার পাপের কি মার্জ্জনা নাই?"

ঊর্দ্ধাকাশ হইতে চন্দ্র সুধাময় হাস্যে জগৎ স্নিগ্ধ করিতেছিল, উজ্জ্বল দীপালোকে মদনমোহনের সুগঠিত মুখ দর্শকগণের হৃদয়ে মধুর ভক্তিরস উদ্বেল করিতেছিল, এবং চতুর্দ্দিকের স্তব্ধ প্রকৃতি সুপ্তভাব ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বত্র শান্তি, কেবল বিরাজ মোহিনীর হৃদয় দুঃখ ও অনুতাপে বিদীর্ণ হইতেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আরও পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। হিমালয়ে একটি উপত্যকায় আজ কয়েক বৎসর একটি সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। উপত্যকাবাসিগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। সন্ন্যাসী রোগীর শুশ্রূষা করেন, অনাথগণকে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দান করেন, সমগ্র গ্রামবাসিগণকে পুত্র কন্যার ন্যায়

করেন। সমস্ত দিন তিনি পরের কার্য্যে ঘুরিয়া ...াকালে আশ্রমের অতি নিভৃত স্থলে বসিয়া ইষ্ট দেবতার ...রাধনায় নিযুক্ত হন। সন্ন্যাসীর প্রকৃতি গম্ভীর, তাঁহার ...স্ত সহানুভূতির সহিত একটা বেদনার আভাস পরিব্যক্ত ...ত। সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয়ের বেদনা তাঁহার আয়ত ...ত্রের স্থির দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইত, কিন্তু ভাষায় তাহা ...ান দিন কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় নাই। সন্ন্যাসী ..., কোথা হইতে আসিয়াছেন; তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য ..., তাহা কেহ জানিত না।

একদিন অপরাহ্ণ কালে একটি অনাথা রুগ্ন রমণী সন্ন্যা-...র আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হইল,—এমন প্রায়ই হইত। ...্যাসীর দ্বার হইতে উপেক্ষিত হইয়া কাহাকেও ফিরিতে ...ত না, পৃথিবীতে যাহার কোন আশ্রয় নাই, সে সন্ন্যাসীর ...কট আশ্রয় পাইত। দূর হইতে এই অভাগিনী সেই ...থা শুনিয়া দুর্ব্বহ দেহভার লইয়া অতি কষ্টে সন্ন্যাসীর ...রে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার দেহ মলিন, পদদ্বয় রক্তাপ্লুত, ...র শরীর হইতে খড়ি উঠিতেছে, মস্তকে ধূলিলিপ্ত বিবর্ণ ...টাভার, কেশের অধিকাংশ শুক্ল। তৃষ্ণায় অভাগিনীর ...ণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় তাহার উদরের মধ্যে প্রদাহ ...পস্থিত হইয়াছে। রমণী একটি বিল্ববৃক্ষ মূলে তাহার জীর্ণ ...র খানি প্রসারিত করিয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে তাহার ...পর লুটাইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া ...জ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি বাছা, তোমার কি কষ্ট?

অভাগিনী পলকহীন ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে উন্মাদিনীর মত ...হিয়া বলিল, "পিপাসা,—প্রাণ যায়,—বড় কষ্ট।"

সন্ন্যাসী ঝরণার নির্ম্মল জল অঞ্জলি পুরিয়া তাহার মুখের ...াছে ধরিলেন, সে কয়েক বিন্দু জল পান করিল; সুমিষ্ট ...ল ভাঙ্গিয়া তাহার মুখে তুলিয়া দিলেন, কয়েক দিন পরে ...তি সামান্য খাদ্য তাহার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তুমি কোথা ...তে আসিতেছ?"

"আমি বড় পাপিষ্ঠা, দেবচরণেও আমার স্থান হয় ...ই।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "খুব বড় পাপিষ্ঠাও ভগবানের ...নুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয় না। বোধ হয়, তুমি বড় অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিয়াছ? তোমার পাপ কি বল?"

"স্বামী ইন্দ্রিয়পরায়ণ অন্যাসক্ত ছিলেন, আমি প্রতি-শোধ দানের জন্য কলঙ্ক সাগরে ডুবিয়াছিলাম, আর উঠিতে পারি নাই।"

সন্ন্যাসী উঠিয়া সরিয়া বসিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে বলি-লেন, "তোমার নাম?"

"কলঙ্কিনীর নাম—বিরাজ।"

"বিরাজ তুমি? কে জানিত, আজ এই জীবন সন্ধ্যায় এ ভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে? আমি সংসার ছাড়িয়া নগর হইতে বহুদূরে পর্ব্বত প্রান্তের এই অরণ্যে আসিয়া পত্নীর প্রতি আমার কর্ত্তব্যভ্রংশ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি-তেছি, তুমি তোমার মুমূর্ষু কালে আমার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছ, বেশ করিয়াছ,—কিন্তু এখন আমি সর্ব্বত্যাগী!"

"প্রিয়তম, এতক্ষণে চিনিয়াছি! আজ এ অন্তিমকালে তোমাকে আমার অবলম্বনরূপে পাইয়াছি; আমাকে ত্যাগ করিও না। আমি বড় হতভাগিনী, এক দিন ত তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, আজ আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, আজিও গ্রহণ কর।"

বিরাজ তাহার দেহের সমস্ত বলের উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর টলিতে টলিতে সন্ন্যাসীর পদ প্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "দেখ আমার চোখে আর জল নাই, কথা কহিবার শক্তি ফুরাইয়াছে, বক্ষের স্পন্দন থামিয়া আসিতেছে, জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিতেছি, আর সময় নাই; বল আমাকে ক্ষমা করিলে?"

সন্ন্যাসী সেই মৃত-প্রায় দেহ অতি সাবধানে বক্ষে তুলিয়া নত মুখে বলিলেন, "প্রিয়তমে, আজ তোমাকে ক্ষমা করিলাম। প্রার্থনা করি, সর্ব্বদর্শী দয়াময় বৈকুণ্ঠেশ্বরও তোমার ক্ষমা করুন। সংসারে তুমি বড় যন্ত্রণা পাইয়াছ।" —সন্ন্যাসীর ওষ্ঠ অভাগিনীর শুষ্ক, বিশীর্ণ ওষ্ঠ স্পর্শ করিল, দেখিতে দেখিতে তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর অন্তিম আলোকচ্ছটা নিবিয়া গেল। অভাগিনীর সংসারযন্ত্রণা বিদগ্ধ প্রাণহীন মৃতদেহ সন্ন্যাসীর প্রেমালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ রহিল। তখন অপরাহ্ণের লোহিত তপন বিরাজের চির-নীরব মুখে সুবর্ণ কিরণ ঢালিয়া দিতেছিল, স্বর্গ হইতে যেন তাহা ক্ষমা ও করুণা বহন করিয়া আসিতেছিল।

সেই সন্ধ্যাকালে গ্রামবাসিগণ মরুভূমে বৃষ্টিপাত হইতে দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারে নাই। তাহারা, সন্ন্যাসীর চক্ষে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সঙ্গিনী।*

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত।

এই নবীনা লেখিকা তাঁহার কাব্যখানি হস্তে লইয়া যেন ভয়ে ভয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার নিজের শক্তির উপর এখনও বিশ্বাস জন্মে নাই, পাছে শ্রোতার ভাল না লাগে, এই ভয়ে যেন গায়কের কণ্ঠ বাধ বাধ হইয়া যায়।

"আহত মুকুল প্রায়,
গান যদি ঝরে যায়,
তারে আমি জীয়াব কি দিয়া
বীণা যদি রহে মুরছিয়া।"

তাই তিনি সলজ্জ সাবধানতার সহিত যেন অতি সন্তর্পণে বীণাটী স্পর্শ করিতেছেন। কখনও বা বাগ্‌দেবীর বীণা ফিরাইয়া দিয়া দ্বিগুণতর ভক্তির সহিত তাঁহার পদে আত্ম সমর্পণ করিতেছেন :—

"রাঙ্গা পা রাখ মা হৃদয়ে
বীণা বেণু মাধিদু সকল।"

বনের পাখীরাও কূজন করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করে, কবির যেন সে শক্তিও নাই, এই আক্ষেপ। বাস্তবিক এই কাব্য কুসুমটী যেন একান্ত ভয় বিহ্বল বিনয়ের সহিত সাহিত্যের বাগানে ফুটিতে অনুমতি চাহিতেছে—যেন সমালোচকের একটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই ইহা শুকাইবার জন্য প্রস্তুত! কিন্তু সুখের বিষয় এতটা বিনয় ও দৈন্যের কোন প্রয়োজন ছিল না; কাব্যখানির সহজ সৌন্দর্য্য ও লিপি নৈপুণ্য অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছে, আমরা ইহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

লেখিকা প্রেমের কথা লইয়া বেশী নাড়া চাড়া করেন নাই। তরুণ বয়সেই যেন জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া একটুকু গম্ভীর ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। বিকশিত কুসুমোদ্যানে তিনি ধ্বংসের ছায়া দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন; সুন্দর প্রস্ফুট কুসুম কি সুপক্ক ফলটী দেখিয়াও তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হয়—

"তবু এই ফুল ফল
কোন ত্রাসে ছল ছল,
মরণ ত্রাসে বুঝি কেঁপে মরে।"

এমনি বিষম উদাস্য ...

পঙ্কজিনী বসু বালিকা বয়সে ... অদ্ভুত ... দেখাইয়া ইহ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গিনী-রচয়িত্রী তাঁহার উদ্দেশ্যে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার ... বৈরাগ্য ভাব আমাদিগকে চমকিত করিয়া ফেলে। ... মৃত্যুর জন্য যেন আকুলিত হইয়া ব্যাকুল স্বরে খুঁজিয়াছেন;—

"নীলিমার কোন্ ধারে,
ভব জলধির পারে
কোথা আছে, কোথা আছে
সুখের নিবাস।"

এই উপলক্ষে সমস্ত সুখ স্বপ্নের মূলীভূত আদি কারণ এবং সমস্ত সুখ স্বপ্নের গৌরব হীন শেষ পরিণতি—ধূলি রাশির প্রতি কবির দৃষ্টি সহজে পতিত হইয়াছে। যে ধূলি লইয়া শিশুকালে কবি ক্রীড়া করিয়াছিলেন—

"ধূলি তুই খেলা ঘরে নিয়েছিলি ডেকে,"

সেই ধূলির নিকট নিবেদন করিতেছেন—

"যানিষ তোমার ডাক আর এক দিন"

সে দিন এ খেলার ঘর ভাঙ্গিবে।

যাহার মৃত্যুর পানে চক্ষু পড়িয়াছে, তাহার অন্য এক দিকে দৃষ্টি পড়া অবশ্যম্ভাবী; জীবের শেষ আশ্রয় মৃত্যুঞ্জয় ভগবানের কথা বলিতে যাইয়া সুরমা সুন্দরী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহার অদ্বিতীয় ভাণ্ডারের সম্পদ অগাধ, "বিন্দু বিন্দু অনুকম্পা সাজে না তাহার।" বলিয়া কখনও আবদার করিয়াছেন, কখন ও বা চাঁদের আত্ম কাহিনীর রূপকে তিনি বুঝাইয়াছেন, তাঁহার প্রেম লাভ করিবার আশা কবির পক্ষে দুরাশা।

"কোন্ বলে চাই তারে বন্দী করিবারে,
কলঙ্ক লাঞ্ছিত অন্ধ হৃদয় আগারে।"

প্রবৃত্তির দীপ্তিশালী চিত্র হইতে নিবৃত্তির এই করুণ ছবি আমাদিগের চিত্ত সমধিক-আকৃষ্ট করে।

এরূপ চিন্তাময়ী ব্যথিতা লেখিকা পরের অপরাধের বিচার করিবেন কিরূপে? পতিতার উপরও তাঁহার অপার করুণা; তিনি যেন মূর্ত্তিমতী দয়ার মত কোমল হস্তখানি ব্যথিতের বিদ্ধ হৃদয়ে বুলাইতেছেন;—

"ঘৃণা লাঞ্ছনার কারো নাই অধিকার
সংসার খেলার ঘরে,
ভুলো কেনা ভুল করে
আর আর হৃদয়ে আমার।"

এই কাব্য খানির কয়েকটি সনেট বড় সুন্দর হইয়াছে, আমরা স্থানাভাব বশতঃ তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। "সতী চিত্র" শীর্ষক সনেটটি পড়িয়া আমাদের কবি প্রমথ নাথের অত্যুৎকৃষ্ট "চিতাভিষিক্তা" সনেটটি মনে পড়িয়াছিল। বঙ্গীয় রমণী কবিগণের মধ্যে যে সুরমা সুন্দরী অচিরে একটি উচ্চ আসন পাইবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।
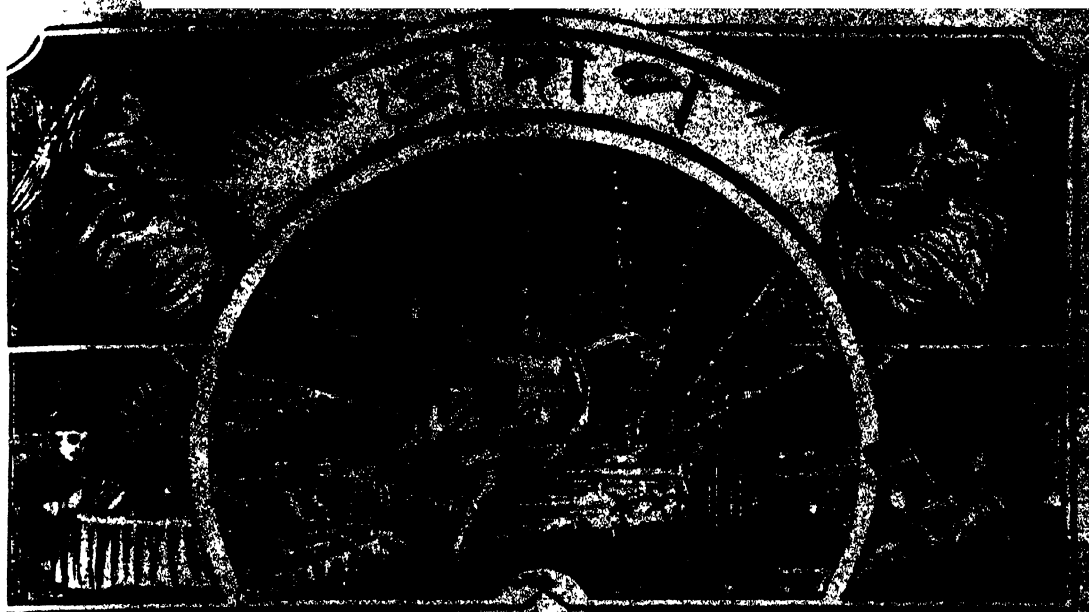
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

* কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ টাকা।

... কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ... কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ... প্রকাশিত।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

KUNTALINE PRESS.

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান, গুরু শিষ্য পরম্পরা ক্রমে প্রবাহিত হইত। সে জ্ঞান সাধারণ প্রচলিত জ্ঞান নহে—তত্ত্বজ্ঞান। তাহার অপর নাম ছিল ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থে লিখিত হইত না। গুরুর মুখ হইতে শিষ্য পরম্পরায় উপদিষ্ট হইত। সেইজন্য ইহার নাম ছিল "শ্রুতি"। গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের প্রবাহকে সম্প্রদায় বলিত। যাহাতে সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ না ঘটে—বিদ্যা, পরম্পরা-ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। যে বিদ্যা বা জ্ঞান সম্প্রদায় বর্জ্জিত—যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা বা কল্পনা প্রসূত, তাহার প্রতি তাঁহারা আস্থাবান ছিলেন না। সেইজন্য উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের অনেক স্থলেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। ঈশ উপনিষদের ঋষি, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্ যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে।"
এইরূপ আমরা ধীর (জ্ঞানী) মহাজনগণের নিকট শুনিয়াছি।

মুণ্ডক উপনিষদের শেষে কথিত হইয়াছে যে এই সত্য ঋষি অঙ্গিরা পুরাকালে বলিয়াছিলেন ("তদেতৎ সত্যং ঋষিরঙ্গিরা পুরোবাচ।" অঙ্গিরা ইহা কোথা হইতে পাইলেন? ইহা কি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত অথবা তিনি গুরু শিষ্যপরম্পরা ক্রমে ইহা লাভ করিয়াছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর, মুণ্ডক উপনিষদ্ নিজেই দিয়াছেন ;—

ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ।
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্য বাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্।

বিশ্বস্রষ্টা, জগৎ ভর্ত্তা, আদিদেব ব্রহ্মা, সর্ব্ব বিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্ম বিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে কহিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্বা পুরাকালে অঙ্গিরকে দান করেন। অঙ্গির সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে দান করেন।

সে কালে এই ব্রহ্ম বিদ্যা যে ব্রাহ্মণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। ক্ষত্রিয়েরাও এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। এমন কি উপনিষদের বিবরণ পাঠে জানা যায়, যে সময় সময় তাঁহারা বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণগণকেও এই বিদ্যা উপদেশ দিতেন। বৃহদারণ্যকে যে বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনকের উল্লেখ দেখা যায়, তিনি এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাভিজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বল, আর্ত্তভাগ প্রভৃতি বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যজ্ঞে এবং একরূপ তাঁহারই সভাপতিত্বে, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজর্ষি জনকের পরিচয় স্থলে এই ব্যাপার উল্লিখিত হইত।

"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির্যস্মৈ ব্রহ্ম পারায়ণম্ জগৌ।"

এইরূপ কৌষিতকী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে কাশীশ্বর অজাতশত্রুর জ্ঞান জ্যোতিতে আপনার বিদ্যা নিষ্প্রভ জানিয়া ব্রাহ্মণ বালাকি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতি কৈকেয়ের সমীপস্থ হইয়া ছিলেন। গীতার চতুর্থাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে কর্ম্মযোগ উপদেশ দেন, তাহা পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজর্ষি সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল।

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে ব্রবীৎ।"
"এবং পরম্পরা প্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ।"
"স এবায়ং ময়া তুভ্যং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।"

'এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বানকে উপদেশ করিয়াছিলাম। বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত এই যোগ পূর্ব্বে রাজর্ষিরা অবগত ছিলেন; কিন্তু ইহা দীর্ঘ কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অদ্য তোমাকে সেই পুরাতন যোগ আমি পুনরায় উপদেশ করিলাম।'

এই পরম্পরাপ্রাপ্ত তত্ত্ববিদ্যাই রাজবিদ্যা। এই বিদ্যা বিশেষ ভাবে রাজর্ষি সম্প্রদায়ে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইহার নামকরণ হইয়াছিল রাজবিদ্যা।* এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠে ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এ বিদ্যাকে রাজবিদ্যা বলে কেন, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না।

"অতো ময়ং ঈশ্বরঃ সৃষ্ট্বা জ্ঞানেনা যোজ্যতা সকৃৎ।
বিসসর্জ্জ মহী পীঠং লোকস্যাজ্ঞান শান্তয়ে।
অধ্যাত্ম বিদ্যা তেনেয়ং পূর্ব্বং রাজসু বর্ণিতা।
তদনুপ্রসৃতা লোকে রাজ বিদ্যেত্যুদাহৃতা।

---

* ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য গীতা ভাষ্যে রাজবিদ্যা শব্দের অক্ষর' ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—'বিদ্যানাং রাজা রাজবিদ্যা।' তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম রাজবিদ্যা। মুণ্ডক উপনিষদে ইহাকে পরাবরা (শ্রেষ্ঠতমা) বলা হইয়াছে।

বলিয়া বোধ হইতেছে, সময়ে তাহা দূর হইয়া যাইবে। কালে ঐ নক্ষত্রও শীতল হইয়া গ্রহের দলে আসিবে। দুঃখের বিষয় এই যে তখন তাহার জ্যোতিটুকু লোপ পাওয়ার দরুণ তাহাকে আর দেখিবার উপায় থাকিবে না। সুতরাং, কয়েক কোটি বৎসর পরে যখন এই কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিবে, তখন মনুষ্য জাতি এই পৃথিবীতে উপস্থিত থাকিলেও উহার কোন সংবাদ পাইবে কি না সন্দেহ।

'সন্দেহ' বলার কারণ এই যে, এক এক বার মনে হয় বুঝিবা সংবাদ পাইতেও পারে। ঐরূপ সংবাদের আভাস আমরাই কোন্ আজ দু এক জায়গায় না পাইতেছি। প্রমাণ স্বরূপ একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এরূপ অনেক নক্ষত্র আছে যে তাহারা চিরকাল সমান উজ্জ্বল থাকে না। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতরে উহাদের উজ্জ্বলতা একবার বাড়িয়া আবার কমিয়া যায়। এইরূপ সময় গণিয়া উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি হওয়ার কারণ কি? ইহার একটিমাত্র সন্তোষজনক কারণ দেখা যায়। মনে করুন ঐরূপ একটা নক্ষত্রের চারিদিকে একটা গ্রহ ঘুরিতেছে, আর মনে করুন, সেই গ্রহ ঘুরিতে ঘুরিতে এক একবার ঐ নক্ষত্র আর আমাদের পৃথিবীর মাঝখানে আইসে। ঐ সময়ের জন্য সেই গ্রহ সেই নক্ষত্রকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সুতরাং তখন সেই নক্ষত্রের জ্যোতিঃ কমিয়া আইসে। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর নক্ষত্রের গ্রহণ হওয়াতে আমরা তাহার উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই।

নক্ষত্র সকলের সঙ্গে আমাদের সূর্য্যের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সূর্য্যের ন্যায় উহারাও উজ্জ্বল এবং বৃহৎ; সূর্য্যের ন্যায় উহারাও সম্ভবতঃ গ্রহাদি পরিবৃত; সূর্য্যের ন্যায় উহারাও মাধ্যাকর্ষণের অধীন।

উহারা কিরূপ উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাও উহাদের আলোক পরীক্ষা করিয়া কতক জানা গিয়াছে। এ সকল উপাদানের মধ্যে আমাদের পরিচিত অনেক পদার্থ পাওয়া যায়।

ঝাড়ের কলমে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া কেমন সুন্দর রং উৎপন্ন করে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সূর্য্যের সাদা আলো মোটামুটি সাত রকম রঙ্গিণ আলোর সমষ্টি। ঐ আলো ত্রিকোণ কাঁচের ভিতর দিয়া আসিলে তাহার উপাদান স্বরূপ সাতটি রঙ্গিণ আলো পৃথক হইয়া পড়ে। শুধু সূর্য্যের আলোকের স্থলেই যে এরূপ হয়, তাহা নহে, যে কোন আলোককে ইচ্ছা এই উপায়ে বিশ্লিষ্ট করা যায়।

খুব সূক্ষ্মরূপে আলোকের বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যায় যে, কোন দুইটি পদার্থ জ্বলিবার সময় একরূপ আলোক বিকীরণ করে না। অঙ্গার জ্বলিবার সময় যেরূপ আলোক নির্গত হয়, গন্ধক জ্বলিবার সময় তদপেক্ষা বিভিন্ন প্রকৃতির আলোক নির্গত হইতে দেখা যায়। এইরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অম্লজন, জলজন, প্রভৃতি যে কোন জিনিস লইয়া পরীক্ষা হউক না কেন, প্রত্যেক স্থলেই এক একটি বিভিন্ন প্রকৃতির আলোক উৎপন্ন হইবে। সুতরাং এইরূপে আলোক পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত বলিয়া দেওয়া যায় তাহা কোন্ জিনিসের আলোক। একাধিক পদার্থ এক সঙ্গে জ্বলিলেও তাহাদের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে চিনিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না। যে যন্ত্র দ্বারা এইরূপে আলোকের বিশ্লেষণ করা যায়, তাহার নাম spectroscope। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ইহার সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্যের মধ্যে আমাদের পরিচিত প্রায় কুড়িটি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব এই উপায়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই উপায়ে গ্রহ উপগ্রহগণের আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যালোক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তবিক গ্রহদিগের কেহই নিজে আলোক বিকীরণ করে না। উহাদের আলোক উহারা সূর্য্যের নিকট প্রাপ্ত হয়।

নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের পরিচিত অনেক মৌলিক পদার্থের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

Spectroscopeএর কার্য্য এইখানেই শেষ হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহাকে দিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য সংবাদ সকল সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

আকাশের অনেক স্থানে মেঘের ন্যায় কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে লোকে ছায়া-পথ অথবা 'যমের জাঙ্গাল' বলে, তাহা এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এতদ্ভিন্ন এই জাতীয় আরো অনেকগুলি পদার্থ আকাশে আছে তাহাদিগকে নীহারিকা বলে। এ সকল জিনিস বাস্তবিক কি, তাহার মীমাংসা অনেক দিন হয় নাই।

অনেকে বলিতেন উহারা বাষ্পরাশি, অনেকে বলিতেন উহারা তারকাপুঞ্জ। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র এক স্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকিলে বাষ্পরাশির ন্যায় দেখা যায়। সুতরাং এ প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে হর্শেল বড় বড় দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে মেঘের ন্যায় দেখা যাইত, হর্শেলের দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহারা একে একে তারকাপুঞ্জে পরিণত হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে ঐরূপ জিনিসগুলির সমস্তই তারকাপুঞ্জ। তাঁহার দূরবীক্ষণের ভিতরেও যে গুলিকে মেঘের মতনই দেখাইল, তাহাদের সম্বন্ধেও তিনি বলিলেন যে উহারাও তারকাপুঞ্জ; তবে আমার দূরবীক্ষণ অপেক্ষা ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ না হইলে উহাদের যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইবে না।

কিন্তু spectroscope আবিষ্কার হওয়ার পরে এ সকল প্রশ্ন অতি সহজেই মীমাংসিত হইয়াগেল! তখন দেখা গেল যে উহাদের ভিতরে দুই প্রকারের পদার্থই আছে। অর্থাৎ উহাদের কতকগুলি জ্বলন্ত বাষ্প, আর কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ।

আকাশে এমন অনেক তারা আছে যে তাহারা দ্রুতবেগে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে অথবা পৃথিবী হইতে দূরে গমন করিতেছে। এ সকল তারার গতি দূরবীক্ষণে ধরা পড়ে না, কিন্তু spectroscope দিয়া তাহা সহজেই টের পাওয়া যায়। এবং ঐ গতির বেগ কিরূপ তাহাও অনুমান করা সম্ভব হয়।

এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যে কোন নক্ষত্র যুগল পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, অথচ তাহারা পরস্পরের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়াতে দূরবীক্ষণে তাহাদিগকে যুগল বলিয়া দেখায় নাই। কিন্তু spectroscpeএর দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ধরা পড়িতে হইয়াছে। তাহাদের আনুমানিক বেগ, প্রদক্ষিণ কাল, এমন কি মোটামুটি একটা ওজন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া তবে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া গিয়াছে।

নক্ষত্রগণের সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি কয়েকটী কথার আলোচনা করিয়াছি। উহারা এত দূরবর্ত্তী হইলেও নিতান্ত আমাদের অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক বিষয়ে আমাদের নিকটস্থ পদার্থ সকলের সঙ্গে উহাদের সাদৃশ্য দেখা গেল; এতদ্ভিন্ন আরো অনেক বিষয়ে এইরূপ সাদৃশ্য থাকা নিতান্ত সম্ভব বলিয়া মনে করা যায়।

আমাদের সূর্য্যের ন্যায় উহারাও এক একটি সূর্য্য। সূর্য্যের ন্যায় উহারাও মধ্যাকর্ষণ বিধির অধীন। সূর্য্যের ন্যায়, দু একটি অনুচর উহাদেরও অনেকেরই আছে।

এ সমস্তই দেখা গেল। অতঃপর কি একথা সম্ভব মনে করা যায় না যে নক্ষত্রদের রাজ্যেও জীব নিবাসের উপযুক্ত লোক আছে? আর তাহাতে মানুষের সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবও হয় ত থাকিতে পারে? ভগবানের এই সুবিশাল-বিশ্বমন্দিরের হীনতম কোনের একটি ধূলিকণার যোগ্যও হয় ত আমাদের এই পৃথিবী হইবে না। তাহার অধিবাসী হইয়া আমরা কি মনে করিব যে ব্রহ্মের আনন্দ কেবল আমাদের জন্যই প্রবাহিত হইয়াছিল, আর তাঁহার অমৃতের অধিকারী হইয়া কেবল আমরাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? ইহা কখনই বিশ্বাসীর উপযুক্ত কথা নহে। বরং আমরা মনে করিতে পারি যে জড় রাজ্যে যেমন বিশ্বময় এক ভাব দেখা গেল; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তেমনি। এই ভাব প্রণোদিত হইয়াই কবি বলিতেছেন—

"নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে·
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।"

সে নাম যে গগনে গগনে গীত হইতেছে, তাহাতে কোন ভুল নাই।

এতক্ষণ আমরা সৌর জগৎকে অনেক দূর হইতে দেখিয়াছি; তজ্জন্য হয়ত উহা আমাদের নিকট ক্ষুদ্র বোধ হইয়াছে। সুতরাং এখন একবার উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করা আবশ্যক।

সূর্য্য ইহার কেন্দ্র এবং অধিপতি, এই জন্যই ইহাকে সৌরজগৎ বলা হইয়া থাকে। বিধাতা ইহাকে অনন্ত আকাশে একটি দ্বীপের ন্যায় রাখিয়া দিয়াছেন। নক্ষত্র সকলকে উহা হইতে এতদূরে রাখা হইয়াছে যে তাহাদের কোনরূপ প্রভাবই ইহার উপর কার্য্যকর হয় না। সূর্য্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজ রাজ্যে প্রভুত্ব করিতেছেন। এই রাজ্যের ব্যাস ৫৫৬ কোটি মাইল। এই স্থানের ভিতরে আটটি বৃহৎ গ্রহ, কুড়িটির অধিক উপগ্রহ, ও প্রায় পাঁচ শত ক্ষুদ্র গ্রহ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথ ভ্রমণে নিযুক্ত

চতুর্থ ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

(১)

একটী সাধারণ লোকের জীবন এবং একটী স্বাধীন রাজার জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে ও বিভিন্ন আদর্শে গঠিত। সাধারণ লোকের জীবন সমাজের কঠোর শাসনে ন্যূনাধিক পরিমাণে সুসংযত, সুমার্জ্জিত ও কৃত্রিম ভাবাপন্ন। এক জন স্বাধীন রাজার জীবনে সংযমের অপেক্ষা উদ্দাম-স্ফূর্ত্তি বেশী, কারুকার্য্য অপেক্ষা কাঠিন্য অধিক, সভ্যতা অপেক্ষা স্বাভাবিকতা বেশী। সে জীবনে অভাব অতি অল্প, সমাজের প্রভাব ততোধিক অল্পতর। পার্ব্বত্য শাল তরুর ন্যায় উহা বিকট বিশাল ও অশোভন হইলেও উহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রকৃতির করচিহ্ন বর্ত্তমান। পার্ব্বত্য নদীর উপলখণ্ডের ন্যায় সেই জীবনের কোণ-কণিকাগুলি অক্ষত ও সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে আমাদের জীবনে সেগুলি চতুষ্পার্শ্বস্থিত পদার্থ সমূহের ঘর্ষণে মর্দ্দনে আঘাতে ব্যাঘাতে শাসনে লাঞ্ছনায় এত দূর ক্ষয়প্রাপ্ত যে, আমরা শালগ্রাম-শিলার ন্যায় নিরীহ সুডৌল ও সুগঠিত। ঘড়ী দেখাইবার ছলে কেহ আমাদের কর্ণ মর্দ্দন করিলে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে মাথার উপরের দিকে চাহিয়া, অধিক পরিমাণে নিজের উদরের দিকে চাহিয়া, এবং অধিকতর পরিমাণে স্বকীয় আশ্রিত দ্বি-সপ্ত সংখ্যক বুভুক্ষু মুখের দিকে চাহিয়া সহিষ্ণুতার সহিত সেই গোলাপী হস্তপ্রদত্ত তিক্ত জিলিপি-খানা গলাধঃ করিয়া থাকি; অন্তরে দ্বিতীয় পাণ্ডবের মত হইলেও বাহিরে যুধিষ্ঠিরের বেশে বাহির হই। ফলতঃ আমরা অষ্টপ্রহরই মুখস পরিয়া আছি; এবং ইদানীং আমাদের মুখ ও মুখস সর্ব্বপ্রকার দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া এমনি মাখামাখি ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে, এখন কোন্‌টী কে, তাহা চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। বোধ হয় কার্য্যতঃ আমাদের দেহ রাজ্যের উপরে মুখ অপেক্ষা মুখসের দাবীই বেশী। রাজনৈতিক ও সামাজিক অধীনতা

এবং আর্থিক অসচ্ছলতাই বোধ হয় ইহার মূল কারণ। কিন্তু একজন স্বাধীন রাজার পক্ষে, বিশেষতঃ একজন পার্ব্বত্য প্রদেশীয় স্বাধীন রাজার পক্ষে, এরূপ মুখস্ পরিবার প্রয়োজন বড়ই কম।

অদ্য যাঁহার জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি এক পার্ব্বত্য প্রদেশের (স্বাধীন ত্রিপুরার) স্বাধীন রাজা। নাম ৺ বীর চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর; পাঁচ বৎসর হইল, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

এই নরপতির প্রায় সপ্ততি-বর্ষ-ব্যাপী জীবনবৃত্ত নানা কারণে কৌতূহলোদ্দীপক। বঙ্গদেশের প্রান্তবর্ত্তী গিরি-সঙ্কুল প্রদেশে তাল তমাল-শিরীষ সহকার-কণ্টকী-কুরুবক প্রভৃতি তরুর শীতল ছায়ায় এবং সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ব্রিটিশরাজধানীর উত্তপ্ত বায়ু ও লবণাক্ত জলের প্রভাব হইতে সুদূরে অবস্থিত ও বর্দ্ধিত বলিয়া এই প্রকৃতি শিশুটীতে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত কুর্দ্দন ও স্বাধীন তাণ্ডব নর্ত্তন বিকাশ পাইয়াছিল, ভারতের অন্য কোন পরিচিত মানব-শিশুতে তেমন হইয়াছিল বলিয়া জানি না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অধিকাংশ রাজার জীবন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে গঠিত। কারণ অনেক স্থলেই বিধাতা-পুরুষ পলিটিকেল এজেন্টের হস্তে তাহাদের ললাট-লিপি লিখিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের সূতিকা গৃহে সেই অগ্নিবর্ণ হংসারূঢ় অদৃশ্য বিধাতা ভিন্ন কোন অগ্নিমুখ হংসপুচ্ছধারী গণ্ড-পিণ্ড অদৃষ্ট নিয়ন্তা বিধাতা প্রবেশাধিকার পান নাই।

ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত মহারাজের বিলক্ষণ পরিচয় থাকিলেও তিনি উহাকে চিরদিন বিদেশী বঁধু বলিয়াই মনে করিতেন, এবং তদুপযোগী সম্মান ও আদরে আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু এই পরদেশী বঁধুয়াকে কখনো স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ইহার ফল ভাল কি মন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে চাই না।

শুনিতে পাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে সাম্য, ফলে কর্ত্তব্য জ্ঞান, এবং পল্লবে একের স্থলে সংঘের সুসমৃদ্ধি; আর প্রাচ্য সভ্যতার মূলে আত্মসুখ, ফলে সুরা-সীমন্তিনীর ছড়াছড়ি, এবং পল্লবে দুর্জ্জয় আলস্য, সর্ব্বগ্রাসিনী বিলাস-লিপ্সা এবং অপরিহার্য্য চিত্তাবসাদ। কিন্তু চোখের সামনে অনেক সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই? প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে হিন্দুরাজার দার্জ্জিলিং-প্রবাস ঘারকাবাস অপেক্ষা পুণ্যকর হইয়াছে। Sence অপেক্ষা Romance এর আদর বাড়িয়াছে, এবং স্বজাতীয়া অভিজাতা কামিনীকে ফেলিয়া বিজাতীয়া অশ্বপাল-দুহিতাকে অঙ্কলক্ষ্মী করা হইতেছে; সংক্ষেপে, পরকাল-চিন্তার স্থান ইহকাল-সর্ব্বস্বতা অধিকার করিয়াছে। আর অপর পৃষ্ঠে কি দেখিতে পাই? —প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে আবিল্ল বিলাসের প্রখর জোয়ার, ও প্রবল আলস্যের দুস্তর ভাটা, এবং কুসংস্কারের নিশ্চল জলের মধ্যেও সময়ে সময়ে দেবদ্বিজে ভক্তি, ধর্ম্ম-ভীরুতা প্রজারঞ্জন প্রয়াস প্রভৃতি সুশোভন কুমুদ কহ্লার বিকশিত হইয়া থাকে।

বক্ষ্যমাণ মহারাজের জীবন ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব; এমন কি উহাতে গঙ্গা যমুনার সম্মিলনও ছিল না। উহা যেন সংস্কৃত নাট্যোল্লিখিত কোন ক্ষত্রিয় রাজার জীবনের পুনরাবৃত্তিমাত্র।

তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কখনওইউরোপীয় চাল-চলনভাবভঙ্গীকে অবজ্ঞা করিতেন না। এক দিন তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "দেখ, সিভিলিয়ানরা কেবল যে লেখা পড়ায় পণ্ডিত, এমন নহে; আদব্ কায়দা বিষয়েও তাহারা সুশিক্ষিত। প্রত্যেক সিভিলিয়ান্ একই ধরণে চিঠির খাম ছিঁড়িয়া থাকে, একই কায়দায় দেশলাইটী জ্বালায় এবং একই ভঙ্গীতে চুরট্‌টী ধরাইয়া থাকে। এমন কি hand-shake করিবার বেলা ঠিক্ একই ভাবে হাতে ঝাঁকি দিয়া থাকে। তাহাদের কাছে চিঠি লিখিলে ঠিক দিন গণিয়া উপযুক্ত সময়ে তাহার উত্তর পাওয়া যায়; ঘড়ী ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা দেখা করিতে আসে। গাড়ীতে চড়িয়া কোথাও যাইবার সময়ে হাতে একটা খবরের কাগজ বা বই থাকা চাই; সময় নষ্ট করা তাহারা মহাপাপ বলিয়া মনে করে।" কিন্তু যে ইউরোপীয়দের তিনি এত প্রশংসা করিতেন, নিজে কখনও তাঁহাদের রীতি নীতির পথে এক পদ অগ্রসর হন নাই; বরং বিদেশিসভ্যতাভিমানী স্বদেশীকে পরান্নপুষ্ট পোষ্যপুত্র জ্ঞানে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন!

ফতলঃ ইহা বোধ হয় এখন একটী পরীক্ষিত সত্য যে, সাহেবেরা তাঁহাদের পদানুচারী নেটিভদের অপেক্ষা স্বধর্ম্মাহ-

বর্ত্তী স্বমার্গাচারী দেশীয়দিগকে সসম্ভ্রম সস্নেহ চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা ভারতীয় রাজার পার্শ্বে টানাপাখার চেয়ে তালপত্র বা চামর-ব্যজন দেখিতে ভালবাসেন, তাঁহার মুখের বকগ্রীব সিগার-পাইপ্ অপেক্ষা ভুজঙ্গ-কুণ্ডলীবৎ আলবোলা দেখিতে ভালবাসেন, এবং আড়ম্বরশূন্য হ্যাট্ কোট্ বুট্ অপেক্ষা হীরক-মুক্তোজ্জ্বল উষ্ণীষ, সলমা-চুমকী-খচিত জামা, ও জরি বাদলা পরিশোভিত নাগরাই জুতা দেখিতে ভালবাসেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলাতে গিয়া সে দেশীয় লোকের চোখে যে তাক্ লাগাইয়াছিলেন, সে অনেকটা তাঁহার দেশীয় পরিচ্ছদের গুণে। ফলতঃ "নিজের উপধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করুক," ইহা অনেক সাহেবের বাসনা ও যাবতীয় মিশনারীর দৈনিক প্রার্থনার অঙ্গীভূত হইলেও, কেহ বেশভূষায় তাঁহাদের অনুকরণ করিলে অনেক সাহেবই বোধ হয় এই মনে করিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন যে, "এই লোকটী ভিন্ন সমাজের হইয়াও সেই ঈসপের দাঁড়কাকের ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে আমাদের দলে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে।" কেহ শিশুর অঙ্গভঙ্গীর নকল করিলে সে যেমন অসহিষ্ণুভাবে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, এক সমাজের লোকে অপর সমাজের অনুকরণ করিলেও অনেক স্থলে সেইরূপ বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ ইহাই বুঝিয়া, কোন ইউরোপীয়ানের সঙ্গে দেখা করিবার বেলাও নিজের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতেন না। অনেক সময়ে গাড়ীতে না যাইয়া 'থাং জাং' বা 'মহাপায়া' (একরূপ খোলা পাল্কি) চড়িয়া যাইতেন; তৎকালে একটী ভৃত্য আলবোলা লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, তিনি অসঙ্কোচে সাহেবদের সম্মুখে ভর্ ভর্ করিয়া তামাকের ধূম ছাড়িয়া দিতেন। অথচ যে সব ইউরোপীয়ানের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সকলেই তাঁহাকে সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন। এক বার National Magazine নামক পত্রে Mr. Skrine মহারাজপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "To know the Maharajah is to love him."

সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্র, চিত্র-কলা ও আলো-আলেখ্য বিদ্যায় (Photography) মহারাজের যেমন একটা উন্মাদিনী আসক্তি ছিল, তেমনি একটা ঈর্ষণীয় শক্তিও ছিল। কিন্তু তিনি আত্মপ্রশংসা অপেক্ষা আত্মপ্রসাদ ভাল বাসিতেন; তাই তিনি স্বকীয় এই গুণসমূহ যক্ষের ধনের মত চিরদিন অতি যত্নে, অতীব সঙ্গোপনে রাখিতেন; সাধারণ লোকে তাঁহার গুণের পরিচয় পাইবার কোন সুযোগই পায় নাই। সে যদু ভট্টাচার্য্য নাই, কাসেমালী খাঁর "রবাব" এখন নীরব। মহারাজের সঙ্গীত-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য কে দিবে? তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থনিচয় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে আসা দূরে থাকুক, যে দুচার খানা রাজপুরীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বোধ হয় এখন পলাতক আসামী; এরূপ স্থলে তাঁহার কাব্যকুশলতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ যাঁহার কলমের চেয়ে মরমের কবিত্ব বেশী ছিল, তাঁহার সহিত যাঁহারা হাসিবার মিশিবার অবসর পান নাই, তাঁহাদিগকে সেই নীরব ভাব-কবির পরিচয় কেমন করিয়া দিব? তিনি যথাযথ-বাদী (realistic) চিত্রকর ছিলেন; বিস্ফোটকটী তো দূরের কথা, মুখের ক্ষুদ্র আঁচিলটী পর্য্যন্ত গোপন করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি সাধারণ লোকের রুচির হিসাবে অশ্লীলতাপূর্ণ। সুতরাং সে গুলি লোকের চোখের সামনে ধরিলে অনেকের হয় ত 'হিষ্টিরিয়া' হইতে পারে। পুষ্পের আঘাতে মূর্চ্ছিত হওয়া ও হস্তি-শুণ্ডে যাতায়াত করা, অথবা উষ্ট্রবরকে গলাধঃ করিয়া মশক ভক্ষণের সময়ে উদ্গার দেওয়া আমাদের দেশে অশোভন বা বিরল নহে। উদার আকাশের ক্রোড়ে শুভ্র সূর্য্যালোকে রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য-শোভনা রমণীর নগ্নসৌন্দর্য্য শিল্পের হিসাবে কিরূপ মনোহর ও মহামূল্য, তাহা এ দেশের লোকের এখনো শিখিবার বিষয়।

তিনি ফটোগ্রাফী বিদ্যায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা সার্ভে জেনারেল আফিসের বৃদ্ধ কর্ণেল্ ওয়াটার হাউজ, প্রথিত নামা বোর্ণ এণ্ড শেফার্ড এবং সুচতুরকর্ম্মা ক্যাপ প্রভৃতি এ শাস্ত্রের ধনুর্দ্ধরেরা অবগত ছিলেন। তাঁহারই কাছে শিক্ষা পাইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বড় ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্ম্মা ইউরোপের কয়েকটী ফটোগ্রাফিক এক্‌জিবিশনে উচ্চ শ্রেণীর প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে এমেরিকার Practical Photographer

নামক পত্রে তাঁহার সচিত্র জীবনী বাহির হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে কখনো কোন প্রদর্শনীতে ফটো পাঠান নাই। অনুরোধ করিলে বলিতেন, "ও সব ছেলেদের সাজে, আমার কেন?" ফলতঃ যে যশঃস্পৃহাকে কাউপার অনেক দেখিয়া শুনিয়া "মহৎ হৃদয়ের শেষ দুর্ব্বলতা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা যৌবনের উত্তপ্ত শোণিতের উপরে অত্যুগ্র মদিরার ন্যায় প্রলয়ঙ্কর কার্য্য করিয়া থাকে, সেই যশোলিপ্সাকে উপযাচিকা হইয়াও এমন করিয়া এমন অপ্রত্যাশিত স্থানে উপেক্ষিতা হইতে আর কখনো দেখি নাই। শেষ বয়সের কথা বলিতেছি না, জীবনের বসন্তকালেও তিনি এই কুহকিনী অভিসারিকাকে এক দিনের তরে আদর সোহাগে আপ্যায়িত করেন নাই।

তাঁহার বহু যত্নের কবিত্বপূর্ণ ফটোখানা একজিবিশন-হলের দেয়ালে টাঙান থাকিবে, আর কোন অসাবধান অল্পজ্ঞান সমালোচক পান চিবাইতে চিবাইতে বা সীগার টানিতে টানিতে করধৃত যষ্ট্যগ্রদ্বারা সেই ছবি প্রদর্শন করিয়া গম্ভীরভাবে দায়িত্বশূন্য ভাষায় বলিবে, "ফটোখানার লাইট শেড্ ঠিক proportionate হয় নাই, মুখখানা বেশী উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হইয়াছে, পশ্চাতের লতা পাতা তেমন ফুটিয়া উঠে নাই—ইত্যাদি," ইহা মহারাজের অভিমানপূর্ণ কোমল অন্তঃকরণে সহ্য হইত না; ঐ ছড়ির আঘাত তাঁহার বুকে শক্তিশেলের মত বিদ্ধ হইত।

ঠিক এই কারণে, অর্থাৎ বাহিরের লোকের অপবিত্র স্পর্শে বা নিঃশ্বাসে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার লিখিত কাব্য গ্রন্থগুলিকে তিনি রাজ-অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে কঠোর জেনানা প্রথার শাসনাধীনে আজীবন আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। নিদাঘ নিশীথের চিন্তাপ্রসূত ও হৃদয়ের তপ্ত-শোণিত-লিখিত কবিতাগুলিকে কোন বাক্-চপল-আনাড়ী অনধিকারী সমালোচক লৌহ লেখনীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিবে, ইহা তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করিত। অহর্নিশ অশ্রান্ত চিত্ত মন্থন করিয়া যে সুধাভাণ্ডের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা লইয়া পাপাশয় অসুরেরা কাড়াকাড়ি করিবে ও উল্লাসে নৃত্য করিবে, এ বীভৎস দৃশ্য তাঁহার কাছে অসহনীয় ও অক্ষমার্হ ছিল। তিনি মনে করিতেন, যাহারা যশের প্রত্যাশী বা অর্থের পিয়াসী, সেই হতভাগ্যেরাই সমালোচকের দোদুল্যমান অসিতলে সোদ্বেগ-চিত্তে বিনিদ্রনয়নে অবস্থান করুক। অপরের সে বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি?

মহারাজের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির পরিচয় আমরা সময়ান্তরে "প্রদীপের" পাঠকবর্গকে প্রদান করিব। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি কিরূপ অনিন্দ্য কবিত্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাহার কবিতায় কষ্টকল্পনা বা অজীর্ণোদ্গার ছিল না। সুকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, সুবিজ্ঞ ভাবুক মিঃ আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের অনেকের সঙ্গে তাঁহার খুব মাখামাখি ভাব ছিল। রবিবাবু মহারাজের কার্সিয়ংস্থিত ভবনে প্রায় এক মাস কাল সপুত্র আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন দিনও মহারাজ স্বরচিত কাব্যগ্রন্থগুলি ইঁহাদের কাহাকেও দেখাইয়াছেন বলিয়া জানি না। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি স্বভাবকবি বালক যেমন সময়ে সময়ে খেলার সাথীর অভাবে স্বীয় উর্ব্বর কল্পনার সাহায্যে একটী নূতন অশরীরী বয়স্যের সৃষ্টি করিয়া তাহারই সহিত খেলিতে বসে, মহারাজও সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান বহির্জগতের আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য অন্তর্জগতের আত্মা নামক পুরুষকে প্রবুদ্ধ করত তাহারই সহিত আজীবন নীরব খেলা খেলিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি কোন সদ্যঃ পরিসমাপ্ত চিত্র বাম হস্তে ঈষৎ দূরে রাখিয়া, মস্তক দক্ষিণে বামে হেলাইয়া অঙ্গুলি চক্রের মধ্য দিয়া কুঞ্চিতভ্রূ নয়নে একাগ্র মনে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, অথবা যখন কোন কবিতা রচনা করিয়া উন্মনস্কভাবে গুন্ গুন্ স্বরে তাহা বারংবার পাঠ করিতেন, তখন মনে হইত, যেন পূর্ব্বোল্লিখিত অদৃশ্য পুরুষ আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছে, এবং ঐ আলেখ্য তাহাকে দেখান হইতেছে ও ঐ কবিতা তাহাকে শোনান হইতেছে। ফলতঃ আত্মচিত্তবিনোদনই মহারাজের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। লোকের 'বাহবা'কে তিনি নির্জ্জলা হাওয়া বলিয়া মনে করিতেন; প্রকৃত পক্ষে উহা 'নেহাত ফাকা আওয়াজ' ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু সংসারের কয়জনে তাহা বুঝে? হীরক ও অঙ্গার যে মূলতঃ একই পদার্থ, তাহা আমরা জানিয়াও বুঝি না, বুঝিয়াও মানি না।

মহারাজের যশোবিতৃষ্ণার অন্যতম উদাহরণ তাঁহার

দঙ্গোপনে দান। পূর্ব্বে আমাদের দেশে দান ধ্যান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অগ্নি বা শালগ্রামশিলার সমক্ষে নির্ব্বাহিত হইত, এখন তাহা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের সম্মুখে হইয়া থাকে. নতুবা ঐ সকল নাকি শুদ্ধ বা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু মহারাজ যে কত লোককে কত দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন তালিকা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, বা হইবে না; তবে যে সকল দুঃস্থ বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার দানে মৃত দেহে জীবনসঞ্চার পাইয়াছেন, ঐ সকল দানের তালিকা স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের হৃদয় ফলকে লিখিত আছে, এবং অন্তর্যামী পরমেশ্বরের মহাকেজখানায় তাহার হিসাব পত্র চির দিন সযত্নে রক্ষিত থাকিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মত বিশাল গ্রন্থ প্রচুর টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়া তাঁহারই ব্যয়ে বিনা আড়ম্বরে, বিনামূল্যে, অথচ বিনা C I E উপাধিতে বিতরিত হইয়াছিল। সে কালের রাজা-বাদশাহদের দানের মধ্যে যেমন একটা সুমধুর স্বাভাবিকতা, ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা ও সন্তোষ পরিলক্ষিত হইত, মহারাজের দানেও ঠিক সেই সকল ছিল।

তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এবার পূজার সময়ে বাড়ী যাবে না?" কম্পাউণ্ডার বলিল, "মহারাজ! এবার বাড়ী যাওয়া হবে না; কারণ শাস্ত্রেই আছে, "বাটী যাই—মাটী খাই।" মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কথার অর্থ কি?" কম্পাউণ্ডার উত্তর করিল, "মহারাজ! সকলে বাড়ী যায়—কত কি জিনিষ সঙ্গে লইয়া। পাঁঠা, কচু, কলা, কাপড়, পোষাক, গহনা ইত্যাদি কত কি জিনিষ বড় বড় আমলাদের সঙ্গে বাড়ী উঠিবে। আমি গরিব কি লইয়া বাড়ী যাইব? তাই বলিতে ছিলাম, আমাদের মত লোকের বাটী যাওয়া ও মাটী খাওয়া সমান।" মহারাজ দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া বৃদ্ধের হাত ভরিয়া টাকা দিয়া বিদায় করিলেন; এইরূপ আশাতিরিক্ত অর্থ পাইয়া বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এইরূপ রোমান্টিক অথচ সাত্ত্বিক দান আজ কালের (বজেট এষ্টিমেট) হিসাব নিকাশের দিনে—নিতান্তই বিরল; কিন্তু আগরতলার তদানীন্তন রাজদরবারে ইহা প্রায় দৈনিক ঘটনার মত ছিল।

গুণীলোক অনেক সময়েই গুণগ্রাহী হইয়া থাকে, অথবা মকরন্দ-গর্ভ কুসুমের নিকট আপনা হইতেই মধু-লোভী ভ্রমরকুল আসিয়া থাকে; এই কারণে এক সময়ে মহারাজের দরবারে এমন সব গুণবান্ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের কোলাহল ও আস্ফালনে সভামণ্ডপ এমন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে তদ্দৃষ্টে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই বাদবিচার পূর্ব্বপক্ষ-উত্তর সমস্যা-মীমাংসা পূর্ণ নবরত্ন সভার কথা স্মৃতি পথে পড়িত —ইহা কল্পনার কষ্টসৃষ্টি নহে, বাস্তব পরীক্ষিত সত্য। এ স্থলে কয়েকটী গুণীলোকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

১। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য—বাড়ী বর্দ্ধমান, বনবিষ্ণুপুর। পূর্ব্বে কলিকাতা ঠাকুর বাড়ী (মহর্ষির বাড়ী) সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র। প্রথমে বেশী শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলিয়া মহারাজের সংস্রবে ইনি প্রসিদ্ধ গায়ক, সঙ্গীতরচক ও বাদক হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত নট-নারায়ণ রাগে গেয় মহারাজ সংক্রান্ত ও অন্যান্য নানা বিষয়ক অনেকগুলি ধ্রুপদ গান এখনও সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ কালোয়াৎ-দের কাছে তানসেনের গানের ন্যায় অতি প্রিয় ও সমাদৃত। মহারাজ মৃত্যুর কিছুপূর্ব্বে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিপাটী রূপে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মুদ্রণও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, দেখিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান মহারাজ এই সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্য্যটী পরিসমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। না করিয়া থাকিলে, করা উচিত। মহারাজের আরব্ধ অপর একটী প্রিয় কার্য্যও এইরূপ আয়ুর হ্রস্বতা বশতঃ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। আগরতলার রাজবংশের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস অতি প্রাচীনকাল হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে। উহার নাম 'রাজমালা,' উহা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। উহাতে বিভিন্ন সময়ের বাঙ্গলা রচনায় বিবিধ নমুনা পাওয়া যায়। যে কারণেই হোক, স্বর্গীয় মহারাজ উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, সংস্কৃত রচনায় সিদ্ধহস্ত কতিপয় পণ্ডিতের সাহায্যে "রাজরত্নাকর" নাম দিয়া ঐ গ্রন্থের এক সংস্কৃত পদ্যানুবাদ বহুব্যয়ে বহুযত্নে মুদ্রিত করিতেছিলেন। ম্যাকেঞ্জি নামক একজন সাহেবকে নিজের ব্যয়ে বিলাত পাঠাইয়া তাঁহাকে "কলোটাইপ্-প্রসেস্" (Collotype Process) শিখাইয়া তাঁহার দ্বারা বহুমূল্যের কলোটাইপ্-মেশিন্" প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে,উক্ত'রাজ-রত্নাকর'গ্রন্থে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ্যাভিষেক, বিবাহ প্রভৃতি প্রথার নিদর্শক কতিপয় কলোটাইপ্-চিত্র সন্নিবেশিত করিবেন। কিন্তু মানুষের আশাকে টানিয়া রবরের মত দীর্ঘ করা সহজ হইলেও আয়ুকে সেরূপ করা যায় না ; তাই মহারাজকে অপূর্ণ আশা বুকে লইয়াই সংসার হইতে বিদায় লইতে হইল। বর্ত্তমান মহারাজ সুবোধ ও সদাশয়, পিতার এই আরব্ধ কার্য্যটীকে তিনি কি সমাপ্ত করিবেন না ?

২। কাশেমালী খাঁ—রবাব (রুদ্র বীণা—সংস্কৃত নাম) নামক প্রসিদ্ধ কাবুল দেশজাত যন্ত্রের বাদক। এই যন্ত্র রক্তচন্দন প্রভৃতি শক্ত কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহাতে কোন পর্দ্দা বা 'সুন্দরী' নাই। ধাতুর তারের পরিবর্ত্তে ইহাতে তাঁত থাকে। কাঠের ছাউনী (তবলী) না থাকিয়া গোধিকার ছাউনী থাকে। ইনি সুরবীণ্ (স্বরবীণা), বীণ্ (বীণা) ও সুর-শৃঙ্গার প্রভৃতিও বাজাইতে খুব্ দক্ষ ছিলেন। অন্যে শিখিবে এই ভয়ে রবাব বাজান কাহাকেও বড় বেশী শুনাইতেন না। এমন কি,নিজের সন্তান হইলে শিখিবে এই আশঙ্কায়ই নাকি তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন।

তিনি প্রথমে রামপুরের নবাব ও নেপালের মহারাজের দরবারে ছিলেন। পরে আগরতলায় আসেন। রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর যখন মহারাজের মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে রাজসংসারের ব্যয় সংক্ষেপ উপলক্ষে ইনি কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। পরে ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরের রাজ বাড়ীতে কার্য্য গ্রহণ করেন,—ঢাকায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি প্রসিদ্ধ মিঞা তানসেনের বংশধর। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বোল্লিখিত যদুর সঙ্গে ইহার অত্যন্ত প্রতিযোগিতা ছিল। সেই জন্য ইনি কখনও যদুর কাছে প্রাণান্তেও রবাব বাজাইতেন না, এমন কি তাঁহাকে যন্ত্রটীও দেখাইতেন না। কিন্তু যদু লুকাইয়া লুকাইয়া বাজনা শুনিত ও যন্ত্র দেখিত। কিয়ৎকাল পরে এক দিন যদু মহারাজকে বলিল, "অনুমতি হইলে আমি একবার ধর্ম্মাবতারকে রবাব বাজাইয়া শুনাইতে চাই। মহারাজ বলিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে ? কাশেমালী তো তোমার হাতে তাহার রবাব দিবে না।" যদু বলিল, "আমি নিজে রবাব তৈয়ার করিয়াছি, সেই রবাব বাজাইব।" মহারাজ বিস্মিত ও প্রীত হইয়া তাহাকে পরদিনই বাজনা শুনাইতে অনুমতি দিলেন। এ দিকে কাশেমালী খাঁর কাণে যদুর এই দুঃসাহসিক প্রস্তাবের কথা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদু মহারাজের কাছে হাজির হইল ; কাশেমালী খাঁও ব্যগ্র বেপথু চিত্ত লইয়া দরবারের এক প্রান্তে উপস্থিত। যদু বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে স্বহস্ত-রচিত রবাব বাহির করিয়া অতি দক্ষতার সহিত বাজাইয়া মহারাজকে শুনাইল। তিনি প্রীত হইয়া যদুর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কাশেমালী খাঁ বিষাদ-মন্থর পদক্ষেপে মহারাজের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া এক সুদীর্ঘ আলস্যপূর্ণ সেলাম ঠুকিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আজ থেকে আমি রাজদরবার হইতে বিদায় হইতে চাই। এক রবাবের জন্যই আমার যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল, যদু যখন তাহাতেও ভাগ বসাইল, তখন আমার এখানে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।" মহারাজ তাঁহাকে আশ্বাসপূর্ণ মধুর বচনে প্রবোধ দিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

৩। পঞ্চানন মিত্র—(ওরফে পাঁচু বাবু) বাড়ী কলিকাতা। মহারাজকে পাখোয়াজ ও তবলা বাজনা শিখাইতেন। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল ; কিন্তু পরে মহারাজ তাঁহার অপেক্ষা ভাল বাজাইতে পারিতেন। ইঁহার কার্য্যের লকব্ (পদবী) ছিল—মহারাজের নিজ তহবিলের দেওয়ান, কিন্তু তাহা নাম মাত্র ; মহারাজকে বাজনা শিক্ষা দেওয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গীতালোচন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল।

৪। প্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মনোহরসাহী গায়ক।

৫। ক্ষেত্র মোহন বসু—গায়ক।

৬। রাম কুমার বসাক—বাড়ী ঢাকা (নবাবপুর।) পাখোয়াজ বাদক।

৭। নিশাদ হোসেন—সেতার ও সুরবীণ বাদক।

৮। ইমামী বাইজী—রামপুরের নবাবের দেশে জন্মস্থান। দীর্ঘকাল আগরতলায় বেতন-ভোগিনী থাকিয়া মহারাজকে গান শুনাইয়াছিল।

৯। চাঁদা বাইজী—মহারাজের রাজ্যাভিষেক সময়ে বেনারস্ হইতে অনাহূত ভাবে আসে। দেখিতে অতি কুৎসিত বলিয়া আসরে তাহার মুজ্রা হয় নাই; সে ভাল গাইতে পারে বলিয়া কেহ মনে করে নাই। একদা জ্যোৎস্নারাত্রে মনোদুঃখে রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ দীর্ঘিকার উত্তর পারের সিঁড়িতে বসিয়া সে বেহাগ রাগের একটী গান গাইতেছিল। মহারাজ গান শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন

তাহার মুখে আরও কয়েকটী গান শুনিলেন। এমন সুগায়িকার কেন আসরে মুজ্‌রা হয় না, বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং সেই রাত্রেই তাহার বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার পরে সে দীর্ঘকাল আগরতলায় থাকিয়া মহারাজকে গান শুনাইয়াছিল।

১০। কেশব চন্দ্র মিত্র—স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা। পাখোয়াজ বাজাইবার জন্য কিয়ৎকাল নিযুক্ত ছিলেন।

১১। সাধু তবল্‌চী—বাড়ী কলিকাতা। মহারাজেরই ছাত্র। ঢাকার প্রসিদ্ধ হসনুও তাঁহারই ছাত্র।

১২। হরিশ্চন্দ্র পাগ্‌লা—(কায়স্থ)—বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়; বেহালায় খুব্‌ ওস্তাদ্‌ ছিল।

১৩। মদনমোহন মিত্র—'কবিতা কদম্ব,' 'জীবনময় কাব্য' প্রভৃতির গ্রন্থকার। ইহাকে রাজ-কবি (Poet Laureate) বলিলেও চলে। ইহার বাড়ী ঢাকার সন্নিকটে।

১৪। নবীন চাঁদ গোস্বামী—সেতার বাদক।

১৫। হাইদর খাঁ—এস্‌রাজ বাদক।

১৬। ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—গায়ক।

১৭। বড়লাট নর্থব্রুক সাহেব যখন ঢাকায় আসেন তখন এ অঞ্চলের অন্যান্য রাজা জমীদারদের ন্যায় মহারাজও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে 'কেডি' নামে একজন সাহেব চিত্রকর মহারাজের চেহারা আঁকিয়াছিলেন। সেই ছবি দেখিয়া মহারাজ এত সন্তুষ্ট হন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া আসেন। ইনি দীর্ঘকাল রাজধানীতে ছিলেন এবং মহারাজ প্রধানতঃ ইঁহারই কাছে তৈল-চিত্রাঙ্কন শিখিয়াছিলেন।

১৮। ফটোগ্রাফী বিদ্যার আবিষ্কারের অল্পপরে মহারাজ এক জন ফরাসীকে বেতনভোগী করিয়া রাজধানী লইয়া আসেন এবং তাঁহার সাহায্যে কলোডিয়ান্‌ প্রণালীতে ফটো তুলিতে আরম্ভ করেন। বোধ হয় ইহার আগে এদেশীয় কোন লোক ফটোগ্রাফী শিক্ষা করেন নাই। উত্তর কালে নিজের অতুল অধ্যবসায়ের বলে, ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত নানা ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্যে, বর্ত্তমান সময়ে যত রকম ফটোগ্রাফিক প্রণালী আবিষ্কৃত আছে, তিনি তাহার প্রায় সমস্তই সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শেষবার যখন তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন সার্ভে জেনারেল আফিসের প্রসিদ্ধ টার্নার সাহেবের সাহায্যে হাফ্‌টোন ব্লক্‌ তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিলেন।

১৯। লিথোগ্রাফি শিখাইবার ও তুলিবার জন্য একজন ফরাসী কয়েক দিন নিযুক্ত ছিল।

দরবারে বারমেসে বেতনভোগী কয়েকটী উচ্চশ্রেণীর পালোয়ান্‌ (মল্ল) ছিল। বিদেশ হইতে কোন পালোয়ান আসিলে এই পালোয়ান্‌দিগকে তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে হইত। প্রতিযোগিতায় বিদেশী জয়ী হইলে এবং সে সম্মত হইলে সেই দণ্ডে সেই স্থলে পরাজিতকে বিদায় করিয়া বিজেতাকে তৎপদে নিযুক্ত করা হইত।

প্রথম বয়সে মহারাজ পালোয়ানদের কাছে কুস্তি শিক্ষা করিতেন, মৃগয়াতেও তাঁহার অতিশয় আসক্তি ছিল; এইরূপ ব্যায়ামের ফলে তাঁহার শরীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি মৃগয়া বা পালোয়ান্‌গিরি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার কোন জামাতা পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখিতেছেন শুনিয়া তিনি একদিন বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলন, "কুস্তি টুস্তি ভদ্রলোকের সাজে না; উহাতে যে কেবল শরীর মোটা হয় এমন নহে, বুদ্ধিটাও মোটা হইয়া যায়।"

প্রাচীন বয়সে পারিবারিক ও রাজনৈতিক নানা চিন্তায় তাঁহার পূর্ব্বের সেই অনবদ্য স্বাস্থ্য কিয়ৎপরিমাণে ভগ্ন হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ থাকাতে বঙ্গের অধিকাংশ ধনিসন্তানের ন্যায় তাঁহার দেহ অজীর্ণ অম্লোদ্গারজর্জ্জরিত অস্থিকণ্টকিত মাংস খণ্ডে বা অবিরত ঘর্ম্মসিক্ত তরঙ্গাবর্ত্তময় মেদপিণ্ডে পরিণত হয় নাই। দাঁত নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তিনি কখন পান খাইতেন না; মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার দুই পাটি দাঁত অটুট ছিল।

শেষ বয়সে তিনি কাণে একটু কম শুনিতেন, সেইজন্য তাঁহার গীত বাদ্যের আলোচনা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তখন তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় (hobby) ছিল—ফটোগ্রাফী ও তৈল চিত্র। তাঁহারই উদ্যোগে প্রতি-বৎসর রাজধানীতে একটী ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী বসিত। তাহাতে রাজকুমারগণ, ঠাকুরেরা (ইঁহারা মহারাজের জ্ঞাতি। বিবাহ আদি সম্বন্ধে রাজ পরিবারের সহিত সংসৃষ্ট) এবং স্বল্প সংখ্যক বিদেশী বাঙ্গালিরা ফটো প্রদর্শন করিতেন।

যাহাতে রাজকুমারগণ সকলেই ফটোগ্রাফী শিক্ষা করেন, ইহা তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। একবার মহারাজের একটী কুমার প্রদর্শনীতে ফটো পাঠান নাই, তাহাতে মহারাজ বিরক্তির সহিত নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"অনেক হয় ত মনে করে যে, এই এক্‌জিবিশন্‌টা আমার ফটো ম্যানিয়া (photo mania) রোগেরই একটা লক্ষণ বিশেষ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের মত লোকের ছেলে পিলের, যাহাদের চাকরী করিতে হয় না, বা কোন নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কার্য্য নাই, আজ বাঁদরওয়ালা আসিল,—সমস্ত দিন বাঁদর নাচই দেখিল, কাল হরি সঙ্কীর্ত্তন হইল, সমস্ত দিন সঙ্কীর্ত্তনই শুনিল, এইরূপ পতঙ্গ-প্রকৃতি অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব লোকের পক্ষে সর্ব্বদা হাতের কাছে ধরিবার ছুঁইবার একটা কিছু থাকা চাই। মস্তকের উপরে এমন একটা কার্য্যভার সর্ব্বদা দোদুল্যমান থাকা চাই, যাহা উঠিতে বসিতে ললাট স্পর্শ করে। তাহা হইলে বৃথা গল্প বা পরনিন্দা করিয়া, স্বাস্থ্য-চিত্ত-হানিকর আমোদ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, অথবা সংবাদ-পত্রের আজ্‌গবি সংবাদ পড়িয়া ও আঙুল মট্‌কাইয়া, জীবনের মূল্যবান্ দিনগুলিকে ছারপোকার মত আঙুলে টিপিয়া একটী একটী করিয়া মারিতে হয় না। এই ফটোগ্রাফীর কাজটা হাতে থাকিলে, অর্থাৎ বৎসরান্তে এক্‌জিবিশনে ফটো প্রদর্শন করিতে হইবে, একথাটী মনে জাগরূক থাকিলে, আমাদের ছেলেদের অন্তঃকরণ অনেক পরিমাণে কলঙ্কস্পর্শ হইতে মুক্ত থাকিবে। আর প্রথম বয়সটা যদি এই হুজুকে কাটিয়া যায়, তবে ভাবী জীবন সচ্চিন্তার প্রসর ক্ষেত্রে ও সৎকর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে পরিণত হইলেও হইতে পারে।"

উপরের কথাগুলি এত দূর সত্য যে, উহার উপরে টীকা করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশের ধনী যুবকদিগকে কেবল ফটোগ্রাফী বিদ্যাটী ভালরূপ শিখাইয়া দিতে পারিলে, তাহাদের জাহান্নমে যাইবার পথ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

এক্ষণে মহারাজের শেষ বয়সের দৈনিক জীবনের একটী ছবি পাঠাকদিগকে উপহার দিতেছি। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বড় লোকদের দৈনিক জীবনবৃত্তের অত্যন্ত আদর। এ দেশে এরূপ জিনিষ বিকাইবে কি না জানি না, তাই সংক্ষেপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিব।

প্রত্যহ প্রাতে ৮।৯ টার সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিচ... রীর নল মুখে করিয়া মহারাজ বৈঠক খানা ঘরে ফ... বিছানার উপরে বসিতেন। এত বেলায় উঠিবার কার... কেবল পূর্ব্বদিন অত্যধিক রাত্রি জাগরণ। কি জন্য এত রাত্রি জাগিতে হইত, তাহা যথাস্থানে বলা যাইবে। এই সময়ে রাজপরিবারের ডাক্তার পরেশ বাবুকে উপস্থিত থাকিয়া মহারাজের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হইত; এক... তিনি তাহা বলিলে ডাক্তার বাবু তদনুসারে ঔষধ প্রস্তুত করিতে যাইতেন। যদিও মহারাজ হোমিওপ্যাথীরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি তিনি এলোপ্যাথী কবিরাজী হেকেমী ঔষধও ব্যবহার করিতেন। কোন বিষয়ে পরমুখা... পেক্ষী হওয়া বা অন্ধবৎ পরের দ্বারা চালিত হওয়া তিনি ভালবাসিতেন না; সেই জন্য কবিরাজী ও ডাক্তারী সংক্রা... অনেক গুলি বই সংগ্রহ করিয়া রীতিমত অধ্যয়ন পূর্ব্বক ন্যূনাধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। নিজের অসু... বিসুখে নিজেই সচরাচর ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। অধিকাংশ সময়ে কেবল ঐ ব্যবস্থার অনুমোদন করা পরেশ বাবুর কার্য্য হইত। এক দিন ডাক্তার বাবু কথা প্রসঙ্গে আক্ষে... করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজকে চিকিৎসা করিয়া কো... সুখ নাই, অনেক সময়েই তিনি নিজের ব্যবস্থা নিয়ে... করিয়া থাকেন; আমি সাক্ষী গোপালের মত উপস্থিত থাকি মাত্র।"

ডাক্তার বাবু কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় হইলে মহারাজ সেই কঠোর হাড়-ভাঙা পাহাড়ে শীতেও একটী মাত্র উড়ানী দ্বারা সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিয়া পায়খানা... যাইতেন। তাঁহার শীতবোধ এত কম ছিল যে, দেওয়া... বাবুর মুখে শুনিয়াছি, মধ্যম বয়সে শীতে গ্রীষ্মে অবিশ্রা... তাঁহার জন্য সজোরে পাখা চলিত, তিনি খালি গায়ে ব... পাতলা একটী জামা মাত্র গায়ে দিয়া, সেই পাখার নীচে বসিয়া থাকিতেন। বার মাস মহারাজ পারাবত-মাং... ও পলান্ন ভক্ষণ করিতেন। তাহার সহিত এই শীত বোধ হীনতার কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। যে অযোধ্যার নবাবে... শীতাল্পতার বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, তিনি অত্যন্ত কপোত-মাংস-প্রিয় ছিলেন।

তিনি এত দূর তাম্রকূট-প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার পায়... খানায় যাইবার পূর্ব্বেই একটী পৃথক্ বিদরী তাঁহার জ...

সেখানে সুজ্জীকৃত থাকিত। ফলতঃ এমন অষ্টপ্রহরব্যাপী তাম্রকূট সেবন আর কোথাও দেখি নাই। আহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত সকল সময়েই তাঁহার মুখে নল থাকিত। শকটারোহণে পরিভ্রমণ, সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎকার, অধ্যয়ন ও চিত্রাঙ্কনের সময়েও বেল ফুলের মালা জড়িত সেই সুবর্ণ নির্ম্মিত 'মুখ-নল'টীর সহিত তাঁহার অধরপুটের বিচ্ছেদ হইত না। যখন তিনি পদব্রজে বাহির হইয়া কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো তুলিতে যাইতেন, এবং কেমেরা সুসংস্থাপিত ও লক্ষ্য সংযুক্ত করিবার জন্য চঞ্চল চরণে দক্ষিণে বামে বিচরণ করিতেন, তখনো 'হুকা-বর্দার্'কে কৌশলপূর্ণ ক্ষিপ্রগতিতে এমন ভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রীহস্তে ঘুরিতে ফিরিতে হইত, যেন উহার নল তাঁহার মুখ-ভ্রষ্ট হইয়া না যায়। যতক্ষণ তিনি বহির্ব্বাটীতে থাকিতেন, ততক্ষণ এইরূপ চলিত; অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র বহির্ব্বাটীর হুকাবর্দার্ হুকো লইয়া ফিরিয়া আসিত; একটী অন্তঃপুরচারিণী দাসী (আগরতলার ভাষায় 'সেবাইতা' বলে, বোধ হয় 'সেবিকা' শব্দের অপভ্রংশ) দ্বিতীয় একটী তৈয়েরী বিদ্রীর নল মহারাজের মুখের কাছে ধরিত, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই দৃশ্যটী দেখিলে স্বতঃই কাদম্বরীর সেই তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর কথা মনে পড়িত।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাণতত্ত্ব।*

ভারতীয় হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন শ্রেণীর পুরাণই ষ্ট হয়। এতন্মধ্যে হিন্দুদিগের পুরাণই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রথমে হিন্দু পুরাণের কথাই অতি সংক্ষেপে বলিব।

অথর্ব্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আর্য্য জাতির সুপ্রাচীন শাস্ত্রসমূহে পুরাণপ্রসঙ্গ আছে। অথর্ব্ববেদের মতে—"অপরাপর বেদের সহিত যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট হইতে পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছিল।" (১১।৭।২৪) শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, অধ্বর্য্য পুরাণ কীর্ত্তন করিতেন। (১৩।৪।৩।১৩)।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও মনুসংহিতায়ও আছে,—শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ সকল ও খিল সমূহ শুনাইতে হইবে। (আশ্বগৃহ্য ৪।৬, মনু ৩।২৩২)। এই কয়টী প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, এক সময়ে পুরাণ আর্য্য হিন্দুগণের অবশ্যপাঠ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।

শঙ্করাচার্য্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য ও সায়ণাচার্য্যের ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্যোপক্রম হইতে জানা যায় যে, দেবাসুরের যুদ্ধ, পুরূরবা-উর্ব্বশী-সংবাদ এইরূপ ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস ও 'সর্ব্ব প্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল,' ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ। ইহাতে মনে হয়, বেদের ব্রাহ্মণভাগের অংশবিশেষই পুরাণ ও ইতিহাস বলিয়া গণ্য ছিল। আবার মহাভারতে আদিপর্ব্বে শৌনক ভারতবক্তা উগ্রশ্রবাকে বলিতেছেন, 'পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার নিকট সে সকল কথা শুনিয়াছি'। (৫ম অধ্যায়)।

মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে, 'পুরু, কুরু, যদু, শূর, যুবনাশ্ব, কুকুৎস্থ, রঘু, নিষধাধিপতি নল প্রভৃতি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য ও আর্জবাদির বিবরণ বিদ্বান্ সৎকবিগণ কর্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।' এতদ্দারা বোধ হইতেছে যে, নানা কবি পুরাণ লিখিয়াছেন; স্মরণীয় মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও প্রাচীন পুরাণসমূহের উদ্দেশ্য ছিল। বেদে বিভিন্ন মহাপুরুষগণের চরিত কীর্ত্তন 'নরাশংস' নামে অভিহিত। এই সকল নারাশংসী গাথাই আদি পুরাণের একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পুরাণার্থবিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা রচনা করেন। স্বয়ং দেখিয়া যে কথা বলা যায়, তাহাই আখ্যান, পরম্পরাশ্রুত কথার নাম উপাখ্যান, পিতৃবিষয়ক ও পরলোকবিষয়ক গীত ও অন্যান্য কোন কোন গীতের নাম গাথা ও শ্রাদ্ধকল্পনির্ণয়ের নাম কল্পশুদ্ধি বা কুলধর্ম্ম।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, বেদব্যাস ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত

* সাহিত্য-পরিষদের গত পৌষ মাসের অধিবেশনে পঠিত।

একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার সূতজাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। পরে লোমহর্ষণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তচ্ছিষ্য অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন এই তিন জনে তিনখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। এই চারিখানি পুরাণসংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম, তৎপরে পাদ্ম, তৎপরে বৈষ্ণব, এইরূপে পরে পরে ১৮ খানি পুরাণ রচিত হইয়াছে।"

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, বেদের ব্রাহ্মণ-অংশে উপাখ্যান, গাথা প্রভৃতি যে সকল পুরাণসম্বন্ধী কথা ছিল এবং বেদব্যাসের সময়ে যে সকল জ্ঞাতব্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা কবির বিবরণ একত্র করিয়া বেদব্যাস পুরাণসংহিতা প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে পুরাণ একখানি বিস্তৃত সংহিতাকারে ছিল না, তিনিই সংহিতাকারে পুরাণ প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া ও সেই সংহিতা অবলম্বনে পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া সকল পুরাণ বেদব্যাসের বিরচিত বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

পুরাণ সংহিতাবদ্ধ হইবার পর সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এইরূপে পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণবাদি অষ্টাদশ পুরাণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। তাহার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন পুরাণ হইতেই জানিতে পারি :—বিষ্ণুপুরাণে আছে—"অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুষ্বশ্বথামপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভ এব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকলসুরাসুরবন্দিতচরণযুগলস্যাত্মেচ্ছাকারণ-মানুষরূপধারিণোঽনুভাবাৎ পুনর্জ্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ যজ্ঞে॥ যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তিধর্ম্মেণ পালয়তীতি।" (৪।২০।১২—১৩)।

এখানে জানা যাইতেছে যে, আদি বিষ্ণুপুরাণ-রচনাকালে পরিক্ষিৎ রাজ্যপালন করিতেছিলেন। মৎস্যপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে—

"অশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্তু বীর্য্যবান্।
যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।
তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রন্তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতং।
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রিণি বর্ষাণি পুষ্করে।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃশদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।" (৫০।৬৬—৬৭)।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উপসংহারপাদেও ঐ শ্লোকটী পাইয়াছি। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যখন পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণ ভারত শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ রচিত হইয়াছিল। সকল পুরাণ-মতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণই শেষ বা অষ্টাদশ পুরাণ। এরূপ স্থলে পরিক্ষিতের সময়ে মহাপুরাণের রচনা-কাল আরম্ভ এবং তাঁহার প্রপৌত্রের পুত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রাচীনতম কালে রচিত বলিয়া কি মনে হয়? অনেকে বলিতে পারেন, তাহা হইলে পুরাণ মধ্যে ভবিষ্য রাজবংশ-প্রসঙ্গে আধুনিক কথা কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল! এদিকে অধ্যাপক উইল্‌সন্ ও মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ অনেকেই বলিতেছেন, খৃষ্টীয় ৮ম হইতে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহাই কি গ্রাহ্য করিতে হইবে?

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ গিয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরাই একথা লিখিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আজও বালিদ্বীপের শৈব ব্রাহ্মণেরা দেববৎ রক্ষা করিয়া থাকেন এমন কি তথাকার কোন শূদ্রকেও তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ শুনিতে বা দেখিতে দেন না। ডাক্তার ফ্রেডারিক সাহেব ওলন্দাজ ভাষায় ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ ও ইহার কতকগুলি শ্লোক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল শ্লোকের সহিত মৎপ্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোক মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাহার অবিকল মিল আছে। কেবল এদেশীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যে ভবিষ্য রাজবংশাখ্যান আছে বালিদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাহা এক কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? অধিক সম্ভব, ভবিষ্য-রাজবংশপ্রসঙ্গ প্রাচীনতম পুরাণসমূহে স্থান পায় নাই। তাহা হইলে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে আনীত যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উহা অবশ্যই স্থান পাইত। তবে ঐ সময় হইতে যে পুরাণ মধ্যে ভবিষ্যাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ভট্ট কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিয়াছেন, 'পৃথিবীবিভাগ, বংশানুক্রমণ, দেশকাল-পরিমাণ, ভাবী কথন ইত্যাদি পুরাণের বিষয়।'

প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত যখন রচিত হয়, তখন ভবিষ্য রাজবংশবর্ণনা পুরাণের দশবিধ লক্ষণ মধ্যে স্থান পাইয়াছিল

তবে পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণে এ প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছিল কি না, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

এখনকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য, ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেই আদি পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই জন্য ঐ পাঁচখানিকে (ভাবী পঞ্চমাংশ বাদ দিয়া) আমরা অনেকটা খাঁটী পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐ সকল পুরাণে সেই জন্য আর্ষ শ্লোকের ছড়াছড়ি।

কেহ বলিতে পারেন, যদি ১৮ খানি পুরাণ ঐরূপ প্রাচীনকালে প্রায় ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট পুরাণের নাম আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না কেন? যখন আদি পুরাণ বেদের ব্রাহ্মণাংশ বলিয়া গণ্য ছিল, তখন অবশ্যই বিভিন্ন পুরাণের নামকরণ হয় নাই। কিন্তু ভগবান্ বেদব্যাসের পুরাণসংহিতা অবলম্বনে অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইলে তৎকালীন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণের কথা আলোচিত হইয়াছিল। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে এই প্রমাণ পাইয়াছি—

"অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্য্যম্ণঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরর্ষয়ঃ।
উত্তরেণাযম্ণঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি কল্পতে।"

শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগোপনিষদ্ভাষ্যে এইরূপ পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যে প্রজামীষিরে ধীরা স্তে শ্মশানানি ভেজিরে।
যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।"

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে 'অষ্টাশীতি সহস্রাণি' ইত্যাদি যে পুরাণ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের সংগৃহীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অনুষঙ্গপাদে ৫৪ অধ্যায়ে ঐ বচনগুলি বিবৃতি সহ পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন উক্ত আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে আরও এক স্থানে ভবিষ্যৎ পুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"আভূতসংপ্লবাত্তে স্বর্গজিতঃ।
পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তীতি ভবিষ্যৎপুরাণে।" ২।২৪।৫-৬

অর্থাৎ পিতৃগণ প্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। পুনরায় সৃষ্টিকালে বীজার্থ হইয়া থাকেন, এ কথা ভবিষ্যৎ পুরাণে আছে। দুঃখের বিষয়, প্রচলিত ভবিষ্যৎপুরাণে ঐরূপ কথা না পাওয়া গেলেও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অনুষঙ্গপাদে ৮ম অধ্যায়ে ঐ বিবরণ পাইয়াছি। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র রচনাকালে যে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যৎ পুরাণের বচন হইতেই জানা যাইতেছে। উক্ত আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের উদ্ধৃত বচনগুলি আর্ষ সংস্কৃতে গ্রথিত, উহা এখনকার ব্যাকরণসঙ্গত নহে। ইহাতে বোধ হইতেছে—আদি অষ্টাদশ পুরাণও ঐ আর্ষ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে নানা পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া অনেকটা মার্জ্জিত হইয়াছে।

সেই প্রাচীন পুরাণে কি ছিল, মৎস্যপুরাণে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে জানা যায় বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয় ও মৎস্য ব্যতীত অপর পুরাণসমূহে তত্তৎ পুরাণের প্রাচীন আদর্শ লইয়া তাহাতে অনেক অভিনব কথা সংযোজিত ও অনেক প্রাচীন কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবার প্রভাব লক্ষিত হয়।' সম্ভবতঃ এই সময়েই ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন পুরাণসমূহ সংগ্রহ বা প্রচলন করিতে থাকেন। সেই জন্য আমরা পুরাণ মধ্যে ভবিষ্য রাজবংশ প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজগণেরও সন্ধান পাই। অধিক সম্ভব রাজসভাশ্রিত প্রাচীন পৌরাণিকগণ পুরাণ মধ্যে তত্তৎ রাজবংশ-তালিকার প্রক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, কালে তাহাই পুরাণের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। তাহা বলিয়া পুরাণের প্রাচীনত্ব লোপ পায় নাই। তৎকালে ভারতে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈন এই কয় সম্প্রদায়ই প্রধান ছিলেন। ব্রাহ্মণানুরক্ত শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তগণ যে যে পুরাণে আপনাদের অভীষ্ট দেবের কথা পাইয়াছিলেন, তাহাকেই আপনাদের নিজ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। এই জন্য আমরা স্কন্দপুরাণীয় কেদারখণ্ডে দেখিতে পাই।

"অষ্টাদশ পুরাণেষু দশভির্গীয়তে শিবঃ।
চতুর্ভি ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বাভ্যাং দেবী তথা হরি।" ১ অঃ।

সাম্প্রদায়িক প্রভাবেও বিভিন্ন পুরাণে অনেক প্রক্ষিপ্ত জিনিস স্থান পাইয়াছে।

এই সময় জৈন সম্প্রদায়ও বিভিন্ন পুরাণ রচনা করিয়া হিন্দু পুরাণগুলি বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, জৈনদিগের পুরাণ গুলি পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া

যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ে নারদ পুরাণে অষ্টাদশ পুরাণো-উপক্রমণিকা সঙ্কলিত হয়। সে সময়ে সংগ্রহকার যত গুলি হিন্দুপুরাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই অনুক্রমণিকা প্রকাশ করিয়া সাধারণকে সাবধান করিয়া দেন যে, ঐ যে বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন অনুক্রমণিক প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কোন বিষয় সেই সেই পুরাণের অঙ্গাধীন নহে অর্থাৎ তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আদিপুরাণের রূপ মৎস্যপুরাণের অষ্টাদশ পুরাণানুক্রমণিকায় বিবৃত হইয়াছে; আর হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কালে নানা সম্প্রদায়ের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত আকারে যে পুরাণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার রূপ আমরা নারদ পুরাণের অষ্টাদশপুরাণানুক্রমণিকায় দেখিতে পাই। এই নূতন সংস্করণই এখন চলিয়া আসিতেছে। তবে পদ্ম, স্কন্দ, প্রভৃতি কোন কোন পুরাণ মধ্যে মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মবীরগণের অভ্যুদয়ে কতক কতক প্রক্ষিপ্ত বচন প্রবেশ লাভ করিয়াছে, নারদীয় পুরাণের অনুক্রমণিকার সহিত প্রচলিত পুরাণের অনুক্রমণিকা মিলাইলে তাহা ধরিতে পারা যায়। তবে চারি লক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণ মধ্যে এরূপ নিতান্ত অপ্রাচীন শ্লোকের সংখ্যা দুই শতাধিক হইবে না। অবশেষে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, হিন্দুপুরাণ মধ্যে এই নগণ্য প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত আর সকল অংশ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে সংগৃহীত বা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সঙ্কলন গ্রন্থে তিন চারি হাজার বর্ষের পূর্ব্বতন শ্লোকাবলীও স্থান লাভ করিয়াছে। 'বিশ্বকোষে' পুরাণ শব্দে এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, সময়াভাব ও বাহুল্যভয়ে তাহা আর এক্ষণে আপনাদিগকে জানাইতে পারিলাম না। যাঁহারা এই বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি বিশ্বকোষে পুরাণ শব্দ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এখন আমি জৈন পুরাণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কালে জৈন সম্প্রদায়ও প্রবল ছিল। তাঁহারা হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনী উড়াইয়া দিবার জন্য ও আপনাদের উপাস্য তীর্থঙ্কর ও সাধুদিগের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য পুরাণ লিখিতে আরম্ভ করেন। তবে ব্রাহ্মণদিগের মত তাঁহারা স্ব স্ব রচনার অতি প্রাচীনত্ব স্থাপনে অগ্রসর হয়েন নাই। তাহারা যে শাকে যে সময়ে পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদিগের যেমন দশটী অবতার, জৈনদিগের অনেকটা সেইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্কর। এই ২৪ তীর্থঙ্করকে আশ্রয় করিয়া ২৪ খানি জৈন মহাপুরাণ রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমাদের যেমন অনেকগুলি উপপুরাণ পাওয়া যায়, দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যেও সেই রূপ কয়েকখানি উপপুরাণও পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন তীর্থমাহাত্ম্য লইয়া আধুনিক কালে যেমন অনেক স্থলপুরাণ রচিত হইয়াছে, জৈন তীর্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ জৈন স্থলপুরাণ শুনা যায়।

আমি এই কয় খানি জৈন পুরাণ দেখিয়াছি। রবিষেণ-কর্ত্তৃক ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত পদ্মপুরাণ বা রামপুরাণ, জিনসেনাচার্য্য রচিত আদিপুরাণ, এবং তৎকর্ত্তৃক ৯০৫ শকে রচিত অরিষ্টনেমিপুরাণ, বা বৃহদ্‌হরিবংশ, জিনসেনের শিষ্য গুণভদ্র কর্ত্তৃক ৮২০ শকে রচিত উত্তরপুরাণ, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগে অরুণমণিরচিত অজিতনাথ পুরাণ, সকলকীর্ত্তি-রচিত শান্তিনাথপুরাণ, মল্লিনাথপুরাণ, চক্রধরপুরাণ, পার্শ্বনাথপুরাণ, জিনদাসের পদ্মপুরাণ ও হরিবংশ, ব্রহ্মচারীশ্বর কৃষ্ণদাসবিরচিত মুনিসুব্রতপুরাণ ও বিমলনাথপুরাণ, কেশবসেন কৃষ্ণজিষ্ণু কর্ত্তৃক কর্ণামৃত-পুরাণ, ও শ্রীভূষণসূরিকৃত পাণ্ডবপুরাণ, এই সমস্ত জৈন-পুরাণই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন কর্ণাটী ভাষায় রচিত অনেক জৈনপুরাণ দৃষ্ট হয়।

রবিষেণের পদ্মপুরাণ বা রামপুরাণ, জিনসেনের অরিষ্টনেমিপুরাণ বা হরিবংশ ও আদিপুরাণ এবং গুণভদ্রের উত্তর পুরাণ প্রধানতঃ এই চারিখানি পুরাণ পাঠ করিলেই দিগম্বর জৈনদিগের অবলম্বিত পৌরাণিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। উক্ত চারিখানি পুরাণের সাহায্যেই পরবর্ত্তী জৈন কবিগণ নানা পুরাণ রচনা করিয়াছেন, সকলকীর্ত্তি, অরুণমণি, শ্রীভূষণ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস সকলেই একবাক্যে স্ব স্ব পুরাণে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুপুরাণে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব করা ও ক্ষত্রিয় প্রভাব সংস্থাপন করাই যেন জৈনপুরাণের গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুপুরাণে পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণপ্রসঙ্গ বিস্তারিত

রূপে বর্ণিত হইয়াছে, জৈনদিগের হরিবংশ বা অরিষ্টনেমি পুরাণে এই বিষয়টি অন্যরূপ বর্ণিত দেখা যায়, তাহা এই—

জমদগ্নি কৌরববংশীয় কার্ত্তবীর্য্যের একটি কামধেনু হরণ করিয়া আনেন, সেইজন্য কার্ত্তবীর্য্য ক্রোধে জমদগ্নিকে বিনাশ করেন। তখন পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কার্ত্তবীর্য্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। কার্ত্তবীর্য্য নিহত হন, কিন্তু তাহাতেও পরশুরামের রোষানল নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি সপ্তবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলেন, এই সময়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনমহিষী গর্ভবতী ছিলেন, তিনি জামদগ্ন্য পরশুরামের ভয়ে কৌশিক (বিশ্বামিত্র) মুনির আশ্রমে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তথায় এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, এই পুত্রের নাম সুভৌম। সুভৌম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল; তিনি আপন চক্রে জামদগ্ন্য পরশুরামের শিরশ্ছেদন করিয়া একবিংশতি বার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন।

জৈন হরিবংশবর্ণিত পরশুরাম নিধন পাঠ করিলে জৈন-পুরাণের উদ্দেশ্য অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর জন্মপ্রসঙ্গে, জৈন-পুরাণকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণরূপ হীনগৃহে তীর্থ-ঙ্করের জন্ম উপযুক্ত নহে বলিয়াই তিনি ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে অবতরণ করিয়াছিলেন। জৈন পৌরাণিক কিরূপে হিন্দু-দিগের পুরাণাখ্যান বিকৃত করিয়াছেন, জৈন হরিবংশ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বসুদেবের উপাখ্যান পাঠ করিলে আপনারা তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন ;—

মথুরাধিপ যদুর দুই পুত্র শূর ও সুবীর। শূর হইতে অন্ধকবৃষ্ণ্যাদি ও সুবীর হইতে ভোজকবৃষ্ণ্যাদির উৎপত্তি। অন্ধকবৃষ্ণির ঔরসে সমুদ্র-বিজয় ও বসুদেবাদি দশটী পুত্র এবং কুন্তী ও মদ্রা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মে। এইরূপ ভোজকবৃষ্ণি হইতে উগ্রসেন মহাসেন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। অন্ধকবৃষ্ণি যথাকালে সমুদ্রবিজয়ের হস্তে সাকেতরাজ্য ও বসুদেবকে সমর্পণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই-রূপে ভোজকবৃষ্ণিও উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নির্গ্রন্থব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদেব সমুদ্রবিজয়ের আদেশে এক-দিন রমণীয় উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন, সমুদ্র-বিজয়ের নিযুক্তা এক কুব্জা আসিয়া তাঁহাকে অধিক্ষেপ করে, তাহাতে বসুদেব রাজা সমুদ্রবিজয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। আর রাজসংসারে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া শ্মশানে গমন করিলেন। শ্মশানে একটী শবদেহ ছিল, বসুদেব অতি সঙ্গোপনে একটি জলন্ত চিতায় সেই শবদেহ এরূপ ভাবে ফেলিয়া দিলেন, যে দূরস্থ লোকেরা ভাবিল যেন সেই জলন্ত চিতায় বসুদেবের দেহাবসান হইল। রাজা সমুদ্রবিজয় বসুদেবের অগ্নি-প্রবেশসংবাদে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। এদিকে বসুদেব ছদ্ম-বেশে শ্মশান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজয়খেট নামক পুরে আসিলেন, এখানে গন্ধর্ব্ববিদ্যাপ্রবীণ সুগ্রীব নামক এক ক্ষত্রিয়ের গৃহে অতিথি হইলেন। সুগ্রীবের সোমা ও বিজয়সেনা নামে দুইটী সুন্দরী কন্যা ছিল, বসুদেব উভয়ের পাণিগ্রহণ করিলেন। বিজয়সেনার গর্ভে অক্রূরের জন্ম হইল। পরে বসুদেব দুইজন বিদ্যাধরকুমারের যত্নে কুঞ্জরাবর্ত্ত নামক বিদ্যাধর-পুরে আসিয়া শ্যামা-নাম্নী এক বিদ্যাধরকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে অঙ্গারক নামক এক বিদ্যাধর সেই কুমারীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আকাশ মার্গে হরণ করিয়া চম্পানগরে লইয়া আসে। ইহার পর চারুদত্তের সহিত বসুদেবের মিত্রতা জন্মে, তিনি চারুদত্তকে গন্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন। এখানে তিনি গন্ধর্ব্বসেনা নাম্নী এক রাজ-কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। একদিন তিনি গন্ধর্ব্বসেনার নিকট শুনিলেন, উজ্জয়িনীতে শ্রীধর্ম্ম নামে এক রাজা ছিলেন, বলি, বৃহস্পতি, নমুচি ও প্রহ্লাদ নামে তাঁহার চারিজন মন্ত্রী ছিল। এক দিন শ্রীধর্ম্ম রাজ-মন্ত্রী চতুষ্টয়সহ জিনমুনিদর্শনার্থ বাহির উদ্যানে আগমন করেন এবং তাঁহাদের দর্শনে শ্রীধর্ম্মরাজের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। পরে তিনি পদ্ম নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বিষ্ণুকুমারের নিকট জৈন দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পদ্ম বলিনামক বিপ্রকে সপ্তাহ রাজ্য প্রদান করেন, এই সময়ে বলির নিকট বিষ্ণুকুমার আসিয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি পাদত্রয়পরিমিত ভূমি দান করিলেন। বিষ্ণুকুমার মহাকায় ধারণপূর্ব্বক এক পদে জ্যোতিশ্চক্র, দ্বিতীয় পদে মনুষ্যলোক ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার করিয়া বসিলেন, পরে দেবগণের অনেক স্তবস্তুতিতে প্রীত হইয়া মহাকায় সম্বরণ করিলেন এবং বলিকে বন্ধনপূর্ব্বক দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করাইলেন। শ্রীধর্ম্মের উপাখ্যান শুনিয়া বসুদেব প্রীত হইলেন। পরে তিনি চারুদত্তের গণিকা কলিঙ্গ-সেনাদুহিতা বসন্তসেনার সংবাদ পান*।

ইহার পর বসুদেব নানা স্থানে গিয়া তথাকার রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ ও তাঁহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইলাবর্দ্ধন-পুরে আসিয়া তিনি মদনবেগা নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তাহার গর্ভে অনাবৃষ্টি নামে এক পুত্র জন্মে। একদিন শূর্পনখা আসিয়া মদনবেগার রূপ ধরিয়া তাঁহাকে অন্তরীক্ষে লইয়া যায়; পরে তত্রা গিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

কিছুদিন পরে বসুদেব ম্লেচ্ছরাজকন্যা জরার পাণিগ্রহণ করেন, এই জরার গর্ভে কৃষ্ণনিহন্তা জরাকুমারের জন্ম হয়। তৎপরে বসুদেব অরিষ্টপুররাজকন্যা রোহিণীর স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইলেন, এখানে রোহিণীর পাণিগ্রহণ আশায় সমুদ্রবিজয় জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ আসিয়াছিলেন, রোহিণী বসুদেবের কণ্ঠেই বরমালা অর্পণ করিলেন; তাহাতে সমুদ্রবিজয়াদি রাজগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বসুদেবকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ ঘটিল, শেষে বসুদেবই জয়লাভ করিলেন। সমুদ্র-বিজয় বসুদেবের পরিচয় পাইয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয় ভ্রাতায় আবার মিলন হইল। রোহিণীর গর্ভে রামের জন্ম হয়। তৎপরে বসুদেব পুত্র ও ভার্য্যা সহ সাকেত নগরে আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনে রাজা সমুদ্র বিজয় মহোৎসব করিয়াছিলেন। এখানে কংস আসিয়া বসুদেবের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। এ সময়ে জরাসন্ধ অতিশয় বল দর্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে জয় করিবার জন্য বসুদেব শিষ্য কংস সহ রাজগৃহাভিমুখে গমন করিলেন, এই সময়ে সিংহপুররাজা সিংহরথ ঘোষণা করেন, 'যে জীবিত কুক্কুর ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।' বসুদেবের আদেশে কংস বীরপতাকা ধারণ করেন ও গুরুর আদেশে সিংহরথকে বাঁধিয়া জরাসন্ধপুরে নিক্ষেপ করেন। কংসের সহিত জরাসন্ধকন্যা জীবদ্যশার বিবাহ হয়, তৎপরে কংস মথুরায় আসিয়া নিজ পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করেন ও বসুদেবকে আনিয়া গুরু দক্ষিণাস্বরূপ আপন ভগ্নী দেবকীকে সম্প্রদান করিলেন। একদিন জীবদ্যশা কংসকে বলিল যে, আমি শুনিয়াছি বসুদেবপুত্রহস্তে আমার পতিপুত্রের মৃত্যু হইবে। তাহা শুনিয়া কংস গুরুকে ছলনা করিয়া

* চারুদত্তের ও বসন্তসেনার কথা জৈন হরিবংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

প্রসবকালে দেবকীকে নিজ গৃহে রাখিলেন। যথাকালে দেবকীর গর্ভে নৃপদত্ত, দেবপাল, অনীকদত্ত, ও শত্রুঘ্নাদি ছয় পুত্র জন্মে। এই ছয় জনেই কংসের হস্তে অকালে কালকবলে প্রেরিত হয়।

দেবকীর সপ্তম গর্ভে শঙ্খ-পদ্ম-গদাসিধারী শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন এবং তথা হইতে নন্দকন্যা দুর্গাকে আনিয়া দেবকীর সূতিকাগারে রক্ষা করিলেন। কংস প্রভাতে উঠিয়া সূতিকাগারে আসিয়া সেই কন্যার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবকী নন্দালয়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। যথাকালে কৃষ্ণ ও বলদেব মথুরায় আসিয়া কেশী, গজ, চাণুর, মুষ্টিক প্রভৃতিকে বিনাশ ও কংসবধপূর্ব্বক উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিলেন। তৎপরে কংসনিপীড়িতা যশোদাগর্ভজাতা দুর্গা জিনদেবের সেবা করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

উপরি উক্ত উপাখ্যান হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, জৈন পৌরাণিকের হস্তে হিন্দুপুরাণ কিরূপ বিকৃত হইয়াছে। এইরূপ মহাভারত ও রামায়ণাদির অধিকাংশ মুখ্য উপাখ্যান গুলিই বিভিন্ন জৈনপুরাণে বিকৃতভাবে বর্ণিত দেখা যায়। জৈনযতিগণ বলিয়া থাকেন, প্রচলিত হিন্দুপুরাণগুলির এক খানিও অকৃত্রিম নহে। সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রাচীন পুরাণাখ্যানই জৈনপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যদি জৈনপুরাণ-সমূহের রচনাকাল লিপিবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে বাস্তবিকই কোন্ পুরাণ প্রাচীন ও মৌলিক, তাহা ভাবিবার বিষয় হইত। যাহা হউক, যখন প্রায় দেড় হাজার বর্ষ হইতে চলিল, জৈনপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার পরেও আমাদের কোন কোন পুরাণ পুনঃ সঙ্কলিত হইয়াছে, তখন জৈন পুরাণগুলি এককালে অবহেলার জিনিস নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং বলিতে পারি না, তাহা হইতে ভবিষ্যতে কত নূতন তত্ত্ব আমরা লাভ করিতে পারিব। আমি যথাসাধ্য বিশ্বকোষের 'পুরাণ' শব্দে ঐ সকল পুরাণের আলোচনা করিয়াছি এবং সাধারণকে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

সময়াভাবপ্রযুক্ত বৌদ্ধপুরাণের আলোচনায় বিরত হইলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সুখ।

(গল্প)

তখন চা পানের সময়, সান্ধ্যদীপ জ্বালান হয় নাই। পল্লী-গৃহ হইতে সমুদ্র বেশ দেখা যাইতেছিল; সূর্য্যদেব সমস্ত আকাশকে আরক্ত করিয়া অস্ত গিয়াছেন—তা পথ যেন স্বর্ণরেণুতে অবলিপ্ত; আর মধ্যসাগর নিস্তব্ধ অকম্পিত, প্রসন্ন, মুমূর্ষু রবির কিরণে তখনও উজ্জ্বল—যেন একখানি প্রকাণ্ড সমুজ্জ্বল ধাতুপাত্রের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

দূরে—দক্ষিণে, বন্ধুর গিরিশ্রেণী পশ্চিমের পাণ্ডু-লোহিত নভোদেশে আপনাদের কৃষ্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল।

আমরা "প্রেম" সম্বন্ধে গল্প করিতেছিলাম; সেই পুরাতন বিষয়ে তর্ক করিতেছিলাম; যে সকল কথা ইতঃপূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি, তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া। গোধূলির ক্লান্ত মাধুর্য্যে আমাদের কথোপকথন মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল; অন্তঃকরণে করুণা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আর, "প্রেম" এই শব্দটী, কখন পুরুষের পরুষ কণ্ঠে, কখন বা রমণীর ক্ষীণ কণ্ঠে অবিরাম উচ্চারিত হইয়া ছোট কক্ষটা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে একটা ত্রস্ত বিহঙ্গের মত পক্ষপুট সঞ্চালন করিতেছিল, একটা ভূতযোনির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বছর কতক ব্যাপিয়া কেহ কি প্রেমাসক্ত থাকিতে পারে?

কেহ কেহ বলিলেন, "হাঁ"।

অপর কেহ বা, "না"।

আমরা ঘটনার পার্থক্য দেখাইতেছিলাম, প্রেমের সীমা স্থির করিতেছিলাম। কত বা উদাহরণ দিতেছিলাম। স্ত্রী পুরুষ সকলেই আপনাদিগের কষ্টকর স্মৃতিতে ব্যথিত হইতেছিলেন; সে সকল কথা তাঁহাদের ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া কম্পিত হইতেছিল; কিন্তু উহা ব্যক্ত করিতে না পারিয়া, তাঁহারা সেই সর্ব্বলোক-সাধারণ, সেই সর্ব্বোচ্চ বস্তু, দুটী প্রাণীর কোমল ও রহস্যময় মিলনের কথা গভীর আবেগে এবং উৎসাহপূর্ণ আগ্রহের সহিত বারংবার বলিতেছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ একজন দূরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—

"ওঃ! ওখানে দেখুন, ওটা কি?"

সাগরোপরি, দিগ্‌বলয়ের ঠিক নিম্নে একটী ধূসরবর্ণ প্রকাণ্ড স্তূপীকৃত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইল।

মহিলাগণ আসন হইতে উঠিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন; তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এমন দৃশ্য তাঁহারা কদাপি দেখেন নাই।

একজন বলিলেন :—

"এ যে কর্সিকা! বাতাসের বিশেষ পরিষ্কার অবস্থায়, বৎসরে দু' তিন বার এরূপ দেখা যায়। দূরস্থ দ্রব্য সামুদ্রিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকাতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু মরীচিকা বেশ দেখা যায়।"

আমরা পৃথক পৃথক পর্ব্বতশ্রেণী অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। মনে হইল, উহাদের শিখরস্থ তুষার পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। একটী নূতন জগতের এই আকস্মিক আবির্ভাবে, সাগরোদ্ভূত এই বায়বীয় দৃশ্যে প্রত্যেকেই বিস্মিত ও শঙ্কিত-প্রায় হইয়া রহিলেন। হইতে পারে, কলম্বসের মত লোক—যাঁহারা অজ্ঞাত জলধিপ রাপার করিয়াছেন—এমন অদ্ভুত দৃশ্যও দেখিয়াছেন।

একটী বৃদ্ধ এতাবৎ নীরব ছিলেন, তিনি বলিলেন :—

"আমার কিছু বলিবার আছে। ঐ যে দ্বীপটী আমাদের সম্মুখে এখন আবির্ভূত, ওটী যেন আমাদের কথোপকথনের উত্তর দিতে, আমার সেই বিশেষ স্মৃতিটীকেই জাগাইতে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ওখানকারই একটী অত্যাশ্চর্য্য সত্য প্রেমকাহিনী আমি জানি। সে প্রেম অসাধারণ সুখের ছিল।"

"ব্যাপারটা এই—

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার কর্সিকায় গিয়াছিলাম। ফ্রান্সের তটপ্রান্ত হইতে আজ যেমন আমরা কর্সিকা দেখিলাম, অনেক সময় এইরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐ অসভ্য দ্বীপটা আমেরিকার অপেক্ষাও অজ্ঞাত ও দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

এমন একটা জগতের কল্পনা কর যা' এখনও জড়পিণ্ড মাত্র; পুঞ্জীভূত পাহাড়ের কল্পনা কর—তাহাদের মাঝে মাঝে কেবল অগ্রসর স্রোতঃপ্রধাবিত সুগভীর খাত; একটীও সমতল ভূমি নাই, শুধু প্রস্তরের অনন্ত তরঙ্গ; শুধু ভীষণ "চড়াই" আর "উৎরাই"—গুল্মপুঞ্জে এবং সমুচ্চ বাদাম ও দেবদারু বৃক্ষের অটবীবৃন্দে সমাচ্ছন্ন। অকর্ষিত, জনশূন্য, নীরস ভূভাগ; কচিৎ দু'একটী গ্রাম —যেন একটী পর্ব্বতের শিরোভাগে শিলাস্তূপ। কৃষি নাই, বাণিজ্য নাই, শিল্প নাই। ক্ষোদিত কাষ্ঠের টুক্রা বা ভাস্কর-খচিত প্রস্তর খণ্ডও সেখানে দেখিতে পাইবে না; পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সুশ্রী ও সুন্দর দ্রব্যজাতের প্রতি অনুরাগের সামান্যতম চিহ্নও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল সৌন্দর্য্যের চর্চ্চাকে আমরা "কলা-বিদ্যা" বলি, তাহারই প্রতি চিরন্তন ঔদাসীন্যই তাহাদের প্রকাণ্ড নীরস দেশের পরমাশ্চর্য্য বিশিষ্টতা!

ইতালী কি সুন্দর দেশ! তা'র প্রত্যেক প্রাসাদ কত না মনোহর দ্রব্যে পরিপূর্ণ! সেখানে মর্ম্মর, দারু, পিত্তল, লৌহ, সকল ধাতুই, এবং মহার্ঘ রত্নরাজি মানবের প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। কত প্রাচীন গৃহের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সামান্যতম জিনিষটীও কলাশ্রীর প্রতি অপার্থিব অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। ইতালী ত আমাদের কাছে চির সাধের পবিত্র দেশ; কারণ, সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার আন্তরিক উদ্যম, মহত্ব, ক্ষমতা, এবং সাফল্যের পরিচয় ও প্রমাণ সেখানেই পাই।

আর, তাহার সম্মুখেই ঐ অসভ্য কর্সিকা!—চিরদিনই প্রাচীনতম যুগের বর্ব্বর অবস্থায় রহিয়াছে! সেখানে মানুষ নিজের জীবিকামাত্র এবং পারিবারিক বিবাদ বিসংবাদ ছাড়া অপর সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া সামান্য গৃহে বাস করিতেছে। অসভ্য জাতির দোষ গুণ তাহাতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। সে প্রচণ্ড ক্রোধপরায়ণ, হিংসুক, রক্তলোলুপ, ও অনুতাপ-বিহীন; অথচ অতিথিবৎসল, উদার, অনুগত, ও সরল; অপরিচিত পথিককেও সাদরে গৃহে লইবে, এবং সামান্যমাত্র সহানুভূতি পাইলে নিজের কৃতজ্ঞ বন্ধুত্ববন্ধনে লোককে বদ্ধ করিবে।

এই চমৎকার দ্বীপে আমি এক মাস ছিলাম—মনে হইত, পৃথিবীর কোন সীমান্তে রহিয়াছি। আর সরাই নাই, পান্থশালা নাই, রাজপথ নাই। অশ্বতর সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে যাও, দেখিবে সেগুলি যেন পর্ব্বতগাত্রে ঝুলিতেছে; উহাদের নিম্নে বক্রগামী অতল-স্পর্শ গহ্বর—সন্ধ্যার সময় সেখান হইতে স্রোতঃপ্রবাহের গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইবে; বাড়ীর দরজায় আঘাত কর; রাত্রের জন্য আশ্রয় এবং কিছু খাদ্য চাও; তার পর, দরিদ্রের ভোজ্য কিছু খাইয়া, দীন গৃহতলে শয়ন কর; প্রাতে আশ্রয়দাতা তোমাকে পল্লীর প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া দিবে; তুমি তাহার করপীড়ন করিয়া বিদায় লও।

এখন, একদিন রাত্রে, দশ ঘণ্টা পথ চলিয়া একটী নিভৃত উপত্যকার একটী ছোট বাড়ীতে আসিয়া পৌছি-

লাম। ক্রোশ দেড়েক দূরস্থ সাগরের সহিত মিলিয়া উপত্যকাটী শেষ হইয়াছে ; গুল্ম, গাত্রবিচ্যুত উপল, এবং বড় বড় বৃক্ষে সমাকীর্ণ দুইটি সরলোন্নত পর্ব্বত বিষণ্ণ মূর্ত্তি উপত্যকাটীকে প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া আছে।

কুটীরটীর চারিপার্শ্বে দ্রাক্ষালতা, একটী ছোট উদ্যান, এবং দূরে কতকগুলি বৃহৎ বাদাম গাছ—ইহাতেই বেশ সংসার চলিয়া যায় ; বস্তুতঃ, এ দরিদ্র দেশে উহাই বিভব।

একটী বৃদ্ধা আমাকে অভ্যর্থনা করিল ; সে গম্ভীর প্রকৃতি এবং পরিচ্ছন্ন—অসামান্য পরিচ্ছন্ন। একজন পুরুষ মোড়ায় বসিয়াছিল, আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য উঠিল, এবং একটী মাত্র কথা না কহিয়া পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিল। তাহার সঙ্গিনী বলিল,

"ওঁকে মাপ করুন ; উনি এখন বধির। ওঁর বয়স বিরাশী বৎসর।"

রমণী ফ্রেঞ্চ ভাষা বলিল—আমি ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"আপনি কি কর্সিকার লোক নন ?"

সে উত্তর দিল :—

"না ; আমরা কন্টিনেন্টের লোক। কিন্তু আমরা এখানে পঞ্চাশ বৎসর বাস করিতেছি।"

মানব-নিবাস হইতে এত দূরে, এই বিপদসঙ্কুল গহ্বরে পঞ্চাশ বৎসরের বাস শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

একটী বৃদ্ধ কৃষাণ বাড়ী আসিলে, আমরা আহার করিতে বসিলাম। সেখানে একমাত্র খাদ্য—আলু, কপি, ও শূকরের বসার ডান্লা !

অল্প ক্ষণেই আহার শেষ হইল ; আমি দরজার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। বিষণ্ণ সন্ধ্যায় জনহীন স্থান বিশেষে একেলা পড়িলে, পথিকেব মন যেমন সময় সময় খারাপ হইয়া যায়, এই শোকাচ্ছন্ন স্থানের বিষাদ মূর্ত্তি দেখিয়া আমারও হৃদয় সেইরূপ ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। মনে হইতেছিল, যেন প্রত্যেক জিনিষ, এই অস্তিত্ব, বিশ্বপর্য্যন্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে লয়-প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। জীবিতের নিদারুণ দৈন্য, প্রাণের মহাশূন্য, দ্রব্য মাত্রেরই অকিঞ্চিৎকরতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে হৃদয়ে যে স্বপ্নভয়াতুর অন্ধকার অসহায় ভাব অনুভূত হয়, আমি তাহাই অনুভব করিলাম।

নিতান্ত বিরাগীর চিত্তেও ঔৎসুক্য চিরদিন জাগ্রত থাকে ; বৃদ্ধাও কৌতূহল-পীড়িত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল :—

"আপনি তবে ফ্রান্স্ থেকে আস্ছেন ?"

"হাঁ ;—আমি আনন্দোভোগের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছি।"

"সম্ভবতঃ, আপনি প্যারিস থেকে এসেছেন ?"

"না, আমি Nancy থেকে আস্ছি।"

এই কথা শুনিয়া যেন সে অসাধারণ আবেগে উত্তেজিত হইল। কি করিয়া যে আমি তাহা ধরিলাম বা অনুভব করিলাম, নিজেই জানিনা।

সে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিল :

"Nancy থেকে আস্ছেন ?"

দ্বারের নিকট উপবিষ্ট পুরুষটীকে অপর সকল বধিরের মত সুখ দুঃখের অতীত বলিয়াই বোধ হইল।

রমণী পুনর্ব্বার বলিল,

"ইহাতে কিছু আসিয়া যায়না ; উনি শুনিতে পাননা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জিজ্ঞাসা করিল,

"তবে আপনি Nancyর লোকদের জানেন ?"

"অবিশ্যি ; প্রায় সকলকেই জানি।"

"Sainte Allaize পরিবারকেও ?"

"হ্যাঁ, বিশেষ জানি ; তাঁরা আমার পিতার বন্ধু।"

"আপনার নাম কি ?"

তাহাকে আমার নাম বলিলাম। কোন কথা ভাবিতে ভাবিতে লোকে যেমন আন্মনে কথা কয়, সে তেমনই মৃদুস্বরে বলিল ;

"হাঁ, হাঁ ; আমার বেশ মনে পড়্ছে। আর Brisemares, তাহাদের খবর কি ?"

"তাদের আর কেহ জীবিত নাই।"

"আহা !—আর, আপনি এদের জানেন, Sirmontদের ?"

"হাঁ, তাদের শেষ পুরুষ একজন সেনাপতি।"

আবেগে, মনস্তাপে, জানিনা কিসে, সে কাঁপিয়া উঠিল ; তাহাদের নাম শুনিয়া তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিচলিত হইয়াছিল ; এবং যে সকল কথা সে আপনার অন্তরের অন্তস্তলে এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা বলিতে চেষ্টা করিল ;

"হাঁ, Henri de Sirmont; আমি তাকে খুব জানি। সে আমার ভাই!"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। তখন, হঠাৎ আমার সব মনে পড়িল :—

Lorraineএর সম্ভ্রান্ত বংশে এক সময়ে নিতান্ত কলঙ্কাপবাদ প্রচারিত হয়। Suzanne de Sirmont নামে একটী কিশোরী একজন সৈনিকের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। বালিকার পিতা সেই সেনাদলের নায়ক ছিলেন।

যে সৈনিকটী সেনাপতির কন্যাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সে বেশ সুপুরুষ, কৃষকের পুত্র, কিন্তু চাল চলন বেশ ফিট্ ফাট্। যখন সেনাদল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছিল, নিঃসন্দেহ তখনই বালিকা তাহাকে দেখে, দেখিয়া মুগ্ধ হয়, এবং তাহাকে ভালবাসিতে থাকে। কিন্তু কেমন করিয়া সে তাহার সহিত কথা কহিত, কেমন করিয়া বা উভয়ের দেখা হইত, কি উপায়ে পরস্পরের সংবাদ পাইত, কি করিয়াইবা বালিকা নিজ প্রেম তাহাকে জানাইল—তাহা কখন জানা গেল না।

কেহ কিছু অনুমান বা সন্দেহ করে নাই। এক দিন রাত্রে, যখন যোদ্ধাটীর চাকুরীর মেয়াদ ঠিক সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহারা উভয়ে অদৃশ্য হইল। বৃথায় লোকে তাহাদের অনুসন্ধান করিল। তাহাদের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিল, বালিকা মরিয়াছে।

এই অভাবিত স্থানে আমি তাহাকে দেখিলাম!

আমি উত্তর দিলাম ;—

"হাঁ, আমার সব মনে পড়িল। আপনি Mademoiselle Suzanne।"

সে মাথা নাড়িয়া জানাইল "হাঁ" এবং নয়নের ইঙ্গিতে নিষণ্ণ বৃদ্ধটীকে দেখাইয়া জানাইল :—

"এই সেই।"

আমি বুঝিতে পারিলাম সে এখনও তাহাকে ভালবাসে, এখনও মুগ্ধ দৃষ্টে তাহাকে দেখে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি সুখী হয়েছিলেন ত?"

সে বলিল :—

"নিশ্চয়ই! খুব সুখী। আমাকে উনি যথেষ্ট সুখী করেছিলেন। কখনও আমাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই।"

তাহার স্বর আন্তরিক।

প্রেমের মহিমাময় শক্তিতে বিস্ময়মূঢ় হইয়া, আমি তাহার মুখে বিষণ্ণ নয়নে চাহিলাম। সেই ধনবতী যুবতী এই লোকটাকে—এই কৃষককে গ্রহণ করিল! সে ইচ্ছা করিয়া কৃষকের পত্নী হইল! বৈচিত্র্যহীন, বিলাসবিহীন, নিখিল ইন্দ্রিয়সুখকর সামগ্রীবিরহিত জীবন সে পছন্দ করিল! সে সামান্য আচার ব্যবহারের বশ্যতা স্বীকার করিল! তখনও তাহাকে সে ভালবাসে! দরিদ্র চাষার স্ত্রী হইতে তাহার দ্বিধা বোধ হইল না! তৃণাসনে বসিয়া সে আলু ও কপির ডাল্‌না খাইত! একখানি মাদুরের উপর তাহারই পার্শ্বে শয়ন করিত!

তাহাকে ছাড়া রমণীটী আর কিছু কদাপি ভাবে নাই। রত্নালঙ্কার, সুন্দর সুন্দর পোষাক, রমণীয় বিলাসোপকরণ, কিম্বা ঝালর-পরিশোভিত সুগন্ধামোদিত কক্ষ, অথবা সুকোমল শ্রমহারী পালঙ্কের শয্যার জন্য সে কখনও দুঃখ করে নাই। সে ছাড়া তাহার আর কোন দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না। সে যদি কাছে রহিল, তবে তাহার আর কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই।

বালিকাবস্থায় সে মানুষ, সমাজ, অভিভাবক, স্বজন—সকলই ত্যাগ করিয়াছিল। একাকী তাহার সহিত সেই ভীষণ উপত্যকায় গিয়াছিল। যাহা কিছু স্পৃহনীয়, যাহা কিছু কল্পনার, যাহা কিছুর জন্য লোকে চিরদিন চাহিয়া থাকে, যাহা কিছু অনন্ত আশার সামগ্রী—বালিকার নিকট সে-ই সব। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে বালিকার জীবন সুখ-পূর্ণ রাখিয়াছিল।

অধিকতর সুখী সে হইতে পারিত না।

সেই অনুরাগিনীর পার্শ্বে শয়ান বৃদ্ধ সৈনিকটীর শ্রুতি-কটু নিঃশ্বাস শব্দ শুনিতে শুনিতে, আমি সমস্ত রাত্রি, সেই অদ্ভুত অথচ সহজ সাহস-কীর্ত্তির—সেই অনাবিল সুখের কথা ভাবিলাম। সে সুখ এত অল্পে পাওয়া গিয়াছিল!

সূর্য্যোদয়ে, বৃদ্ধ দম্পতীর করপীড়ন করিয়া বিদায় লইলাম।

* * * * *

বক্তা থামিলেন। একজন মহিলা বলিলেন :—

"সোজা কথা ;—তাহার আকাঙ্ক্ষা সহজেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তাহার অভাব নিতান্ত সামান্য, তাহার প্রার্থনা একান্ত সহজ-সাধ্য ছিল। সে কেবল মূর্খের মত কাজ করিয়াছিল।"

অপর একজন মৃদু ধীর কণ্ঠে বলিল, "তাহাতে কি আসিয়া যায়, সে সুখী ছিল।"

হেথায়, চক্রবালের নিম্নে, কর্সিকা রজনীর অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছিল—আপনার প্রকাণ্ড প্রতিবিম্ব মুছিয়া দিয়া যেন ধীরে সমুদ্রগর্ভে ফিরিয়া গেল। যে দুটী দীন প্রেমিক তাহার তীরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের কাহিনী বলিবার জন্যই যেন কর্সিকা সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল।*

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

সৃষ্টির বিশালত্ব।

(শেষ প্রবন্ধ)

একাদশ বৎসর অন্তর এক এক বার সূর্য্যে ঝটিকাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে সূর্য্যমণ্ডলস্থ এই কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নগুলি বর্দ্ধিত আকারে এবং অধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বৈদ্যুতিক উৎপাতের সঞ্চার হইয়া সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত হয়। এতদূরে থাকিয়াও আমরা এগার বৎসর পর পর সূর্য্যের এই উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ অসুবিধা ভোগ করি। এখানেও তখন ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং কিছুকালের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে।

সূর্য্যের মূর্ত্তি আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, তাহা উহার যথার্থ মূর্ত্তি নহে ; ঐ গোলাকার পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে এমন অনেকগুলি পদার্থ আছে যাহা উহার প্রচণ্ড আলোকের জন্য সহজ চক্ষে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের সম্পূর্ণ গ্রহণ হইলে ঐ সকল পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয়। অগ্নি হইতে ধূম বহির্গত হইলে যেমন দেখায়, ঐ সকল পদার্থও তেমনি। বাস্তবিক উহা সৌর ঝটিকার প্রচণ্ড তেজে উৎক্ষিপ্ত বাষ্প রাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ এক একটা বাষ্পস্তূপ তিন লক্ষ মাইলেরও অধিক উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে; উহার উদ্গমনের বেগ সেকেণ্ডে এক শত মাইল অপেক্ষাও দ্রুত হইয়া থাকে।

সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় উহারও একটা আহ্নিক গতি আছে। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার, আর সূর্য্য প্রায় ২৫ দিনে একবার আবর্ত্তিত হয়।

কেবল তাহাই নহে। পৃথিবী যেমন আবর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হয়, সূর্য্যও তেমনি অগ্রসর হইতেছে। এই সৌরজগৎকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্য ঘণ্টায় কুড়ি হাজার মাইল বেগে আকাশের এক প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

আকাশরূপ অনন্ত সমুদ্রকে পার হইবার উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের অধিক উদ্বিগ্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন। উহা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তদপেক্ষা বর্ত্তমানে সূর্য্য আমাদের জন্য কি করিতেছেন, তাহার আলোচনা হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়। সার রবার্ট বলের জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থে এ বিষয়ের এইরূপ বর্ণনা আছে :—"সূর্য্য-রশ্মির ঐন্দ্রজালিক শক্তি ধরাকে শস্যশালিনী করিতেছে। সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্রের জল হইতে মেঘ সকল উত্থিত হয়; এবং সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া ধরাকে সতেজ এবং পোতবাহিনী নদী সকলকে পরিপূর্ণ করে। সৌরতেজে মেদিনী উত্তপ্ত হইয়া বায়ুকে সঞ্চারিত করে; সেই জন্যই অর্ণবযানসকল সমুদ্র পার হইতে সমর্থ হয়। শীত ঋতুর সন্ধ্যাকালে অগ্নিসেবন করিতে বসিয়া আমরা সেই যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠাগত সূর্য্য রশ্মিকেই উপভোগ করিয়া থাকি। সেই প্রাচীন কালের সূর্য্যোত্তাপ অঙ্গার-যুগের উদ্ভিদ সকলকে বিপুল বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া কোটি কোটি বৎসর কয়লার অভ্যন্তরে নিদ্রিত ছিল, এতকাল পরে আমরা পুনরায় তাহাকে সচেতন করিতেছি। কয়লায় সঞ্চিত সৌর-শক্তিই আমাদের বাষ্পীয় যন্ত্র সকলকে প্রধাবিত করে। কয়লার নিহিত সূর্য্যালোকেই আমাদের নগর সকল আলোকিত হয়।"

এবম্ভূত সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া বিধাতা তাহার চতুর্দ্দিকে সৌর জগতকে সাজাইয়াছেন।

---

* গী দে মোপাসাঁ রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে —লেখক।

সূর্য্যের সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরে বুধ, পৌনে সাত কোটি মাইল দূরে শুক্র; সওয়া নয় কোটি মাইল দূরে পৃথিবী, ১৪ কোটি মাইল দূরে মঙ্গল, আটচল্লিশ কোটি মাইল দূরে বৃহস্পতি, আটাশ কোটি মাইল দূরে শনি, একশত আটাত্তর কোটি মাইল দূরে ইউরেনস্, এবং দুই শত আটাত্তর কোটি মাইল দূরে নেপচুন্ বিচরণ করিতেছে।

গ্রহগণ শকট-চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। একবার আবর্ত্তনের কালকে গ্রহের এক অহোরাত্র এবং একবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার কালকে উহার এক বৎসর বলা যায়। যে গ্রহ যত দূরবর্ত্তী, তাহার গতি ততই ধীর। এ স্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, আমরা সচরাচর যেরূপ ধীর গতির প্রসঙ্গে গোধিকা কচ্ছপ শম্বুকাদির কথা স্মরণ করি, গ্রহগণের গতি বাস্তবিক সেই প্রকার ধীর। এ ধীরতা আপেক্ষিক ধীরতা মাত্র। এক গ্রহের তুলনায় অন্য গ্রহের গতি মন্দ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা মন্থর-গামী গ্রহের গতিও অতিশয় প্রচণ্ড। কামানের গোলার বেগ তাহার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর।

সর্ব্বাপেক্ষা অলস গ্রহ নেপচুন। কারণ তাহা সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী। কিন্তু এই গ্রহও প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে তিন মাইল গমন করে। ইউরেনসের বেগ সেকেণ্ডে চারি মাইল, শনির ছয় মাইল, বৃহস্পতির আট মাইল, মঙ্গলের পোনের মাইল, পৃথিবীর সাড়ে আঠার মাইল, শুক্রের বাইশ মাইল, এবং বুধের তেইশ হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল।

গ্রহগণের দূরত্ব এবং বেগ এত বিভিন্ন হওয়াতে উহাদের বৎসরও বিভিন্ন হয়। আমাদের পৃথিবীর বৎসরের তুলনায় বুধের বৎসর তিন মাসে, শুক্রের বৎসর সাড়ে সাত মাসে, মঙ্গলের বৎসর প্রায় তেইশ মাসে, বৃহস্পতির বৎসর প্রায় বারো বৎসরে, শনির বৎসর প্রায় ত্রিশ বৎসরে, ইউরেনসের বৎসর চুরাশী বৎসরে, নেপচুনের বৎসর এক শত পঁয়ষট্টি বৎসরে পূর্ণ হয়।

গ্রহদিগের সকলে সমান বড় নহে, ইহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। এই বিভিন্নতার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী চারিটি গ্রহ অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দূরবর্ত্তী চারিটি গ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ এবং নেপচুন ইহাদের তুলনায় অতিশয় বৃহৎ। বুধ, শুক্র, এবং মঙ্গল ইহারা সকলেই পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু নেপচুন আয়তনে পৃথিবীর পঁচাশী গুণ, ইউরেনস্ পঁয়ষট্টি গুণ, শনি সাত শত একুশ গুণ, বৃহস্পতি এক হাজার তিন শত নয় গুণ।

গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, উপগ্রহগণ তেমনি গ্রহদিগকে প্রদক্ষিণ করে, আমাদের চন্দ্র এই শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা ইহার কার্য্য। আমরা যে উহাকে এত বৃহৎ দেখিতে পাই, পৃথিবীর সান্নিধ্যই ইহার এক মাত্র কারণ। কিন্তু বাস্তবিক উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। গুরুত্বে উহা পৃথিবীর আশী ভাগের এক ভাগও হয় না।

পৃথিবী তাহার পৃষ্ঠস্থ পদার্থ সকলকে যেরূপ বলের সহিত আকর্ষণ করিতেছে, চন্দ্র তাহার পৃষ্ঠস্থ বস্তু সকলকে তাহার ষষ্ঠাংশ পরিমিত বলের সহিত আকর্ষণ করে। এই হিসাবে দেখা যায় যে চন্দ্রলোকে গেলে গর্দ্দভের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত; কারণ এই পৃথিবীতে তাহাকে যে ভার বহন করিতে হয়, চন্দ্রলোকে তাহার ওজন এখানকার ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।

চন্দ্রলোকে গমনের প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন হয় যে, তথায় কিরূপ জীব বাস করে। এ প্রশ্নের উত্তরে দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে আমরা যেরূপ জীবের কথা জানি, তাহাদিগের পক্ষে চন্দ্রলোকে বাস করা সম্ভব নহে। জীবন রক্ষার প্রধান দুটি উপাদান যে জল আর বায়ু, এ উভয় বস্তুরই চন্দ্রে অভাব দেখা যায়। বায়ুহীন দেশে শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব। সেখানে বজ্রপাত হইলেও তাহা নীরবেই হইবে। উষা এবং গোধূলী সে দেশ হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তথায় রজনীর ঘন অন্ধকার বর্ত্তমান থাকে, আর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর অমানিশার সঞ্চার হয়। তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতিশয় ভীষণ। জীবহীন রসহীন শুষ্ক শতধা বিদীর্ণ কঙ্করময় শ্মশান ভূমিকে বেষ্টন করিয়া মৃত আগ্নেয় গিরির কঙ্কাল সকল প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চন্দ্রের ক্ষুদ্র কলেবরের তুলনায় এই সকল পর্ব্বত হিমালয়ের অপেক্ষাও প্রায় তিন গুণ উচ্চ। তথাকার বায়ুহীন আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অনৈসর্গিক উগ্রতা

সহকারে দীপ্তি পায়। আমাদের পৃথিবী সেই আকাশের চন্দ্র; আমরা যে চন্দ্রকে দেখিতে পাই, তদপেক্ষা সেই চন্দ্র পঞ্চাশ গুণ বৃহৎ।

এই অসহনীয় উজ্জ্বলতার সঙ্গে অভাবনীয় শৈত্যের সমাবেশ হইয়া চন্দ্রের ভীষণতাকে দ্বিগুণ ভয়ানক করিয়াছে। চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি সকলকে মৃত বলা হইয়াছে। বাস্তবিক এখন আর সে সকল আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নি নির্গত হয় না। চন্দ্রের অগ্নি অনেক দিন যাবৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

সৌর জগতে এ পর্য্যন্ত একুশটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর একটি, মঙ্গলের দুটি, বৃহস্পতির পাঁচটি, শনির আটটি, ইউরেনসের চারিটি এবং নেপচুনের একটি।

শনিগ্রহের আটটি চন্দ্র ব্যতীত আর একটি অতিশয় অদ্ভুত অনুচর আছে। দূরবীক্ষণে দেখিলে শনির মূর্ত্তি কতকটা গাড়ীর চাকার ন্যায় বোধ হয়। গাড়ীর চাকার মধ্যস্থলে একটা পিণ্ডের ন্যায় এবং চতুর্দ্দিকে বলয়ের ন্যায় থাকে; যাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে উহার নাভি এবং নেমী বলা যায়। শনিগ্রহও ঐরূপ একটি বলয় বেষ্টিত গোলক। এইরূপ বলয় সৌর জগতে আর কোন গ্রহেরই নাই। উহা যে বাস্তবিক কিরূপ বস্তু, তাহা সহজে স্থির হয় নাই। দূরবীক্ষণের ক্ষমতা যতই বাড়ে, এই বলয়ের মূর্ত্তি ততই অদ্ভুত হইয়া দাঁড়ায়। গ্যালিলিয়ো তাঁহার ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ দিয়া, উহাকে বলয় বলিয়া বুঝিতেই পারেন নাই। আধুনিক বৃহৎ দূরবীক্ষণ সকলে উহাকে অনেকগুলি বলয়ের সমষ্টিরূপে দেখা যায়। উহার কোন কোন অংশ অর্দ্ধ স্বচ্ছ, তাহার ভিতর দিয়া শনির দেহ অল্প অল্প দৃষ্ট হয়। বলয়ের মূর্ত্তিতে সময় সময় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে।

এই বলয় অথবা চক্রের ব্যাস এক লক্ষ বায়াত্তর হাজার আট শত মাইল। ইহার পরিসর বিয়াল্লিশ হাজার তিন শত মাইল। শনির পৃষ্ঠ হইতে ইহার দূরত্ব ছয় হাজার মাইল। বলয়ের আয়তনের তুলনায় ইহার বেধ অতি সামান্য। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তাহা ৫০ মাইলের অধিক হইবে না।

এই বলয় যে কোন কঠিন বা তরল বস্তু নহে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহা একটি পদার্থ নহে। অসংখ্য ক্ষুদ্র উপগ্রহ দলবদ্ধ হইয়া শনিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। উহারা এতই ক্ষুদ্র যে, উহাদিগকে পৃথক্ ভাবে দেখা সম্ভব নহে। সুতরাং আমরা উহাদিগকে সমষ্টিতে বলয়ের ন্যায় দেখি। এই সকল বলয় এবং আটটি চন্দ্র মিলিত হইয়া শনির আকাশকে না জানি কত সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে!

উপগ্রহদের বৃহত্তমটি বৃহস্পতির সহচর। উহার ব্যাস পাঁচ হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ মাইল। শনির সহচর আর একটি উপগ্রহও প্রায় ইহার সমান। এই দুটি উপগ্রহ বুধগ্রহ অপেক্ষাও বৃহৎ।

মঙ্গলের উপগ্রহ দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের ব্যাস হয়ত দশ মাইলের অধিক হইবে না।

গ্রহগণের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র-গ্রহগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

এই সকল গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহাদিগের স্থানটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ অতিশয় বিস্ময়কর। সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্বগুলিকে পৃথিবীর দূরত্ব দিয়া ভাগ করতঃ সেই ভাগফলকে দশ গুণ করিলে বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ৪, ৭, ১০, ১৬, ৫২, ১০০, ১৯৬ এই সকল রাশি পাওয়া যায়। ইহাদের প্রথম রাশিকে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি রাশি হইতে বাদ দিলে, ৩, ৬, ১২, ৪৮, ৯৬, ১৯২ এইরূপ বিয়োগফল সকল বাহির হয়। ১২ আর ৪৮এর মধ্যে ২৪এর অঙ্কটি থাকিলে রাশিগুলি ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণিত হইয়া আসিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্যোতিষিকগণ এই ২৪এর অঙ্কটির অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যস্থলে কোন গ্রহ থাকিলে এই শূন্য স্থান পূর্ণ হয়, সুতরাং ঐ স্থানে একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহের অস্তিত্বে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন।

ইহা ইউরেনস্ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বের কথা, উক্ত গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে এই নিয়ম তাহার স্থলেও কার্য্যকর। সুতরাং পুনরায় সেই মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যস্থিত শূন্য স্থানটিতে লোকের দৃষ্টি পতিত হইল। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনে ঐ স্থানে একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। তদবধি ঐ বিশেষ স্থানটিতে আরো অনেকগুলি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সকল গ্রহের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি শত।

ইহাদের আয়তন নিতান্তই ক্ষুদ্র। ইহাদের কাহারও ব্যাস ৫০০ মাইলের অধিক নহে। ১০।২০ মাইল ব্যাস বিশিষ্টও অনেকগুলি আছে। এতদপেক্ষাও ক্ষুদ্র যে নাই, এমন কথাই বা কি করিয়া বলা যায়? বাস্তবিক ইহাদের সংখ্যা প্রতি বৎসরই এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এরূপ ভাবে কিছু দিন চলিলে পরে ইহাদের হিসাব রাখাই কঠিন হইবে।

এই গ্রহপুঞ্জের সহিত শনিগ্রহের বলয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়।

গ্রহগণের সকলেরই এক একটা বিশেষত্ব আছে, যথা বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহ; শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহ; মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর অনুরূপ গ্রহ; বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ; শনি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত গ্রহ; ইউরেনস্ ইদানীন্তন কালের প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহ; নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী গ্রহ।

মঙ্গল গ্রহকে পৃথিবীর অনুরূপ বলার অর্থ এই যে, পৃথিবীর ন্যায় উহাও জল স্থলময় গ্রহ। পৃথিবীর মেরুর ন্যায় ইহার মেরুও তুষারে আবৃত। শীতকালে এই তুষার বৃদ্ধি পায়, এবং গ্রীষ্মকালে উহার আয়তন কমিয়া আসে। ইহাতে মেঘ সঞ্চারিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ইহাতে যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহাও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। বৎসরের কোন কোন ভাগে ইহার বর্ণ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাতে বৃক্ষলতাদির অস্তিত্ব সূচিত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

মঙ্গল গ্রহের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য সংবাদ এই যে ইহাতে এমন অনেকগুলি পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, যাহা দৃষ্টি মাত্রই কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। ঐ গ্রহে মনুষ্য আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতেছে না; কিন্তু তথায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, বিশেষ ক্ষমতাশালী জীব আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। তাহারা বলেন যে, বিশাল পয়ঃপ্রণালী সকল খনন করিয়া মঙ্গলের অধিবাসিগণ জলচালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল পয়ঃপ্রণালী এত বৃহৎ, যে তাহাদের ক্ষুদ্রতমগুলির পরিসর ১৮ মাইলের কম হইবে না। স্থানে স্থানে এক একটা হ্রদ হইতে ঐরূপ পাঁচ ছয়টা পয়ঃপ্রণালী নির্গত হইতে দেখা যায়।

মঙ্গল গ্রহে বুদ্ধিমান্ জীবের অস্তিত্বে অনেকের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতি মধ্যেই তাহাদের সহিত পরিচয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এতৎ প্রসঙ্গে সম্প্রতি সংবাদপত্রে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে যে একটি সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিছু দিন হইল আমেরিকার কোন মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ যোগে মঙ্গলগ্রহকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইতেছিল। এমন সময় উহার এক স্থানে অনেকগুলি আলোক হঠাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে দেখা গেল, এবং কিছু কাল পরে তাহা আবার হঠাৎ নিভিয়া গেল। যাঁহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন যে উহা মঙ্গলের অধিবাসিগণের কার্য্য এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সংবাদ দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য।

মঙ্গলের এই সকল পয়ঃপ্রণালী যদি বাস্তবিকই কোন জীবের কার্য্য হয়, তবে সেই জীব মনুষ্য অপেক্ষা অনেক গুণে উন্নত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে কত মঙ্গল, কত পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কত উন্নত হইতে উন্নততর জীবকে রাখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে?

সৌরজগতের অপর কোন গ্রহে জীবের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগুলির এখনও শৈশবাবস্থা। উহারা কালে জীবনিবাসের উপযোগী হইলে হইতেও পারে, কিন্তু এখন তথায় জীব না থাকাই সম্ভব।

আমাদের এই পৃথিবীও যে এক কালে জীবনিবাসের অনুপযুক্ত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন এক সময় গিয়াছে যখন এই পৃথিবী সূর্য্যের ন্যায় অগ্নিময় ছিল। উহা কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বের কথা। তৎপর যুগ যুগান্তর ধরিয়া পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতেছে, এবং তাহাতে নানারূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত জীব প্রাদুর্ভূত হইয়া জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। মনুষ্য অতি অল্প দিন যাবৎই পৃথিবীতে আসিয়াছে, এবং পৃথিবীর জীবন কালের তুলনায় আর অতি অল্পকালই এখানে থাকিতে পাইবে। পৃথিবীর জন্মাবধি ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর জীব জন্মগ্রহণ করতঃ শেষে যেমন মনুষ্যের হস্তে ইহার আধিপত্য রাখিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ মানুষও কালে কোন উন্নততর জীবকে আসন ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িবে কি না, তাহা বিধাতাই জানেন। এ বিষয়ে

কোনরূপ অনুমান করা যদি আমাদের পক্ষে সঙ্গত হয়, তবে তাহা এই যে পৃথিবী ক্রমে শীতল হইয়া কালে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, যে তখন আর তাহাতে কোনরূপ জীব থাকা সম্ভব হইবে না। তত দিনে অন্যান্য লোক জীব নিবাসের উপযোগী হইয়া দয়াময়ের মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ধূমকেতু এবং উল্কার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক দেখা যায় না। সৌরজগতের ধূমকেতুগুলি চিরকালই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

অন্যান্য অসংখ্য ধূমকেতুর ন্যায় ইহারা অনন্ত আকাশের অধিবাসী ছিল। শেষে উর্ণনাভের জালে মক্ষিকা আবদ্ধ হইবার ন্যায় সূর্য্যের আকর্ষণে ধরা পড়িয়াছে।

ধূমকেতুর সম্বন্ধে যখন লোকের জ্ঞান তত পরিষ্কার ছিল না, তখন ইহাদিগকে দেখিয়া সকলে অতিশয় ভয় পাইত। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ইহারা অতিশয় নিরীহ। দেখিতে উহাদের এক একটা যতই বিশাল এবং ভয়াবহ হউক না কেন, উহাদের মধ্যে পদার্থ এত অল্প আছে যে তাহার সম্বন্ধে অধিক সময় নষ্ট করা উচিত বোধ হইতেছে না।

উল্কাগুলির সহিত ধূমকেতুর অতিশয় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায়। ধূমকেতুগণ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে উল্কাপুঞ্জে পরিণত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেই সকল উল্কা সেই ধূমকেতুর অবলম্বিত পথে অদ্যাপি বিচরণ করিতেছে। পৃথিবী ঐ পথের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় ঐ সকল উল্কাকে আকর্ষণ করে। তখন উল্কা সকল বেগে বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ বায়ুর সংঘর্ষণে অতিমাত্র উত্তপ্ত ও দগ্ধ হইয়া ধ্বংস পায়। আমরা যাহাকে উল্কাপাত বলি, তাহা ঐ উল্কার জীবনের শেষ উজ্জ্বল মুহূর্ত্ত মাত্র।

পৃথিবীতে ২৪ ঘণ্টায় কি পরিমাণে উল্কাপাত হয়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে। যাহা চক্ষে দেখা যায়, এরূপ উল্কার সংখ্যা প্রতিদিন এক কোটির কম হইবে না। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক উল্কাই আমরা চক্ষে দেখিতে পাই। উহারা যে বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের নিতান্তই সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। ভগবান যদি বায়ুস্তরকে এত গভীর না করিতেন, তাহা হইলে এই সকল উল্কার আঘাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৌরজগতের আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালীর কতক আভাস পাওয়া গেল। এখন ইহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যতদূর নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া ভাল। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই ইতিবৃত্তের দু এক কথা শিখিতে পারা যায়। বনের ভিতরে যেমন সকল অবস্থার বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশেও সেইরূপ সকল অবস্থার জ্যোতিষ্কই আছে। নিতান্ত শিশু বৃক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ, প্রাচীন বৃক্ষ, শুষ্ক মৃত বৃক্ষ সকলই বনের ভিতরে দৃষ্টি গোচর হয়; এবং তাহা হইতে বৃক্ষ কিরূপে বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত, এবং অবশেষে জরাগ্রস্ত ও মৃত হয়, তাহা আমরা অনায়াসেই কল্পনা করিয়া লইতে পারি। সেইরূপ আকাশের দিকে তাকাইয়াও আমরা নানা অবস্থার জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই এবং তাহাদের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া জ্যোতিষ্কের জীবনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হই। নীহারিকাগণের অবস্থাই জ্যোতিষ্কের প্রথম অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এই সৌরজগৎ এক সময়ে এইরূপ বাষ্পরাশি মাত্র ছিল। সেই বাষ্পরাশি সর্ব্ব প্রথমে কিরূপে আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা ঈশ্বর জানেন। বাষ্প যতই সংকুচিত হইতে লাগিল, আবর্ত্তনের বেগ ততই বাড়িয়া চলিল। এইরূপে কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে মাঝে মাঝে সেই বাষ্পরাশি হইতে এক এক অংশ পৃথক্ হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং এইরূপে গ্রহগুলির জন্ম হইল। সূর্য্য হইতে গ্রহ সকল যে প্রণালীতে নির্গত হইয়াছে, গ্রহ হইতে উপগ্রহ সকলও ঠিক সেই প্রণালীতে নির্গত হইয়াছে।

কটাহের রাশিকৃত উষ্ণ দুগ্ধ হইতে এক চামচ দুগ্ধ তুলিয়া আনিলে, চামচের দুগ্ধ অতি শীঘ্রই শীতল হইয়া যায়; কিন্তু কটাহস্থিত দুগ্ধ তখনও হয় ত পূর্ব্ববৎ উষ্ণই থাকে। এইরূপ কারণে সূর্য্য শীতল হইবার অনেক পূর্ব্বেই গ্রহগণ কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃহস্পতি অপেক্ষা পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র, সুতরাং পৃথিবী তদপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র শীতল হইয়া আসিতেছে। চন্দ্র এতদপেক্ষাও ক্ষুদ্র; এইজন্য চন্দ্রের উষ্ণতা ইতিমধ্যেই লোপ পাইয়াছে। চন্দ্রে

কলেবর যেরূপ ভাবে ফাটিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে ইহার অদৃষ্টে বা এতদপেক্ষাও হীনতর অবস্থা লেখা থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে কালে উহার দেহ ক্রমে গলিত হইয়া শেষে ধূলি রাশিতে পরিণত হইবে।

ইহাই জ্যোতিষ্কের পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। এই পৃথিবী, ঐ গ্রহগণ, ঐ সূর্য্য সকলকেই এককালে এই অবস্থায় আসিতে হইবে।

ইহাই কি তবে এই বিশ্বের পরিণাম? এত শৃঙ্খলা, এমন পারিপাট্য, এত সৌন্দর্য্যের ব্যবস্থা কেন হইয়াছিল—যদি শেষে এইরূপ শোচনীয় ভাবে তাহার অবসান হইবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যায়, যে ভগবান্ আমাদের মানদণ্ড দিয়া তাঁহার সৃষ্টির পরিমাণ ঠিক করেন নাই। মানবের যে এমন সুন্দর দেহ, তাহাও অতি অল্প-কালের মধ্যেই এইরূপে ধূলি মাত্রে পরিণত হয়। জড় রাজ্যের ইতিবৃত্তের ইহাই শেষ অধ্যায়। এথাকার সকলই অনিত্য; নিত্যতা কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যেই আছে।

তবে কি এক কালে সৃষ্টি লোপ পাইবে? তাঁহার কোন ভয় দেখা যায় না। যাহা দেখিতেছি, তাহার যতই অবস্থান্তর হউক না কেন, উহার লোপ অথবা অপচয় অসম্ভব। বস্তুর ধ্বংশ নাই, শক্তির ধ্বংশ নাই, ধ্বংশ হয় কেবল অবস্থার। বস্তু আর শক্তি বিদ্যমান থাকিলে সৃষ্টিও বর্ত্তমান থাকিবে। ভগবান যদি ইহাদের নিত্যতা কাড়িয়া লয়েন তবেই সৃষ্টির লোপ সম্ভব হয়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

সৃষ্টির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে আমরা ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতরে নীত হইতে থাকি। এই পৃথিবীর বিশালতা উপলব্ধি করিতে মানুষের অনেক দিন লাগিয়াছিল। ক্রমে সূর্য্যের বিশালতার সমক্ষে পৃথিবীর আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া গেল। সূর্য্য আবার সৌর জগতের তুলনায় তাহার বিশালতা হারাইল। নক্ষত্রগণের দূরত্বের তুলনায় এই সৌরজগৎও অকিঞ্চিৎকর হইল।

নক্ষত্রগুলি যে এখান হইতে অনেক দূরে তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু বাস্তবিক উহারা পরস্পর হইতে যত দূরে, সৌর-জগৎ হইতে তদপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত নহে। আমাদের সূর্য্য ঐ নক্ষত্রগণেরই দলভুক্ত; এবং উহাদেরই সঙ্গে মিলিয়া ছায়া পথের একটি নিভৃত কোণে বাস করিতেছে।

ঐ ছায়া পথই আমাদের দৃশ্যমান্ জগৎ। ইহা কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় আমাদের নাই। ইহার প্রান্তবর্ত্তী নক্ষত্রগণকে আমরা দেখিতে পাইলেও উহাদের দূরত্ব মাপিতে অক্ষম। এই অগাধ দূরত্বের নিকটে আমাদের দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র সকল পরাস্ত হয়। তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অসীম। অনেকের বিশ্বাস এই যে, ইহা সীমাবদ্ধ। এরূপ উক্তি সৃষ্টির গৌরবের পক্ষে কিছু মাত্র হানিজনক হওয়ার প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রমাণস্বরূপ দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আণ্ড্রোমীডা নামক নক্ষত্র মণ্ডলে একটি অতি বৃহৎ নীহারিকা আছে। Spectroscopeএর সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই নীহারিকা বাষ্পভূত নহে। সুতরাং উহা অগণ্য নক্ষত্র-মালায় গঠিত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দূরবীক্ষণেই এই সকল নক্ষত্রকে পৃথকরূপে দেখা যায় নাই। ঐ সকল নক্ষত্র হয় নিতান্তই ক্ষুদ্র, না হয় অতিশয় দূরবর্ত্তী। যদি শেষোক্ত কথাই সত্য হয়, তবে ঐ নীহারিকা আমাদের ছায়াপথ হইতে হীন কলেবর হইবে না। অর্থাৎ সে অবস্থায় উহাকেও একটি স্বতন্ত্র ছায়াপথ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সৃষ্টিতে ঐরূপ আর কত ছায়াপথ আছে, তাহা কে জানে। ছায়াপথের সীমা সহজেই কল্পনা করিতে পারি; এমন কি, কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলেন যে তাঁহারা সেই সীমার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন। নভোমণ্ডলের কোনরূপ সীমা সম্ভব হয় না। সুতরাং আমাদের এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যদি সসীম হয়, তবে এ প্রশ্ন সহজেই উত্থাপিত হইতে পারে যে "অতঃপর কি আছে?" এরূপ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তরটিও সহজেই মনে হয়। ঐ অনন্ত আকাশে আরো বহুতর জগৎ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা এতই দূরবর্ত্তী যে, এখান হইতে উহাদিগকে দেখিবার উপযুক্ত কোন যন্ত্র আমাদের নাই। হয় ত উহাদের আলোক এখনও পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়ই নাই।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন যদি আমাকে কেহ প্রশ্ন করেন যে "সৃষ্টির বিশালতা কি তুমি কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলে?" তবে আমাকে সংকোচে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে আমি তাহার

কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। বিশাল বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা আমাদের এতই সীমাবদ্ধ যে, আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র বিষয় ভিন্ন আর কিছুরই উপলব্ধি করিতে পারি না। কাজেই এইরূপ সুমহান ব্রহ্মাণ্ডের কথা শ্রবণ ও আলোচনা পূর্ব্বক আমাদের তদপযুক্ত বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। ভগবান আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া আমাদের প্রতি অশেষ করুণা করিয়াছেন। যদি তিনি তাহা না করিতেন —যদি ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতর বিষয়ের কথা শুনিয়া আমাদের মনোবৃত্তি সকল তাহার অনুপাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তবে এতক্ষণে আমাদের কিরূপ দুরবস্থা হইত, তাহা এক বার কল্পনা করিয়া দেখুন। মস্তকে বজ্রপাত হইলেও বুঝি এতদপেক্ষা গুরুতর দুর্ঘটনা হয় না। সুতরাং এই কৃপার জন্য দয়াময়কে ধন্যবাদ দিয়া এইখানে অদ্যকার বিষয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়।

(সমাপ্ত)

ছাতির কথা।

ছাতির আবার গল্প। যে ছাতি আজিকালি আব্রাহ্মণ-চণ্ডালপর্য্যন্ত নিত্য ব্যবহার করিতেছে তাহার আবার ইতিহাস! এই বলিয়াই হয়ত অনেকে হাস্য করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক ছত্র সম্বন্ধে এমন অনেক আশ্চর্য্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যে, তাহা অনেক ভাল ভাল গল্প অপেক্ষাও রুচিকর। অনেকে হয় ত জানেন যে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে "জোনাস্ হ্যানওয়ে" নামক এক ব্যক্তি প্রথমে ইংলণ্ডে ছাতির প্রচলন করেন। কিন্তু উক্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন ইংলণ্ড অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল, তখনও সে দেশে ছাতির ব্যবহার ছিল। বৃটিশ মিউজিয়মে যে সকল পুরাতন প্রস্তর এবং ধাতুফলক আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালে ছাতা একটী রাজকীয় সম্মানের বস্তু ছিল। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৮৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত একখানি ধাতুফলকে "এসেরিয়ার" এক জন বিখ্যাত রাজার প্রতিকৃতি আছে। ইনি একটী মৃত বৃষের উপর আহুতি প্রদান করিতেছেন এবং পশ্চাতে রাজভৃত্য ছত্র ধারণ করিয়া আছে। এই ফলকখানি এক্ষণে বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইতেছে। ইহা হইতেই স্পষ্টই দেখা যায় যে বহু পুরাকাল হইতেই পৃথিবীতে ছত্রের প্রচলন আছে।

পূর্ব্বকালে যে কেবল "এসেরিয়া"বাসীরাই ছত্র ব্যবহার করিত তাহা নহে, মিশরের পুরাবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে মিশরদেশের রাজারা এবং পুরোহিতেরা ছত্র ব্যবহার করিতেন। গ্রীস্বাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারাই ছত্র ব্যবহার করিতেন। পরে রোম যখন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিল এবং যখন সমস্ত পৃথিবী রোমের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তখন ছত্র কেবল রাজকীয় সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত না; সর্ব্বসাধারণেই আতপ বর্ষা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছাতা ব্যবহার করিত।

এসিয়াতে ছাতা কেবল রাজচিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত ছিল না, অনেক সম্প্রদায়ের লোকে অতি ভক্তি সহকারে ছাতির পূজা করিত। এবং এই প্রথা চীন এবং শ্যাম দেশে অদ্যাপি দেখা যায়। অনেকে হয়ত চিনেদের ধর্ম্মমন্দির দেখিয়াছেন। এই মন্দির আর কিছুই নয়, একটী বৃহৎ ছত্র! চীন দেশের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে পূর্ব্বে তাহাদের ধর্ম্মশালা সকল গোলাকার গম্বুজের মত প্রস্তুত হইত এবং ঐ মন্দিরের মস্তকে খিলানের পরিবর্ত্তে রেশমের কিম্বা কাপড়ের ছাতা থাকিত। কিছুদিন পরে যখন তাহারা দেখিল যে ঐ সকল ছত্র শীঘ্র নষ্টশীল, তখন তাহারা ছাতির পরিবর্ত্তে সেই সকল ধর্ম্মশালার উপর ইষ্টক কিম্বা প্রস্তরের "খিলান" নির্ম্মাণ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহাদের প্রাচীন ছত্রশীর্ষ ধর্ম্মশালা সকল আধুনিক পাকা প্যাগোডায় পরিণত হইয়াছে।

চীনবাসীরা তাহাদের রাজাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করে, এমন কি তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জ্ঞান করে, সুতরাং এই দেশেই ছাতির পূজা অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন রাজার রাজ্যাভিষেক কালে কিম্বা রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির বিবাহের সময় চীন দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক একটী রেশমী ছাতা হাতে করিয়া আগে আগে যায় এবং তৎপশ্চাৎ রাজা কিম্বা বিবাহের পাত্রপাত্রীরা গমন করে। এই ছাতি বাহকদিগের দল সময় সময় দুই তিন শতেরও অধিক হয়। এই সকল "রাজার

দেখিবার বস্তু বটে। এই ছাতির তিনটী করিয়া "স্তবক," এক একটী স্তবক নানাবিধ রঙের বহুমূল্য রেশমী কাপড়ে প্রস্তুত এবং প্রত্যেকটীর উপর এক একটী রাজচিহ্ন অঙ্কিত থাকে। ছত্রগুলি রাজপ্রাসাদে অতি সন্তর্পণের সহিত রক্ষিত হয়। চীনদেশে ছাতির ব্যবহার যত অধিক, পৃথিবীর বোধ হয় আর কোনও দেশে তত নহে। বড় বড় জমীদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যখন ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভৃত্যেরা ছত্র ধরিয়া গমন করে। প্রত্যেক মন্দিরে প্রায় ১০।১২ টী করিয়া সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য ছত্র রক্ষিত আছে। মৃত ব্যক্তিদের কবরের উপরেও অসংখ্য কাগজের ছাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার কালে বহুসংখ্যক ব্যক্তি নীল এবং শ্বেত বর্ণের ছত্র ধারণ করিয়া শবের অগ্রে গমন করে।

চীনদেশের লোকেরা কিরূপ ছত্রভক্ত, তাহা নিম্নলিখিত গল্প হইতে বুঝা যাইবে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী কোন এক জন চীনবাসী এক দিন বাইবেল পড়িতে পড়িতে দেখিল, এক স্থলে খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিতেছেন যে, "Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." অর্থাৎ "যে আমার সঙ্গে আসিতে ইচ্ছা করে, সে আপনাকে ভুলিয়া গিয়া নিজের ক্রুশ লইয়া আমার পশ্চাতে আসুক।" কিন্তু ঐ চীনবাসী "take up his cross"এর প্রকৃত অর্থ ঠিক করিতে না পারিয়া ভাবিল যে, যিশু নিশ্চয়ই ছাতির কথা বলিতেছেন! অবশেষে সে উক্ত অংশটুকু নিজে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইল "Leave everything but your umbrella; take that and follow me." অর্থাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল "ছাতি" লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।"

চীনেদিগের ন্যায় ব্রহ্মবাসীরাও অত্যন্ত 'ছাতিখোর'। উক্ত দেশের প্রত্যেক কর্ম্মচারী স্বীয় পদমর্য্যাদানুযায়ী ছোট বড় ছাতি ব্যবহার করে। কিন্তু এই সকল ছাতির কেবল একটী মাত্র "স্তর" থাকে। রাজা এবং রাজপরিবারবর্গ কেবল বহুমূল্য ও বহুস্তরযুক্ত ছত্র ব্যবহার করেন। শ্যামদেশবাসীরা যদিও ছাতির পূজা করে না, তথাপি তাহারা ছাতিকে রাজকীয় ক্ষমতার দ্যোতক মনে করে। তাহাদের রাজার অনেকগুলি বহুমূল্য ছত্র আছে। শ্যামদেশের রাজা আমাদের বর্ত্তমান রাজাকে এবং "ডিউক অব ইয়র্ককে" "মহা-চাকরি" (Maha chakri) উপাধিতে ভূষিত করিয়া দুই জনকে দুইটী বহুমূল্য ছত্র উপহার দিয়াছিলেন। শ্যামদেশের কোন ধনীব্যক্তির কিম্বা কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহটীকে উত্তমরূপে তৈলাক্ত করিয়া একখানি নৌকার উপর রাখা হয় এবং তৎপরে সেই নৌকার মধ্যভাগে একটী ডাণ্ডা পুঁতিয়া তাহার উপর একটী বৃহৎ ছাতা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার ছত্রের অনেকগুলি করিয়া থাক থাকে এবং যিনি যত বড় লোক, তাঁহার শবের উপর সেই পরিমাণে থাকের সংখ্যা অধিক হয়।

বোর্ণিও দ্বীপেও মৃত ব্যক্তির কবরের উপর ছাতা দেওয়া হয়। জাপানে সুন্দর সুন্দর কাগজের ছাতি প্রস্তুত হয়। এই ছাতিগুলি দেখিতে ছোট তাঁবুর মত এবং নানাবিধ রঙের-কাগজে এবং কাপড়ে নির্ম্মিত।

আমাদের ভারতবর্ষেও বহু পুরাকাল হইতে ছাতির প্রচলন আছে। অনেক ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত ছাতির পূজা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে সাঁওতালেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী

ছত্রপূজক। উহারা বসন্তকালে একটী স্থান উত্তমরূপ পরিষ্কার করিয়া তথায় একটী বাঁশ পুঁতে ও তাহার উপর একটী ছাতি বাঁধে এবং ফুলের মালা দিয়া সেই ছাতাটীকে উত্তমরূপে সাজাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে গীত বাদ্য সহকারে নৃত্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

মোগলদিগের রাজত্বকালে কেবল বাদসা এবং উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীরাই ছত্র ব্যবহার করিতে পাইতেন। তদ্ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি ছাতি ব্যবহার করিতে পাইত না। যখন কোন ইংরাজ বণিক কিম্বা কোন ভ্রমণকারী দিল্লীর মধ্য দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহাকে ছাতি পরিত্যাগপূর্ব্বক নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। আজি কালিও আমাদের দেশে অনেক রাজ্যে কেবল রাজপরিবারবর্গই ছাতি ব্যবহার করিতে পান, অপর কেহ উহার ব্যবহার করিতে পারেন না।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ছত্র যে রাজ-চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত, তাহা আমরা রামায়ণাদি সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে অবগত হইতে পারি। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের এক-স্থলে আছে—

"জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে
কুমার-জন্মামৃত-সম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ
শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে।"

বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীর বরে যখন রাজা দিলীপের একটী পুত্রসন্তান হয়, তখন অন্তঃপুরচারী যে ব্যক্তি "কুমারের জন্ম হইয়াছে" এই কথা, রাজাকে শুনাইয়াছিল, সেই ব্যক্তিকে ইন্দুধবল শ্বেত ছত্র ও দুইটী চামর, এই তিন দ্রব্য ভিন্ন দিলীপের আর কিছুই অদেয় ছিল না।

ছত্র যে রাজ পরিচ্ছদ এবং রাজচিহ্নের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল, তাহা আমরা উক্ত সর্গের শেষ শ্লোকটী পাঠে অবগত হইতে পারি।—

"অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে
নৃপককুদং দত্বা যূনে সিতাতপবারণম্
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে",

* * * * * * * * *

অনন্তর দিলীপ বিষয়ভোগ বাসনায় বীতস্পৃহ হইয়া যুবরাজ রঘুকে যথাবিধি রাজচিহ্ন শ্বেতছত্র প্রদান করিয়া সুদক্ষিণা দেবীর সহিত মুনি-সেবিত বনের তরুচ্ছায়া অবলম্বন করিলেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই সপ্রমাণ হয় যে, প্রাচীনকালে ছত্রই রাজ-সম্মানের প্রধান বস্তু ছিল। অনেকে হয়ত জানেন যে, প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ (আমাদের বর্ত্তমান রাজা) যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন রাজচিহ্নের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার মস্তকোপরি একটী বৃহৎ রাজছত্র ধৃত হইয়াছিল।

আফ্রিকা দেশেও অনেকস্থলে রাজ ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ ছত্র ব্যবহৃত হয়। "আবিসিনিয়া" প্রদেশের রাজা কিংবা রাণী যখন ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন ভৃত্যেরা তাঁহাদের মস্তকে ছত্র ধরিয়া গমন করে। ইঁহাদের একটী সুবৃহৎ ক্রুশচিহ্নাঙ্কিত রাজছত্র আছে; উৎসবাদির উপলক্ষে তাহা ব্যবহৃত হয়।

"অশান্তি" দেশের রাজন্যবর্গের প্রত্যেকের এক একটী রাজছত্র আছে। ইহাদের দেশে রাজাদের মুকুট নাই, ছত্রই মুকুট স্থানীয় এবং যিনিই এই রাজছত্র অধিকার করিতে পারেন, তিনিই রাজ্যলাভ করেন! অপহৃত-ছত্র রাজা আর "রাজ-সম্মান" পান না!

"মরক্কো" প্রদেশে সুলতান ভিন্ন অপর কেহই ছত্র ব্যবহার করিতে পারে না; কিন্তু "নাইজার" প্রদেশের রাজা এবং কর্ম্মচারীরাও ছত্র ব্যবহার করিতে পারে। আফ্রি-কাতে যে সব ছত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা দেখিতে কদাকার ভীষণ! উহার চতুর্দ্দিকে মনুষ্য-দন্ত-কঙ্কাল, কড়ি ইত্যাদি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মরক্কো এবং আবিসিনিয়া-বাসীদের ছত্রগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর! আমরা এইস্থলে

অপাস্তিদেশের রাজা "প্রেমকার" ছত্রের একটী চিত্র দিলাম। এই ছত্র এক্ষণে উইণ্ডসর প্রাসাদে রক্ষিত হইতেছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে "হ্যানওয়ে" নামক এক ইংরাজ ইংলণ্ডে প্রথম ছত্র প্রচলন করেন। এই ব্যক্তি আসিয়াভূমি ভ্রমণ করিয়া তথাকার লোকদের ছত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়া ছত্রের আবশ্যকতা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন এবং পরে স্বদেশে গিয়া ছত্র ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু তিনি এই ছত্র ব্যবহার করিতে গিয়া প্রথমে একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। যখন তিনি তাঁহার স্বজাতীয়ের নিকট ছত্র ব্যবহারের কথা উত্থাপন করেন, তখন সকলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দেয়; এমন কি রাস্তায় বহির্গত হইলেও অনেকে তাঁহাকে ঢিল মারিতে এবং বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কিছুদিন পরেই সকলে ছত্র ব্যবহারের উপকারিতা বুঝিতে পারিল এবং ছত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ঠিকা গাড়িওয়ালারা যখন দেখিল যে, লোকে রৌদ্রক্লান্ত হইয়া আর "গাড়ি ভাড়া" করে না, কিন্তু ছাতি মাথায় দিয়া অবাধে পথ হাঁটিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া হ্যানওয়ের বিরুদ্ধে এক মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসিদেশে ছত্রের প্রথম প্রচলন হয়। তখন দুই একজনকে ছত্র ব্যবহার করিতে দেখা যাইত; কিছুদিন পরে সকলেই ছত্র ব্যবহার আরম্ভ করিল। সেখানে Pont-Neuf নামক একটী সেতু আছে। কিছুদিন কয়েকজন মিলিয়া সেই সেতুর দুই প্রান্তে দুইটী ছোট ঘর তৈয়ার করিয়া তাহাতে বিস্তর ছাতি রাখিয়া (দুই ফারদিং) এক পয়সাতে ছাতি ভাড়া দিতে লাগিল। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ঐ মূল্য দিয়া সেতুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাতা মাথায় দিয়া যাইতে পারিত।

রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের সময়েও কলিকাতার নানা স্থানে উৎকল দেশীয় ভাড়াটিয়া ছাতাওয়ালাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহারা প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া বাবুদের জন্য অপেক্ষা করিত; এবং রৌদ্র বৃষ্টির সময়ে পয়সা লইয়া ভদ্র পথিকদিগকে যথা স্থানে রাখিয়া আসিত। আজ কাল কার্ত্তিক ঠাকুরের পশ্চাতে যে ছত্রধারী উড়িয়ার প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার মূল এই।*

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সমগ্র গ্রেট্ ব্রিটেনের মধ্যে কেবল মাত্র রিডিং নগরে ছত্র হস্তে এক ব্যক্তির একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই ভদ্রলোকটী আর কেহ নহে,—বিখ্যাত বিস্কুটওয়ালা "জর্জ পামার।"

* বিগত বর্ষের প্রদীপে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ডেভিড হেয়ার নামক প্রবন্ধের ২১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

"নেব্‌রাস্‌কা" প্রদেশের "ওমাহা" নগরে ৩৫০ ফিট উচ্চ একটী বৃহৎ ধাতু নির্ম্মিত ছত্র প্রস্তুত হইতেছে। এই ছত্রের প্রত্যেক "শিক্‌" হইতে এক একখানি গাড়ী ঝুলান হইবে এবং সেই গাড়ীগুলিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০ জন মনুষ্য বসিতে পারিবে! এই সকল গাড়ীতে লোক চড়িলে তড়িৎ সাহায্যে এই ছাতিটী সাধারণ ছাতির ন্যায় খুলিয়া যাইবে। এবং ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকিবে, পরে যখন যথানির্দ্দিষ্ট উচ্চ স্থানে উঠিবে, তখন সেই সকল শকট সেই সুবৃহৎ ছত্র-দণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবে! ইহা কতকটা আমাদের দেশের "রাধা-চক্রের" ন্যায়। তবে ইহাতে অনেক যন্ত্রাদি থাকিবে এবং তড়িৎ সাহায্যে ইহার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এই যা!

পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাপড়ের ছাতির অপেক্ষা "গুয়া-পাতার" ছাতিরই বিশেষ আদর এবং প্রচলন ছিল। অদ্যাপি ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলে উহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। সেকেলে (এবং একালেও দুই দশজন) মোক্তার, উকীল বা আদালতের কর্ম্মচারিগণ কাছারী গমন-কালে বৃহৎ দণ্ডযুক্ত প্রকাণ্ড আটচালার ন্যায় গুয়া-পাতার ছাতার শীতল ছায়ায় দেহ রাখিয়া ছত্রধারী ভীমসেনকে গলদ্‌ঘর্ম্ম করেন! বেচারীর প্রাণান্তব্যঞ্জক মুখচ্ছবি, বাবুর অপূর্ব্ব বেশ এবং তদুপরি ছত্ররাজের দিগন্ত-প্রসারী মূর্ত্তি দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে!

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিরহিণী।

[মেঘের প্রতি যক্ষের উক্তি]

হেরিবে সে গৃহ মাঝে রমণী-রতন রাজে,
পক্কবিম্বাধরা, শ্যামা শিখরিদশনা,
বহিয়া নিতম্বভার মন্থর গমন তার,
ক্ষীণ কটি, নিম্ন নাভি কুরঙ্গনয়না,
পীন পয়োধর ধরি' তনু মন্দনত মরি,—
প্রথম যুবতী করি' শিল্প রচনায়
বিরলে গড়িলা বিধি প্রেয়সী আমার।
দ্বিতীয় জীবনসমা সে মোর প্রিয়তমা
গভীর বেদনা বহে বিরহে আমার,
না কহে অধিক কথা, চক্রবাক বধূ যথা,
একাকিনী থাকে বালা ভবনে আমার।
নয়নের জল ঝরে অবিরল
ফেটে পড়ে যেন সুচারু আঁখি,
অধর তাহার মলিন আকার
বিরহতপত নিশাস মাখি'।
করতল 'পরি ধৃত মুখ মরি
রেখেছে আবরি' অলকদাম,—
তব গুণ্ঠন বৃত চন্দ্রম
যেমতি শ্রীহীন মলিন ঠাম।
মিলনের তরে ব্যাকুল অন্তরে
দেব-আরাধনা করিছে মরি!
কিংবা নিরজনে আঁকিছে যতনে
আমার মূরতি মানসে স্মরি'।
পিঞ্জর নিবাসে সারিকার পাশে,
গিয়া কভু কহে মধুর স্বরে,—
"প্রভু নিরন্তর করিত আদর
লো রসিকে! তাঁরে মনে কি পড়ে?"
মম নামাঙ্কিত পদ সুললিত
গাহিতে সঙ্গীত বিষাদ-লীন

আহা সে ললনা মলিন-বসনা
রাখে অঙ্ক'পরে করুণ বীণ্!
নয়ন আসার সিক্ত তন্ত্রী তার
মুছি' কোন মতে আচলে হায়!
আপন রচনা মরি মূরছনা
বার বার বালা ভুলিয়া যায়।
হইতে দেহলী ফুল দল তুলি'
গণে বিরহিণী বিরহমাস,—
গেল কত তার বাকি কত আর,
ফুরাইবে কবে বিরহ রাশ।
ভাবিতেছে কিবা কোথা কোন দিবা
নাথ-আলিঙ্গন লভিল বালা,—
এমন চিন্তায় সদা ভুলে যায়
বিরহবিধুরা মরম জ্বালা।
নানা সাধনায় দিবস ফুরায়
বিরহ তেমন নাহিক দহে,
আসিলে যামিনী আহা সে দুখিনী
মরণ অধিক যাতনা সহে।
অবনী শয়নে অনিদ নয়নে
নিশীথে নীরবে কাঁদে সে হায়!
হে করুণ ঘন! হ'তে বাতায়ন
আমার বারতা কহিয়ো তায়।
বিরহ-শয্যায় এক পাশে হায়
ক্লিশ তনুলতা রয়েছে পড়ি',—
যেন প্রাচী মূলে পড়িয়াছে ঢুলে'
ক্ষীণ শশিকলা মলিন মরি!
সাধের মিলনে সুখ-জাগরণে
কাটিত যে নিশি পলকে হায়,
আজি সে যামিনী যাপিছে কামিনী
তিতি আঁখিনীরে যুগের প্রায়!
ইন্দু কিরণ হ'তে বাতায়ন
পড়িছে ঝরিয়া শয়ন কোলে,
সুখের আশায় হেরিতে তাহায়
চমকি' ললনা নয়ন খোলে।
অমনি উথলে [illegible] নীর আঁখিতলে,
নয়নের পাতা মুদিয়া আসে,—

বাদলের দিনে যেমতি বিপিনে
জাগরণহীন নিদ্রা বিহীন
স্থল কমলিনী বিষাদে ভাসে!
চারু চঞ্চল রুখু কুন্তল
পড়েছে আসিয়া কপোলে হায়,
অধর রাঙ্গিয়া মলিন করিয়া
দুলায় নীরব নিশান তায়।
স্বপন মাঝারে লভিতে আমারে
চাহিছে ললনা ঘুমের ঘোর,
ঘুমাবে কেমনে? উথলে নয়নে
আমরি নিঠুর নয়ন-লোর!
প্রমথ বিরহ দিবসে অসহ
বাঁধিলা যে শিখা বিষাদে ভাসি',
বরষের পরে হরষের ভরে
করিব মোচন আমি যা' আসি,'
এক বেণী হায়! সে শিখা লুটায়
কঠিন, বিষম, কপোল'পরে,
মুহু মুহু মরি! পরশে শিহরি'
দিতেছে সরায়ে সনখ করে!
আহা সে অবলা বিরহ বিকলা
অসহ ভূষণ ফেলিছে খুলি,'
দারুণ দহনে বিরহ শয়নে
মৃদুল তনুয়া পড়িছে ঢুলি'।
দরশি' সে দুখ বিদরিবে বুক
অশ্রুরূপে তব পড়িবে ধারা,—
সজল অন্তর গলে নিরন্তর
করুণা পরশে, জগত ধারা।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শব্দদ্বৈত।

গত ফাল্গুন মাসের প্রদীপে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত রবিবাবুর বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া দুইচারিটী কথা মনে উদিত হইল; নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। রবিবাবুর প্রবন্ধ

পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। সমালোচনা পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে, তাহাই লিখিতেছি। রবিবাবু অথবা শ্রীনিবাসবাবুর ত্রুটি প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহার সমস্ত সঙ্গত নাও হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে, এই বিশ্বাসে আমরা অতিশয় সংকোচের সহিত দুই একটী কথা বলিতেছি।

আমাদের মতে শ্রীনিবাসবাবু "তিন তিন" "চারি চারি" প্রভৃতির যে অর্থ করিয়াছেন, উহা তাহাদের সাধারণ অর্থ বটে; কিন্তু রবিবাবুর অর্থেই বিশেষত্ব আছে। "চারি চারিটে পেয়াদা"র যে অর্থ রবিবাবু করিয়াছেন, উহাই বিশেষ ভাবাত্মক বোধ হয়। একটা নয়, দুইটা নয়, "চারি চারিটে পেয়াদা" উহাতে এইরূপ অর্থই বুঝায়। বিশেষত্ব এই যে, একটা পেয়াদাই যথেষ্ট, সেই স্থানে চারিটা। একটাতেই আশঙ্কা বা অশান্তির কারণ আছে, চারিটা খুবই বেশী। শ্রীনিবাসবাবু সাধারণ অর্থের দিকে গিয়াছেন। আমরা যে বিশেষত্বের কথা বলিলাম, উহা বুঝাইবার নিমিত্ত দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। "লোকটার চারি চারিটে ছেলে মারা গেছে, কাজেই শোকে মর মর।" একটীর মৃত্যুতেই শোক হইবার কথা; চারিটীর শোক অত্যন্ত অধিক। এইরূপ"—(একটা নয় দুটো নয়) দশ দশটা টাকা হারাইয়া গেল।" অর্থাৎ একটা গেলেও অনুতাপের কথা—সেখানে দশটা। এমনই "পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা লোকসান্।" আমাদের মতে রবিবাবুই এই বিশেষ অর্থ টানিয়া আনিয়াছেন; শ্রীনিবাস বাবু তাহা পারেন নাই। "তখন তাহাকে ধরিবার জন্য চারি চারি পেয়াদা আসিয়া হাজির" এ প্রয়োগ ঠিক এবং আমরা এরূপ প্রয়োগ শুনিয়াছি।

শ্রীনিবাসবাবু "সকাল সকাল" দ্বিত্বেরও সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রদীপ-সম্পাদক মহাশয় টীকায় তাঁহার ভুল ধরিয়া দিয়াছেন। সম্পাদক যে প্রয়োগটী দেখাইয়াছেন, উহাতেই "সকাল সকাল"-এর বিশেষ অর্থ সূচিত হইয়াছে। ইহার অর্থ "নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে।" 'সকাল সকাল উঠা'র অর্থও তাহাই। প্রতিদিন যে সময়ে উঠা হয়, তাহার পূর্ব্বে উঠা, অথবা সাধারণতঃ লোকে যে সময়ে উঠে, তাহার পূর্ব্বে উঠা এইরূপ বুঝায়। "সকাল সকাল বেড়িয়ে যেন দিনে দিনে সেখানে পৌঁছিতে পার" বা "সকাল সকাল বেরুতে হবে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফেরা চাহি"—প্রয়োগ দেখুন। অন্যদিনে বাহির হইয়া দিন থাকিতে থাকিতে পৌঁছান যায় নাই বা ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে, তাই সে সময়ের পূর্ব্বে বাহির হইবার কথা বলা হইতেছে। "সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়" এর অর্থ বোধ হয় সন্ধ্যার কাছাকাছি, অর্থাৎ সন্ধ্যার একটু ও দিকে গেলেও ক্ষতি নাই।

"গরম গরম" এর অর্থেও শ্রীনিবাস বাবু পূর্ব্বের ন্যায় কেবল সাধারণ অর্থ ধরিয়াই টানিয়াছেন। আমাদের মতে ইহার অর্থ রবি বাবুর "খুব গরম" বলিয়াও বোধ হয় না। ইহার অর্থ যেন ঈষদুষ্ণ বা যতটা গরম সহ্য করা যায়, তাহাই। "জলটা গরম গরম খাবেন" বলিলে কিছু গরম (থাকিতে) খাবেন ইহাই বুঝা যায়। জল ঠাণ্ডা খাওয়াই সাধারণ নিয়ম। ঠিক এমনই "গরম গরম দুধ খাবেন," বা "দুধটা গরম গরম খাবেন।" "গরম গরম লুচি" বলিলে আমরা বুঝি, যতটা গরম সহ্য করা যায় বা আহারের পক্ষে ভাল—তাহাই। মুখে ফোস্কা পড়ে, এমন গরম নহে। তবে এখানে শ্রীনিবাস বাবুর অর্থ অর্থাৎ প্রত্যেক খানা গরম এরূপ অর্থ—করাও চলে। কিন্তু "তাহার মেজাজটা গরম গরম বোধ হ'ল" এখানে অর্থ বোধ হয়, কিছু গরম—স্বাভাবিক নিয়মের অতিরিক্ত। "সাহেবী সাহেবী মেজাজ" বলিলেও খুব সাহেবী বুঝায় না। "চেহারাটা নরম নরম" বা "মুখ খানা শুক্‌নো শুক্‌নো" বা "কথাগুলো ফাঁকা ফাঁকা" ইহার অর্থ লইয়া বোধ হয় মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কাপড়টা বা কাপড়খানা "ভিজে ভিজে রয়েছে" বলিলে ঈষৎ আর্দ্র বা স্থানে স্থানে আর্দ্র রহিয়াছে, এইরূপ বুঝা যায় বলিয়া আমাদেব ধারণা।

"গরমাগরম" কথাটী আমাদের মতে বাঙ্গালা কথাই নহে। ইহাকে শব্দদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া আনা ভাল হয় নাই। সহরের 'সাড়ে বত্তিশ ভাজা' বিক্রেতা হিন্দুস্থানীর মুখে ভিন্ন এ কথা অন্য কোথায়ও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে 'ঝমাঝম্ বৃষ্টি' ঠিক বটে। সপাসপ্ বেত বা পটাপট্ পাদুকা প্রহার এই শ্রেণীর কথা। টপাটপ্ রসগোল্লা উদরসাৎ করাও শুনা যায়। এ সকল স্থানেই যেন ক্রিয়াজনিত ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এক একটী পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রবিবাবুর প্রবন্ধ দেখি নাই; সুতরাং সাহস করিয়া
ান কথা বলিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, শব্দ-
তের একটা শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক। কতকগুলি
শব্দাদ্বৈত, কতকগুলি বিশেষণদ্বৈত, আর কতকগুলি
য়া বিশেষণদ্বৈত, এতদ্ভিন্ন ক্রিয়াদ্বৈতও আছে। এই
ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইলেই যেন ভাল হয়।
ঝাঁ, টা টা, শাঁ শাঁ, অথবা টো টো, ভো ভো, হো হো
তি পৃথক রাখিলেই চলে। শ্রীনিবাস বাবুর সমা-
চনায় সকল শ্রেণীরই দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু শৃঙ্খলা নাই।
াদের বিবেচনায় এক এক শ্রেণীর বিশেষ ভাবাত্মক
গুলি সংগ্রহ করিয়া সাধারণ অর্থবাচক শব্দযুগ্মের
রিটী দৃষ্টান্ত দিলেই চলিতে পারে। সমস্ত শব্দদ্বৈত
শেষ করা সম্ভবপর নহে, করিতে গেলেও ভাষার অভি-
র ন্যায় প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়। বাঙ্গালার বড় অভি-
হইলে তাহাতেই প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে তাহার পুনরা-
হয় কি না, অথবা অন্য কোন শব্দের সহিত তাহার
াগ হয় কি না, তৎসমস্তের উল্লেখ করিলেই যেন
তে পারে।

আমাদের মতে "পদে পদে লাঞ্ছিত" বা "গ্রামে গ্রামে
র" এরূপ প্রয়োগের বিশেষত্ব নাই বলিয়া উল্লেখ না
লেও চলে। কিন্তু "ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পাওয়া" বা
াণে প্রাণে বেঁচে থাকার" উল্লেখ করা আবশ্যক।

শ্রীনিবাস বাবুর লিখিত অনেকগুলি শব্দকে আমরা
দ্বৈত বলিতে চাহি না। আমাদের মতে "ধর্ম্ম টর্ম্ম" কে
দ্বৈত না বলিয়া এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ভাষার
ক শব্দের প্রথম অক্ষরের পরিবর্ত্তে "ট"কার বসাইয়া
রূপ পুনরাবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যথাঃ—ধর্ম্ম টর্ম্ম,
টথা, বই টই, ধান টান, দুধ টুধ ইত্যাদি। বাঙ্গালায়
রূপ শব্দেরও এইরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। এমন কি
াদা শব্দেরও এই পুনরাবৃত্তি হইতে নিস্তার নাই।
—"টাকা টাকা কিছু আছে?" "দেখো যেন টান্
াগে না।" শ্রীনিবাস বাবু টর্ম্মকে ধর্ম্মের বিপরীত-
ভাবিয়া ধর্ম্ম টর্ম্ম এর বিপরীত অর্থই করিয়াছেন।
দের মতে এইরূপ পুনরাবৃত্তিতে বস্তুর সদৃশ, তৎজাতীয়
সংক্রান্ত কিছু বুঝায়; বিপরীত কথনই বুঝায় না।
টাকা বলিলে আমরা টাকা এবং যাহাতে টাকার
কাজ হয় (পয়সা নোট ইত্যাদি) এমন কিছু বুঝি। ধর্ম্ম
টর্ম্মের অর্থও সেইরূপ।

চিঠিপত্রকেও শব্দদ্বৈত বলিয়া ধরিতে আমাদের আপত্তি
আছে। পত্র শব্দটী প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে সাধারণতঃ যে যে
শব্দের পরে প্রযুজ্য, তাহাদের কতকগুলি উল্লেখ করিলেই
চলে। যথাঃ—চিঠি, কাগজ, পুঁথি, হিসাব, নিকাশ, খরচ,
বিছানা বাসন, জিনিষ। আমরা খতপত্র, খাজনা পত্র বা
তৈজসপত্র বলিয়া থাকি; কিন্তু দোয়াত বা কলমপত্র, টাকা
বা পয়সা পত্র বা ঘটী পত্র শুনা যায় না।

প্রবন্ধলিখিত কতকগুলি শব্দকে যে শব্দদ্বৈতের মধ্যে
স্থান দেওয়া উচিত নহে, ইহা প্রবন্ধ শেষে শ্রীনিবাস বাবু
স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, রবি বাবুর প্রবন্ধেও
এইরূপ কথা আছে। আমরা কাহারও সমর্থন করি না।
যে সব কথা লেখা হইয়াছে, তাহাতে ঘর দোর, ঘটী বাটী,
খন্তা কুড়াল, ছাতি লাঠি কিছুই বাদ দেওয়া চলে না।
ইহাতে দীনবন্ধু বাবুর সেই 'সকলই ছুই ছুই' মনে
পড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবি বাবুর প্রবন্ধ দেখি নাই; প্রদীপে
স্থানও সংকীর্ণ। এই দুই কারণেই সংক্ষেপে আমাদের
ক্ষুদ্র মন্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

কৈফিয়তের জবাব।

বায়ুনভোবিদ্যা নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদের কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। লেখকের মতে সায় দিতে পারি নাই, এবং কেন পারি নাই, তাহাই আমার প্রতিবাদের উদ্দেশ্য ছিল। কোন এক জন বা দুই জনের অনুমানকে অপর বিশ জন যে "সিদ্ধান্ত" বলিবে এমন কথা নাই। বায়ুনভোবিদ্যা-লেখক যদি লিখিতেন, অমুক বৈজ্ঞানিক এই কথা বলেন, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। তৎপরিবর্ত্তে তিনি "আধুনিক দার্শনিকগণ" "আধুনিক মত," "বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত" ইত্যাদি লিখিয়া অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সকল বিষয় সম্প্রতি আলোচ্য নহে।

কৈফিয়ৎলেখক "অযথা ব্যাখ্যা করিয়া প্রদীপের স্থানের অপব্যবহার করা অনাবশ্যক" বলিয়া ভূমিকা করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতেছি, তিনি বায়ুনভোবিদ্যা নামটার বিলক্ষণ অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপ্তেকৃত ইংরাজি সংস্কৃত অভিধানের প্রতি আমারও শ্রদ্ধা আছে। বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ বিষয়ে মত না থাকিলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, উপস্থিত প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ-লেখক মহাশয় আপ্তের অভিধানের অপব্যবহার করিয়াছেন। আপ্তে মহাশয় meteorology শব্দে করিয়াছেন,

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন
ও
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

KUNTALINE PRESS.

অনেকের অপেক্ষা চীনবাসী অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে। সে অবাধে যখন যথায় ইচ্ছা যাইতে পারে, পুলিস অথবা সরকারী কর্ম্মচারিগণ তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। যে পাসপোর্ট রুষীয়ের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তোলে, সে তাহার কিছু মাত্র জানে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া চীনবাসীকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে হয় না; সে সভা আহ্বান করিতে, পথিপার্শ্বে বক্তৃতা করিতে, স্বপক্ষের সহিত দলবদ্ধ হইতে, বক্তৃতা ও লেখনী চালনা দ্বারা গবর্মেন্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতে, এমন কি মাঞ্চুবংশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতেও সমর্থ। সাধারণ লোক ও ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সে কোন ভেদ জানে না, সে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই শ্রেণী-বিভাগ মাত্র বুঝিতে পারে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেক ধীমান্ ব্যক্তিই কালে মান্দারীণ বা তত্তুল্য উচ্চপদ লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডে একজন দরিদ্র সন্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্রলাভের যতটা সম্ভাবনা থাকে, চীনদেশের সেই শ্রেণীর লোকের বৈদেশিক রাজদূত হওয়ার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অধিক থাকে। চীনদিগের অনেক দোষ আছে, কিন্তু সেগুলি তাহাদের গুণ হইতেই উৎপন্ন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অধিক মনোযোগ বশতঃ বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। চিরকাল বাহ্য ব্যাপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় সার বস্তুর প্রতি তাহাদের নজর নাই। তাহারা মন্দকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাহার উপর জয়লাভের চেষ্টা না করিয়া তাহাকে এড়াইতে চায়।"

চীনদেশে খৃষ্টানদিগের অবনতি।

কিন্তু চীনদিগের দোষ যত গুরুতরই না হউক কেন, তাহাতে আমাদের বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। যদি তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতাপেক্ষা তাহাদের স্বদেশীয় দোষাবহ সভ্যতা পছন্দ করে, তাহাতে আমাদের হস্তক্ষেপের কিছুই অধিকার নাই। ডাক্তার ডিলন বলেন :—

"চীন, ইউরোপীয় ব্যাপার সমূহে কখন হস্তক্ষেপ করে নাই। শক্তিপুঞ্জকে অভিযোগের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ সে প্রদান করে নাই। বস্তুতঃ তাহার প্রধান দোষই এই যে, এতদুভয়ের জন্য আপনাকে উপযোগী করিয়া তুলিতে সে নিতান্ত উদাসীন। যদিও তাহার লোকসংখ্যা এখন আর স্বদেশে কুলাইয়া উঠিতেছে না, তথাপি সে অন্যের দেশ লইয়া কাড়াকাড়ি করে না, অন্যান্য সকলকে সে যেরূপ শান্তিতে থাকিতে দেয়, সে নিজেও তদ্রূপ শান্তিতে থাকিতে চায়। এইরূপ একাকী থাকিবার তাহার অধিকার আছে। রুষ বিদেশীয় মিশনরিদিগকে স্বীয় প্রজাবর্গের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে দেয় না। একজন রুষীয় প্রজাকে গ্রীক প্রণালীর খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রটেষ্টেণ্ট বা কাথলিক ধর্ম্মগ্রহণে উপদেশ দান আইনানুসারে দণ্ডনীয়। তদ্রূপ কোন আচরণ চীনদেশে কেন দণ্ডনীয় হইতে পারিবে না? শক্তিপুঞ্জ যে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। কিন্তু সংবাদপত্র সমূহ যে ভাষায় তাহার বর্ণনা করেন, তাহা একটু সংযত করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না। শিক্ষিত ও সত্যবাদী সংবাদপত্র লেখকগণ কেন যে এখনও চীনকে সভ্য করিয়া লইবার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করেন, তাহা বুঝি না। কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এতদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল চীনদেশবাসীর সর্ব্বনাশ ও স্বদেশীয় সৈন্যগণের নৈতিক অবনতি সাধন করিতেছেন।"

স্ত্রী জাতির উপর ভীষণ অত্যাচার!

ডাক্তার ডিলন যে সকল ঘটনার বিবৃতি করিয়াছেন, তাহাতে শেষোক্ত উক্তিটির সত্যতা অত্যন্ত ভয়াবহরূপেই সপ্রমাণ হয়। আমাদের সভ্যতা-প্রচারমূলক যুদ্ধের একটী প্রধান ঘটনা এই :—

"এক দিবস আমি টাং-চাউ নগরে একজন মৃত ধনী ব্যক্তির গৃহে একটা প্রকাণ্ড কাল বাক্স দেখিয়া উহার মধ্যে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিলাম। বাক্সটির মধ্য হইতে ভয়ানক পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছিল। আমার ইউরোপীয় সঙ্গী উত্তর করিল, উহার ভিতর তিনটি স্ত্রীলোকের মৃত দেহ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে উহাদিগকে ইহার মধ্যে রাখিয়াছে? সে উত্তর করিল, কয়েকজন সৈনিক কর্ম্মচারী।

'তুমি ঠিক্ জান?'

'হাঁ; আমি স্বয়ং সম্মুখে থাকিয়া দেখিয়াছি।'

'তুমি ঐ যুবতীদিগকে স্বয়ং দেখিয়াছ?'

'হাঁ; তাহারা এই গৃহস্বামীর কন্যা। সৈনিকপুরুষগণ তাহাদের সতীত্ব হরণ করিয়া তরবারির আঘাতে

তাহাদের বধ সাধন করিয়া তাহাদিগকে এই বাক্সে পুরিয়া রাখিয়াছে।'

'ভগবন্! কি ভয়ানক অবস্থাতেই আমরা উপনীত হইয়াছি!'

'পূর্ব্বে এরূপ আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার অপেক্ষা বীভৎস ঘটনাও ঘটিয়াছে। ইহাদিগের সতীত্ব নষ্ট করিয়া পরে বধ করা হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে এরূপও হইয়াছে যে, পুনঃ পুনঃ পাশব অত্যাচারে অস্ত্রাঘাত ব্যতিরেকেই অনেক কুসুমকোমলা কামিনীর মৃত্যু হইয়াছে!"

কামচরিতার্থতার নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা !!

যেখানে জীবন রক্ষা অপেক্ষা হত্যা করা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, তথাকার অবস্থা বাস্তবিকই বড় শোচনীয় সন্দেহ নাই। ডাক্তার ডিলন বলিতেছেন :—

"সৈন্যদিগের অপরাধের দ্বারা তাহাদের জাতিগত চরিত্রের তুলনা সঙ্গত হইবে না, কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, চীনদেশে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু লোমহর্ষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে; ইহা ভিন্ন মিলিত শক্তিপুঞ্জের সেনাসমূহ অরক্ষিত ব্যক্তির ও সম্পত্তির বিনাশ সাধন, এই দুইটি পাপেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অনুলিপ্ত।

জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার সুব্যবস্থা হওয়ার অনেক পরেও কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে নির্ভয়ে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত। একটি ঘটনার স্মরণ হইতেছে, যে সকল বন্ধুর সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকটই উহা অতি বীভৎস কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। পিকিং নগরে সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনাটি ঘটে। নগরের রুষাধিকৃত অংশের একটী সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে তিনজন ফরাসী সৈনিক প্রবেশ করিল। বাড়ীতে কেবল তিনটি প্রাণী ছিল, —পিতা, মাতা এবং কন্যা। কন্যাটিকে দেখিয়া সৈনিকত্রয় তাহার সতীত্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু পিতামাতার উপস্থিতি বিপজ্জনক বিবেচনা করিয়া দুইজনে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিতে চাহিল, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদিগকে অন্য একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে বলিল। মুহূর্ত্তকাল পরামর্শের পরই অধিকাংশের মতানুসারে স্বামী

স্ত্রী নিহত হইল। এমন সময় নিকটস্থ একজন চীনীয় চীৎকার ও বন্দুকের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া একজন ইউরোপীয় সহ তথায় উপস্থিত হওয়ায় পাষণ্ডদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু মৃত দম্পতী আর পুনর্জ্জীবিত হইল না।

অন্যায় লুণ্ঠন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচারের পর লুণ্ঠনের কথা বলিতে গেলে নিতান্তই বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রে অবতরণ করিতে হয়। কিন্তু হেগের শান্তি-সমিতিতে চীন অন্যতম পক্ষ ছিল, এবং তথায় লুণ্ঠন সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে নিম্ন লিখিত প্রমাণ উদ্ধার করা অসঙ্গত হইবে না;—

"যেপর্য্যন্ত লুণ্ঠনের উপযুক্ত কিছুমাত্র ছিল, সে পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতে উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠন চলিয়াছিল। শেষে যখন লুণ্ঠনের কিছু রহিল না, তখনও এই প্রথা সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হয় নাই। জাপানীগণ সর্ব্বপ্রথম লুট বন্ধ করিয়াছিল, রুষ শীঘ্রই তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অল্প সময়েই জাপান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লুট করিয়াছিল। নগরের চীনদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াই সম্মিলিত সৈন্যবৃন্দ পরিতৃপ্ত হয় নাই, যে সকল ইউরোপীয় অধিবাসীর রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের সম্পত্তি লুট করিতে তাহারা ত্রুটি করে নাই।"

জর্ম্মন-সম্রাটের শিষ্যগণ।

ইহাদের অযথা প্রাণিবধে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, সুতরাং তাহারা যে নিহত ব্যক্তি সমূহের সম্পত্তি লুণ্ঠনে দ্বিধা করিবে না, ইহাই স্বাভাবিক; এবং চীনদেশে যে একত্র ও পৃথগ্‌ভাবে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে প্রাণিহিংসার স্রোত বহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জর্ম্মন-সম্রাট্ তাঁহার সৈন্যগণকে নির্ম্মমহৃদয়ে অসভ্য হুনদিগের ন্যায় যুদ্ধ করিতে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা কি ভয়াবহরূপেই প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে তিনি নিশ্চয়ই বিবেকতাড়িত হইবেন। ডাক্তার ডিলন বলিতেছেন:—

"আমি যতদূর জানি, নবেম্বরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্যগণই* কেবল বক্সারদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছে, ও আহত বক্সারদিগকে হাসপাতালে স্বজাতীয়ের ন্যা পরিচর্য্যা করিয়াছে। যে সকল চীনবাসী তাহাদিগে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বহুকাল পরে নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃত হই ছিল, তাহাদিগকে বিনা উত্তেজনায় বধ করিতেও তাহা অস্বীকার করিয়াছিল। কেবল জাপানীগণ সমগ্র চীনয় নিতান্ত সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহারাই প্রকৃ পক্ষে চীনবাসীদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিত। এ কারণে তাহাদের বিশ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহারা রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। টিন্-সিন্ পিকিনের জাপানাধিকৃত অংশ অন্যান্য শক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃ স্থান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও তাহাদের আদর্শস্বরূ হইয়াছিল।"

* মনে রাখিতে হইবে, ইহারা ইংলণ্ডের ভারতীয় সেনা।

অখ্রীষ্টান মিত্রবর্গ।

"লুণ্ঠনরূপ পৈশাচিকতা দমনে জাপানী সেনাপতি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপরাধীদিগকে এক গুরুতর শাস্তি প্রদান করিতেন যে, জাপানী সৈন্যগণের ম লুণ্ঠন-প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই রূ জাপানীগণ তাহাদের বৈদেশিক মিত্রগণকে উৎকৃষ্ট রা নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধকা ভয়ঙ্কর ও নির্ভীক ভাব ধারণ করিলেও তাঁহারা গ্রাম নগরের নিরীহ লোকদিগের প্রাণনাশ করিতেন না, এ চীন অধিবাসীদিগের উপর যাহাতে অত্যাচার না হ তন্নিমিত্ত অন্যান্য শক্তিপুঞ্জকে অনুরোধ করিয়া সেই ম নানা স্থানে ঘোষণাপত্রের প্রচার করিতেন।"

টাকুবন্দরে জাহাজের মাল তুলিবার সময় তিন শ নিরস্ত্র কুলীর প্রাণবধ সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ঘটনা। তাহা পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু—

"কুক্ষণে রুষ সৈন্যগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল রুষদিগের প্রতি নাকি তখন হুকুম ছিল, শিখাধারী চীনবা মাত্রকেই বধ করিতে হইবে। সেই তিনশত কুলির প্রত্যে রুষীয় বন্দুকের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।"

ইউরোপীয়গণ রক্ত পিপাসায় উন্মত্ত হইয়াছিল। তা উপরি উক্ত ঘটনার ন্যায় আরও অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছিল ডাক্তার ডিলন বলিতেছেন:—

"আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; টাউ চাঁউ নগরে পয়ঃ প্রণালী সমূহ পুনঃ পুনঃ রক্তরঞ্জিত হইয়াছিল, এ

সময়ে সময়ে মনুষ্য-শোণিতে পাদুকা সিক্ত না করিয়া পথে চলা অসম্ভব হইত। যে সকল নিরীহ অধিবাসিগণ বন্দুক অথবা সৈনিক-পরিচ্ছদ দর্শনমাত্র ভয়ে কম্পিত হইত, তাহাদের প্রতি এই প্রকার ভয়ানক অত্যাচারের কোন কারণ ছিলনা। কিন্তু শোণিত পিপাসা বৈদেশিক সেনাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিতান্ত অপদার্থ ও অজ্ঞাত-কুলশীল ইউরোপীয়ের এবং জাপানীর হস্তে নগরের সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য চীনবাসীর জীবনমরণের ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। তাহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন আপীল ছিল না। একটি ইউরোপীয়েরও ক্রোধোদ্রেক হইলে তাহার কি দশা হইবে, কোন চীনবাসী তাহা জানিত না। অনেক সময় ভারবাহী পশুর ন্যায় ১২।১৪ ঘণ্টা খাটিয়া সামান্য বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত শয়ন করিলেও তাহাকে তুলিয়া কয়েক পদ দূরে লইয়া গিয়া, গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইত! কি কারণে তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিহিত হইল, তাহা সে নিজেও জানিত না, কেহ তাহাকে বলিয়াও দিত না।”

কিন্তু খ্রীষ্টান জাতিগণ কিরূপে যুদ্ধ করেন, সে সম্বন্ধে যে সকল গুপ্তকথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভয়াবহ অর্থ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে ডিলনের সমগ্র প্রবন্ধটি পড়া আবশ্যক। যাহা হউক, পাপের এই রহস্যোদ্ঘাটন হইতে আর একটি ঘটনার উদ্ধার না করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিতেছি না:—

“কো-সো নামক স্থানে নদীতীরে আমি দুটি শবদেহ দেখিতে পাইলাম। যে সকল বীভৎস দৃশ্য সমাধিক্ষেত্রতলে লুক্কায়িত থাকে, তৎসমুদয় প্রকাশ্য দিবালোকে দেখিতে দেখিতে আমি তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, তথাপি এই ঘটনাটি আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। এক পিতা ও তাহার অষ্টম বর্ষীয় পুত্র হাত ধরাধরি করিয়া দয়াভিক্ষা করিতেছিল, এমন সময় সভ্যতার নামে তাহারা গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পায়! সেই অবস্থাতেই তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া পড়িয়াছিল, একটা ধূসর বর্ণ কুকুর পিতার একখানি হস্ত ধীরে ধীরে চিবাইতেছিল। এরূপ দৃশ্য দেশবাসী ইউরোপীয়দিগেরও করুণার উদ্রেক করিত; চীনবাসীর নিকট ইহা কেবল শারীরিক নহে, আত্মার দুর্গতিরও পরিচায়ক। কারণ যে পুত্র ইহলোকে পিতৃ-স্মৃতি জাগরুক রাখিত এবং পরলোকেও তাঁহার কল্যাণ সাধন করিত, পিতার সহিত তাহার জীবন-তরু একত্রে বিচ্ছিন্ন করা তাহাদের মতে মহাপাপ।”

আমরা ষ্টেড্ সাহেবের প্রবন্ধ ও তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত ডাক্তার ডিলনের মন্তব্য এইখানে শেষ করিলাম। ইহার উপর আর সমালোচনা অনাবশ্যক। ইউরোপীয় সভ্যতা যে কীদৃশ পদার্থ, আশা করি, বাহ্য-চাকচিক্য-বিমুগ্ধ বঙ্গবাসী এখন তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহার ভবিষ্য জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠন করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখিবেন। পাশ্চাত্য সমাজে কি কি দোষ থাকা প্রযুক্ত তাহার নিম্নস্তর সমূহ এতদূর নীতিজ্ঞানশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল ও নৃশংস হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও ভয় পাই। কিন্তু তাহা বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। ষ্টেড্ সাহেব বলিয়াছেন, মনুষ্যচরিত্রে পাশব প্রবৃত্তি লুক্কায়িত থাকে, সভ্যতা ও শাসনের বাঁধাবাঁধি না থাকিলে তাহা সহজেই প্রস্ফুট হইয়া উঠে। অতএব হিন্দুসমাজের কঠোর নিয়মগুলিকে কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও অসভ্যতার পরিচায়ক বিবেচনা করিয়া তাহাদের সংস্কারপ্রয়াসের পূর্ব্বে চীনদেশে সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের আচরণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা ভাল।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রীক জাতির স্বাধীনতালাভ।

(সঙ্কলিত)

খ্রীষ্টীয় ১৫ শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রীসদেশের অধিবাসীরা আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া মোসলমানদিগের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হন। তদবধি প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা তুরস্কের ভিন্ন ভিন্ন অধিপতিগণের বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়া দাসত্বের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। সেই চারিশত বৎসরের মধ্যে গ্রীসদেশের সর্ব্বত্র মোসলমান রাজা, মোসলমানধর্ম্ম ও মোসলমান আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশের নানাস্থানে খ্রীষ্টীয় গির্জ্জার পরিবর্ত্তে মহম্মদীয় মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ক্রুশচিহ্নের পরিবর্ত্তে মুসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকায় দেশ ছাইয়া গিয়াছিল।

এইরূপ পারতন্ত্র্যকালে গ্রীসদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার

বিস্তার হয়। গ্রীসবাসীরা ক্রমশঃ শিক্ষিত হইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তাহার ফলে স্বদেশের প্রাচীন গৌরবকাহিনী ও পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি-কলাপের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বৈদেশিক বিজেতার অভিনব শিক্ষা দীক্ষা ও শৌর্য্যবীর্য্য দর্শনে চমকিত হইয়া যাঁহারা আপনাদিগকে অপদার্থ ভাবিতেন, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন মহিমা ও সভ্যতা, তাঁহাদিগের প্রাচীন স্বাধীনতা ও শিল্পকৌশল, প্রাচীন যুদ্ধ-পদ্ধতি ও পরাক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহাদিগের আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহারা যে এক বিশ্বপূজিত সুসভ্য জাতির বংশধর, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগের অনেকে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। তখনও ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বত্র প্রাচীন গ্রীকজাতির সম্বন্ধে সাধারণের যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহাতে তাঁহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে ইউরোপের অনেক জাতিই তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেন বলিয়া বোধ হয়। তথাপি সে সময়ে কোনও গ্রীসবাসীরই প্রকাশ্যভাবে মোসলমান-শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার সাহস ছিল না। কারণ, তাঁহাদিগের মস্তকের উপর তুরস্কের যে শাণিত অসি অবিরামভাবে ঝুলিতেছিল, তাহা কখন যে মস্তকের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদ করিবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। শাসক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে বহুদিন হইতে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমস্ত দুর্গ তুর্কদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সমস্ত সৈন্য তুরস্করাজের আজ্ঞাধীন ছিল। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে সুলতানের শাসন-শৃঙ্খল উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে যে গ্রীকজাতির সমূলে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সকলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতির পক্ষে প্রবল শাসক সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে আত্মোদ্ধার সাধন করিবার যে একমাত্র উপায় সকল দেশে প্রচলিত আছে, গ্রীস-বাসীরা তাহারই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা দেশের মধ্যে নানাস্থানে গুপ্তসভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপল, ব্যাভেরিয়া, অষ্ট্রীয়া, রুষিয়া প্রভৃতি স্থানেও এই সকল সভার শাখাসমিতি স্থাপিত হইল। কেবল গ্রীসবাসীর শৌর্য্য সাহসের বলে, সুযোগ পাইলেই যাহাতে আপনাদিগের প্রণষ্ট স্বাধীনতা-রত্নের পুনরুদ্ধার করিতে পারা যায়, তাহার উপায়-নির্দ্ধারণ ও তদুপযোগী ব্যবস্থার বিধান করাই সেই সকল গুপ্ত সভা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসে সেই সকল গুপ্তসমাজ "হিটেরিষ্ট-দিগের সভা" নামে পরিচিত।

হিটেরিষ্টদিগের সমাজে গ্রীসদেশের অধিকাংশ বড় লোকই যোগদান করিয়াছিলেন। যে সকল গ্রীক সেই সভায় সদস্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগের সকলকেই এই সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া হইত। কার্য্য-নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সভার সভাসদ্‌বর্গকে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণ সভ্যদিগকে জানান হইত যে, গ্রীসদেশবাসীর সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। তদপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর সভ্যেরা "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী সদস্য" নামে পরিচিত হইতেন। রাষ্ট্রবিপ্লব সাধন করিয়া তুরস্কের অত্যাচার হইতে গ্রীসদেশকে মুক্তিদান করাই যে সভার উদ্দেশ্য, তাহা এই শ্রেণীর সদস্যের নিকট ব্যক্ত করা হইত। সাধারণ শ্রেণীর সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বহুদিনের পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মচারিসমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যেরা এই রাষ্ট্রবিপ্লবসংক্রান্ত বিশেষ গোপনীয় তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকিতেন। চতুর্থশ্রেণার সভ্যগণ হিটেরিষ্টদলের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৬ জনের অধিক ছিল না। কিরূপ ব্যক্তি এই শেষোক্ত সমাজভুক্ত হইতেন, তাহা অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই। তবে অনেকের বিশ্বাস, রুষিয়ার জার, ব্যাভেরিয়ার রাজপুত্র প্রভৃতি এই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিলেন।

মস্কো নগরে এই গুপ্ত সমাজের পীঠস্থান বা প্রধান আড্ডা ছিল। তাহার উচ্চপদস্থ সদস্যগণের পত্র-ব্যবহারের জন্য এক প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্নের আবিষ্কার হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক শ্রেণার সভ্যগণের পৃথক্ পৃথক্ নিদর্শন চিহ্ন থাকিত। বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর সদস্যের নিদর্শন চিহ্ন কি, তাহা অপর শ্রেণীর সদস্যদিগকে জানিতে দেওয়া হইত না। এইরূপে হিটেরিষ্ট সমাজের চেষ্টায় কিছুদিনের

মধ্যেই গ্রীসদেশের প্রত্যেক অধিবাসীর মনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। প্রত্যেকেরই মনে হইতে লাগিল যে, তাহাদিগের স্বাধীনতালাভের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এদিকে এই সমাজের চেষ্টায় ইউরোপ খণ্ডের নানা প্রদেশস্থিত হিটেরিষ্ট-হিতৈষিগণ তাঁহাদিগকে গুপ্তভাবে অর্থ ও যুদ্ধোপকরণাদি দানে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

গ্রীসবাসীরা যখন এইরূপে স্বাতন্ত্র্যলাভের দুর্দ্দমনীয় বাসনার বশীভূত হইয়া সাধারণতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন, এবং তুরস্কজাতির প্রতি তাহাদিগের চিরপ্রবৃদ্ধ বিদ্বেষানল জলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের অগ্নিশিখা-সংস্পর্শে ক্রমশঃ নেপল্‌স, সিসিলী, পিডমণ্ট প্রভৃতি জনপদসমূহেও বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হয়। উহারই একটি স্ফুলিঙ্গ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীসদেশে পতিত হইয়া তথায় মহাবিপ্লবের সঞ্চার করে।

গ্রীসবাসীরা আপনাদিগের প্রণষ্ট স্বাধীনতালাভের জন্য পূর্ব্ব হইতেই ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছিলেন। তুরস্কের শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে বিদ্বেষানল প্রধূমিত হইতেছিল, হিটেরিষ্ট সমাজ এই সময়ে প্রাণপণে তাহাতে বায়ুব্যজন করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবানল প্রজ্বলিত না হওয়াই বিচিত্র।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৩১ শে তারিখে সুলতানের শাসনাধীন ওয়ালেচিয়া প্রদেশের তুরস্ক শাসনকর্ত্তা ইহলোক পরিত্যাগ করেন ও তাঁহার পদে অপর শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হন। প্রাচীন সুবাদারের মৃত্যু ও নূতন সুবাদারের ওয়ালেচিয়ায় উপস্থিতি, এতদুভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কালই স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীন করিবার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া হিটেরিষ্টগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইল। তুরস্ক রাজপুরুষ বা তদনুগত ব্যক্তিবর্গের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সহসা একদিন বুচারেষ্ট নগরে প্রায় দেড় শত গ্রীক সমবেত হইলেন এবং থিওডোর ল্যাডিমারকো নামক রুষরাজ্যের জনৈক শৌর্য্যশালী লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেলকে আপনাদের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশোদ্ধারকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা প্রথমে জরুনিট্‌জ নামক নগর অধিকারপূর্ব্বক তথা হইতে একটি বিজ্ঞাপনী বা ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রে লিখিত ছিল—"তোমাদিগের স্বাতন্ত্র্যলাভের সময় অতীব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব তোমরা সকলে উত্থিত হও এবং অত্যাচারী তুরস্কদিগের শাসনপাশ ছিন্ন কর!" তুরস্ক রাজপুরুষদিগের অত্যাচারমূলক করদানপদ্ধতির ফলে গ্রীসদেশের কৃষকেরা এরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছিল যে, পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র তাহারা দলে দলে থিওডোরের পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েক দিবসের মধ্যেই থিওডোরের অধীনতায় দেড় শতের স্থানে দ্বাদশ সহস্র যুযুৎসু গ্রীসবাসীর সমাবেশ হইল।

ঠিক এই সময় অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে ম্যাল্‌ডেভিয়া প্রদেশের রাজধানী "জাসী" নগরে ইপ্সিল্যাণ্টী নামক একজন প্রসিদ্ধ রুষীয় সেনানী দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে তুরুস্কশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি রুষরাজের আদেশক্রমে গ্রীসবাসীর অধীনতাপাশ মোচন করিতে আসিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন,—

"হে ম্যাল্‌ডেভিয়া বাসিগণ! তোমাদিগের সকলকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এ সময়ে গ্রীসদেশ স্বাধীনতার মশাল প্রজ্বলিত করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনাদিগের সমস্ত অধিকার ও স্বত্ব পুনর্লাভ করিবার জন্য গ্রীসবাসী এ সময়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে আমি অগ্রসর হইয়াছি। আমাদিগের কার্য্যকলাপের দ্বারা তোমাদিগের ধন মান বা প্রাণে কোনও প্রকার আঘাত লাগিবে না। যদি কোনও তুরস্কসেনা তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসে, তাহা হইলে তোমরা ভীত হইও না। কারণ তাহাদিগের দুর্ব্বৃত্ততার শাসন করিবার জন্য একটি মহাশক্তি (রুষিয়া) উদ্যত রহিয়াছে!" বলা বাহুল্য, এই ঘোষণাপত্র হিটেরিষ্টদিগের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিল। রুষের পৃষ্ঠবলের আশ্বাস পাইয়া অনেক গ্রীসবাসীই সাহসে বুক বাঁধিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্র যখন "ওডেসা" নগরে পঠিত হইল, তখন তত্রত্য অধিবাসীদিগের আনন্দের পরিসীমা

রহিল না। তাহারা সেই স্বাধীনতার ধ্বজাধারীদিগের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিল। এ কার্য্যে অর্থদান করিতে প্রায় কেহই পশ্চাৎপদ হইলেন না। অল্পদিনের মধ্যে বিদ্রোহীদিগের সহায়তার জন্য বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইল। সাধারণের এতাদৃশী সহানুভূতি দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ইপ্সিলান্টী মহোদয় "সেক্রেড ব্যাটালিয়ন" বা "পবিত্র সেনাদল" নামে একটি পল্টন গঠিত করিলেন। সেই সেনাদলের সহায়তায় তিনি পরে কতিপয় মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গ্রীসদেশে স্বাধীনতার জন্য যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ছয় বৎসরকাল স্থায়ী হইয়া স্বীয় প্রচণ্ড প্রতাপে তুরুকপতিকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। গ্রীসবাসীর এই প্রশংসনীয় উদ্যমে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদিগের সহানুভূতি থাকায় পাশ্চাত্য নরপতিগণ গ্রীকজাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেন। খ্রীষ্টীয় নরপতিগণের অনুরোধে তুরুকের সুলতানকেও পরিশেষে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইল। গ্রীকজাতি তাঁহাদিগের শৌর্য্য সাহস ও ষড়্বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ স্বাধীনতারত্নের অধিকারী হইলেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। নিস্তার সোহাগ—কবিতাগাথা ও সামাজিক দৃশ্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

পুস্তক পাঠে বুঝিলাম, পরলোকগতা পত্নীর বিরহে ব্যাকুল হইয়া গ্রন্থকার এই শোকগাথা রচনা করিয়াছেন। এই প্রকার পুস্তকের সহিত সাধারণের সম্বন্ধ অতি অল্প। সুতরাং ইহার সমালোচনা অনাবশ্যক।

২। উত্তর স্বভাব ও ফুলের বাগান—প্রকাশক মোক্তার, কিন্তু গ্রন্থকারও মোক্তার কি না জানিতে পারিলাম না। তিনি যাহাই হউন, বাগ্দেবীর কাছে কিন্তু মোক্তারেরই ন্যায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বিবিধ প্রকারের নজীর প্রদর্শন করিয়া বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভা প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—

> "বাগ্দেবী ভগবতি, দেও প্রতিভা এ দীনে
> ভাতিবে উজ্জ্বল বড় যে কবিত্ব আভা,
> [illegible] যথা রবির প্রতিভা।"

তাঁহার "কবিত্ব আভায়" বড় উজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া [illegible] নাই, [illegible] পাইলাম না।

৩। বন কুসুম—শ্রী[illegible] বি, এল প্রণীত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বনকুসুমে উদ্যান কুসুমের শোভা সৌরভ কি মাধুর্য্য সম্ভবে না বলিয়া কি বনকুসুম প্রস্ফুটিত হয় না? তাই এ "বন কুসুম" প্রস্ফুটিত হইল। উদ্যান-কুসুম-সৌরভ-মধুরসজ্ঞ পাঠক যদি বন কুসুমের বিন্দু মাত্রও আরণ্য মধু পান করিতে পারেন, তবেই বনকুসুম ধন্য হইবে।"

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, তাই 'বনকুসুম'কে "ধন্য" করিতে পারিলাম না।

৪। কাব্য চিন্তা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।

পূর্ণ বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন লেখক। তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে, চিন্তা আছে, ভাব আছে, স্বদেশপ্রীতি আছে। তিনি কয়েকখানি সারবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাধারণ্যে যথেষ্ট পরিমাণে যশোলাভ করিয়াছেন। কাব্যচিন্তা তাহারই অন্যতম। কাব্য চিন্তা পাঠ করিয়া আমরা বহু পরিমাণে উপকৃত হইলেও একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি।

পূর্ণ বাবু সমালোচক। সমালোচকের সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হওয়াই আবশ্যক। একচোখো দৃষ্টি লইয়া সমালোচনা করিতে যাওয়া ভাল নহে। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ণবাবুর লেখনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে চালিত হয় নাই। তিনি আমাদের দেশের যাবতীয় প্রাচ্যভাবের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন। প্রশংসা করুন তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু প্রতীচ্য ভাবমাত্রই কি মন্দ? পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা আমরা স্থলবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিতে পারি—কিন্তু কিছুই কি লাভ করি নাই? পূর্ণবাবুর ন্যায় প্রবীণ সমালোচকের নিকট আমরা নিরপেক্ষ সমালোচনাই প্রত্যাশা করি। এই প্রকার "একচোখো" সমালোচনা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নিন্দার্হ। যাহা হউক, তাঁহার কাব্যচিন্তা যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই যে উপকৃত হইবেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বঙ্গসাহিত্যে কাব্যচিন্তার ন্যায় গ্রন্থ যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

৫, ৬। নির্ঝর ও কীর্ত্তি—শ্রীরঘুনাথ শুকুল প্রণীত। মূল্য ।৴০ আনা। দুইখানিই কবিতা পুস্তক। স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

৭। রমা—(নাটক) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ প্রণীত। সেরিডান কর্ত্তৃক অনূদিত স্কোলার জর্ম্মান নাটক অবলম্বনে গ্রন্থ খানি লিখিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি; পাঠ করিবার সময় অনুবাদ বলিয়া মনে হয় নাই। রমা, [illegible] প্রভৃতি চরিত্রগুলি [illegible] হইয়াছে বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ।

KUNTALINE PRESS.

৭

অম্বর-কবি গম্ভীরস্বরে
বন্দনা গাথা গাহিবে,
ঝরিবেক ধারা, ভাবরাশি যেন
নবীন ছন্দে নামিবে!

৮

মন-উপবন উন্মুখ হ'য়ে
সে সলিল পান করিবে,
গীতিকার ফুল যূথিকার মত
চরণের তলে ঝরিবে!"

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

কদম্ব।

নিদাঘের অবসানে
তৃপ্ত পাপিয়ার গানে
পুলকে শিহরি উঠে কদম্ব কুসুম।
সজল সমীরে তার
বহিয়া সৌরভ-ভার,
ভাঙে জগতের চোকে বিরহের ঘুম।

তাহারি মধুর বাসে
স্মৃতি পরশিয়া আসে,
দূর দ্বাপরের সেই অতীত কাহিনী—
বিধুরা ব্রজের বালা,
কপট কঠিন কালা,
কালো কালিন্দীর ধারা,—আনন্দ-বাহিনী!

হেরিয়া রোমাঞ্চ তা'র,
মনে পড়ে রাধিকার
সুখ সান্ধ্য অভিসার,—নিধুবন-বাসে!
মধুর ঝুলন খেলা
মনে পড়ে, সন্ধ্যা বেলা
সে যথন কেঁপে উঠে পুবাল বাতাসে!

তাহারি শ্যামল শাখে
পাপিয়া যখন ডাকে,
মনে পড়ে, সুধামাখা শ্যামের বাঁশরী;
পোষিত আভীর-বালা
কি দ্রুত আনন্দ-জ্বালা,
বিরলে, বাঁশীর ডাকে, আপনা পাসরি!

হে কদম্ব! তব তলে
নিতি গোচারণ ছলে,
সাজিত রাখাল-রাজ রাধিকারমণ।
তোমারি শীতল ছায়ে
বসিলে, এখনো গায়ে
লাগিয়া, শীতলে, তা'র পূত-পরশন।

তোমারে হেরিয়া তরু
সিক্ত এ হৃদয়-মরু,
শ্যাম-স্মৃতি-সুধা-সিন্ধু উথলি প্রবল!
তোমার পল্লব পত্রে,
পড়ি আমি শত ছত্রে,
অতীতের ইতিহাস—অতি অনর্গল!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

পাতা ও ফুল।*

ফুল সকলেই জানে, সকলেই চিনে। যে শিশুর মুখে কথা ফুটিয়াছে মাত্র, সেও ফু ফু করিয়া ফুলের দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু ফুল বলি কাহাকে? ফুলের লক্ষণ কি?—যাহা গাছে হয়, যাহার গন্ধ ও শাদা লাল নীল প্রভৃতি বর্ণ আছে ইত্যাদি বলিয়া গেলে সামান্য লক্ষণ শেষ হয়। বলা বাহুল্য এই প্রকার স্থূল লক্ষণ দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশ করা সহজ নয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ফুলের লক্ষণ বলিতে পারি না বটে, কিন্তু দেখিলেই চিনিতে পারি। ইহার অর্থ এই যে, কোন বস্তু ফুল কি না, তাহা নিশ্চয় করিতে যে বিশ্লেষণ আবশ্যক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না বটে, তথাপি সে বিশ্লেষণ মনে মনে অব্যক্তভাবে থাকে। কিন্তু বিশ্লেষণ ফল ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিলে বুঝা যায়, তাহা

---

*প্রদীপে 'কুষ্মাণ্ডচিন্তা' প্রকাশিত হইবার পর প্রবন্ধের বিষয়সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র পাই। সেই সকল পত্রে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসাধ্য দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্পষ্টজ্ঞান নাই। তাই কি, দেখিলেই ফুল কি না, বলিতে পারা যায়? পারিলে আমরা সকলেই ডুমুরের ফুল দেখিয়া এতদিন রাজা হইতাম। অথচ ডুমুরটা কাটিলেই তাহার ভিতরে পুঞ্জাকারে ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ডুমুর দুষ্প্রাপ্যও নয়; ফুলও তত ছোট নয়। কাঁটালের ফুল সকলেই দেখিয়াছে, অথচ ডুমুরের ফুল অপেক্ষা কাঁটালের ফুল অধিক বড় নহে। তবেই বোধ হয়, ডুমুরের ফুলগুলি ভিতরে হয় বলিয়া উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

সূর্য্যমুখীর ফুল দেখিলে বুঝা যায়, উহা একটি ফুল নহে। একখানি থালের কিংবা আসকে পিটের উপরে কতকগুলি ছোট ছোট ফুল বসাইলে যেমন দেখিতে হয়, সূর্য্যমুখীর ফুলও তেমনই। থালাখানিকে বাঁকাইয়া ঘটীর মত করিতে পারিলে সূর্য্যমুখীর ফুল দেখিতে ঠিক ডুমুর ফুলের মত হইত। কাঁটাল, আনারস, তুঁত ফুলও একটি ফুল নয়; সূর্য্যমুখীর ও ডুমুরের ফুলের মত পুষ্প সমষ্টি। কিন্তু এস্থলে যেন একটা মুষলের গায়ে ফুলগুলি সাজান আছে। মান ও কচুর ফুলেও এই রকম। একটা ডাঁটার গায়ে ফুলগুলি সাজান, এবং সকল ফুলের বাহিরে একটি হলদে বা লাল আবরণ থাকে। তবেই, সূর্য্যমুখীর অনেকগুলি ফুলের একটি বোঁটা। যদি মৌরীফুলের বোঁটাগুলি না থাকিত, তাহা হইলে উহার ফুলগুলির সন্নিবেশ ঠিক সূর্য্যমুখীর মত হইত। কিংবা যদি সূর্য্যমুখীর প্রত্যেক ফুলের এক একটি পৃথক্ বোঁটা থাকিত, তাহা হইলে ঠিক মৌরীফুলের মত উহার সন্নিবেশ হইত। সূর্য্যমুখী, কাঁটাল, আনারস, তুঁত ও ডুমুরের প্রত্যেক ফুলের এক একটি পৃথক্ ও লম্বা বোঁটা থাকিলে, উহারা যে যুক্তফুল, তাহা সহজেই বুঝা যাইত।

লিখিত ফুলগুলির অঙ্গ-সংস্থান বুঝা তত সহজ নহে। তাই, অপেক্ষাকৃত একটা বড় ফুল লওয়া যাক্। ধুতুরা ফুল সকলেই চিনে। দেখা যায়, উহার একটা বোঁটা আছে। বোঁটার উপরে একটা সবুজ রঙ্গের খোল, যেন লম্বা কল্কে। তাহার ভিতরে তদপেক্ষা বড় কিন্তু শাদা আর একটা খোল। উহাও দেখিতে ঠিক কল্কের মত। উহার ভিতর গায়ে মোটা সূতার মত পাঁচটা লাগিয়া থাকে। সূতা পাঁচটার উপরে পাঁচটা সরু মাথা। ইহাদের ভিতরে শাদা এক রকম গুঁড়া থাকে। খুব ফুটন্ত ফুলে গুঁড়া তত দেখা যায় না, অল্প ফোটা ফুলেই বেশী দেখা যায়। এই সকল অঙ্গের মাঝখানে আর একটা মোটা সূতার মত দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নীচেটা মোটা; কাটিয়া দেখিলে উহার মধ্যে শাদা শাদা ছোট ছোট বীজ দেখা যায়। সূতার উপরে একটা মাথা। অল্প ফোটা ফুলের ঐ মাথাটায় হাত দিলে তাহাতে চট্‌চটে আটার মত একটা জিনিস হাতে ঠেকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ধুতুরাফুলের এই কয়েকটি অঙ্গ আছে।

উপরের বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ত্যাগ করা গিয়াছে। ত্যাগ করিবার দুইটি কারণ। এক, পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহার লক্ষণ দেওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয়, বাঙ্গলাভাষায় উদ্ভিদ্-বিদ্যার পরিভাষা নাই বলিলেই হয়। একে, ফুলের নাম করিবার সময়ে উহার আর কি কি নাম আছে, তাহা ভাবিতে হয়; তাহার উপর পারিভাষিক শব্দ যোগ হইলে বিষয়টা দুর্বোধ্য হইবার সম্ভাবনা ঘটে। অথচ একটা না একটা পরিভাষা খাড়া না করিলেও চলে না। তাই, ধুতুরা ফুলের উপরের লিখিত সবুজ রঙের বাহিরের খোলাটাকে বহিষ্পুট, ভিতরের সাদা খোলটাকে অন্তষ্পুট বলা যাইবে। যে শাদা গুঁড়ার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা পরাগ। অন্তষ্পুটে লগ্ন পাঁচটা সূতা পাঁচটা পরাগকেশর। উহাদের মাথাগুলা পরাগাশয়। সকলের মধ্যস্থ অঙ্গের নিম্নভাগে বীজ হয়। এজন্য উহার নাম বীজকাশয়। উহার উপরের শাদা সূতাটা শলা, এবং শলার মস্তকে পিণ্ড। ধুতুরা ফুলে দুইপ্রকার পুট আছে বলিয়া উহাকে দ্বিপুট বলা যায়। পরাগাশয় ও পরাগকেশর লইয়া একটি অঙ্গ, এবং বীজকাশয়, শলা, ও পিণ্ড লইয়া উহার আর একটি অঙ্গ।

এখন প্রত্যেক অঙ্গের উদ্দেশ্য বলা আবশ্যক। বীজকাশয় নাম হইতেই উহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে। উহার মধ্যে বীজক হয়, বীজক ক্রমে বীজে পরিণত হয়। শলাটি বীজকাশয়ে যাইবার নালী, এবং পিণ্ডটি নালীমুখ। নালীমুখে আটা থাকে; সেই আটায় পরাগ পড়িলে, পরাগের মধ্যস্থ পদার্থ বিশেষ নালী দিয়া বীজকের পদার্থ বিশেষের সহিত মিলিত হয়। ঐ দুই পদার্থের মিলনকে নিষেক ক্রিয়া বলা যায়। ইহার ফলে বীজক ক্রমে বীজ বা গর্ভ বা ভ্রূণে পরিণত হয়। ভ্রূণটি ক্ষুদ্রাবয়ব বৃক্ষ সন্তান। অতএব

বীজকাশয়, শলা ও পিণ্ড,—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, সংক্ষেপে স্ত্রাঙ্গ; এবং পরাগাশয় ও পরাগকেশর,—পুংজননেন্দ্রিয়, সংক্ষেপে পুমঙ্গ। বহিষ্পুট বা বহিরাবরণ দ্বারা ফুলের অন্যান্য অঙ্গ রক্ষিত হয়। অন্তষ্পুটের উদ্দেশ্য অধিকাংশ স্থলে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ। ফুলের পিণ্ডের উপরে পরাগপতন আবশ্যক, নইলে বীজ হয় না। পবনের দ্বারা কোন কোন ফুলের পিণ্ডে পরাগ আসিয়া পড়ে, কোন কোন ফুলে পতঙ্গগণ পরাগ-পাতনে সহায় হয়। এই দুইটি সামান্য উপায়।

তবে, ধুতুরা ফুল দ্বিপুট, দ্বিলিঙ্গ। সকল ফুল এ প্রকার নহে। কুষ্মাণ্ড ফুল দ্বিপুট, কিন্তু একলিঙ্গ। কদলী ফুল দ্বিলিঙ্গ, কিন্তু একপুট। সূর্য্যমুখীর দুই প্রকার ফুল একই আধারে জন্মে। বাহিরের ফুলগুলি একলিঙ্গ, একপুট। উহাতে স্ত্রাঙ্গ এবং অন্তষ্পুট মাত্র থাকে। ভিতরের বা মাঝের ফুলগুলি দ্বিলিঙ্গ। প্রথমে মনে হয়, যেন উহাতে কেবল অন্তষ্পুট আছে; কিন্তু তাহার নীচে দুই পাশে বহিষ্পুটের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাপ ফুলেও চারিটি অঙ্গ আছে। সবুজবর্ণ বহিষ্পুট, অন্তষ্পুট বা পাপড়ি, পরাগকেশর এবং বীজকাশয়, এই চারি অঙ্গ। কিন্তু উহার একটি বীজকাশয় ও তাহার শলা ও পিণ্ড না থাকিয়া অনেকগুলি স্ত্রাঙ্গ থাকে। একটা গোলাপ ফুলকে লম্বা-লম্বি কাটিলে বহিষ্পুটের ভিতরে অনেক স্ত্রাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে, গোলাপ ফুলও দ্বিপুট, দ্বিলিঙ্গ। রজনীগন্ধা দ্বিলিঙ্গ বটে, কিন্তু পুট দুইটি উভয়েই শাদা। এইরূপ চাঁপা ফুল দ্বিলিঙ্গ, কিন্তু পুটের প্রভেদ নাই। চাঁপাফুলেও অনেক স্ত্রাঙ্গ থাকে। এজন্য একটি ফুল হইতে অনেকগুলি ফল হয়। বলা বাহুল্য, বীজকাশয়ের নাম ফল। এইহেতু সূর্য্যমুখীর যাহাকে বীজ বলা যায়, তাহা বস্তুতঃ ফল। ধান্য বীজ নহে, ফল।

বহিষ্পুট, অন্তষ্পুট, পুমঙ্গ, ও স্ত্রাঙ্গ—এই চারি অঙ্গেরই বহুবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সমুদয় বর্ণনা করিবার স্থান নাই। দ্বিপুট ফুলের দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যাইবে। একপুট ফুলের দৃষ্টান্ত সকলের তত অধিক জানা নাই। নিষ্পুট—অর্থাৎ যাহার একটিও পুট নাই—এমন ফুলের দৃষ্টান্ত আরও অল্প। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, যাহাকে আমরা কচুর ফুল বলি, বাস্তবিক তাহা একটি ফুল নহে। উহার মধ্যস্থ দণ্ডের গায়ে নীচে ও উপরে নিষ্পুট একলিঙ্গ ফুল জন্মে। নীচের ফুলগুলি স্ত্রাঙ্গ, উপরেরগুলি পুমঙ্গ মাত্র। এই সকল ফুলে পুটের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। তবে, ফুল নিষ্পুট হইতে পারে, কিন্তু নির্লিঙ্গ হয় না। উদ্যানে সযত্নপালিত কোন কোন বৃক্ষের ফুল নির্লিঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু বন্যফুলের নির্লিঙ্গ হওয়া, বোধ করি সম্ভবপর নয়।

এখন ফুল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা যাউক। একই বস্তু বহুবিধ প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ জীবাঙ্গের নির্দ্দেশ নানা ভাবে করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের হাতটাকেই লওয়া যাউক। অর্থাৎ, আমাদের হাত কাহাকে বলি? রূপ (আকার) দেখিলে উহা মানুষের অঙ্গবিশেষ,—সন্ধি ও অঙ্গুলীযুক্ত দীর্ঘাকার অঙ্গ ইত্যাদি; উহার ক্রিয়া (উদ্দেশ্য) দেখিলে, উহা জিনিস পত্র ধরিবার অঙ্গ বিশেষ; উৎপত্তি দেখিলে, উহা মানুষ্য-স্কন্ধের অনুবন্ধবিশেষ; আভ্যন্তর রচনা দেখিলে, উহা মাংসত্বগাদিবেষ্টিত অস্থিসমষ্টি বিশেষ; ইত্যাদি। এখানে পূর্ণ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিলাম না।

এইরূপ, ফুলেরও নানা ভাবে সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে এখানে দুইটির উল্লেখ করা যাইতেছে। রূপ দেখিলে উহা বিকৃত পল্লব মাত্র (ক্ষুদ্রাকার পত্রময় কাণ্ড); ক্রিয়া বা উদ্দেশ্য দেখিলে উহা জননেন্দ্রিয় মাত্র। রূপ নির্দ্দেশ করিবার সময় উৎপত্তি, এবং উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিবার সময় রূপ ভাবিতে হয়। একটি অন্যের অপেক্ষা করে। এস্থলেও উৎপত্তি দেখিলে ফুল বিকৃত পল্লব মাত্র। রূপ বলিবার সময় এতটা না বলিলেও চলে। তখন উহার পুট ও পরাগ কেশর বীজকাশয়াদির বর্ণনা করিতে হয়। যাহা হউক, কোন একটি না দেখিয়া দুই তিনটি দেখিলে বস্তুনির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত পূর্ণ হয়। এইরূপে বলা যায় ফুল সন্তান-জননের উপযোগী বিকৃত পল্লব মাত্র।

ফুল যে সন্তান জননের উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলের পিণ্ডটি কাটিয়া দিলে কিংবা বস্ত্রাদিতে আবৃত করিয়া রাখিলে তাহাতে পরাগ পড়িতে পারে না, বীজও হয় না। কিন্তু কি প্রমাণের সাহায্যে ফুলকে বিকৃত পল্লব বলা যায়? বিকৃত পল্লব অর্থে এরূপ নহে যে, পূর্ব্বে পল্লব থাকে, পরে ফুল হয়। উহার অর্থ এই যে, পল্লব ও ফুল এক আদর্শে গঠিত। আরও বলিতে পারা যায়, পল্লব ও ফুল গঠনে

এক জাতীয়, কার্য্যে ভিন্ন। এমন কি, কার্য্যে ভিন্ন বলিয়াই রূপে ভিন্ন। প্রথমে উদ্দেশ্য, পরে রূপান্তর; কি প্রথমে রূপান্তর পরে কার্য্য-ভেদ, এ তর্ক জীব-বিদ্যায় বিলক্ষণ করিতে হয়। এস্থলে এ তর্কের সম্ভাবনা নাই। নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, প্রথমে পাতা ছিল, পরে ফুল হইয়াছে। যাদি সৃষ্টিতে পাতাই ছিল, পরে পাতাগুলি রূপান্তরিত হইয়া ফুলের বহিস্পুট, অন্তস্পুট, পুমঙ্গ, ও স্ত্র্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রমাণ?

প্রমাণ অনেক এবং সকল বিষয়েরই আছে। কতকগুলি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। গোলাপ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির পাতা একটির পর একটি, এইরূপ পর্য্যায়ে ডাঁটায় জন্মে, অর্থাৎ প্রতি গ্রন্থি হইতে একটি পাতা জন্মে। ফুলে সে রকম কই? ধুতুরা ফুলের চারিটি অঙ্গ। এইরূপ অধিকাংশ ফুলে এক এক অঙ্গ মণ্ডলাকারে জন্মিতে দেখা যায়।—কিন্তু সকল ফুলেই এই প্রকার নহে। কুমুদ, ও চাঁপা ফুলের অঙ্গগুলি মণ্ডলাকারে না থাকিয়া পাতার মত সর্প-কুণ্ডলাকারে আছে। এইরূপ আরও অনেক ফুল আছে।

২। আকন্দ ও তুলসীর প্রতি গ্রন্থি হইতে দুইটি পাতা বহির্গত হয়।—এইরূপ সর্ষপ ফুলেও দুটি দুটি চারিটি বহিস্পুট, দুটি দুটি চারিটি অন্তস্পুট ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। প্রতি গ্রন্থি হইতে একটি পাতাই হউক, দুইটি পাতাই হউক, দুই গ্রন্থির মধ্যে কিছু না কিছু অন্তর থাকে।—সকল ফুলের মণ্ডলদ্বয়ের মধ্যে অন্তর নাই বটে, কিন্তু কোন কোন ফুলে এইরূপ অন্তর আছে। হুড়হুড়িয়ার ফুলের অন্তস্পুট, বহিস্পুট, পুমঙ্গ, ও স্ত্র্যঙ্গ এই চারি মণ্ডলের মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প অন্তর আছে। আজকাল ঝুমকা লতা বাগানে দেখা যায়। ঝুমকা ফুলের অন্তস্পুট পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গের মধ্যে অল্প অল্প অন্তর দেখা যায়। তা ছাড়া সকল গাছেই পাতা ফাঁক ফাঁক থাকে না। জলে যে টোকা পানা জন্মে, তাহার পাতাগুলার মধ্যে ফাঁক দেখা যায় না। মূলার কাণ্ডে পাতার বিন্যাসেও অধিক অন্তর দেখা যায় না।

৪। শিম, মটর প্রভৃতি কোন কোন গাছের পাতার নীচে ও পাশে অপর দুটি ক্ষুদ্র পাতা দেখা যায়।—কোন কোন ফুলেও এইরূপ আছে। জবা, কার্পাস প্রভৃতি কোন কোন ফুলের বহিস্পুটের বাহিরে নীচে অপর কয়েকটি ছোট ছোট পাতা দেখা যায়।

৫। ধুতুরার বহিস্পুট ও অন্তস্পুট মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যায়, প্রত্যেকটি পাঁচটি দলের পরস্পর সংযোগে কলকের মত আকার পাইয়াছে।—এইরূপ কোন কোন গাছের একই গ্রন্থিজাত দুইটি পাতা যুক্ত হইয়া থাকে।

৬। গাছের পাতা চেপ্টা কাগজের মত সমস্ত।—বহিস্পুট ও অন্তস্পুটের দলগুলিও এমনই চেপ্টা। কুমুদ ফুলের পরাগকেশর চেপ্টা, শিমের বীজকোশও চেপ্টা। তা ছাড়া, সকল গাছের পাতা চেপ্টা নয়। পেঁয়াজের পাতা গোল লম্বা, লুনিয়া শাকের পাতা গোল না হইলেও চেপ্টা নয়।

৭। পাতার আকারের সহিত ফুলদলের আকারের সাদৃশ্য আছে। গোলাপের বহিস্পুটের এক এক দল সময়ে সময়ে ঠিক পাতার মত হয়। কুমড়ারও এইরূপ দেখা যায়।

৮। পাতা সবুজবর্ণ, কিন্তু ফুল?—ফুল অর্থে কেবল পাপড়ি বা পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গ ধরিলে চলিবে না। বহিস্পুট ও ফুলের অঙ্গ। বহিস্পুট প্রায়ই সবুজবর্ণ। শিম, মটর প্রভৃতির স্ত্র্যঙ্গও সবুজবর্ণ। অধিকাংশ ফল প্রথমে সবুজ বর্ণ থাকে, পাকিবার সময় হলদে বা লাল হয়। তা ছাড়া, কোন কোন ফুলের পাপড়ি অর্থাৎ অন্তস্পুটের দলও প্রথমে সবুজবর্ণ থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "প্রদীপের" কোন কোন পাঠক বনফুল, কাঁটালিচাঁপা, মধুমালতীর উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্‌বিষয় পরে বলা যাইবে।

৯। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বহিস্পুট কতকটা পাতার মত বলিয়া কি ফুলের অন্তস্পুট, পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গকে পাতার বিকৃতি বলিতে হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি ফুলের একটি অঙ্গকে পাতার বিকৃতি মনে হয়, তবে বোধ হয়, অন্যান্য অঙ্গও তাই। সরল মাটীতে গোলাপের বহিস্পুট কখন কখন ঠিক পাঁচটি পাতার মত হয়। তার পর, কুমুদ ফুলের বহিস্পুট ও অন্তস্পুটের প্রভেদ করিতে পারা যায় না। সকলের বাহিরের দলগুলির এক পিঠ সবুজ অন্য পিঠ শাদা। সুতরাং অন্তস্পুট ও বহিস্পুট এক জাতীয় বলিতে হইবে।

১০। কিন্তু পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গের সহিত পুটের কোন

সাদৃশ্য দেখা যায় কি?—যিনিই "ডবল" ফুল দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার প্রমাণ দিতে পারেন। ফুল "ডবল" বা বহুদল হইবার কারণ দুইটি। (১) একদল ফুলের যে অন্তম্পুট থাকে, তাহা পালনগুণে সম্মুখে বিভক্ত হইয়া বহুদল হয়। অর্থাৎ অন্তম্পুটের একটি মণ্ডলের স্থানে দুই তিনটি মণ্ডল হয়। এইরূপে বহুদল বেলা বা 'ডবল' বেলার উৎপত্তি। (২) পুমঙ্গ, অন্তম্পুটের দলে পরিণত হয়। এইরূপে গোলাপ ডবল হয়। বহুদল গোলাপের ভিতরকার দলের কোন কোনটার শিরোভাগে পরাগাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমুখী জবাতে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোন ফুলের পাপড়ি স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা বড় হইলেও কেহ কেহ তাহাকে 'ডবল' মনে করেন। এইরূপে, অপরাজিতার পাঁচটি পাপড়িই বড় হইলে কখন কখন 'ডবল' নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা বহুদল নামের অপব্যবহার। যেহেতু দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। যাহা হউক, দেখা গেল পুমঙ্গ অন্তম্পুটে পরিণত হইতে পারে। এমন কি, কখন কখন গোলাপের অনেক স্ত্র্যঙ্গও দলের আকার প্রাপ্ত হয়।

১১। পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গ, দলের আকার পাইতে পারে বলিয়া কি সেগুলিকে পাতার বিকৃতি মনে করিতে হইবে?—ফুলের মধ্যে স্ত্র্যঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকৃত। কিন্তু সেই স্ত্র্যঙ্গও কোন কোন স্থলে সবুজ পাতায় পরিণত হইতে দেখা যায়। কখন কখন গোলাপের এই প্রকার বিকার ঘটে, এবং ইহারই বিষয়ে "প্রদীপে" প্রশ্ন হইয়াছিল। অবশ্য এরূপ ঘটনা সর্ব্বদা হয় না, তাই ইহাকে অদ্ভুত পদার্থ মনে করা যায়।

১২। স্ত্র্যঙ্গের ভিতরে বীজ হয়। কিন্তু কোন পাতার গায়ে বীজ হয় কি?—বীজ অর্থে সন্তান বা ক্ষুদ্র বৃক্ষ. পাষাণভেদী, ঢেঁকিলতা প্রভৃতি (Ferns) নামে খ্যাত গাছগুলির পাতার নীচের পিঠে এক প্রকার রেণু জন্মে। সেই রেণুগুলি ঠিক বীজ নয় বটে, কিন্তু তাহা হইতে নূতন গাছ হয়। এই সকল গাছের স্পষ্ট ফুল দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য ইহারা অপুষ্পক শ্রেণীর অন্তর্গত। ছত্রাক (বেঙের ছাতি, ছাতু) এই প্রকার রেণু হইতে জন্মে। উহার রেণুগুলি ছত্রাকের ছাতার নীচের পরদায় জন্মে। উহাও অপুষ্পক। সপুষ্পক গাছের মধ্যে পাতরকুঁচি বা হিমসাগর অনেকেই জানেন। উহার পরিপক্ব পাতা সূতায় বাঁধিয়া কয়েকদিন ঝুলাইয়া রাখিলে পাতার ধারে ছোট ছোট গাছ হয়। এই জন্য একটি পাতা হইতেই অনেকগুলি পাতরকুঁচির গাছ জন্মাইতে পারা যায়। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পাতা হইতে ক্ষুদ্রাকার গাছ বা বীজ জন্মিতে পারে, এবং স্ত্র্যঙ্গ রূপ পাতা হইতে বীজের জন্ম তত বিস্ময়কর নহে।

১৩। ফুল যদি পল্লব, তাহা হইলে ফুল উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই পল্লবের বৃদ্ধি শেষ হয় কেন? যে ডালের শেষে ফুল হয়, তাহার বৃদ্ধি সেই খানেই শেষ হয়। কিন্তু পল্লবের ত এরূপ হয় না।—ইহাই নিয়ম বটে, কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আনারস প্রথমে ফুলসমষ্টি থাকিয়া পরে ফলসমষ্টি হয়। কিন্তু সেই আনারসের উপরে পল্লব থাকে। এমন কি, সেই পল্লব রোপণ করিয়া আনারসের গাছ উৎপাদন করা যায়। এস্থলে ফুলেই ডালের বৃদ্ধি লোপ হয় না।

এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। উপরে দুই একটি ফুলের উল্লেখ করা গিয়াছে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত সকলের তত পরিচিত না থাকিতে পারে। যাহা হউক, এই কয়েকটি প্রমাণ দ্বারাই বলা যাইতে পারে যে, পল্লবের বিকৃতি ফুল, কিম্বা পল্লব ও ফুল মূলে একই, কেবল কার্য্যবিভিন্নতায় উভয়ের আকার প্রকার বিভিন্ন হইয়াছে। পাতার কার্য্য গাছের খাদ্য উৎপাদন, ফুলের কার্য্য বংশরক্ষা। একটি পুষ্টি, অন্যটি বংশবৃদ্ধি। এই দুই কার্য্যে যাবতীয় জীবের (প্রাণী বা উদ্ভিদ) সমুদায় কার্য্য। এই দুই কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যই নাই। সুতরাং এই দুই কার্য্য যত শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়, জীবের ততই মঙ্গল। সবুজ বর্ণ পাতায় সূর্য্যের তেজে স্ব স্ব দেহ-পোষণক্ষম খাদ্য প্রস্তুত হয়। পত্র মধ্যস্থ সবুজ রঙটিই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত। পত্রে এই রঙটি পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে পত্রীণ বলা যায়। শিম পাতা ছিঁড়িয়া বা পেষিয়া সুরাসারে ভিজাইয়া রাখিলে পত্রীণ তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ রঙের উপরিভাগ দেখিলে লালবর্ণ, ভিতর দেখিলে ঘোর সবুজবর্ণ দেখায়। ইহা পত্রীণের একটি লক্ষণ। কর-বীক্ষণ (spectroscope) যন্ত্র দ্বারা স্থূলভাবে দেখিলে লোহিত, নারঙ্গ, পীত, হরিৎ, নীল, বেগুনে বর্ণের মধ্যে পীতের ও

হরিতের কিয়দংশ দেখা যায়, অন্যান্য বর্ণ অদৃশ্য হয়। এইরূপও অন্যান্য ক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, পত্রীণ একটা রঙ নহে। বোধ হয় উহা পীত ও নীল এই দুই রঙের মিশ্রণে উৎপন্ন। ইষ্টক প্রস্তরাদি দ্বারা ঘাস আবৃত করিয়া রাখিলে তাহা পাণ্ডুর বা ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। অনেকের মতে পাণ্ডুর রঙটী হইতে পত্রীণের উৎপত্তি। স্থূলতঃ বলিতে গেলে পত্রীণে পীত ও নীলবর্ণের দুইটি রঙ আছে।

ফুলের অন্তস্পুটের বর্ণ দেখিয়াই লাল নীল প্রভৃতি বর্ণের ফুল বলা যায়। বহিস্পুট প্রায়ই সবুজ; তাহাতে পত্রীণ থাকে। অধিকাংশ ফলও প্রথমে সবুজ, এবং পাকিলে হলদে বা লালবর্ণ হয়। অপক্ব ফলেও পত্রীণ থাকে। সেই পত্রীণের বিকারে পক্ব ফলের পীত ও লোহিত বর্ণের উৎপত্তি। এইরূপ, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িবার পুর্ব্বে তাহার পত্রীণ বিকৃত হইয়া পীতবর্ণ হয়। অন্তস্পুটের বর্ণের কারণও বোধ হয় পত্রীণ, তাহারই বিকারে ফুলের বহুবিধ বর্ণের উৎপত্তি।

যাঁহারা পুষ্পোদ্যানকর্ম্মে রত, তাঁহারা জানেন যে, ফুলের কোন এক স্বাভাবিক বর্ণকে পালন দ্বারা অন্য প্রকার বর্ণে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। এইরূপে কিন্তু সকল প্রকার বর্ণ দিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ফুলগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। (১) যে সকল ফুল স্বভাবতঃ পীত, তাহাদিগকে লাল ও সাদা করিতে পারা যায়, কিন্তু কখনও নীলবর্ণ করিতে পারা যায় না। (২) যে সকল ফুল স্বভাবতঃ নীল, তাহাদিগকেও লাল ও সাদা করিতে পারা যায়, কিন্তু কখনও হলদে করিতে পারা যায় না! দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণকেলি পীত, নারঙ্গ, লোহিত বর্ণের, এবং অপরাজিতা নীল, বেগুনে, লালবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাপ নীলবর্ণের হইতে দেখি না। বস্তুতঃ এক দিকে লোহিত, নারঙ্গ, পীত, পীতহরিৎ; অন্যদিকে হরিৎ-নীল, নীল, মহানীল, বেগুনে, নীললোহিত, লোহিত,—এই দুই ভাগে ফুলের বর্ণ ভাগ করিতে পারা যায়। উহাদের মধ্যস্থলে পত্রীণের হরিদ্বর্ণ।

নানাজাতীয় ফুল লইয়া দেখিলে জানা যায়, সাদা ফুলই অধিক। বোধ হয় শতকরা ২৬.২৭টি ফুল সাদা। হলদে ও লাল ফুলের সংখ্যা কিছু কম। নীলবর্ণের ফুল ইহার অর্দ্ধেক, বেগুনে তাহার অর্দ্ধেক, সবুজ তাহার অর্দ্ধেক, শতকরা ৩.৪ টা, নারঙ্গবর্ণের ফুল আরও কম শতকরা ১.২ টা। বস্তুতঃ বেগুনে ও নারঙ্গ বর্ণ ফুল তত দেখিতে পাওয়া যায় না, নীলবর্ণ ফুল খুব কম। সবুজবর্ণ ফুল আছে বটে, কিন্তু পূর্ণ বিকশিত ফুলে পত্রীণ থাকে কি? স্থূলতঃ দেখিলে সবুজ বর্ণ বোধ হইতে পারে। এইরূপে কেহ কেহ সবুজ বর্ণের ফুলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বনফুল, মধুমালতী, ও কাঁটালি চাঁপার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের সহিত পীতবর্ণের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। বনফুল ও কাঁটালি-চাঁপা চিনি, কিন্তু এসময় উহাদের ফুল পাইলাম না। ফুল পাইলে উহাদের বর্ণ ঠিক সবুজ কি না, অর্থাৎ ইহাদের পাতার মত বর্ণ কি না, দেখা যাইত। মধুমালতী নাম হইতে ফুলটি ঠিক করিতে পারিলাম না। কথায় বলে, যোজনান্তে ভাকা। গাছ পালার নাম এই কথার সাক্ষী। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ফুল অদ্যাপি দেখি নাই। বিলাতী কোন কোন প্রকার "প্যান্‌সি" দেখিতে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু তাহা ঘোর বেগুনে বা নীল ও বেগুনে। সকলেই জানেন, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনে অতিশয় ঘোরবর্ণ হইলে কাল দেখায়।

ফুলের অন্তস্পুটের উদ্দেশ্য স্মরণ করিলেও জানা যায়, তাহা সবুজবর্ণ না হইলেই সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়। পুমঙ্গ ও স্ত্র্যঙ্গকে রক্ষা করা ইহার তত উদ্দেশ্য নয়। পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয়। যে সকল ফুলের অন্তস্পুট বড় বা সুন্দর, তাহাদের উদ্দেশ্য পতঙ্গের দিগ্‌দর্শন করা, ইহা সহজেই বোধ হয়। এমন স্থলে তাহা পাতার সহিত মিশিয়া গেলে উদ্দেশ্যই বৃথা হয়। অবশ্য গন্ধ দ্বারা পতঙ্গ আকৃষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। কিন্তু গন্ধের সহিত ফুলের পত্রাতিরিক্ত বর্ণ থাকিলে ফুল দূর হইতে চিনিতে ক্লেশ হয় না। বোধ করি, বৃহদাকার ফুলের গন্ধ তেমন থাকে না। কাঁটালি চাঁপার বর্ণ পীত, কিন্তু তাহার গন্ধ বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। সহজে দেখাইবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা, গেঁদা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ফুল একত্র জন্মে। উহাদের এক একটি ফুল দূর হইতে স্পষ্ট দেখা না যাইতে পারে, কিন্তু অনেকগুলি একত্র জন্মিলে আকারে বড় হয়, দৃষ্টি পথেও পড়ে। মান কচু প্রভৃতি ফুলের সৌন্দর্য্য নাই, বোধ হয় তাই সকল ফুল গুলির একটি বড় পীত বা রক্তবর্ণ আবরণ থাকে। এই

বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। এখানে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

অনেক ফুলের পরাগ পবন দ্বারা পিণ্ডে পতিত হয়। এ সকল ফুল প্রায়ই ছোট, সৌন্দর্য্য ও গন্ধহীন। ধানের, ও বিবিধ ঘাসের ফুল এই প্রকারে নিষিক্ত হয়। এ নিমিত্ত আবার অন্যবিধ কৌশল অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। তৎসমুদয় বর্ণনা করা এখন উদ্দেশ্য নহে।* এই সকল ফুল সবুজ হইলেও নিষেক-ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু ফুলে যদি পত্রীণ থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পত্রের কাজও করাইয়া লওয়া হয়,কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা না করিলে ফুল দ্বারা পাতার কাজ করান সহজে বিশ্বাস হয় না। অবশ্য পত্রীণযুক্ত ফুল কখন হইতে বা থাকিতে পারে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না। যদি পাতায় পত্রীণ থাকে, তাহা হইলে কোন কোন ফুলেও তাহার থাকা অসম্ভব নহে। যেহেতু ফুল পাতারই বিকৃতি, এবং পত্রের পত্রীণই বিকৃত হইয়া বহুবিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে।

১৮ই পৌষ, ১৩০৭। শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

এমার্সন।

পড়াতে ও বোঝাতে, বোঝাতে ও জানাতে কি যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এমার্সনের নিকটেই ইহা প্রথম শিক্ষা করি। ইংরাজীনবিশদিগের অনেকেই এমার্সনের নাম জানেন, আমিও জানিতাম। তাঁর লেখাও একটু আধটু অনেকেরই পড়া থাকে, আমারও ছিল। তাই এক দিন এমার্সনের একখণ্ড প্রবন্ধাবলী দেখিতে পাইয়া, অনুগ্রহ সহকারে, তাহা কিনিয়া আনিলাম। সে বহুদিনের কথা। বাড়ী আসিয়াই, পাতা কাটিয়া, পড়িতে বসিলাম। পড়িলাম—

There is one mind common to all individual men. Everyman is an inlet to the same and all of the same He that is once admitted to the right of reason is made a free man of the whole estate. What Plato has thought he may think ; what a saint has felt he may feel ; what at any time has befallen man he can understand. Who hath access to the universal mind is a party to all that is or can be done, for this is the only and sovereign agent.

ভাবার্থ—এক আত্মাই সকল মানুষের মধ্যে বাস করেন প্রত্যেক মনুষ্যই এই আত্মাতে, ও এই আত্মা সম্বন্ধীয় সকল বিষয় ও ব্যক্তিতে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। যে একবার অধ্যাত্ম জীবনের অধিকার পাইয়াছে, সে স্বাধীনভাবে সমুদয় বিশ্বরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে। প্লাটো যাহা ধ্যান করিয়াছেন, সে তাহা ধ্যান করিতে পারে। যে কোনও সাধুপুরুষ যাহা অনুভব করিয়াছেন, সেও তাহা অনুভব করিতে পারে। যে কোনও যুগে, যে কোনও মানবের জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তৎসমুদায়ই সে বুঝিতে পারে। এই সার্ব্বজনীন বিশ্বাত্মাতে যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে যাহা কিছু হইয়াছে বা যাহা কিছু হইতে পারে, তৎসমুদয়েরই সে অংশীদার হয় ; কারণ এই আত্মাই জগতে একমাত্র কর্ত্তা ও প্রভু!

কথাগুলি ছোট ছোট, অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। পদযোজনাও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। আপাততঃ দেখিতে গেলে, সকলই বোধগম্য বলিয়া বোধ হয়। অথচ তলাইয়া যখন দেখা যায় কি বুঝিলাম, শব্দ ছাড়িয়া যখন বস্তু ধরিতে যাই, দেখি সকলই কেমন আবছায়ার মত হইয়া যায়। এমার্সন প্রথম পড়িতে আরম্ভ করিয়া, অনেকেরই এইরূপ মনে হয়। সহজ কথার আড়ালে কি গভীর, দুর্ব্বোধ্য ভাব লুকাইয়া থাকে অনেক সময়ে তাহা ধরা যায় না। কোনও বিষয় বোঝা গেল না, এটা বুঝিলে তো তার অর্দ্ধেকটাই একরূপ বোঝা হইয়া যায়। অনেকের এমার্সন প্রথম পড়িয়া, এ জ্ঞানও ভালরূপে হয় না। আমিও তাহা বুঝিলাম না। কথার পর কথা, পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলাম। কেবল দেখিলাম,—তাহাতে কিছুই মিষ্টতা নাই।

রসভেদে যে অধিকারীভেদ হয়, যে যাহার রস আস্বাদন করিতে পারে না, সে তাহার উপযুক্ত নয়,—আস্বাদন ভিন্ন যে জ্ঞান জন্মে না,—এ শিক্ষাও প্রথমে এমার্সনের নিকটই লাভ করি। এমার্সন বলিয়াছেন—Never read any but what you like—যাহা তোমার মিষ্ট লাগে না, এমন কিছু কখনও পড়িও না। তখনও এই উপদেশ পাই নাই। তাই পড়িয়া গেলাম, মোটামোটি বুঝিতে পারিতেছি, এই

---

* 'নব্য ভারতে' কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফুলের বিবাহ নামক প্রবন্ধে এ বিষয় যথেষ্ট আলোচনা করা গিয়াছে। প্রবন্ধটিতে যদিও রূপকের আকার দেওয়া গিয়াছে, তথাপি উহার প্রত্যেক উক্তিই সত্য। রূপকও সহজে ভেদ করিতে পারা যাইবে।

মনে করিলাম। তবে যাহাতে রস পায় না, সখ করিয়া এমন বই আদ্যোপান্ত কেহ ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িতে পারে না। এমার্স‍নও আমার বেশীদিন পড়া হইল না। দু চারি দিন পরেই প্রথম যৌবনের উদ্দাম অজ্ঞতার অহঙ্কারে, সরাসরিভাবে, প্রবন্ধগুলিকে নিতান্তই নীরস সাব্যস্থ করিয়া, গ্রন্থখানিকে প্রাচীন পরিত্যক্ত পুস্তকের মধ্যে তুলিয়া রাখিলাম।

র‍্যালফ র‍্যাল্‌ডো এমার্সন।

ছয় সাত বৎসর কাল সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল। এ মনের মধ্যে আর এমার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। তার পর একদিন, ঘোরদুর্দ্দিনে, মৃত্যুর ছায়াতে, নিরাশার অন্ধকারে, আত্মহারা হইয়া, হঠাৎ দৈবক্রমে এমার্সন হাতে তুলিয়া লইলাম। প্রথমেই "ক্ষতিপূরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে হাত পড়িল। দেখিলাম নিদারুণ শোক ও বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ কিরূপে হয়, এমার্সন তাহারই আলোচনা করিতেছেন। একেবারেই এই কথাগুলির উপরে চক্ষু পড়িল :—

We cannot part with our friends. We cannot let our angels go. We do not see that they only go out, that archangels may come in. We are idolators of the old. We do not believe in the riches of the soul, in its proper eternity and omnipresence. We do not believe there is any force in today to rival or recreate that beautiful yesterday. We linger in the ruins of the old tent, where once we had bread and shelter and organs, nor believe that the spirit can feed, cover, and nerve us again. We cannot again find aught so dear, so sweet, so graceful. But we sit and weep in vain. The voice of the Almighty saith, 'Up and onward for evermore!' We cannot stay amid the ruins. Neither will we rely on the new; and so we walk with reverted eyes, like those monsters who ever look backward.

ভাবার্থ :—আমরা বন্ধু-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি না। আমাদের দেবতা-গুলিকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আমরা ইহা দেখি না যে এক দেবতা চলিয়া গেলে, তদপেক্ষা উচ্চতর দেবতার আবির্ভাবের অবসর জন্মে। আমরা আত্মার সম্পদে বিশ্বাস করি না; আত্মা যে অনন্ত ও সর্ব্বগত, ইহা ভুলিয়া যাই। কল্যকার দিন কি সুন্দর ও সুখকর ছিল, অদ্যকার দিনেরও যে সেইরূপ সুন্দর ও সুখকর হইবার শক্তি আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা প্রাচীনের উপাসক; অতীতের অসার মূর্ত্তিরই ভজনা করিতে অভ্যস্ত। আমরা অতীতের ভগ্নাবশেষ মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াই। সেখানে একদিন আহার এবং আশ্রয় এবং আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহারই ধ্যান করি, কিন্তু আত্মারাম যে আমাদিগকে পুণরায় অন্নবস্ত্র দিয়া উৎফুল্ল করিতে পারেন ইহা বিশ্বাস করি না। এই জন্য যাহা হারাইয়াছি তার মত এমন প্রিয়, এমন মধুর, এমন সুন্দর আর কোথাও কিছু পাই না। কিন্তু এ বিলাপ আমাদের বৃথা। সর্ব্বনিয়ন্তার আদেশ এই যে আমরা

চিরদিনই পড়িয়াপিয়া আবার উঠিব, এবং অনন্তকালই অগ্রসর হইব। তাই অতীতের ভস্মাবশেষ মধ্যে আমরা একেবারে পড়িয়া থাকিতেও পারি না। অথচ বর্ত্তমানের উপরেও আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। এই জন্য আমরা সর্ব্বদাই পশ্চাতের দিকে চক্ষু খুলিয়া, রাক্ষস বিশেষের ন্যায়, এই বিশ্বে বিচরণ করিয়া থাকি।

এই কথা গুলি পড়িতে পড়িতে পিপাসিত প্রাণের সম্মুখে এক অতি অপূর্ব্ব অমৃতের ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। তদবধি এমার্সন আমার অতি প্রিয় হইয়াছেন। সুখে, দুঃখে, বিপদে প্রলোভনে, নিরাশায় ও শুষ্কতায় সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গ অন্বেষণ করিয়া থাকি।

এমার্সনের সম্বন্ধে অনেকেরই অভিজ্ঞতা এইরূপ। এমার্সনের রস প্রথমে অনেকেই আদৌ আস্বাদন করিতে পারেন না। কিন্তু দৈবযোগে একবার সে অমৃতের আস্বাদন পাইলে জন্মের মত তাহাতে মজিয়া যান। এ বিষয়ে গ্লানি-প্রশংসার কথা কিছুই নাই। এমার্সন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উপদেষ্টা; আর দেবপ্রসাদ ভিন্ন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কদাপি কাহারো নিকট প্রকাশিত হয় না।

এইজন্য, সর্ব্বত্রই এমার্সনের প্রকৃত রসগ্রাহীর সংখ্যা অতি অল্প। এমার্সন আমেরিকান। আর ইহা ঠিক যে আমেরিকাতে আজি পর্য্যন্ত এমার্সন ব্যতীত আর একটীও বিশ্বজনীন প্রতিভা প্রকাশিত হয় নাই। মার্কিন কবি হুইট্যার বলিয়াছেন যে, এমার্সনই একমাত্র আমেরিকান, যাঁহার কথা সহস্র বৎসর পরেও লোকে পাঠ করিবে ও ধ্যান করিবে। তথাপি আমেরিকার চক্ষে এমার্সন, এমন কি, উপন্যাস-লেখক হথরণ অপেক্ষাও হীন। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বড় লোকদিগের একট বাছুনী হইয়াছিল। একশত সভ্যের এক কমিটী নির্ব্বাচিত হইয়া, তাহাদের উপরে এই বাছুনী করিবার ভার অর্পিত হয়। এই কমিটীর নির্ব্বাচনে এমার্সন যে ভোট পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি দশম কি একাদশ স্থান মাত্র পাইতে পারেন। আমেরিকায় এমার্সনের যে প্রতিপত্তি তাহা তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক বলিয়া তত নহে যত তিনি আমেরিকান বলিয়া। এমার্সন ইউনিট্যারিয়ান্ ছিলেন, অধিকাংশ ইউনিট্যারিয়ান্ই আপনার দলের লোক বলিয়া এমার্সনকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করেন; অন্য দলের লোক হইলে সেরূপ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। বষ্টনের লোকেরা এমার্সনের অনেক গুণ কীর্ত্তন করে, কারণ তিনি বষ্টনের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার লেখনী প্রভাবে বষ্টন অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এই সকল অবান্তর হেতুতে আমেরিকায় এমার্সনের কতকটা প্রতিপত্তি আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অতি অল্প সংখ্যক আমেরিকানই তাঁহার প্রকৃত রস গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমেরিকায়ই যখন এই অবস্থা, ইংলণ্ডের তো তখন আর কথাই নাই। এমার্সনের প্রকৃত রসগ্রাহী লোক ইংরাজমণ্ডলিমধ্যে আরো কম। ফলতঃ এমার্সনের প্রতিভা ইংরাজ বা আমেরিকান জাতীয় চরিত্রের উপরে সম্যক রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ভাষা ছিল তাঁর ইংরাজি, ভাব ছিল তাঁর বিদেশীয়। মার্কিনীয় ইতিহাস ও মার্কিনীয় জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে স্বভাবতঃই তাঁর লেখনীর একটা অতি ঘনিষ্ট যোগ ছিল সত্য, এরূপ যোগ থাকা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। কিন্তু এই সকল তো সত্যের বহিরাবরণ মাত্র। যে মহাসত্য এমার্সন আয়ত্ত করিয়া এই বহিরূপকরণের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, এখনও ইংরাজ বা আমেরিকান জনসাধারণ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই। এই জন্যই এমার্শন অনেকের নিকট এরূপ দুর্ব্বোধ্য। যাঁহারা এমার্সন লইয়া নাড়া চাড়া করেন, তাঁহারাও অনেকেই কেবল এমার্সনের রচনার বহিঃ কোষেই আবদ্ধ থাকেন, মূল শাঁশের সন্ধান প্রাপ্ত হন না।

প্রত্যেক মৌলিক ও বিশ্বজনীন প্রতিভা এক একটী মূল সত্য অবলম্বনে প্রকাশিত হয়। এই মূল সত্যই তাহার উপজীব্য, এই মূল সত্যই তাহার প্রাণ, এই মূল সত্যের অভিব্যক্তির জন্যই তাহা নিয়ত বিব্রত থাকে। নানা সুরে, নানা তালে, সে এই একই সাম গান করে। নানা মতে, সে এই একই মন্ত্রের সাধন করে। এই মূল সত্যের সন্ধান বিন্দু মাত্রও যে প্রাপ্ত হয়, এই গূঢ় মন্ত্র যে একবারও উচ্চারণ করিতে পারে, তাহার নিকট সেই প্রতিভার বিরল, বিজন, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত, চিরদিনের জন্য মুক্তদ্বার হইয়া যায়।

এমার্সনের বিশ্বজনীন প্রতিভা, এইরূপ কোন্ মহাসত্য অবলম্বনে প্রকাশিত হইয়াছিল? এমার্সন কোন্ নিগূঢ় মন্ত্র সাধন করিয়াছিলেন, যাহার সন্ধান পাইলে, তাঁহার আত্মার

মন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার জন্মিয়া থাকে? এক কথায় বলিতে গেলে, তাহা তত্ত্বের একত্ব। একই শক্তি, একই জ্ঞান, একই প্রেম, একই আত্মা যে বহু রূপে এই দেশ কালের রঙ্গভূমিতে লীলা করিতেছে, ইহাই এমার্সনের প্রতিভার মূল মন্ত্র। এই এক গ্রামে তাঁর সকল সুর বাঁধা ছিল। যাঁহাদের প্রাণে এই মহা সত্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, কেবল তাঁহারাই এমার্সনের নিগূঢ় আস্বাদনের অধিকারী।

এই মহাসত্য এমার্সন কোথা হইতে লাভ করেন, বলা সুকঠিন। তবে হিন্দু শাস্ত্র সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে স্বল্প বিস্তর সংস্রব ছিল, ইহা স্থির নিশ্চিত। ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার টেবিলে সর্ব্বদাই এক খানি গীতা থাকিত। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আমেরিকায় যাইয়া এমার্সনের বাড়ী দেখিতে যান। সে সময় এমার্সন যে টেবিলে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন, তাহার উপরে তিনি একখানি ভগবদ্গীতা দেখিয়াছিলেন। এমার্সনের কন্যা এখন সেই বাড়িতে বাস করেন। আমি যেদিন কনকর্ড তীর্থ দর্শনে যাই, সেদিন তিনি বাড়ী ছিলেন না। চাকর বাকর কেহই বাড়ী ছিল না। বাড়ী বন্ধ ছিল। সুতরাং সে গীতাখানি তদবস্থায় এখনও আছে কি না বলিতে পারি না। তবে উপনিষদের মূল তত্ত্বের সঙ্গে যে এমার্সনের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল, ইহা স্থির নিশ্চিত। ব্রহ্ম নামে এমার্সনের একটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে। সেটী এই :—

If the red slayer think he slains,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways,
I keep and pass and turn again.

Far or forgot to me is near;
Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings.

The strongs gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred seven;
But thou, meek lover of the good!
Find me, and turn thy back on heaven.

ভাবার্থ :—"হন্তা যদি মনে করে সে হনন করিয়াছে, হত যদি মনে করে সে হত হইয়াছে, তবে তাহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। আমিই থাকি, আমিই যাই, আমিই পুনরাবর্ত্তন করি।

আমার পক্ষে দূর ও বিস্মৃতি উভয়ই অতি নিকট। আলোক ও অন্ধকার আমার নিকট দুই এক। অদৃশ্য দেবতারা আমার নিকট প্রকাশিত হন। স্তুতি নিন্দা উভয়েই আমার সমজ্ঞান।

আমাকে ছাড়িয়া যাহারা গণনা করে, তাদের সে গণনা ভুল হয়। আমা হইতে যখন তাহারা দূরে উড়িয়া যায়, আমিই তখন তাহাদের পক্ষপুটের মূলে শক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকি। আমিই সন্দেহী, আমিই সন্দেহ; আমিই ঋক-মন্ত্র, যাহা ব্রাহ্মণেরা গান করেন।

দেবতাগণ আমার ধাম কামনা করেন। সপ্তর্ষিগণ বৃথায় আমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। কিন্তু হে নিরভিমানী, কল্যাণকারী পুরুষ, স্বর্গের প্রতি বিমুখ হইয়া তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইতে পার।"

এই কবিতাটীতে যে গীতা ও উপনিষদের ছায়া পড়িয়াছে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই কবিতাটী প্রথম প্রকাশিত হইলে হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এমার্সনের রচনা, সকলেই পড়িলেন। কিন্তু অর্থ বোধগম্য করে সাধ্য কা'র? হার্বার্ডের একজন অন্তেবাসীর নিকট শুনিয়াছি যে, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্ম কথাটা এক অদ্ভুত অর্থ লাভ করে। যাহা কিছু দুর্ব্বোধ, জটিল, বাক্য মাত্র, তাহাকেই তখন তাঁহারা "ব্রহ্ম" বলিতেন। এমার্সন যে গীতা উপনিষদাদি স্বল্প বিস্তর জানিতেন, এই কবিতাটীই এক দিকে তাহার প্রমাণ; অন্য দিকে যেরূপ ভাবে ইহা তাঁহার স্বদেশীয় সমসাময়িক লোকেদের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইতে তাঁহার রচনার নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে, এ সকল লোক কতটা যে অপারগ ছিলেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। সৌভাগ্যক্রমে জর্ম্মাণ দর্শনের প্রচারে, এবং পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বের ক্রমশঃ বিস্তারে, শনৈঃ শনৈঃ এমার্সনের মৌলিক তত্ত্ব, ইংরাজ ও মার্কিনীয় চিন্তাকে অধিকার করিতেছে। যে পরিমাণে এই মহা সত্যের প্রভাব সে সকল দেশে বিস্তৃত হইতেছে, সেই পরিমাণে এমার্সনের আদরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক জর্ম্মাণ দর্শন, এবং হিন্দুতত্ত্বজ্ঞান, উভয়েরই সঙ্গে এমার্সনের স্বল্প বিস্তর পরিচয় ছিল, এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি তিনি যে মহা সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত, আপনার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালব্ধ, এ বিষয়ে তিলার্দ্ধও সংশয় নাই। এইখানেই এমার্সনের মহত্ত্ব ও মৌলিকতা। এই জন্যই, যাহাদের সে অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদের নিকট এমার্সন এরূপ দুর্বোধ্য। সাধারণ শিক্ষকদিগের ন্যায় এমার্সন কখনও শুদ্ধ শেখা কথা বলেন না। তাঁহার শিক্ষা ও সাধনা যে অতি সামান্য ছিল এরূপও নহে। অতি শৈশবেই তিনি সেক্সপীয়ার, মিলটন, ড্রাইডেন্, ইয়ং প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। তৎপরে ক্রমে বাইরণ, স্কট্, এবং ওয়ার্ডসবার্গের সঙ্গেও ঘনিষ্ট পরিচয় জন্মে। এমার্সন আপনার ভ্রাতাদের সঙ্গে এই সকল পড়িতেন এবং পঠিত বিষয় সম্বন্ধে পরস্পরে স্বাধীনভাবে সর্ব্বদা সবিস্তারে আলোচনা করিতেন। যখন পড়িবার ভাল পুস্তক কিছু পাইতেন না, তখন আপনারা যথেচ্ছা কিছু কিছু লিখিয়া পরস্পরে মিলিয়া তাহা পাঠ ও বিচার করিতেন। এইরূপে শৈশবাবধিই এমার্সনের স্বাধীনভাবে বিবিধ বিষয়ে চিন্তা করিবার অভ্যাস জন্মে। তার পরে একটু বেশী বয়স হইলে, পৈত্রিক পৌরাহিত্য ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য, এমার্সন আমেরিকার তদানীন্তন কালের এক উৎকৃষ্ট তত্ত্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। সর্ব্বশেষে এই বিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া, এক উচ্চতর পোষ্ট গ্রাডুয়েট স্কুলে (graduate school) প্রকৃতিতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানাদি, সাধনার উচ্চতর অঙ্গ, অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে আমেরিকায় একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকের পক্ষে যতটা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল, এমার্সন তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল শিক্ষা ও সাধনাতে এমার্সনকে আপনার কেন্দ্র ভ্রষ্ট না করিয়া বরং তাহারই উপরে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি অনেক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি শুদ্ধ অপরের অভিজ্ঞতা দ্বারা আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টি সাধনের নিষ্ফল প্রয়াস পান নাই। মানুষকে বিবিধ শাস্ত্র সাহিত্য শিক্ষা করিতে হইবে, এ সকল ব্যতিরেকে মনুষ্যত্বের সম্যক ও সমদর্শী স্ফূর্ত্তি লাভ অসম্ভব ও অসাধ্য। কিন্তু যে আপনার জীবন-কেন্দ্রের উপরে আপনি স্থির, অটল হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, কেবল সেই বাহিরের শাস্ত্র সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণে সমর্থ, এমার্সন বারম্বার এই কথা বলিয়াছেন :—

Can rules or tutors educate
The semigod whom we await ?
He must be musical,
Tremulous, impressional,
Alive to gentle influence.
Of landscape and of sky,
And tender to the spirit-touch
Of man's or maiden's eye :
But, to his native centre fast,
Shall into Future fuse the Past,
And the world's flowing fates in his own
mould recast.

"To his native centre fast"—এমার্সনের সাধনার এই মূল মন্ত্র। তিনি আপনার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়া সকল দেখিতেন, সকলই বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, কখনও আপনার অভিজ্ঞতাতে যাহা প্রকাশিত হয় নাই এমন সত্য লোকসমক্ষে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। এই জন্য এমার্সনের লেখাতে অপরাপর গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে বটে, অনেক সময়ই অপরের উক্তিও উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সকলই তাঁর নিজস্ব। সচরাচর আমরা যে সকল লোককে পণ্ডিত বলি, এমার্সন সেরূপ পণ্ডিত ছিলেন না ; অথচ পাণ্ডিত্যের উপকরণ সমুদায়ই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি দার্শনিকও ছিলেন না, অথচ দর্শনের অনেক অতি নিগূঢ়াদপিনিগূঢ় তত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এমার্সন ঋষি ছিলেন। ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ, ঋষিগণ মন্ত্র দর্শন করেন। যাঁহারা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিশ্বের মূলতত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারাই ঋষি। এমার্সনও ঋষি, কারণ তিনি তত্ত্বদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। এমার্সনের সুযোগ্য পুত্র এডবার্ড এমার্সনের মুখে শুনিয়াছি যে, এমার্সনকে যে লোকে জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করে, ইহাতে তিনি সম্ভবতঃ কখনই সন্তুষ্ট হইতেন না—The disagreeable word Sage often applied to him would never have pleased him. Seer is certainly a better word. তাঁহার সম্বন্ধে ঋষি শব্দই সমধিক উপযোগী। এমার্সনের পাঠক মাত্রেই তাঁহার পুত্রের এই

উক্তির সমর্থন করিবেন। এমার্সন তর্ক করেন না, বিচারে প্রবৃত্ত হন না, ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞার ন্যায় যুক্তির উপর যুক্তি স্থাপন করিয়া তদুপরি আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান না। তিনি কেবল সত্য দেখেন, এবং যাহা দেখেন তাহার সাক্ষ্য দেন। এইজন্য তিনি যেখানে বাক্‌বিতণ্ডা হইবার আশঙ্কা আছে, এমন স্থলে প্রায়ই আপনার প্রাণের কোনও গভীর অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন না। I do not gladly utter any deep conviction of the soul in any company where I think it will be contested ; no, nor unless I think that it will be welcome." এমন কি সে সত্য যেখানে সাদরে গৃহীত হইবে না মনে করিতেন, সেখানে প্রায় তাহা ব্যক্ত করিতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে, তর্ক যুক্তির দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, তাহাতে সত্যের সত্ত্বাই নষ্ট হইয়া যায়। Truth has already ceased to be itself, if polemically said. মানবাত্মার সত্যলাভের স্বাভাবিকী-শক্তিতে তাঁহার অটল আস্থা ছিল। তিনি বলিয়াছেন,—I believe that each mind, if true to itself, by living forthright, and not importing into it the doubts of other men, dissolve all difficulties, as the Sun at midsummer burns up the clouds. Hence, I think, the aid we can give to each other is only incidental, lateral, sympathetic." অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মাই যদি আপনার প্রতি বিশ্বাসী থাকে, তাহা হইলে, শুদ্ধ জীবন ধারণ করিয়াই, এবং যাহাতে অপর লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাস আপনার ভিতরে বৃথা না আইসে, তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া,—সমুদায় বিঘ্ন বাধা শরৎকালের মেঘের ন্যায়, আকাশে উড়াইয়া দিতে পারে। অতএব আমরা পরস্পরকে যাহা কিছু সাহায্য করিতে পারি, তাহা সমুদায়ই কেবল অবান্তর বিষয়ে মাত্র, তাহা শুদ্ধ সহানুভূতি দ্বারা, তার অধিক নহে। অন্যত্র এমার্সন বলিয়াছেন যে, মানুষ মাত্রেই অনন্ত জীবন ক্ষেত্রে এক সামান্য ভূমি খণ্ড প্রজাস্বত্বে পাইয়াছে। এই সংকীর্ণ প্রাচীরবদ্ধ দেশে, তাহার দৃষ্টি সমক্ষে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহার সাক্ষ্য দান করাই তাহার জীবনের এক মাত্র কার্য্য।

"Vast the realm of being is,
In the waste one lot is his :
Whatever hap befalls
In his vision's narrow walls
He is here to testify."

এমার্সন আপনার আন্তরিক অভিজ্ঞা হইতে সর্ব্বদা কথা কহেন বলিয়া যাঁহাদের তাঁর অনুরূপ কোনও অভিজ্ঞতা আদৌ নাই, তাঁহারা কিছুতেই, কেবল মাত্র অভিধান ও ব্যাকরণের বলে, তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আবার এই জন্যই, যাঁহাদের সেরূপ অভিজ্ঞতা স্বল্প-বিস্তর কিছু আছে, তাঁহারা অন্যদিকে, এমার্সনের রসে একেবারে মজিয়া যান।

জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে এমার্সন এতটাই মূল্যবান বস্তু মনে করিতেন যে, অতি সামান্য ব্যক্তিও যদি আপনার প্রাণের কোনও প্রত্যক্ষ বিষয়ের কথা বলিত, তিনি তাহা সাদরে, সসম্ভ্রমে শ্রবণ করিতেন। আর অন্য দিকে, অতি বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোকও যখন আপনার প্রত্যক্ষের অতীত কথা বলিতেন, এমার্সন তৎপ্রতি কর্ণপাতও করিতেন না। প্রথম জীবনে এমার্সন পৈত্রিক পৌরহিত্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্ম মন্দিরে যাইয়া দশজনকে লইয়া, বাঁধা প্রণালী ধরিয়া, ভগবানের স্তুতি বন্দনা করিতে গেলেই, মাঝে মাঝে প্রণালীর খাতিরে, আপনার সাক্ষাৎ অনুভূতির বাহিরের কথা কহিতে হয় বলিয়া, তিনি ক্রমে ধর্ম্মযাজন পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এমন কি অনেক সময় ধর্ম্মাচার্য্যেরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার অতীত, অলীক সপ্তম স্বর্গের কথা বলেন বলিয়া, শেষে এমার্সন উপাসনালয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। একবার একজন অন্তরঙ্গের নিকটে এমার্সন বলিয়াছিলেন যে, উপাসনালয়ে উপদেশবেদী হইতে সচরাচর যে সকল কথা বলা হয়, তাহা শুনিয়া এমন মনে হয় না যে এসকল উপদেষ্টা জীবনে কখন রোগে কাতর, শোকে ম্রিয়মাণ, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত, ঋণজালে বিজড়িত, বা পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়াছেন। এরা যে মানুষ, মানুষের সুখ দুঃখ, ও রক্ত মাংসের সঙ্গে যে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহাদের সপ্তম স্বর্গের কথা শুনিয়া এরূপ মনে হয় না। এই সকল শূন্যগর্ভ, বাক্যময় উপসনা ও উপদেশাবলীর জ্বালায় এমার্সন ভজনালয়ে যাতায়াত একরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন।

এইজন্য এমার্সন ধর্মের বাহ্যাড়ম্বরকেও বড়ই ঘৃণা করিতেন এবং শূন্যগর্ভ বাক্যের দ্বারা ভগবানের ভজনার বড়ই বিরোধী ছিলেন। এমন কি যখন তখন, যেখানে সেখানে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করাকে তিনি অতি গর্হিত কাজ মনে করিতেন। এই কারণে ধর্ম্ম চঞ্চুকেরা এমার্সনকে একরূপ অবিশ্বাসী বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু এমার্সন যে ভগবদুপাসনার বা পরমেশ্বরের নিকটে আত্ম-নিবেদন করার কর্ত্তব্যে ও উপযোগিতায় বিশ্বাস করিতেন না, তাহা নহে। তবে তাঁহার ভাব এত গভীর, ও তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে সকলে তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিত না। যখনই নিরাশার সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার প্রাণময়ী জ্যোতিঃ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ফুটিয়া উঠে, কিম্বা যখনই জীবনের গভীর সুখ ও আনন্দের সময়ে মন অন্তর্মুখীন হইয়া, আপনার প্রতি আপনি ভাবাবেশে চাহিয়া দেখে, তখনই সত্য ও সহজ প্রার্থনার উদয় হয়. এমার্সন একপ বিশ্বাস করিতেন। ব্রহ্মচক্ষে ব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করাই প্রকৃত প্রার্থনা। জগদীশ্বরের সঙ্গে জগতের সমুদায় কাম্য বস্তুকে সম্ভোগ করাই তাঁহার নিকটে ভগবদ্ভজনার আদর্শ ছিল। এইজন্য সচরাচর লোকে, বিশেষতঃ খৃষ্টীয়ান-মণ্ডলী মধ্যে 'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও' বলিয়া যে যাচঞা করে, এমার্সন তাহাকে আত্মার এক প্রকার রোগ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন যে Men's prayers are a disease of the will. তিনি লিখিয়াছেন,—

In what prayers do men allow themselves! That which they call a holy office is not so much as brave and manly. Prayer looks abroad and asks for some foreign addition to come through some foreign virtue, and loses itself in endless mazes of natural and supernatural, and mediatorial and miraculous. Prayer that craves a particular commodity—anything less than al—good is vicious. Prayer is the contemplation of the facts of life from the highest point of view. It is the soliloquy of a beholding and jubilant soul. It is the spirit of God pronouncing his works good. But prayer as a means to effect a private end is meanness and theft. It supposes dualism and not unity in nature and consciousness. As soon as the man is at one with God he will not beg. He will then see prayer in all action.

অর্থাৎ হায়! হায়! মানুষ সচরাচর কিরূপ প্রার্থনাই না করে। এরূপ প্রার্থনা একটা পবিত্র কর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে শৌর্য্য ও মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নাই। এইরূপ প্রার্থনা বহির্মুখীন; ইহা কোনও বাহিরের শক্তির সাহায্যে কোনও বাহিরের বস্তু লাভ করিতে চায়, তাই অতি প্রাকৃতবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদে জড়িত হইয়া যায়। যে প্রার্থনাতে কোনও একটা বিশেষ ও ব্যক্তিগত বস্তু ভিক্ষা করে, বিশ্ব-মঙ্গল অপেক্ষা কোনও ইতর বস্তু যাচঞা করে, তাহা পাপ মাত্র। জীবনের প্রত্যক্ষ বিষয় ও ঘটনাবলীকে অত্যুচ্চ দৃষ্টিভূমি হইতে পর্য্যবেক্ষণ করাই প্রার্থনা। যে আত্মা জগতে জগদীশ্বরের লীলা দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হয়, প্রার্থনা তাহার স্বগত উক্তি মাত্র। প্রকৃত প্রার্থনাতে স্বয়ং পরমাত্মা জীবাত্মার ভিতর দিয়া আপনার সৃষ্টি দেখিয়া আপনি পরিতৃপ্ত হয়েন। কিন্তু ব্যক্তিগত কোনও উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ যে প্রার্থনা প্রকাশিত হয়, তাহা নীচতা ও চৌর্য্যের সমান। ইহাতে প্রকৃতি জীব ও পরমাত্মার একত্ব না বুঝাইয়া দ্বৈতভাবও বিরোধ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু মানব যখনই পরমেশ্বরের সঙ্গে একাত্মভাব অনুভব করিবে, তখন আর সে যাচঞা করিবে না। তখন সে সকল কার্য্যকেই প্রার্থনারূপে দর্শন করিবে। এইরূপ প্রার্থনার আবশ্যকতা তিনি সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন যে মাতৃস্তন্য ব্যতিত শিশুর জীবন ধারণ করা যেরূপ সহজ ও সম্ভব, প্রার্থনা ব্যতিত আত্মার জীবন ধারণও সেইরূপ সহজও সম্ভব।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি যে তিনি পাঁচ সাত মিনিটের বেশী ভগবৎ-প্রসঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না। পরমেশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ে দু চারি কথা শুনিলেই তাঁহার চিত্তে এমন ভাবোচ্ছ্বাস হইত যে তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাহা বেশীক্ষণ সহ্য করা অসাধ্য হইত। এমার্সনেরও কতকটা সেরূপ ভাব ছিল। তিনি বারম্বার বলিতেন "Do not speak of God much. After very little conversation on the Highest Nature thought deserts us, and we run into formalism. অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে বেশী কথা কহিও না। সেই পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে দু চারি কথা বলার পরেই আমাদের চিন্তার স্রোত বন্ধ হইয়া যায়, এবং আমরা শব্দের শুষ্ক চড়ায় গিয়া ঠেকিয়া যাই।

জড়ে ও জীবে, সর্ব্বত্রই এমার্সনের চক্ষে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইত। তিনি প্রকৃতিতে ব্রহ্ম পূজা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাসস্থান কণ্কর্ড চারিদিকে প্রকৃতির বিবিধ দৃশ্যে পরিবেষ্টিত। তাঁহার বাড়ী হইতে একটু দূরে গেলেই

ছোট ছোট পাহাড় ও বন জঙ্গল পাওয়া যায়। কন্‌কর্ডের পাশ দিয়া একটী অতি সুন্দর তটিনী প্রবাহিত হইতেছে। তার পরপারে বৃক্ষ লতা পূর্ণ মনোরম উপবন। বসন্ত সমাগমে যখন পত্র পুষ্পে ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন বড়ই সুন্দর দৃশ্য হয়। এমার্সন এই তটিনীর তটে তটে প্রায়ই আপন মনে ভ্রমণ করিতেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট পরমেশ্বরের অবগুণ্ঠন মাত্র ছিল। তিনি বলিতেন,—Nature is too thin a screen ; the glory of the One breaks through everywhere অর্থাৎ প্রকৃতি বড়ই সরু পর্দ্দা, তাহার ভিতর দিয়া সর্ব্বত্রই সেই একের প্রভা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এমার্সন বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া কাণ পাতিয়া প্রকৃতির উপদেশ শুনিতেন। এই জন্য তিনি শিক্ষার্থী যুবকদিগকে সর্ব্বদাই এই উপদেশ দিতেন, "শোন—listen, একাকী ভ্রমণ করিবে, এবং অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু শোন তাহা রোজনামচায় সযত্নে লিখিয়া রাখিবে।" আমেরিকার একজন অতি প্রসিদ্ধ সংস্কারক সম্বন্ধে এমার্সন এই কথা বলিতেন যে, তাঁহার প্রধান দোষই তিনি কিছু শুনিতে চান না—that he "would not listen"—not merely in conversation with others, but, what was worse, when alone. এমার্সন প্রকৃতির নিকটেই তাঁহার আপনার উদ্দেশের প্রণালীও শিক্ষা করেন। প্রকৃতি কখনও তর্ক-যুক্তি করে না। প্রকৃতি হয় কোনও তত্ত্ব ইঙ্গিত করে, বা কোনও সত্য ব্যক্ত করে। ইচ্ছা হইলে তুমি এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিতে পার; সাধ্য হইলে তুমি এই সত্য গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু তর্কযুক্তির দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়া কদাপি বিপথগামী হইবে না। বিশেষতঃ তুমি তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ কর বা না কর, তার কথা শোন বা না শোন, প্রকৃতির প্রফুল্লতা ও ধৈর্য্য তাহাতে নষ্ট হয় না, প্রকৃতি চিরদিনই যোগযুক্ত, অটল, অবিচলিত। এই জন্য এমার্সন বলিয়াছেন যে কোনও মানুষ সভাসমিতি হইতে বাহির হইয়া নির্জ্জন প্রকৃতির নিকট গেলেই সে যেন হাসিমুখে তাহাকে বলে—so hot, little man?—এত উষ্মা কেন হে বাপু?—তিনি আরও বলিতেন যে, প্রকৃতি হইতে সর্ব্বদাই নূতন, খাঁটি, জীবন্ত, প্রাণস্পর্শী সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রকৃতিতে যেমন সেইরূপ সাধু ও সরল মানুষেও এমার্সন নিয়ত ভগবদ্দর্শন করিতেন। মানুষ আপনার নিকট আপনি খাঁটি থাকিলেই, আপনার স্বরূপস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকিলেই, তাহার মধ্যে পরমেশ্বরকে দেখা যায়। মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয় বলিয়া, তিনি সর্ব্ব প্রকারের নীচতা, অসরলতা, ও অসারতাতে বড়ই ব্যথিত হইতেন। একস্থলে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, Every where I am hindered of meeting God in my brother, because he has shut his own temple doors, and recites fables merely of his brothers' or his brother's brother's God.

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহীশূরে রাজোদ্বাহ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

৬ই জুন—আজ মহারাজের বিবাহ। গতকল্য মান্দ্রাজের গভর্ণর ভারতের রাজ-প্রতিনিধির প্রতিভূ হইয়া আসিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধির সম্মানে তাঁহাকে সমাদর করা হইয়াছে। মহীশূরের রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার প্রতীক্ষায় আমরা সকলে পূর্ণ 'লেবাসে' (full dress) উপস্থিত থাকিয়া 'স্বাগত' জ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছি। তিনিও আমাদের কর-মর্দ্দন করিয়া নিজের প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আজ আমরা ১১টার সময় 'ধড়া-চূড়া' পড়িয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। আজকার জনতা, আজকার মহীশূর নগরের শোভা—বর্ণনাতীত; আজ যেন অজ রাজার নগর-প্রবেশের চিত্র দেদীপ্যমান দেখিতেছি! রাস্তাঘাটে কেবলই স্ত্রীলোক—অসংখ্য স্ত্রীলোক, স্ত্রী-স্বাধীন প্রদেশে যেন যূঁই, চামেলি, বেলি, গোলাপের ছড়াছড়ি; দাক্ষিণাত্য সুলভ শৃঙ্গারে সজ্জিত নারী মূর্ত্তি—রবি বর্ম্মার চিত্রের আদর্শ—দেখিতে দেখিতে যাইতে ছিলাম। তাহাদের শারীরিক গঠন অতীব সুঠাম—বেণীবন্ধে পুষ্পগুচ্ছ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক; কেবল গণ্ডপ্রদেশে জাফ্রানের রঙ্গীন রেখাটী যেন চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সৌন্দর্য্য নাশ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, এমন সুন্দর দেহকান্তি বঙ্গে সুদুর্লভ। ভয়ানক জনতা ভেদ করিয়া আমরা বিবাহ লগ্নের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। আজকার বন্দোবস্তটী পাকাপাকি—'সরকারী'

অর্থাৎ State; আজ পূর্ণ সম্মানসহ সকলের অভ্যর্থনা—যথোচিত আসনের নির্দ্দেশ। আমরা বিদেশীয় রাজপ্রতিভূগণ মহারাজের বামদিকে দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সমাসীন হইলাম। রাজকর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ পদমর্য্যাদানুসারে আমাদের নিকটে কার্পেটে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু একটা রীতি যেন নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইল। স্বয়ং মহারাজ নগ্নপদ, সকলের জন্যই নিম্নে কার্পেটে আসন; কিন্তু গভর্ণর হইতে সামান্য শ্বেতকায় পর্য্যন্ত চৌকিতে (chair) আসীন। যে কার্পেটে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান হইতে নিম্নতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আসীন, তাহারই উপর কাষ্টাসনে ইংরেজদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছিল। আমাদের চক্ষে ইহা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। এ বন্দোবস্তের ভাব ও উদ্দেশ্য আমরা সহজ জ্ঞানে বুঝিলাম না। রাজকর্ম্মচারিগণ অবশ্যই তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক এরূপ করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে দুর্গস্থ রাজভবন হইতে মহারাজ বরবেশে সুসজ্জিত এবং সুবর্ণ হাওদার উপর সুবর্ণ ছত্রের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া মহাসমারোহে মিছিলসহ 'জগন্মনোমোহন প্রাসাদে' উপস্থিত হইলেন। এখানে কিন্তু একটা ইংরেজী প্রবাদের মর্য্যাদা ভঙ্গ হইল; "All that glitters is not gold" এই প্রবাদটী মহীশূরের তাৎকালীন সমারোহে "All that glittered was gold except diamonds and other precious stones রূপে পরিণত হইয়াছিল। দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ হইতে জগন্মনোমোহন প্রাসাদ অতি অল্প দূরে অবস্থিত, তবুও মিছিলের বাহার, সমারোহ ও গাম্ভীর্য্য যথাযথ পরিরক্ষিত হইয়াছিল। এ বন্দোবস্ত অতীব প্রশংসনীয়। চারিকোণে সোণার হাওদাযুক্ত চারিটী হাতী, তাহার মধ্যে মহারাজের নিজের সোয়ারী হাতী। পদাতি, অশ্বারোহী, রাজচিহ্নধারী বাহকবৃন্দ, পতাকা, ধ্বজা, ডঙ্কা, এই রাজমিছিলে না ছিল কি? মিছিলসহ মহারাজ ধীর পদবিক্ষেপে বিবাহ মণ্ডপের দ্বারদেশে সমাগত হইলেন। সকলেই জয় জয়কার ধ্বনিতে মহারাজাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কন্যাপক্ষ হইতে বনোর রাণা ও মূলীর রাজা মহারাজাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক মণ্ডপে আনয়ন করিলেন। মণ্ডপমধ্যস্থ বেদিকামঞ্চে মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিলে, অন্য সকলে নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইল। মহারাজের আসন গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তোপধ্বনিতে গবর্ণর সাহেবের আগমন বার্ত্তা সূচিত হইল। সুযোগ্য বৃদ্ধ দেওয়ান বাহাদুর ও অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ গবর্ণর সাহেব ও এ রাজ্যের রেসিডেন্টকে দ্বারদেশ হইতে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিবাহ সভায় আনয়ন করিলেন। এখানে কিংখাপের পর্দ্দার অন্তরালে রাজমাতা মহারাণী উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর সাহেব উপযুক্ত 'লেবাসে' G. C. B র 'তথ্‌মা তাবিজ' পরিধান পূর্ব্বক নতশিরে প্রথমে মহারাজ ও পরে অন্তরালস্থ রাজমাতা মহারাণীকে অভিবাদন করত আসন পরিগ্রহ করিয়া অদ্যকার শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান দর্শন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে কন্যা বিবাহ-সভায় আনীতা হইলেন। কন্যা কাঠিওয়ার প্রদেশীয় ভনরাজার দুহিতা। তিনি পরমাসুন্দরী, রত্নাদিতে ভূষিতা, বিবাহবেশে তাঁহার মুখশ্রীতে রাজরাণীর গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রতিভাত হইতে লাগিল। বহুজনতাপূর্ণ সভা মধ্যে, বার বৎসরের কন্যা যেন বরমাল্য হাতে নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্বয়ম্বরে উপস্থিত। চঞ্চলতাশূন্য স্থির দৃষ্টিতে পাত্রী সভাস্থ জনতার দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; আর (পুরোহিত কর্ত্তৃক) অনুদিষ্ট বিবাহপদ্ধতির আনুষ্ঠানিক কার্য্যগুলি যথাযথ সম্পাদন করিতেছিলেন। আজকার রাজোদ্বাহে আমরা সেকালের পৌরাণিক ভাব অনুভব করিতেছিলাম। হোমানলের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ সময়ে নবনারীর প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার পদাভরণ রত্নবনকমলের শিঞ্জনে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতেও ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা সহ মন্থরগতিতে প্রাচীন কবির ছবি যেন ফুটিতেছিল। যখন ভনর বড় জামাতা (ভনর রাণার প্রতিনিধিরূপে) কন্যার সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তখন নব বিবাহিতা রাণী যেন স্বতঃই বুঝিতে পারিলেন, "আমি এখন রাজরাণী, আমার পদোচিত স্থৈর্য্য ও গৌরব রক্ষা করিতে হইবে।" রাণীর নাম প্রতাপকুমারী বাঈ। তাঁহার অদ্যকার এই ভাবে তিনি যেন সেই নামেরই মহিমা ও সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছিলেন। এ দৃশ্যটী আমাদের বড়ই মনোমোহন করিয়াছিল।

বিবাহপদ্ধতি সমস্তই পূর্ব্বোল্লিখিত বিবাহের অনুরূপ, কেবল 'টালী' বন্ধনের সময় রাজসম্মানসূচক ২১ টী তোপধ্বনিতে রাজা ও রাণীর পরিণয়বার্ত্তা জনসাধারণে প্রচারিত

মহীশুর—রাজদম্পতি।

Photo by Author.

KUNTALINE PRESS.

প্রচারিত হইল। এই তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের মহোল্লাসপূর্ণ জয়জয়কার শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল।

বিবাহ পদ্ধতির কার্য্য সমাধা হইলে, গবর্ণর সাহেব যবনিকার সম্মুখীন হইয়া রাজমাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেন :—

'Since H. E. the Viceroy is unable to his regret to be present here today, he has asked me to represent him and to inform your Highness that Her Majesty the Queen Empress of India has been graciously pleased to command that her congratulations should be conveyed to your Highness."

মহারাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া গবর্ণর সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন "The Viceroy also desired me to express felicitation, on this auspicious ceremony and to wish your Highness and your bride a long and happy life. Speaking for myself, I wish to offer Her Highness the Maharani Regent and to your Highness my sincere congratulations on this happy event and I desire to express my earnest hope that this alliance, so auspiciously entered upon, will bring many blessings to your Highness and to your Highness's bride, that it will promote the happiness of your Highness's beloved mother and that it will add to the welfare of this already fortunate and prosperous State."

তখন দেওয়ান সার্, কে, শেষাদ্রি আয়ার্ রাজমাতা মহারাজের পক্ষ হইতে উত্তর দিলেন :—

"Her Highness the Maharani Regent is deeply grateful to Her Majesty the Queen Empress for the gracious message of congratulations which has just now been conveyed to her. Her Highness the Maharani Regent and His Highness the Maharaja join in tendering to H. E. the Viceroy their most hearty thanks for his felicitation on this auspicious ceremony, which has just now been concluded, and Her Highness begs to add that it has been a source of special gratification to her that their Excellencies the Governor of Madras and Lady Havelock have been able to grace with their presence the auspicious event of today."

তৎপর পুষ্পমালা দ্বারা ইংরাজ অতিথিবর্গকে বরণ করা হইল। গবর্ণর ও রেসিডেণ্টসহ অপরাপর ইউরোপীয় অতিথিগণ নতমস্তকে বিবাহসভা ত্যাগ করিলেন। বর-কন্যা—রাজা, রাণীও [illegible] দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতি-নমস্কার জ্ঞাপন করিলেন। আধুনিক প্রথা অনুসারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া করমর্দ্দন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে হয় নাই।

এবার বিবাহের উপঢৌকন বা যৌতুক দিবার পালা। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ, মহারাজের আত্মীয় কুটুম্ব, প্রধান কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ নিজ নিজ যৌতুক মহারাজা ও রাণীর করস্পর্শ করাইয়া আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে মহারাজের পক্ষ হইতে আতর, পান ও পুষ্পমাল্যের প্রতিদান আরম্ভ হইলে, তাঞ্জোরের নানাবিধ নৃত্য দর্শকবৃন্দের চক্ষুর প্রীতিসম্পাদন করিতে লাগিল। যথাসময়ে পুষ্পমাল্য, পান আতর বিতরণকার্য্য সমাপিত হইলে, দূরদেশাগত অতিথিবর্গ, মহারাণী রাজমাতার যবনিকার সম্মুখে অভিবাদনপূর্ব্বক, আপন আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করিলেন। মহারাণীও অতিথিদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নবদম্পতির প্রতি আশীর্ব্বাদ কামনায় অনুরোধ করিলেন। সভাস্থ সকলেই নবদম্পতির শুভকামনা প্রকাশ করিলে, নবদম্পতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে মহারাণীর নিকটে গমন করিলেন। আমরা সভাস্থ সকলে ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া বেলা ১টার সময় স্ব স্ব বাসায় ফিরিলাম।

অপরাহ্ন ৫ টার সময় আমরা নগর পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। তখনও পথে জনতার হ্রাস হয় নাই; নগরের নানাস্থানে বিভিন্নপ্রকার আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের জনতা অত্যধিক। এ দৃশ্য বঙ্গীয় অতিথির চক্ষে নূতন। নাগরদোলার স্থানে, ছায়াবাজীর ঘরে, ভেল্কিবাজীর মজলিসে, ভাঁড়ের সম্মুখে, পুতুলনাচের আসরে, "লটারী" খেলার কুঠরীতে, আশ্চর্য্য সামগ্রীপুঞ্জে সুসজ্জিত দোকানের নিকটে—যেখানে সেখানে স্ত্রীলোকের ভিড়; ক্রীড়া নাই, ব্রীড়া নাই, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় মুখে বস্ত্রাবরণ নাই—যুবতী, কিশোরী ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরই মেলা, এসব আমোদে যেন তাহাদেরই পূর্ণাধিকার। বিচিত্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকদের জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য!

সন্ধ্যার সময় আমরা রাজদরবারে হাজির হইলাম। আজ নবদম্পতি বিবাহ মণ্ডপেই নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিবেন। দাক্ষিণাত্যে একটী সুন্দর নিয়ম প্রচলিত আছে।

যে বয়সেই বিবাহ হউক না কেন, স্বামী-স্ত্রীতে সন্দর্শন বা একত্রবাস আমাদের দেশের ন্যায় ঘটে না। স্ত্রী যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত না হন, সে পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট হইতে পৃথক থাকেন। তৎপরে বর ও কন্যাপক্ষীয়গণ উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বামী স্ত্রীতে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অদ্যকার রাত্রির অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলিকে আমাদের দেশের স্ত্রী আচার বলিলেই হয়; বর ও কন্যা হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর বরকন্যা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ফুল গুচ্ছ নিক্ষেপ ও তজ্জনিত আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ফুলশর নিক্ষেপ ও প্রতিনিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্টতার জন্য উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণের পরস্পরকে গঞ্জনা, নানা বর্ণের চূর্ণ দ্রব্য লইয়া পরস্পরের গণ্ড দেশে প্রক্ষেপ, পুষ্প তাম্বুল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদির আদান প্রদান প্রভৃতি নানা কৌতুক নব দম্পতির মধ্যে চলিতে লাগিল। এখানেও পুরোহিত ঠাকুরের অধিকার, তিনি মন্ত্রপূত করিয়া পুষ্পাদি নব দম্পতির হাতে দিলে পর পরস্পরে আদান প্রদান বা নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টাকাল খেলা ধূলার পর, বর কন্যা দরবারে গম্ভীর ভাবে বসিলেন, নকিব ফুকারিতে লাগিল, দরবার আরম্ভ হইল। রাজ-কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ পদ অনুসারে মহারাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক আসরে উপবেশন করিলেন। আবার সেই তাঞ্জোরের এক ঘেয়ে নাচ চলিতে লাগিল। এইরূপে আরও ঘণ্টা খানেক পরে আতর, পান ও পুষ্পমাল্য বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হইল। মহারাজ ও রাণী অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন।

ইহার পর ক্রমাগত কয়েকরাত্রি নবদম্পতি এই বিবাহ মণ্ডপে প্রকাশ্য দরবারে নানাবিধ স্ত্রীআচার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। একদিন পুষ্পদোলায় তাঁহাদের দুলিবার কথা ছিল; ইংরাজ অতিথিগণ তাহা দেখিবেন। কিন্তু যথাকালে পুষ্পদোলা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হওয়ায়, সে দৃশ্য দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু তাহার সাজ সরঞ্জাম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ব্যাপার খানা যথার্থ ফুলদোলাই বটে।

নৃত্যাদি দর্শন উপলক্ষে রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া আমরা সমবেত অতিথিবর্গ পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলাম। নৃত্যগীত, ভাঁড়ামি, নানা সঙ, ও অন্যান্য তামাসার সঙ্গে সঙ্গে দূরদেশাগত অতিথিগণ পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপনের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। যাহারা পানাভিলাষী তাহাদের জন্য বন্দোবস্তের ত্রুটী ছিল না। যাহাদের তাহাতে অভিরুচি নাই, তাহাদের জন্যও অনুবিধ সাত্বিক বন্দোবস্ত ছিল। অদ্যকার সভায় নর্ত্তকীদের বিরাম নাই—নানা দেশীয় নানা ধরণের গীত বাদ্য ও নৃত্যকলার চরম আদর্শ প্রদর্শিত হইতে লাগিল। নব দম্পতির সংসর্গে বিবাহ সভায় নানাবিধ আমোদে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের মলয়ানিলে বঙ্গের নববসন্তের স্পর্শসুখ যেন এ সময় হঠাৎ উপস্থিত। বঙ্গের প্রবাসীর পক্ষে অদ্যকার রাত্রিটী বিরহোদ্দীপক।

১৩ই জুন পর্য্যন্ত বিবাহ-সংসৃষ্ট অপরাপর অনুষ্ঠান ব্যাপারাদি এবং স্ত্রী আচারগুলি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একই রকমে চলিতে লাগিল। দরবারে নৃত্য গীতাদি পান, আতর ফুলমালা বিতরণ সবই একঘেঁয়ে; প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে দুঘণ্টাকাল প্যাণ্টলুন সহ পদ্মাসনে উপবেশনের কষ্ট অনুভব করিতাম। শেষ দিনে মহারাজ সস্ত্রীক বিবাহের অনুষ্ঠেয় অবশিষ্ট ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন; বিবাহ মণ্ডপের স্তম্ভাদির পূজা, গুরুপূজা, যজ্ঞশেষ আহুতি ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহারাজা ও রাণী দরবারে বসিলেন। এবার আর এক বিরাট ব্যাপার উপস্থিত। সমবেত অতিথিবর্গ ও রাজকর্ম্মচারিগণকে "খেলাত" বা রাজ-উপহার প্রদত্ত হইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অবিরাম খেলাত বর্ষণ ব্যাপার চলিতে লাগিল! বহুমূল্য শাল ও উষ্ণীষ একখানি থালায় করিয়া প্রথমে মহারাজ ও রাণীর হস্তস্পর্শ করান হয়, পরে দরবারের বক্সী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে রাজসম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক খেলাত প্রদান করিতে লাগিলেন। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত এই উপহারের যেন আর বিরাম নাই। ছোট বড় অতিথি, ছোট বড় রাজকর্ম্মচারী, সকলেই যথোপযুক্ত খেলাত পাইলেন। শুনিতে পাইলাম, এই খেলাত বিতরণ ব্যাপারে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নিমন্ত্রিত রাজাদের ও রাজ-প্রতিনিধিদের প্রতিদান স্বরূপ খেলাত ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং মহারাণী পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দান করিয়াছিলেন।

বিবাহের দিন হইতে এক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন

দুবেলা মহারাজ ও রাণী রাজ দরবারে একত্র মিলিত হইয়া নৃত্য গীতাদিতে যোগদান করিতেন এবং শাস্ত্রীয় বিধি ও স্ত্রী আচার ব্যাপার সম্পাদন করিতেন। সপ্তাহান্তে নব-দম্পতি এই কঠিন পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

বিবাহ-সভায় সপ্তাহব্যাপী ক্রিয়াকর্ম্মের সময়, দর্শন ব্যতীত রাজ অন্তঃপুরে নবদম্পতির মিলনের কোন ব্যবস্থা নাই। স্ত্রী বয়স্কা হইলে পর, দ্বিতীয় বিবাহ বা গর্ভাধান বিবাহ কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বামী স্ত্রী একত্র বাস করিবার নিয়ম মহীশূর রাজ্যে প্রচলিত। সে রাজ্যে এই নিয়ম এখন রাজবিধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া ২।১ জন লোক কারাদণ্ডও ভোগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে 'সহবাস আইন' লইয়া যেরূপ তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, এই আদর্শ রাজ্যে তাহা বিধিবৎ ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তটী ভারত সাম্রাজ্যে কম গৌরবের বিষয় নয়!

১৪ই জুন সন্ধ্যার পর বিরাট মিছিলে নব দম্পতির নগর পরিভ্রমণে বাহির হইবার দিন। এই ব্যাপারটীও যেন নাগরিকদিগকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল। যে যে নির্দ্দিষ্ট রাজপথ দিয়া মহারাজের মিছিল যাইবে, সেই সেই মহল্লার লোকগণ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে অতি সুন্দর তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে এক মহল্লার সহিত অন্য মহল্লার যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সেদিন সহরে আলোর বাহার কি অদ্ভুত! বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে মল্লিকার প্রদীপ দিবার প্রথা দেখিলাম না। লাল, নীল, সবুজ নানা রঙ্গের লণ্ঠনে আলো এমন ভাবে সাজাইয়া দিয়াছে, যেন বোধ হয় অট্টালিকার গাত্রে হীরা, চুনি, পান্না গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। এই লণ্ঠন গুলির শোভা দিনের বেলায় কিছুই বুঝা যায় না; কিন্তু রাত্রিতে এই আলোর দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। এখানে আর একটী উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, আমাদের দেশে (বঙ্গদেশে) রাত্রি ও দিনের বেলায় সাজের তারতম্যের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সে জন্য দিবালোকে যাহা সুন্দর দেখায়, রাত্রিতে চন্দ্রালোকে বা প্রদীপালোকে অনেক সময় তাহার বাহার থাকে না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এবিষয়ে খুব পটু, তাহারা চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে নিপুণ। দিনের বেলায় রাজপথের সাজসজ্জা নয়নের তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু সন্ধ্যার পর মিছিলের রোশনাই ও চন্দ্রালোকে উহা কেমন বিচিত্র ও সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। বাস্তবিক এরূপ সাজসজ্জার কার্য্যে দাক্ষিণাত্যের লোক সুনিপুণ। তাহাদের আতস বাজীর নমুনা দেখিয়াও আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

রাত্রি দশটার সময় মিছিল রাজপ্রাসাদ হইতে রওয়ান হইবার কথা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া সকলেরই ম[নে] আশঙ্কা হইল, ঝড় বৃষ্টিতে বা সমস্ত আয়োজন উদ্যো[গ] নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, ভগবানের কি বিচিত্র লীলা ভাগ্যবান্ পুরুষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে কদাচিৎ আকস্মি[ক] বাধা বিঘ্ন দেখা যায়। মহারাজা ও রাণী যেমনই হাতীর উপ[র] উপবিষ্ট হইলেন, অমনি সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া আকা[শ] মেঘমুক্ত হইল; তখন সকলেরই মনে মনে ধারণা হইল, দেবগণ স্বর্গ হইতে শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। মেঘমু[ক্ত] চন্দ্রালোক দেখিয়া সকলেই জয় জয়কার করিতে লাগিল এই মিছিলে না ছিল কি? যিনি ঢাকাতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মিছিল দেখিয়াছেন, তিনি কতকটা ইহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নানা বর্ণের আলোক, অত্যদ্ভুত আত[স] বাজী, নানাবিধ বাদ্য, অসংখ্য সৈনিক পদাতি ও অশ্বারোহী রাজচিহ্ন ও ধ্বজপতাকাধারী অসংখ্য লোকজন সহ মিছি[ল] বাহির হইল। (২৫১ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ) দাক্ষিণাত্যে নর্ত্তকীদের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশীরকম। দলে দলে নর্ত্তকী মিছিলের অগ্রে, মধ্যে ও পশ্চাতে নানা স্থানে সঙ্গে স[ঙ্গে] নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছিল। আলোক-মালা, ধ্বজপতাক[া] তোরণশোভিত মহীশূর নগরী এক অপূর্ব্ব শো[ভা] ধারণ করিয়াছিল! রাজপথে জনতা—কেবলই জনতা—এ[ই] জনতা ভেদ করিয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ইহা ছাড়া দ্বিতল, ত্রিতল দালানের উপর অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের সমাবেশ রাজপথের বিভিন্ন স্থানে মহোল্লাসে উন্মত্ত নাগরিকগ[ণ] নবদম্পতির অভ্যর্থনার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। পাটহস্তীর উপর আরূঢ় রাজা ও রাণী—এ[ক] এক বাড়ীর সম্মুখীন হইলে খৈ, পুষ্প ও মাল্যাদি সুগ[ন্ধি] দ্রব্যের দ্বারা গৃহপতিগণ উভয়কে বরণ করিতেছে। এই রূপে নগরের প্রধান প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া কর্ম্মচারী ও প্রজাসাধারণের উৎসাহপূরণ করত মহারা[জ] ও রাণী মিছিল সহ প্রত্যূষে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন মিছিলের আড়ম্বর দেখিয়া আমরা রাত্রির প্রথম ভাগে স্বীয় আবাসে ফিরিয়াছিলাম। পরদিন অপর সাধারণে[র] অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমরা মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে সারারাত্রি না থাকিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়া ছিলাম।

ইতোমধ্যে একদিন ইংরাজদিগের একটী ভোজ state Dinner হয়—After dinnerএ আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। মহারাজ স্বয়ং Queen's Health পানের প্রস্তাব করেন এবং ইংরাজীতে নিজ স্বাস্থ্য পানকারীদিগকে অভিনন্দিত করেন। ষোড়শ বৎসর বয়স্ক রাজকুমারের এই নাকি প্রথম ইংরাজী বক্তৃতা। তাঁহার সাহস ও ইংরাজী-শব্দোচ্চারণ প্রণালী প্রশংসনীয়।

ইহার পর দুই ঘণ্টা কাল আতস বাজীর তামাসা হয়। মান্দ্রাজী বাজীকরগণ এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। কলিকাতার অনেক বড় বড় ব্যাপারে আতস বাজীর তামাসা দেখিয়াছি, কিন্তু মান্দ্রাজী আতস বাজীর ন্যায় ব্যাপার আর কোথাও দেখি নাই। অগ্নিবৃষ্টি, নানা রকমের ছবি, রামরাবণের ও ইংরাজবুয়রের যুদ্ধ, উপদেশপূর্ণ শ্লোক প্রভৃতি কত বিষয় যে আতস বাজীতে দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

১৬ই জুন আমাদের মহীশূর পরিত্যাগ করিবার দিন। সে দিন রাজমাতা মহারাণী আমাদিগকে "খেলাত" দিলেন। রাজ-অন্তঃপুরের মাঝামাঝি এক স্থানে কিন্‌খাপের পর্দ্দার আড়ালে উপবেশনপূর্ব্বক মহারাণী নানাবিধ সুমিষ্টবাক্যে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। বিশেষ কষ্ট, অসুবিধা ও পথক্লান্তি স্বীকার করিয়া আমরা বিবাহে যোগদান করিয়াছি বলিয়া আমাদিগের ধন্যবাদ করিলেন এবং আমরা যেন কোন প্রকার ত্রুটী গ্রহণ না করি, এই অনুরোধ করিলেন। তিনি কানাড়ি ভাষায় কথা কহিলেন এবং তাহার বড় জামাতা (অথবা সহোদর ভ্রাতা) দোভাষীর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলাম, "আপনি এ উৎসব ব্যাপারে একরূপ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; এ বৃহৎ ব্যাপারে বন্দোবস্তের ত্রুটি হওয়াই সম্ভব ছিল; কিন্তু কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় অতি সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে; কোন অংশে কোন বিষয়ে খুঁত নাই। মানুষ সমালোচন প্রিয়, পরদোষান্বেষী; কিন্তু আমরা চেষ্টা করিয়াও এব্যাপারের কোন প্রকার ত্রুটি বা দোষ ধরিতে পারি নাই—যদি আমাদের মনে কোন দুঃখ থাকে, তবে এই মাত্র এক দুঃখ লইয়া যাইতেছি।" হীরকাঙ্গুরী,—জরির শাল, তাস, কিন্‌খাপ, প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের "খিলাত" লইয়া যখন আমরা গাড়ীতে উঠিলাম, তখন মনে হইল, কেহ বা আমাদিগকে এই সকল জিনিসের ব্যবসায়ী বলিয়া সন্দেহ করে। তৎপরে সেই অল্পসময় মধ্যে যে সকল রাজকর্ম্মচারী ও দূরদেশাগত অতিথির সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য বাহির হইলাম। উপসংহারে এই আদর্শ রাজ্যের কর্ণধার, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবংশীয় স্বনামখ্যাত মন্ত্রী সার্, কে, শেষাদ্রি আইয়ার কে, সি এস্, আই মহোদয়ে

সার্ কে শেষাদ্রি আইয়ার, কে. সি. এস. আই।

সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি সংপ্রতি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চাণক্যসদৃশ রাজনীতিজ্ঞ এই বৃদ্ধ মন্ত্রীপ্রবরের নাম মহীশূর রাজ্যের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত থাকিবে, সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের পারঘাট জিলার একজন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন B. A. B L. ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমে মহীশূর রাজ্যের বিচার বিভাগে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সালে ডিপুটি কমিশনার, পরে প্যালেস্ কন্ট্রোলার, তৎপরে সেসন্ জজের পদে উন্নীত হন। নিজের প্রতিভা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বলে তিনি ক্রমে মহীশূর রাজ্যের কর্ণধাররূপে অধিষ্ঠিত হন। Sir W. W. Hunter তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "A statesman who has given his head to Herbert spencer and his heart to Para Brahma."

ঘটনাবশতঃ কলিকাতা নগরীতে তাঁহার সহিত প্রবন্ধ লেখকের সাক্ষাৎ হয়। এবং সেই সূত্রেই মহারাজের বিবাহোপলক্ষে মহীশূর গমনের সুযোগ হয়। এই উদ্বাহকাণ্ডে তিনি কৃষ্ণ সদৃশ সারথি ছিলেন। একটী ঘড়ীহস্তে তাঁহাকে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য, সামাজিকতায়, আদর অভ্যর্থনায়, ছোট বড় সকল ব্যাপারে ব্যস্ত দেখিতাম। তিনি যেন একটী যন্ত্রের ন্যায় অবিরাম কার্য্য করিতেছেন,—কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি বা বিশ্রাম নাই। ভারতবাসী সময়ের মূল্য জানে না, একলঙ্ক এই বৃদ্ধ মন্ত্রীতে কোন ইংরেজ আরোপ করিতে পারেন নাই।

এই বিরাট ব্যাপারের বন্দোবস্ত এমন পরিপাটী ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল যে, কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলেই একবাক্যে বিবাহ ব্যাপারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতিথিবর্গের জন্য বহ্বাড়ম্বরশূন্য, অথচ এমন সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, সকলেই একবাক্যে তাহারা প্রশংসা করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যবাসীর পক্ষে এরূপ অভিযান তীর্থভ্রমণতুল্য।

শ্রীমহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মা।

আবুল্ ফজল্ *

যে সমস্ত উদার হৃদয় দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ সভাসদ্ মোগল বংশীয় সম্রাটশ্রেষ্ঠ শাহানসা আকবরের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভারতবর্ষে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছিলেন, আবুল ফজল্ তাঁহাদের অন্যতম। মোগল সাম্রাজ্য কালের অনন্ত মহিমায় ধূলিসাৎ হইয়াছে—মোগল রাজধানী নগরী-প্রধানা মহানগরী দিল্লী আপনার অতীতের স্মৃতি লইয়া দর্শক পথিকের নেত্রকোণে অশ্রুবিন্দুর উদ্রেক করিতেছে—উক্ত সাম্রাজ্যের গর্ব্বের আস্পদ বৈদেশিক নৃপতিবৃন্দের বিস্ময়স্থল "তক্ত তাউস্" (ময়ূর-সিংহাসন) এখন বৈদেশিক বণিকের করতলগত—পৃথিবীর মধ্যে স্থাপত্য কীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা তাজমহলের ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া নীল সলিলা যমুনা বিষণ্ণভাবে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া ভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি জাগাইয়া দেয় মাত্র। সে জগদ্বিমোহন সমৃদ্ধি, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অতুল ঐশ্বর্য্যের আর কিছুই নাই। মোগলের সে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বৈজয়ন্তী দিল্লীর প্রাসাদশিখরে আর সগর্ব্বে আন্দোলিত হয় না। সম্রাট আকবরের সে জগৎ প্রসিদ্ধ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" নাম এখন ইতিহাসগত হইয়াছে। কিন্তু আজিও অতীতের যে গৌরব যিনি বিমোহিনী তুলিকায় ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছেন, এ প্রবন্ধে তাঁহারই একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইবে।

আবুল ফজলের পূর্ণ নাম শেখ আবুয়ল ফজল বিন্ মুবারক। নামের শেষাংশের অর্থ মুবারকের পুত্র'। হিন্দু গ্রন্থকারেরা যেরূপ স্বরচিত গ্রন্থের প্রারম্ভে বা উপসংহারে যথারীতি ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়া নিজের বংশাবলীর পরিচয় দিয়া থাকেন, পারস্য গ্রন্থকারদেরও সেরূপ রীতি আছে। তাহা ছাড়া, অনেকে স্বীয় পিতার নামও নিজের নামাংশে যোজনা করিয়া থাকেন। আবুল ফজলও এস্থলে সেই সনাতন প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে নাগুর নামক স্থানে তাঁহার পিতা মুবারকের আদিম নিবাস ছিল। তিনি তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আগ্রায় বাস করেন। সে স্থলের মাদ্রাসায় (মুসলমান বালকদের বিদ্যালয়ে) তিনি বাল্যকালে কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষালাভ করেন। মুসলমানের মধ্যে শিয়া ও সুন্নি, ধর্ম্মের এই দুই প্রধান বিভাগ আছে। তাঁহার জীবনাখ্যায়কেরা বর্ণনা করেন যে, প্রথমে তিনি শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; তাহার পর উক্ত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া শিয়া সম্প্রদায়কে আশ্রয় করেন। কালক্রমে কিন্তু তিনি উভয় সম্প্রদায়েরই মত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে স্বাধীনতাবাদ (Freethinking) অবলম্বন করেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ উদারতা নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। আমরা পরে দেখাইব যে, আবুল ফজলকে এই মতাবলম্বী হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কিরূপ বিপদ গ্রস্ত, এমন কি অবশেষে নিহত হইতে হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, আবুল্ ফজল্ ও ফৈজী পিতার উদার ধর্ম্মমতের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ও আবুল্ ফজলের সংসর্গে ভবিষ্যতে সম্রাট আকবরের মুসলমান ধর্ম্মে নিষ্ঠা বিচলিত হইয়াছিল। আবুল ফজল ও ফৈজী বাহ্যতঃ মুসলমান ধর্ম্মের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলেও অন্তরে স্বাধীনতাবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রায় অনেক ঐতিহাসিকের এই মত যে, আকবরের সহিত পরিচয়ের পর তাঁহাদের সহবাস ও আলাপের ফলে এই ধর্ম্মমত আকবর প্রকাশ্যভাবে অবলম্বন করেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া

* Akbar by Col. Malleson. Indian Statesman Series "Ayeen i Akbari" Translated by H. Beverdige B. C. S. আইনী আকবরী শ্রীযুক্ত জলধর সেন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত।

অনেক মুসলমান আমীর ওমরাহ আবুল ফজলের উপর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হন ও পরিশেষে এই ছল করিয়া আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র, ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট্, সেলিমের উত্তেজনায় তাঁহাকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে নির্ম্মম ঘাতকের অস্ত্রে অকালে নিহত করা হয়।

৯৫৪ হিজিরা অর্থাৎ ১৫৫১ খৃঃর আনুমানিক ১৪ই জানুয়ারী তারিখে আবুল ফজলের জন্ম হয়। আবুল্ ফজলের পিতা সেখ্ মুবারক নিজে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আকবরের চরিতাখ্যায়ক বদৌনি বলেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের এমন অংশ ছিল না যাহা মুবারকের নিকট প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ধর্ম্মমতের উদারতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। মুবারক তাঁহার পুত্র-দিগকে এরূপ সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকল সমাজেই সমাদৃত হইবার যোগ্য গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন্। তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি সুপরিমার্জ্জিত ছিল। তাঁহাদের স্মৃতিও সমধিক তেজস্বিনী ছিল। এই অনন্যসাধারণ ধীশক্তির উপর পিতৃ-প্রদত্ত সুশিক্ষার বীজ, উর্ব্বরক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায়, অতি সুফল প্রদান করিয়াছিল। আবুল ফজল্ বিংশতিবর্ষ বয়সে একপ্রকার অধ্যয়নকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপকের দুরূহ ব্রতে দীক্ষিত হন। আকবরের রাজ্য শাসন কালে বিংশতিতম বর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ তাঁহার সহিত আকবরের প্রথম পরিচয় হয়। তখন আবুলফজলের বয়স ত্রয়োবিংশ বৎসর মাত্র। এত অল্প বয়সে তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চারিদিকে এরূপ ছড়া-ইয়া পড়িয়াছিল যে, গুণগ্রাহী আকবর তাঁহার গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পরিচয় লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান্ তাহার তদানীন্তন জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার পাণ্ডিত্যের কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, একদা ঘটনাক্রমে ইস্পাহানীর একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি আবুল্ ফজলের হস্তগত হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পুঁথির কতকাংশ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় তাহার অক্ষরগুলি এরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার পাঠোদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়া-ছিল। আবুল্ ফজল্ এরূপ দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত হইলেন। তিনি উক্ত পুঁথির দগ্ধিত অংশ ছাটিয়া ছাটিয়া তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নূতন কাগজ যুড়িয়া দিলেন। তাহার পর বারংবার পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহার বিনষ্ট অংশ উদ্ধার করিতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই সময় সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। এই মোগল-কুল-তিলকের অন্তঃপুর মধুপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় তখন নানা দিগ্দেশ আনীতা, সম্ভ্রান্ত রাজকুলোৎপন্ন লোকললামভূতা সুন্দরীগণের বলয়শিঞ্জন ও মধুর নূপুরনিক্বণে মুখরিত ও তাঁহার ইতিহাস-খ্যাত রাজসভা নানদেশীয় পণ্ডিতবর্গের সমাবেশে সমলঙ্কৃত ছিল। আকবর একদিকে যেমন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, অন্যদিকে সেইরূপ অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কি কবি, কি ধর্ম্মোপদেষ্টা, কি দার্শনিক, কি ঐতিহাসিক, কি চিত্রকর কি সঙ্গীত কলাকুশল সকলেই তাঁহার নিকট সমুচিত সমাদর পাইত। ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগের পর ভারতবর্ষে সাহিত্যকলা, চিত্রকার্য্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতির এতদূর উন্নতি আর অন্য কোন সময়েই হয় নাই। এবিষয়ে তাঁহার রাজসভা বিক্রমের নবরত্ন সভার বা আকবরের সমসাময়িক ইংলণ্ডের "কুমারী রাজ্ঞীর" সভা, ফ্রান্সের অধিপতি ষোড়শ লুইর বা স্পেনাধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের রাজসভার সহিত তুলনীয়। আবুল্ ফজলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুকবি ফৈজী আকবরের রাজ্যশাসনের দ্বাদশ বর্ষে, যখন সংগ্রামের শিবির চিতোরে স্থাপিত হয়, সে সময় আকবর কর্ত্তৃক শিবিরে সমাহূত হন। কথিত আছে যে, ফৈজী সংস্কৃতে বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন ও তিনি প্রায় ১০১ খানি স্বরচিত পুস্তক রাখিয়া যান। বলা বাহুল্য যে তাহার অনেকগুলিই বর্ত্তমানকালে বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পুস্তকাগারে ৪৩০০ খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি ছিল।

প্রথমে আবুল ফজল্ আকবরের সভায় পরিচিত হইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অগ্রজ ফৈজী সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। ইচ্ছা করিলেই ফৈজী বা তৎপরিচিত অন্য কোন আমীর ওমরাহ অক্লেশে তাঁহাকে আকবরের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা স্বাভাবিক বিনয় বশতঃ লোকের নিকট সম্মান পাইবার জন্য প্রায়ই উন্মুখ থাকেন না। কারণ একদিন না একদিন লোকসমাজে তাঁহাদের সম্মান অবশ্য-ম্ভাবী—তাঁহাদের হৃদয়ে এ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল থাকে। কিন্তু আকবর যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে নিজ দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, তখন তিনি বাদশাহের সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য, পরিচয় হইবার পর গুণগ্রাহী আকবর তাঁহাকে সেনাবিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে কাল-সহকারে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার সদ্গুণের যথার্থ সমাদর করেন। এই পদে তিনি প্রায় ২৮ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় অবধি সম্রাট্ তাঁহার অশেষ গুণগ্রাম ও বিদ্যাবত্তায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত যে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহা আবুল ফজলের মৃত্যু পর্য্যন্ত অটুট ছিল। আকবরের জীবনীলেখক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "পরিচয় অবধি আকবরের রাজসভা তিনি সমলঙ্কৃত করেন। সম্রাটের ও তাঁহার মধ্যে পরস্পরের চরিত্রে শ্রদ্ধা ও পরস্পরের কার্য্যে সহানুভূতি সমুত্থিত যে বিশুদ্ধ সখ্যভাবের বীজ পরস্পরের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল উহা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের সার উপাদানস্বরূপ। সম্রাট আকবর আবুলফজলের একজন প্রধান প্রতিভাশালী শিষ্য হইয়াছিলেন। মৃগয়ার উৎকট আনন্দ, সাম্রাজ্য শাসনের গভীর উৎকণ্ঠা ও যুদ্ধের বিপুল শ্রমাবসানেও তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিতে উৎসুক ছিলেন। আকবর একজন ধর্ম্মজ্ঞ মুসলমান ছিলেন; মোল্লা ও মৌলানাদের (শ্রুতি ও স্মৃতিজ্ঞ পণ্ডিতদের) তর্ক-সংগ্রাম শুনিবার অপেক্ষা সম্রাটের অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর আমোদ ছিল না।" *

বহু বৎসর সম্রাট কর্ত্তৃক এরূপ সম্মানিত হইয়া আবুলফজল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এ সৌভাগ্য আকবরের অনেক মাৎসর্য্যপরায়ণ সভাসদের চক্ষুশূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ এক বিষয়ের জন্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট তিনি বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পিতার নিকট আবুল্ ফজল যে উদার ধর্ম্মমত শিক্ষা করিয়াছিলেন, সাহচর্য্য ও আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে আকবর সেই ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী হন। তাহার উপর আবার সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা আসিয়া তাঁহার সভা সমলঙ্কৃত করিতেন, সুতরাং সকল ধর্ম্মের সার মর্ম্ম তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। তাঁহার উদার পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে ধর্ম্মান্ধতার সম্মান ছিল না, যুক্তি ও ন্যায়েরই সমধিক সম্মান ছিল। কালে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সারভাগ সঙ্কলন করিয়া তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। তিনিই তাহার প্রণেতা ও তিনিই তাহার প্রচারক (Prophet) ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে জগৎস্রষ্টার জ্যোতির প্রতিবিম্বস্বরূপ লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষু প্রভাকরকে তিনি প্রকাশ্যভাবে উপাসনা করিতেন। সূর্য্যকান্ত মণি দ্বারা কার্পাসে অগ্নিসংগ্রহ করিতেন, অগ্নিহোত্রীদের মত সে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালাইয়া রাখা হইত। কর্পূর ধূপ অগুরু গুগগুলে হোম করিয়া, তিনি ললাটে টীকা ধারণ করিতেন। তাঁহার রাজপুত

* Akbar, by Col. Malleson (Rulers of India Series P. 152.

ঠাকুরদের সম্মান করিয়া দেব দেবীর অর্চনা করিতেন। একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপবাস করিতেন। অনেক তিথিতে তিনি নিরামিষ ভোজন করিতেন। তিনি নিজে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন না। প্রকাশ্য স্থানে গো বধ করিলে প্রজাদের বিশেষরূপে দণ্ডিত হইতে হইত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, অনেককে তিনি মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন। এমন কি নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া তাঁহার ধারণা হওয়ায় লোকে দেবতার মত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তাহাতে তিনি আপত্তি করিতেন না। ঈশ্বর ও ঈশ্বর-প্রেরিত ('রসুলো খোদা') মহম্মদ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা-পদ্ধতি যে ধর্মে নাই, সে ধর্মাবলম্বীদের নিকট ধর্মমতের এরূপ স্বেচ্ছাচার একেবারে অমার্জ্জনীয়। তাহার উপর আকবর মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে কোনও বিশেষ প্রভেদ করিতেন না। কি খ্রীষ্টান, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কাহারও তিনি অসম্মান করিতেন না। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে ও নীতিতে পণ্ডিত মোল্লা মৌলানাদের, হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসীদের বা বৌদ্ধ শ্রমণদিগের তাঁহার নিকট সমান আদর ছিল। আবুল ফজল স্বীয় গ্রন্থে অনেক স্থলে এরূপ য়িহুদী রাবিদের (Rabbis) ও খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় তর্কের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার অনেক সভাসদ্ গোঁড়া মুসলমানেরা প্রকাশ্যে না হউক, অন্তরে—এ ধর্ম্মের উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল ও তাহাদের ধারণায় আকবরের এরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতার যাহারা প্রধান কারণ হইয়াছিল, তাহাদের উপর তাহারা মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল। তিনি যে উদার অপক্ষপাত রাজনীতিক ভিত্তিতে মোগল সাম্রাজ্য অক্ষয় করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই অদূরদর্শীদের নিকট অজ্ঞেয় ছিল। আকবরের জীবনচরিত লেখকদের মধ্যে বদৌনি বড় ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। আকবরের কোন রাজনীতিক বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বদৌনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেন যে সম্রাট্ এমন স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কতক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সম্রাট্ ভাবিতেন যে, "যদি সর্ব্বত্র এরূপ যথার্থ জ্ঞান সুপ্রাপ্য হয়, তবে যে ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সহস্রবৎসরের অধিক পুরাতন নহে, সেই ইস্লাম ধর্ম্মে সমগ্র সত্য নিহিত থাকা কি প্রকারে সম্ভব? তাহা হইলে কেনই বা এক সম্প্রদায় যে বিষয় স্বীকার করে, অপর সম্প্রদায় তাহা অগ্রাহ্য করে—কেনই বা সম্প্রদায় বিশেষ শ্রেষ্ঠতার ভাণ করে—যখন কোথা হইতে সে শ্রেষ্ঠতা তাহাকে প্রদত্ত হয় নাই।"* বিবেক ও যুক্তির নিকট এরূপ বাক্য অমৃতময় হইলেও, ধর্ম্মান্ধতা এমতকে দূরে পরিহার করে।

সম্রাট্ আকবরের সভায় যে সভাসদেরা আবুলফজলের ও তাঁহার আত্মীয়দের প্রধান বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান মখ্দুম-উল্-মুল্ক ও শেখ্ আবদুন্নবি। ইঁহারা সুন্নিসম্প্রদায়ের নেতা ও এতাবৎকাল রাজ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহাদের অত্যধিক অহমিকা ও অসহ্য ধর্ম্মান্ধতায় এক অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে আকবর কৃতসংকল্প হন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারীর আদেশে রাজ্যে সিয়া সম্প্রদায়ের ও "অন্যান্য বিধর্ম্মীদের" যে উৎপীড়ন হইয়াছিল,—তাঁহার বিচারে যে কয়টী লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, তাহাতে সুদূরদর্শী সম্রাটের মর্ম্ম ব্যথিত হইয়াছিল। সেইজন্যই তিনি এই অন্যায় ধর্ম্মান্ধতার মুলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বিহার হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে তাঁহার ইতিহাস-প্রথিত সান্ধ্য-তর্ক-সভা আবাহন করিতে লাগিলেন। এ সভায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কূটার্থ মীমাংসার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন যে, ফতেপুর শিক্রির নির্জ্জন উপাসনে বসিয়া তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাদের মূল্য বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম বা জাতির বিষয়ে নিরপেক্ষ ও সাম্যজনীন উদারতার ভিত্তির উপর নিহিত রাজ্যশাসনের মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; উক্ত সভাহ্বানের তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল। আকবর বলিতেন যে, তাঁহার যে সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়ক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তাহার সুমীমাংসা এ সভায় হইবে: আকবরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নহে, উহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এখানে সংক্ষেপে এ কথা বলা আবশ্যক যে, এ সভায় সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে গুরুতর বিষয়, এমন কি মহম্মদের চরিত্র পর্য্যন্ত অনালোচিত রহিত না। সম্রাট্ আবুলফজলকেই স্বপক্ষের নেতা ও মধ্যস্থ স্থির করিয়াছিলেন। চতুর আবুলফজলও ধর্ম্মমতের বিভিন্ন তর্কগুলি একে একে উপস্থাপন করিয়া তর্কবহ্নি প্রধূমিত রাখিয়াছিলেন। ইহার পর এই সুপণ্ডিত ও তদধিক সুচতুর রাজমন্ত্রী একটী প্রস্তাব করেন, তাহাতে সম্রাটের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি একদিন এই সমিতিতে প্রস্তাব করিলেন যে, রাজা যখন, সমস্ত পার্থিব বিষয়ের অধিনেতা তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাসনভারই বা তাঁহাকে না দেওয়া হয় কেন? ব্লক্‌ম্যান্ বলেন যে, এরূপ প্রস্তাবের অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের ও বিশ্বাসের মুলোচ্ছেদকারী কথা আর দ্বিতীয় নাই। কারণ উক্ত ধর্ম্মের অনুশাসন উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই শিরোধার্য্য। কেহ ইহার অতিক্রম বা সমালোচনা করিতে পারেন না। ধর্ম্ম কিছুতেই রাজার শাসনের অধীন নহে, রাজাই সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মানুশাসনের অধীন। কারণ তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নহেন, রক্ষয়িতা ও পালয়িতা মাত্র। আলাউদ্দীন খিলিজি প্রভৃতি নৃপতিরা কখনও কখনও প্রয়োজন মত কোরাণের অনুশাসনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কখনই তাঁহারা ধর্ম্মকে এরূপ অনুশাসন হইতে বিচ্ছিন্ন বা মোল্লাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সুতরাং যখন চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৭৮ খৃঃ (৯৮৬ রজবে) আবুল ফজল পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবটী বৃহস্পতিবারের সমিতিতে উপস্থিত করেন, তখন তুমুল প্রতিবাদের প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়াছিল। এতাবৎকাল মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের জীবনের কোন অংশের বিচার বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতামত লইয়া আলোচনা হইত, এখন হইতে উক্ত ধর্ম্মের মূলনিহিত সত্যের বিচার হইতে লাগিল। যে সুন্নিসম্প্রদায় এপর্য্যন্ত রাজ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রধানপদ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন যে, বিগত চারিবৎসরে ইস্লাম ধর্ম্মের সুদৃঢ় ও সুপ্রোথিত ভিত্তি কিরূপ ক্ষয়িতমূল হইয়াছে। কর্ণেল্ ম্যালিসন্ বলেন, আকবরের তদানীন্তন ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বদৌনির গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার তখনকার মানসিক অবস্থা কতক জানা যাইতে পারে। তাহাতে সম্রাটের ধর্ম্মমতের সার্ব্বভৌম উদারতার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, ইহার পর আবুলফজল, তাঁহার অগ্রজ ফৈজী ও তাঁহাদের পিতা সেখ্ মুবারক তিনজনে মিলিয়া একখানি পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিলেন, তাহাতে আকবরকে 'মুজ্‌তাহিদ্' অর্থাৎ ইস্লাম ধর্ম্ম বিষয়ে অভ্রান্ত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে ব্যবহারবিদ্ বা পণ্ডিতেরা এমনকি পূর্ব্বোক্ত মকদম্-উল মুল্ক্ ও আবদুন্নবি পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আকবরের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে অঙ্গীকার করি-

* If some true knowledge were thus everywhere to be found why should truth be confined to one religion or to a creed like Islam, which is compratively new and scarcely a thousand years old; why should one sect assert which another denies, and why should one claim a preference without having superiorty conferred upon itself?" Badoun's words quoted in Col. Malleson's book P. 149.

লেন। আবুল ফজল, আকবর নামায় লিখিয়াছেন যে, ইহাতে দেশ দেশান্তরের ও ধর্ম্মান্তরের লোকেরা সম্রাটের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও শান্তি রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছিল ও দুর্জ্জন নীচাশয়গণ সম্রাটের উদার উচ্চাভিলাষ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া আর মুখ তুলিতে পারে নাই। ইহার পর বৎসরে সেখ আবদুন্নবি ও মখদম্ উল মুল্ক মহাশয়েরা মক্কা যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন মুবারক ও তাঁহার পুত্রদ্বয় নিষ্কণ্টক হইলেন। অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান্ তাঁহার আইন-ই-আক্‌বরীর উৎকৃষ্ট অনুবাদের উপক্রমণিকায় আবুল ফজলের যেএকটা বহুগ্রন্থ-সংগ্রহীত অমূল্য জীবনী দিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে—আবুলফজলের হৃদয়ের উদারতার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, উক্ত দুই ব্যক্তি তাঁহাদের সমাক্ ক্ষতি, এমন কি, তাঁহার পিতার জীবন পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন করিয়াছিল; তথাপি আবুলফজল্ ইঁহাদের বিরুদ্ধে একটীও গ্লানিকর কথা স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন নাই।

১৫৭৯ খৃঃ এই ধর্ম্মকলহ ও তর্কসংগ্রামের এক প্রকার অবসান হইয়াছিল। অতঃপর আবুলফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজীর সহিত সম্রাটের সখ্যতা দৃঢ়তর হয়। ফৈজীকে তিনি যুবরাজের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে কাল্পি, আগ্রা ও কলিঞ্জরের 'সদর' (অর্থাৎ একপ্রকার শাসনকর্ত্তা) ও চারশতী মনসব্দার পদে নিযুক্ত করিয়া নিজ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ফৈজী পার্থিব সম্মান অপেক্ষা সম্রাটের অমূল্য বন্ধুত্বই অধিকতর শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহার অনুজের সমধিক সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃঃ প্রারম্ভেই সম্রাট আবুলফজলকে এক হাজারী মনসব্দার ও দিল্লী প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ইহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃঃ আবুলফজলের মাতার মৃত্যু হয়। "আকবর নামা" পাঠকের নিকট অবিদিত নাই যে, তিনি জননীর স্মৃতিতে গ্রন্থের কয়েকপৃষ্ঠা ব্যয় করিয়াছেন—ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কিরূপ চরিত্রবান্ মনীষাসম্পন্ন পিতামাতার ঔরসে জন্মিয়াছিলেন। আকবর, সান্ত্বনার নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে যে কথায় সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই যোগ্য হইয়াছিল। সম্রাট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"যদি এ পৃথিবীর লোক চিরকাল অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিত,তবে হিতৈষী বন্ধুরা কখন তাহাদের শোকক্লিষ্ট অন্তঃকরণকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে উপদেশ দিবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু পৃথিবীর এই পান্থনিবাসে কেহই দীর্ঘ প্রবাসী নহে, সুতরাং শোককাতর ব্যক্তিরা এ সান্ত্বনায় শান্ত হইয়া ভালই করে।"

ইহার পর সম্রাটের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রাজ্যে ইসলাম্ ধর্ম্মমতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে; তবে এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে—এই ধর্ম্মবিপ্লবের জন্য অপর পক্ষীয়েরা আবুলফজলকে প্রধান দোষী স্থির করিয়া তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল ও যতঃপরতঃ তাঁহার যাহাতে অনিষ্ট হয় সে চেষ্টায় রহিল। এমন কি যুবরাজ সেলিমও এই দলভুক্ত ছিলেন। যাহাতে যুদ্ধে অপারগতা বা রাজ্যশাসনে অপটুতানিবন্ধন আবুল ফজল সম্রাটের অপ্রিয় হন, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিতে, সম্রাটকে সুযোগ পাইলেই অনুরোধ করিতেন। সেলিম একদিন অতর্কিতভাবে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি লেখককে কোরাণের ভাষ্য নকল করিতে প্রবৃত্ত দেখিলেন। তখন বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে একেবারে সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলেন ও বলিলেন যে, আবুলফজল আমাদের এক রকম শিক্ষা দেন ও নিজে অন্যপ্রকার আচরণ করেন। এই ঘটনায় সম্রাট ও তাঁহার প্রিয় সদস্যের মধ্যে কিছুদিনের জন্য মনোমালিন্য হয়।

এ সময়ে সম্রাটের আদেশে ও প্রধানতঃ আবুল ফজলের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়। আরবী গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখে এ প্রসঙ্গ নীরস হইবে বলিয়া তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থগুলির নাম করা প্রয়োজন। আবুলফজল, ফৈজী, ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত বদোনি, শেখ সুলতান, হজি ইব্রাহিম, শেখ মুনাব্বর প্রভৃতি বিদ্বদ্বর্গের চেষ্টায় অনেক ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক মূল সংস্কৃত বা হিন্দী হইতে,পার্সীতে অনূদিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ফৈজী প্রাচীন সংস্কৃত গণিত গ্রন্থ লীলাবতী পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবুলফজল স্বয়ং মহাভারতের কতকাংশের অনুবাদের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় ও অন্যান্য লেখকের সাহায্যে 'তারিখি আল্ফি'* অর্থাৎ 'সহস্র বৎসরের ইতিহাস' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম একটী জীবন্ত প্রচলিত ধর্ম্মরূপে গণ্য না হইয়া উহা বিগত যুগের ইতিহাসগত ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

১৫৯২ খৃঃ প্রারম্ভে আবুলফজল দুই হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ সময় হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ ওম্‌রাহদের (উম্‌রা-ঈ-কিবার) সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। এ সময়েই তাঁহার অগ্রজ দাক্ষিণাত্যে বরহ্‌ন্-উল-মুল্কের নিকট ও খান্দেশ সুলতান সেলিমের শ্বশুর আলিখাঁর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নব ধর্ম্মের পাণ্ডুলিপি রচনার পর, শেখ মুবারক প্রায় সকল পার্থিব কার্য্যকলাপ হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর বৎসর লাহোরে নবতিবৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় (৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৫৯৩ খৃঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি শক্তি অবিকৃত ছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কোরাণের যে বৃহৎ টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের আভাষ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আকবর্ সাহের সভায়, সেই 'অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ' সময়েও তাঁহার মত পণ্ডিত অতি অল্প ছিল। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক্ অধিকারী হইয়াছিলেন। পারস্য ও আরবী ভাষায়, ছন্দঃ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে, দর্শন বিজ্ঞানে, কোরাণ পড়িবার প্রণালী সূচক 'তাজবিদ্' শাস্ত্রে, বহু প্রকারে কোরাণ আবৃত্তি করিবার জ্ঞানে তাঁহার মত লোক দুষ্প্রাপ্য ছিল, এ কথা তাঁহার বংশের পরম শত্রু বদোনিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার ও তদীয় পুত্রদের সম্বন্ধে কোন কুৎসা রটনা করিতে না পারিয়া বদোনি কেবল তাঁহাদের মহম্মদীয় শাস্ত্রে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে অনেক গালি দিয়াছেন। এমন কি উভয়কে নাস্তিকতার জন্য জাহান্নমে প্রেরণ ও আবুল ফজলকে ভ্রাতৃ-বিদ্বেষী হুসেনভ্রাতা ঈয়াজিদের সহিত তুলনা করিতেও ছাড়েন নাই। বেচারা বদোনি বাদশাহের অনুগ্রহে কেবল দুইহাজার বিঘা নিষ্কর ভূমি পাইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু তাঁহার সহাধ্যায়ী আবুল্ ফজল্ শুধু দুহাজারি মনসব্দারের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এমন নহে—আকবরের পরমবন্ধুর মধ্যে পরিগণিতও হইয়াছিলেন। উভয়ের পার্থিব অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে বদোনির মত লোকের হিংসায় যথেষ্ট কারণ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

মুবারকের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে ফৈজীর মৃত্যু হয়। ফৈজিকে সম্রাট এত ভাল বাসিতেন যে, কথিত আছে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট স্বয়ং গভীর রাত্রে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। অভাগা কবির তখন এমন বাক্‌শক্তি ছিল না যে, তিনি বাক্যোচ্চারণ করিয়াও সম্রাটকে অভিবাদন করিতে পারেন। আকবর তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, "শেখজিউ, আমি আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ হাকিম আনিয়াছি—আপনি

* এ গ্রন্থের অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমান লেখকের "ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে (ভারতী, মাঘ, ১৩০৭) দ্রষ্টব্য।

আমার সহিত কোন কথা কহিতেছেন না কেন?" তথাপিও তাঁহার নিকট কোন উত্তর না পাওয়াতে সম্রাট এতদূর শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় উষ্ণীষ ভূতলে ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে আবুলফজলকে অনেক প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। আবুলফজল ভ্রাতৃস্নেহের অনেক অমূল্য নিদর্শন স্বীয় গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন। "আকবর নামা," ও "আইন ঈ-আক্‌বরী" উভয় গ্রন্থেই তিনি ফৈজীর অনেক কবিতাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জ্যেষ্ঠের তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাসমূহ "মার্কিজ্ উল-আদ্‌ব্‌র্" নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

প্রায় এ সময়েই তিনি দুই হাজার পাঁচশতী মনসবদার নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম যাইতে হইয়াছিল। যুবরাজ মুরাদ দাক্ষিণাত্যে নিজের অত্যধিক পানাসক্তিদোষে এক বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছিলেন—তাঁহার আগমন অবধি তত্রত্য শাসনকার্য্য কোন প্রকারেই অগ্রসর হয় নাই। খাঁ খানান্ অর্থাৎ বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জ্জা আবদুর রহিম তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। মুরাদের অত্যধিক পানাসক্তিতে আকবর ভীত হইয়া আবুল ফজলকে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, যদি বিজিত রাজ্য রক্ষা করিতে সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষেরা সমর্থ হয়, তবে পানোন্মত্ত মুরাদকে লইয়া আবুল ফজল ফিরিয়া আসিবেন। কারণ মুরাদ নিজে পানাসক্ত—অতএব অকর্ম্মণ্য ছিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা উৎকোচগ্রাহী ও বিদ্রোহী পক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রকারী এবং স্বয়ং খাঁ খানানও তাঁহার একান্ত অবিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং আবুল ফজলের অভীষ্ট শীঘ্রই যে সিদ্ধ হইবার কথা, তাহাতে বিচিত্র কি? আবুল ফজল যখন বহারাণ্‌পুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন খান্দেশাধিপতি বাহাদুর খাঁ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, বাহাদুর খাঁর ভ্রাতার সহিত আবুল ফজলের ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া আবুল ফজলকে সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতে নিরস্ত করিবেন। কিন্তু আবুল ফজল বিরক্তি সহকারে উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে রাজ কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। সম্রাটের বন্ধুত্বে তাঁহার অন্য কাহারও নিকট পারিতোষিক গ্রহণের অভিলাষ তিরোহিত হইয়াছে।

এদিকে যুবরাজ মুরাদও আহ্মদনগর হইতে এলিচপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্র মির্জ্জা রোস্তামের মৃত্যু হওয়াতে অত্যন্ত শোককাতর ও কঠিন বিকার রোগগ্রস্ত হইয়াও তিনি পানদোষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। আবুল ফজল তাঁহাকে সম্রাটের নিকট লইয়া যাইবেন জানিয়া তিনি আহ্মদনগরে ফিরিয়া আসিলেন; দৌলতাবাদ হইতে ষোল ক্রোশ দূরে পূর্ণা নদীতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। যখন আবুল ফজল্ যুবরাজের শিবিরে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন শিবিরে অতি বিশৃঙ্খলা ছিল। যুবরাজের মৃত্যুতে সৈন্যদল ভগ্নোৎসাহ ও সেনাধ্যক্ষেরা পলায়নপর হইয়াছিল। বিদ্রোহীর রাজ্যে, বিপক্ষের সৈন্য মধ্যে পলায়ন করা যে কতদূর বিপজ্জনক তাহা বুঝাইয়া দিয়া আবুল ফজল এই ভগ্নোদ্যম সেনানীগণকে অনেক কষ্টে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন; তিনি বিজিত নগর সমূহের রক্ষার্থ সেনা রাখিয়া অত্যল্পদিনের মধ্যে নাসিক ব্যতীত বৈহালাৎ, সাটুওা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সম্রাটের অধীনতায় স্বামীর জায়গীরস্বরূপ লইয়া আহ্মদনগরের দুর্গ ছাড়িয়া দিবেন, তিনি চাঁদ বিবির সহিত এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

আকবর তখন উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন। যুবরাজ দানিয়েল্‌কে সম্মান দেখাইতে অস্বীকার করায় বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার আরও সঙ্কট সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সম্রাট স্বয়ং বাহাদুরখাঁর আসীর দুর্গ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং সুলতান দানিয়েলকে আহ্মদনগরের যুদ্ধ কার্য্যের শাসন-ভার দিলেন। উপযুক্ত লোক রাখিয়া সম্রাটের অনুমতিক্রমে আবুল ফজল বিজাপুরের সমীপবর্ত্তী খেড়গাঁও নামক স্থানে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আকবর সেই সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে এই কবিতাটির দ্বারা সম্ভাষণ করেন :—

ফরখুন্দা শবে বায়দো খুশ্ মাহাতাবে।
তা বাতো হে কায়দ্ কুনম্ অজ্ হর্ বাবে॥

রজনী মনোহারিণী, সুন্দর জ্যোৎস্না-শালিনী—(এরূপ রজনীতে) তোমার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহাকে সম্রাট চার হাজারী মনসবদারের উচ্চপদে উন্নীত করিয়া দিলেন। ইহার পর বাহাদুরখাঁর রাজ্যান্তর্গত মালহি দুর্গ ও আসীর দুর্গ বিজয়ে তিনি যে যোদ্ধৃত্ব দেখাইয়াছিলেন বা দাক্ষিণাত্যে রাজু মান্নার বিদ্রোহ লইয়া যে গোলযোগ বাধে, সেই বিদ্রোহদমনে যে দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এস্থানে উল্লেখমাত্র করিলাম। আমরা এক্ষণে নীচ পাপাশয় লোকের দুঃ চক্রান্তে তাহার শোকপূর্ণ হত্যাকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই দী প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাহার ধর্ম্মমতের জন আক্‌বরের রাজ সভাসদ অনেকেই, এমন কি যুবরাজ সেলিম পর্য্যন্ত তাঁহার উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। সম্রাটের—অনুকম্পায় এতদিন তিনি যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সম্রাটের নিকট তাঁহার যে সম্ভ্রম ও প্রতিপ ছিল, তজ্জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও যুবরাজ এপর্য্যন্ত তাঁহার কোনও অনি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার চিরপোষিত হিংসাবৃত্তির পরিতর্পণের যোগ্য অবসর মিলিল। আসীর্ দুর্গের আক্রমণের সময়ে যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহী উদয়পুরের রাণাকে দমন করিতে প্রেরিত হন। তাঁহাকে দমন করা দূরে থাক, তিনি নিজেই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। যদিও বরহান্‌পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পিতাপুত্রে পুনর্মিলন হইয়াছিল, তথাপি আবার সপ্তচত্বারিংশৎবয়স্ক প্রৌঢ় সেলিম পিতৃবিদ্রোহী হন। সম্রাটের অনেক আমীর ওম্‌রাহ ভিতরে ভিতরে সেলিমকে সহানুভূতি করাতে সম্রাট তাহার একমাত্র বিশ্বস্ত ভৃত্য আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে অনুমতি করেন। সুতরাং তিনি পুত্র আবদুর্ রহমন্‌কে বিজিত নগর রক্ষাদির ভার দিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে আগ্রাভিমুখে রওনা হন। এই সুযোগে সেলিম্, বুন্দেলা জাতির রাজা উরছা অধিপতি রাজা বীর সিংহকে আবুল ফজলকে নিধন করিতে উৎসাহিত করেন। নানা কারণে বীরসিংহের মোগল দরবারে প্রতিপত্তি ছিলনা, তিনি সম্রাটের রোষ নয়নে পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের ভাবী সম্রাটের এ আদেশ বীরসিংহ অমান্য করিতে সাহস করিলেন না। আবুল ফজলের আগ্রা ফিরিবার পথে নারওয়ার নামক স্থানে বীরসিংহ নিজের সৈন্যসহ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী হইলে আবুল ফজলকে সেলিমের এই নীচ কাপুরুষোচিত অভিসন্ধির কথা বলা হইল। কিন্তু তিনি বীর ভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে—"চোর ও দস্যুদের ভয়ের জন্য তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বন্ধ রাখিতে পারেন না।" এই বলিয়া তিনি নারওয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে ছয়ক্রোশ দূরে সরাইবার নামক স্থানে বীরসিংহের সৈন্য দৃষ্ট হইল। তখনও ফিরিলে আবুল ফজল রক্ষা পাইতে পারিতেন। তাহার প্রিয় অনুচরেরা, বিশেষতঃ তাহার বহুদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য গদাইখাঁ আফগান, তাঁহাকে তিনক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত আন্ত্রী নামক স্থানে ফিরিতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিল। তথায় তখন তিন সহস্র সৈন্য লইয়া কার্য্যোপলক্ষে রায়রায়াণ ও সূর্য্য সিংহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আবুল ফজলের মহৎ বীরহৃদয় মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ও অবশ্যম্ভাবী দেখিয়াও কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে ঘৃণা বোধ করিল। তিনি আপনার মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পঙ্গপাল তুল্য অগণিত বীরসিংহের সেনাসমূহের সম্মুখীন হইয়া সিংহ বিক্রমে

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার অদ্ভুত রণকৌশল ও বীরোচিত সাহসেও তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহার অল্প সংখ্যক অনুচর বীরসিংহের সেই বিপুল সেনাবাহিনীর আক্রমণের বেগ কতক্ষণ রোধ করিতে পারে? অল্পক্ষণেই তাহার অনুচরেরা সকলে প্রায় হতনিহত হইল, তিনিও যুদ্ধ করিতে করিতে কোন অশ্বারোহীর বর্ষাঘাতে নিহত হইলেন। বীরসিংহ তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া সেলিমকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেলিমও তাহা অযোগ্য স্থানে নিক্ষেপ করিয়া একান্ত নীচাশয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তৈমুর লঙ্গের বংশে এইরূপ একটী পুরাতন প্রথা চলিত ছিল যে, অভিজাতবংশের কাহারও যদি মৃত্যু হয়, তবে সম্রাটের নিকট মৌখিক কেহ সে সংবাদ জ্ঞাপন না করিয়া সেই মৃত ব্যক্তির উকীল স্বীয় হস্তে একটী নীলবর্ণ রুমাল বাঁধিয়া সম্রাটের সমক্ষে উপস্থিত হইবে। এই চিরাগত নিয়মানুসারে আবুল ফজলের উকীল আকবরের সমক্ষে এই চিহ্ন ধারণ করিয়া উপস্থিত হওয়াতে বাদসাহ প্রবল শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়েন। প্রথম শোকোচ্ছ্বাস শমিত হইলে তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—সেলিম যদি ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিল, সে আমাকে নিহত করিয়া পথের কণ্টক দূর করে নাই কেন? নিষ্পাপ নির্দ্দোষ আবুল ফজলকে হত্যা করিল কেন?" ইহার পরে তিনি এই কবিতাটীর আবৃত্তি করিয়াছিলেন :—

শেখে মা অজ্ শওকে বেহদ্ চঁসয়ে মা আমদা।
জিঁ স্তিয়াকে পায় বোসি রে সরোপা আমদা॥

আমার সেখ আমাকে দেখিবার আগ্রহাতিশয্যে ত্বরান্বিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার চরণ চুম্বন করিবার অভিপ্রায়ে (আসিয়া) নিজ জীবন হারাইলেন!

যদিও বাদসাহের আদেশানুসারে উরছাধিপতি বীরসিংহ নিজ রাজ্য হইতে তাড়িত ও পলাতক হইয়াছিলেন ও আকবরের জীবিতাবস্থায় জঙ্গলে লুকাইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বাদসাহের মৃত্যু ঘটিলে তিনি জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পুরস্কৃত হন। বীরসিংহের এরূপ সম্মানের কারণ যে আবুল ফজলের হত্যাকাণ্ড, একথা জাহাঙ্গীর তাঁহার স্বভাবসঙ্গত নির্লজ্জতার সহিত স্বলিখিত "আত্মজীবন চরিতে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আবুল ফজলের সাত ভ্রাতা ও চারি ভগ্নী ছিল। তন্মধ্যে তাঁহার পিতার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পাঁচজন। আবুলফজলের এক পুত্র সেখ আবদুর রহমান আবজল খাঁর উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। জাহাঙ্গীর ইঁহার পিতাকে যেরূপে অকালে মৃত্যুমুখে পাতিত করেন, সেই অনুশোচনা বশতঃই হউক বা অন্য যে কারণে হউক পুত্রকে তদ্রূপ উচ্চপদে অর্থাৎ বিহারের শাসনকর্ত্তা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ও গোরখপুর জায়গীর স্বরূপ দান করেন। আবুলফজল "আকবর নামা" ও "আইন-ঈ-আকবরী" (উক্ত পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড) ব্যতীত "আয়ার দানীপ" অর্থাৎ একখানি আরব্য গ্রন্থের অনুবাদ, "মক্তুবাৎ-ই-সালেমি "বা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজা মহারাজাদিগের সহিত আবুলফজলের যেরূপ ব্যবহার হইয়াছিল তাহার সমগ্র বিবরণ, রচনা করেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান "রিশালা-ঈ মুনাজৎ" বা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও "জমীউল্লে'খার্ৎ" বা অভিধান গ্রন্থ ও কাসকোল্ বা ভিক্ষাপাত্র" (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প সংগ্রহ) প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ "আকবর নামা ও "আইন-ঈ-আকবরীর" সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা বর্ত্তমান লেখক, তাঁহার, ভারতীতে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের উপকরণ প্রবন্ধে, ক্রমশঃ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য সে সম্বন্ধে এ স্থলে কোন কথা উল্লেখ করা গেল না। তবে এলফিনষ্টোনপ্রমুখ ঐতিহাসিকেরা পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ আবুলফজলকে সম্রাটের চাটুকার প্রভৃতি অযথা বাক্যে নিন্দাবাদ করিয়াছেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান যে তাঁহার সম্পাদিত আইন-ঈ-আকবরীর অনুবাদের সূচনায় সে সব কথা বিশেষ যোগ্যতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন, এস্থলে সে সব কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থে আবুল ফজল সত্যপ্রিয়তা, ভূয়োদর্শন ও লিপিচাতুর্য্যের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, উহা ঐতিহাসিকের পক্ষে মহার্হ।

আবুল ফজল একদিকে যেমন ধীরতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, উদার্য্য প্রভৃতি গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন, অন্য দিকে তদ্রূপ অসাধারণ বীর ও বিশ্বাসী ছিলেন। গুণগ্রাহী সম্রাটের সভায় তজ্জন্য তিনি এত অল্প দিনে প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। রোমীয় সম্রাট অগষ্টস্ বা ভারতবর্ষীয় বিক্রমাদিত্য সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকেরা তাঁহাদের রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজের বীরত্ব ব্যতীত তাঁহাদের সভাসদেরা লিপিশক্তির সহিত শৌর্য্য বীর্য্যের সমন্বয় করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিকেরা মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য শকারির সহিত কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের উৎসাহদাতা বিক্রমাদিত্যের ঐক্যের বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। উভয়ের ঐক্য হইলেও অগষ্টস বা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌দের শৌর্য্যবীর্য্যের বা রণপাণ্ডিত্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সভাসদেরা একদিকে যেমন লিপিশক্তি, অপরদিকে সেরূপ যোদ্ধৃত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে আকবরের জগদ্বিখ্যাত রাজসভা ঐশ্বর্য্য ও গৌরবে কুমারী রাজ্ঞী এলিজাবেথের সভার সহিতও কতকাংশে স্পেনের অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের সভার সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলিত হইতে পারে। রাজা ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ, টোডারমল্ল, আবুল ফজল্, ফৈজী, সেখ মুবারক প্রভৃতি উভয়বিধ শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয়। আবুল ফজল ও ফৈজীরমত ঐতিহাসিক ও কবি অধিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইহার মধ্যে আবুল ফজল যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, দ্বিতীয় ফিলিপের সভাসদেরা অরেঞ্জোডি আরসিলা, জারসিলেস্কো ডিভেগা, সর্ভেণ্টিস্ ও লোপডিভেসা এই উভয় শক্তির বিকাশ দেখাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। গৌরবেও উভয় নৃপতির সময় তুলনীয়। আকবরের সময় মোগল রাজত্ব সর্ব্বোচ্চ গৌরবের সীমায় পৌছিয়াছিল। ফিলিফের সময় স্পেনের যে ঐশ্বর্য্য-প্রভাব ও গৌরব হইয়াছিল, সে দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ের বিষয় আলোচনা করিলে সেরূপ কখনও হয় নাই, দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সম্রাট-রত্ন আকবরের গৌরব মুকুটে আবুল ফজল একটি শ্রেষ্ঠতম রত্ন। পাণ্ডিত্যে, লিপিশক্তিতে, মানসিক শৌর্য্য, বীর্য্য ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। আবুলফজলের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উপহার দিয়া আমরা এস্থলে এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। ইহা অধ্যাপক ব্লকম্যান্ কাশ্মীরের কোন মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলপট্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

ইলাহি বহর্‌খানা কে মিনগরম্ যো ইয়ারে তু অন্দ্,
ও বহর্ জবান্ কি মি শেনয়ম্ গোঈয়ায়ে তু
কুফ্‌রো ইস্‌লাম দররহ পো ইয়ান্
ওহ্‌দাহু লা শরিক নহ্ পো ইয়ান্
অগর্ মস্‌জিদস্ত বইয়াদে তু নারায়ে কুদ্দুস্ মিজনন্দ্।
ও অগর্ কলেসিয়াস্ত্ ব শৌকে তু নাকুস মিজম্বানন্দ্।
গাহ্ মতকিয়ো দৈয়মো গাহ্ সাকিল মস্‌জিদ্।
ইয়ানিকে তোরাসি তলবম্ খানা বখানা। ইত্যাদি।

অধ্যাপক ব্লকম্যান্ কৃত অনুবাদের বাঙ্গালা অনুবাদ আমরা দিলাম—

"হে ঈশ্বর! প্রতি মন্দিরে লোকে আপনাকে অন্বেষণ করে। মানব-কথিত প্রতিভাষায় আপনার স্তুতি গীত হয়।

বহুঈশ্বরবাদ ও ইস্লাম্ উভয়েই আপনার জন্ত লালায়িত, প্রত্যেক ধর্ম্ম বলে আপনি এক ও অদ্বিতীয়।

মস্জিদে আপনার স্তুতি মৃদুস্বরে ধ্বনিত হয়, খ্রীষ্টানের গীর্জ্জায় আপনার প্রেমবিহ্বল ভক্তেরা ঘণ্টাধ্বনি করে।

কখনও খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম মন্দিরে ও কখনও মস্জিদে আমি গিয়া থাকি কিন্তু প্রতি মন্দিরে আপনারই সন্ধানে ফিরি।

আপনার প্রিয় ভক্তেরা স্বাধীন ধর্ম্মবাদ ও ধর্ম্মান্ধতা উভয়েরই বহির্ভূত। কারণ উভয়ের কেহই আপনার সত্যের যবনিকার অন্তরালে বাস করে না ইত্যাদি।*

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

লক্ষ্মী।

(সাঁওতালী গল্প।)

'ওকনি' একখানি ক্ষুদ্র সাঁওতাল গ্রাম। সাঁওতাল-দিগের ভাষায় গ্রামকে 'আতু' বলে। গ্রামখানিতে ১৫।১৬ খানি কুঁড়ে ঘর, কয়েকটি আমগাছ, ৩।৪ টি মহুয়া গাছ, একটি বড় বটগাছ, এবং ঈষৎ দূরে একটি ক্ষুদ্র নদী। একটি মুঝারি গোছের পাহাড়, তাহারই পাদদেশে ক্ষুদ্র গ্রাম। কয়েক বিঘা আবাদি জমি, এবং একটি স্বল্পতোয়া মন্দগতি নদী, ইহা লইয়াই সাঁওতাল বস্তি। গ্রামের চারিদিকে জঙ্গল, পাহাড়ের উপরেও জঙ্গল, জঙ্গলে বড় বড় শালগাছই অধিক। মহুয়া গাছেরও অভাব নাই, এবং সেই সঙ্গে নেক্ড়ে বাঘ এবং ভালুকেরও অভাব নাই। সাঁওতালেরা প্রকৃতির শিশু, উহারা এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি প্রাণী আনন্দিত মনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বন্য হিংস্র পশু উহাদের প্রতিবেশী। জঙ্গলের মধ্য দিয়া, গ্রামের উত্তরপার্শ্ব দিয়া একটি অনতিবিস্তৃত রাস্তা পূর্ব্বপশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সরকারি সড়ক, অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড-রোড্। এই রাস্তা দিয়া পথিকেরা এবং কখনও কখনও শকটাদি যাতায়াত করে।

এই গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘর খানি, বেশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, ঘরের 'পিণ্ডা'গুলি সুমার্জ্জিত, চালটি নূতন ছাওয়া, ঘরের সম্মুখে কয়েকটি ধান্তের মরাই রহিয়াছে। সেখানি ভাদো মাঝির ঘর। ইনিই গ্রামের মণ্ডল, সমৃদ্ধ এবং সঙ্গতিপন্ন লোক। শুধু এ গ্রামের নহে, নিকট এবং দূরবর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামের ইনি শাসনকর্ত্তা। ইঁহাকে 'পরগণা' বলে। ইঁহার পরামর্শ ব্যতীত গ্রামগুলির কোন গুরুকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় না; বিবাহ, পূজা, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইঁহার পরামর্শ এবং আদেশের অপেক্ষা করে। ইনি একাধারে বিচারপতি, পুরোহিত এবং শাসনকর্ত্তা। ভাদো মাঝির দেহটি স্থূল, পেটটিতে একটি নাতিক্ষুদ্র ভুঁড়ি আছে, গলায় একগাছি রূপার হার এবং বাহুতে একটি রূপার তাগা আছে। ভাদো মাঝির মনটি কিন্তু নিতান্ত সরল ও সুন্দর। ভাদো সাহসী, ক্ষমতাশালী, সহৃদয় এবং সত্যবাদী। উহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও এখনও বাঘ শিকারে প্রচুর আনন্দ বোধ করিয়া থাকে, এখনও ভাদো শিকারিদলের অগ্রগণ্য।

ভাদো মাঝি জাতিতে 'বাদোলিমাণ্ডি'। সাঁওতালেরা সকলেই এক জাতি, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে এগারটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে, যথা,—কিস্কু, সোরেন, মাণ্ডি, হাঁসদাঃ, মুরমু, হেমরোম, টুডু, বাস্কে, পাঁওড়িয়া, বেস্রা এবং চোঁড়ে। ইহাদিগের মধ্যে কিস্কু রাজবংশীয়, এবং সকলের উচ্চ, আর চোঁড়ে সকলের নিম্নে। এক এক গোত্রের মধ্যে আবার ২।৩।৪ টি শাখা আছে, যেমন মাণ্ডির মধ্যে চারিটি শাখা বর্ত্তমান। যথা, বাদোলি মাণ্ডি, রুত মাণ্ডি, মিরুবাহা মাণ্ডি, এবং সাদা মাণ্ডি। সাঁওতালেরা একজাতি, গোত্রনির্বিশেষে পরস্পরের মধ্যে আহারাদি চলে, বিবাহাদিও চলিয়া থাকে, তাহাতে কোনও বাধা নাই। তবে কখনও কখনও চোঁড়ে গোত্রীয় কন্যাকে উচ্চগোত্রীয়েরা আপনাদের বধূরূপে লইতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকে।

যে গ্রামের কথা আমরা বলিয়াছি, তাহাতে তিন ঘর মাণ্ডি, পাঁচ ঘর হাঁসদাঃ, দুই ঘর টুডু, এক ঘর সোরেণ, এবং চারি ঘর বাস্কে আছে। গ্রামের মধ্যে পরগণা ভাদো মাঝি প্রধান, অধিকন্তু অর্থশালী; সুতরাং তাহারই সম্মান বেশি, কিন্তু গ্রামে যে একঘর সোরেন আছে, সামাজিক শ্রেণীবিচারে তাহারা উচ্চতর। তথাপি ভাদোর নীচে সোরেন গৃহের সম্মান।

---

*এপ্রবন্ধে অন্যান্য যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা গেল, সে সকল-গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তন্মধ্যে কেবল অধ্যাপক কয়েলের লিখিত আবুলফজলের জীবনী (Dictionary of National Biography) ও অধ্যাপক ব্লকম্যানের আবুল ফজলের জীবনী (Introduction to his translation Ain Akbari) উল্লেখ করা উচিত। শেষোক্ত সুপণ্ডিত লেখকের নিকট আমি সবিশেষ ঋণী।

মঙ্গলা গ্রামের 'যোগমাঝি' অথবা চৌকিদার। গ্রামের সমুদায় অবিবাহিত বালক বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইঁহার উপর অর্পিত। অবিবাহিত বালক বালিকা বলিলে যুবক যুবতীকেও বুঝিতে হইবে। কারণ, সাঁওতালদিগের মধ্যে সাধারণতঃ বিবাহের বয়স, বালক ও বালিকা উভয়ের পক্ষেই, ১০ হইতে ২০।২২ পর্য্যন্ত। যোগ মাঝি গ্রামে কিঞ্চিৎ জমি পাইয়াছেন, এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছেন। যোগমাঝি গ্রামের বালক বালিকাগণকে যথেচ্ছভাবে পরিচালিত করিতে পারেন, ইচ্ছামত লইয়া যাইতে পারেন, এবং তাহাদের লইয়া যথা ইচ্ছা নাচ দিতে পারেন। বালক বালিকাগণের চরিত্র গঠনের উপর যোগমাঝির প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

ইহা ছাড়া গ্রামের সোমরা 'পারামাণিক' এবং চুণা 'নাএকে' এই দুই জনের সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা কর্ত্তব্য। পারামাণিক মহাশয় জমির বিভাগ এবং বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। যাহাতে ভাল ভাল জমি একজনের একচেটে দখলে না থাকে, সেদিকে তাঁহার খুব নজর, আর যাহাতে অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা এবং তজ্জন্য চাঁদা আদায় করাও তাঁহার কাজের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। নাএকে মহাশয় পূজারি, গ্রামের দেবতাগণের পূজা ইত্যাদি তাঁহার কর্ত্তব্য।

সাঁওতালেরা আপনাদিগকে 'হোড়' এবং অপর সকলকে 'দিকু' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। সাঁওতালের প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে হিন্দু প্রতিবেশীই অধিকসংখ্যক,এইজন্য 'দিকু' বলিলে প্রধানতঃ হিন্দুগণকেই বুঝায়। আমাদিগের ম্লেচ্ছ' এবং সাঁওতালদিগের 'দিকু' শব্দ প্রায় একার্থের বোধক। উহাদিগের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের তত বিচার নাই, এবং গোমাংস খাইতে উহারা খুব ভালবাসে,কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন কোন মতেই খাইবে না। বরং কুর্ম্মির হাতে খাইবে, তবু হিন্দু ব্রাহ্মণের হাতে খাইবে না। উহা তাহাদিগের মধ্যে একেবারে নিষিদ্ধ; এরূপ বিচিত্র প্রথার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৮৬৬ সালের 'মন্বন্তরে' (দুর্ভিক্ষে) সরকার বাহাদুর হইতে অন্ন বিতরিত হইয়াছিল, সরকারিক কর্ম্মচারীরা মনে করিয়াছিলেন—হিন্দু ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন সকলেই খাইতে পারিবে, এইজন্য হিন্দু ব্রাহ্মণের দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু সাঁওতালেরা দলে দলে অন্নাভাবে মরিতে লাগিল, কেহই হিন্দু ব্রাহ্মণের অন্ন স্পর্শ করিল না। হিন্দু ব্রাহ্মণের উপর তাহাদের এ বিজাতীয় ঘৃণার উৎপত্তি কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বোধ হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ হইতেই পুরাকালে এই জাতির সর্ব্বনাশ হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই এই বিষম ঘৃণা।

সাঁওতালের প্রাণের জিনিষ নৃত্য আর বংশী। সাঁওতাল-নাচ পাঠক পাঠিকারা অনেকে হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। চন্দ্রিকাবিধৌত পর্ব্বততলে দলে দলে সাঁওতাল বালক বালিকা এবং যুবক যুবতী সম্মিলিত হয়, মস্তকের লম্বা কোঁকড়ান চুল দোলাইয়া এবং কানে দু চারিটী ফুল গুঁজিয়া যুবতীগণ পুষ্পহার শোভিত যুবকগণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া পাহাড়ের তলে আসিয়া সমবেত হয়। তাহার পর যুবক যুবতী সম্মিলিত হইয়া হাতে হাতে ধরিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া চক্রাকারে কখনও তত্ব, কখনও শুষ, কখনও বা ঘন(১) গতিতে নৃত্য করিতে থাকে,—যেন সমবেত যুবক যুবতীর মণ্ডলী একখানি নৃত্যপর সজীব চক্রে পরিণত হইয়া সঞ্চলিত হইতেছে, পঞ্চাশ ষাট খানি হাত এবং পা এক সঙ্গে উঠিতেছে এবং পড়িতেছে, যেন সকলে মিলিয়া একখানি দেহ, একখানি প্রাণ। উপরে নীলাকাশে উৎসুক চন্দ্রমা মধু হাসি হাসিয়া এই মধুর দৃশ্য দেখিতেছেন, তাঁহার হাসিতে পাহাড়, নদী, জঙ্গল, মাঠ সকলই হাসিয়া উঠিতেছে। এই দৃশ্য দেখিলে দ্বাপরের যমুনাজল-পূত-বৃন্দাবন বিপিনে গোবর্দ্ধন-গিরিমূলে জ্যোৎস্নাময় নিশীথে নৃত্যকুশল বনমালাধর শ্রীকৃষ্ণের এবং নৃত্য-পরায়ণা পুষ্পহারশোভিতা কর্ণে কুসুমাভারধারিণী গোপী-দিগের সেই মণ্ডলাকারে রাসনর্ত্তনের একখানি রমণীয় ছবি যেন নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এই কি সেই গোবর্দ্ধন গিরি! আর ওই কি সেই বৃন্দাবনের পরিসর-পরিগত পূতনীরা যমুনা! আর উহারাই কি সেই নৃত্য-বিভ্রান্ত সরলা প্রেমসর্ব্বস্ব গোপযুবতী! উহাই কি শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি! আহা কি মধুর সুর! যেন হৃদয় মন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে! (২)

(১) নর্ত্তনে বিলম্বিতং দ্রুতং মধ্যং তত্ত্ব ঘোঘোঘনং ক্রমাদিত্যাদয়ঃ।

(২) মার্শেল ডাল টন সাঁওতাল-নৃত্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সহিত তুলনা করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"We have in both, the maidens decked with flowers and ornamented with tinkling bracelets, the young

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে—

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।

আমরা কথায় কথায় আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি—ভাদো মাঝির গৃহে তাহার পত্নী 'চুণী' এবং সপ্তদশ-বর্ষীয়া কন্যা 'লক্ষ্মী' ছাড়া আর কেহ নাই। কন্যাটি ভাদো মাঝির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাহার সংসারের সার, তাহার জীবনের বন্ধন। লক্ষ্মীর রংটি কাল, কিন্তু মুখ সুশ্রী, সরলতা তাহার বড় বড় কৃষ্ণ চক্ষুতে যেন ভাসিয়া উঠিতেছে, হস্ত পদ সবল এবং সুগোল, যৌবনের শ্রীতে সর্ব্বাঙ্গ সবে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যুবতী লক্ষ্মী আজিও বালিকা, পাড়ার যুবক দাশো চুণ্ডা প্রভৃতির সহিত আজিও জঙ্গলে জঙ্গলে খেলিয়া বেড়ায়, বনে সাদা সাদা শাল ফুল ফুটিয়া উঠিলে সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া সেখানে গিয়া শালফুলের মালা গলায় পরে, লক্ষ্মী দাশোর গলায় মালা পরাইয়া পলাইয়া যায়, দাশো ভাল ভাল ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া লক্ষ্মীর মাথায় পরাইয়া দেয়, কাণে ফুল গুঁজিয়া দিয়া দেখিতে থাকে, আর যখন দাশো জ্যোৎস্না রজনীতে পাহাড়ের তলে নদীতীরে শুইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে, তখন লক্ষ্মী চুপি চুপি যাইয়া দাশোর চোখ টিপিয়া ধরে এবং দুজনে পাশাপাশি বসিয়া কত গল্প করে। যখন সকলে মিলিয়া বৈশাখের প্রাতঃকালে বনে মহুয়ার ফুল কুড়াইতে যায়, তখন দাশো অযাচিত ভাবে আপনার টুকরি হইতে ঢালিয়া লক্ষ্মীর টুকরিখানি সাদা মহুয়া ফুলে ভরিয়া দেয়, এবং লক্ষ্মীর সরল সুন্দর মুখে মৃদু হাসি দেখিয়া উচ্চ-হাস্যে বন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে। লক্ষ্মীর সহিত দাশোর খুব ভাব, সেই অবাধ স্নেহবন্ধনে দু'জনেই খুব সুখী এবং দু'জনেই পরিতৃপ্ত। লক্ষ্মী যুবতী হইয়াও তাহার পিতৃ-প্রদত্ত স্বাধীনতাগুণে পালিত ব্যাঘ্রশিশুর ন্যায় চঞ্চল ক্রীড়াশীল এবং নির্ভয়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে নদীতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

men with garlands of flowers and peacocks' feathers, holding their hands, and closely compressed, so that the breast of the girl touches the back of the man next to her, going round in a great circle, limbs all moving as if they belonged to one creature; feet falling in perfect cadence, the dancers in the ring singing responsive to the musicians in the centre, who, fluting, drumming, and dancing too, are the motive power of the whole, and form an axis of the circular movement."

লক্ষ্মীদের 'ওড়াঃ' (গৃহ) খানি নদীর তীরেই অবস্থিত। লক্ষ্মী প্রকৃতির শিশু, প্রকৃতির অঙ্কে প্রতিপালিত, বন জঙ্গলে পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে এত দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সুতরাং যুবতী লক্ষ্মী যে বিলাস বিভ্রম আজিও শিখে নাই তাহা বিচিত্র নহে, কুটিলতা সঙ্কোচ যে আজিও তাহার নিকট অপরিজ্ঞাত, তাহাও বিচিত্র নহে।

এক দিন রাত্রি কালে দাশো নদীতীরে 'বুরু'তলে (১) একখানি 'ধিরি'র (২) উপরে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, আর গান গাহিতেছিল। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে আসিয়া দাশোর পাশে বসিল, এবং দাশোর করুণ বংশীধ্বনি এবং গীত শুনিতে লাগিল। সে কি গান? দাশো গাহিতেছিল,—

দোং রাড়। (৩)

সুঃ দাঃ ডাডি দাঃ

দাঃ বেন লোলো কান গলের মালা

বাড়ায় গেআ বেন লেস্বো কেশোরি

আতি দুলাড় লিং তাহেঁ কানা।

অয়ি কণ্ঠমালা! নদীবালুকার গর্ত্ত হইতে এবং পথি পার্শ্বস্থ কূপ হইতে তোমরা দু'জনে জল ভরিতেছ, অয়ি কোমল কিশোরি! তোমরা দুজনে জান, আমি আর ... পরস্পরকে কত—কত ভাল বাসিতাম!

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দাশো কতবার কত রকমে এই গীতটী গাহিয়া লক্ষ্মীকে শুনাইল। শেষ চরণটী গাহিবার সময়ে সে উহার কথাগুলির মধ্যে কত উচ্ছ্বাস, কত আগ্রহ কত করুণা, কত আশার মোহন সুর ঢালিয়া দিল। কত ভঙ্গিমায় বারবার গাহিল—'আতি দুলাড় লিং তাহেঁ কানা' 'আমরা দু'জনে কত—কত ভালবাসিতাম।'

লক্ষ্মীর দিকে সলজ্জ নেত্র তুলিয়া দাশো বলিল, "লক্ষ্মী দেখ, নদীর ওপারে আমাদের দেশ, এখানে আমাদের দেশ নয়। নদীর উত্তপ্ত বালুকার পর পারে আমাদের সুন্দর রাজ্য, এখানে আমাদের স্থান নাই।" এই বলিয়া দাশো গাহিল,—

দোং রাড়।

দে হো দে লা হো দে তাড়াম মে

গাডা গিতিল দো লোলো কান দো

(১) বুরু—পাহাড়। (২) ধিরি—পাথর। (৩) রাড়—সুর, রাগ
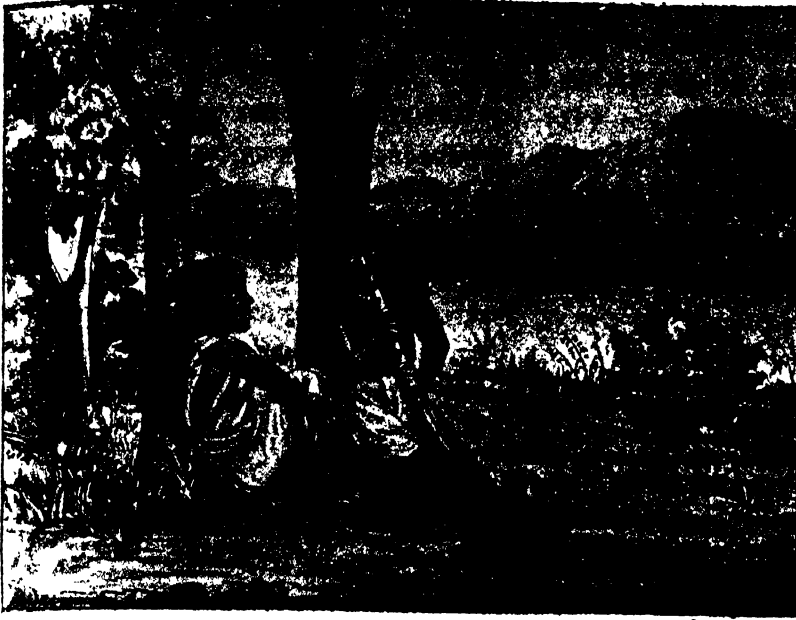
প্রধান পর্ব্ব নামে পরিচিত। দাশাঁই দুর্গা পূজা, আর শোহরাই কালী পূজা। শোহরাইতে গ্রামবাসীরা 'পুরখা' (মৃত পিতৃপুরুষ) গণের উদ্দেশে পূজা দিয়া থাকে, মুরগী এবং পশু হনন করিয়া থাকে। প্রত্যেক পর্ব্বে নৃত্যগীত একটি সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। আবার ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য হইয়া থাকে। দাশাঁইতে যেরূপ নাচ হইবে—শোহরাইর নাচ তাহা হইতে বিভিন্ন। সাঁওতালেরা অত্যন্ত নৃত্য কুশল জাতি।

নো আ গাডা ম্বাং পারোম লে থান
ঞেলোঃ গেআ হো আলাং দিশোম।

হে প্রিয়, ওগো প্রিয়, চল, চল, নদীর বালুকা উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, এই নদীর পারে যাইলে—হে প্রিয়, আমাদের দু'জনার দেশ দেখা যাইবে।

গান-সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মী বলিল, "দাশো, ঘরে চল, রাত হইয়াছে, তুমি আর অমন করুণ সুরে গান গাহিয়ো না। তোমার জন্য আমার মন কেমন করে। মনে হয় যেন তোমায় ছাড়িয়া আমি কোথায়, কোন 'বির বুরুর' (১) দেশে চলিয়া যাইব, আর বুঝি তোমায় দেখিতে পাইব না। দাশো, তুমি অমন করিয়া আর গাহিয়ো না।"

দাশো বলিল,—"লক্ষ্মী, সত্যই আমার জন্য তোমার মন কেমন করে?"

এই কথা বলিয়া দু'জনে হাত-ধরাধরি করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। দাশোর বাড়ী লক্ষ্মীদের বাড়ীর পাশেই।

আজ 'দিকু শোহরাই'। ইহা সাঁওতালদিগের একটী প্রধান পর্ব্ব, হিন্দু প্রতিবেশীর নিকট হইতে গৃহীত কালীপূজা সাঁওতালগণের মধ্যে 'দাশাঁই' আর 'শোহরাই' এই দুইটি

আজ শোহরাই। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারময়ী রজনী, মহুয়া বৃক্ষতলে নৃত্যপর যুবক যুবতীরা সমবেত হইয়াছে। সকলে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, লক্ষ্মী এবং দাশো পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া ঐ দলের মধ্যে রহিয়াছে। লক্ষ্মীর কাণে দুটি বন ফুলের তোড়া বাঁধা, এবং দাশোর গলায় একগাছি বনফুলের মালা। দু'জনেরই রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান। লক্ষ্মীর একধারে দাশো, অপর পার্শ্বে চুণ্ডা। চুণ্ডাও লক্ষ্মীর হাত ধরিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। সকলে চক্রাকারে হাত ধরাধরি করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া ঘুরিতে লাগিল। সকলেরই মুখে আনন্দ, প্রফুল্লতা, হাস্য। লক্ষ্মীর লাবণ্য-পরিপূর্ণ দেহ তালে তালে হেলিতেছে দুলিতেছে, তাহার উন্নত বক্ষের মনোমোহন স্পন্দন, তাহার যৌবনোচ্ছাসপূর্ণ দেহের নর্ত্তনজনিত ললিত তরঙ্গলীলা, তাহার সুন্দর মুখখানির হাস্যময় ভঙ্গিমা, তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণতার চক্ষুর অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রভৃতি [illegible] হইয়া দাশোকে বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। দাশো যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে, যেন তাহার অর্চ্চনীয়া দেবী, তাহার পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মী, কোন স্বর্গের অপ্সরা, যে [illegible] তাহারই হাতে হাত দিয়া সে কোন্ অজ্ঞাত সুরপুরে মনের আনন্দে নৃত্য

(১) বির—জঙ্গল। বুরু—পাহাড়।

করিতেছে। যেন সে রাজ্যে সে আর তাহার লক্ষ্মী ব্যতীত আর কেহ নাই, যেন তাহারা দু'টীতে সুখে প্রেমে বিভোর হইয়া মনের আনন্দে সেই সুরপুরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। দাশো চক্ষু ভরিয়া লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব রূপসুধা পান করিতে লাগিল, আর তাহার শরীর যেন ক্রমশঃ কি এক নেশায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সে লক্ষ্মীর হাত চাপিয়া ধরিল, লক্ষ্মী দাশোর দিকে ফিরিয়া দাশোর মুখের দিকে তাকাইল। দাশোর মুখ দেখিয়া লক্ষ্মী একটু হাসিল, সেও দাশোর হাত খানি ঈষৎ চাপিয়া ধরিল, দাশোর কাণে কাণে বলিল, "দাশো তোমায় আজ বড় সুন্দর দেখাচ্চে।"

দাশো জাগিয়া জাগিয়া কত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। একবার ভাবিল, সে যেন মরিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী যেন কতদিন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সে একবার লক্ষ্মীকে দেখিবার জন্য কত কাঁদিতেছে, লক্ষ্মী কোথায়?—শেষে চক্ষু মুদিয়া লক্ষ্মীর রূপ ধ্যান করিতে লাগিল, স্বপ্ন দেখিল, যেন লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, তাহার দিকে আনত করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, সে দৃষ্টিতে কত করুণা, কত প্রেম!—চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, লক্ষ্মী তাহার দিকে তেমনই করুণা এবং প্রেমপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতেছে। সে কিন্তু মরিয়া যায় নাই, সে এবং লক্ষ্মী হাতে হাত দিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছে।

এই দলের মধ্যে দাশোর ন্যায় আর এক জন যুবক লক্ষ্মীর মদিরাময় সৌন্দর্য্যে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইতেছিল। তাহার নাম চুণ্ডা। সেও লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া কত জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিল, লক্ষ্মীর উজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া আত্মহারা হইতেছিল, এবং কখনবা নিমেষহীন দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর যৌবনপূর্ণ দেহের হেলনি, তাহার সমুন্নত বক্ষঃস্থলের মোহময় আন্দোলন, আর সর্ব্বাঙ্গের মদিরাময় লাবণ্যলীলা দেখিতেছিল। তাহারও মন প্রণয়ে লালসায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল। নৃত্য করিতে করিতে চুণ্ডা একেবারে লক্ষ্মীকে বুকে টানিয়া লইয়া সকলের অলক্ষিতে লক্ষ্মীর গণ্ডদেশে চুম্বন করিল। আর কেহ ইহা দেখিল না, কিন্তু দাশোর সতর্ক চক্ষু উহা লক্ষ্য করিল। দাশোর দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল, রাগে হিংসায় ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল, মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিহিংসা ঘুরিতে লাগিল। লক্ষ্মী এই আকস্মিক ব্যাপারে নিতান্ত কুপিতা এবং দাশোর দিকে চাহিল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার ঠোঁট দু'খানি ফুলিতে লাগিল। কেহ কিছু বলিল না। নৃত্যগীত চলিতে লাগিল।

নৃত্যগীত থামিয়া গিয়াছে। দাশো আর লক্ষ্মী বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। দু'জনেই চিন্তিত মনে পথ চলিয়াছে। পশ্চাতে চুণ্ডার উচ্চহাস্য এবং কলরব শুনা যাইতেছে। নদীর পারে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইলে দাশো বলিল, "লক্ষ্মী, তুমি দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।" অল্প পশ্চাতে উচ্চশব্দ ধ্বনিত হইতেছিল। চুণ্ডার মন আনন্দে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয় উৎফুল্ল। সে নদীর পাড়ে আসিলে দাশো একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। চুণ্ডা সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, পড়িয়া গেল। তখন দাশো চুণ্ডাকে এক পদাঘাত করিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নদী পার হইল। এখন দাশোর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তাহার মনের অমাবস্যা ঘুচিয়াছে। দাশো হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মীকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিল, আসিবার সময় লক্ষ্মীর কানে কানে বলিয়া আসিল, "লক্ষ্মী, তুমি চুণ্ডার নও, আর কাহারও নও"।

পর দিন প্রাতে সকলে গত রাত্রির ঘটনা জানিল। চুণ্ডা মস্তকে গুরুতররূপে আহত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছে। তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। পরগণা ভাদো মাঝি ও গ্রামের অপরাপর সকলেই দাশোকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাশো কোনও কথাই গোপন করিল না। সে স্বীকার করিল, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সে চুণ্ডাকে নদীতীরে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আহত করিয়াছিল, মনে ভাবে নাই যে, চুণ্ডা এরূপ সাংঘাতিক আঘাত পাইবে। দাশো কখনও মিথ্যা কথা কহে নাই, সে মিথ্যা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। তাহাকে যে শাস্তি দেওয়া যাইবে, সে তাহাই অবনত মস্তকে বহন করিবে।

লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে লক্ষ্মীও সকল কথা যথাযথ বর্ণনা করিল; কিছুই গোপন করিল না। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতার চরণে ধরিয়া বলিল যে, তাহারই জন্য দাশো এইরূপ করিয়াছে, তাহারই কুহকে দাশো উত্তেজিত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল, দাশোর কোন দোষ নাই, সকল অপরাধ তাহারই।

তিন দিনের দিন চুণ্ডা প্রলাপে লক্ষ্মীর নাম লইয়া উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। চতুর্থ দিনে দাশোর বিচার হইল। লক্ষ্মী কত করিয়া, কত কাঁদিয়া দাশোকে ক্ষমা করিবার জন্য তাহার পিতাকে অনুরোধ করিল। পিতার জীবনসর্ব্বস্ব কন্যা, একমাত্র স্নেহের পুত্তলি লক্ষ্মী তাঁহার নিকট কত কাঁদিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত চক্ষু ফুলাইল, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ পিতা আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। ভাদো মাঝি এবং গ্রামের পঞ্চায়তের বিচারে হতভাগা দাশো গ্রাম হইতে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল।

সেইদিন রজনীর অবসানে দাশো আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মভূমির নিকট চিরজীবনের তরে বিদায় হইল। তাহার উন্মেষিত যৌবনের খরপ্রবাহী প্রেমস্রোত রুদ্ধ করিয়া, জীবনের সারাংশ, প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা, সমস্ত চির জন্মের তরে ওই ক্ষুদ্র কুটীরের অভ্যন্তরে রাখিয়া, শূন্যমনে কাঁদিতে কাঁদিতে দাশো চলিল। জন্মভূমি, প্রণয়, স্নেহ, সুখ, আশা, আজ তাহার সকলই হারাইল! হায়, দাশোর নবীন জীবনে এই আকস্মিক বজ্রাঘাত কেন হইল! কেন—কে বলিবে?

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী এখন অষ্টাদশবর্ষে উপনীত হইয়াছে। তাহার পিতা মাতা তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। 'নরখি' গ্রামের বুধা কিস্‌কুর পুত্রের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ স্থির হইয়াছে, বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন, এবং কন্যাপক্ষীয়েরাও যাইয়া বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভোজ খাইয়া আসিয়াছেন। বুধা কিস্‌কু ভাদোমাঝিকে কন্যার জন্য ৩ টাকা পণও দিয়াছে। সাঁওতালদিগের বিবাহে বরপক্ষ হইতে কন্যাকর্ত্তাকে ৩, ৫, ৭, অথবা ১২ টাকা পণ দিতে হয়। আজ 'বার বার' (দূত) আসিয়া ভাদোমাঝিকে সংবাদ দিয়া গেল যে, আর ৫ দিন পরে বিবাহ হইবে, বরপক্ষ হইতে মোট ১২ জন লোক আসিবে। ভাদোমাঝি তদনুসারে বিবাহের, এবং বরপক্ষীয়দিগের অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিল। গৃহে বিবাহের বাজনা বাজিতে লাগিল।

মাদল, নাগরা আর বাঁশী আজ প্রভাতে অতি মধুরস্বরে বাজিয়া উঠিল। আজ লক্ষ্মীর বিবাহ; লক্ষ্মী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নদীতীরে গেল, দাশো আর সে যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিত, যেখানে বসিয়া দাশো জ্যোৎস্নাময়ী নিশায় বাঁশী বাজাইত ও লক্ষ্মীকে গান শুনাইত, ধীরে ধীরে লক্ষ্মী সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর যাইয়া উপবেশন করিল। তখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে। লক্ষ্মী চিন্তিত মনে বসিয়া অপর পারের দিকে চাহিয়া রহিল। বুঝি ভাবিতে লাগিল, যদি এমন সময়ে দাশো আসিয়া একবার তাহার অন্তরের দুঃখ দেখিয়া যায়। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল প্রাণের মধ্যে হাহাকার উথিত হইল। আজ সে তাহার বাল্যের সহচর, যৌবনের প্রেমের দেবতা, তাহার সখা, বন্ধু এবং প্রণয়ীকে চিরজন্মের তরে বুঝি বিসর্জ্জন করিতে চলিয়াছে। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া আসিল, সে প্রস্তরের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া করুণস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

লক্ষ্মী এখনও দাশোকে ভুলে নাই। গ্রামের সকলেই ভুলিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মী কি ভুলিতে পারে? এত ভালবাসা কি কখনও বিস্মৃত হওয়া যায়? কখনও কি ভুলিতে পারিবে? প্রেম, হর্ম্ম্যবাসিনী রমণীর হৃদয়ে যে ভাবে প্রকাশিত হয়, অমার্জ্জিতা বন্যবালার হৃদয়েও তেমনই ভাবে বিকশিত হইয়া উঠে। প্রেমের মন্দাকিনীধারা সকলকে একই স্বর্গে লইয়া যায়। রমণীর হৃদয়, মানুষের হৃদয়, সভ্য ও অসভ্য সকল সমাজেই একপ্রকৃতিক। 'A touch of Nature makes the whole world kin'.

প্রাতঃকালে বর আসিয়াছে। বরপক্ষীয়েরা গ্রামের বাহিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। ভাদোমাঝি গিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল। সকলে ভাদোর বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়াছে, বিবাহের বাদ্য বাজিতেছে। বরের ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ৫।৭ জন যুবক যাইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা পূর্ণযৌবনা শ্রীরূপিণী লক্ষ্মীকে বরের নিকট লইয়া আসিল। বর একটি ঘটি হইতে কন্যার অঙ্গে ৫ বার জল ছিটাইয়া দিল, কন্যাও তদ্রূপ করিল। তৎপরে বর কন্যার হাতে হাত দিয়া ৫ বার তাহার হাত ধরিয়া টানিল, কন্যাও বরের হাত ধরিয়া ৫ বার আকর্ষণ করিল। এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইল। লক্ষ্মীর জীবনস্রোত ভিন্ন প্রবাহে বহিল।

বিবাহের পরে আহারাদি ও ভোজ হইল। বরপক্ষীয়েরা যে ছাগ সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা কাটা হইল, কন্যা-

পক্ষীয়েরা অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়া উপস্থাপিত করিল। 'হাঁড়িয়া' (একপ্রকার মদ্য, ভাত হইতে প্রস্তুত, যাহাকে 'পচাই' বলে) চলিতে লাগিল। গ্রামের যুবক যুবতীগণকে লইয়া যোগমাঝি উপস্থিত হইল, তখন নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। সকলে মহোল্লাসে তাহাতে যোগ দিল। সে সঙ্গীত এই,—

দাং রাড়।
মারাং বুরু দো আড়ি উস্কুল
আঁড়গো বাকাপ্তে ডাণ্ডাইং হুকেন
জামতোড়া লাডু দো আতি সেবেল
অজয় বড়াকর দাঃ লাং এ্যইআ।

অর্থ :— বড় পর্ব্বত খুব উচ্চ,
উঠিতে নামিতে কটি ব্যথিত হইল ;
জামতাড়া সহরের মিঠাই (লাড়ু) খুব মিষ্ট,
এস, আমরা দুজনে মিঠাই খাইয়া অজয়
আর বরাকরের জল পান করি।

এইরূপে বিবাহ-বাসর কাটিয়া গেল। দুইদিন পরে লক্ষ্মীকে লইয়া বর তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল।

* * * * *

তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। লক্ষ্মীর বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজ লক্ষ্মীর জীবনের দু'একটি দৃশ্য আমরা পাঠক পাঠিকার সম্মুখে ধরিব। দুঃখের কাহিনী শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত হওয়াই ভাল।

লক্ষ্মী এখন কোথায়? কালের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে লক্ষ্মী আজ কোথায় উপনীত হইয়াছে, তাহা কেহ জান কি?

লক্ষ্মীর গৃহ হইতে ৬০০ ক্রোশ দূরে ঐ যে চা-বাগান দেখিতেছ, ঐখানে অনুসন্ধান করিলে লক্ষ্মীকে দেখিতে পাইবে। দৈবের বিড়ম্বনায়, অদৃষ্টের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মক্রমে, লক্ষ্মী, বৃদ্ধ ভাদোমাঝির নয়নতারা, স্নেহের পুতুলি লক্ষ্মী, আজ চা বাগানের কুলি। কোথায় তাহার পরিজন, কোথায় তাহার স্নেহময় জনক জননী! আজ চক্ষের জলে ভাসিয়া, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দরিদ্রা লক্ষ্মী তাহার জীবনের অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। হা বঙ্গদেশ! তোমার কত ঘরে ঘরে এইরূপ সোণার প্রতিমা হারাইয়া কত হাহাকার উঠিতেছে, কে তাহার গণনা করিবে?

প্রাতঃকালে সাহেব চাবুকহস্তে চা তোলা কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিলেন। লক্ষ্মীর নিকটে আসিয়া তাহার অনিন্দ্য বদনকান্তি দেখিয়া সাহেব বিমোহিত হইলেন। সাঁওতাল যুবতীর সৌন্দর্য্যে সাহেব অভিভূত হইলেন। এত যুবতীর যৌবনমধু পান করিয়াছেন, কই, সাহেব এমন লাবণ্যে ঢলঢল দেহলতা, এমন উন্মাদক সৌন্দর্য্য ত কখনও দেখেন নাই! সাহেব বিমুগ্ধ হইয়া, কৃষ্ণ মুখের অপূর্ব্ব শ্রী, বারবার সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীকে তাঁহার কুঠিতে লইয়া যাইবার জন্য সরদারকে উপদেশ দিয়া সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া গেলেন। সে দিন তাঁহার পরিদর্শন কার্য্য ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইল।

সন্ধ্যার সময়। তখনও অল্প অল্প আলো রহিয়াছে। আলো আঁধারে, সরদারেরা সাঁওতাল যুবতী লক্ষ্মীকে ধরিয়া সাহেবের কুঠিতে আনিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া লক্ষ্মীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার কেশ আলুলায়িত, তাহার মুখে এক ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার যৌবন, তাহার সৌন্দর্য্য তেমনই মোহময়, তেমনই বিভ্রমোৎপাদক। সাহেব সবে শিকার হইতে প্রত্যাগত হইয়া বারাণ্ডায় টেবিলের উপর বন্দুক রাখিয়া মদ্যপানে নিরত হইয়াছেন। লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী কিছুই বলিল না, সাহেবের মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল, মধুর অথচ ভীষণ নেত্রযুগল স্থাপিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে চক্ষু হইতে যেন জ্বলন্ত অগ্নি নির্গত হইতেছিল। সাহেব সরদারকে হুকুম দিলেন, "উপর লাও"। সরদার লক্ষ্মীকে টানিয়া উপরে উঠাইল। সাহেব লক্ষ্মীকে ধরিয়া জোর পূর্ব্বক তাহাকে বেঞ্চের উপর বসাইল। সরদার এই সময়ে প্রস্থান করিল।

তারপর সাহেব মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন!

এমন সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া ধীরে ধীরে একজন কুলি আসিয়া বারাণ্ডার উপরে উঠিল, এবং সবলে সাহেবের মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিল। সাহেব আহত হইয়া লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া দিলেন। কুলি লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী, আমার সহিত আইস, তোমার কোনও ভয় নাই"। কুলি লক্ষ্মীকে লইয়া দ্রুতপদে বারাণ্ডা হইতে অবতরণ করিল। উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইল। ইত্যবসরে সাহেব দক্ষিণ হস্তে বন্দুক উঠাইয়া কুলিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন,

কুলি আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মী পলাইল।

অমাবস্যার অন্ধকারময়ী রাত্রি। কুলি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া আজ তিন দিন শয্যাশায়ী। তাহার ক্ষুদ্রগৃহে লক্ষ্মী আসিয়া দিবারাত্রি তাহার পাশে বসিয়া আছে। তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া লক্ষ্মী কাতর প্রাণে দেবতার কাছে কুলির জীবন ভিক্ষা করিতেছে।

অর্দ্ধরাত্রে কুলির চেতনা হইল। কুলি চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্মীকে দেখিয়া বলিল, "লক্ষ্মী, তোমার দাশো আজ সুখে মরিতে পারিবে। সে যে তোমার জন্য জীবন দিতে পারিল, ইহাতে তাহার কত আনন্দ, কত সুখ। সে যে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে চির জন্মের নির্ব্বাসন ক্লেশ এবং বিরহ-দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী, আমার ঘরে—ঐ কোণে মাটীর তলে আমার সঞ্চিত সমুদায় অর্থ প্রোথিত রহিয়াছে, আমি মরিয়া গেলে তুমি উহা লইয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দেশে যাইও। তোমার এগ্রিমেণ্টের সময় অতীত হইয়াছে। ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেই তোমায় ছাড়িয়া দিবে। তুমি দেশে যাইও, আর তোমার বাবাকে ও গ্রামের সকলকে বলিও, দাশো তাহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। লক্ষ্মী, আইস, আমার হাতে হাত দিয়া আমার চক্ষুর নিকটে তোমার মুখখানি আন। আমি আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। লক্ষ্মী, দাশো তোমায় এই চারি বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়াছে, ধ্যান করিয়াছে। সে তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই! তুমি তাহাকে ভুলিয়া যাইও না!"

রাত্রি শেষে দাশো প্রলাপ বকিতে লাগিল,—

যোঁআ গাডা লাং
পারোম লে খান
এেলোঃ গেস্মা হো
আলাং দিশোম।

এই নদীর পারে গমন করিলে, হে প্রিয়, আমাদের দু'জনের দেশ দেখা যাইবে।

রাত্রির অবসানে সাঁওতাল যুবা দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্ত পথে পুনর্যাত্রা করিল। বুঝি এখনও, সে তাহার লক্ষ্মীর কথা ভুলিতে পারে নাই। তাই এখনও এতদিন পরেও, বিধবা লক্ষ্মী জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যায় নদীতীরে 'বুরু'তলে 'ধিরি'র উপরে বসিয়া—মোহন বংশীধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠে, আর দূরে পরিচিত ক্ষীণ সুরে গানের একটি চরণ শুনিতে পায়—"আডি দুলাড় লিং তাহেঁ কানা।"

শ্রীমুরলীধর রায় চৌধুরী।

জামাই-ষষ্ঠী।

(চিত্র)

'জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী' বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলের বহু প্রাচীন আনন্দপূর্ণ পারিবারিক উৎসব। রথযাত্রা, দোলযাত্রা, দুর্গোৎসব কিম্বা অন্যান্য পার্ব্বণে উৎসবের যে উল্লাস-

ময় উৎসাহ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ প্রত্যেক গ্রাম ও নগর মধ্যে তরঙ্গায়িত হইয়া পল্লীবাসিগণকে সংগ্রাম-কঠোর সংসারের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পথ হইতে সুখ ও আনন্দের আরামদায়ক নেপথ্যে সম্মিলিত করে—জামাই ষষ্ঠীতে সেই জাতীয় আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা যেন ভিন্ন জাতীয় উৎসব, ইহার আনন্দ, সুখ ও পরিতৃপ্তি শুদ্ধান্তের পবিত্র সীমায় আবদ্ধ—বহিঃপ্রকৃতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; বহির্জগতের বিপুল কোলাহল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এই পল্লী উৎসব বঙ্গললনার বিচিত্র প্রেমানন্দরাগে চিত্রিত হইয়া বঙ্গান্তঃপুরের মোহময় প্রভাবচ্ছায়ায় আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু তথাপি এই পুরাঙ্গনাগণের এই উৎসবকে ক্ষুদ্র বা নগণ্য বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। রমণীগণকে আমরা উৎসবের দেবীরূপে গ্রহণ করিতে পারি; তাঁহাদের অভাবে কোন উৎসব সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিত না; দুর্গোৎসবে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গরমণী শক্তিস্বরূপিণী হইয়া জননীর কন্যাপূজা ব্রতের উদ্যাপন করিতেছেন, সেখানে পুরুষ তাঁহার সহায়, জাতীয় সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী। সেখানে পুরুষ ও রমণীর সমবেত সাধনা, সমবেত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়;—কিন্তু জামাই ষষ্ঠীর সহিত এক জামাতা ভিন্ন অপর পুরুষের সংস্রব নাই। রমণী অন্তঃপুরের অধিশ্বরী। তিনি তাঁহার গৃহ রাজধানীতে জামাতৃ-পূজার আয়োজনের জন্য এই গার্হস্থ্য উৎসবে যোগদান করেন। জামাই ষষ্ঠী বঙ্গান্তঃপুরের প্রধান উৎসব।

কবে কিরূপে এই উৎসবের আরম্ভ, কেহ বলিতে পারে না, কেহ সে কথা জানে কি না, তাহাও বলা যায় না; কিন্তু যুগান্ত কাল হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই উৎসব বিরাজিত হইয়া বঙ্গীয় রমণীর স্নেহ, প্রেম ও মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সে দিন পল্লীগৃহে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয়-দান পুরুষ লেখকের পক্ষে সম্ভব নহে।

জ্যৈষ্ঠ মাস—স্কুল কালেজ সমস্ত বন্ধ হইয়াছে, ষষ্ঠীর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্ব হইতেই জামাতৃবর্গ—বিশেষতঃ নব-জামাতৃবৃন্দ শ্বশুর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ শ্বশুর মহাশয় জামাতার অভিভাবকের নিকট পত্র লিখিয়া জামাতাকে ষষ্ঠী উপলক্ষে তাঁহার গৃহে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি অত্যন্ত সুমধুর, সাধারণতঃ তাহা শ্যালিকা-হস্ত-বিরচিত। ষষ্ঠীর দুই এক দিন পূর্ব্বেই আমাদের ক্ষুদ্র পল্লী গোবিন্দপুর, গ্রামবাসিগণের নবজামাতৃবর্গের আবির্ভাবে নব শ্রী ধারণ করিল। প্রভাতে ও অপরাহ্নে জমীদারগণের বিভিন্ন সরিকের জামাতৃবর্গ ভিন্ন ভিন্ন আকার, বেশভূষা ও বিলাসিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রাজপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পায়ে বিলাতি জুতা, মুখে সিগারেট, অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয়ক, কাঁধে সিল্কের চাদর; গরদের পাঞ্জাবীতে বরবপু সমাচ্ছন্ন, বুকের উপর সুবর্ণ চেন ও মাথার উপর কেশ রাশির মধ্যে 'চেরা সিঁথি' আত্মমহিমা বিকাশ করিতেছে। কাহারও গোঁফ পরিদৃশ্যমান, কাহারও গোঁফের রেখা দিয়াছে, হাতের ছড়ি আত্মরক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ, বিলাসের জন্যই তাহার আবশ্যক—কে বলিবে, সুরসেনাপতি মহাবীর ষড়ানন এই কলির শেষে তাঁহার সুপুচ্ছ বাহনের অনুসন্ধানে জামাতার ছদ্মবেশ গ্রহণপূর্ব্বক গোবিন্দপুরে আসিয়া দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন কি না!

গৃহে গৃহে উৎসাহ ও কলরবের স্রোত অশ্রান্ত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। পল্লীর অন্তঃপুরের সে উৎসব-দৃশ্য বর্ণনার উপযুক্ত ভাষা ও ক্ষমতা বর্ত্তমান লেখকের নাই, আমরা এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদান করিব।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামের শ্রেষ্ঠ জমীদার। জমীদার মহাশয়ের পঞ্চ কন্যা। তিনটি বিবাহিতা। জ্যেষ্ঠ কন্যা সরসীবালা স্বামীর নিকটে থাকেন। তাঁহাকে লইয়া তাঁহার স্বামী হরেন্দ্র বাবু পূর্ব্ব বৎসর শ্বশুরালয়ে আসিয়া জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। এবার তিনি আসিতে পারেন নাই, এজন্য জমীদার গৃহিণী কিঞ্চিৎ দুঃখিতা—কিন্তু আজ দুই দিন হইল, তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামাতা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। পল্লী-যুবতীগণ ষষ্ঠীর পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে সরযুবালা ও সরলাবালাকে বেশভূষায় ভূষিত করিতে বসিয়াছেন। সেখানে বহু রমণীর সমাগম হইয়াছে—কেহ কন্যার রূপের, কেহ জামাতার গুণের, কেহ বেয়ানের অহঙ্কারের, কেহ বেহাইয়ের অমায়িকতার সমালোচনাপূর্ব্বক গৃহিণীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছেন। গৃহিণী অদূরে বসিয়া জামাতৃদ্বয়ের জলযোগের আয়োজন করিতেছেন—আম, কাঁঠাল, কালজাম, গোলাপজাম, লিচু, তালশাঁস, ফলসা, নারিকেল কোরা, শাঁক আলু প্রভৃতি নানা জাতীয় ফল মূল ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন রজতপাত্রে সজ্জিত হইতেছে। মায়ের কাছে বসিয়া সরোজবালা ও শৈলবালা সতৃষ্ণ নয়নে জামাই বাবুদের জলযোগের আয়োজন দেখিতেছে। ইতোমধ্যে গয়লা বৌ কদলীপত্রে আবৃত দুইটি পাত্রে ছানা ও ক্ষীর লইয়া উপস্থিত হইল। গয়লা বৌর পশ্চাতে একটি পঞ্চম বর্ষীয় উলঙ্গ বালক। একটী সুপক্ক আম্র উভয় হস্তে ধরিয়া গোপনন্দন ফেলারাম তাহার সুমিষ্ট রস পান করিতেছে, পীতরসে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতেছে। গয়লা বৌ ছানা ও ক্ষীরের বাটী গৃহিণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিল, "কত্তামা কাঁঠালের ভুতুড়ীগুলো কোথায়?"—কামিনী ঝি একটা ঝোড়ায় কাঁটালের ভুতুড়ীগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল।

ঘোষাণী ঝুড়ি কক্ষে লইয়া মহানন্দে গৃহমুখে প্রস্থান করিবে এমন সময় গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ-লো ফেলার মা, তুই ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁঠালের ভুঁতুড়ী গরুর জন্যে নিয়ে যাস্, দুধে ত রাজ্যের জল ঢালিস্, জামাই এলো বাড়ী, এখন দিন কতক একটু ভাল দুধ দে দেখি।" ফেলারামের জননী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অভিমানভরে বলিল, "দেখ কত্তামা, যে দিব্বি বল সেই দিব্ব করতে পারি, তোমার বাড়ীর দুধে এক ছটাকও জল দিইনি,—তা তোমার যদি সে কথায় বিশ্বাস হবে, আমার শনি গাই আর মঙ্গলা গাই সে দিন বিইয়েচে, তা দুধ বটের আটার মত হবে কোথেকে? কত্তামা, আর কিছুতে তোমার মন পেলাম না।" গৃহিণী বলিলেন, কাল ষষ্ঠী আছে, সের খানেক ক'রে ছানা ক্ষীর, আর সের দশেক হিসেবে দৈ দুধ দিস্, দু পাঁচ জন লোক জনকেও আবার খেতে বল্‌তে হবে।"—"তা দেব কত্তামা, কাল আবার বছরকার দিন, দেখি যদি মনোরপুরে (মনোহর) কিছু দুধের জোগাড় কর্ত্তে পারি, ঘোষ আবার বাঁকে গিয়েচে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোষ আবার কোথায় বাঁকে গেল রে!"—ঘোষাণী নূতন গল্প-রসের আয়োজন সম্ভাবনায় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কক্ষ হইতে কাঁটালের ভুঁতুড়ির ঝুড়িটা সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "কত্তামা, ঘোষ দুর্গাপুর মজুমদারদের জামাইয়ের ষষ্ঠীর তত্ত্ব নিয়ে গিয়েছে। আহা, মজুমদার গিন্নির ঐ একটি মেয়ে, কত সাধ আহ্লাদ করে বিয়ে দিলে, তা দেওয়া থোওয়া ভাল হয় নি বলে মেয়ে ছেড়ে দেয়না, বলে বাঁউড়ী সুট গয়না হাজির কর, করে মেয়ে নিয়ে যাও।" তা মজুমদারের ত আর অবস্থা আগের মত নেই, অত টাকার মাল কোথেকে দেবে? ষষ্ঠীতে মেয়ে জামাই পাঠালো না। সেদিন মজুমদার-গিন্নি একটু টাটকা ঘি চেয়েছিলো—দিতে গিয়েছিলেম; বলব কি কত্তামা, মাগী একঘর কান্না কাঁদলে, বেয়াই মিন্সে একেবারে চামার, চোকের চামড়া নেই গো, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে পাঠায় না! মজুমদার-গিন্নি ঝি জামাইয়ের জন্যে দুভার জিনিষ পাঠালে। আহা মেয়ের চাঁদ মুখ খানা দেখবার জন্যে গিন্নির পেরাণডা ছটফট করে।" গোপবধূর কথা শুনিয়া কোমলপ্রাণা বন্দোপাধ্যায়-গৃহিণীর হৃদয় সমবেদনা-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সরসী বালার সুমধুর মুখচ্ছবি সহস সকরুণ কল্পামূর্ত্তিতে তাঁহার মানসনেত্র-পথে উদিত হইয়া তাঁহার দুহিতাবিরহপ্রপীড়িত বক্ষের অভ্যন্তর হইতে একটি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আকর্ষণ করিল। গৃহিণী কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "খাইয়ে দাইয়ে মানুষ ক'রে পরের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্যেই মেয়ে।"

গৃহিণীর ননদ রাঙা পিসিমা তখন রন্ধনশালায় ঘোরতর ব্যস্ত। পাকপ্রণালীর অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি বহু প্রকার পাকপ্রণালীতে অভ্যস্ত। তিনি জামাতৃ-ষয়ের জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন। পিঠা পুলি আঁদোশা, গোকুল পিঠে, চন্দ্র পুলি, রুলাবড়া প্রভৃতি খাদ্য-পাকে তিনি সিদ্ধহস্ত। এ সকল দ্রব্য ভিন্ন তিনি আর একটী অতি উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য পাক করিতেন, তাহার নাম "রাধিকার সরোবর রসমাধুরী"—যাহার নাম এমন সুন্দর, তাহার আস্বাদন কিরূপ মধুর, তাহা যিনি রাঙা পিসিমার হস্ত-রচিত এই সুরস সুমিষ্ট মোলায়েম মিষ্টান্নের আস্বাদন না করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। কবির বর্ণনা শক্তিও যেখানে পরাভূত—সেখানে অকবির অনধিকার চর্চ্চা নিতান্তই ধৃষ্টতা এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জনীয়। রাঙা পিসিমা বিধবা, তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী বনমালী বাবু ভোজন-বিলাসী ছিলেন, পিসিমার 'রস মাধুরী'তে তিনি সদা পরিতৃপ্ত থাকিতেন। আজ নিদাঘের এই নিঃসঙ্গ অপরাহ্নে একাকী সেই বহুদিনের অভ্যস্ত প্রাচীন-সুখস্মৃতিবিমণ্ডিত 'রসমাধুরী' নির্ম্মাণ করিতে করিতে তাঁহার আনন্দময় যৌবন মধ্যাহ্নের কত সুখের, কত বেদনার, কত বাসনার কথা মনে পড়িতে-ছিল, তাহা কে বলিবে? জ্ঞাতি দেবরগণের চক্রান্তে বিধবা সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া প্রৌঢ়ত্বের অবসানকালে ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সংযত, পবিত্র উদার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া তিনি তাঁহার সহোদরের পুত্রকন্যাগণের মাতৃত্ব আংশিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সুখ, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও পরিতৃপ্তি।

বেলা শেষ হইয়া আসিল। গ্রাম্য ললনাগণ কেশ-বিন্যাস শেষ করিয়া কলসী-কক্ষে সুকোমল মলয় সমীর-বিকম্পিত ললিত লবঙ্গলতার ন্যায় দেহ লতিকার সুচারু ভঙ্গিতে বিজন বনপথ বহিয়া ঘাটে চলিলেন। তাঁহাদের কাহারও পায় চারিগাছি ডায়মণ্ডকাটা মল, কাহারও পায়ে গুজরী পঞ্চম, কটিতটে চন্দ্র হার, কণ্ঠে কণ্ঠমালা এবং কর্ণে সুদৃশ্য দুল। মলের ও গুজরী পঞ্চমের রুণুঝুনু শব্দে সমস্ত দিনের খর-রবিকর-দগ্ধ সঙ্কীর্ণ বনপথ যেন নবজীবন লাভ করিল, ভাষা পাইলে সে যেন বলিতে পারিত—

"মরমে মুরছিয়া
পড়িতে চাহে হিয়া
ঐ চরণযুগ রাজীবে।"

নদীতে অধিক জল নাই। যে জলটুকু আছে, তাহা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, নদী তলস্থ বালুকাকণা ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, ছোট ছোট ঝিনুক ও গুগ্‌লি গুলি দেখা যাই-তেছে। তীরে তরিগুলি অপরাহ্নের মৃদু সমীরণের হিল্লোলে দুলিতেছে, নদীতীরে বসিয়া দুই একজন নিষ্কর্ম্মা লোক বড়শীতে কেঁচো গাঁথিয়া মাছ ধরিতেছে, শৈবালদলের লোভে দুই একটা গ্রাম্য অশ্ব নদী তীরস্থ পঙ্কের মধ্যে নামিয়া নাসিকা নিমজ্জন পূর্ব্বক ক্ষুন্নিবারণে মনঃসংযোগ করি-য়াছে। পাঁচ সাতটী মহিষ নদীর অপর পাড় হইতে জলে নামিয়া জলক্রীড়া করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া এক

একবার বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট মস্তক জলের উপর তুলিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে, রাখাল বালক তীরে দাঁড়াইয়া ঢিল ছুড়িয়া তাহাদিগকে গন্তব্য পথে প্রেরণের চেষ্টা করিতেছে। চুণ বোঝাই একখানা মহাজনী নৌকার উপর বসিয়া একজন জেলে জাল বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে—

"তারে না দেখে রে মন প্রাণ যে আমার
ক্যামোন করে—
ও সে থাক্‌না ক্যানো পাব্‌না জ্বালায়
আর আমি হাজিপুরে;
তবুও তারি লেগে প্রাণটা আমার ক্যামোন করে।"

গানের সেই মেঠোসুরে যেন অপরাহ্নের ছায়াচ্ছন্ন অবসন্ন মৌন গ্রাম্য প্রকৃতি ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। গ্রাম্যবধূগণ একবার কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে জলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এবং পরস্পরের মুখের দিকে সকৌতুকে একবার চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

'গা ধোয়া' শেষ হইলে সিক্তবস্ত্রে রমণীগণ গৃহমুখে চলিলেন; এমনই নিত্য তাঁহারা অপরাহ্নে নদীতে গা ধুইতে, জল লইতে আসেন; কিন্তু আজ সকলের ভাব সমান নহে, যাঁহার স্বামী জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছেন, তিনি কিছু ব্রীড়াবনতমুখী, সঙ্কুচিতা, চলিতে চলিতে সখীজনের প্রমোদ পরিহাস মন্দ লাগিতেছে না, তথাপি মুখে কৃত্রিম বিরক্তি—মাথা নাড়িয়া সখীর প্রতি সকোপ সভ্রুভঙ্গি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "নে ভাই থাম, তোর রঙ্গ দেখে গা জ্বলে যায়।"—কেবল চাটুযোদের মেয়ে সুলোচনা কোন কথা বলিল না। সুলোচনা যুবতী, বয়স সতর আঠার হইবে, আশ্চর্য্য সুন্দরী, প্রস্ফুটিত শুভ্র-মল্লিকা ফুলের মধ্যে যেমন একটা পবিত্রতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, সুলোচনার মুখে চোখে সেইরূপ পবিত্রতা বিরাজ করিত; পরিপূর্ণ যৌবন, অসাধারণ রূপ, সুকোমল লাবণ্যে তাহার সেই রূপজ্যোতিঃ নির্গলিতাম্বুগর্ভ শুভ্র শরদ্‌ঘনে সমাচ্ছন্ন পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ রাশির ন্যায় মাধুর্য্যসম্পন্ন,—সে রূপসাগরে তরঙ্গ নাই, তাহা নিশ্চল নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত। সুলোচনা কুলীন-দুহিতা—কুলীন-পত্নী, তাহার সপত্নী সংখ্যা অল্প নহে, তাহার কুলীন স্বামী বহু অনুরোধে একবার জামাই ষষ্ঠীর সময় শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'মর্য্যাদার' উপযুক্ত মূল্য দানে গরিব শ্বশুরকে অক্ষম দেখিয়া সেই যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই। সুলোচনার দুঃখ কি, তাহা কেহ জানিতে পারিত না, কাহারও নিকট সে তাহা প্রকাশ করিত না, কিন্তু তাহার সহচরীগণ তাহার বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত।

ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হইয়া উঠিল। আম বাগানের ভিতর হইতে রাখালেরা পাকা কাঁঠাল ও গেঁজেভরা আম মাথায় লইয়া প্রভুগৃহে চলিয়াছে। ভাঁটের শাখায় জোনাকির মৃদু আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুই একটি নক্ষত্রবালা গগনগবাক্ষ খুলিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে সন্ধ্যা ধূসর

ধরণীর দিকে চাহিয়া আছে। গ্রাম্য দেব মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গৌরদাস বাবাজীর আখড়ায় 'ভুজতা ভুজতাং' রবে মৃদঙ্গধ্বনি হইয়া হরি সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস জ্ঞাপন করিতে লাগিল, গৃহে গৃহে মৃৎপ্রদীপে আভা বিকাশ হইল। পরদিনের ষষ্ঠীর আয়োজন করিতে গৃহিণীদের অনেক রাত্রি হইল। হরিনামের মালা ফিরাইবার কাজটি আজ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

কিন্তু গ্রাম্য বালকগণের আজ রাত্রে শুইয়া দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। কখন রাত্রি পোহাইবে, কখন তাহারা ফল সংগ্রহ করিতে যাইবে, এই চিন্তায় সকলেই অস্থির। ষষ্ঠী পূজার জন্য ফল-সংগ্রহ, পল্লীবালকগণের মহা উৎসাহের কার্য্য। ছয় রকম ফল দিয়া ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করিতে হয়। অর্দ্ধজাগরণে অর্দ্ধনিদ্রায়, অর্দ্ধ আশায় অর্দ্ধ দুশ্চিন্তায় কোন প্রকারে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে তাহারা ফলের সন্ধানে বিভিন্নদিকে যাত্রা করিল, এবং একটু বেলা হইতে না হইতে তাহারা কোঁচড় ভরিয়া পেয়ারা, ডালিম, লিচু, ফলশা, খেজুর ও জাম এই ছয়রকম ফল সংগ্রহ করিয়া আনিল। পাড়ার রমণীগণের মধ্যে অধিকাংশ ফল বিতরণ করিয়া তাহারা পরম প্রীতি লাভ করিল, নিজের বাড়ীর জন্য অতি অল্পসংখ্যক ফল রাখিল।

গৃহিণীগণ আজ অতি সকালেই স্নান শেষ করিয়া আসিলেন, এবং সিক্তকেশে শুদ্ধবস্ত্রে পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্য দেবী মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইবেন না, বৃক্ষরূপে পূজিতা হইবেন, তাই এ পূজার নাম অনেক স্থলে 'গাছ ষষ্ঠী পূজা'। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী তুলসীমঞ্চে সমস্ত বৈশাখ মাস 'ঝরা বাঁধা' ছিল, তুলসীবৃক্ষমূলে বৈশাখ মাসে জলসেক করিবার জন্য তাহার ঊর্দ্ধে যে সচ্ছিদ্র মৃন্ময়পাত্র দুল্যমান রাখা হয়, তাহাই 'ঝরা'। বৈশাখের অবসানের সহিত ঝরার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহারই সন্নিকটে অনেকখানি স্থান প্রত্যূষে গোময়ানুলিপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রায় এক প্রহর বেলা হইলে গৃহিণীর আদেশক্রমে একটি ষষ্ঠীগাছ আনয়ন করা হইল, ইনি অশ্বথ-শাখা। ষষ্ঠীগাছ সেখানে প্রোথিত হইলে নানাপ্রকার ভীজে, সন্দেশ, বাতাশা, নৈবেদ্য আমজাম ও কাঁঠাল প্রভৃতি সময়োপযোগী ফল স্তূপাকারে ষষ্ঠীর পদমূলে রক্ষিত হইল। অধিকাংশ গৃহিণী কলার খোলায় আতব চাউল চূর্ণে জল ও হরিদ্রা মিশাইয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুতুলি নির্ম্মাণ করিয়া একপাশে রাখিলেন, কেহ কতকগুলি ক্ষীরের পুতুল গড়িয়া দিলেন,—অভিপ্রায় এই যে, "হে মা ষষ্ঠী, তুমি আমার সংসারে এতগুলি পুত্র কন্যা দান কর।" —মা ষষ্ঠী কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তিমতি গৃহিণী বৃন্দের এই আগ্রহপূর্ণ নিবেদনে যদি কর্ণপাত করেন, তবে হতভাগাগণ চিরজীবন কমলার কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু জননীর মনে এসকল তর্ক উপস্থিত হয় না, তাঁহার মাতৃত্ব-গৌরব সামাজিক বিজ্ঞতার বহু ঊর্দ্ধে বিরাজিত।

ধূপ আসিল, দীপ আসিল, পূজার উপকরণ সেই ছয়টি ফল আসিল, অবশেষে দাড়ি গোঁপ কামান, বিলম্বিত বেণী বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যজমানগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে দেখিলে গ্রামের ছেলেরা অনুচ্চস্বরে বলাবলি করিত, "বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ।"—বোধ করি; তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের উপর তাহাদের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সেজন্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-গৌরবের অভাব ছিল না, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নবগ্রহের স্তব করিতে পারিতেন এবং পুঁথি না খুলিয়াই দশকর্ম্ম সমাধা করিতেন। পুরোহিত মহাশয় একখানি টুলে বসিয়া চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বলিলেন, "ছোট মাসী বৌমাদের সব ডাকো, পূজো দেখুন"। তাহার পর রৌদ্র হইতে কেশবিরল মস্তকটি রক্ষা করিবার জন্য নামাবলী খানি তেভাঁজ করিয়া মাথার উপর রাখিয়া তিনি কুশাসনে পূজায় উপবিষ্ট হইলেন।

বাড়ীর বধূ ও কন্যাগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া পুরোহিতের সন্নিকটে ষষ্ঠীর অদূরে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া ভক্তি বিহ্বল চিত্তে পূজা দেখিতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র অশ্বথ শাখা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ গুণে কোন্ মূর্ত্তিতে সেই সকল কোমলপ্রাণা ভক্তের হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তাহারা ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে পারিবে না। কিন্তু পুরোহিতের পূজা শেষ হইলে যখন তিনি গৃহান্তরে যাত্রা করিলেন, তখন বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলে গললগ্ন-বাসে ভূমিষ্ঠা হইয়া ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন; গৃহিণী আগ্রহভরে বলিলেন, "মা বাছা সকলকে ধনেপুত্রে লক্ষেশ্বর কর, সকলের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখ।"—গৃহিণীর সেই আকুল কণ্ঠের একাগ্রতা পূর্ণ প্রার্থনা জগজ্জননীর বরাভয়প্রদ বাম চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবে না, একথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না।

যাঁহারা পল্লীগ্রামের মধ্যে কিছু সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাদেরই গৃহে অশ্বথ শাখা রোপণ করিয়া এই প্রকার ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে। কিন্তু গ্রামস্থ সকলে এই ভাবে ষষ্ঠী পূজা করেন না। গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায়, হয় কোন বনের মধ্যে, নির্জ্জন পথ প্রান্তে কিম্বা নদীর ধারে প্রকাণ্ড অশ্বথ বিরাজ করে। এই সকল বৃক্ষ পল্লীগ্রামে 'ষষ্ঠী গাছ' নামে বিখ্যাত। সেই সকল 'ষষ্ঠী গাছ' আজ গ্রাম্য ললনাগণের পূজা লাভ করিতেছেন। অধিকাংশ পল্লীর রমণীই উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি হস্তে লইয়া ষষ্ঠীতলায় সমবেত হইয়াছেন। পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে পূজোপকরণ বিস্তৃত। রমণীগণ নিকটে দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতেছেন, তাঁহাদের মৃদু মধুর গুঞ্জনে বনপ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে; কেহ অবগুণ্ঠনবতী, কাহারও নাকে নোলক, কাহারো নাসিকায় নথ; বলয় চুড়ে ঠুন্ ঠুন্ শব্দ হইতেছে, পট্ট বস্ত্র বায়ুপ্রবাহকম্পিত হওয়ায় খস্ খস্ শব্দ হইতেছে, কেশ-

তৈলের মধুর গন্ধ সমীরণহিল্লোলে ভাসিয়া যাইতেছে, দীপ্ত সূর্য্য অন্তরীক্ষ হইতে অশ্বথের নিবিড় পল্লব ভেদ করিয়া যুবতীজনের প্রীতিপ্রফুল্ল সন্তোষ ও শান্তিপূর্ণ হাস্যোজ্জল মুখের মোহন ভাব নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছেন না। কাহারও পাঁচবৎসরের মেয়েটি নীলাম্বরী পরিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া কজ্জলরাগরঞ্জিত নেত্রে একদৃষ্টে পূজা দেখিতেছে। কাহার ক্রোড়ে এক বৎসরের শিশুপুত্র মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোমল ওষ্ঠাধর স্তনবৃন্ত পরিত্যাগ করে নাই, ঘর্ম্ম স্রোতে শিশুর নবনীতকোমল দেহ প্লাবিত। স্নেহময়ী জননী তাহাকে তদবস্থায়ই ক্রোড়ে ধরিয়া বলয়বেষ্টিত সুগোল হস্তখানি দ্বারা অঞ্চল ঘুরাইয়া শিশুর ঘর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, এক একবার পূজার দিকে ও এক একবার গভীর স্নেহে নিদ্রামগ্ন পুত্রের মুখের দিকে অতি সতৃষ্ণ করুণ. নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, স্নেহময়ী জননীর অন্য স্তনবৃন্ত ভেদ করিয়া অমৃত উৎসের ন্যায় ক্ষীরধারা নিঃসারিত হইতেছে—যেন ষষ্ঠী দেবী মাতৃ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই নিদাঘ মধ্যাহ্নে পল্লীপ্রান্তে ছায়াশীতল বৃক্ষ মূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন; এবং অসীম ধৈর্য্য সহকারে তাহার পবিত্র জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন। বিহগ-দম্পতি উচ্চ শাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে, কৃষাণ অদূরবর্ত্তী ধান্য ক্ষেত্রের তৃণ বিনাশের জন্য নিড়ানী চালাইতেছে, তালপাতের ছাতা মাথায় দিয়া পরাণ মাঝি গ্রাম প্রান্তবাহিনী নদী বক্ষে খেয়া নৌকার নগি ঠেলিতেছে, দুই একজন ভারী ভিন্ন গ্রাম হইতে জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব লইয়া বাঁক ঘাড়ে করিয়া ষষ্ঠীতলা দিয়া গন্তব্য পথে চলিয়াছে, আম কাঁটালের ভারে তাহার স্কন্ধ ও বাহু মূলের মাংসপেশী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহার 'বাঁকের' উভয় প্রান্ত নত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা বহিতেছে। পথের ধূলা জানু পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে; ললাটের ঘর্ম্ম করতলে অপসারিত করিয়া সে ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়াছে।

ধূপ গন্ধে চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল হইয়া উঠিল। যুবতীগণ হরষ সরস হৃদয়ে শুভ্র শঙ্খ উভয় হস্তে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার নীরস কঠিন মুখ তাঁহাদের পুষ্পপুট তুল্য সুকোমল কুঞ্চিতাধরে স্পর্শ করিলেন, সেই মোহময় সংস্পর্শে প্রাণহীন শঙ্খের অস্থিময় দেহে যেন নব প্রাণের সঞ্চার হইল। সে তাহার প্রাণের আনন্দ উচ্চ নিনাদে সমস্ত গ্রামে ঘোষণা করিতে লাগিল।

পূজা শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত তাঁহার নৈবেদ্যরাশি একজন ভৃত্যের স্কন্ধে চাপাইয়া অশ্বথ-মূল পরিত্যাগ করিলেন, রমণীগণ ষষ্ঠী প্রণাম করিয়া শূন্য পাত্র হস্তে গৃহে ফিরিলেন, কেহ ষষ্ঠীর 'তেল [illegible]' লইয়া প্রিয় সহচরীর মুখে ও কপোলে [illegible]। [illegible] ষষ্ঠীতলা [illegible]

কতকগুলি সিন্দুর চিহ্ন ও পদতলে পূজার অর্ঘ্য ধারণ করিয়া একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। পাঁচ সাতটা কাক বৃক্ষ শাখা হইতে নামিয়া নৈবেদ্যের তণ্ডুল কণা আহরণ করিতে লাগিল, এবং কাঁটালের গন্ধে লুব্ধ দুই একটি শৃগাল অদূরবর্ত্তী বাঁশের ঝাড় ও আস্শ্যাওড়ার ঘন গুল্ম হইতে আত্ম প্রকাশ পূর্ব্বক বৃক্ষ মূলে অগ্রসর হইল।

আজ আর ভাত রাঁধিবার নিয়ম নাই, অবস্থাপন্ন পরিবারে আজ লুচি মণ্ডার আয়োজন। অধিকাংশ পল্লীবাসীই আজ চিপিটক ও দধির আয়োজন করিয়াছে। চিড়াদই, তাহার উপর আম, কাঁটাল, মর্ত্তমান কলা—ঘরে ঘরে মহোৎসব ব্যাপার! প্রতি গৃহে জামাতা ভোজনের আনন্দ। শ্যালিকার পল্লীসুলভ বিদ্রূপ, শ্যালকের সপ্রেম সম্ভাষণ, শাশুড়ীর জননীর ন্যায় স্নেহাদর, পত্নীর হৃদয়ভরা আনন্দ। জামাতৃবর্গ এই সকল আনন্দ রস পান করিতে করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছেন, "অসার খলু সংসারে, সারং শ্বশুরমন্দিরং।"

কিন্তু এমন আনন্দের দিনে কোথাও কি দুঃখ নাই? ভগবানের তাহা. বিধান নহে। ঐ যে দত্তগিন্নি আজ এই সুখের দিনেও অন্ধকার গৃহে পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছেন, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন; আশা করিয়াছিলেন, আর যে কয়টা দিন বাঁচিবেন, কন্যা জামাতার মুখের দিকে চাহিয়াই হরিনাম করিতে করিতে তাহা অতিবাহিত করিবেন, কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ হইয়াছিল। গত চৈত্রে, আজ দুইমাস হইল, বিসূচিকা রোগে তাঁহার প্রাণ প্রতিমা কন্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে ষষ্ঠীর সময় তাহার শ্মশান তুল্য বিজন গৃহ জীবনাবলম্বন কন্যা জামাতার পদস্পর্শে নন্দনের শোভা ধারণ করিয়াছিল। আজ তাঁহার সকল আশা ফুরাইয়াছে; আজ আর কি সেই প্রাচীনা স্বামীপুত্রহীনা অবলম্বনবঞ্চিতা হতভাগিনীর কোন সান্ত্বনা আছে?—তাই তাঁহার সেই করুণ শোকোচ্ছ্বাস যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাঁহারই সহানুভূতি কাতর বক্ষে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে,—মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু আকুলকণ্ঠে মর্ম্মোচ্ছ্বাস প্রকাশ পূর্ব্বক যেন গাহিতেছে :—

"ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে।
মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,
প্রাণভরা আশা—সমাধি—পাশে।
দুদিন এসেছিল, দুদিন হেসে ছিল,
দুদিন ভেসেছিল সুখ-বিলাসে।
না হতে পাতাপাতি, নীরবে গেল চুপি
বাসনাময় প্রাণে, শুধু পিয়াসে।"

১ই জ্যৈষ্ঠ, [illegible], ষষ্ঠী।

শ্রী[illegible] রায়।

[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে [illegible] প্রকাশিত।

পরিব্রাজক বেশে

শ্রীযুক্ত জলধর সেন।

KUNTALINE PRESS.

চতুর্থ ভাগ। } শ্রাবণ, ১৩০৮। { ৮ম সংখ্যা।

কল্পনার স্মৃতি।

যদিও শতধা হৃদি শত উপেক্ষায়,
আমি কি ভুলিতে কভু পারি মায়াবিনি!
এ হৃদয় মরুময় তুমি বাপী তায়,
রেখেছ শীতলি' বুকে দিবস যামিনী।
শুধু কি প্রবাসে বসি' একেলা আঁধারে,
অশ্রুগুলি গণি' যাবে জীবনের বেলা?
তোমার মধুর মুখ স্মৃতির আগারে,
জান না রয়েছে কিবা আনন্দের মেলা!
প্রাণময় সৌন্দর্য্যের পূর্ণিত বিকাশে,
অতৃপ্তি ভুলিয়ে গেছে দুটী আঁখিতারা;
যেন ওরা প্রান্তস্থিত দূর দেববাসে,
দুরন্ত বিয়োগ-দুঃখ হইয়াছে হারা।
তব স্মৃতি জীবনের তৃপ্তি নিকেতন,
সুন্দর অতিথি শূন্য আশ্রমে কেমন!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

যমুনা।

তোমার শ্যামল কূলে তমালের তলে
দাঁড়াতেন হে যমুনে, বনমালা গলে
বনমালী, বিলাসিনী রাধিকার সনে,
উজানে বহিত তাঁরি মুরলীর স্বনে
তোমারি তরঙ্গাকুল নীল জলধারা;
আজি তব কূলে বসি তাই আত্মহারা
হেরিতেছি, তব ওই হিল্লোল বিলাস,
শুনিতেছি, মুহুর্মুহু মুরলী নিশ্বাস
তোমারি কল্লোল গানে। মানস নয়নে
হেরিতেছি, দ্বাপরের সেই বৃন্দাবনে
নিকুঞ্জমন্দির মাঝে আহিরিণীগণ
নৈশ অভিসার আশে বাসর রচন।
রাখালকুলের খেলা গোচারণ মাঠে,
নগণ্য গোপীনিপ্রণ ঐ তব ঘাটে
বিয়াকুল বিলুণ্ঠিত বসনের তরে।

হেরিতেছি, গোকুলের প্রতি ঘরে ঘরে
বাল গোপালের সেই গুপ্ত ননী চুরি,
ও কম কোমল করে সুকঠিন ডুরি
যশোদার কঠিন শাসন। মনে পড়ে
নাচিলে তরঙ্গ তব মরুত মন্থরে,
হে কালিন্দি, মহানন্দে শ্রীনন্দনন্দন
করিয়া সে মধুময় মুরলী মন্দ্রন
আভীরা যুবতী সহ তরণী-সঙ্গমে
(মাতাইয়া গোকুলের স্থাবর জঙ্গমে)
যাপিতেন মধুময় মাধবী প্রদোষ।
যমুনে লো, সবি আছে আগের মতন
সেই তরু সেই লতা সেই বৃন্দাবন,
তেমনি বহিছ তুমি সদা বেগ ভরে
কেবল গোপাল নাই যশোদার ঘরে।

শ্রীহারাণচন্দ্র দে।

সংগ্রাম সাহ।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে সংগ্রাম সাহ নামে এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে আজিও তাঁহার পরিচয়ের কতিপয় চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা সংগ্রামের প্রধানতঃ লীলাক্ষেত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন সুদূর মারবাড় বা যোধপুরের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও সংগ্রামের গুণগ্রামের ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া স্বতঃই তাঁহার ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা একটি প্রবাদমূলক বাক্যকে কতকগুলি অসার উপকরণে সজ্জিত করিয়া পাঠকগণের ক্ষণিক মনস্তুষ্টি-বিধানে প্রয়াস পাইতেছি। বাস্তবিক প্রকৃত বিষয়ে সত্য ঘটনা পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিসংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। আজ কেবল মহাত্মা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণের অবগতির জন্য এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা, আলমগীর-নামার আংশিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত 'কলিকাতা রিভিউ'র কতিপয় প্রবন্ধ, মিঃ বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস এবং মহাত্মা কর্ণেল টড্ কৃত রাজস্থানের ইতিহাস এবং অন্যান্য কতিপয় প্রবন্ধাবলম্বনে এই প্রস্তাব সংক্রান্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে যথাক্রমে এতদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যে সময়ে দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ, ভারতে রাজ্য-বিস্তার করিয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটুকু নমুনা প্রদান না করিলে, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই জন্য তৎসমসাময়িক কিছু বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাদসাহের প্রতিনিধি-স্বরূপ মুসলমান নবাবগণের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকালে সাধারণ প্রজা ও দেশরক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এইজন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনে পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌসৈন্যের গমনোপযোগী যান-সকল, সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ই-আকবরীতে এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আকবরের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশের জমিদারেরা ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৮ জন পদাতিক, ১৭০টি হস্তী, ৪২৬০টি কামান এবং ৪৪০০ নৌকা সম্রাটকে যোগাইতেন।

এই সময়ে বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা একরূপ নিরাপদ হইলেও পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গ দুইটি বিদেশীয় জাতির দ্বারা বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার একদল আরাকানবাসী মগ ও অপর দল ইউরোপের নরপিশাচ পর্ত্তুগীজ দস্যু। এতদুভয় দল কখনও একত্রভাবে কখনও বা বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া, পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ জনহীন করিয়া তুলিয়াছিল। মুসলমান বাদসাহকুলতিলক আকবর বাদসাহের সময়ে এই উপদ্রবের প্রথম সূত্রপাত হয়। এই জন্য বাদসাহ সাহাবাজ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলনব্যপদেশে পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ মেঘনা নদীর মোহানায় [illegible]

করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানকে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রদান করেন *। সাহাবাজ—১৫৮৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছিলেন। তৎপর আর এই জন্য তথায় কোনরূপ সৈন্য রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, বাদসাহ তৎপ্রদেশীয় ভূম্যাধিকারিগণের উপর দস্যুদমনের ভার দিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত থাকেন।

মোগলগৌরবের মধ্যাহ্নকালে যখন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর সাহ অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতশাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎসময়ে দ্বাদশ জন প্রধান ভৌমিকের উপর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তন্মধ্যে বাক্‌লা (চন্দ্রদ্বীপ), ও শ্রীপুর (বিক্রমপুর) দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের দুইটী রাজধানী ছিল। মিঃ রালফ্ সাহেবের লিখিত বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে এক বৃহৎ নগরী বাক্‌লা নামে অভিহিত হইত। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে যখন পাদ্রি মিঃ ফুইট্ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন তিনি তৎস্থানীয় দ্বাদশজন ভূম্যধিকারীর আধিপত্য সন্দর্শন করেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ অধিবাসীরা হিন্দু ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল বর্ত্তমান ছিল। হয় ত কোনরূপ সংক্রামক-রোগের প্রকোপ অথবা অন্য কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনার আয়ত্ত হইয়া তাহারা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে একটি প্রবল বন্যার উৎপত্তি হইয়া প্রায় দুই লক্ষ লোক স্রোতোবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে এই ঝড় ও বৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।† তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কালকবলিত হইয়া, জনহীনতার মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। মিঃ গ্রাণ্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পরিশেষে মগদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল।

তৎসময়ে মগদিগকে এরূপ নরপিশাচ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন পল্লীতে প্রবেশ করিলেই, তত্রত্য অধিবাসীরা অন্তস্থানীয় লোকদিগের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে, সন্দীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরবাসী কি শূদ্র কি নরসুন্দরেরা ভিন্ন দেশের হিন্দুর জলস্পর্শ করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ মঘে তেলি, মঘে কামার, মঘে কুমার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপেও মিশিতে পারে না।

মিঃ বিভারেজ বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এবিষয়ের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠে অনুমিত হয় যে মঘেরা যদি কখনও সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত, তথাপি তাহার ফল লোকে কু ব্যতীত সু বলিয়া বিশ্বাস করিত না। সাহেব লিখিয়াছেন, আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরবর্ত্তী রমজানপুরের দাসেরা বলে, তাহাদের একটি স্ত্রীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল, সেই সময়ে একজন মঘ নদীতট দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। মঘকে দেখিয়া ঐ রমণী তাহার দৃষ্টি হইতে আপনাকে অন্তরাল করিবার জন্য জলে ডুব দিল। কিন্তু মঘ বিবেচনা করিল, ঐ মহিলা বুঝি জল নিমগ্ন হইয়াছে! তখন সে দয়ার্দ্রচিত্তে জলে নামিয়া উহাকে তীরে উঠাইয়া লইয়া আসিল। এই ব্যাপারের পরিণামে ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং সাধারণে তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া

* বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা সাহাবাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা সবডিভিসন এই পরগণার মধ্যে সংস্থাপিত।

† "বাক্‌লা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান পাতসাহের (আকবরের) রাজত্বের ঊনত্রিংশ বৎসরে একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রজল বাড়িতে আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাক্‌লা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাক্‌লার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন। রাজপুত্র কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সদাগরগণ যেখানে একটু উচ্চস্থান পাইল, সেইস্থানেই আশ্রয়গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল। ঘরবাড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্রোতোবেগে প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল! কেবল দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। প্রায় দুইলক্ষ লোক জীবন বিসর্জ্জন করিল।"

'বসুমতী' আফিস হইতে প্রকাশিত আইন আকবরী।

বিবেচনা করিতে লাগিল। বাস্তবিক তৎকালে মঘেরা যে সকল অসভ্যোচিত উৎপাত করিয়া, সমুদ্রতীরটাকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের শত শত সাধুতায় তাহার একাংশও পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাহাবাজ খাঁর প্রতি প্রথমতঃ এই আততায়ী দস্যুদলের দমন করিবার ভার অর্পিত হয়। সাহাবাজ খাঁ উহাদিগকে একরূপ দেশবিতাড়িত করেন। তখন আর সাহাবাজপুরে সৈন্য রাখা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, বঙ্গীয় ভৌমিকগণের উপর দস্যুদলনের ভারার্পণ করিয়া সম্রাট সাহাবাজকে রাজধানীতে থাকিতে আদেশ করেন। সে সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে বাক্‌লা ও বিক্রমপুরে, দুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুক্ষণে বারভূঞা দলের সহিত বাদসাহ জাহাঙ্গীরের মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। তাহারা সম্রাটের অবাধ্য হওয়ায় রাজা মানসিংহ আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাদিত করেন। এই সুযোগে মঘ ও পর্ত্তুগীজেরা প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। তখন পুনরায় আজিম ওসমানের প্রতি ঐ সকল দস্যুদলনের ভার অর্পিত হয়। আজিম ওসমান মঘদিগকে বিতাড়িত করেন এবং কতকগুলি পর্ত্তুগীজকে ধৃত করিয়া চট্টগ্রামে ও ঢাকার নিকটবর্ত্তী মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটা স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই স্থানটি অধুনা "ফিরিঙ্গি বাজার" নামে পরিচিত। আজিও তথায় সেই সকল পর্ত্তুগীজদিগের বংশধরেরা বাস করিতেছে।

তৎপর হইতে ক্রমে একজন প্রধান সেনাপতির অধীনতায় কতকগুলি বাদসাহী সৈন্য মেঘনা নদীর মোহানায় নিয়ত অবস্থান করিয়া, মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগের উৎপাত নিবারণ করিত। যখন ঔরংজেব বাদসাহ ভারতবর্ষের প্রায় একচ্ছত্র রাজা বলিয়া পরিচিত হন, তখন এই দস্যুদমনের ভার, হিন্দুসেনাপতি সংগ্রাম সাহের উপর অর্পিত হয়। বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংগ্রাম সাহাবাজপুরে আগমন করেন। তখন তথায় এমন কোন দুর্গ ছিল না, যাহাতে নিরাপদে সৈন্য রক্ষা করিতে পারা যায়। এই জন্য সংগ্রাম তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে তাহাকে "সংগ্রামের কেল্লা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। আলমগীর-নামাতে এই দুর্গের কথা উল্লিখিত আছে। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। "কলিকাতা রিভিউ র ৫৩ ভল্যুমের ৭৩ পৃষ্ঠার 'চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি' শীর্ষক প্রস্তাবে এই দুর্গ এবং সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটি দুর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তাঁহার বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৪২ পৃষ্ঠায় এই কেল্লা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রফেসার ব্লক্ ডিক্‌লন এবং বাঞ্জার কৃত একখানা ক্ষুদ্র ম্যাপ আছে, তাহা (১৭২৪—২৬খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ফ্রাঙ্কনবেলটাইন্ কৃত পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, বাক্‌লা একটা দ্বীপ মাত্র ছিল। সংক্রাণের অন্তরীপ বলিয়া একটা চিহ্ন ঐ ম্যাপে দৃষ্ট হইত। ঐ চিহ্নিত স্থান দেখিলে অনুমিত হয়, মেহেন্দিগঞ্জের থানায় একটি প্রাচীন মোগলদুর্গ ছিল, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"

আমরা সাহেবের এ কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি; কারণ সাহাবাজপুরনিবাসী অনেক প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত আছি, ঐ পরগণার অন্তর্গত গান্ধিয়া গ্রামের অনতিদূরে ইলিসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটি মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। পঞ্চসনার বন্দোবস্তের * কালেক্‌টরির কাগজ পত্রে সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গান্ধিয়া গ্রামের যে সীমানির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সংগ্রামের গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় †। এই কারণে সংক্রাণের অন্তরীপ ও সংগ্রামের কেল্লা যে একই স্থান, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হয় নাই, এই প্রাচীন মোগলদুর্গ মেঘনার শাখা ইলিসা নদীর গর্ভস্থ হইয়া, সংগ্রামের নামের একরূপ বিলোপসাধন করিয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঝালকাঠি থানার অধীন রামনগর গাবখান প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া সংগ্রামনীলের খাল বলিয়া একটা দোনের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ

* ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় জমিদারগণের সহিত প্রথম জমিদারি পাঁচসন মিয়াদে বন্দোবস্ত হয়, তাহাকে পঞ্চসনা বলে, পরে দশ বৎসরের জন্য দশসনা বন্দবস্ত হয়।

† জেলা বাখরগঞ্জের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ২৭৫০ নং তালুক দুর্গাপ্রসাদ সেনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১২০৪ সনের মৌজা ওয়ারি দেখ।

(ই)হা সংগ্রামসাহ কর্ত্তৃক নিখাত হইয়াছিল। এই জন্ত (ত)াহার নামের সহিত ঐ খালের নাম সংযোজিত হইয়াছে। (ই)হাতে আরও বোধ হয়, সংগ্রাম সাহ একটা উপাধি মাত্র (ছি)ল। নীল শব্দের সহিত অন্ত কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া (ত)াহার নামকে পূর্ণাবয়ব করিত; যেমন নীলকণ্ঠ বা নীল-(চন্)দ্র প্রভৃতি। পূর্ব্বাপর যেমন অনেকের উপাধিতেই (প)রিচয় পর্য্যবসিত হইয়াছে, নাম কেহ ততটা পরিজ্ঞাত (ন)হেন, তদ্রূপ সংগ্রাম সাহ এই উপাধিতেই তিনি পরিচিত (ছি)লেন, তাঁহার সম্পূর্ণ নাম লইবার আবশ্যকতা হয় নাই; (ক)াজেই নামটি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দস্যুদলের অপসারণ করিবার জন্য সংগ্রাম নানা স্থানে (গ)ড়বন্দী করিয়া, সৈন্য রক্ষার উপায় করিয়া লইলেন। (প)রে মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিকূলে সৈন্যপরিচালনা (পূ)র্ব্বক তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে (দূ)রীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে চাঁদরায় নামে বৈদ্য-(ব)ংশীয় অপর এক মহাত্মা সংগ্রামের প্রধান সহকারী (ছি)লেন। সংগ্রাম তাঁহার দ্বারা নানা বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত (হ)ন। সে যাহা হউক, এই সকল শত্রুদমনের কথা (অ)চিরে সম্রাট্ ঔরংজেবের নিকট পৌছিলে, তিনি সন্তুষ্ট (হ)ইয়া সংগ্রামকে পুরস্কারস্বরূপ ভূষণা, মামুদপুর ও চাঁদ-(র)ায়কে সাহাবাজপুর পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। (ব)াখরগঞ্জের ইতিহাসে লেখক শ্রীযুত খোসালচন্দ্র রায় (ম)হাশয় তৎকৃত ইতিহাসে তত্রত্য প্রাচীন বৈদ্য ভূম্যধি-(ক)ারিগণের উল্লেখ স্থলে এই চাঁদরায়ের বংশকে পরিত্যাগ (ক)রিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস বা সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতি (প)াঠ করিলে, তাঁহার এইরূপ ভ্রম হইত না। উল্লিখিত (ঘ)টনার বহুকাল পরে যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম (রি)পোর্ট প্রস্তুত হয়, তখন ১১৩৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১১৭০ (ব)ঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সাহাবাজপুরের বৈদ্য ভূম্যধিকারী চাঁদরায়ের (ব)ংশধর শ্রীরাম রায়ের নাম ব্যতীত আর কোন বৈদ্য-(জ)মিদারের উল্লেখ বাখরগঞ্জের জেলায় দৃষ্ট হয় না। চাঁদ-(র)ায়ের প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব বিগ্রহ ও তাহার অত্যুচ্চ মঠ (আ)জি পর্য্যন্ত সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করি-তেছে। মেঃ বিভারেজ কৃত ও খোসালচন্দ্র রায়কৃত বাখর-গঞ্জের ইতিহাসে এই কীর্ত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের দ্বাদশ জমিদার ভৌমিকের মধ্যে যাঁহারা রাজা মানসিংহের বঙ্গে আগমনের পরেও বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা হইয়া-ছিল। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজি কোন মতে বাদসাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। অনেক ষড়যন্ত্রে ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কতিপয় কূটবুদ্ধি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের সহায়তায় মানসিংহ এই সকল বিদ্রোহী-দিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন বিদ্রোহী রাজন্যগণের রাজ্য কতক সম্রাটের সরকারে খাস রাখা হইল, এবং উহার কতক অন্য জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইল। খাস অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত মহাল যুদ্ধ ও নৌপোতের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য নাওরা মহাল বলিয়া সরকারি খাস মহালের সামিল করিয়া রাখা হইল। মুকুন্দরায়ের ভূষণা মামুদপুর এইরূপে নাওরা মহালের অন্তর্গত রহিয়া গেল।

ঔরংজেব এই খাস নাওরা ভূষণা মামুদপুর, পুরস্কার-স্বরূপ সংগ্রামকে প্রদান করেন। সংগ্রাম তথায় এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। আমরা অতঃপর সংগ্রামের পারিবারিক ও জাতীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়া তৎপরে তাঁহার প্রধানতম বীরত্বের ও সম্মানের বিষয় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত বর্ণনা করিতে হইলে, অগ্রে তাহার জাতি, বাসস্থান ও বংশাদির বিষয় উল্লেখ করাই রীতিসঙ্গত। কিন্তু আমরা সংগ্রাম সম্বন্ধে ঐ সকল বিবরণের যাথার্থ্য প্রমাণের ভার স্বীয় স্কন্ধে লইতে ইচ্ছুক নহি। কারণ, যাহা প্রকৃতির অসীম চিরতমসে সমাবৃত রহিয়াছে, যাহা অম্বুধির অতল জলে নিমজ্জিত, অথবা যাহা হিমাদ্রির উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াও পাইবার উপায় নাই, তাহা খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে তদীয় জীবনের ঘটনা-পরম্পরা আলোচনা দ্বারা যতদূর বুঝিবার উপায় আছে, তাহাই এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারিবে।

আমাদের দেশে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে, সংগ্রাম বঙ্গদেশে আগমন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

ব্রাহ্মণের নিম্নেই এদেশে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়? তদুত্তরে নাকি এইরূপ জানিতে পান যে, "বৈদ্য জাতিই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ জাতি"; তখন তিনি আপনাকে "হাম বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত করেন। এস্থলে কেহ কেহ বলেন, যখন এই কথা জিজ্ঞাসিত হয়, তখন কোন বৈদ্য উপস্থিত না থাকায়, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা, এই আপদটা বৈদ্যের উপর চালাইয়া দিবার জন্যই এই কূটনীতির অবতারণা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই কথার কোনও মূল্য নাই। কারণ যে কোন সময়েরই ইতিবৃত্ত পাঠ করা যাউক না কেন, তাহাতেই দেখা যায়, কোন রাজকার্য্য উপলক্ষে বঙ্গের কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, কেহই কখনও প্রতিযোগিতায় ন্যূন ছিলেন না। তবে বৈদ্যজাতীয়গণের অপর দুইটি জাতি অপেক্ষা সংখ্যার ন্যূনতা ছিল। সংগ্রাম যখন এদেশে আসিয়া, একটা প্রধান রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিকটে যে দুই চারিটি বৈদ্য ছিল না, একথা কোন মতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বৈদ্যবংশীয় চাঁদরায় যে তাঁহার চিরসহায় ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে, সংগ্রামের পিতৃ-পিতামহাদির পরিচয় পাইবার উপায় নাই কেন? তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আমাদের কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টিই উহার প্রথম অন্তরায়; দ্বিতীয়তঃ কুলজীলেখকগণের নিগ্রহটাই উহার প্রধান কারণ। প্রস্তাবান্তরে বলিয়া গিয়াছি যে, আমাদের দেশে যাঁহারা কুলীনের সন্তান নহেন, তাঁহারা যেন ইহজগতেরও কেহ নহেন। তাঁহারা সজীব হইয়াও নির্জীব, বিদ্বান হইয়াও মূর্খ, আবার অন্যদিকে কুলীনের অসাধুনন্দনও কুলতিলক বলিয়া কতই না পূজনীয় ও সম্মাননীয় হন, এই জন্য মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত, মাধবকর, বাভটগুপ্ত ও ত্রিলোচন দাস প্রভৃতি মহাত্মগণের বংশাবলী বা কুলকাহিনী বিবৃত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে নাই। অথচ কতকগুলি শূন্যনামমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া কুলজীলেখকেরা কতই বাহাদুরী লইয়া গিয়াছেন। আমি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর * প্রবন্ধে লিখিয়াছি, বৈদ্যবংশের মধ্যে সিদ্ধ ও সাধ্য দুইটি থাক আছে। এতদ্ভিন্ন কষ্ট বলিয়াও নিম্নশ্রেণীর বৈদ্যের একটা থাক দৃষ্ট হয়। কুলপঞ্জিকালেখকেরা মাত্র সিদ্ধবংশ মধ্যে যাহারা কুলীন, কুলজ ও মৌলিক, তাঁহাদেরই বংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এমন কি সিদ্ধবংশ মধ্যে যাহারা কার্য্যদোষে সাধ্যবৎভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বংশাবলীরও উল্লেখ করা হয় নাই। সংগ্রাম সাহ, সালঙ্কায়ন গোত্রসম্ভূত ছিলেন, কষ্ট সাধ্য বংশ বলিয়া তাঁহার বংশাবলী কোন কুলজী গ্রন্থেই খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। তবে সিদ্ধবংশের সহিত আদান প্রদান থাকায়, তদ্বংশের কার্য্যকলাপের উল্লেখ স্থলে, তাহার ও তদ্বংশীয় কোন কোন ব্যক্তির নাম মাত্র কুলজী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

কুলজীর শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এই বোধ হয়, উচ্চ শ্রেণীর বৈদ্যগণের সহিত সাধ্যবৈদ্যগণ যখনই আদান প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই একটা বড় গোছের গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। নাগকন্যা গ্রহণ করিয়া ধন্বন্তরি সেন, দত্তকন্যা গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণ সেন, করকন্যা গ্রহণ করিয়া দুহি সেনের পিতা পুণ্ডরীকাক্ষ সেন এবং বিষ্ণুদাস প্রভৃতি যদি বা মার্জ্জিত হইয়াছিলেন কিন্তু অনেক সিদ্ধবংশীয়দিগকে এই কারণে সাধ্যবদ্ভাব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল।

প্রবাদ বাক্যে এবং কুলজী পাঠে অবগত হওয়া যায়, সালঙ্কায়ন গোত্রীয় সংগ্রাম সাহ, সিদ্ধবংশীয় বৈদ্যগণসহ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে, তাঁহার জাতি লইয়াই প্রথমে গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেক কার্য্য বলপূর্ব্বক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসম্পর্কিত মহাশয়েরা বহুকাল পর্য্যন্ত সমাজে আবদ্ধ ছিলেন। এখন সেরপুর, তুলসী ঘাট কি ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ বৈদ্যগণের সহিত বঙ্গীয় বৈদ্যেরা কার্য্য করিতে গেলে, যেমন সমাজে হলস্থুল পড়িয়া যায়, তখনও তদ্রূপ একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়া, বৈদ্যসমাজটাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই গোলযোগের প্রথম সূত্রপাত ভূষণা মামুদপুরের নিকটস্থ বাণীবহ, কালিয়া ও মামুদপুর প্রভৃতি স্থানেই উপস্থিত হয়। সংগ্রাম বাণীবহগ্রামবাসী শক্তিমাধব

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৬ সন ২য় ও ৩য় সংখ্যা দেখ।

ংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন * এবং তৎপুত্র রাধাকান্ত ধন্বন্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ৪টি কন্যা ক্রমে ধন্বন্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেনের সহিত ও উচলি রঘুনাথ সেনের সহিত, আদিত্য রঘুনাথ সেনের সহিত ও বিকর্ত্তন রামচন্দ্রের সহিত ও শক্তিগণবংশীয় দুর্গাদাস সেনের সহিত ও আত্মগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হয়। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক শেষটির মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন †। অপর কয়েকটি সম্বন্ধের বিষয়ে রামকান্ত কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংগ্রাম সম্ভবতঃ বঙ্গজ সমাজের সহিত আদান প্রদান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে রাঢ়ীয় সম্প্রদায়ের সহিতও কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই কারণে ভরত মল্লিক কৃত গ্রন্থে, মাত্র একটি কার্য্যের উল্লেখ আছে। সংগ্রাম সাহ, কেবল অর্থব্যয়ে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। ধন্বন্তরি উচলিবংশীয় বিজয় সেনের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় রামচন্দ্র সেন বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের সমাজপতি পদে বরিত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার ধনবল ও কুলকার্য্য-পরায়ণতা না থাকিলে, তিনি কখনও এতাদৃশ উচ্চ সম্মান পাইতে পারেন নাই। সংগ্রামের এইরূপ উচ্চপদস্থ সম্মাননীয় ঘরে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ধন বা জমি জমা প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়াও তিনি তাঁহাদিগকে কোন মতে বাধ্য করিতে পারেন না। তখন বলপ্রকাশে. রামচন্দ্রের পৌত্র রঘুনাথকে ধৃত করিয়া আনিয়া আপনার এক তনয়ার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কবিকণ্ঠহার কৃত গ্রন্থে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

"দুর্দ্দৈবাশনি-সম্পাতাদ্রঘুনাথো বুধো মৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণ পীড়িত॥"

ইহাতে বুঝা গেল, সংগ্রাম সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া রঘুনাথ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, ধন্বন্তরি আদিত্যবংশ হইতেও এইরূপ আর একটি বালক ধৃত হইয়া, ভূষণাতে প্রেরিত হয়। কিন্তু বালক সংগ্রামের কন্যা বিবাহ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনায় নদীজলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই সময়ে এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, সংগ্রামের কুটুম্বগণেরও সহিত যাহারা আদান প্রদান করিতে লাগিল, তাহারা পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজদোষ বলিয়া বৈদ্যসমাজে যাহারা ন্যূনভাবাপন্ন হয়, এই সংগ্রামের এবং তৎসংসৃষ্ট লোকের সংস্রবই তাহার মূল কারণ। প্রায় দুই পুরুষ পরে এই গোলযোগ নিরাকৃত হয়।

এইরূপ শালঙ্কায়ন গোত্রীয় অনেকের কার্য্য কলাপের পরিচয় কুলপঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়। শালঙ্কায়ন বংশ আজিও বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মলচিরা, কোটালিপাড়া এবং বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরে আর তাহাদিগের আদান প্রদান জন্য ততটা কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। শালঙ্কায়ন গোত্র, বৈদ্যের চতুর্ব্বিংশতি গোত্রের অন্তর্গত। সংগ্রাম এই শালঙ্কায়ন গোত্রীয় ছিলেন, যদি তাহা না হইত, তবে সাধারণতঃ লোকে "হারাইয়া তাড়াইয়া কাশ্যপ গোত্র" এইরূপ যে একটা কথার উল্লেখ করিয়া থাকে, সংগ্রাম সেই ভাবে আপনাকে কশ্যপ বা মৌদ্গল্য প্রভৃতি একটা সিদ্ধবংশের পরিচয় দিয়া সমাজে কতকটা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিতে পারিতেন। কারণ মৌদ্গল্য ও শালঙ্কায়ন এই উভয় গোত্রের উপাধিতেই দাস শব্দ লিখিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহোদয়গণের মধ্যে যে এইরূপ দুই চারিটা প্রসঙ্গ শ্রুত হওয়া না যায়, এমত নহে। সংগ্রাম হয় ত বাল্যকালাবধি হিন্দুস্থানে থাকিয়া লেখা পড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। বহুকাল বিদেশে থাকা নিবন্ধন দেশীয় রীতি নীতি ততটা পরিজ্ঞাত ছিলেন না এবং হিন্দী ব্যতীত বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন না। এখনও দেখা যায়, অনেক বঙ্গসন্তান বহুকাল বিলাতে অবস্থান করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিতে সমর্থ হন না।

---

* সদাশিবের পুত্র গোপীরমণ সেন তৎপুত্র মাধব রায় ও জগদানন্দ রায়। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোররপুর গ্রামে মাধবের বংশ এবং বাণীবহ গ্রামে জগদানন্দের বংশ বাস করিতেছে। কণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা। ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

† "রঘুনাথ মজুমদার রতিনাথ বিধানকৌ।
চত্বারো রঘুনাথস্য তনয়াঃ বিনয়ান্বিতাঃ।
রামকৃষ্ণো রামচন্দ্রো রমাকান্তস্তৃতীয়কঃ।
গঙ্গারামোঽনুজঃ সর্ব্বে মজুমদার ইতিশ্রুতাঃ।
ভূষণা রাজসংগ্রাম সাহাধ্যকস্তকোত্তমাঃ॥
চন্দ্রপ্রভা ২৪৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয়তঃ রাজসরকারে নিয়ত কার্য্য করিয়া তিনি পদোন্নতির সহিত সংগ্রাম সাহ উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার নীল শব্দের সহিত অন্য শব্দ যোগে যে পূর্ণ নাম ছিল, তাহা সাধারণে অবগত ছিল না। যেমন 'জঙ্গ বাহাদুর' নেপালের প্রধান সেনাপতির উপাধি মাত্র কিন্তু তিনি সাধারণের নিকট উক্ত নামেই পরিচিত, তাঁহার প্রকৃত নাম অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন।

কবিকণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা ১৫৭৫ শকে বিরচিত হয়, যথা—

"পঞ্চসপ্তত্যৌ শাকে নমোঽস্তু শূলপাণয়ে।
সমাপ্তোঽয়ং কুলগ্রন্থো জগতাং শুভমস্তু চ॥"

অতএব দেখা গেল, ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে বা ১৭১০ সংবতে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। এই সময়ে কবিকণ্ঠহার ও সংগ্রাম উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে সংগ্রাম সাহাবাজপুরে স্বীয় নামে গড়বন্দী করেন। এতদ্দৃষ্টে বোধ হয়, এই গড়বন্দী হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তিনি উচ্চ বৈদ্যগণের সহিত কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রয়াস পান। আমরা আবার এই সংগ্রামকেই ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে পরিণত বয়সে রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে মারওয়াড় প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই। তখন ঔরংজেব বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। এতদ্বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ, ঔরংজেবের একজন বিখ্যাত সেনানায়ক ছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে বহুদেশ ও জনপদ অধিকার করিয়া বাদসাহের প্রভুত্ব তথায় সংস্থাপিত করেন। সমগ্র বীরসমাজে তাঁহার সুযশের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু এরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কোথায় সম্রাট তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন, না তৎপরিবর্ত্তে যশোবন্তের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য তিনি কূট মন্ত্রণায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। যেখানে রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলা, ও শত্রুসঙ্কুল, সেই স্থানেই যশোবন্তের জন্য ব্যবস্থিত হইতে লাগিল। বাদসাহের রাজত্ব মধ্যে কাবুলের তুল্য দুর্গম স্থান, আর কোথায়ও ছিল না। বাদসাহের আদেশে যশোবন্ত তথাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া চলিলেন। ঔরংজেব যশোবন্তের জ্যেষ্ঠপুত্রকে বড়ই ভালবাসার ভাণ দেখাইয়া আপনার সন্নিকটে রাখিলেন। কোথায় রাজপুত্র বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া সুনাম ও যশোরাজি অর্জ্জন করিবেন, না তদ্বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইয়া উহাকে সমূলে বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। একদা বাদসাহ পুরস্কারস্বরূপ যশোবন্তের পুত্রকে একটী অঙ্গাবরণ প্রদান করেন। মহাহৃষ্টচিত্তে সম্রাটদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করিয়া তিনি উহা গাত্রে সন্নিবেশ করিলেন। অমনি যেন শত শত বৃশ্চিকে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। রাজপুত্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অচৈতন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। সম্রাট প্রদত্ত বিষময়পরিচ্ছদে তাঁহার প্রাণবায়ু অচিরে বহির্গত হইল। রাজা যশোবন্ত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রশোকে আর অধিক দিন জীবনধারণ করিলেন না, তাহার আত্মাও প্রিয়-পুত্রের আত্মার অনুসরণ করিল।

তৎপরে বাদসাহ যশোবন্তের প্রধান সেনানায়কগণকে প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার শিশুপুত্র অজিতসিংহকে হস্তগত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত রাজপুতেরা তাহাতে কোন মতে সম্মত হইল না। পরে বাদসাহ তাহাদের সমবেত দল ধৃত করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ ফল দর্শিল না। রাজপুতেরা আপন প্রভুর শিশুপুত্র ও বণিতাগণকে মারবাড়ে লইয়া গেল। খল স্বভাব সম্রাট তখন যোধপুর উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে কতিপয় সুদক্ষ সেনাপতির সহিত আপন পুত্র আকবরকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা যোধপুরের রাজপুতগণকে পরাস্ত করা দূরে থাকুক, বরং তথাকার রাজপ্রতিনিধি দুর্গাদাসের সমরকৌশলে পরাস্ত হইয়া, সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। আকবরের একটি রূপলাবণ্যবতী কুমারী রাজপুতদিগের হস্তে বন্দী হইল। অচিরে এই সংবাদ ঔরংজেবের নিকট পৌঁছিলে, পরাজয়ের জন্য তিনি যতদূর বিচলিত না হইলেন, পৌত্রী রাজপুতদিগের হস্তগত হইয়াছে এই সংবাদে তাহার মন তদপেক্ষা অস্থির হইয়া উঠিল। তখন একটা সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেলাই তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। অচিরে সন্ধির প্রস্তাব রাঠোড়দিগের নিকট প্রেরিত হইল, তাহারা

উহাতে সম্মত হইল। রাঠোড়েরা ত আর সাধ করিয়া বিবাদ করিতে বসে নাই, তাহারা কেবল আত্মরক্ষা-কল্পেই অসি ধারণ করিয়াছিল। এখন সম্রাটের প্রস্তাব তাহারা সাদরে গ্রহণ করিয়া বাদসাহের পৌত্রীকে তৎকরে সমর্পণ করিল। এই ব্যাপারে সম্রাট যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন এবং কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহের আর কোন আয়োজন বা চেষ্টা রহিল না।

খলের মন কখনও পরানিষ্ট চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে পারে না। রাঠোড়বাহিনীর শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় যতই বাদসাহের মনে উদিত হইতে লাগিল, ততই তিনি অধিকতর চিন্তিত হইতে লাগিলেন। যশোবন্তের বংশের বিলোপসাধন যেন তাঁহার এক মাত্র সঙ্কল্প হইয়া দাড়াইল। কেবল পৌত্রীর মোচনের জন্যই তিনি পূর্ব্বে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখন আর কোন আশঙ্কা নাই মনে করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর বাহিনীর সহিত কতিপয় প্রধান সেনাপতিকে যোধপুর আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে সংগ্রাম শাহ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বিবিধ যুদ্ধে বাদসাহের পক্ষে জয়লাভ করিয়া, বিশেষতঃ মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করিয়া, সংগ্রাম মধ্যবাঙ্গালায় কতকগুলি ভূবৃত্তি পান এবং সম্রাট তাঁহাকে মনসবদারের সম্মানীয় পদে বরণ করিয়াছিলেন। এখন সেই বয়োবৃদ্ধ সেনাপতিকে যোধপুর উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। সংগ্রাম যোধপুরে পৌছিয়া কয়েকটি যুদ্ধ করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইল, যোধপুরের বীরপুত্রেরা প্রমাদ গণিয়া যুদ্ধ করিয়াও যোধপুর রক্ষার আর কোন উপায় করিতে পারিল না। তখন তাহারা সেনাপতি সংগ্রামের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রধান ভাট কবিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। মহাত্মা টড্ সাহেব তাঁহার রাজস্থান ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬১ পৃষ্ঠায় এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবু তাহার যে সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতিপয় পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"সংবৎ ১৭৪১ অব্দের প্রারম্ভ কালে কি যুদ্ধ, কি বিভীষিকা, কিছুই শান্তি হইল না। সুজনসিংহ রাঠোড় সেনা লইয়া দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। এদিকে সাক্ত-চম্পাবত, কেশর কুম্পাবত, ভট্টি ও চৌহানদেব সৈন্তদের সাহায্যে যোধপুরস্থ যবন সেনাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সুজনসিংহ হত হইলে ভট্ট কবি সেনাপতি সংগ্রামের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিল,—আপনি স্বজাতীয় ভ্রাতৃদলে মিলিত হউন। সংগ্রাম তখন মনসবদার পদে অভিষিক্ত থাকিয়া ভূসম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন।"

(বরাট প্রেস রাজস্থান ২য় খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।)

সংগ্রামও হিন্দু ছিলেন, সুতরাং হিন্দুদিগের দুর্গতি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অচিরে রাঠোড় দলের সহিত তিনি সন্ধি করিলেন, এবং সম্রাটের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রভুত্ব রাঠোরদিগকে স্বীকার করাইয়া, তথা হইতে সসৈন্যে চলিয়া আসিলেন। এতৎসম্বন্ধে টড্ সাহেব, তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬২ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহারও অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা গেল। "সংগ্রাম যে কোন্ কুলসম্ভূত এবং কিরূপ উচ্চপদারূঢ় ছিলেন, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলাম না। তবে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি কোন মহদবংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।" মহাত্মা টড্ স্বীকার করিয়াছেন, সংগ্রাম ঔরংজেব বাদসাহের প্রধান সেনাপতি ও একজন মনসবদার ছিলেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দিখাঁকেও একজন সেনাপতি ও মনসবদার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। পরে তিনি সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একই সময়ে সংগ্রাম ও আলিবর্দ্দি, একই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংগ্রাম যে কতকগুলি ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাও টড্ উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু তিনি সংগ্রামকে যতটা চিনিতে পারিয়াছিলেন আমরা তদপেক্ষা কিছু বেশী জানিয়া শুনিয়া সংগ্রামের পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এখন দেখা উচিত, কবিকণ্ঠহার ভরত মল্লিক-প্রোক্ত সংগ্রাম আর সাহাবাজপুরের কেল্লা সংস্থাপক ও রাঠোড়-বিজয়ী সংগ্রাম, একই ব্যক্তি কি না। কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃঃ অব্দে বা ১৭১০ সংবতে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপর ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভা নাম্নী কুলপঞ্জিকা

প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহা কণ্ঠহারের গ্রন্থের ২২ বৎসর পরে বিরচিত হয়। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই সংগ্রামের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কণ্ঠহার যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন সংগ্রাম সাহের পুত্র পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুরকুলের পরিচয় অনুসারে বোধ হয়, সংগ্রাম ও তৎপুত্র রাধাকান্ত এবং কবিকণ্ঠহার একসময়ের লোক ছিলেন। তৎপর ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে সাহাবাজপুরে, সংগ্রাম, স্বনামে গড়বন্দী করেন। আলমগির-নামাতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তৎপর ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে সংগ্রামকে রাজস্থানের অন্তর্গত মারবাড় প্রদেশে রাঠোড়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায়।

১৬৫৩ হইতে ১৬৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় একত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে আমরা বঙ্গদেশে ও রাজপুতনায় সংগ্রামকে দেখিতে পাই। আবার এই সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ঔরংজেব বাদসাহই দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। মোগল রাজবংশ মধ্যে ঔরংজেব যত দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেরূপ আর কেহই পারেন নাই। এই সম্রাটের অধীনে থাকিয়া যে একই সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্রাট মধ্য-বাঙ্গালার ভূষণা মামুদপুর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীর অর্পণ করেন এবং কালিয়াতেও তাঁহার একটা জায়গীর ছিল, যাহা আজিও 'নাওরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটি অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদি ও মধুখালি স্থান-দ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কোঁড়কদির মাননীয় ভট্টাচার্য্য বংশের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার গুরু ছিলেন। অদ্যাপি তৎপ্রদত্ত কতিপয় ভূবৃত্তির লিখন উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়-দিগের নিকট বর্ত্তমান আছে। মথুরাপুর গ্রামে আজিও একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, যাহাকে সাধারণে সংগ্রামের দেউল বলিয়া থাকে। সংগ্রাম ও তদ্বংশীয়গণের পর ভূষণা, রাজা সীতারাম রায়ের হস্তগত হয়। সীতারাম রায় বিদ্রোহী হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎপরে ধৃত হইয়া নিহত হন। এই সময় ভূষণার জমিদারী, নাটোররাজ রঘুনন্দনের হস্তগত হয়। নাটোর রাজবংশের বিখ্যাতনামা রাণী ভবানীর সময়ে ভূষণাবাসী কোন ব্রাহ্মণের বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ঐ ব্রাহ্মণ রাণীর নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে ভূষণার পূর্ব্বস্বামী সংগ্রাম ও সীতারাম রায়ের নামো স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা প্রয়োজন বোধে, ঐ আবেদন পত্র হইতে একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পূর্ব্বৈঃ সংগ্রাম সাহা-নৃপতি প্রভৃতিভিঃ পালিতা ভূষণা যা,
সীতারামেণ পশ্চাত্তদনু রসবতী রামকান্তেন চোঢ়া*
সা চেদানীং সপত্নীকরযুগলগতা স্বামিহীনা বিরূপা,
কেষাং বা নানুগাসৌ নচ ভবতি কথং কেন বা নানুদমা।"

এখন নিঃসংশয়ের সহিত বলা যাইতে পারে, ভূষণারাজ সাহাবাদপুরের কেল্লার সংস্থাপক ও রাঠোড়বিজয়ী সংগ্রাম একই ব্যক্তিই। সম্রাট্ ঔরংজেবের অধীনে থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন সংগ্রাম আপনাকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সমাজের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহাকে আমাদের বাঙ্গালী বলিয়া গ্রহণ করিয়াই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

কার্য্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি

Heaven helps those who help themselves—যাহারা নিজের সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁদের সহায় হন —এই প্রবাদ বাক্যটি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল। মানব জীবনে আত্মসাহায্যের ইচ্ছাই ব্যক্তিগত চরিত্রের মূল স্বরূপ। ঐ মূল অনেক লোকের প্রকৃতিতে প্রোথিত হ'লে জাতীয় বল ও শক্তির উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতীয় জীবনেও ভিতরের সাহায্য যত উপকারী ও ফলদায়ী, বাহিরের সাহায্য তেমন নয়। কোন লোক বা জাতি নিজে কষ্ট করিয়া একটি দ্রব্য পাইলে বা কার্য্য সাধিলে তাহার চরিত্র যেরূপ দৃঢ় ও সতেজ

* রাণী ভবানী নাটোররাজ রামকান্তের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রামকান্তই ভূষণাধিপতি ছিলেন, তদন্তরে রাণী ভবানীর হস্তগত হয়; এইজন্য কবি ভূষণাকে "সপত্নী-করযুগলগতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

য়, পরের সাহায্য পাইলে বা সাধিলে সেরূপ হয় না, রং আরও নিস্তেজ ও অসহায় হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপরের প্রবাদ কোটির অর্থ অধিক বোধগম্য হইবে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার কি দ্রুত উন্নতিই হইয়াছে! পূর্ব্বে যেখানে একটি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ল, এখন সে স্থলে অন্ততঃ দুই তিনটি ছোট বড় স্কুল ঠিয়াছে—তালপাতা ও খাঁকের কলম ছাড়িয়া ছেলেরা ট পেন্সিল বা পেন কাগজ ধরিয়াছে; শিশুশিক্ষার রিবর্ত্তে হয় ত ফাষ্ট বুক পড়িতেছে, মাদুর ফেলিয়া ঞ্চিতে বসিতেছে—তা ছাড়া, ম্যাপ, গোলক, ফুটবল কেট—প্রভৃতি বিলাতী বিদ্যালয়গুলির সরঞ্জামের ট সহর ডিঙ্গাইয়া পল্লিগ্রামে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে—কিন্তু ন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতেছেন, সকলে এ দেশে রাজী শিক্ষার যেরূপ সুফল আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ ছুই হইতেছে না। প্রকৃত শিক্ষার ফলে সে নিরেট দৃঢ় মানুষের পরিবর্ত্তে আমাদের চারদিকে কি এক পা ও হাল্কা চরিত্রের উদয় হইতেছে। বালকেরা লের শিক্ষা শেষ করিয়া কলেজে উঠিতেছে, প্রতি সর কত ছাত্র বি,এ, এম্,এ, উপাধি ধরিয়া বাহির তেছে—অথচ যে চরিত্রগঠন ও জাতীয় উন্নতি শিক্ষার দেশ্য, তাহার কিছুই ফলিতেছে না। ইহার কারণ, ই সব বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য আমরা অন্য জাতিদ্বারা হির হইতে পাইয়াছি। এই শিক্ষার ইচ্ছা ও আবশ্যকতা অন্তর্জাতীয় হইত, বালকেরা যদি কার্য্যতঃ শিক্ষার রা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হা দ্বারা সুফল ফলিত।

ইউরোপের সর্ব্বত্রও দেখা যায় যে, অতি উৎকৃষ্ট ক্ষালয়গুলিও মানুষকে কার্য্যতঃ সাহায্য দিতে পারে ; উহা কেবল ব্যক্তিগত বা জাতীয় চরিত্র- নে পথদর্শকস্বরূপ। বহুদিন হইতে সকলেরই এই রণা হইয়া গিয়াছে যে, উত্তম শিক্ষানীতি বা রাজনীতি রাই মানুষ পৃথিবীতে সভ্য ও কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারে। ন্তু উত্তমশিক্ষাপ্রণালী বা নিয়মের দ্বারা যদিও মানুষকে ল পথে রাখিবার চেষ্টা করা যায়, এবং উৎকৃষ্ট আইনের সাহায্যে মানুষের জীবন, স্বত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করা হয়, কিন্তু কোনরূপ কঠোর শাসনেই অলসকে পরিশ্রমী, অমিতব্যয়ীকে মিতব্যয়ী ও মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী করিতে পারে না। এইরূপ আমূল উন্নতি কেবল ব্যক্তিগত কার্য্যশক্তি ও স্বার্থত্যাগের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে।

মানব ইতিহাসের সকল কালেই দেখিতে পাই যে, সকল জাতির শাসনরীতি সেই সেই জাতির লোক সমাজের চরিত্রের প্রতিকৃতি মাত্র। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ভালমন্দ জাতীয় চরিত্রের সমষ্টি দ্বারা সেই সেই জাতির আইন কানুন স্থিরীকৃত হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ভাল লোকেরা ভালরূপে, আর মন্দেরা মন্দরূপে শাসিত হইয়া থাকে। ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ পাই যে, কোন জাতির বা রাজ্যের শক্তি তাহার শাসন-প্রণালী অপেক্ষা লোক সমাজের চরিত্রের উপরই অধিক নির্ভর করে। এমন কি, মানব জাতির সভ্যতা ও মানব সমাজের স্ত্রীপুরুষ ও ছেলে মেয়েদের আত্মোন্নতি দ্বারাই সাধিত হয়।

জাতীয় অবনতি যেমন ব্যক্তিগত অলসতা, স্বার্থপরতা ও পাপের ফল—জাতীয় উন্নতিও সেইরূপ ব্যক্তিগত পরিশ্রম, কার্য্যক্ষমতা ও সততার সমষ্টিমাত্র। যে সকল সামাজিক কুনীতি দেখিয়া আমরা মনস্তাপ পাই, তাহাও অধিকাংশ স্থলে মানুষেরই কলুষিত ও অকর্ম্মণ্য জীবনের শাখা প্রশাখা। অনেকে আইনের দ্বারা উহা কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু যতদিন না মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অবস্থা আমূল বিশুদ্ধ ও উন্নত হয়, তত দিন উহা কোন না কোন প্রকারে বাড়িতে থাকিবে। গত ডিসেম্বর মাসে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন কালে—উহাতে রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক বিষয়েরও আন্দোলন হইবে পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। যে সকল স্বদেশহিতৈষী ভ্রাতারা ঐ মহৎকার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা যদি অল্প সময়ও দেশীয় লোকদিগকে কার্য্যমূলক জ্ঞান ও আত্মোন্নতির শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদারতা অধিকতর উচ্চ, স্বদেশপ্রেম অধিকতর গভীর ও তাঁহাদের সাধু চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।

মানুষ নিজেকে ভিতর হইতে যেরূপে শাসন করে- তাহারই উপর ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তি যত নির্ভর করে, বাহিরের শাসনের উপর ততদূর করে না। মানুষের পক্ষে নৈতিক অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও পাপাভ্যাসের দাস হওয়া যেরূপ ঘৃণাকর ও দুঃখজনক, যথেচ্ছাচার রাজার অধীনে ক্রীতদাস হওয়াও সেরূপ নয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ে দাসত্ব ধারণ করে, রাজা বা শাসন-রীতির পরিবর্ত্তনে সে কখন স্বাধীন হইতে পারে না।

সকল সভ্যজাতিই বহু শতাব্দীর চিন্তাশীল ও কর্ম্মিষ্ঠ লোকের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। জীবনের সকল অবস্থাতেই অধ্যবসায়সম্পন্ন ব্যক্তিরা—সামান্য কৃষক হইতে অভিজ্ঞ দার্শনিক পর্য্যন্ত—সকল প্রকার শ্রমশীল ও কার্য্যকারী মানুষই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি গাঁথিয়া থাকে। এক পুরুষের অবসানে আর এক পুরুষ—আর এক বংশ আসিয়া ঐ গুরু কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এইরূপে নিরন্তর শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদিগের কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারা সকল জাতির বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ম ও প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

এই কার্য্যতঃ শিক্ষাদ্বারা আত্মোন্নতির ইচ্ছা ইংরাজ জাতির ব্যক্তিগত চরিত্রে যেরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, সেরূপ অতি অল্প জাতির মধ্যেই দেখা যায়। উহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই সাধারণ ও সামান্য শ্রেণীর ভিতর হইতে চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তির উৎপত্তি হইতেছে। প্রতিদিন গৃহে, দোকানে, রাস্তায় ও কারখানায় মানুষ যে কার্য্যতঃ শিক্ষা পায়, তাহাই আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়। সকল জাতির এইরূপ কার্য্যতঃ শিক্ষাকেই জর্ম্মণ পণ্ডিত শিলর মানবজাতির প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া গিয়াছেন। কার্য্য, সদাচার ও আত্মসংযমের দ্বারাই মানুষ প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে পারে—উহাই মানুষকে জীবনের সকল কর্ত্তব্য প্রকৃষ্টরূপে সাধনের জন্য প্রস্তুত করে। যাবতীয় মহৎ চরিত্রের আখ্যায়িকা পড়িয়াও আমরা এই জ্ঞান শিক্ষা পাই যে, মানব জীবন—অধ্যয়ন অপেক্ষা অনুশীলন দ্বারা, সাহিত্য অপেক্ষা আদর্শ দ্বারা, জীবনী অপেক্ষা চরিত্র দেখিয়া অধিক কার্য্যমূলক জ্ঞানলাভ করে। আর ঐরূপ অভিজ্ঞ লোক সমাজের সমষ্টিতেই মানব জাতি ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে থাকে।

জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, মনের উপর কার্য্যমূলক জ্ঞানের সেইরূপ প্রভুত্ব দেখা যায়। উহা মানব জীবনের সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে। আমরা কে, কোথায় আছি, আমাদের শক্তি কতদূর, আমরা কি কাজ করিতে সমর্থ—এই সব গুরু বিষয়ে উহাই আমাদের মনকে সর্ব্বদা চিন্তাশীল রাখে। উহাই আমাদিগকে সুখময় কার্য্যের ন্যায় নিরানন্দ কর্ত্তব্যের দিকেও অগ্রসর করে। উহা আমাদিগকে গতানুশোচনা বা মনস্তাপের দ্বারা কার্য্যশক্তি বৃথা নষ্ট করিতে দেয় না। যদি আমরা একবার কোন কাজে বিফলকাম হই, তাহা হইলে উহাই আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ অধিক সতর্কতার সহিত আবার সেই কাজ সাধিতে শিক্ষা দেয়।

অনেকে মনে করেন, কল্পনাপ্রিয় লোকের মধ্যেই এই কার্য্যমূলক জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। অবশ্য, অতিরিক্ত কল্পনায় মুগ্ধ ভাবুকদের পক্ষে এ কথা সত্য হইতে পারে। কেন না, শরীরের ন্যায় মনেরও কখন কখন কেবল একটি অংশেরই বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বামনদিগের বৃহদাকার হাত, পা ও মাথা তাহাদের দীর্ঘতা গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু কেহ যদি ভাবেন যে, কল্পনা শক্তির সহিত কার্য্যমূলক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। কেননা, আমরা সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাই, যাঁহারা মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কল্পনাশক্তি প্রবল ছিল।

বেকন বলিয়াছেন - এই মানব জীবনের নাটকের মধ্যে কেবল ঈশ্বর ও স্বর্গের দূতেরা দর্শক হইবেন; চিন্তাশক্তি ও কার্য্যশক্তির সর্ব্বদাই মিল থাকিবে। শনি ও বৃহস্পতি—এই দুটি প্রকাণ্ড গ্রহের যোগের ন্যায় বিশ্রাম ও পরিশ্রমের, চিন্তা ও কার্য্যের দৃঢ় যোগ থাকিবে। এইরূপ মিলনই কার্য্যমূলক জ্ঞানের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের জীবনে আমরা এইরূপ কার্য্য ও কল্পনার যোগের স্পষ্ট প্রমাণ পাই। কার্য্যমূলক জ্ঞানের দ্বারাই অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধন করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সব কর্ম্মিষ্ঠ বিখ্যাত

ইংরাজদের মধ্যে আমরা সুতার কলের আবিষ্কারক স্যর রিচার্ড অকরাইট, চিফ জষ্টিস লর্ড টেণ্ডরডেন্ ও চিত্রকর টর্ণরকে দেখিতে পাই। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই সব প্রসিদ্ধ ও পূজ্য ব্যক্তিরা জীবনারম্ভে নাপিতের দোকানে কাজ করিতেন!

এমন কি, সর্ব্বদেশে আদৃত শেক্সপিয়রও অতি সামান্য শ্রেণীতে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা কসাইয়ের কাজ করিতেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি নিজেও পশম আঁচড়ানর কি কেরাণীর কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার নাটক সকল পড়িলে, তাঁহাকে শুধু এক কাজের নয়—সকল কাজের ও সকল বিষয়ের কার্য্যপ্রধান জ্ঞানে দক্ষ বলিয়াই স্থির হয়। তিনি নিজ রচনায় সমুদ্র সম্বন্ধে এমন সব যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা পড়িয়া নাবিকেরা তাঁহাকে এক জন নাবিক বলিয়াই স্থির করে। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক লেখা পাঠে যাজক ও পুরোহিতেরা ভাবেন, তিনি নিশ্চয় কোন যাজকের কেরাণী ছিলেন। আবার তাঁহার অশ্ববিদ্যায় নিপুণতা দেখিয়া অশ্ব ব্যবসায়ীরা বলেন, তিনি ঘোড়ারও কাজ করিতেন। বাস্তবিক, জীবন নাটকে তিনি যে একজন প্রকৃত নট ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি জীবনে নানা খেলা খেলিয়া ও নানা দিক দেখিয়া যে অসীম কার্য্যমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তক সমূহে আমরা সেই জ্ঞানেরই পরিচয় পাই। যত দিন মানব জগৎ থাকিবে, তত দিন উহাও অবিনাশী থাকিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবে।

আবার ইংরাজশ্রমজীবীদিগের মধ্যেও আমরা ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডলে, নৌবিদ্ কুক, ও কবি বরণের আবির্ভাব দেখিতে পাই। বিখ্যাত বেন জনসন্ও রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহার জীবনের প্রথমে কার্য্যমূলক জ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছিলেন। মহৎ চরিত্রের ইতিহাস খুঁজিলে এইরূপ সহস্র সহস্র উদাহরণ পাই, সকল স্থলেই কঠিন পরিশ্রম মানুষের আত্মোন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছিল।

শ্রম ব্যতীত কোন কর্ম্মেই পারদর্শিতা লাভ করা যায় না। আত্মোন্নতি, কর্ম্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতি—সকল বিষয়েই শ্রমশীল হস্ত ও চিন্তাশীল মস্তক একত্র মিলিয়া জয়লাভ করে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মিলেও কার্য্যক্ষমতা ভিন্ন কেহ কখনই বিখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, উইলের দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কার্য্যজ্ঞান ও শিক্ষা উহা দ্বারা আত্মগত করা যায় না। লোকে অর্থ দিয়া অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে বটে, কিন্তু কেহই টাকা দিয়া আত্মচর্চ্চা কিনিতে পারে না। সে জন্য, এই সব সামান্য শ্রমজীবীদের মধ্যে এত মহৎ চরিত্র দেখিয়া ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয় যে, মানুষের আত্মোন্নতি ও জাতীয় উন্নতির জন্য কার্য্যমূলক জ্ঞান যত আবশ্যক, অর্থ বা পরের সাহায্য তত নহে। সুখময় ও সচ্ছন্দ জীবন মানুষকে কষ্ট ও বিপদের সঙ্গে যুঝিতে শিখায় না। সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পালিত হইলে মানুষের উদ্যম ও কার্য্যক্ষমতা চালনার অভাবে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতরূপে, যে দারিদ্র্য বা সঙ্কটপূর্ণ জীবনকে মানুষ মহাশাপ বলিয়া ভয় পায়, তাহাই আত্মসাহায্য দ্বারা মানবজীবনে শুভ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইতে পারে। জীবনযুদ্ধের এইরূপ ব্যক্তিগত কার্য্যমূলক জ্ঞানই জাতীয় উন্নতির এক মাত্র উপায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

রসকদম্ব।

এই গ্রন্থ, কবিবল্লভ নামক কোন ব্যক্তির রচিত। কবিবল্লভ নাম কি উপাধি, তাহা জানা যায় নাই। গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকগুলি অশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ আমার আদর্শ পুস্তক খানির সংস্কৃত শ্লোকগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিত হয় নাই। গ্রন্থের আরম্ভ ভাগ এইরূপ,—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ। চূড়া পুষ্পময়ী শিখণ্ড-রুচিরা বয়ংসিচ বিম্বাধরৈঃ।
কৈশোরঞ্চ বরঞ্চ নয়ন কন্দর্প দৃষ্টি প্রভো॥
রম্যং রত্নময়ং বপুশ্চ বসনং হেমপ্রভং।
বৃন্দারণ্যে কলানিধির্বিজয়তে ক্রীড়া স রাসোৎসবঃ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজং রম্যং মধুব্রতং।
ন বা রাস কদম্বাখ্যং করোতি কবিবল্লভং॥

প্রথম পয়ার ছন্দ অহির রাগ—

জয় জয় নাগরশেখর রসগুরু।
অযাচক যাচক পূরক কল্পতরু॥
প্রেমরস ভক্তিদানে শুদ্ধ মহাশয়।
দোষলেশ নাহি ধরে গুণের আশ্রয়॥
নিজনামে অসীম......বিস্তারিল।
নিজগুণ কুসুম কীর্ত্তন প্রকাশিল॥

প্রেম নাম ফল দিয়া অখিল তুষিল।
অতি শাস্ত হৈঞা প্রভু জীব নিস্তারিল ॥
হেন প্রভুর রূপ করি নয়ান পুত্তোলি।
হৃদয়ে বান্ধিব গুণ প্রেমের পুতলি ॥
রসনা নর্ত্তক করি সে গুণ আবেশে।
শ্রবণ পূর্ণিত করে সেই নাম যশে ॥
সে তনু প্রসাদ ঘ্রাণে নাসিকা তুষিব।
প্রণাম কারণে নিজশির নিয়োজিব ॥
সে পদকমলে করি মন মধুকর।
ভুজযুগ করি দিব কর্ম্মের কিঙ্কর ॥
চরণ করিঞা অথ দেখি তার লোকে।
নিজ দেহে নিয়োজি খণ্ডিব ভব-শোকে ॥
যার গুণ ভাবি ভব অজের বৈভব।
শ্রুতি সতী সঘনে বাখানে অনুভব ॥
নারদ তুম্বরু শুক সহস্রবদনে।
জনম গোঙায় এক চরিত্র মননে ॥
হেন প্রভুর মহিমা বোলিতে কেবা পারে।
দরিদ্র গৃহস্থ যেন আশা করি মরে ॥
জীবের যোগ্যতা এহি জানিব বিশেষে।
যেন তেন মতে দিবা রাখে কৃষ্ণরসে ॥
কহিতে শুনিতে মাত্র করিব অভ্যাস।
ভাগ্যবশে আচরণ যে হয় প্রকাশ ॥
সুজন সঙ্গতি যদি কৃষ্ণকথা কহে।
কমি মল আনল শীতল রসদহে ॥
কর্ম্মে ত সাহস করি ঈশ্বরের বলে।
প্রভুর বলে সিন্ধু যেন লঙ্ঘিল বানরে ॥
অসাহসে কৃষ্ণকথা না কহিলে দোষ;
আপনে জল্পিঞা করে আপনে সন্তোষ ॥
তবে যত কৃষ্ণরসে রসিক সকল।
নানাবেশে বাস করে ধরণীমণ্ডল ॥
উত্তম মধ্যম যত যে করে জল্পনা।
সাধুগণ করে তাতে সরস কল্পনা ॥
সেই সাধুগণ মনে করিঞা ভরসা।
বুদ্ধি অনুমানে কহি কৃষ্ণগুণ ভাষা ॥
মধুহারী কীট পুষ্পে আসক্তি না করে।
যথা যথা মধু পায় তথা তথা হরে ॥
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃত শকতি।
মনুষ্য শরীরে এই বুদ্ধি তিন জাতি ॥
উত্তমে না দেয় দোষ গুণ মাত্র ভোগে।
শম্বুক ছাড়িঞা হংস সুখী পদ্ম যোগে ॥
দোষ গুণ সমভাব মধ্যম বিচারে।
সর্ব্বদ্রব্য মূল্য যেন বণিকের ঘরে ॥
দোষে দুঃখ গুণে সুখ ক্ষণেক প্রকাশে।
পল্লব ছাড়িঞা উষ্ট্র কণ্টক বিলাসে ॥
অতএব ভাবরস সুদৃঢ় জানিব।
ভাব হৈতে প্রেমযোগে স্বকর্ম্ম সাধিব ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব শক্তি অভিন্ন স্বভাব।
অন্যোন্যে সকলে করে সর্ব্বদেহে ভাব ॥
ভাব হৈতে পৃথক্ বুদ্ধি যেবা জন করে।
মস্তক ছেদিঞা যেন শরীর প্রহারে ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী।
পসার সাজিঞা তারা লেয় ভক্তিমণি ॥

প্রণাম করিঞা কহি পণ্ডিত চরণে।
কৃষ্ণের প্রসঙ্গ গুণ স্থাপিব যতনে ॥
হীনের পরশে গঙ্গা নহে অপবিত্র।
কবি-দোষে দোষী নহে কৃষ্ণের চরিত্র ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী।
ভক্তিমূল্য দিঞা তারা কিনে ভক্তিমণি ॥
দুয়ারে দুয়ারে লঞা সাধুগণ ফিরে।
আর্ত্তিমূল্য যাচিঞা বিকায় প্রতি ঘরে ॥
দরিদ্র অবল খঞ্জ অঙ্গহীন জনে।
প্রণিপাতে সেই ভক্তি কিনে বিনি ধনে ॥
তিক্ত মিষ্ট কটু কসা ক্ষার অম্ল নহে।
নিত্য নিত্য নবধাস জন্মে নব দেহে ॥
রাজারে নিবারে নারে না পোড়ে আনলে।
জ্ঞাতিগণে না হিংসয়ে না দেখে তস্করে ॥
নাড়িতে বহিতে কিছু নাহি পরিশ্রম।
বিলাইতে অক্ষয় ভোগিতে অনুপম ॥
অনায়াসে হেন দ্রব্য পাঞা সর্ব্বজনে।
অচৈতন্য হারায় আলস্য অভিমানে ॥
চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।
নিত্যানন্দে আনন্দ করুক অতিশয় ॥
অদ্বৈতে অদ্বৈত যেন করে প্রেম সঙ্গ।
গদাধর ধারা যেন রসের তরঙ্গ ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব সুজনে।
তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণে ॥
শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞানচক্ষু-দাতা।
সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা ॥
জন্মে জন্মে এই মাত্র লভুক প্রসাদ।
যাহা হৈতে খণ্ডে ঘোর সংসার বিষাদ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব ॥
চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ।
লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে।
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে।
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি।
অন্তরে প্রবেশ তবে না হয় মাধুরী ॥
অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান।
পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান ॥
তে কারণে দঢ়াঞা কহিল নিজমনে।
পূর্ব্বপক্ষ যে করে সন্ধান সেই জানে ॥
গ্রাম্য কথা হেন মতি ছাড় সর্ব্বজনে।
নিরবধি কর প্রেম অমৃত ভোজনে ॥
হাস্য অনুরাগ শান্তি শৃঙ্গার আলাপ।
যে রসে রসিক যেই সেই করে ভাব ॥
ভক্তিরস অবশ্য লভিবে কৃষ্ণ গুণে।
শ্রীকবি বল্লভে কহে ধরিঞা চরণে ॥

কবির গুরুর নাম উদ্ধব দাস। কবি, কৃষ্ণসংহিতা নামক কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কবি, দ্বারকাপুরীর দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন, বর্ণনায় বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। উভয়ের কথোপ

কথন বর্ণনায় কবি বিলক্ষণ লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভাব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ও রুক্মিণী, রৈবতক পর্ব্বতে, তত্রত্য জনগণের প্রেমরীতি দর্শন করিতে যান। পথিমধ্যে রুক্মিণী যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, কৃষ্ণ তৎসমুদায়ের উত্তরদান করিয়াছেন। সৃষ্টি-তত্ব, ভূবর্ণনা, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বর্ণনা, সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ ও সুমেরু পর্ব্বতের সুন্দর বর্ণনা আছে।

কবির গোলোক বর্ণনা—

সর্ব্বোপরি গোলোক সুরভি অধিকারী।
গোলোকের রূপ গুণ কি বর্ণিতে পারি॥
রত্নমণি ভূমি তাতে ধূলি চিন্তামণি।
পরশে রচিত বেদী পথ অনুমানি॥
মণিময় গৃহ শুক্ক কাননে রচিত।
সর্ব্বধাতু কোমল সুগন্ধি নানারীত॥
সরোবরের নীর সব অমৃত সমান।
মধু পরিপূর্ণ হৈঞা নদীর নির্ম্মাণ॥
জলযোগে সঘনে বিহরে দেবহংস।
সর্ব্বসুখ মূর্ত্তিমান্ ভোগে নানা অংশ॥
সর্ব্ববৃক্ষ কল্পদ্রুম নানা গুণ ধরে।
ফলফুল মকরন্দ গন্ধে শোভা করে॥
অযাচক যাচক কাহাকে নাহি জানে।
বাঞ্ছা বিনে পূর্ণ করে নানা রস দানে।
নব নব সুখ সব শরীরে উদয়।
মানসে বিস্তর ভোগ না বুঝি নির্ণয়॥
রমণী রসিক যাতে অখণ্ড যৌবন।
বিনি পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র জানে সর্ব্বজন॥
প্রেমরস সুখরস মূর্ত্তিমন্ত দেখি।
অখণ্ড আনন্দ সর্ব্বজীব মহাসুখী॥
কার্য্য বিনা কারণ সর্ব্বত্র উপাদান।
স্বাদুগন্ধ রূপবতী সর্ব্ব মূর্ত্তিমান্॥
গীতচ্ছন্দে কথা যাতে নৃত্যচ্ছন্দে গতি।
সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপতি॥
না ভোগিলে সর্ব্বরস ভোগে সর্ব্বজন।
না দেখিঞা সর্ব্বরূপ করে নিরীক্ষণ॥
না বোলিলে সর্ব্বকথা বুঝে অনুমানে।
না শুনিলে সর্ব্বধ্বনি শুনে সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সর্ব্ব না রসিঞা রসে।
য নর সকল কর্ম্ম পূরে বিনি শ্রমে॥
গোলোকের রীতি অতি অসীম উপমা।
কোটি কোটি অনন্তে কহিতে নারে সীমা॥

কবির বর্ণনা অতি মনোহারিণী। মধ্যে মধ্যে সুন্দর অনুপ্রাসচ্ছটাও আছে,—

নলিনী দোলনী শোভে অমৃত লহরী।
উড়ে পড়ে মধু পিয়ে মাতল ভ্রমরী॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে শীতল সুগন্ধ।
অবিরত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ॥

বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে ষোড়শ দলান্বিত পদ্মের ক্রোড়ে যে যে সুন্দরীর ভাবনা করেন, তাহা এই—

সম্মুখের দলে বসে বৃন্দা দেবী রামা।
শব্দরূপা মূর্ত্তি রতি অতি কৃষ্ণপ্রেমা॥
তার বামে রঙ্গদেবী পরম সুন্দরী।
ঐশান্তে সুভদ্রা দেবী রূপ অধিকারী॥
তার বামে ভদ্রাদেবী রস মূর্ত্তিমতী।
তার বামে রক্তরেখা মধ্যমরী সতী॥
তার বামে শৈব্যাদেবী ভোগিনী সুন্দরী।
মূর্ত্তিমতী ছয় শক্তি রূপ অধিকারী॥
ষট্‌কোণে বসতি এই প্রধান নায়িকা।
কৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম আনন্দ-দায়িকা॥
তার তলে বাম পাশে ভূশক্তি সুন্দরী।
স্নিগ্ধ দুর্ব্বাদল শ্যামা দিব্য বেশধারী॥
কৃষ্ণগীত রসগানে বীণা যন্ত্র ধরে।
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল কৃষ্ণ প্রেমরস ভরে॥
শব্দাদি বিষয় চিত্ত কৃষ্ণেতে অর্পিতা।
কৃষ্ণের বল্লভা ধৈর্য্য চরিত্রে পণ্ডিতা॥
ষট্‌কোণ দক্ষিণ ভাগে শ্রীশক্তি রমণী।
দিব্য বেশবাস অতি নূতন যৌবনী॥
কুচের অঙ্কুর তনু ননীর পুতুলি।
ক্ষীণকটি উরুগুরু বিচিত্র ত্রিবলী॥
শুদ্ধহেম জিনি তনু দিব্যরূপ শোভা
কায়মনোবচনে সঘনে করে সেবা॥
এদুই আধার রূপে থাকে অনুরাগে।
তার বাহ্যে অষ্টদল শোভে অষ্টভাগে॥
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামলা বায়ব্যে।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা অনুক্ষণ সেবে॥
প্রিয়প্রিয়া ঐশান্যে বিশাখা পূর্ব্বদিকে।
অগ্নিকোণে শৈব্যা পদ্মা সুদক্ষিণ ভাগে॥
নৈঋতে বসতি ভদ্রা সেবে প্রাণপতি।
কৃষ্ণ অঙ্গে ইন্দ্রিয় যোজিঞা করে স্থিতি॥
তপকোণে অষ্ট দলে শোভে অষ্ট রামা।
চারু চন্দ্রাবলী আর চিত্ররেখা নামা॥
চন্দ্রাবতী মদন সুন্দরী প্রিয়াপ্রিয়া।
মধুমতী শশিরেখা শোভে হরিপ্রিয়া॥
ষোলয় দলেতে শোভে ষোলয় সুন্দরী।
একজন সংহতি সহস্র অনুচরী॥

যথেষ্ট উদ্ধৃত হইল। আর উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক মনে করি। কবির বর্ণনায় বৈষ্ণবদের উপাসনা তত্ত্বের অনেক নিগূঢ় কথা জানা যায়। কবির পরকীয়া রসটী বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালায় "অ" (নস্থানে উৎপন্ন) অব্যয়ের ব্যবহারে বৈচিত্র্য ছিল। অনেক স্থানে উহার কোন অর্থ থাকিত না। যথা—

অনাস্তিক জনের সুদৃঢ় নহে ভাব
একান্তিক জানে সত্য অনে প্রেমলাভ

এখানে অনাস্তিক শব্দের অর্থ নাস্তিক। এইরূপ কুমারী স্থানে অকুমারী ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয় প্রায় হইত না। ঈপ্ ও নী প্রত্যয়ের ব্যবহারই অধিক ছিল। উহাই যেন বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি। এখনও সাধারণ লোকে পণ্ডিত, শিয়াল, শিশু, বিড়াল প্রভৃতির স্ত্রীলিঙ্গে পণ্ডিতনী শিয়াল্নী, শিশুনী, বিড়াল্নী প্রভৃতি ব্যবহার করে। মালদহ জেলায় কর্ত্তা ও সাহু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কর্ত্তানী ও সাহুনী বা সাহোন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রন্থের শেষ ভাগ এইরূপ—

কলিযুগে চৈতন্য সরস অবতার।
নিজগুণ সঙ্গে কৈল প্রেমের প্রচার॥
আনন্দে পড়িঞা প্রেম বিচার না কৈল।
গুপ্তরস চরিত্র সভাকে জানাইল॥
তবে সে মহান্তগণ প্রেমে চিত্ত দিঞা।
ঘরে ঘরে বিভজিল যতন করিঞা॥
বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়।
বনমালী দাসস্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্য লীলার আরম্ভ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরস কদম্ব॥
জয় জয় ধ্বনি আছে সূত্রের সন্ধান।
দ্বারকা বর্ণন যার বৈভব নিদান॥
হাস্যরস মোক্ষ জানি রুক্মিণী রভসে।
রয়বত (?) চরিত্র জানিব প্রেমরসে॥
বুঝিব অদ্ভুত রস ব্রহ্মাণ্ড চরিত্রে।
শিক্ষারস জানি তিন গুণ বিস্তারিতে॥
স্তুতিরস জানিব রুক্মিণী মিষ্টবাণী।
জীবজন্ম বিচারে ইন্দ্রিয় ভেদ জানি॥
বুঝিব শৃঙ্গার রস নিত্যলীলা হনে।
প্রেমরস জানি পুন গুপ্ত প্রেম গুণে॥
শান্তিরস অনুরাগ বৈরাগ্য লক্ষণ।
দ্বিতীয় তৃতীয় ভাবে জানিব ভজন॥
সংসারি বদ্ধতা ভাবে বীভৎস নিদান।
বর্ণভেদে জানি আস্থা রসের সন্ধান॥
ভক্তিরস জানিব নারদ দরশনে।
ভীতরস জানিব সে নারদ কথনে॥
মুনি মন কথায়ে বিস্ময় রস জানি।
সত্যভামা বিরহে করুণ রস মানি॥
বীররস জানিব ইন্দ্রের অহঙ্কারে।
ক্রোধরস জানি পুন ঈশ্বর শরীরে॥
শৃঙ্গাল বিরহ সর্ব্বরস বিস্তারিল।
তেকারণে নাম রসকদম্ব রাখিল॥
ঈশ্বর চৈতন্য প্রেমভক্তি রসধাম।
ভব দুঃখ বিমোচনে নিত্যানন্দ নাম॥
অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয়।
জগতে ভাসাঞা দিল প্রেমের নির্ণয়॥
নিজগুরু ঠাকুর উদ্ধব দাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার গুভান॥
শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী।
প্রাকৃতে নিখিল রস সর্ব্বজীবে লাগি॥
রুক্মিণীতে কৃষ্ণকথা বহুত বিস্তার।
সমুদ্র প্রমাণ তাহা জানি রস তার॥
মূই মূর্খ হান তাহে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সঙ্কটে॥
শুনিলেহি সাধুগণ প্রবেশিবে ভাগ্যে।
পাষণ্ড প্রবেশ হৈবে পরিহাস যোগে॥
প্রাকৃত কারণে লোক অনুভাব কহে।
বিচারিলে মহা তত্ত্ব গ্রাম্য কথা নহে॥
শাক্ত, শৈব, সৌর, আর বৈষ্ণব জানিবে।
যার যেই মত সেই বিচারে পাইবে॥
কবি দোষ ছাড়িঞা তত্ত্বেতে দেহ মতি।
ভজিঞা সংসার বন্ধ ছাড় শীঘ্রগতি॥
কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে।
সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জন্ম হৈল প্রবন্ধ নির্ণয়॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিল কারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রিগণ॥
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা॥
আর যত বন্ধুগণ দিল উপদেশ।
তা সভাকে কৃষ্ণপ্রেম লভুক বিশেষ॥
করোত জাতির মহা স্থানের সমীপে।
অমবাড়া গ্রামেত বাস আছিল স্বরূপে॥
ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌষমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রস-কদম্ব পুস্তক॥
রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হয়ে এক মতি।
শ্রীকবিবল্লভে পুন বোলে এই স্তুতি॥

ইতি, শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত রসকদম্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ। যথা দৃষ্টেত্যাদি
শশিরস বালশূন্য যুক্ত শাকেভদব্দে।
প্রতিপদি সিতপক্ষে বাহুলে মাসি নক্তং॥
রুক্মিণী কৃষ্ণসংবাদ, শ্রীআত্মারাম দেব শর্ম্মণস্য লিখিত।

কবির বাসস্থান "করোত জাতির মহাস্থান সমীপে ছিল। করোত জাতি, কোন জাতি ও তাহাদের মহাস্থান কোথায়, আমরা বুঝিতে পারি নাই। কবি সম্বন্ধে আমরা কেবল এই কয়েকটী কথা জানিতে পারিয়াছি, কবির পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। কবি, নরহরি দাস নামক ব্যক্তির শিষ্য

মুকুট রায় নামক ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এ কোন্ নরহরি দাস? কবির গুরুর নাম উদ্ধব দাস, বৃন্দাবনস্থ রূপসনাতনের নিকট যে রস-তত্ত্ব শ্রবণ করেন, কবি, বনমালীর নিকট সেই তত্ত্ব শুনিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ খানিতে দ্বাবিংশতি সর্গ আছে। এই গ্রন্থ ১৫২০ শকে রচিত হইয়াছে। কেবল পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত এই গ্রন্থে অন্য ছন্দের ব্যবহার হয় নাই। চারি চরণে এক এক শ্লোক ধরা হইয়াছে, যথা—

> সাতকালে পরমায়ু নিত্য করে ক্ষয়।
> সংসারী সকলে কিছু না বুঝে নির্ণয়॥
> প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রজনী যত জাগে।
> সংসারী বিকর্ম্ম ভোগে নানা অনুরাগে॥

ইহা এক পদ বা শ্লোক। এই গ্রন্থে এইরূপ সহস্র পদ আছে। গ্রন্থের অক্ষর সংখ্যা ২০৬০০০০। আমরা যে গ্রন্থ দেখিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম, তাহা ১৬৫০ শকে লিখিত। সাহাপুর গ্রামের গণেশ দাস বৈরাগীর বাটীতে এই পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে রস-কদম্ব এক খানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার মুদ্রণ হইলে ভাল হয়।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

অভিধান-আলোচনা।

(Half hour with Amarakosh)

অভিধান পড়া আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা। সংস্কৃত পড়িতে হইলে সাধারণতঃ অমরকোষ মুখস্থ করিতে হইত। এখন প্রাচীন প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। কতক প্রাচীন জিনিষের পুনঃপ্রচলন আরব্ধ হইয়াছে, কিন্তু অভিধান-পাঠ প্রথার আজিও চলন হয় নাই।

অভিধান পড়ার গুণ অনেক ছিল। এখন প্রায়ই দেখা যায়, বি, এ, এম্, এ পাশ করিয়াও কি ইংরাজি, কি সংস্কৃত, উভয় ভাষারই অনেক শব্দ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত সংস্কার অথবা একটা অস্পষ্ট সংস্কারমাত্র রহিয়াছে, প্রকৃত অর্থজ্ঞান আমাদের নাই। আবার অভিধান না পড়ায় আমাদের পরিজ্ঞাত শব্দসমূহের পুঁজি (Stock of Words) অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি দোষ এখনকার শিক্ষিতসমাজে খুব দেখিতে পাওয়া যায়।

সে দিন অমরকোষের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কতকগুলি শব্দ এবং তাহার অর্থসম্বন্ধে সাধারণের কিরূপ ভ্রান্ত সংস্কার আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহাই মনে হইতে লাগিল। নিম্নে তাহারই কতকগুলি উদাহরণ দিলাম, এবং অমরধৃত অর্থও দিলাম। পাঠক পাঠিকা শব্দগুলির অর্থসম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের সংস্কার এবং অমরের বচন, এই দুটি নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। আমি অনেক সময়ে আমার শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহাদের অনেক ভ্রান্ত সংস্কার রহিয়াছে। কতকগুলি শব্দার্থ সম্বন্ধে আমার নিজেরই ভ্রান্তি দেখিয়া কত সময়ে লজ্জিত হইয়াছি।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। একার্থ-বোধক অনেকগুলি শব্দ সকল ভাষায় পাওয়া যায়। সেই শব্দগুলির অর্থ অথবা প্রয়োগবিষয়ে অনেক সময়ে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য কল্পিত হইয়া থাকে। ইংরাজিতে যেমন Wit ও humour, wish ও desire প্রভৃতি। যে ভাষায় এইরূপ একার্থবোধক শব্দসমূহের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য অধিক দেখা যায়, সে ভাষাকে তত অ[illegible] বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ একটি [illegible]র্থের বোধের জন্য দশটি শব্দ অনাবশ্যক, সুতরাং এই দশটি শব্দের মধ্যে অর্থগত অথবা প্রয়োগ-গত সূক্ষ্ম পার্থক্যের কল্পনা করিয়া ভাষার মধ্যে বিচিত্রতা এবং শব্দবল সম্পাদিত করা ভাষার উন্নত এবং পরিণত অবস্থার পরিচায়ক। অভিধান পাঠের সময় অথবা ভাষা শিক্ষার সময়, এই বিষয়ের আলোচনা করিলে যেমন প্রভূত আনন্দ লাভ হয়, তেমনই প্রভূত জ্ঞানলাভও হইয়া থাকে—

(১) অরণ্যানী—মহারণ্য। "মহারণ্যমরণ্যানী"। উপবন—কৃত্রিম বন। আরামঃ স্যাদুপবনং কৃত্রিমং বনমেব যৎ।

বৃক্ষবাটিকা—অমাত্য এবং বেশ্যার গৃহের সমীপবর্ত্তী উপবন। অমাত্য "গণিকাগেহোপবনে বৃক্ষবাটিকা।" ইহাই অমরধৃত অর্থ। অন্য অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা নহে। শকুন্তলায়, যথা,—"অয়ে! দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকা আলাপ-ইব শ্রূয়তে"।

উদ্যান—রাজার সাধারণ বন।

প্রমদবন—রাজার অন্তঃপুরবর্ত্তী বিহারকানন। "উদ্যানং রাজ্ঞঃ সাধারণং বনং স্যাদেতদেব প্রমদবনমন্তঃ-পুরোচিতং। কত লোকে 'প্রমোদবন' লিখিয়া থাকে।

(২) পংক্তি—শ্রেণীর সাধারণ নাম। "বীথ্যালিরাবলিঃ পংক্তিঃ শ্রেণী।"

লেখা-রাজি—নিবিড় পংক্তির নাম।

(৩) বানস্পত্য—যে বৃক্ষের পুষ্প হইতে ফল জন্মে।

বনস্পতি—পুষ্পব্যতিরেকে যে বৃক্ষে ফল জন্মে।

"বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাৎ তৈরপুষ্পাদ্বনস্পতিঃ।"

(৪) বল্লী—লতা। "বল্লরির্মঞ্জরিঃ।"

বল্লরী—মঞ্জরী, পল্লবাঙ্কুর। "বল্লী তু ব্রততির্লতা।"

(৫) পত্রের সাধারণ শব্দ—পত্রং পলাশং ছদনং দলং পর্ণং ছদঃ (পুমান্)।

কচি নূতন পাতার নাম—পল্লব, কিসলয়। "পল্লবোঽস্ত্রী কিসলয়ং।"

(৬) কদলী বৃক্ষকে 'মোচা' বলে। বাঙ্গলায় কলার ফুলকে মোচা বলে।

(৭) সামান্য স্ত্রীর বাচক শব্দ—"স্ত্রী যোষিদবলা যোষা নারী সীমন্তিনী বধূঃ। প্রতীপদর্শিনী বামা বনিতা মহিলা তথা।"

স্ত্রী-বিশেষের নাম যথা—"বিশেষাশ্চাঙ্গনা ভীরুঃ কামিনী বামলোচনা। প্রমদা ভাবিনী কান্তা ললনা চ নিতম্বিনী। সুন্দরী রমণী রামা।"

কোপযুক্তা রমণীর নাম—"কোপনা সৈব ভামিনী।"

পিতৃগৃহস্থিতা স্ত্রীর বাচক শব্দ—"চিরণ্টী তু সুবাসিনী [স্ববাসিনী]।"

(৮) গুল্ফ ও জানুর (গোড়ালি ও হাঁটুর) মধ্য ভাগের নাম—জঙ্ঘা। ইংরাজিতে যাহাকে (ankle) বলে। "জঙ্ঘা তু প্রসৃতা।" জঙ্ঘা অর্থে উরু নহে।

জানু—হাঁটু। জানূরুপর্ব্বাষ্ঠীবদস্ত্রিয়াং।

(৯) অলক—চূর্ণ কেশ। অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাঃ।

(১০) স্ত্রীর কটিভূষণের নাম—মেখলা, কাঞ্চী প্রভৃতি।

পুরুষের কটিভূষণের নাম—শৃঙ্খল। (!) "স্ত্রী কট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রসনা তথা। ক্লীবে সারসনং চাথ পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং ত্রিষু।

(১১) পট্ট বস্ত্র—বাল্ক, ক্ষৌম।

সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্র—ক্ষৌম, দুকূল।

(১২) নিধুবন—ইহা কোন উপবন বা কুঞ্জবন নহে। ধূবনং কম্পনং। নিধুবন মৈথুনের বাচক শব্দমাত্র। "ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ সঃ।" গ্রাম্যধর্ম্ম শব্দটি প্রণিধান যোগ্য।

(১৩) ধেনু—নবপ্রসূতা গো। "ধেনুঃ স্যান্নব-সূতিকা।"

(১৪) প্রসূন—ফুল, ফল। "প্রসূনং পুষ্পফলয়োঃ।"

(১৫) পর্জ্জন্য—শব্দায়মান মেঘ। "পর্জ্জন্যৌরসদব্দেন্দ্রৌ।"

(১৬) অধর—নিম্ন ওষ্ঠ।

(১৭) পূর্ণিমার সাধারণ নাম—"পৌর্ণমাসী তু পূর্ণিমা।"

চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমার নাম—অনুমতি।

পূর্ণচন্দ্রযুক্তা পূর্ণিমার নাম—রাকা।

"কলাহীনে সানুমতিঃ পূর্ণে রাকা নিশাকরে।"

(১৮) মুহূর্ত্ত—দ্বাদশ ক্ষণ পরিমিত কাল। ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। সুতরাং এক মুহূর্ত্তে ৪৮ মিনিট্।

"ক্ষণস্তে তু মুহূর্ত্তো দ্বাদশাস্ত্রিয়াং। তে তু ত্রিংশদহোরাত্রঃ।"

(১৯) নিদাঘ—গ্রীষ্ম ঋতু। দুপুর বেলা নহে।

নিদাঘ অর্থে—ঘর্ম্মও হয়।

(২০) পরিমল—কুঙ্কুমাদির মর্দ্দনে উত্থিত মনোহর গন্ধ। "বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে।"

আমোদ—অতি দূরপ্রসারী মনোহর গন্ধ। "আমোদঃ সোঽতিনির্হারী।"

সুরভি, ঘ্রাণ-তর্পণ, ইষ্টগন্ধ, সুগন্ধি—সাধারণ সুগন্ধি বাচক শব্দ।

আমোদী—কর্পূরাদিজনিত মুখ গন্ধের নাম। "আমোদী মুখবাসনঃ।"

(২১) ঈষৎ পাণ্ডু বর্ণের নাম—ধূসর। "ঈষৎ পাণ্ডুর ধূসরঃ।"

নীল শব্দে কৃষ্ণবর্ণকেও বুঝায়। কৃষ্ণবর্ণের বাচক শব্দ, যথা—কৃষ্ণে নীলাসিত-শ্যাম-কাল শ্যামল-মেচকাঃ। কৃষ্ণ অর্থে নীল শব্দের প্রয়োগ বহুস্থলে দেখা যায়।

হরিৎ—সবুজ বর্ণ। "পলাশো হরিতো হরিৎ।" পত্রো বর্ণ। অনেকের হরিৎকে হলদে অর্থাৎ পীতবর্ণ বলিয়া ধারণা আছে।

অরুণ—ঈষৎ রক্তবর্ণ। "অব্যক্ত-রাগস্তরুণ।"

(২২) আলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, বিলাপ, বিপ্রলাপ সংলাপ, সুপ্রলাপ, এবং অপলাপ, এই কয়েকটি শব্দ লপ্ ধাতু নিষ্পন্ন। উহাদের অর্থ, যথা,—"স্যাদাভাষণমালাপঃ, প্রলাপোঽনর্থকং বচঃ। অনুলাপো মুহুর্ভাষা, বিলাপঃ পরিদেবনং। বিপ্রলাপো বিরোধোক্তিঃ, সংলাপো ভাষণং মিথঃ। সুপ্রলাপো সুবচনমপলাপস্তুনিহ্নবঃ॥"

(২৩) স্মিত—অল্প হাস্যের নাম।

বিহসিত—মধ্যম হাস্য। আচ্ছুরিতক—অতিশয় হাস্য।

"স্যাদাচ্ছুরিতকং হাসঃ সোৎপ্রাসঃ স মনাক্ স্মিতং। মধ্যমঃ স্যাদ্বিহসিতং।"

(২৪) অন্ধকার—তমস।

অল্প অন্ধকার—অবতমস।

অতিশয় অন্ধকার—অন্ধতমস।

বিশ্বব্যাপক অন্ধকার—সন্তমস।

"ধ্বান্তে গাঢ়োঽন্ধতমসং ক্ষীণেঽবতমসং তমঃ বিষ্বক্ সন্তমসং।"

(২৫) নলিনী—পদ্মলতার বাচক শব্দ।

নলিন—পদ্ম। "নলিন্যান্তু বিসিনী পদ্মিনী।"

পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম। "পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজং।"

কোকনদ—রক্তপদ্ম। "রক্তোৎপলং কোকনদং।"

বিস—পদ্মের মৃণাল। "মৃণালং বিসং।"

(২৬) প্রান্তর—দূর এবং শূন্য পথ। "প্রান্তরং দূরশূন্যোঽধ্বা।"

কান্তার—দুর্গম পথ। "কান্তারো বর্ত্ম দুর্গমং।" কান্তার অর্থে মহারণ্যও হয়। "মহারণ্যে দুর্গপথে কান্তারঃ পুন্নপুংসকং।"

(২৭) গণ্ডশৈল—পর্ব্বত হইতে চ্যুত স্থূল প্রস্তর। ইহার অর্থ ছোট শৈল নহে।

"গণ্ডশৈলাস্তু—চ্যুতাঃ স্থূলোপলা গিরেঃ।"

পাদ—মূল পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। "পাদাঃ প্রত্যন্ত পর্ব্বতাঃ।"

(২৮) উন্মাদ—উন্মাদ রোগ। "উন্মাদশ্চিত্তবিভ্রমঃ" উন্মাদ রোগবিশিষ্ট ব্যক্তির নাম—উন্মত্ত, উন্মাদবৎ। 'উন্মত্ত উন্মাদবতি।" অনেক পুস্তকে উন্মত্ত অর্থে উন্মাদ শব্দের অপপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

আজ আর নয়। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ইহাতেই পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। সুতরাং এই খানেই বিদায় ইতি—

শ্রী—

হিমাচল বক্ষে।

১

অনেকদিন পরে আজ আবার নূতন করিয়া হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিলাম। বঙ্গের এই সমতলভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া, কর্ম্মকঠোরজীবনের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য মস্তকে বহনপূর্ব্বক অন্ধ আবেগে কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিয়াছি; সুখ, আশা, পরিতৃপ্তি, কিছু নাই; তথাপি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেতকী কুসুমের সৌরভাকুল ভ্রমরের ন্যায় সংসারের ধূলায় অন্ধীভূত আঁখি লইয়া ক্রমাগত কণ্টকাঘাত সহ্য করিতেছি; পক্ষদ্বয় ছিন্ন, বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত; হৃদয়ে আর সে সাহস, সে বিশ্বাস নাই, মনের সে বল, অনন্ত দেবতার করুণায় তেমন অসীম নির্ভরের শক্তি নাই। তাই আজ মধ্যাহ্নজীবনের অবসানে, নিদারুণ-ক্লান্তিনিপীড়িত বক্ষে, হতাশভাবে একবার চাহিয়া দেখিতেছি—কোথায়, কতদূরে আমার শান্তিসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আমার জীবনের সেই নিষ্কাম সাধনা কোন্ দেবতার পদতলে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া শিশুর ন্যায় কতকগুলি পুত্তলিকা লইয়া পুতুল খেলিতে বসিয়াছি! আষাঢ়ের এই নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, ধরাতল বর্ষার সলিলে সিক্ত প্রকৃতির শ্যামল সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত; নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিতেছে, শ্যামলা ধরণীর বিস্তীর্ণ বসনাঞ্চলের ন্যায় ধান্যভূষিত ক্ষেত্র, জল ও স্থল অপূর্ব্ব সুষমায় সমাচ্ছন্ন। মনে হয়, কতযুগ পূর্ব্বে এমনই একদিনে ভারতের অমর কবি রামগিরিতে নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষের হৃদয়বেদনা অশ্রুময়ী ভাষায় সুপ্রকাশিত করিয়া প্রত্যেক প্রবাসী বিরহীর অপূর্ণ কামনা দ্বারা তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন দিনে, এমন ঘনঘোর বর্ষার মধ্যে আমার বিরহিহৃদয়ে যে সুপ্ত বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা শান্ত করিবার জন্য আমার সেই চির সুখদুঃখের অচল দেবতা হিমালয়ের পবিত্রস্মৃতি-চর্চ্চাই

একমাত্র মহৌষধ। তাই একবার সংসার ভুলিয়া, মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাহাদিগকে দুদিনের জন্য আপনার ভাবিয়া প্রতিপদে জটিলতর ভ্রান্তিজালে বিজড়িত হইতেছি তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া, একবার সেই অতীত জীবনের সুমধুর কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ইহাতে কাহারও হৃদয়ে আনন্দ বা তৃপ্তি দান করিতে পারিব, সে আশা নাই, সে সম্ভাবনাতেও অতীত কথার আলোচনা করিব না। মানুষ পৃথিবীতে নিজের তৃপ্তির জন্যই ব্যাকুল, অন্যে যখন ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার পথে আসিয়া পড়ে, তখন সে তাহাকে সঙ্গিরূপে গ্রহণ করিয়া ইপ্সিত পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে কুহকমন্ত্র সে অপরের হৃদয়াকর্ষণের জন্য প্রয়োগ করে, কখন কখন তাহা ছিন্নতার, বীণার তানলয়হীন ধ্বনির ন্যায় শ্রুতিকঠোর হয়। যে বীণার সহায়তায় আমার আকাঙ্ক্ষাপীড়িত হৃদয়ের হাহাকার সঙ্গীতরূপে উচ্ছ্বাসিত করিয়া তুলিয়াছিলাম, সে বীণা আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে আগ্রহ, সে আন্তরিকতা আমার নাই; কেবল দগ্ধস্মৃতির অন্তর্জ্বালা সেই বহুদূরান্তর-ন্যস্ত হিমাচলের বৃক্ষলতাবর্জ্জিত, ধূসর, অপরিবর্ত্তনীয়, চিরউদাসীন প্রস্তর স্তূপের ন্যায় বক্ষের মধ্যে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহাতে অশ্রু শুকাইয়া যায়, কোন্ বলে কবিত্বের অমৃত উৎস উৎসারিত করিব?

আমার সেই বহু পুরাতন, পর্ব্বতবাসের চিরসঙ্গী, শ্রীভ্রষ্ট ডাইরি খানির পৃষ্ঠা কতদিনের পর আজ নূতন করিয়া খুলিলাম। অনেক দিন ইহা খুলি নাই, কৃপণের ধনের মত অতি যত্নে ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহা খুলিয়া দেখিতেছি—ঐ পেন্সিলে লেখা পথের বিবরণ অপরিচ্ছন্ন ও নিতান্ত অশোভন হইলেও আমি ইহার ভিতর দিয়া বিশালকায় হিমালয়ের সুবিরাট, প্রশান্ত সুগম্ভীর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। ইহার প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রের ভিতর কত সুদীর্ঘ দিবসের অলিখিত কাহিনী, কত নিদ্রাহীন নিঃসঙ্গ যামিনীর দুঃসহ কণ্টকশয্যার সকরুণ বার্ত্তা আমার অতীত স্মৃতি উজ্জ্বলরূপে বিকসিত করিবার জন্য মূকভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহা মনে করিলে নানাভাবে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। মনে হয়, এই কি সেই পৃথিবী, দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ কি চিরদিনই একরূপই থাকে? একদিন যাহা ছিলাম, আজও কি তাহাই আছি? মনুষ্যজীবন প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কাল যে ধার্ম্মিক ছিল, আজ সে মহাপাপিষ্ঠ, কাল যে সন্ন্যাসী ছিল, আজ সে ঘোরতর সংসারী; কাল যে পরের সুখের জন্য হাস্যমুখে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিত, আজ সে নিজের সুখের অনুরোধে পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে! তবে কে বলিল, পৃথিবীতে দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ চিরদিন সমান! যে রত্নাকর একদিন সামান্য উদরান্ন সংগ্রহের জন্য নরহত্যায় উন্মুখ হইয়াছিল, সেই রত্নাকর আর যাঁহার কবিত্বস্রোতে আজ সমস্ত শিক্ষিত জগৎ পরিপ্লাবিত, এবং যে সুধাতরঙ্গে অবগাহন করিয়া কতজন কবি বিজয়ী সাধকের বেশে যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন সেই বাল্মিকী, একজন? সেই হিমালয় বক্ষবিহারী, লোটা-কম্বলধারী, কপর্দ্দকহীন, উদাসীন লক্ষ্যহারা সন্ন্যাসী, আর এই সংসারজ্বালা-সংক্ষুব্ধ, বিষয়লিপ্ত, অতি সাবধান, সাধনমার্গ-বিচ্যুত গৃহী, এ উভয় কি একজন? কে জানিত, কোন্ অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাতা এই হতভাগা গৃহহীন, উদাসীন সন্ন্যাসীর জন্য এত সুদৃঢ় পাশ নির্ম্মাণে রত ছিলেন। কিন্তু এজন্য আমি বিধাতাকে অপরাধী করিতে পারি না। তিনি চিরকরুণাময়; আমার এই উত্তপ্ত মস্তকে তাঁহার চিরমঙ্গলময় আশীর্ব্বাদধারাবর্ষণে তিনি কোন দিন উদাসীন নহেন। আমিই মাতৃ-অঙ্কারূঢ় দুরন্ত শিশুর ন্যায় কতবার তাঁহার স্নেহালিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছি। পৃথিবীর ধূলায় দেহ মলিন ও কলঙ্কিত করিয়াছি, তাই এ দুর্দ্দিনে ঝটিকা বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে অবসাদগ্রস্ত, উৎকণ্ঠিত একক জীবনের গুরু মরুস্তর ভেদ করিয়া উভয় বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারণপূর্ব্বক আবেগভরে সেই মহিমাময়ী, অনাথের চিরনির্ভর, বিশ্বজননীকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে;
ঠেলিস্‌নে মা ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।
সারাদিনটে ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁজের বেলা
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত, গিয়েছে চ'লে।
কত আঘাত লেগেছে গায়,
কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
কত প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দ'লে।

কেউ তো আর চাইলে না ফিরে,
নিশায় আঁধার এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে।"

—কিন্তু যাহার চিত্তে চাপল্যের সীমা নাই, তাহার অনুতাপ অনর্থক!

হিমালয়ের বহুসংখ্যক উপত্যকা ও অধিত্যকা, চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম করিয়া, নগাধিরাজের কত নয়ন মনোমোহন নগ্নশোভা নিরীক্ষণ করিয়া ডাইরীর ভিতর দিয়া যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সে স্থানের নাম শ্রীনগর—এ ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগর নহে, হিমালয়বক্ষে বিস্তীর্ণ, গিরিপাদপসমাবৃত গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর। গাড়োয়াল রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত, বৃটীশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়াল। শ্রীনগর এই বৃটীশ গাড়োয়ালের রাজধানী। বৃটীশ গাড়োয়ালের রাজধানী বলিলে ঠিক বলা হইল কি না বলা কঠিন; যবে কলিকাতাকে যদি বৃটীশ ভারতের রাজধানী বলিলে অত্যুক্তি না হয়, তাহা হইলে শ্রীনগরকে বৃটীশ গাড়োয়ালের রাজধানী বলিলেও অন্যায় হইবে না। কারণ ভারত-রাজপ্রতিনিধি সুদুঃসহ গ্রীষ্মতাপ প্রশমনোদ্দেশে রাজকর্ম্ম সংসাধনার্থ বৎসরের নয়মাস শিমলাশৈল ও ভারতের বিভিন্ন নগরে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট তিন মাস অতি কষ্টে কলিকাতায় অতিবাহিত করিলেও যেমন কলিকাতা বৃটীশ ভারতের রাজধানী, সেইরূপ গাড়োয়াল রাজ্যের বিচারকবর্গ ও বিচারালয়, শান্তিরক্ষণ ও শাসনবিভাগের মুকুটমণিগণের নিকেতন শ্রীনগরের কিছু দূরবর্ত্তী একটি মনোরম পার্ব্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত হইলেও শ্রীনগরই গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত। রাজপুরুষগণ কখন কখন অনুগ্রহপূর্ব্বক অবসর-কালে শ্রীনগরের সেই সুমোহন পার্ব্বত্যশোভা নিরীক্ষণ করিতে গমন করেন। তাঁহাদের শ্রীনগরে পদার্পণের অন্য কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, তথাপি শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজধানী। যখন স্বাধীনতার মহিমাময়ী জয়শ্রীতে সমগ্র গাড়োয়ালপ্রদেশ উদ্ভাসিত ছিল, যখন গাড়োয়ালের প্রত্যেক বৃক্ষলতা, প্রত্যেক গিরি-নির্ঝর, অরণ্যের প্রত্যেক সুকণ্ঠ বিহঙ্গ আপনার বিজন বনস্থলীতে উপবেশন করিয়া অক্লান্তকণ্ঠে স্বাধীনতার গৌরব-গাথা গান করিত, যে দিন গাড়োয়ালের প্রত্যেক গিরি-শৃঙ্গ স্বাধীনতার অটল গৌরবস্তম্ভের ন্যায় সুনীল অম্বরপথে আপনার উন্নত মস্তক প্রসারিত করিয়াছিল—সে দিন শ্রীনগর গাড়োয়ালের প্রকৃত রাজধানী ছিল। তখন ইহা সমগ্র গাড়োয়াল প্রদেশের দ্যুতিমান কণ্ঠহারস্বরূপ বিরাজ করিত, এখনও সযত্নে অতীত শোভার বিলুপ্ত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া মৌনভাবে বিরাজ করিতেছে—অতীতের সকলই গিয়াছে, কেবল তাহার সুনামের সৌরভ অশ্রান্তগতি কালের চির-কলতানের সহিত ভাসিয়া আসিতেছে। সুতরাং এখন শ্রীনগরকে রাজধানী নামের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিলে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতির অবমানন। করা হয়। হয় ত সেই জন্যই এখনও শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজধানী। যদিও প্রকৃত রাজধানী এখন পাউরীতে এবং শ্রীনগরের প্রাচীন, সমৃদ্ধসম্পন্ন, গৌরব শ্রীবিভূষিত অট্টালিকারাশির উপকরণ লইয়া পাউরীর সুন্দর সুন্দর শৈলনিকেতন নির্ম্মিত হইয়াছে। বড়কে ভাঙ্গিয়া ছোট করা, ছোটকে টানিয়া বড় করা বিধাতার কাজ। এ পৃথিবীতে নিরন্তর এ দৃশ্য দেখিতেছি—ইংরাজ আজ ভারতের বিধাতা, তাঁহারা বড় শ্রীনগরকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া ছোট পাউরীকে বড় করিয়াছেন। এজন্য আক্ষেপ বৃথা!

নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কত অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ্‌রাশি ভেদ করিয়া, কত গিরি নদী, উপত্যকা অধিত্যকা, কত পার্ব্বত্য জনপদ, তুষারসমাচ্ছন্ন গিরিপ্রান্তর, রৌদ্রদগ্ধ অগ্নিময় বন্ধুর-পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া—শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত হৃদয়ে যে দিন গাড়োয়াল রাজধানী পূর্ব্বশ্রীহীন শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম—সে দিন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন মঙ্গলবার। আমার উদ্দেশ্য, এইবার শ্রীনগর হইতে তিহরী যাইব। পূর্ব্বে একবার যখন শ্রীনগরের ভিতর দিয়া বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলাম, তখন তিহরীর পথে যাই নাই; আমরা হরিদ্বার হইতে বরাবর শ্রীনগরের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। পথেরও শেষ নাই, আকাঙ্ক্ষারও বিরাম নাই, তাই এবার আমি এই নূতন পথ ধরিলাম; কিন্তু পথ নূতন হইলেও দেরাদুন গমনের ইহাই ঠিক পথ। শ্রীনগর হইতে দেরাদুন যাইতে হইলে হরিদ্বার প্রদক্ষিণ

করিয়া যাওয়া ঠিক নহে, অনেক ঘুরিতে হয়। জীবন যখন শোকতাপে প্রপীড়িত হইয়া ব্যগ্র বাহুদ্বয় বিস্তার-পূর্ব্বক মরুভূমির মরীচিকার মোহে শান্তির মৃগতৃষ্ণি-কার সন্ধানে ব্যাধশরাহত পিপাসাতুর মৃগের ন্যায় উদ্ভ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়াছিল, কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে নাই, সহস্র বিপদের মেঘমালা মস্তকের উপর ঘনীভূত দেখিয়াও বহুদূরবর্ত্তী লোকালয়ের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই, তখন সেই বক্রপথে পরিভ্রমণে কিছুমাত্র শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না—কিন্তু এখন সেই শ্মশানের চিতাগ্নি-শিখা ধীরে ধীরে, নির্ব্বাপিত হইতেছে, চিন্তা আসিয়া চিতার স্থান অধিকার করিয়াছে, অবসাদ আসিয়া উন্মত্ততার প্রখরতা মন্দীভূত করিতেছে এবং হৃদয়-নির্ব্বাসিত গৃহ-সুখের কাতর আর্ত্তনাদ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ভারতের এই সীমান্তরালবর্ত্তী বিজন গিরিপদমূলে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই এখন ঠিক পথেই চলিতে হইবে, এখন শ্রীনগর ভেদ করিয়া তিহরীর অভ্যন্তরপথে মসুরী পৌছিতে হইবে—সেখান হইতে ঐ ত দেরাদুন দেখা যাইতেছে, সে তাহার পাষাণ-বক্ষপঞ্জরে স্নেহবাহু দ্বারা বাঁধিবার জন্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঐ ক্রমাগত আমাকে আহ্বান করিতেছে। দেরাদুন আমার উন্মত্ত অধীর হতাশ হৃদয়ের প্রথম অবলম্বন, আমার প্রথম সন্ন্যাসের পবিত্র তপোবন, আমার নিরা-শার ঊর্ম্মিমুখর অকূল সমুদ্রের আলোক-স্তম্ভ, আমার ইহকাল ও পরকাল, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান লোপ করিবার সুবর্ণ সেতু। কত দেশে দেশে পরিভ্রমণ করি-লাম, হিমালয়ের সুমহান্ বিরাট সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না, পার্ব্বত্য নির্ঝরের নিত্য উৎসারিত রজত দ্রব তুল্য সুনির্ম্মল অমৃতধারা অঞ্জলী ভরিয়া পান করিয়াও মর্ম্মভেদী পিপা-সার তীব্র জ্বালা প্রশমিত হইল না, তাই এখন ভগ্নমনে শূন্য হৃদয়ে, কম্পিত পদে, ক্লান্ত দেহে উৎকণ্ঠাকুল প্রিয়জন-সন্দর্শনলোলুপ প্রবাসীর ন্যায় আমার অন্তিম অবলম্বন দেরাদুনের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি—এখন বাঁকা পথ ধরিয়া আর কেন চলিব? তাই আজ সরল পথ ধরিয়া যাত্রা করিয়াছি। জানি একদিন এ যাত্রার অবসান হইবে, কিন্তু জীবনের শেষ দিন মহাযাত্রার আরম্ভের পূর্ব্বে এই বিয়োগ-বিষাদ-সমাচ্ছন্ন জীবন-নাটকের কয়েকটা শোচনীয় অঙ্ক কি ভাবে অভিনীত হইবে তাহা কে জানে? দুর্ভেদ্য অন্ধ-কার-যবনিকায় ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন!

শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়াই আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে অলকনন্দার বক্ষে প্রসারিত লৌহ সেতু অতিক্রম করিলাম। নির্জ্জীব, ধূসর, বক্রতাবহুল ভুজঙ্গ দেহের ন্যায় যে পার্ব্বত্যপথ হরিদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহা অলকনন্দার বাম পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা মন্থরগতিতে নদী পার হইলাম, নদীতীর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অলকনন্দা গিরিনদী, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তুষারবিগলিত জলধারা অলকনন্দার জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছে। গিরিনদী, বিস্তৃত-কায়া নহে, কিন্তু খর স্রোতা। তাহার উপলবন্ধুর বক্ষ ভেদ করিয়া তুষার-নির্ঝর সলিলরাশি, 'ফেনময় কলহাস্য তরঙ্গে প্রাণের সকল বাসনা ভাসাইয়া লইয়া, অধীর প্রবাহ নাদে তটভূমি ঝঙ্কারিত করিয়া প্রেমসিন্ধু অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। নদীবক্ষে কোথাও আবর্ত্ত, কোথাও জলরাশি পাষাণ অবরোধ লঙ্ঘন করিয়া প্রপাতের ন্যায় সশব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে। গতির বিরাম নাই, বাধার প্রতি লক্ষ্য নাই, ভক্তের নিষ্ঠার ন্যায় সাধুর পবিত্রতার ন্যায়, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের ন্যায় এবং প্রবাসীর গৃহানুরাগের ন্যায় তাহা একান্ত একাগ্রতা পূর্ণ

সেই পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া কতক্ষণ অলকনন্দার সেই রজত প্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার অস্ফুট মর্ম্মকাহিনী যেন এক অর্থহীন রহস্য-ভাষের ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া জ্বালাময় বক্ষে, অশান্তি ও অকল্যাণের কলঙ্কভার স্কন্ধে লইয়া কি উদ্দেশ্যে আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, জীবনের কোন সাধ, কোন আশা পূর্ণ হইল না তথাপি জীবনধারণের এ বিড়ম্বনা কেন? তাহা অপেক্ষা যদি ঐ প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণীর ন্যায় জীবনের উভয় কূল প্লাবিত করিয়া চিরপ্রেমের অনন্ত পারাবারে, কৃপা সিন্ধুর বিশালতায় আপনার এই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারিতাম! কিন্তু হায় সে সাধ্য আমার নাই সাহস নিতান্ত সামান্য, বিশ্বাস নিতান্ত অল্প, জন্ম

র্ভরের প্রতি নির্ভর করিবার শক্তির একান্ত অভাব। র্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমি সেই তীর পথ ধরিয়া গ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রবাহিণী আমার দুর্ব্বলতা দখিয়া আত্মসম্মানভরে স্পর্দ্ধান্বিতা, আলোকে, পুলকে, গারবে ও তরলতায় ঝঙ্কারময়ী, বিপুল সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা বিশ্ববিমোহিনীর ন্যায় তাহার শুভ্র তরঙ্গের অঞ্চল হলাইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে তাহার গতি-থে ছুটিয়া চলিল।

পূর্ব্বে অনেকের কাছেই শুনিয়াছিলাম, 'এ সড়ক হুৎ উমদা' অর্থাৎ চড়াই উৎরাইএর একান্ত অভাব। কৃত পক্ষে অলকনন্দা পার হইয়া এক মাইলের মধ্যে থের দুর্গমতা দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু এক াইল পরে আমাদিগকে অলকনন্দার তীরভূমি পরিত্যাগ রিতে হইল; কারণ, সে পথ দেবপ্রয়াগে চলিয়া য়াছে। সুতরাং গতি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আমাদিগকে র্ব্বতের উপর দিয়া তিহরীর পথ ধরিতে হইল। ন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া একবার নূতন পথের দিকে চাহিয়া দখিলাম। দেখিলাম, উহা অসমতল, দুরারোহ, দুর্গম র্দ্ধ ভূমি দিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতে আমি ভীত হইলাম না। কারণ এ বস্থায় আমি অনভ্যস্ত নহি। দিনের পর দিন, াসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াই ত আমি াামার জীবনের অনন্য অবলম্বন হিমালয়ের বক্ষে, তাহার র্গম উপত্যকায়, তাহার বিপদসঙ্কুল পথহীন অধিত্যকায় ন্মত্তের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। হাই যদি আমার একমাত্র সাধনা হয়, তবে আমি নশ্চয় বলিতে পারি, ভগবান আমার সে সাধনা সিদ্ধ করিয়াছেন। আমি রত্নের সন্ধানে পর্ব্বতের শিখরে শখরে বৃথা পরিভ্রমণ করিয়াছি। সমস্ত দিন পার্ব্বত্য-থের সহিত সংগ্রাম করিয়া দিবাবসানে যখন শ্রমখিন্ন বসন্ন চরণদ্বয় আর উঠিতে চাহিত না, যখন সমস্ত দনের নিদারুণ রৌদ্রসন্তপ্ত, বিদীর্ণ-প্রায় ব্রহ্মরন্ধ্র লইয়া ন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতাম, সন্ন্যাসী জীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অবলম্বন লোটা কম্বল ও উদ্দেশ্যহীন গুরু জীবনভার পন অসহ্য বোধ হইত, তখন অভিমানী সন্তান স্নেহময়ী মাতার উপর রাগ করিয়াও যেমন তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে—আমিও সেইরূপ পর্ব্বতের উপর রাগ করিয়া ক্লান্ত দেহে উপলশয্যা অবলম্বন করিতাম। ধীরে ধীরে অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইত, চরাচর-ব্যাপী অন্ধকারের ক্রোড়ে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গসমূহ লুপ্ত হইয়া যাইত, ঊর্দ্ধে অনন্ত বিস্তীর্ণ কোটীনক্ষত্রখচিত নীলাকাশ—স্তব্ধতার দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র—চতুর্দ্দিকে শিখরে শিখরে নানা জাতীয় ওষধি মাধবের নীলবক্ষে কৌস্তভের ন্যায় শোভা বিকীর্ণ করিত, সে কি এক রঙ্গ? তাহার উপর বিচিত্র বর্ণের প্রস্তর খণ্ড হইতে লাল, নীল, পীত, হরিত, প্রভৃতি বিচিত্র প্রভা ফুটিয়া উঠিত। শুইয়া শুইয়া মনে হইত যেন বিশ্বের অনাদি দেবতা তাঁহার অনন্ত রূপকে সান্ত করিয়া তাঁহার অস্তিত্বের অসীমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া এই সীমা-হীন নৈশনিস্তব্ধতার মধ্যে যোগমগ্ন মহেশ্বরের ন্যায় দণ্ডায়-মান হইয়া পর্ব্বতবিহারী ভক্তগণের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করিতেছেন। নানা বর্ণের পুষ্প দ্যুতিমান হীরক খণ্ডের ন্যায় হারের আকারে তাঁহার কণ্ঠে বিলম্বিত, অর্ঘ্যের ন্যায় চরণোপান্তে প্রসারিত। দেখিতে দেখিতে গিরি অন্তরাল হইতে শশধরের রজতকৌমুদী-সংস্পর্শে অন্ধকারের স্বপ্ন-কুহেলিকা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইত। চন্দ্র আরও ঊর্দ্ধে উঠিত, তাহার বহু নিম্নে তুষারকিরীটিশুভ্র গিরিশিখর চন্দ্রা-লোক-চুম্বিত নিস্তরঙ্গ বারিধিবক্ষের ন্যায় প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিত। আমি নিদ্রালস নেত্রে ঊর্দ্ধ গগনে চাহিয়া দেখিতাম, সেই খণ্ডচন্দ্র শুভ্রদেহ ব্যোমকেশের তৃতীয় নেত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, তাহা হইতে শান্তি ও প্রসন্নতা ক্ষরিত হইয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু প্রপীড়িত ধরণীর বক্ষে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে—সেই অমৃতধারা ধীরে ধীরে আমার শ্রান্ত ললাটে আমার উত্তপ্ত মস্তকে বর্ষিত হইত—আমি অজ্ঞাতসারে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইতাম; দেহের জড়তা, মনের অবসাদ, প্রাণের হাহাকার বিশ্বজননী আমার শিয়রে বসিয়া কিরূপে দূর করিতেন তাহা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রভাতে যখন সুখস্পর্শ সমীরণের মৃদু কম্পনে, অদূরবর্ত্তী বৃক্ষরাজির শরশর শব্দে, বনবিহঙ্গের সুমধুর বৈতালিক সঙ্গীতে আমি নয়ন উন্মী-লন করিতাম। তখন দেখিতাম, নবজীবন লাভ করি য়াছি—ইহাই আমার দুর্গম গিরিপথের বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাস,—আমার তুচ্ছ জীবনস্বপ্নের চরম সার্থকতা।

নদী তীরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, সম্মুখে আড়াই মাইল দীর্ঘ একটি চড়াই। এই চড়াই অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে সাড়ে তিন মাইল অবতরণ করিলে, তবে এক বেলার জন্য বিশ্রাম লাভের অবসর হইবে। মধ্যাহ্ন কালে আশ্রয় স্থান ও আহার লাভের আশা ফলবতী করিতে হইলে, এই ছয় মাইল চড়াই ও উৎরাই পার হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, পথিমধ্যে অন্য কোন স্থানে চটি বা পান্থনিবাস থাকা দূরের কথা, এই ভয়ানক গ্রীষ্মের সুতীক্ষ্ণ সৌরকর হইতে মস্তক রক্ষা করিবার জন্য একটি শাখা-পত্র-ভূষিত ছায়া-শীতল তরুতল পর্য্যন্ত কোন স্থানে বর্ত্তমান নাই—ছয় মাইল দূরে যে আশ্রয়স্থান, তাহাও আবার সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে। সেখানে তিহরীর রাজার একখানি বাংলা আছে—এই বাংলা অতিথিশালা নহে—ডাক বাংলা, সাহেবেরা যাহাকে Dawk Bungalow বলেন, তাহাই। ইহা রাজকর্ম্মচারিগণের বিরামগৃহ, গৃহীর কর্ম্মক্ষেত্র। সাধু-সন্ন্যাসীগণকে তাহার শত হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়স্তম্ভিত, দৃষ্টিতে রাজ কর্ম্মচারিগণের অখণ্ড প্রতাপের পরিচয় লাভ করিতে হয়। মস্তকের উপর দীপ্ত সূর্য্যকিরণ অধিক সুতপ্ত, কি ধরাতলের এই সকল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর দণ্ডের উত্তাপ অধিক অসহনীয়—তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। সেখানে যে আমাদের ন্যায় সন্ন্যাসীর মস্তক রক্ষা করিবার স্থান পাওয়া যাইবে, সে আশা আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। কিন্তু শুনিয়াছিলাম, ডাকবাংলার অদূরে একখানি ক্ষুদ্র দোকান আছে। তাহাকেই আমরা ডাকবাংলাতে পরিণত করিব, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া দুস্তর চড়াই অতিক্রমের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

কি সঙ্কটাকীর্ণ সংকীর্ণ পথ! সূর্য্যদেব এখনও পূর্ব্বাকাশে, পূর্ব্বাহ্নের অধিকার এখনও অক্ষুণ্ন, কিন্তু তথাপি সেই দুঃসহ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করা কি কঠিন! পদতলে গিরিপৃষ্ঠ সূর্য্যোত্তাপে আলোকহীন উত্তাপসার কৃষ্ণবর্ণ বহ্নির ন্যায় জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে; বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ক্ষুদ্র তৃণ গাছটি পর্য্যন্ত নাই,—কেবল বক্রপথ, ক্রমাগত চড়াই; পদদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, নিশ্বাস রোধ হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া দরবিগলিত ধারায় ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। তথাপি বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সহিষ্ণুতার সহিত সেই প্রস্তরীভূত অগ্নিরাশির দিয়া চলিতেছি; নিম্নে অগ্নি রাশি, ঊর্দ্ধে বহ্নিচক্র। হৃদয়ের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, সেখানেও অভাব নাই, সেখানকার অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, পেক্ষা দুঃসহ; সেই অগ্নিস্রোত বক্ষে ধরিয়া মৃত্যু আশাতেই এই সুদুস্তর বহ্নিচক্রে ঝাঁপ দিয়াছি। নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া সেই অতি দুঃ মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বের উদয় মনে হইল, আজ এই পথকষ্টে এত অপ্রসন্ন হইয়া তেছি কেন, এত অশান্তি বোধ করিতেছি কেন? শান্তি কবে পাইয়াছি, জ্ঞান সঞ্চারের পূর্ব্বেই অদ্বিতীয় অবলম্বন-দণ্ড—জ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, প্রথম সোপান পিতৃদেবকে হারাইয়াছি, মায়ের অ কথা আর বলিব না।—তাহার পর, যৌবন-মধ্যাহ্নে চিরপ্রেমময়ী, প্রসন্নতাস্বরূপিণী, অসীম ধৈর্য্যশা মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধার ন্যায় মহিয়সী প্রণয়প্রতিমা প্রগাঢ় প্রেমসরোবরকূলে উপবেশন করিয়া তাড়িত, কম্পিতপক্ষ, ঘর্ম্মাপ্লুত বক্ষ, পিপাসী কপো ন্যায় আকণ্ঠ জলপানে পিপাসা পরিতৃপ্তির ব করিতেছি, এমন সময়ে সহসা—কোন্ ঐন্দ্রজালি কুহকদণ্ড স্পর্শে সেই সরোবর মুহূর্ত্ত মধ্যে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইল—আমি সেই দিন হইতে মরুভূমির উপর দিয়া মহাবেগে মরীচিকার পশ্চা ধাবিত হইয়াছি—দিবা নাই, রাত্রি নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, ক্রমাগত চলিতেছি। এখন আবার কি ভয়, কিসের কষ্ট? আশাহীনের কোন কষ্ট না হৃদয়ের যে অনলদাহ, বাহিরের উত্তাপে তাহার ব বাড়িবে না।

আমি ললাটের ঘর্ম্ম অপসারণ করিয়া, বিধা চিরমঙ্গলময় উদ্দেশ্যের প্রতি আমার সন্দেহান্দো দুর্ব্বল হৃদয়ের সকল আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করিয়া পর্ব্ব ভ্রমণোপযোগী সুদীর্ঘ যষ্টির সহায়তায় কম্পমান প অবসাদবিকল উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে আরো করিতে লাগিলাম। মনুষ্য যদি তাহার সর্ব্বাপে অধিক দুঃখের সময়ে, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দি

করুণার নির্ভর করিতে না পারিত, তাহা হইলে সকল সান্ত্বনার পথ যুগপৎ রুদ্ধ হইয়া যাইত, হার জীবনধারণ করা অত্যন্ত সুকঠিন হইত। আজ বিপদ্‌কালে যখন দেহ শ্রান্ত ক্লান্ত, পদদ্বয় অবসন্ন কম্পান্বিত, চলৎশক্তি রহিতপ্রায়, তখন ভগবানের রুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। রৌদ্র-দ্ধ ধূসর মরুময় পর্ব্বতবক্ষে অনেক ঊর্দ্ধ চড়াইয়ে মল মেঘের ন্যায় যে দৃশ্য সন্দর্শন করিতেছিলাম, ক্রমে হা শালবনে পরিণত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ডকায় ল বৃক্ষগুলি পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া ব পাদভূমি ছায়াসমাচ্ছন্ন করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হিয়াছে। তাহার পত্ররাশি শর শর কম্পিত হইতেছে, বিড় পত্রান্তরালে বসিয়া বিহগদম্পতি মধুর স্বরে জন করিতেছে—মরুবক্ষোবিহারী পথশ্রান্ত তৃষাতুর পথি-কর নয়ন সমক্ষে যেন ঢল ঢল বিমল সলিলপূর্ণ সরিৎ-বি আমার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইল। মৃতের নিরা-ন্দময়, নিদারুণ শ্মশান ভূমি হইতে আমি যেন অমৃতের বজীবন হিল্লোলিত শান্তিময় স্বর্গে উপস্থিত হইলাম। ই পার্ব্বত্য শাল তরুনিচয়ের নিবিড় ছায়া আমার দগ্ধ স্তকের উপর জগজ্জননীর মধুময়ী করুণাপরিপূত ঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত হইল, কলকণ্ঠ বনবিহঙ্গের ই মৃদু কাকলি যেন বহুদিনের বিস্মৃত বান্ধবের প্রীতি-রা মর্ম্মকাহিনী বহন করিয়া আনিতে লাগিল। পথ-ান্ত সন্তান বহুদূর পথভ্রমণ করিয়া ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে অব-ন্ন চরণে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ের কাছে আসিয়া ড়িলে মা যেমন সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার ঞ্চল আন্দোলন করিয়া সন্তানের শ্রান্তদেহ শীতল রেন, সেইরূপ আমার বোধ হইল, প্রকৃতি জননী এই খহীন শান্তিহীন গৃহহীন অনাথ সন্তানের অসহনীয় ান্তি দূর করিবার জন্যই শালবৃন্ত হস্তে আমার অলক্ষ্যে সিয়া ধীরে ধীরে বীজন করিতেছেন। আমার নয়ন কাণে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইল, বিশ্বেশ্বরের অপার রুণার প্রতি সুগভীর বিশ্বাসে আমার ক্ষুদ্রতা ভরা ৃতাপূর্ণ সন্দিগ্ধ হৃদয় ভরিয়া উঠিল, মাতৃমহিমায় াতৃহীনের নিরাশ্রয় মরুচিত্ত বর্ষার প্লাবনে ক্ষুদ্র তটিনীর ায় কূলেকূলে পরিপূর্ণ হইল। চড়াইএর সর্ব্বোচ্চ স্থানে আমি একটি শাল বৃক্ষমূলে আমার অবসন্নদেহভার স্থাপন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। বিহঙ্গের সেই কলগীতি, সমীরণের সেই অব্যাহতগতি, শালপত্রের সেই শরশর কম্পন ও আমার কল্পনামুখর কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস কবির সুমধুর সঙ্গীতের ভাষায় যেন বিশ্বজননীর মহিমাময়ী প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আমি অনুভব করিলাম—

“স্নেহ-বিহ্বল, করুণা ছল ছল
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে।
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।

*　　*　　*

করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা
শান্ত করি মম অসীম যন্ত্রণা;
স্নেহ অঞ্চলে মুছায়ে আঁখি-জল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি-সাথে, আশীষ রাথে মাথে
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে।”

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সত্যই আমার সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠিল, আমার পথশ্রম অপনীত হইল। বেলা ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিলাম। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চড়াইএ উঠিয়াছিলাম, এবার নামিতে হইবে। সম্মুখে "খাড়া উৎরাই" আজি দ্রুতপদে নামিতে লাগিলাম। পর্ব্বতারোহণ যেমন কঠিন, অবরোহণ তেমন কঠিন নহে, সাড়ে তিন মাইল নামিতে অধিক সময় লাগিল না। বেলা দশটা বাজিয়া গেলে, আমি পূর্ব্বকথিত রাজার বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। করোগেটেড্ আয়রণের ছাদ-বিশিষ্ট একখানি ক্ষুদ্র বাংলা। বাহিরের দিকে একটি অনতি-দীর্ঘ বারান্দা আছে, সেই বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দ্বার রুদ্ধ, শিকলে তালা লাগান, কোন দিকে জন মানবের সম্পর্ক নাই। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একবার তালা নাড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু তালা খুলিল না। তখন উঠিয়া অগত্যা অদূরবর্ত্তী দোকানে চলিলাম। দেখিলাম, সে দোকান খানিও বদ্ধ, তাহাতেও তালা লাগান রহিয়াছে।

বাংলার চৌকীদারের কোন সন্ধান নাই, দোকানের দোকানীও নিরুদ্দেশ! তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে এমন লোকও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম এই নিদারুণ পরিশ্রমের পর ভগবান এবেলা আমাদের অদৃষ্টে একাদশীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় কিছুমাত্র নূতনত্ব ছিল না। কারণ পর্ব্বতভ্রমণ আরম্ভ করিয়া একাদশীতে আমরা নিত্য অভ্যস্ত। এ ত আর সখের পথভ্রমণ নহে, আবশ্যকানুরোধে 'রিফ্রেশ-মেণ্ট রুমের' বন্দোবস্তও কোথাও নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া কখন কখন দুই দিনও নিরম্বু একদশী করা গিয়াছে, পূর্ণিমা প্রতিপদ তাহাতে বাধাদান করিতে পারে নাই। তাই সম্মুখে আহারাভাবের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রাণে কিছুমাত্র আতঙ্কের সঞ্চার হইল না; বেশ নিশ্চিন্তচিত্তে বসিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, আজ যদি আমার সঙ্গে বদরিকাশ্রম ভ্রমণের সঙ্গী পরম বৈদান্তিক শ্রীমান অচ্যুতানন্দ স্বামী থাকিতেন, তাহা হইলে এই জনহীন গিরি প্রান্তবর্ত্তী পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিমতী ক্ষুধার আক্রোশের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার বিরিক্তিপূর্ণ বদনব্যাদান, তাঁহার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভ্রুকুটীভঙ্গী এই অবিচল শুদ্ধ পান্থশালাকেও বিচলিত করিয়া তুলিত। শ্রীমান্ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন, কোন দিন তাহা আমার ন্যায় সুহৃদরের নিকটও প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যত দিন তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসের একমাত্র অবলম্বন লোটা কম্বল, তাঁহার উৎকট পাণ্ডিত্যের একমাত্র পরিচয় কঠোর বেদান্ত দর্শনের কূট যুক্তি তাঁহার ক্ষুধার দাহিকাশক্তি কোন দিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু অচ্যুত স্বামী আর আমাদের সঙ্গে নাই। কক্ষচ্যুত ভ্রাম্যমান ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আমরা একত্র হইয়াছিলাম, সুখে দুঃখে কত দিন একত্র কাটিয়া গিয়াছে। কত দিন অবোধ শিশুর যুক্তিহীন আবদারের ন্যায় তাহার স্নেহের আবদার সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার আদর তাহার অভিমান, তাহার ক্রোধ এবং অনুনয় বিনয়ের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ছিল না। তাহার প্রকৃতি ঠিক পার্ব্বত্য প্রকৃতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সহসা এক দিন পথপ্রান্ত হইতে সে সেই উচ্ছ্বসিত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মু... বিহঙ্গের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে কে জানে; স্মৃ... কথা এখন এই অকিঞ্চিৎকর জীবন নাটকের একাং... পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

তিহরী রাজের ডাকবাংলার বারন্দায় কম্বল বিছ... ইয়া তাহার উপর শ্রান্ত দেহ বিস্তীর্ণ করিয়া নিমিলি... নেত্রে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম; কতক্ষণ ... ভাবে ছিলাম বলিতে পারি না। সহসা চক্ষু খুলিয়া দেখি... লাম, পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে লইয়া একটা লো... সেই বাংলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে একা... মানুষ দেখিয়া প্রাণে কিছু আশার সঞ্চার হইল। লোকা... হয় ত ভাবিয়াছিল, কোন সাধু এখানে শুইয়া শুই... ভগবানের চরণ ধ্যান করিতেছে—আমি যে সংসার ছাড়ি... তখনও সংসারের মায়ামোহ ও ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা চিন্... করিতেছিলাম, তাহা সেই মানবচরিত্রানভিজ্ঞ পর্ব্বতবা... সরল মূর্খ কি করিয়া বুঝিবে? সে আমাকে প্রসারি... নেত্রে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়াই কৃতা... ঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিল। গেরু... বসনের মাহাত্ম্য! আমি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বসিবা... জন্য অনুমতি করিলাম। সে একটু সঙ্কুচিত ভাবে দূ... বসিয়া কথা প্রসঙ্গে আমাকে জ্ঞাত করিল যে, এই বাংল... রক্ষক চৌকিদার মহাশয় কোন বিশেষ রাজকার্য্য ব্যপদে... তিহরী গিয়াছেন, আজ প্রত্যাগমনের কোন সম্ভাবনা নাই... দোকানদার মহাশয়ও দোকান বন্ধ করিয়া ঘরে গিয়াছেন... তাঁহার ঘর কিছু দূরে। এ পথে সর্ব্বদা লোক জনের গতি... বিধি না থাকায় দোকান খানি অনেক সময়েই বন্ধ থাকে... হাতে বিশেষ কাজ কর্ম্ম না থাকিলে আর তিনি তাঁহা... পণ্যশালায় শুভাগমন করেন না। আগন্তুক লোকটি এ... স্থান হইতে তিন মাইল নিম্নবর্ত্তী কোন গ্রামের জমীদারে... পাইক। জমীদার মহাশয়ের সহিত সে দূরবর্ত্তী কো... এক গ্রামে গিয়াছিল, কার্য্য শেষে ফিরিয়া আসিতেছে... শুনিলাম; জমীদার মহাশয়ও পশ্চাতে আসিতেছেন... পাইক আশ্বাস দিল, জমীদার মহোদয়ের আগমন হইলে... সাধুসেবার আয়োজন হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভা... বনার কথা শুনিয়া সাধুর মনে যে নিরতিশয় আনন্দ ... আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা পাইক বেচারা বুঝি...

ারিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সাধুজি অত্যন্ত
ৎকণ্ঠার সহিত জমীদারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে
াগিলেন। পাইকের মুখে শুনিলাম, এখান হইতে ছয়
াইল দূরে রাস্তার আর একখানি বাংলা আছে, কিন্তু
াসানে দোকান পাট কিছু নাই, সেখান হইতে যদি আরও
য় মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারা যায়, তবে এক
ানি দোকানে ঘি আটা মিলিতে পারে। নিদাঘ মধ্যা-
হ্নর এই ভয়ানক রৌদ্রে পরিশ্রান্ত দেহে পাহাড়ের উপর
য়া এই দ্বাদশ মাইল পথ ভ্রমণের উৎসাহ আগ্রহ বা
মর্থ্য আমার ছিল না। বিশেষতঃ সেই দোকানদারও যদি
ই দোকানীর মত তাহার দোকান বন্ধ করিয়া 'ঘর' গিয়া
কে, তবে ক্ষোভ ও বিরক্তি ভিন্ন অন্য কোন লাভের
াবনা নাই। সুতরাং জমীদার মহাশয়ের আশাপথ
হিয়া বসিয়া থাকাই সঙ্গত জ্ঞান হইল।

অবশেষে জমীদার মহাশয় সেই বাংলায় আমার সম্মুখে
সিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও দুজন
াক। এতগুলি লোক নিশ্চয়ই একত্র একাদশী
বিবে না ভাবিয়া আমি কিছু প্রসন্ন হইলাম। জমীদার
াশয় সাধুর অভিবাদন করিলেন। বলিলেন বহুপুণ্যফলে
ন নির্জ্জন স্থানে তাঁহার সাধুসন্দর্শন হইল। পুণ্যফল
হার অধিক, সে কথা চিন্তা করিয়া আমি সহাস্যমুখে
মীদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিলাম।

সাধুসেবা প্রসঙ্গের আশায় পাঠক পাঠিকাগণকে উৎ-
রাখিয়া এখন বিদায় গ্রহণ করি। তাঁহাদের ধৈর্য্য
পেক্ষা পরিশ্রান্ত সাধুর ক্ষুধাতৃষ্ণা অল্প নহে।†

শ্রীজলধর সেন।

অমিতাভ।*

(সমালোচনা)

বুদ্ধদেব-কথা চিরকালই হিন্দুর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী
দুর, আদরের সামগ্রী। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের অনতি-
র চিরতুষারমণ্ডিত হিমাচলের পাদদেশে কপিল-
নগরে সিদ্ধার্থের জন্ম ও হিন্দুর পরমতীর্থ গয়ার
সন্নিকটে বোধিদ্রুমমূলে তাঁহার বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি হয়। মগধ
(বর্ত্তমান বিহার)—অধিপতি রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের
সময় বৌদ্ধধর্ম্ম তদ্দেশে অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।
নালন্দার বৌদ্ধমঠে সহস্র সহস্র ছাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও
দর্শনশিক্ষা করিত। ভক্ত বাঙ্গালী কবি জয়দেব কর্ত্তৃক
বুদ্ধ হিন্দুদিগের নবম অবতাররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।
শাক্যসিংহের সুন্দর উন্নত ও পবিত্র জীবন মনুষ্যমাত্রেরই
প্রীতিপদ। বিশেষতঃ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' প্রভৃতি সর্ব্ব-
ভূতে দয়াব্যঞ্জক নীতিগুলি অতি সহজেই কোমল
বাঙ্গালীচিত্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধ
দর্শনের ন্যায় হিন্দুদিগের সাংখ্যদর্শনের মতেও সংসার
অশেষ দুঃখের আকর, সাংসারিক সুখ কুপিত-ফণিফণা-
চ্ছায়াতুল্য। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই হিন্দুদার্শনিকের
'মুক্তি', জন্ম পরিগ্রহজনিত অবশ্যম্ভাবী ক্লেশনিবৃত্তি বৌদ্ধ-
দিগের 'নির্ব্বাণ'। কপিল দর্শন প্রকৃতির কোন সৃষ্টি-
কর্ত্তার অস্তিত্ব মানেন না, বৌদ্ধধর্ম্মও ঈশ্বরের অস্তিত্ব
সম্বন্ধে নীরব। কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের মূল
ভিত্তি, উভয়ই হিন্দুধর্ম্মে স্বীকৃত। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধ
দর্শনে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। "প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ-
মতে অনুপ্রাণিত! প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট
ও নিবিষ্ট।" বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেও
সংস্কৃতভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ, বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, ভাস্কর্য্য
ও অশোক প্রভৃতির তাম্রশাসনে ভারতের সর্ব্বত্র তাহার
চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং নেপাল, তিব্বত, সিংহল,
ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, সাইবিরিয়া প্রভৃতি এসিয়া খণ্ডের
অধিকাংশ স্থলে অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা সমধিক অনুচর-পরিবৃত
হইয়া চতুর্ব্বিংশতি শতাব্দী ধরিয়া সতেজে বিরাজ ও সাত-
চল্লিশ কোটি মানবের পথপ্রদর্শন করিতেছে। যে মহাত্মা
হইতে এহেন ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাঁহার শিক্ষাপ্রদ চরিতাখ্যান
একজন বাঙ্গালী হিন্দুকবির পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত বৌদ্ধলেখকগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন
ভিন্ন দেশে ও কালে সংস্কৃত, পালি, নেপালী, তিব্বতীয়,
চীন ও জাপানী ভাষায় রচিত হইয়াছে। তাঁহার কোন
জীবনচরিতই সুশৃঙ্খল ও সুসম্বদ্ধ নহে; সকলগুলিই অস-
ম্ভব অলৌকিক জনশ্রুতি ও পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলীতে
পরিপূর্ণ, এবং ভক্তজনসুলভ অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। তদুপরি

---

† লেখক মহাশয় যে যে দেশে হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তার একখানি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।—প্রদীপ-সম্পাদক।

* শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত।

বৌদ্ধধর্ম্ম বেদাদিষ্ট যাগযজ্ঞ ও জাতিভেদের বিরোধী হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধের জীবনাখ্যায়িকা নানাবিধ কুৎসিতবর্ণে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং এই সকল আবর্জ্জনাময় মূল পুস্তক হইতে বুদ্ধের জীবনের একটি ধারাবাহিক বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হয়, তাহাদিগকে ত্রিপিটক বলে। তাহার প্রথমভাগ সূত্র, অর্থাৎ বুদ্ধের স্বীয় উপদেশাবলী, দ্বিতীয়ভাগ অভিধর্ম্ম অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শন, তৃতীয় ভাগ বিনয় অর্থাৎ বৌদ্ধ নীতি-বিজ্ঞান। সূত্রসমূহই বুদ্ধের জীবনেতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি; তৎপরেই গাথা, অর্থাৎ সমসাময়িক ভাটগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-ধর্ম্মমণ্ডলীর সমক্ষে গীত বুদ্ধের জীবনী, উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেবল সূত্র ও গাথা হইতে বুদ্ধের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০—৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত 'ললিত বিস্তর' নামক গ্রন্থে বুদ্ধের জন্ম হইতে সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, এবং বহু অলৌকিক ঘটনা-সম্বলিত হইলেও তাঁহার জীবনের সেই অংশ সম্বন্ধে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অবশিষ্টাংশ সূত্র প্রভৃতি হইতে সঙ্কলন করিতে হয়। পালি ভাষায় বুদ্ধঘোষ প্রণীত বুদ্ধের যে জীবনী আছে, তাহাতে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বুদ্ধের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত হইলেও তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে। কারণ, উহা বুদ্ধদেবের প্রায় সহস্র বৎসর পরে বিরচিত।

বুদ্ধের কোন সুশৃঙ্খল জীবনী না থাকায় এতাবৎ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যতিরেকে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞতা বর্ত্তমান ছিল। পনের বৎসর হইল, সুকবি এড্‌ুইন্ আর্ণল্ড Light of Asia নামক একখানি উচ্চশ্রেণীর কাব্যরচনা দ্বারা এই অজ্ঞান তিমির অনেকাংশে দূরীভূত করিয়াছেন। * পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় বিরচিত হওয়াতে যদিও আমাদের সমালোচনার সীমাবহির্ভূত, তথাপি বিষয়ের ঐক্যনিবন্ধন 'অমিতাভ' সমালোচনায় তুলনার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে উহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইব।

মহাকাব্যরচনার পক্ষে অমিতাভের জীবনী অপেক্ষা উচ্চতর ও যোগ্যতর বিষয় কল্পনা করা দুরূহ। মহাকাব্যের বিষয় যেরূপ মহান্ ও উন্নত হওয়া আবশ্যক, উহা তাহার অনুরূপ, এবং মহাকাব্যের উদ্দেশ্য যে লোকশিক্ষা শাক্যজীবনী অপেক্ষা তদ্বিষয়ে অধিকতর অনুকূল আমরা আর কিছু জ্ঞাত নহি। উহাতে কাব্যসুলভ লাবণ্য ও রোমান্স্‌দ্বারা ভূষিত হইবার উপযুক্ত অলৌকিকত্বের অপ্রতুল নাই। বিষয়টিতে শান্ত, করুণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক রসোদ্রেকের যথেষ্ট উপাদান আছে মানবহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কোমল গম্ভীর, মধুর প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার ভাবরাজি মন্থন করিয়া প্রত্যেক মানবের সহানুভূতি আকর্ষণদ্বারা অন্তঃকরণ উন্নত ও মার্জ্জিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আবার বিষয়টি কবির কল্পনাশক্তি, শিল্পকুশলতা ও রচনা চাতুর্য্যের উত্তম বিকাশক্ষেত্র। কারণ, জগতের যাবতীয় বিলাস সামগ্রীতে পরিবৃত ও নিরন্তর ভোগসুখে নিরত থাকিয়াও গৌতমের হৃদয়ে যে মহান্ বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার ক্রমবিকাশ-প্রদর্শন প্রতিভাশালী কবি ব্যতিরেকে অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। নবীনচন্দ্রে এরূপ একজন কবি পাইয়া আমার আলোচ্য কাব্যখানির সম্বন্ধে যতদূর আশান্বিত হইয়াছিলাম, ততদূর সফলকাম না হইলেও অনেকাংশে উহা চরিতার্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রকাশক বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, কোন কোন সমালোচকের মতে পলাসির যুদ্ধের পর অমিতাভের ন্যায় কাব্য নবীন বাবুর লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা কোন ক্রমেই এই মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। পলাসির যুদ্ধের সেই জ্বালাময়ী ভাষা, আশ্চর্য্য বর্ণনাশক্তি, অদ্ভুত

* Perhaps the work which has brought Buddhism to a larger circle of Western readers than it had hitherto reached is Mr. Edwin Arnold's Light of Asia—a poem which has undeniable merits, and is likely to maintain its rank among the narrative poems of modern times.........I doubt if all that has been done by oriental scholars has contributed so much to the sympathy of Christians with a great religion foreign to their own as this entrancing poem. The surprise and delight with which it was greeted was remarkable and was really painful evidence that the Western community at large were in a state of densest ignorance concerning Buddha and Buddhism before the publication of this work."—Rev. S. Fletcher Williams (*Reported in The Indian Mirror, November 1899*).

শব্দ-চতুরতা”—অমিতাভে বড় পরিদৃষ্ট হয় না। আমাদের মতে পুস্তকখানি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত না হইয়া মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের ন্যায় আদ্যোপান্ত এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইলেই ভাল হইত; অবশ্য ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট যে গীতিকবিতা আছে, তৎসম্বন্ধে একথা প্রযুজ্য নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ও অমিত্রাক্ষর প্রভৃতির একত্র সমাবেশে যেন বিষয়ের গাম্ভীর্য্য, গুরুত্ব, ও ধারাবাহিকতা রক্ষার পক্ষে ব্যাঘাত হইয়াছে। আর্ণল্ডও শেষ সর্গের কতক অংশ ব্যতীত সর্ব্বত্র এক অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

বর্ণনাশক্তিতে যে নবীন বাবুর পূর্ব্বাপেক্ষা অধঃপতন হইয়াছে, 'অমিতাভে' তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বোধ হয় কবি পলাসির যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রেই তাঁহার সমগ্র বর্ণনাশক্তি নিঃশেষ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমরা কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার বিকাশ দেখিতে পাই মাত্র। এবিষয়ে আর্ণল্ডের সহিত তুলনায় তিনি নিতান্তই খাট হইয়া পড়েন। হলোৎসবের দিন বাসন্তিক প্রকৃতির মুক্তদৃশ্যের আর্ণল্ড কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন! নবীন বাবু সে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। সিদ্ধার্থের প্রমোদভবন নির্ম্মাণের একটি বিস্তৃত মনোহর বিবরণ Light of Asiaর দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই, নবীনবাবু কয়েকটি ছত্রেই তাহার নিঃশেষ করিয়াছেন। এইরূপ কপিলবস্তুর নাগরিকগণের দৈনিক জীবন, রাজগৃহে সূর্য্যোদয়, সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভে প্রকৃতির আনন্দোৎসব প্রভৃতির বর্ণনাতে আর্ণল্ডের শ্রেষ্ঠ বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সে দিনের মত মহান্, গম্ভীর, কবিকল্পনা উদ্দীপক ও সুফল প্রসূ ঘটনা মানবের ইতিহাসে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। যে দিন গৌতম স্বীয় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মানবের হিতার্থ বনবাসী হইয়াছিলেন, একবার সেই ঘটনাটি কল্পনা করা যাউক। প্রথম দৃশ্য,—সিদ্ধার্থ গোপাপ্রমুথ অপ্সরাবিনিন্দিত রমণীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ ও বিলাসিতাপূর্ণ ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রমোদভবনে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার এক দেবকান্তি পুত্র জন্মিয়াছে; সমগ্র রাজপুরী আনন্দে মগ্ন; কিন্তু সিদ্ধার্থের চিত্ত নিরানন্দ। তিনি বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে, সংসারে সুখাশা মরীচিকায় জলভ্রমমাত্র, যদি কিছু সুখ থাকে—তাহা সংসারে বীতরাগ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেই আছে। পরবর্ত্তী দৃশ্য,—নিশীথ সময়, সমগ্র পুরী নিস্তব্ধ ও নিদ্রামগ্ন; গোপা একবার স্বপ্নদর্শনে চমকিয়া উঠিয়াছেন, সিদ্ধার্থ আশ্বাসবাণী দ্বারা পুনরায় তাঁহার নিদ্রাসম্পাদন করিয়াছেন; সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তিনি ইহাই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া যাবতীয় ভোগবিলাস স্ত্রী পুত্র, রাজ্য প্রভৃতি জীবনে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক মানবের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উচ্চ লক্ষ্যানুসরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধর্ম্মে সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। সেই ধর্ম্মের আলোকে এখনও জগতের এক তৃতীয়াংশ মানব স্বীয় জীবন পরিচালিত করিতেছে। কবির কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি কত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা প্রদর্শনের বোধ হয় এতদপেক্ষা উচ্চতর, ভাবময়, মহান্ বিষয় কল্পিত হইতে পারে না। আর্ণল্ডের Light of Asiaর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এবং বর্ণনাগুণে এই অংশটি তাঁহার কাব্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অমিতাভের 'বৈরাগ্য', 'মহানিশি' 'বিদায়' ও 'মহানিষ্ক্রামণ' এই চারিটী অধ্যায়ে উহা বিবৃত হইয়াছে। যদিও উহাতে নবীন বাবুর কবিত্বশক্তি ও উজ্জ্বল কল্পনার পরিচয়ের অভাব নাই, তথাপি বর্ণনাগুণে উহা আর্ণল্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।*

অমিতাভ পাঠে পাঠকের চিত্তে কবি-প্রতিভার অবনতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও পুস্তকের সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ কবির হস্তাক্ষর প্রতীয়মান হয়। নিম্নে বারাণসীর বর্ণনা উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতেই পাঠক উপরিউক্ত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

> বঙ্গদেশ জনপদ করি অতিক্রম
> হইলেন উপনীত বারাণসী ধামে
> ভারতের মহাতীর্থ। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

* যে রাত্রে সত্যের উদ্দেশে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগী হন, সেই স্মরণীয় নিশীথে গোপা স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলে সিদ্ধার্থের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয়, সে দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া সুকবি আর্ণল্ড উভয়ের প্রেমের একটি সুন্দর আভাস দিয়াছেন। গিরিশ বাবু তাঁহার 'বুদ্ধদেব চরিতে' তাহার অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু অমিতাভে তাহা নাই।

শোভিতেছে কাশী নীলা ভাগীরথী তীরে
নীলাকাশে অর্দ্ধশশী। হর্ম্ম্য শত শত
সোপান-চরণ জলে করি নিমজ্জিত
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ মহাযোগী মত
তম আচ্ছাদিত দেহ। শান্ত প্রতিবিম্ব
পড়ি শান্ত সলিলেতে দুইটি ত্রিদিব
বিকাশিছে কিবা শান্তি পবিত্রতাময়।
দেবালয়, বিদ্যালয়, শত সংখ্যাতীত
শোভিতেছে স্থানে স্থানে। যোগী শত শত,
পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, বিপ্র, আছে নিমজ্জিত
অধ্যয়নে, কিম্বা নানা শাস্ত্র আলাপনে।
ঢাক, ঢোল, কাংস্য, ঘণ্টা, করতাল রবে
পরিপূর্ণ কাশীধাম, লোক কোলাহলে।
সোপান, সৈকত, জল, স্থল, রাজপথ
আচ্ছন্ন মানবে, নানাবাসে বিচিত্রিত।
সোপানে, সৈকতে, জলে বক্ষ নিমজ্জিত,
কত কণ্ঠে, কত স্তোত্র হইতেছে গীত
কত নরনারী কণ্ঠে; মন্ত্রে বহিয়া
যাইছেন ভাগীরথী বহি পুষ্পভার,
অগুরু চন্দন পুষ্পগন্ধে সুবাসিত;
ধর্ম্ম কোলাহলে পূর্ণ বারাণসী ধামে
বুদ্ধ করিলেন স্থির করিতে প্রচার
নবধর্ম্ম ভেরী রবে দুন্দুভি নির্ঘোষে।
* * * * * *
ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী ধূসরা যোগিনী,
ধূসরা কুন্তলা বালা, ধীরে নিশীথিনী
উপাসিকা কুলনারী, নীলমণিময়
পুষ্প পাত্রে মনোহর, শ্বেত পুষ্পনিভ
লইয়া নক্ষত্ররাশি, অনন্তরূপিণী
আসিলেন মহাতীর্থে। ধীরে আবতির
কোলাহল নীরবিল, হইল নীরব
চরাচর, কাশীধাম সুষুপ্ত নীরব। (১৪৫—৪৭ পৃঃ)

যিনি প্রদোষকালে নদী বক্ষ হইতে বারাণসীর শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই এই বর্ণনার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। রাজগৃহ, গয়া, নৈরঞ্জনা তীরস্থ বনভূমি প্রভৃতির বর্ণনাও মনোহর, পাঠক স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইবেন, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

অমিতাভ Light of Asia অপেক্ষা ঘটনাবহুল, এবং ললিত বিস্তরের অধিকতর অনুগামী। আর্নল্ড যে সকল বিষয়ের কোন উল্লেখই করেন নাই, নবীন বাবু তাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গৃহ পরিত্যাগ কালে সিদ্ধার্থ পিতার নিকট বিদায় লইতে গিয়াছিলেন, আর্নল্ড তাহার কোন উল্লেখই করেন নাই। সিদ্ধিলাভের পর প্রচার কালীন অনেকগুলি ঘটনা তিনি বাদ দিয়া গিয়াছেন, নবীন বাবু তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত গাথাটি নবীন বাবু কেমন সরল ও সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, পড়িলে মনে হয় না ইহার ভাবগুলি অন্য কোন পুস্তক হইতে গৃহীত। কিন্তু পাঠক ললিত বিস্তরের একাদশ অধ্যায় খুলিলে দেখিতে পাইবেন, নবীন বাবু কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূলের অনুগামী হইয়াছেন। ইহা অবশ্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই;—

"জরা মৃত্যু দুঃখে ভরা হায়! এই ত্রিভুবন,
মরণ-অগ্নিতে দীপ্ত, অনাশ্রয়, অকিঞ্চন।
কুম্ভগত ভ্রমরের মত হায়! জীব আর,
মর নর হস্ত হ'তে নাহি কি উদ্ধার তার?
শারদীয় অভ্র সম অনিত্য এ রঙ্গালয়,
জন্ম মৃত্যু নিরন্তর করিতেছে অভিনয়।
বেগবতী নদী মত, চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রায়,
মানব-জীবন দ্রুত কোথায় চলিয়া যায়।
অজ্ঞান আঁধারে ঘোর তৃষ্ণায় পীড়িত নর,
কুম্ভকার-চক্র মত ঘুরিতেছে নিরন্তর।
ইন্দ্রিয়ের সুখে মুগ্ধ হায়রে মানব যত,
জড়িত ব্যাধের জালে প্রলুব্ধ মৃগের মত।
বাসনা অনন্ত বহ্নি; তাহার ইন্ধন ভোগ;
ভোগ সুখ-স্বপ্ন সম, জলে চন্দ্র ছায়া যোগ।
যৌবনে সুন্দর দেহ হ'লে জরা ব্যাধি-গত
করে নর পরিহার, মৃগে শুষ্ক হ্রদ মত।
ফলিত পুষ্পিত চারু বৃক্ষসম দেহ, হায়!
জরা আক্রমিলে হয় তড়িৎ আহত প্রায়।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল?
জরা দহে দেহ, যথা তপ্ত বিষ বনস্থল।
হরে পরাক্রম বেগ, সুরূপ বিরূপ করে,
হরে সুখ, হরে শান্তি ব্যাধি দগ্ধ করে নরে।
কহ মুনে! মানবের কি আছে উপায় বল!
নির্ব্বাণ হইবে কিসে জরা-ব্যাধি-দুঃখানল?
শিশিরে তুষারপাত প্রফুল্ল কমল প্রায়
হায়! দেহ, বল, রূপ,—সকলই শুকায়ে যায়।
নিপতিত নদীবক্ষে বিশুষ্ক পত্রের মত
এ সংসারে প্রিয়জন ভাসিয়া যায় সতত।
যে যায় সে যায় হায়! কেহ ত না ফিরে আর,
মিলন তাহার সহ নাহি হয় আরবার।
সকলি মৃত্যুর বশে, মৃত্যু বল বশে কার?
জন্ম-জরা মরণের বিষে পূর্ণ এসংসার।
ক'রেছিলে প্রণিধান সিদ্ধার্থ! কি মনে হয়—
উদ্ধারিতে এ সংসার? উপস্থিত সে সময়।"
(৩৮—৪০ পৃঃ)

পাঠক উদ্ধৃত গাথাটি মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িয়া দেখিবেন, যে সকল উপমাদ্বারা উহার রমণীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই মূল হইতে গৃহীত। এইরূপ অনেক স্থলে নবীন বাবু ভাব, শব্দ, উপমা, এমন কি এক একটি সমগ্র পদ মূল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু

তাঁহার প্রশংসার কথা এই যে, তাহাদিগকে পুস্তক মধ্যে এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে বর্ণনার ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই, অথচ কবিতার সৌন্দর্য্য অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবির কাব্যশিল্পের একটি প্রধান পরিচয় উপমার উৎকর্ষ ও উপযোগিতা, অমিতাভে নবীন বাবুর কাব্য-শিল্পের সেরূপ পরিচয় যথেষ্ট আছে, নিম্নলিখিত উপমা-টিতে অন্যান্য রমণীগণের তুলনায় গোপার শ্রেষ্ঠত্ব কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে।—

> একে একে তাও শিরে গেল বালাগণ,
> গেল চন্দ্র কিরীটিনী যামিনী যেমন।
> *　　*　　*　　*　　*
> *　　*　　*　　একি দরশন!
> কৌমুদী যামিনী শেষে উঠিল কি ভাসি
> উষার আলোক রাশি সুপ্রভাতে হাসি!
> দণ্ডপাণি-সুতা গোপা অতি ধীরে ধীরে
> প্রবেশিল দিবা যেন অশোক মন্দিরে। (২৯ পৃঃ)

শব্দের সহিত ভাবের সামঞ্জস্য (onomatopœia) দ্বারা ভাষাটী অনেক স্থলে মনোরম করা হইয়াছে যথা—

> ঢলাঢলি করি রঙ্গে, করি গলাগলি
> করিতেছে হুলুধ্বনি পুরাঙ্গনাগণ,—
> হাসির তরঙ্গ ভঙ্গে কটাক্ষ ঢালিয়া। (৫৫ পৃঃ)

এখানে 'ঙ্গ' এবং 'ল' এই দুটী বর্ণের বাহুল্যদ্বারা রঙ্গের তরলতা সূচিত হইতেছে।

এস্থলে নবীন বাবুর রচনা পদ্ধতির (Style) একটী দোষোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শব্দ-বিশেষের পুনরুক্তি স্থলবিশেষে শ্রুতিসুখকর হয় এবং পদটীকেও সুন্দরতর করে, কিন্তু পুস্তকের যত্র-তত্র এইরূপ পুনরুক্তি করিতে গেলে তাহা কবির একটি মুদ্রাদোষ (mannerism) বলিয়া পরিগণিত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই :——

> শাক্য-রাজ্য সুখে ভরা,　　ধন ধান্যে প্রেম পুণ্যে
> 　　পরিপূর্ণ দেশ মনোহর,
> ধন ধান্যে, প্রেম পুণ্যে　　পরিপূর্ণ রাজপুরী;
> 　　পরিপূর্ণ রাজার অন্তর।
> প্রেম পুণ্যে বিভাসিত　　শান্তির সুনীলাকাশে
> 　　তবু যেন হয়েছে সঞ্চার— ইত্যাদি। (৩ পৃঃ)

আবার ৬ পৃষ্ঠায়ই—

> প্রকৃতি মেলিছে আঁখি,　　ভাসিছে নির্ম্মলাকাশে
> 　　বসন্তের প্রথম নীলিমা।
> প্রথম মলয়ানিলে　　ফুটেছে প্রথম ফুল,
> 　　ফুটিছে প্রথম কিশলয়।
> প্রথম পাখীর গান,　　পুষ্পের প্রথম ঘ্রাণ,
> 　　কানন করিছে সুধাময়।
> প্রথম বসন্তোন্মেষে　　দেবীর হৃদয়ে যেন
> 　　কিবা স্বর্গ খুলিল প্রথম,—ইত্যাদি।

এইরূপ ১২৯ পৃষ্ঠায় 'স্থির' ১৫২ পৃষ্ঠায় 'আকুল' ১৫৩ পৃষ্ঠায় 'মধুর' ও 'মাধুরী,' ১৮৪ পৃষ্ঠায় 'নীরব,' ১৮৮ পৃষ্ঠায় 'দুঃখ' ইত্যাদি শব্দের পুনরাবৃত্তি বড় শ্রুতিকঠোর বোধ হয়। যেখানে সেখানে না হইয়া পুস্তকের দু এক স্থলে এরূপ হইলে কঠোর না লাগিয়া মধুরই লাগিত।

নবীন বাবু সূচনায় বলিয়াছেন, "আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে (বুদ্ধদেবকে) মানুষিক ভাবাপন্ন দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক। অতএব তাঁহাকে অতি-মানুষভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনও বিশেষ নাই।" কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নবীন বাবু বুদ্ধদেবকে সম্পূর্ণ মানুষিক-ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই! তবে তিনি যে সকল অলৌকিক ঘটনার বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলিকে যোগবল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জম্বু বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ ধ্যানমগ্ন থাকিয়া ব্যোমচারী পঞ্চ মহর্ষির দৃষ্টি আক-র্ষণ করিয়াছিলেন, মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলেও বৃক্ষচ্ছায়া তাঁহার মস্তকোপরি স্থির থাকিয়া তাঁহাকে ছায়াম্বিত করিয়াছিল, সিদ্ধিলাভানন্তর ভাগীরথী পার হওয়ার কালে নাবিক বিনাপণ্যে পার করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বুদ্ধ শূন্য-মার্গে নদী পার হইয়াছিলেন, ইত্যাদি ব্যাপারের নবীনবাবু উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যোগবল দ্বারা সেগুলির স্বাভাবিকতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষ-দিগের জীবনী হইতে অতিমানুষ ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা অসম্ভব। কারণ ভক্তশিষ্যগণ তাঁহাদিগকে অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করে, এবং তাহাদের সেই সকল চিত্র হইতেই আমরা মহাপুরুষদিগের প্রথম বিবরণ প্রাপ্ত হই। এতদ্ব্যতীত মানবের অন্তঃকরণ স্বভাবতই পূজ্য ব্যক্তিদিগকে সাধারণ মনুষ্যশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চ করিয়া কল্পনা করিতে ভালবাসে। নিজে যে সমুদায় মানসিক দুর্ব্বলতা ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তাঁহারা তৎসমুদায় হইতে মুক্ত, এরূপ ধারণা সে করিতে

চায়। এই জন্য তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বিজ্ঞানের আলোকে বিচার না করিয়া ভক্তির চক্ষে বিশ্বাস করিয়া লয়। ইহা হইতেই miracleএর সৃষ্টি। মানব-হৃদয়ের এই বীর-পূজা-প্রবণতা কেবল কুফলপ্রসূ নহে; ইহা হইতে এক দিকে যেমন কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়, অন্য পক্ষে তেমনই ইহাতে আমাদের লক্ষ্যের উচ্চতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে না এবং আমাদের উপাস্য দেবতার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনেক প্রকার দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে মুক্ত থাকি। 'সিদ্ধি' ও 'মহানির্ব্বাণ' এই দুই অধ্যায়ে কবি বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্রগুলির আভাস দিয়াছেন। প্রথমোক্ত অধ্যায়ে সে গুলি সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

দুঃখের কারণ (১) জন্ম; জন্মের কারণ
(২) কর্ম্মফল; কর্ম্মফল উপজে চেষ্টায় (৩)
শারীরিক মানসিক; চেষ্টার কারণ
(৪) সুখ-তৃষ্ণা; বুঝিলেন, সুখ-দুঃখ-বোধ (৫)
তৃষ্ণার কারণ; সুখ-দুঃখ অনুভব
জন্মায় ইন্দ্রিয়গণ; তাহার কারণ
জগতের সহ মন ইন্দ্রিয় (৭) সংযোগ।
জগতের রূপ-রস-গন্ধ মনোহর (৮)
এই সংযোগের হেতু। গন্ধ রূপ রস;—
সমস্ত জগৎ,—সূক্ষ্ম পরমাণু জাত,
করে প্রকটিত নানারূপে (৯) এক জ্ঞান।
বুঝিলেন, সংসার এ জ্ঞানের মূল;
[illegible] সংসার ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যা-সম্ভূত।
[illegible] সত্য রূপ রস,—একে দেখে যাহা
[illegible] সুন্দর, অন্যে দেখে তা বিরূপ।
[illegible] রূপ রস ভাবে সত্য নর
[illegible] ঘোর, আমি ও আমার—
[illegible] হ'য়ে প্রতারিত।
[illegible] হইলে নিরোধ
[illegible] হ'লে তিরোহিত,
[illegible] রূপ রস জগতের,
হইবে [illegible] তাহে ইন্দ্রিয় ও মন,
করিবে না পাপকর্ম্মরত মুগ্ধ নর।
পাপ কর্ম্ম ফলে জন্ম হইবে না আর;
জরা-ব্যাধি-মরণের হইবে নির্ব্বাণ। (১৩২-৩৩ পৃঃ)

শেষ অধ্যায়ে এগুলি আরও বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বগুলি যেরূপ দুরূহ, তাহাতে কবি তাহাদিগকে যথাসাধ্য সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, বলিতে হইবে।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কেবল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণের মধ্যে নহে, বৌদ্ধদিগের মধ্যেই যেরূপ বিভিন্নমত প্র[illegible], তাহাতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আয়তনে তাহার সম্যক্ আলো[চ]না সম্ভবপর নহে। অতএব এতৎসম্বন্ধে যে দুটি ধার[ণা] প্রধানতঃ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা[র] কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব। এক[টি] অভাবাত্মক (negative) আর একটি ভাবাত্মক (positive) সোজাসুজি বলিতে গেলে অভাবপক্ষে নির্ব্বাণ অ[র্থ] আমিত্বের আত্যন্তিক বিনাশ (absolute nihility) ইহা শূন্যবাদে পর্য্যবসিত। ভাবপক্ষে নির্ব্বাণ অর্থ আত্মা[র] অবিনশ্বর ভাব ও বিকাররহিত নির্ম্মল সত্তা (a stat[e] of Eternal repose and bliss)। ইহা শূন্যবাদ নহে[,] আত্মার একটি বিশেষ অবস্থা। নবীনবাবু নির্ব্বাণে[র] এই শেষোক্ত মতটিই অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বো[ধ] হয়। তিনি নির্ব্বাণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

কর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, নাই মৃত্যু আর!
সুখের তৃষ্ণায়, দুঃখ-তাড়নায় আর,
নহে বিচলিত, আত্মা শান্তাকাশ মত
অনন্ত, অসীম, শান্ত, শান্তি-পারাবার! (১৯৬ পৃঃ)

আর্ণল্ডও নির্ব্বাণের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, * এ[বং] গিরিশ বাবু তাঁহার নাটকে ইহারই সমর্থন করিয়াছেন—

এস নব রাজ্যে
চিরশান্তি করিছে বিরাজ,
রোগ-শোক-মৃত্যু-ভয় নাই
আনন্দ সদাই;
নাহি প্রলোভন,
হিংসা-কীট করে না দংশন,
আশায় না ফেলে আর দুঃখের সাগরে;
পরম পুলকে নির্ব্বাণ আলোকে
অমৃত জীবন হয় লাভ!

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই মতই বোধ হয় সাধারণের গ্রা[হ্য] ও সমীচীন বলিয়া প্রতীতি হইবে। তাহার কারণ আর্ণল্ড উত্তমরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মানব জাতির এ[ক] তৃতীয়াংশ কখনই কতকগুলি অর্থশূন্য শুষ্ক তত্ত্বে আ[স্থা] স্থাপন করিতে অথবা শূন্যতাকে জীবের চরম লক্ষ্য বলি[য়া] বিশ্বাস করিতে পারে না।" †

(১) জাতি (২) ভব (৩) উপাদান (৪) তৃষ্ণা (৫) বেদনা (৬) স্পর্শ (৭) ষড়ায়তন (৮) নামরূপ (৯) বিজ্ঞান।

* "——Nameless quiet, nameless joy,
Blessed Nirvana,—sinless, stirless rest—
That change which never changeth." *Book* [illegible]
"If any teach Nirvana is to cease
Say unto such they lie." *Book VIII.*

† The views, however, here indicated of "Nirvana" ......are at least the fruits of considerable study, and also of a firm conviction that a third of mankind would never have been brought to believe in blank abstractions, or in Nothingness as the issue and crown of Being."

মার্লবরোর দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধে খৃষ্টিয়ানা আপন শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভাবিতেও পারিল না। রামিলিসের যুদ্ধাবসানে একটা গোলা ভাঙ্গিয়া আসিয়া তাঁহার মাথায় লাগে। এই আঘাতে তাঁহাকে তিনমাস শয্যাগত থাকিতে হয়। সেই সময়ে, তিনি যে রমণী, একথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক হইতে সম্মানসূচক উপহার আসিতে লাগিল। তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকটে আনীত হইলেন। সৈন্য-দলের কাপ্তান এক নববিবাহের উদ্যোগ করিলেন। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ এই বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টিয়ানা আর রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। বিবিধ যুদ্ধে আপনার রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালপ্ল্যাকুয়েটের যুদ্ধে তাঁহার স্বামী নিহত হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এতদুপলক্ষে রাণী এন্ তাহাকে ৭৫০্ টাকা উপহার দেন ও রাজকোষ হইতে তাঁহাকে জীবনব্যাপী বৃত্তি দেওয়া হয়। ডিউক অব্ মার্লবরোর মৃত্যু হইলে খৃষ্টিয়ানা তাঁহার সৈনিকসঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে ও ছলছল চক্ষে মৃত সেনাপতির সম্মানার্থ তদীয় শববাহী শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। চেলসী হাঁসপাতালে তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার সৈনিকসঙ্গিগণ তদীয় সম্মানার্থ তিনবার বন্দুকধ্বনি করেন।

হানাম্নেল আর এক রণরঙ্গিণী ... তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নাবিকরূপে ... তিনি পুরুষ বেশে স্বামীর অন্বেষণে বাহি... কভেণ্ট্রিতে যাইয়া তিনি গাইসের ... হইয়াছিলেন। ক্রমাগত বাইশ দিন ধরিয়া ... কার্লাইল অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। তিনি ... কার্লাইলে ছিলেন, তখন কোন অপরাধের জন্য তাঁহার ছয় শত বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। এই ছয়শতের মধ্যে ন্যূনকল্পে চারিশত আঘাত তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তিনি নীরবে সে যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিল না যে, তিনি রমণী।

অনন্তর তিনি সেই দল ত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পোর্টস্মাউথে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি কপর্দ্দক-বিহীনা এবং নিতান্ত অসহায়া। অগত্যা তিনি জেমস্ গ্রে নাম গ্রহণ করিয়া বস্কোয়েনের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ যাত্রী মানোয়ার বহরের নৌ সৈন্যদলভুক্ত হইলেন। এদেশে আসিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। পণ্ডিচারি অবরোধকালে হানাই স্বীয় দলের অগ্রণী হইয়া অগ্ন্যুদ্গিরণকারী ফরাসী কামানের সম্মুখবাহিনী নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে কঠোর কর্ত্তব্যসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইতে দেখে নাই। একদা তিনি পরিখা খননে নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমাগত সাতরাত্রি পরিখাভ্যন্তরে কোমর জলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং ন্যূনকল্পে দ্বাদশটী গুলি লাগিয়া তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। পাছে তাঁহার রমণীত্ব প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় তিনি স্বয়ং এক এদেশীয়া স্ত্রীলোকের সাহায্যে আপনার ক্ষতস্থানের প্রক্ষালন ও তাহাতে ঔষধ প্রদান করিতেন,—চিকিৎসকের সাহায্য আদৌ গ্রহণ করিতেন না। হানার সুমসৃণ মুখমণ্ডল দেখিয়া কেহ বা তাহাকে কুমারী মলী গ্রে বলিয়া ডাকিত, আবার কেহ বা তাঁহার হাসিখুসি মেজাজ দেখিয়া তাহাকে হার্টি জিমি বলিত। কিন্তু কেহ কখন তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই।

হানাম্নেল।

এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েক বৎসর যাপন করিয়া পরে তিনি শুনিতে পাইলেন, যে স্বামীর অন্বেষণে তিনি আপন

চায়। এই জন্য তাহাঁ ...রিয়া রণক্ষেত্র সার করিয়াছেন, বিচার না করিয়া ত...র প্রাণদণ্ড হইয়াগিয়াছে! ইহা হইতেই ... মাত্র তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করি- বীর-পূজা-প্রবণতা বেশ বর্জ্জন করিয়া আবার রমণী এক দিকে যে... দিন পরে তাঁহার আবার বিবাহ হইল। ইহাতে অ...ববাহিত জীবন তাঁহাকে অধিকদিন যাপন ...ইল না। একটী পুত্রসন্তান রাখিয়া তিনি না... বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

মহাবীর নেল্‌সন্ যুদ্ধে বামচক্ষুহীন হন, একথাটা সর্ব্ব-জন-বিদিত। নিকারাগুয়া সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি সির্গর ডি লিবারেটো আবারকা বলেন যে, একজন রণরঙ্গিণীর হস্তে এই অদ্বিতীয় বীরপুরুষকে চক্ষু হারাইতে হইয়াছিল! ১৭৮০ খৃঃ অব্দে নেল্‌সন্ আপন মানোয়ার বহর সমভি-ব্যাহারে মধ্য আমেরিকার উপকূলাস্তিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্পেনীয় উপনিবেশগুলির যথাসম্ভব নিগ্রহ করিতেছি-লেন। ক্যাসল অব স্যানকার্লস ডি নিকারাগুয়া অধি-কার মানসে হঠাৎ একদিন স্যানজুয়াল নদী বাহিয়া দুর্গ-সম্মুখীন হইলেন। প্রতিরোধ-প্রয়াস বৃথা ভাবিয়া দুর্গস্থ সৈন্যেরা দুর্গ ত্যাগ করিল। শুধু ডোনামোরা নাম্নী একটি রমণী দুর্গ ত্যাগ করিলেন না। তিনি একটা

মেরি সেলিয়েক্ক ও নেপোলিয়ন।

জলন্ত দেশলাইয়ের সাহায্যে নভভিমুখীন কামানগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। যুগপৎ কামানগুলি ভৈরবরবে গোলা বর্ষণ করিল। একটা গোলা ভাঙ্গিয়া নেল্‌সনের চক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন দেখিয়া দুর্গাবরোধ-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হইল। এইরূপে এক রমণীর অলোক সাধারণ শৌর্য্যে শত্রুহস্ত হইতে দেশ রক্ষা পাইল। এই স্বদেশহিতৈষণার জন্য ডোনামোরা রাজাদেশে জীবন-ব্যাপী বৃত্তি, কাপ্তেন উপাধি ও সম্মান-সূচক পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

মেরী সেলিয়েক্ক নাম্নী আর এক রমণী বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের জন্য মহাবীর নেপোলিয়ানের হস্ত হইতে লিজিয়ন অব অনার চিহ্নিত ক্রুশ পুরস্কার পাইয়া সুবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। প্রথমে ১৭৯২ খৃঃ অব্দে তিনি দ্বিতীয় সংখ্যক সৈন্যদলে পুরুষ ভলান্টিয়াররূপে প্রবেশ করেন। অষ্টারলিজের যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন করিতে দেখিয়া নেপোলিয়ন তাঁহাকে সাতশত ফ্রাঙ্কের জীবন-ব্যাপী বৃত্তি প্রদান করেন। ইতালি হইতে প্রত্যাগত হইয়া মেরী সেলিয়েক্ক যখন সম্রাট্-পত্নী যোসেফিনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তাঁহাকে মূল্যবান্ মকমলের পোষাক পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত লিজিয়ন অব্ অনারসম্মান প্রাপ্ত প্রত্যেকে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন মিছিলে (Procession) উপস্থিত ছিলেন।

ফরাসী প্রলয়কাণ্ডের ভৈরব যুগে (Reign of Terror) পারী ও অন্যান্যনগরে উগ্রচণ্ডা নাম লইয়া স্ত্রীলোকেরা দলে দলে বাহির হইত। ইহারা অনাহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, কাস্তে কুড়াল হস্তে লইয়া সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থান করিত ও উদরান্নের দাবী করিত। এই সময় দুটী রমণী আপনাদের অসীম সাহসের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হন। তন্মধ্যে এক জনের নাম রোজ লাকোম (Rose Lacomb) অপরের নাম থিয়রন ডি মেরীকোর্ট। প্রথমা সামান্য অভিনেত্রী ছিলেন। অভিনয় ছাড়িয়া তিনি রণরঙ্গে মাতিলেন। দ্বিতীয়ার অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখিয়া সকলে তাঁহাকে লা বেলি লিগজ বা লিজবাসিনী সুন্দরী (La Belle Liegoise) বলিত। লা বেলি লিগজ রক্তবর্ণরেসমবস্ত্র পরিহিতা হইয়া পালক শোভিত উষ্ণীষ মস্তকে দিয়া সর্ব্বদাই আপন সঙ্গিনীগণের অগ্রণী হইতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইনভালিডেসের (the Invalides) সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন। তিনিই অগ্রণী হইয়া ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে বাস্তিল (the Bastille) আক্রমণ করেন। রোজ লাকোমের সমভিব্যাহারে তিনিই আবার সহস্র সহস্র অনাহারক্লিষ্ট ও ক্ষিপ্তপ্রায় পারীবাসিনীগণের অগ্রণী হইয়া ভার্সেল (Versaille) আক্রমণ করেন। চিত্রে তাঁহার বাস্তিল আক্রমণ চিত্রিত। কি রোমহর্ষণ চিত্র! কুসুমকোমলা রমণীর কালান্তক রূপ কি ভয়াবহ!

থিয়রণ ডি মেরিকোর্ট।

রমণি! আমি না জানিয়া এতকাল তোমাকে রোদনসম্বলা অবলা বলিয়া ভাবিয়াছি। অপরাধ ক্ষমা কর। প্রসন্ন হও। তোমার রণরঙ্গিণীরূপ সম্বরণ কর। অর্জ্জুনের অনুরোধে বাসুদেব কালান্তক রূপ সংবরণ করিয়া চিরপরিচিত চতুর্ভুজ নারায়ণ হইয়াছিলেন। আবার বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভক্তের আগ্রহে দ্বিভুজ মুরলীধর সাজিয়াছিলেন। রমণি! তুমি একবার বাঙ্গালীর ঘরণীরূপে ভয়ত্রস্ত বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকের হৃদ্‌পদ্মে বিহার কর। তোমার বলয়শোভিত বাহুদ্বয়,মল পরিহিত অলক্তরঞ্জিত পদযুগল আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হউক। তোমার গজেন্দ্রগমনে চক্ষু জুড়াক, মঞ্জীরসিঞ্জন শ্রবণে অমৃতধারা বর্ষণ করুক। আর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে ও বিধুবদনসুধা প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া বিষাদমণ্ডিত মৃতপ্রায় প্রাণকে সঞ্জীবিত করুক।

শ্রীপ্রদ্যুম্নচন্দ্র সোম।

প্রতিহিংসা।

(গল্প।)

১

সিপাহী বিদ্রোহ তখন শেষ হইয়াছে, ইংরাজের প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিদ্রোহিগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু ইংরাজের ক্রোধবহ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, অস্ত্রধারী সিপাহী দেখিলেই ইংরেজ-সৈনিকগণ তাহাদিগকে ধরিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতেছে, কিম্বা গাছে লটকাইয়া সঙ্গীনের আঘাতে উদরবিদারণপূর্ব্বক নিদারুণ প্রতিশোধপিপাসা প্রশমিত করিতেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা তখনও দূর হয় নাই। এক এক দিন এক একটা নূতন হুজুগ উঠিয়া রণশ্রান্ত ইংরেজ সৈনিকগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিতে লাগিল। এই সকল হুজুগ হয় ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু এক দিনের হুজুগে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না; একদিন সকালে জনরব উঠিল,ছত্রভঙ্গ সিপাহীরা আবার জোট বাঁধিতেছে, শীঘ্রই টুপিওয়ালার গোঁফে আগুন লাগাইয়া দিবে; বেরেলী, বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। এই জনরব প্রচারের পর একদিন বেরেলীর ইংরাজদুর্গ হইতে আধ ডজন বন্দুক চুরী গেল। সকলে বুঝিল, ইহা নিরস্ত্র সিপাহীদিগেরই কাজ।

চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতির আদেশে বেরেলী দুর্গ হইতে দলে দলে অশ্বারোহিসৈন্য বন্দুকচোর সিপাহীদিগের সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু চোর ধরা পড়িল না, তথাপি নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণ চৌর্য্যাভিযোগে দণ্ডিত হইতে লাগিল। যিনি ফরিয়াদী তিনিই বিচারক, সাক্ষী ইংরাজ সৈন্য; অপরাধ সপ্রমাণ ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডদান উভয়ই সমান উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতে চুরীর হ্রাস হইল না। বন্দুকচুরীর সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহা চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হইয়া পড়িল, ইংরেজের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। শেষে সেনাপতিগণ মন্ত্রণা করিয়া এক মিলিটারী কমিশন বসাইলেন। তাহার সভ্যসংখ্যা দশ জন। কমিসনের সভাপতির প্রতি অপরাধিগণের সরাসরি বিচার করিয়া দণ্ডদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। এই সভাপতি মহাশয়ের নাম কাপ্তেন থয়র্নটন্।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে একদিন অপরাহ্ণে কাপ্তেন থয়র্নটন্ অশ্বারোহণে বায়ু সেবনার্থ সেনানিবাস হইতে বহির্গত হইবেন, এমন সময় একজন এডজুটাণ্ট একখানি আদেশপত্র তাঁহার হাতের জন্য

লইয়া আসিল। মিঃ থবনটন্ অশ্বগতি সংযত করিয়া তাঁহার সহকারী এডজুটান্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

"আবদুল গফুর নামক একজন মুসলমান সিপাহীর কোতলের পরওয়ানা। একজন সারজেন্ট তাহাকে পাহাড়ের উপর গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

"আসামীর জবাব কি?"

"কোম্পানীর সৈন্য দেখিয়া সে তাহার হাতের বন্দুক তাড়াতাড়ি পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আসামী বলে, সে তাহার ভাই আবদুল আব্বাসের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে, তাহার কোন কু-মতলব নাই। আবদুল আব্বাস পঞ্জাবে সওদাগরী করে, আজ কয়েক দিন এ দেশে আসিয়াছে। আসামী আবদুল গফুরের এ কথায় বিশ্বাস করা যায় না। সে সরকারের বন্দুক চুরী করিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্যের জন্য যাইতেছিল, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।"—এই বলিয়া এডজুটান্ট নীরব হইল।

"ঠিক কথা। বদমায়েসকে গুলি করিয়া পশুর মত হত্যা কর।" কাপ্তেন অশ্বপৃষ্ঠে হইতেই অকম্পিত হস্তে হত্যার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন।

অবিলম্বে এই আদেশ নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইল।

২

যাহাদিগের চক্ষুর উপর এই হত্যাব্যাপার সংসাধিত হইল, তাহাদের মধ্যে আবদুল গফুরের ভ্রাতা আবদুল আব্বাস একজন দর্শক ছিল। নীরবে সে তাহার ভ্রাতার শোচনীয় হত্যা সন্দর্শন করিল, তাহার শোকসন্তাপবিদ্ধ হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে সবলে বিদলিত করিতে লাগিল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষে প্রতিহিংসার অনল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

আবদুল আব্বাস তাহার ভ্রাতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ ধরাতলে পড়িয়া অশ্রুধারায় মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে, শিশুপুত্র দুটি তাহাদের মায়ের কোলের কাছে পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে। আবদুল দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দানের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। গৃহে একটা পিস্তল ঝুলিতেছিল,—পিস্তলটি কিছু পুরাতন ও মরিচা ধরা। সেই পিস্তলে সে কাপ্তেনের প্রাণবধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

ঠিক এই সময়ে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আবদুল গফুরের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রাচীন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় তাঁহার দেহে যুবজনোচিত সামর্থ্য বর্ত্তমান। সন্ন্যাসীর নাম কি, তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি করিত। মুসলমানেরা তাঁহাকে 'ফকির সাহেব' বলিয়া ডাকিত, হিন্দুরা বলিত 'স্বামীজি'। কোম্পানীর নফরেরা তাঁহাকে কোন বিদ্রোহপরায়ণ ক্ষত্রিয়-রাজার 'পলিটক্যাল স্পাই' মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সংসারের সুখদুঃখ ও জাতিভেদের গণ্ডির অনেক ঊর্দ্ধে তিনি বিচরণ করিতেন।

সন্ন্যাসী একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভূম্যবলুণ্ঠিতা বিধবা ও তাহার রুদ্যমান সন্তানদ্বয়ের দিকে চাহিলেন; তাহার পর আবদুল আব্বাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, প্রতিহিংসার জন্য প্রস্তুত হইতেছ?"

আবদুল আব্বাস অবিচলিতভাবে বলিল, "যাহারা আমার নিরপরাধ ভ্রাতাকে অবিচারে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের স্বহস্তে বধ করিয়া ভ্রাতৃশোক নিবারণ করিব, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার।" সে অবিচলিত উৎসাহের সহিত বন্দুক ঘসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস, ক্ষান্ত হও, অত্যাচারের দণ্ডবিধানের কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান, তোমরা যাঁহাকে খোদা বল, তিনিই। প্রতিদিন প্রচুর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তুমি আর সে স্রোতের বৃদ্ধি করিও না। পরমেশ্বর তাঁহার কাজ করিবেন, অনুতাপে পাপীর হৃদয় দগ্ধ হইবে, রক্তপাত করিয়া আর তুমি তাহার অপেক্ষা কি অধিক দণ্ডবিধান করিবে।"

আবদুল আব্বাস দৃঢ়হস্তে বন্দুক চাপিয়া ধরিয়া সন্ন্যাসীর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক বলিল, "ফকির সাহেব, আপনি হিন্দু, তাই হিন্দুর মত পরামর্শ দিয়াছেন। কাফেরের প্রাণবধেই মুসলমানের পরম পুণ্য, তাহাই মুসলমানের পরম ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্ম পালন করিব, আপনি বাধা দিবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, তোমার এই ক্রোধের জন্য আমি তোমাকে অপরাধী করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দুমুসলমান সকল ধর্ম্মের উপর এক ধর্ম্ম আছে, তাহা পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তুমি এই হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষা করিলে কখন কর্ত্তব্যচ্যুত হইবে না। আমি কাহাকেও কখন অন্যায় অনুরোধ করি নাই।"

আব্বাস মিঞা বন্দুক হাতে করিয়া কতক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আমরা সকলে আপনাকে পীরের ন্যায় মান্য করি, কখন আপনার অবাধ্য হই নাই, আজও হইব না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ হস্ত শত্রুশোণিতপাতে বিরত হইবে। কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহায় আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, কতদিনে এ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল প্রদত্ত হইবে?"

সন্ন্যাসী একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সেই স্তব্ধ সান্ধ্য আকাশে নবোদিত

তারকার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর দূরবর্ত্তী বনভূমির দিকে চাহিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিলেন,"এক বৎসরের মধ্যে।"

বন্দুকটা যেখানে ঝুলান ছিল, কক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আবদুল আব্বাস তাহা সেখানেই ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

৩

রাত্রি আটটা। কাপ্তেন থরনটন্ তাঁহার শয়ন গৃহের বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহার মন আজ চিন্তা-পূর্ণ। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইয়াছে, এই যে তিনি ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত মনুষ্যবধের আদেশ প্রদান করিতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কতদূর সঙ্গত বা বৈধ হইতেছে, তাহা কি কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? কতকগুলি অসহায় দুর্ব্বল মনুষ্যকে ধরিয়া তিনি তাহাদিগের বধের আদেশদান করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের কতটুকু অপরাধ আছে, তাহারা সত্যই অপরাধী কি না, তাহার কি কোন দিন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি ক্ষমতালাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবার কিছুমাত্র অধিকার নাই; তিনি তাঁহার এই ব্যবহারে বৃটিশরাজমহিমাই যে কলঙ্কিত করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত অবজ্ঞাত করিতেছেন।—এ সকল চিন্তা আজ প্রথম তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। তিনি মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা, কিছু কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

একজন দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকযুবা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে মিলিটারি প্রথায় কাপ্তেন সাহেবকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে গালা মোহর করা নীলবর্ণের লেফাফা মোড়া একখানা পত্র প্রদান করিল। কাপ্তেন থরনটন্ যদি সে সময় একবার তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাহার মুখ মলিন, ভীতিবিস্ময়সমাকুল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে জলন্ত গোলা অগ্নিস্রোতের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিলেও তাহার মনের ভাব হয়ত এরূপ হইত না; আজ সহসা তাহার এ ভাব কেন?

কিন্তু সে দিকে লক্ষ্যপাতমাত্র না করিয়া মিঃ থরনটন্ লেফাফার গালা মোহর ভাঙ্গিয়া পত্রখানি টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, নীলবর্ণের চিঠির কাগজ, ভিতরে ইংরাজীতে এই কয়টি কথা মাত্র লিখিত ঃ—

"১৮৫৮ সালের ১৭ই জুলাই আবদুল গফুর নিহত হইয়াছে।

"১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই কাপ্তেন থরনটন্‌কে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

"পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এক বৎসর মাত্র বিলম্ব।"

পত্রের নীচে একটা স্বাক্ষর, অতি অস্পষ্ট স্বাক্ষর, তাহা কাহার হস্তাক্ষর কাপ্তেন সাহেব বহু চেষ্টাতেও তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

কাপ্তেন থরনটন্ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রবাহী পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই পত্র আনিয়াছে?"

"আবদুল গফুর, একজন মুসলমান সিপাহী।"—ভগ্নস্বরে পদাতিক এই উত্তর দিল।

"অসম্ভব। আবদুল গফুরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

"হাঁ খোদাবন্দ, যাহাদের গুলিতে আবদুল গফুরের প্রাণ বাহির হইয়াছে, আমি তাহাদের মধ্যে একজন; তাহার প্রাণদণ্ডের পর যখন তাহার মৃতদেহ পর্ব্বতগুহায় নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু আমি আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আবদুল গফুর এই কেল্লার ভিতর আসিয়া স্বহস্তে আমাকে এই পত্র দিয়া গিয়াছে।"

কাপ্তেন থরনটন্ কুসংস্কারান্ধ লোক ছিলেন না, সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, পদাতিকের নিশ্চয়ই কোন রকম চক্ষের দোষ ঘটিয়াছে। তথাপি একটা অজ্ঞাত ভয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় বিকম্পিত হইল—এই সংক্ষিপ্ত ও সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত ভাষায় লিখিত পত্রখানি প্রেতলোকের এক অপরিজ্ঞাত রহস্যময় ইঙ্গিতের ন্যায়, তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একজন সাহসী কাপ্তেন, স্বহস্তে অনেক সিপাহী বধ করিয়াছেন; এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অপ্রীতিকর পত্রের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন।

৪

কাপ্তেন থরনটনের স্ত্রী বিবি থরনটন্ তখন আগ্রায় ছিলেন। ১৬ই আগষ্ট রাত্রে কাপ্তেন সাহেব বেরেলী হইতে স্ত্রীকে দেখিবার জন্য আগ্রায় আসিলেন। স্ত্রীর নিকট হইতে এক জরুরী পত্র পাইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আগ্রায় চলিয়া আসিতে হয়। ১৭ই আগষ্ট প্রভাতে কাপ্তেন সাহেব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুখসুপ্তিমগ্ন ছিলেন। পূর্ব্বদিনের পথশ্রমে তাঁহার শয্যাত্যাগে কিছু বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় আটটার সময় তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া মশারীর বাহিরে আসিতেই বিবি থরনটন্ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন, পত্রখানি সেই পূর্ব্বের পত্রের মত নীল লেফাফায় আঁটা। পত্রখানি দেখিয়াই সহসা কাপ্তেনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, কম্পিতহস্তে মেম সাহেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন পত্রের ভাষা ও নাম স্বাক্ষর অবিকল পূর্ব্বের ন্যায়; প্রভেদের মধ্যে এই পত্রে লেখা আছে, "পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এগার মাস মাত্র বিলম্ব।"

কাপ্তেন কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ পত্র কোথায় পাইলে ?"

"সাতটার সময় বাঙ্গলোর বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, একটা দীর্ঘদেহ মুসলমান সিপাহী পত্রখানা আমার হাতে দিয়া কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।"

কে এই সিপাহী ? সাহেব শয়নের বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়াই কক্ষমধ্যে অধীরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বিবি থরনটন্ সহসা স্বামীর এই প্রকার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পত্র, কি সংবাদ ?"

"কিছু নয়"—বলিয়া কাপ্তেন পত্রখানি শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া বাতায়নপথে কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন, এক খণ্ড উড়িয়া তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সাহেব সেই কাগজ টুক্‌রা হাতে করিয়া পুনর্ব্বার বাহিরে ফেলিতে যাইবেন, হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল, লেখা আছে,—"এগার মাস।"

কাপ্তেন সাহেবের হৃদয় চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। আজ তাঁহার মনে হইল, নিশ্চয়ই কোন অতি প্রাকৃত ঘটনার সহিত এই পত্রের সংস্রব আছে। তিনি বেরেলী হইতে পূর্ব্ব রাত্রে হঠাৎ আগ্রায় আসিয়া পৌছিয়াছেন, তাঁহার বেরেলীত্যাগের কথা তাঁহার দুই একটী বিশ্বস্ত বন্ধু ও উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্যের বিদিত ছিল না। তথাপি কে কিরূপে তাঁহার আগ্রা আগমনের সংবাদ পাইয়া এই পত্র পাঠাইল ? ইহা কি কেবল মিথ্যা ভয় প্রদর্শন মাত্র ? কোন ক্রমে তাঁহার দুশ্চিন্তা দুর হইল না, এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুধা নিদ্রা দুর হইয়া গেল ; হুইস্কির সাহায্যে তিনি এই চিন্তা, এই অজ্ঞাত ভয় নিবারণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বৃথা হইল, ঘোর অসচ্ছন্দচিত্তে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর কোন রাজকার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় দিল্লীর ইংরাজ সেনাপতির গৃহে এক প্রকাণ্ড 'ডিনরের' আয়োজন হইয়াছে। কাপ্তেন, কর্ণেল, লেফটেনাণ্ট, মেজর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট বড় সকল 'মিলিটারি জিনিয়াস' টেবিল পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন ; মিলিটারি কুললক্ষ্মীগণ দেশের টেলরসপ অন্ধকার করিয়া সুপক্ষ প্রজাপতিবৃন্দের ন্যায় যোদ্ধ্‌বর্গের পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক "None but the brave deserves the fair" সুকবি ড্রাইডেনের এই স্মরণীয় উক্তির সারবত্তা সপ্রমাণ করিতেছেন। ব্রোচ্, ব্রেসলেট, নেকলেসের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত, আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত সুন্দরীগণের রূপজ্যোতিঃ সৌরকর প্রতিফলিত নির্ঝর-ধারার ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতেছে। কাপ্তেন থরনটন্ একটি সুন্দরী যুবতীর স্বাস্থ্যপানের আকাঙ্ক্ষায় গ্লাসটি তুলিয়াছেন, এমন সময় একজন আরদালি টেবিলের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি নীল লেফাফার ভিতর বন্ধ গালা মোহর করা। পত্রখানি দেখিয়াই সাহেবের হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গেল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্ব্বশরীর বাতাহত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। সহসা তিনি ভয়ানক অসুখ বোধ করিতেছেন বলিয়া ডিনার টেবিল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে পত্র খুলিতে সাহস হইল না। অনেক চেষ্টার পর পত্র খুলিয়া দেখিলেন, সেই এক কথা ; নূতনের মধ্যে তাঁহার পরমায়ুর আর একমাস হ্রাস হইয়াছে, তাহাই লেখা আছে। পরদিন কাপ্তেন সাহেব দিল্লী ত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানেই থাকুন, পর পর কয়েক মাস ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল।

৫

কয়েক মাস পরে একদিন কাপ্তেন সাহেব দেরাদূনের সন্নিকটবর্ত্তী কোন পার্ব্বত্য অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দিবাবসান কালে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি অত্যন্ত শ্রান্তি-বশতঃ একটি ক্ষুদ্রকায়া গিরতরঙ্গিণী তীরে সংকীর্ণ পার্ব্বত্যপথের উপর বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্ত্তী গিরিগুহা প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয় নাই ; কাপ্তেন সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—সেই নিশ্চল নির্ব্বাক দেহ আবদুল গফুরের।

সেই সায়ংকালে নির্জ্জন গিরিনদী তটে, অপরিসর পথের উপর ছয় মাস পূর্ব্বে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ সজীব দণ্ডায়মান দেখিয়া কাপ্তেন থরনটন্ নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল ; কিন্তু তিনি বীর পুরুষ, কাপুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার কক্ষস্থিত চর্ম্ম-নির্ম্মিত কোষ হইতে একটি রিভলবার আকর্ষণ পূর্ব্বক আগন্তুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। কিন্তু আগন্তুক নিশ্চল, গুলি খাইয়া অক্ষত দেহে সে হা হা করিয়া হাসিয়া যে দিকে পূর্ব্বে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছিল, সেই দিকেই দ্বিতীয় বার তাহার অকম্পিত হস্ত প্রসারিত করিল। তাহার সেই অবজ্ঞাপূর্ণ জীবনের হর্ষোচ্ছ্বাসবর্জ্জিত, নীরস উচ্চহাস্য সেই মৌনসায়াহ্নের শত গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া ধীরে ধীরে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহার নির্নিমেষ চক্ষুর তারকাদ্বয় দীপ্তিমান অগ্নিগোলকের ন্যায় জলিতে

লাগিল ; সেই অবজ্ঞাব্যঞ্জক, রোষানলপ্রদীপ্ত তীব্রদৃষ্টি মনুষ্যেরও নহে, পশুরও নহে ; তাহা উৎপীড়িত, আহত প্রতিহিংসা-লোলুপ পিশাচের পৈশাচিকতায় পরিপূর্ণ। কাপ্তেন থরন্‌টন্ চক্ষু অবনত করিলেন। তাহার পর চক্ষু তুলিয়া যখন তাহার দিকে পুনর্ব্বার চাহিলেন, দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, অস্তমান অংশুমালীর অন্তিমকিরণ-রেখার ন্যায় তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। শব্দহীন, গতিহীন-ভাবে সে ছায়ামূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল ? ছায়া না কায়া ? কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। সেই মূর্ত্তি যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল, কাপ্তেন অবসাদ-শিথিল পদ-ক্ষেপে অত্যন্ত মন্থরগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। গুহাপ্রান্তে চাহিয়া দেখিলেন, নীল লেফাফায় মোড়া একখানা পত্র পূর্ব্ব পত্রের ন্যায় গালা মোহর করা সেখানে পড়িয়া আছে। লেফাফার উপরে তাঁহারই শিরোনামা ! সাহেবের ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল, তিনি সেই গুহাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন ; তাহার পর পত্রখানি তুলিয়া লইয়া মোহর ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যার মৃদু আলোতে তাহা পাঠ করিলেন। পত্রখানি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায়ই সংক্ষিপ্ত পত্রে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, তাঁহার আয়ুঃকাল আর ছয় মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬

ইহা নিশ্চয়ই যে অনৈসর্গিক ঘটনা, কাপ্তেন সাহেবের অতঃপর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ শতগুণ সংবর্দ্ধিত হইল, তাঁহার মুখ হাস্যহীন, পাংশুবর্ণ ; চক্ষু জ্যোতিহীন, কোটরগত ; দেহের সে লাবণ্য নাই, মনের সে দৃঢ়তা নাই, সংকল্পের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই ; এক একখানি পত্র কেবল যে তাঁহার পরমায়ু হ্রাসের সংবাদ বহন করিয়া যথানিয়মে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তাহা নহে ; প্রত্যেক পত্র তাঁহার দেহের শোণিতশোষণ করিতে লাগিল ; ক্রমে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন ; কি দিবসে, কি নিশীথে, কি আলোকে, কি অন্ধকারে, কি জাগরণে, কি নিদ্রায় বিধাতার অলঙ্ঘ্য কঠোর বিধানের ন্যায়, অনির্দ্দেশ্য হস্তলিখিত সেই সংক্ষিপ্ত পত্র সর্ব্বক্ষণ তিনি তাঁহার হৃদয়পটে মুদ্রিত দেখিতেন।

বেরেলী ক্যান্টনমেণ্টের বাহিরে একদিন ক্যাপ্তেন থরন্‌টন্ অশ্বারোহণে প্রাতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে অশ্বচালন করিয়া অবশেষে তিনি অনেক দূরে একটা সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি অনতিদীর্ঘ খালের উপর এই সেতু প্রসারিত। সংকীর্ণ সেতু। কাপ্তেন সাহেব সেতুর অপর প্রান্তে উপস্থিত হইবেন, সম্মুখেই দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম—রামহিত তেওয়ারি। মিঃ থরন্‌টন্ রামহিতকে চিনিতেন। তাহার পুত্র পরীক্ষিৎকে বিদ্রোহী সন্দেহে সাহেব তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার আদেশে তাহার অধীনস্থ সিপাহীরা তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে ; অবশেষে তাহার একমাত্র অবলম্বন ক্ষুদ্র কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহা ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীতে রামহিত তেওয়ারির আপনার বলিতে আর কেহ নাই ; কিছু নাই।

সেই শিরাবহুল জীর্ণ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া সেই জীবিতকঙ্কাল মিঃ থরন্‌টনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পরে সাহেবের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কাপ্তেন সাহেব, চিনিতে পার কি ? আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি।"

সাহেব বলিলেন, "আমার অপেক্ষায় ? আমার কাছে বিদ্রোহীর পিতার কি দরকার থাকিতে পারে ? ভিক্ষুক পথ ছাড়িয়া দে, নতুবা তোর বুকের উপর আমার অশ্বের ক্ষুর বিদ্ধ হইবে।"

"আমি সে ভয়ে ভীত নহি। ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, উৎপীড়কের দমনকর্ত্তা, তোমার দমনের জন্য তাঁহার ন্যায়দণ্ড উত্তোলিত রহিয়াছে, সাহেব সাবধান !"

কাপ্তেনের দেহের সমস্ত রক্ত তাঁহার মুখে আসিয়া জমা হইল, তিনি বলিলেন, "নিমকহারাম, আমার অপমানে সাহসী হইতেছিস্ ?" সাহেব বন্দুক তুলিয়া রামহিতের মস্তক লক্ষ্য করিলেন।

বৃদ্ধ অচঞ্চল। বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র উন্মোচন করিয়া দক্ষিণহস্ত সাহেবের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, "সাহেব, তুমি দিন দুনিয়ার মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তোমার অপমান করি, আমার এমন কি সাধ্য ? খাপা হইও না, তোমার নামে একখানি পত্র আছে লও।"—সেই নীল লেফাফা, গালা মোহর করা পত্র। সাহেবের হস্ত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িল, বৃদ্ধ রামহিত সে দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া পত্রখানি কাপ্তেনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। মিঃ থরন্‌টন্ মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে সেখানে অবস্থান করিলেন ; তাঁহার চক্ষুর উপর চরাচর ঘুরিতে লাগিল, প্রভাতের উজ্জ্বল দিবালোক নিবিয়া গেল। দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু অনেক কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন, সেই ভীষণ দৈববাণী। স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—তাঁহার পরমায়ু আর এক মাস !

'মেডিক্যাল লিভ' লইয়া সাহেব পরদিন বিলাতযাত্রা করিলেন। এত দিনে তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে, এক মাস পরেই তাঁহাকে দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, দেশত্যাগ করিয়া যদি কোন ক্রমে অব্যাহতি লাভ করা যায় !

৭

মিঃ ম্যাকফারসন বোম্বের একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী, তিনি কাপ্তেন থরনটনের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাহেব জীর্ণদেহ, উদ্বেগতাড়িত হৃদয় লইয়া বোম্বে নগরে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। স্নেহময়ী ভগিনী দীর্ঘকাল পরে ভ্রাতার দেহ ও মনের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "এ অবস্থায় তুমি কোন ক্রমেই জাহাজে উঠিতে পাইবে না, আমার এখানে থাকিয়া কিছু সুস্থ হও, পরে দেশে যাইও।"

কাপ্তেন ভগিনীর অনুরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "এই রৌদ্রদগ্ধ অভিশপ্ত ভারত-বক্ষে আমার সমাধি রচনা না করিয়া তুমি ছাড়িবে না। আর এক মাসের মধ্যেই আমার জীবনের অবসান হইবে।"

"এ বিশ্বাস তোমার কেন হইল? তোমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়াছে দেখিতেছি। তুমি সংসারের সকল চিন্তা ছাড়িয়া দাও।"

"চিন্তা আমি ছাড়িয়াছি, কিন্তু সে রাক্ষসী আমাকে ত্যাগ করিবে না! প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে সে আমার বক্ষে বসিয়া আমার হৃদয়শোণিত শোষণ করিতেছে—আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"—কাপ্তেনের মস্তক সোফার উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

মিঃ থরনটনের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিবি ম্যাকফারসন তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিবি থরন্‌টন্ কিছুই জানিতেন না।

ভ্রাতার সুখশান্তি বিধানের জন্য বিবি ম্যাকফারসন প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন, আমোদ ও আনন্দের মধ্যে সর্ব্বদা তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমোদের প্রবৃত্তি কাপ্তেনের হৃদয়-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পিঞ্জরের বিহঙ্গম পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিল না।

ভগিনীর আগ্রহে কাপ্তেন থরন্‌টন্ কোন খ্যাতনামা বিলাতী থিয়েটারে একদিন সায়ংকালে অভিনয় দেখিতে গমন করিলেন। সে দিন মহাকবি সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের অভিনয় ছিল।

অভিনয় দেখিতে দেখিতে 'বক্সের' উপর হইতে কাপ্তেন সাহেব আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ নিকটেই ছিলেন, তাঁহারা যুগপৎ উঠিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, কাপ্তেন মূর্চ্ছিত। বহুচেষ্টায় তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। সাহেব বলিলেন, "তোমরা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা দেখিয়াছ? আমি দেখিয়াছি, সে প্রেতাত্মা হ্যামলেটের পিতার নহে, আবদুল গফুরের প্রেতাত্মা।"

বিবি ম্যাকফারসন ভ্রাতার মস্তকে পাখা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? আবদুল গফুর কে?"

"একজন সিপাহী। বিনা বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছি।"

* * *

কাপ্তেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার আসিয়া বিবিধ যন্ত্র সংযোগে তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কাপ্তেনের 'ব্রেণ ফিবার' হইয়াছে, অনেক দিনের রোগ—অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।"—তিন দিন সাহেব শয্যাগত রহিলেন।

চতুর্থ দিন সাহেবের অবস্থা অল্প ভাল বোধ হইল, অপরাহ্নে একখানি ইজিচেয়ারে তিনি বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। বাঙ্গলোর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, সমুদ্রের দিক হইতে মুক্ত বায়ুপ্রবাহ আসিয়া সাহেবের ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু ধীরে ধীরে অপসারিত করিতেছিল।

নীল পরিচ্ছদধারী, নীল-উষ্ণীষ-শোভিত, নীল পতাকাধারী একজন মুসলমান সৈনিক পুরুষ সেই বারান্দায় আসিয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাপ্তেন তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন, সৈনিক-পুরুষ একখানি নীল বর্ণের পত্র বাহির করিয়া সাহেবের স্থির, নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর ধরিল। আজ পত্র লেফাফা আবদ্ধ নহে, খোলা পত্র,—অক্ষরগুলি লোহিত কালিতে অঙ্কিত। সাহেব নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করিলেন—

"আজ ১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই,

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে তোমার পরমায়ু শেষ হইল।"

সাহেব চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। বিবি ম্যাকফারসন নিকটেই ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া তীব্রস্বরে সেই মুশলমান সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই?"

"উৎপীড়িতের প্রতিহিংসা।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কলিকাতা ২৮নং হেরিসন রোড, হরসুন্দর মেসিন প্রেসে শ্রীকুঞ্জ বিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।
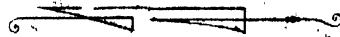
করিবার জন্য, ঢকা ও বংশী নিনাদ করা হইত। কোন রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া বাদসাহ যখন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেন, সে সময়ের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করা বড়ই কঠিন। যাত্রাকালেই হউক আর প্রত্যাবর্ত্তন সময়েই হউক, অসংখ্য বাহিনীর সুশৃঙ্খল গতি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইত। উৎসবের দিনে বা পর্ব্বাহে যখন সাহান্-সা প্রাসাদের বাহির হইতেন—কিম্বা রাজ প্রাসাদ হইতে "এদ্গায়" যাইতেন—"চাবুকদার" ও "এসাওল"গণ সর্ব্বাগ্রে জনতার ভিতর দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিত। সমগ্র নগরীর বিপণী, গৃহ দ্বার ও রাজপথ, নানাবিধ সজ্জায় শোভিত হইত। প্রত্যেক গৃহদ্বার রেশমের রঙিন্ পরদা, পতাকা ও পুষ্পমাল্যে শোভিত হইত। রাস্তার পার্শ্বে ত্রিতল চতুস্তল প্রকাণ্ড সৌধ গুলির অলিন্দ, ছাদ প্রভৃতি জনপূর্ণ হইয়া পড়িত। নগর ও উপনগরের অগণ্য জনস্রোত রাজপথ ও গলি গুলি পূর্ণ করিত। বাদসাহ পর্ব্বোপলক্ষে যখন রাজপথ দিয়া এদ্গায় (ইদ্ পর্ব্বানুষ্ঠানের স্থান) যাইতেন, তখন কখনও হস্তিপৃষ্ঠে কখনও বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন। সর্ব্বাগ্রে মণি-খচিত ছত্র লইয়া এক দল ছত্রবাহী যাইত। তাহাদের পশ্চাতে রত্ন-খচিত, সুচিত্রিত, ব্যজনী ও চামর লইয়া চামরধারীরা থাকিত। তৎপশ্চাতে বাদসাজাদারা স্বদলস্থ প্রধান প্রধান ওমরাহবেষ্টিত হইয়া, ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেন। বাদসাহজাদাদের অগ্রে, সুসজ্জিত ইরাকি ও আরবী অশ্বের উপর অশ্বারোহীরা চলিয়া যাইত। তাহার পর হস্তিযূথ। হস্তিযূথের উপর রত্ন-ঝালরময় হাওদা ও একটীর উপর কেবল মাত্র সিংহাসন। ইহার পর সিংহচিহ্নিত রাজপতাকা ও অন্যান্য রাজচিহ্ন—রাজদণ্ড ও উন্মুক্ত অসিধারিগণ। ইহার পর খাস্-এ-সওয়ারীর দল। এই দলে তখ্‌তে রওয়ান, পালকী, চতুর্দ্দোল, তাঞ্জাম ও গুজরাটের গাড়ী থাকিত। মীরতুজকগণ এই সকলের পরিচালকরূপে থাকিতেন। ইসাওয়ালেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের দণ্ড ও আশাশোটা লইয়া তাহার পরে যাইত, তাহাদের পরে খিদ্মতিয়াগণ।

ইদ্গার স্থান পর্য্যন্ত রাজপথের দুইপার্শ্বেই রাজভৃত্যেরা ও অস্ত্রধারী সৈন্যগণ এবং বরকন্দাজেরা দাঁড়াইয়া থাকিত। ইহাদের সম্মুখেই পদাতিক ও বন্দুকধারিগণ। এই দলের মধ্যেই সম্রাট প্রসন্নমুখে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে পথ অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার আদেশে রাজ পথের দর্শকদের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়াইয়া দেওয়া হইত। এ সকল দিনে নগরের সকল ভিক্ষুকের জীর্ণ ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইয়া যাইত। এদ্গায় উপস্থিত হইয়া সেই সপ্তসমুদ্র সীমাবেষ্টিত হিন্দুস্থানের মহা গৌরবান্বিত বাদসা আপনার পদ-গৌরব ভুলিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নমাজ করিতেন। এই সময় প্রবীণ, মহাজ্ঞানী প্রধান মোল্লাসাহেব প্রচারমঞ্চে দাঁড়াইয়া এই মহা প্রতাপান্বিত খলিফা ও তাহার পূর্ব্বপুরুষের গৌরব কীর্ত্তন করিতেন। মোল্লাসাহেবেরা এই সময়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন।

বাদসাহের শিবির।

বাদসাহ যখন অগণ্য সৈন্য লইয়া, যুদ্ধার্থে বা মৃগয়ার জন্য রাজধানীর বাহির হইয়া দূরস্তর প্রদেশে যাইতেন, তখন সর্ব্বাগ্রে "খুস্‌মঞ্জিল" "দারোগা" ও "মস্রফ" প্রভৃতি কর্ম্মচারিরা সদলবলে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে একটী সুন্দর স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া তথায় "পেশখানা" বা সম্বর্দ্ধনা-গৃহ প্রস্তুত করিতেন। তাম্বু-চিত্রকর, ভিস্তি, সূত্রধর, সুপকার প্রভৃতি কর্ম্মচারী ও ফরাস্ খানার লোকেরা সর্ব্বাগ্রে যাইত। যে স্থান নির্ব্বাচিত হইত সেইস্থানে বিচিত্র শিবির-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইত। এই শিবির শ্রেণীর মধ্যে বাদসাহের শয়ন ও বিশ্রাম কক্ষ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় দরবার গৃহ, প্রভৃতি সবই থাকিত। সর্ব্বমধ্যে বেগমদিগের তাঁবু। এই তাম্বুর দরজা জানালা থাকিত, সেই সব জানালায় স্বর্ণখচিত নীলাভ পরদা দোদুল্যমান হইত। দৌলৎখানার চারিদিকে বা সম্মুখে বাজার স্থাপন করা হইত। এই বাজারে সকল প্রকার বিক্রেয় পদার্থ থাকিত। বাদসাহের শিবিরের পরে সাহজাদাদের শিবির, তৎপরে বড় বড় আমীর ওমরাহদিগের বস্ত্রাবাস। অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া এই শিবিরশ্রেণী সন্নিবেশিত হইত, এই জন্য প্রত্যেক বিভাগের চিহ্ন স্বরূপ প্রধান প্রধান শিবিরের শিরোদেশে বিভিন্ন বর্ণের পতাকা সমূহ বায়ুভরে ইতঃস্তত সঞ্চালিত হইত। পতাকা দেখিয়া কোন্‌টী কাহার শিবির তাহা নির্ণীত হইত। সম্রাট যখন দৌলৎ-

খানা হইতে বাহির হইতেন, তখন জয় ডঙ্কা ও বংশী নিনাদে, করতালের গম্ভীর শব্দে,সমস্ত প্রান্তর ও আকাশের পদপ্রান্তস্থ মেঘরাজির নিভৃত ক্রোড়দেশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। বাদশাহের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য হস্তী, দ্রুতগামী অশ্ব, তক্তরওয়ান্, স্বর্ণ সিংহাসন, প্রভৃতি ইচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইত। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, রাজপুত্রগণ বখ্শীগণ, ওমরাহগণ, মনসব্দারগণ ও বিজয়ী বীরবৃন্দ বাদশাহের অগ্রে পশ্চাতে থাকিতেন। সর্ব্বপশ্চাতে বেগমদিগের জন্য "চন্দাওল" "মহাফেজ" "পাল্কী" ও "ডুলী"। এই পাল্কীগুলি মণিমণ্ডিত রেশমের আবরণীতে বেষ্টিত, স্বর্ণ রৌপ্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পরিশোভিত। খোজাদিগের প্রধানগণ, অস্ত্রধারী খোজা ও তাতারীগণ, এত সতর্কতার সহিত, এত সুশৃঙ্খলার সহিত বাদসাহ ও মহিষীগণের চারি ধার রক্ষা করিয়া চলিত, যে সেখানে মৃদু মলয়ের যাতায়াতের পথও যেন রুদ্ধ হইয়া পড়িত। লৌহ পর্ব্বতের (?) ন্যায় একদল সুনির্ব্বাচিত তেজোদৃপ্ত বিশ্বাসী রাজপুত সৈন্য, বেগম ও সাহজাদীদের রক্ষক রূপে চারি ধার বেষ্টন করিয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে অগ্রসর হইত। এত সুশৃঙ্খলার সহিত, এত তৎপরতার সহিত, এই বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইত, যে তাহা দেখিবা মাত্রই বিস্ময় জন্মিত। কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কেহ পথিপার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষের ফল পাড়িতে পারিত না বা কোন শস্য ক্ষেত্রে গিয়া শস্য লইতে পারিত না। যে এইরূপ অপকর্ম্ম করিত—বাদসাহের আদেশে তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া জন্মের মত তাহার জঠরজ্বালার নিবৃত্তি করিয়া দিত। সৈন্যদের হস্ত হইতে প্রজার শস্যক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করিবার জন্য,ওমরাহ ও মন্সবদার ও আহদিয়ানেরা সমস্ত দলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। কোন শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে সেনাদল উপস্থিত হইলে দারোগা ও আমিনেরা সর্ব্বাগ্রে তাহা জরীপ করিয়া তাহার একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া লইতেন। যদি কোনরূপে এই শস্যের ক্ষতি হইত, তাহা হইলে, রাজকোষ হইতে সেই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্রাধিকারীকে টাকা ধরিয়া দেওয়া হইত।

বরযাত্রী।

প্রচলিত পল্লী প্রবাদ অনুসারে পিতার কুপুত্রের উপরই বিবাহে বরযাত্রী হইবার ব্যবস্থা আছে। প্রিয় বন্ধু বসন্ত কুমারের বিবাহে সেই প্রবাদ সার্থক হইয়াছিল।

সে এক বৈশাখের কথা। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছি, বিজয় বাবু এক দিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বসন্তের বিবাহে তোমরা বরযাত্রী হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।' 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

বসন্ত আমার সমবয়স্ক, সহাধ্যায়ী এবং প্রতিবেশী। তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুতা হইয়াছিল। "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" বিবাহার্থীর পক্ষে শ্বশুরালয় শ্মশান অপেক্ষা অল্প ভীতি উৎপাদক নহে, অধিক শ্যালক শ্যালিকা থাকিলে ত কথাই নাই। বসন্তের ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের উপর ষষ্ঠীদেবীর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

আসল কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের জন্মস্থান রাজপুর। রাজপুর রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একখানি ক্ষুদ্র পল্লী,আমাদের গ্রাম হইতে কত ক্রোশ হইবে বলিতে পারি না, তবে অনেক দূর বটে। আমাদের গ্রাম হইতে রাজপুর গ্রামে উপস্থিত হইবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকলগুলি যানেরই আবশ্যক হয়, অর্থাৎ গোশকট, বাষ্পীয় শকট, ষ্টীমার, নৌকা ইহার কোনটিই বাদ দিবার উপায় নাই।

বিজয় বাবু আমাদের গ্রামের প্রসিদ্ধ উকীল, তাঁহার জমীদারীও নিতান্ত অল্প নহে, তাহার উপর বসন্ত তাঁহার একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্র, সুতরাং তাহার বিবাহের আয়োজনে গ্রামে মহা কলরব পড়িয়া গেল। মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন গ্রামের সর্ব্বসাধারণের কল্পনানেত্রের সম্মুখে অত্যন্ত পরিস্ফুট আকার ধারণ করিল। গ্রামস্থ লোকের মুখে কেবল এই বিবাহের কথা, চতুর্দ্দিকে সকালে সন্ধ্যায় এই সম্বন্ধেই নানাবিধ আলোচনা। কৌলিন্যে যাহারা সমাজের মস্তক, জীবনোপায় যাঁহাদের উঞ্ছবৃত্তি, তাঁহারা দলে দলে বিজয় বাবুর বৈঠকখানায় সমাগত হইয়া সুবাসিত তাম্রকূটধূম্র পান করিতে করিতে অসঙ্কোচে নানা প্রকার সদুপদেশ দান করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন,

"এই আপনার প্রথম কার্য্য, গায়ে হলুদের দিন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাড়ী একখানি গামলা-ও এক গামলা শর্ষপ তৈল দান করা বিধেয়।" কেহ প্রস্তাব করিলেন, এই উপলক্ষে প্রত্যেক সধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে এক একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত নথ দান করিলেই বিজয় বাবুর কীর্ত্তিস্তম্ভ দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয়ের আয়োজন সম্বন্ধে অবশ্য কাহারও মতভেদ ছিল না।

২৪এ বৈশাখ রাত্রে বিবাহ। স্থির হইল, ২৩এ বৈশাখ অপরাহ্ণে আমরা গৌশকটে কন্যাগৃহাভিমুখে ধাবিত হইব। বসন্ত তাঁহার ভাবী পত্নী তড়িৎকুমারীর আলোক চিত্র ইতি-পূর্ব্বেই দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মেয়েটি তাহার পছন্দ হইয়াছিল। নব বৈশাখের শান্ত শীতল নির্ম্মল প্রভাতে অচিরে বিবাহ-সম্ভাবিত প্রেমিক যুবকের হৃদয়, বসন্তের পুষ্পগন্ধ সমাকুল সমীরণবৎ কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং প্রভাতে উঠিয়া বসন্ত যখন আমার শয়নকক্ষের প্রান্তবর্ত্তী কুসুমোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গাহিতেছিলেন,—

"আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলহার
প্রভাত-চরণে ঢালিব।"

তখন আমার মনে কিছুমাত্র বিস্ময়োদ্রেক হইল না। পূর্ব্বাকাশে তখন তরুণ অরুণোদয় হইতেছে মাত্র, বৃক্ষপত্র শ্যামল দূর্ব্বাদল শিশির-সিক্ত, সুখস্পর্শ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; প্রভাতালোকের কুহকময় সংস্পর্শে বসুন্ধরা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে! বসন্তের গান শুনিয়া আমি কোন প্রকার সাড়া শব্দ না দিয়া উঠিয়া বসিলাম, মাথার কাছে টেবিলের উপর হারমোনিয়ামটা ছিল, তাহাতে সুর দিয়া ধরিলাম—

"আমি নিতি নিতি কত করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।"

বন্ধু গান ছাড়িয়া একেবারে বারান্দায় উঠিয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে উভয়ে তাঁহাদের গৃহ উপস্থিত হইলাম।

বিজয় বাবুর বাড়ীর সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে বসিয়া রসুন-চৌকীর দল সুস্বরে মঙ্গল গান গাহিতেছিল। পাড়ার কতকগুলি বালকবালিকা বেঞ্চির উপর বসিয়া গল্প করিতেছিল, পরস্পরকে চিমটি কাটিতেছিল, কেহ কাহারও হাত হইতে একটা রসগোল্লা বা আধখানা জিলিপি কাড়িয়া লইয়া নিজের মুখবিবরে নিক্ষেপ করিতেছিল। কেহ এক রাশ বকুল ফুল কোঁচড়ে পুরিয়া আনিয়া অনন্যমনে মালা গাঁথিতেছিল।

ধীরে ধীরে আমরা বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। সুসজ্জিত বৈঠকখানা ভারি সরগরম দেখা গেল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে কুটুম্ব মহাশয়েরা আসিয়া ঘর পূর্ণ করিয়াছেন, ঘন ঘন তামাক চলিতেছে। বিজয় বাবুর চারি দিকে আট দশ জন হিতৈষী পরামর্শদাতা, সম্মুখে একটা হাড়ি, হাড়ির গায়ে লাল কালিতে লেখা—"শ্রীমান্ বসন্তকুমার বসু বাবাজীবনের শুভ বিবাহের জমা খরচ।" জমাখরচের যত কিছু কাগজ পত্র সেই হাড়ির মধ্যে রক্ষিত হইতেছে। বৈঠকখানার সম্মুখে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, পাল্কীর বেহারা, মৎস্যবিক্রেতা জেলে, দধি দুগ্ধ সরবরাহকারী গোয়ালা, মাটির গেলাস নির্ম্মাতা কুম্ভকার প্রভৃতি বহুলোক বসিয়া স্ব স্ব বরাত মিটাইতেছে। আজ মধ্যাহ্নে বরযাত্রী-ভোজন আছে। যাহারা বরযাত্রী হইয়া যাইবেন, তাঁহারা বিজয় বাবুর গৃহে আহার করিয়া গরুর গাড়ীতে উঠিবেন। বর ও পুরোহিতের জন্য পাল্কীর বন্দোবস্ত স্থির হইল

বিজয় বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমরা young man, বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাবে যদি তবে কি রকম করে কাজ চল্‌বে? দেখ্‌চোত আমি একা মানুষ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি একাই একশ।"

"নাহে বাপু:—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', শুভকার্য্যের অনেক বাধা। তোমার সার্ট খোল, কোমর বেঁধে লেগে পড়, গাড়ীর বন্দোবস্ত করা আর বরযাত্রীদের গুছিয়ে ষ্টেসনে নিয়ে যাওয়ার ভার তোমার উপর। নেপাল দাদা ভাঁড়ার ঘরের ভার নিয়েছেন, তরিতরকারী, মাছ, দই সবই প্রায় এসে পড়েছে, সকালে সকালে সকলকে খাইয়ে বিদেয় কর্ত্তে পাল্লে হয়, পারাপারের পথ, অনেক দূরও যেতে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি যাবেন ত?"

"না, আমার আর যাওয়া হবে না। এদিগের সমস্ত কাজ বাকি, তা আমি না গেলেও চল্‌বে, তোমারা আছ, গ্রামের সকল ভদ্র লোকই যাচ্ছেন, বিশেষতঃ বসন্তের বড় মামা জগবন্ধু বরকর্ত্তা হয়ে যাবেন, কোন অসুবিধা হবে হবে না।"

বড় মামা মহাশয় অহিফেন নামক মহাদ্রব্য কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই সেবন করিয়া থাকেন। সংপ্রতি তিনি কিঞ্চিৎ কাঁচা অহিফেন সেবন করিয়া বিজড়িত নেত্রে তাম্রকূট ধূমের মধুরতা আস্বাদন করিতে করিতে এই নশ্বর জগতের শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিজয় বাবুর বচন-সুধা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহার সুপক্ক লোমবহুল ভ্রূর নিম্নভাগে মগ্নপ্রায় রুদ্ধ নেত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "অহং আমি বরকর্ত্তা হয়ে যাচ্চি, দেখে নেবে কি রকম হুঁসিয়ারিসে সকল কাজ শেষ করে আসি। বোসজার সেখানে যাওয়ার দরকার কি ?"

আমি বলিলাম, "মামা, শুনেছি সে গণ্ডগ্রাম, সঙ্গে আফিঙ্ নিতে ভুলবেন না, কৌটা যদি ফেলে যান, তবে আপনার প্রাণ নিয়েই আমাদের শশব্যস্ত হয়ে পড়্‌তে হবে।"

মাতুল মহাশয় একটা সম্বন্ধ বিরুদ্ধ রসিকতা দ্বারা আমার সদুপদেশ উড়াইয়া দিলেন।

ভাবিলাম, বাড়ীর ভিতর আয়োজনটা কি রকম চলিতেছে একবার দেখিয়া আসি।—ধীরে ধীরে সিঁড়ির দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ছাঁচের নীচে দাঁড়াইতেই ছাদের উপর হইতে আমার মস্তকে এক ঘটী চুণ হলুদ গোলা জল বর্ষিত হইল। বিস্ময়-ব্যাকুল চক্ষে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, দুইখানি বলয়ালঙ্কৃত সুগোল হস্ত ত্বরায় অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পর চারিদিক হইতে খল খল হাস্য, নব বস্ত্রের খস খস শব্দ, এবং অলঙ্কারের রুণু ঝুণু ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। কুটুম্বিনীগণে গৃহ পরিপূর্ণ, কিশোরী ও যুবতীগণের ফুল্লারবিন্দ তুল্য মুখ, সরোবরে পদ্ম সমূহের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আমার লাঞ্ছনাকারিণী দূর সম্পর্কীয়া একটি শ্যালিকা, অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি এই ভাবে অভিনন্দন করিলেন।

সকালে বর যাত্রিগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; বেলা দুইটার সময় সকলের আহারাদি শেষ হইল। প্রায় ২০ খানি গো-শকট পথে সারি দিয়া দাঁড়াইল, গাড়োয়ানেরা জোঁয়ালে গরু বাঁধিয়া গাড়ীতে তৈল দিয়া লইল। তার পর গাড়ীতে তোষক ও বালিশ পাতা হইলে, বরযাত্রিগণ পান চিবাইতে চিবাইতে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; কোন গাড়ীতে দুজন, কোন গাড়ীতে তিনজন বরযাত্রী; বরকর্ত্তা মাতুল মহাশয় স্বয়ং এক গাড়ী অধিকার করিয়া শয়ন করিলেন; হারাধন খানসামা ও নরহরি প্রামাণিক এক গাড়ীতে উঠিল; বরের বাক্স তাহাদের জিম্মা রহিল। বেলা প্রায় তিনটার সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল, স্থির হইল বর ও পুরোহিত সন্ধ্যার পর পাল্কীতে রওনা হইবেন।

বিশখানা গাড়ী রাজপথের ধূলি উড়াইতে উড়াইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। বরযাত্রিগণ গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিয়া পঞ্জরে বেদনা সঞ্চয় করিতে করিতে রেলোয়ে ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। রামনগর ষ্টেসনে গিয়া আমাদের ট্রেণে চাপিতে হইবে, রামনগর আমাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ, মধ্যে দুইটি পার।

পথের দুইধারে মাঠ, অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে দূরে দুই একটা অশ্বথ বট বা শিমুল গাছ। ঝাঁ ঝাঁ করিয়া রৌদ্র পড়িতেছে, কোন একটা গাছের পত্রান্তরাল হইতে তৃষিত চাতক 'ফটিক জল' শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে, উদ্দাম বায়ু প্রবাহে ধূলি-রাশি উড়িয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছে। রাখালেরা মাঠে গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে, তাহাদের নিকটে তাল পাতার ছাতি পড়িয়া আছে। কেহ কেহ আম পাড়িয়া লবণ মাখিয়া খাইতেছে, পল্লীস্থ নারীগণ অদূরবর্ত্তী বিল হইতে মৃৎকলসীতে জল লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে। ক্রমে সূর্য্যের তেজ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, বৃক্ষের ছায়া প্রান্তর বক্ষে দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অপরাহ্ণে তরুর অন্তরালে বিহঙ্গ কুজন আরম্ভ হইল। আমরা সেই গরুর গাড়ীতে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম।

রামনগরের হাটে যখন আমরা পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। গাড়ীগুলি ভাল ছিল, তাই আমরা সাত ঘণ্টার মধ্যে দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলাম। এই হাটে আমাদের আহারাদির জন্য 'ভাঁড়ার' খোলা হইয়াছিল, প্রায় ষাট জন লোকের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি পাক করা ছিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া আহার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছি, এমন সময় অদূরে পা[illegible] বাহক বেহারাগণের 'হিঁয়ো' 'হিঁয়ো' 'জোয়ান হিঁয়ো' ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। অবিলম্বে বরবেশে শ্রীমান্ বসন্ত কুমার রঙ্গভূমে উপস্থিত হইলেন। পুরো[illegible]

মহাশয় পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়াই 'সন্ধ্যার' জন্ম অস্থির হইয়া পড়িলেন, রাত্রি দশটা বাজে এখনও তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক অসমাপ্ত রহিয়াছে। বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি সন্ধ্যাহ্নিকে নিযুক্ত হইলেন, আমরা ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। শুনিলাম মাত্র এক কোয়ার্টারের মধ্যে ট্রেণ প্লাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মাতুল মহাশয় বরকর্ত্তা সাজিয়া আসিয়াছেন। তিনি অতি সতর্ক ব্যক্তি, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বরযাত্রির সংখ্যা গণনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বরযাত্রিগণ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! মাতুলের ক্রোধ ক্রমে অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। দুর্দ্দৈব! তাঁহার সেই ক্রোধের পরিণত অবস্থায় তাহার প্রিয় বন্ধু ফকিরচাঁদ দত্ত মহাশয় তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মিত্তিরজা, একবার কৌটাটা বের করত ভাই।"—মাতুল ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া, বলিলেন, "তোমার আক্কেলটা কি রকম দত্তজা, কৌটাটাতে ভরি দুই আফিং আছে কি নেই, তারই উপর তোমার নজর পড়ে রয়েছে, এক রাতে আট প্রহরই যদি তোমার কৌটার আবশ্যক হয় খানিক নিয়ে এলেই পার্ত্তে, কেউত বারণ করে নি।"—অন্য সময় হইলে মিত্তির জা মহাশয় বন্ধুর এই বাক্‌পটুতা হাস্যে ক্ষমা করিতেন, কিন্তু এখন তিনি বরযাত্রী, বরকর্ত্তা হইয়া বরযাত্রীকে অপমান করে, এমন বরকর্ত্তা পৃথিবীতে নাই। দত্তজা ক্রোধে তিনগুণ হইয়া বলিলেন, "আমি ফকির চাঁদ দত্ত, জন্মেজয় দত্তের পুত্তুর, জনার্দ্দন দত্তের নাতি, আমাকে আধ আনার আফিংএর জন্যে কিনা অপমান করে বিজয় ঘোষের শালা—এ বিয়েতে যে বরযাত্রী যায় সে ত্রিজাতক।"—দত্ত মহাশয় ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। আমরা পাঁচ সাত জনে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার গায়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় শত হস্তীর বল। তবে সুবিধার কথা এই যে সত্যই তাঁহার গৃহ প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় ছিল না, ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অহিফেন গ্রহণ করিবার ফন্দী তে তিনি এই প্রকার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পরে আমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন।

যাহাহউক বরকর্ত্তা মাতুল ওরফে মিত্তিরজা মহাশয় অধিকাংশ বরযাত্রি কর্ত্তৃক তাঁহার এই অবিবেচনার কার্য্যের জন্য তিরস্কৃত হইয়া একেবারে শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং দত্তজাকে ক্রোধ শান্তির অমোঘ ঔষধ বাহির করিবার নিমিত্ত তাঁহার জামার জেবে হাত পুরিয়া দিলেন। সহসা তাঁহার মুখভাব ফাঁসির আসামীর মুখের আকার ধারণ করিল। হতাশ ভাবে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, আমার কৌটা।" জামার জেব হইতে হয়ত কৌটা পড়িয়া গিয়াছে ভাবিয়া তিনি যে পরিমাণে ব্যাকুল হইলেন, অন্যান্য বরযাত্রিগণ ঠিক সেই পরিমাণে আনন্দানুভব করিলেন, এমন কি বৃদ্ধ দত্তজা পর্য্যন্ত বলিলেন, "বেশ হয়েছে, ভগবান্ জব্দ করেছেন, আমাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা!"—সহসা অদূরে সাঁ সাঁ শব্দ হইল। আমরা বুঝিলাম, ট্রেণ আসিতে আর বিলম্ব নাই, তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলাম, ছোট ষ্টেসন, গাড়ী দুই তিন মিনিটের অধিক সেখানে অপেক্ষা করে না। ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল, আমরা গাড়ীতে উঠিয়া একটা কামরা দখল করিয়া বসিলাম। ট্রেণে আমাদের জন্য সে কামরটা রিজার্ভ করা ছিল। গাড়ীতে উঠিয়া মিত্তিরজা ব্যাকুল ভাবে তাঁহার পকেট, কাপড়ের বোচ্‌কা, ব্যাগ্ প্রভৃতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। মুখে কিছু না বলিলেও বুঝিতে পারা গেল, তিনি তাঁহার 'সাত রাজার ধন' সেই আফিংয়ের কৌটা খুঁজিতেছেন। বিস্তর চেষ্টাতেও যখন তাহা মিলিল না, তখন তিনি অবসন্ন ভাবে একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাদশীর চন্দ্রালোকে নৈশ প্রকৃতি হাসিতেছিল। প্রান্তরের ভিতর দিয়া ট্রেণ ঝটিকা-বেগে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। বরযাত্রিগণ কেহ গান ধরিলেন, কেহ সিগারেট ধূম পান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধেরা এক স্থানে বসিয়া কবে কোথায় কোন্ বিবাহের বরযাত্রী হইয়া কন্যাযাত্রিগণকে কিরূপ ভাবে 'জব্দ' করিয়াছিলেন তাহারই গল্পে স্ব স্ব বুদ্ধি বাহুল্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। সহসা মিত্তিরজা 'পেয়েছি পেয়েছি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দত্তজা তিন বেঞ্চি লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইলেন ও আগ্রহের সঙ্গে বলিলেন, 'কৈ কোথায় গেলে ?"—"এই ট্যাকে, কৌটা ট্যাকে রেখে কোথায় না খুঁজেছি হে! বড় হায়রাণ হওয়া গেছে।"—তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকে হাসিল। মিত্তিরজা এতই খুসী হইলেন যে, বিনা আপত্তিতে পাটনাই মটরের মত এক বড়ি অহিফেন অম্লানবদনে দত্তজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে উভয়ের বিবাদের আপোষ হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি অনেকেরই নিদ্রা হইল না। পোড়াদহ ষ্টেসনে উত্তর বঙ্গ লাইনের এক 'গাধা ট্রেণ' অপেক্ষা করিতেছিল, আমাদের গাড়ী খানা তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। শুনিলাম গোয়ালন্দ ও কলিকাতার দিক হইতে গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত আমাদের সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহাই হইল। ঘণ্টা দুই সেখানে বিশ্রাম করিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। অতি প্রত্যুষে দামুকদিয়া ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চলা পদ্মা খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, প্রভাত সূর্য্য কিরণে সৈকত ভূমি চিক্ চিক্ করিতেছে, এবং নানাজাতীয় নৌকা পাল ভরে দিগ-দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে, দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী লইয়া জেলেরা ইলিশ মাছ ধরিতেছে। আমরা ট্রেণ পরিত্যাগ করিতে না করিতে আই, জি, এস, এন্, কোম্পানীর সুবৃহৎ দোতলা ষ্টীমার "থ্রাস" হইতে সুগভীর বংশীধ্বনি হইল, বোধ হয় বাঁশী বলিতেছিল, 'ভয় নাই, আমি প্রস্তুত আছি।'

রৌদ্র প্রবল হইয়া উঠিল, একে বালিচর, তাহার উপর গৃহাভাব, সেই রৌদ্রে চড়ার উপর বসিয়া আমরা ষ্টীমারের শীতল বক্ষে বিশ্রাম লাভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার বক্ষ হইতে তখন রাশি রাশি গোচর্ম্ম নামিয়া রেলের গাড়ীর কক্ষ পূর্ণ করিতেছিল। অনেকে এই অবসরে স্নান করিয়া লইলেন, কেহ কেহ নির্ব্বিকার চিত্তে তামাক টানিয়া সন্তাপ দূর করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেন্টের মেল ষ্টীমার সাঁড়া ঘাট হইতে দার্জিলিং রেলের আরোহী লইয়া ঘাটে আসিয়া থামিল। জলদ-গম্ভীর স্বরে পুনঃ পুনঃ 'আলিগেটারের' কণ্ঠনাদ হইতে লাগিল। শত শত আরোহী ব্যস্তভাবে ষ্টীমার ছাড়িয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিতে লাগিলেন। কুলিরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোট ও ডাকের ব্যাগ্ ঘাড়ে লইয়া ডাক্ গাড়ী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। চারিদিকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, ডাক, হাক্, সোর গোল—যেন কোন মহোৎসব ব্যাপারের কোলাহলে নদীতীর প্রতিধ্বনিত। ময়রারা নানাবিধ খাবার বড় বড় রেকাবে সাজাইয়া ক্ষুধাতুর যাত্রিগণের ক্ষুধার পরিমাণ সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

বরযাত্রিগণের ক্ষুধা সময়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মিত্তিরজাকে বলা গেল, "জলযোগের কিছু আয়োজন করুন, ষ্টীমারে চারি পাঁচ ঘণ্টা থাকিতে হইবে, তখন কোথায় কি খাইতে পাওয়া যাইবে ?"—রাত্রির গুরুতর আহারের পর প্রভাতেই আবার ক্ষুধার আতিশয্যের কথা শুনিয়া মিত্তিরজা কিছু রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমরা বাপু ব্রহ্মাণ্ড হজম করিয়া ফেলিতে পার। এখানে দুদশ টাকার বেশীত আর গোল্লা রসগোল্লা পাওয়া যাবে না। ক্ষুধাটা একটু চন্ চনে কর, ষ্টীমার হইতে নামিয়াই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত পাইবে।" মাতুল মহাশয়ের কার্পণ্য দর্শনে বরযাত্রিগণের অনেকে বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল, কেহ কেহ প্রস্তাব করিল ত্রেতার কাল নিমে ও দ্বাপরের শকুনি বর্ত্তমান কলি যুগে মাতুলের অংশ অভিনয় করিবার জন্য বিজয় বাবুর শ্যালক ছুটিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে, অতএব তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করা হউক, তাহাতে দেশের বহু মঙ্গল সাধিত হইবে। মাতুল দেখিলেন, তাঁহার শত্রুর সংখ্যা যেরূপ অধিক তাহাতে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; তিনি নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন। বসন্তকুমার অবিলম্বে দশ টাকা বাহির করিয়া দিলে মহাসমারোহে নদী তীরে জলযোগ সুসম্পন্ন হইল। আমরা ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম, তখন বেলা আট্টা।

কয়েকবার বংশীধ্বনি করিয়া ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। জলরাশি বিদীর্ণ করিয়া উভয় পার্শ্বের চরপ্রান্তে ফেনরাশি পুঞ্জীভূত করিয়া ষ্টীমার স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইল। উচ্চ চরের বহু নিম্নে নদীবক্ষ, স্থানে স্থানে বালুকাময় চর। সেই সকল চর ঘুরিয়া ষ্টীমার অতি সাবধানে চলিতে লাগিল। যেখানে জল অল্প সেখানে বংশখণ্ড প্রোথিত, তাহার মস্তকে তৃণগুচ্ছ আবদ্ধ। খালাসীরা ওলন দড়ি ফেলিয়া ষ্টীমারের মাথায় দাঁড়াইয়া বিকৃতকণ্ঠে সুর করিয়া হাকিতেছে "এক বাঁও মিলে না—দু বাঁও-মি-লে—এ-এ-না।"—ষ্টীমারের দুই পাশ দিয়া বড় বড় নৌকা অনুকূল স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া লক্ষ্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

সুবৃহৎ মুক্ত বিহঙ্গ-পক্ষের ন্যায় শুভ্রপাল, একটির উপর আর একটি, বায়ুভরে তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। পালের দড়ি ধরিয়া মেড়ুয়াবাদী নৌ-চালকগণ নৌকার ছৈয়ের উপর পালের ছায়ায় বসিয়া আছে। অপর পারের সন্নিকটে দলে দলে মহিষ জলে দেহ নিমজ্জিত করিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রশমিত করিতেছে।

কত গ্রাম অতিক্রম করিয়া ষ্টীমার চলিতে লাগিল। কত বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে গ্রামবাসিনী রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে স্নান করিতেছে—কত বালক বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা; কেহ স্নান করিতেছে, কেহ তীরে বসিয়া আঠাল মাটি দিয়া মাথা ঘসিতেছে, কেহ বালি দিয়া কলস বা হাতের খাড়ু মাজিতেছে, কেহ বা ক্ষারসিক্ত কাপড় কাচিতেছে। নদীমাতা সকলকে সমান আদর ও আগ্রহভরে বক্ষে গ্রহণ করিতেছেন, তাহাদের দেহের সন্তাপ দূর করিতেছেন। কত পল্লীযুবক উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া সেই প্রসন্নসলিলার সলিলগর্ভে সাঁতার কাটিতেছে, কখন ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে। একটি ছোট মেয়ে মুক্ত আর্দ্র কেশে তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "ও দাদা তোমার পায়ে পড়ি, ফিরে এসো, অতদূর যেয়ো না, আমার ভয় করবে।"—

একটা ষ্টেসনে ষ্টীমার লাগিল। গোপাঙ্গনাগণ দধি, দুগ্ধ, ছানা ক্ষীর লইয়া ষ্টীমারের কাছে ভিঁড় করিয়া দাঁড়াইল। একজন ভিখারী দূরে দাঁড়াইয়া তাহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া করুণস্বরে আরোহিগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে অন্ধ। তাহার বামহস্ত খানি অবলম্বন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সরলতামাখা কাতর মুখখানি দেখিয়া অতি নির্দ্দয়ের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। বোধ হয় সেই দৃষ্টিহীন অনাথের অন্ধনেত্রের পরিবর্ত্তে ভগবান্ তাহাকে এই সুকুমারী বালিকাটিকে প্রদান করিয়াছেন। প্রিয়বন্ধু বসন্তকুমার অন্ধের সহিত সমবেদনা প্রকাশপূর্ব্বক তাহার হস্তে একটি টাকা প্রদান করিলেন। এমন দান বোধ করি, সে জীবনে কখন লাভ করে নাই। সে উভয় হস্ত মিলিত করিয়া বলিল, "রাজা বাবু, তুমি চিরজীবী হও।"—কৃতজ্ঞতাভরে তাহার অন্ধনেত্র হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

বেলা ২ টার সময় আমরা 'চারঘাট' ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরে আমাদের গম্যস্থান। বসন্তকুমারের ভাবী শ্বশুর মহাশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি, সেই অঞ্চলের কোন নীলকরের নায়েব। দেখিলাম দুইটী হস্তী ও কয়েকখানি পাল্কী নদীর ধারে প্রতীক্ষা করিতেছে। বর, পুরোহিত ও কয়েকজন বরযাত্রী পাল্কীতে চড়িলেন, মিত্তিরজার পাল্কীর উপর লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতা বশতঃ তিনি স্বয়ং বরকর্ত্তা বলিয়া চক্ষু লজ্জার খাতিরে আর পাল্কী চড়িলেন না, একটা হাতীতে চড়িলেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত দত্ত মশাইও সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। হস্তীতে আরোহণ করিয়া দত্তজার মনে বড় স্ফূর্ত্তির উদয় হইল, তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধূম পান করিতে লাগিলেন। মিত্তিরজা বলিলেন, "দত্তজা তোমার ঐ বিলাতি তামাক একটু দাওত, বড় তামাকের পিপাসা হয়েছে।" দত্ত মহাশয় একটা সিগারেট ও দেশলাই বাক্স মিত্তিরজার হস্তে অর্পণ করিলেন, মিত্তিরজা মুখে সিগারেটটী গুঁজিয়া দুইহাতে দেশলাই ধরাইলেন, ইতিমধ্যে দত্তজার ইঙ্গিতে মাহুত হাতি উঠাইল, মিত্তিরজা গদীর উপর হইতে একেবারে "পপাত ধরণীতলে"—মিত্তিরজার আর্ত্তনাদে বরযাত্রিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পাঁচ সাতজনে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। মিত্তিরজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি হস্তী পৃষ্ঠে আর দ্বিতীয় বার আরোহণ করিবেন না। অগত্যা অনেক কষ্টে একখানি পাল্কী খালি করিয়া তাঁহাকে তাহার মধ্যে পুরিয়া চৌধুরী (কণের পিতা) মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রেরণ করা হইল। আমরা দশ বার জন পদব্রজে মাটী ভাঙ্গিয়া, ছোট ছোট জলা ও বিল পার হইয়া লক্ষ্য স্থানে চলিলাম।

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহ হইতে রসি দুই দূরে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের স্নানাহার ও বিশ্রামের সকল আয়োজনই বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া মিত্তিরজা এমনই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার আত্মীয়গণ বিধিমতে বর কর্ত্তার ক্রোধোপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইল না। অবশেষে দত্তজা গোপনে চৌধুরী মহাশয়কে বরকর্ত্তা মিত্তিরজার ক্রোধ দূরীকরণের ঔষধের কথা জ্ঞাত করিলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে প্রায়

পাঁচ ভরি অহিফেন মিত্তিরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিত্তিরজা সেই মুহূর্ত্ত হইতে চৌধুরী মহাশয়ের ক্রীতদাস হইয়া পড়িলেন। শেষে এমন হইল যে, তিনি বরযাত্রিগণের অসুবিধার প্রতি পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতে রাজী হইলেন না।

সন্ধ্যার পর বাসাবাটী হইতে মহাসমারোহে বর কন্যাকর্ত্তার গৃহে নীত হইলেন, বরযাত্রিগণ পদব্রজে বরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের নীচে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, শ্রীমান বসন্তকুমার পাল্কী হইতে নামিয়া টোপর মাথায় দিয়া হস্তে দর্পণ লইয়া এক মখমলের শয্যায় উপবেশন করিলেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ দুই পাশে ও সম্মুখে বসিলে রীতিমত পান তামাক চলিতে লাগিল, অভ্যাগত ব্যক্তিগণের মস্তকে গোলাপ জল বর্ষিত হইতে লাগিল। মেয়ের পিতা কুঠির দেওয়ান, সুতরাং কুঠির বহু সংখ্যক আমলা সভাস্থলের শোভা বর্দ্ধন করিয়া বসিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেরা আসিয়া আমাদের সঙ্গী ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যা ঘটিত নানা তর্ক আরম্ভ করিল, নানা প্রকার মৌখিক অঙ্ক, হিঁয়ালী ও ফাঁকি সিদ্ধান্তের বিচার চলিতে লাগিল, শেষে হাতাহাতির উপক্রম হইল। এমন সময় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "লগ্ন উপস্থিত, সভাস্থ সকলের অনুমতি হইলে কন্যা পাত্রস্থ করি।"—কিন্তু সভাস্থ ব্যক্তিগণ অনুমতি দান করিলেন না। গ্রাম্য বারোইয়ারির পাণ্ডারা বারোইয়ারি পূজার জন্য পঞ্চাশ টাকা চাঁদার দাবি করিয়া বসিলেন। গ্রাম্য বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ লম্বা চাঁদার ফর্দ্দ বাহির করিলেন, হরি সভার দল আসিয়া চাঁদা প্রার্থনা করিলেন। মিত্তিরজা প্রথমে কিছুই দিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, শেষে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু চাঁদা দিয়া সকলকে শান্ত করিলেন। বর সভাস্থল হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল, অন্দর মহলে স্ত্রী আচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেখানে বরযাত্রিগণের প্রবেশ নিষেধ, পাছে সেখানে কোন বরযাত্রী প্রবেশ করে, এজন্য কয়েকজন কন্যাযাত্রী ও দ্বারবান যষ্টিহস্তে দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। আমরা বসিয়া ঘন ঘন হুলুধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। অদূরে রসুনচৌকী বাজিয়া বিবাহ উৎসব জ্ঞাপন করিতে লাগিল, আকাশে বসিয়া শশধর এই মধুর মিলন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমাদের সঙ্গে কয়েকজন হিন্দুস্থানী প্রহরী গিয়াছিল, তাহাদের প্রতি কন্যাকর্ত্তা কিম্বা তাঁহার দলস্থ লোক কিছুমাত্র যত্ন প্রকাশ করেন নাই, তাহারা সন্ধ্যাকাল হইতে এক ঘটী পানীয় জল চাহিয়া পায় নাই, অধিকন্তু দুই একটা অপমানের কথা শুনিয়াছিল, তাহারা অপমানিত হইয়া কোন কোন বরযাত্রীর কাছে নালিশ রুজু করিয়া বলিল, দেওয়ানজীর বাড়ীতে আর তাহারা ক্ষণ মাত্রও থাকিবে না, রাগ করিয়া তাহারা বাসায় চলিয়া গেল। বরযাত্রিগণ তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিবাহ সভা পরিত্যাগ করিলেন। মিত্তিরজা তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল। সকলেই বলিলেন "আপনি বরের মামা, বৈবাহিক গৃহে লুচি মণ্ডা, আফিং গুলি ভক্ষণ করুন, আমরা অপমান সহ্য করিয়া এখানে খাইতে পারিব না, পেটের দায়ে ত আর আমরা আসি নাই।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া মাতুলমহাশয় বরকর্ত্তাকে সংবাদ দিলেন। বরকর্ত্তা চৌধুরী মহাশয় কন্যাদান করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সেই অবস্থাতেই বাহিরে আসিয়া দেখিলেন কেহই তাঁহার গৃহে নাই, সকলেই রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি মহাব্যস্ত ভাবে আমাদের বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁর পরিবারস্থ অনেকে আসিয়াই বরযাত্রিগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বরযাত্রিগণ তখন দুর্ব্বাসার ন্যায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কাহারও কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করিলেন না। অগত্যা সকলকে বিফল মনোরথে চলিয়া যাইতে হইল। বরযাত্রিগণ অনাহারে শয়ন করিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নব জামাতা আমাদের প্রিয়বন্ধু বসন্তকুমারকে লইয়া পুনর্ব্বার বরযাত্রগণের সম্মুখীন হইলেন। বসন্ত সকলকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তাঁহার শ্বশুরকে ক্ষমা করিতে বলিলেন, কিন্তু তখন তিনি সদলচ্যুত, শ্বশুরের লোক, তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে কে?—অবশেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় বরযাত্রিগণের পদ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন বরযাত্রী মহোদয়গণের মনে কিঞ্চিৎ অনুকম্পার সঞ্চার হইল, তাহারা বলিলেন যদি দারো[illegible]

তাহাকে মার্জ্জনা করে তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহার গৃহে ভোজন করিবেন।—দারোয়ানেরা সহজেই তাহাদের ক্ষোভ পরিত্যাগ করিল, তখন সকলে গিয়া আহারে বসিলেন।

আহারান্তে আমরা আবার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কোন কোন বরযাত্রী গৃহে শয়নের স্থান না পাইয়া বারান্দায় আসিয়া শয়ন করিলেন, কেহ বা নিকটস্থ কুটম্ব গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি অধিক ছিল না, সুনিদ্রা হইবার পূর্ব্বেই রাত্রি শেষ হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে বরযাত্রীরা দেখিলেন তাঁহাদের জামা কাপড় চাদর সমস্ত হরিদ্রা রঙ্গে রঞ্জিত। শীঘ্রই সকলে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন, রাত্রে কন্যাযাত্রী মহাশয়েরা যে অজস্র গোলাপ জল বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা হরিদ্রারঞ্জিত ছিল, রাত্রে হরিদ্রার বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই, প্রভাতে যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে কন্যাযাত্রিগণ কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। কিন্তু তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ক্রোধ প্রকাশ নিষ্ফল, সুতরাং মনের আক্রোশে তাঁহারা বিছানা ছিঁড়িয়া, বালিসের তুলা বাহির করিয়া, হুকাগুলি ভাঙ্গিয়া, ঘর অপরিষ্কার করিয়া, দলে দলে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কন্যাপক্ষের একজন লোকও বলিল না—"মশায় এ বেলাটা থাকুন।" বরযাত্রিগণের আক্রোশে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইল না, কারণ তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে যখন শানাই নূতন করিয়া মধুর রাগিণীতে হৃদয়ের আনন্দ গাথা ব্যক্ত করিতে লাগিল, এবং গ্রামস্থ নরনারীগণ কৌতুকপূর্ণ অন্তরে বর দেখিতে চৌধুরী বাড়ীর দিকে ছুটিল, তখন আমরা গৃহহীন আশ্রয় হীন ভাবে ক্ষুব্ধ চিত্তে মেঠোপথ অতিক্রম পূর্ব্বক "পিতার কুপুত্র যে, বরযাত্রী হয় সে" এই গ্রাম্য প্রবচনটির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে আমাদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছিলাম। আমাদের সমস্ত আক্রোশ মিত্তিরজার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু হায়, তিনিও তখন আমাদের মধ্যে ছিলেন না। বৈবাহিক গৃহে দান সামগ্রীর ফর্দ্দ মিলাইতেছিলেন। যাহা হউক, এই ঘটনার পর মিত্তিরজাকে গৃহে আসিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে, তিনি আর জীবনে কখন বরকর্ত্তার গুরুভার গ্রহণ করিবেন না, এমন কি দশ ভরি অহিফেন উৎকোচ পাইলেও না।

প্লেগাসুর।

নামাবলী, লীলাভূমি ও গতিবিধি।

যাহার উপদ্রবে শ্রীনিবাস বোম্বাই শ্মশানে পরিণত এবং রাজধানী কলিকাতা বিলাপ ধ্বনিতে পরিপূরিত, সমগ্র সভ্যজগৎ যাহার অঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পরাঙ্মুখ প্রায় হইয়া নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত, এবং আমাদের সভ্যপ্রধান গবর্ণমেণ্ট যাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় মধ্যপথে অবস্থিত, পর্ণকুটীরবাসিনী কাঙ্গালিনী মৃত্যুমুখী একমাত্র পুত্রের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া যাহার চিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে অসমর্থ, এবং অট্টালিকাবাসী ধনাভিমানী অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও প্রিয়পুত্রকে যাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিত, তাহার নাম ও ধাম, গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? এই দৈত্যের,

ডাক নাম

প্লেগ্। বিলাতের প্লেগ্ এবং ভারতের জনপদোদ্ধ্বংসন এই উভয়ের শব্দার্থ এক, কিন্তু ভাবার্থ এক কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। প্লেগ্ বলিতে এখন বিউবনিক প্লেগ্ (১) বুঝায়। কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও বহুকাল পর্য্যন্ত প্লেগের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করেন নাই; বরং সকল সময়েই যে বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাহা নহে। এই জন্য জনপদোদ্ধ্বংসন যে আধুনিক প্লেগ্ নয় এ কথা কেহ নিশ্চয় বলিতে পারেন না, বরং প্লেগ্ বলিয়াই অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। (২) জনপদোদ্ধ্বংসনের লক্ষণ ও ক্রিয়াদির এইরূপ আভাস পাওয়া যায়:—

"প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং
যেহন্তে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ
সমানকালাঃ সমান লিঙ্গাশ্চ
ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদ
মুদ্ধ্বংসয়ন্তি।* তদ্যথা—বায়ুরুদকং
দেশঃ কাল ইতি।" চরকসংহিতা,
বিমানস্থান, তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যগণের যে সাধারণ ভাব, তাহার বৈগুণ্যহেতু এক সময়ে এক লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া জনপদ উৎসন্ন করে। সেই সকল সাধারণ ভাব এই; যথা, বায়ু, জল, দেশ ও কাল।

ভূমির বৈগুণ্য বশতঃ যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গও রোগাক্রান্ত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়;—

"সরীসৃপ ব্যালমশক শলভ মক্ষিকা মূষকোলূক শ্মশানিক শকুনি জম্বুকাদিভি + ×"—চরকসংহিতা, বিমানস্থান ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ, সরীসৃপ, সাপ, মশা, পতঙ্গ, মাছি, ইঁদুর, পেঁচা, শ্মশানবাসী শকুনি, শিয়াল প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়।—সেকালেও তবে ইঁদুরের উপর রোগের আক্রোশ ছিল।

(২) রোগটা এক প্রকার সাংঘাতিক জ্বর বলিয়াই বোধ হয়।

---

(১) Bubonic Plague.

(২) চরক, বিমানস্থান, ৩য় অধ্যায়।

জনপদোদ্ধংসন অধ্যায়ে অকালমৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া চরক রক্তাতিসার ভ্রম প্রলাপ যুক্ত জ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। চরক রোগ দেখেন নাই বলিয়া বোধ হয়; দেখিয়া থাকিলে তাঁহার মতন বিচক্ষণ লোক লক্ষণগুলির তন্ন তন্ন বিচার করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ মারীর প্রকোপ হইয়াছিল; চরক প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখিয়াই ভবিষ্যতে মারীর আশঙ্কা করিয়াছিলেন। বর্ণনা পড়িয়া সংক্রামক বলিয়া বোধ হয়। সুশ্রুত পাঁচ প্রকার সংক্রামক রোগের উল্লেখ করিয়াছেন:—

কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ
উপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং।

সুশ্রুত।

অর্থাৎ কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ ও উপসর্গিক রোগ (পাপজাত এবং ভূতোপসর্গজাত রোগ), এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়।

কুষ্ঠ, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ রোগ ও ঔপসর্গিক রোগ কখনও মারীর আকার ধারণ করে না। সুতরাং জনপদোদ্ধংসন সংক্রামক জ্বর বলিয়াই অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ। সুশ্রুতে মসূরিকা নাম দিয়া বসন্ত রোগের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে যে বহুলোকের প্রাণ নাশ হইত তাহা বোধ হয় না, কারণ বসন্ত ক্ষুদ্র রোগের মধ্যে গণ্য। এদিকে চরক বলিতেছেন সাপ, ইঁদুর, মশা, মাছি প্রভৃতি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়; কিন্তু মানুষ, গরু ও ঘোড়া ছাড়া অন্য প্রাণীর বসন্ত হয় বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং জনপদোদ্ধংসন রোগ প্লেগ বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে।

(৩) রোগের লীলা-ভূমির বিষয় আলোচনা করিলেও জনপদোদ্ধংসন প্লেগ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। চরক বলেন পঞ্চাল দেশের রাজধানী কাম্পিল্য নগরে আত্রেয় গ্রীষ্মকালে গঙ্গাতীরে অগ্নিবেশকে জনপদোদ্ধংসনের কথা বলেন। রোহিলখণ্ড ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশকে পুরাকালে পঞ্চাল বলিত। আধুনিক কেদারনাথ উত্তর পঞ্চালের একটী নগর। কেদারনাথে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে মহামারী প্রবল ছিল তাহা প্লেগ্ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ অনুমান করেন, এই মহামারী হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে এবং তিব্বত হইতে চীনদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।(১)

চীনদেশে ইহার নাম ইয়াং ৎযু পিং। (২) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইহাকে ব্ল্যাক্ ডেৎ বলিত। (৩) ষষ্ঠ শতাব্দীতে জস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে ইউরোপে প্লেগের ভয়ানক উপদ্রব হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম জস্টিনিয়ান্ প্লেগ্। (৪) ইতালীয় গ্রন্থে ইহার নাম পেস্টিস্ ইঙ্গুইনেরিয়া (৫) বা কুঁচকিগত মারী। আফ্রিকা অঞ্চলের কৌম্পলি (৬) ও রবওঙ্গা (৭) লিভ্যান্ট্ উপকূলের লিভ্যান্টাইন্ প্লেগ্; (৮) এবং মাড়ওয়ার অঞ্চলের পালি প্লেগ্ (৯) একই পদার্থ। এতদ্ভিন্ন ইহার নাম ওরিএন্টেল্ বা প্রাচ্য প্লেগ, (১০) এবং বিউবনিক টাইফাস্ (১১)। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। এখন দেখা যাউক, ইহার

ধাম

কোথায়। ইনি মর্ত্তলোকের প্রায় সর্ব্বত্রই বাস করেন। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহার নিবাস সিরিয়ায় ছিল। ইবেনেজার যুদ্ধে (১২) ফিলিস্তাইনগণ ইজরায়েলবাসিদিগকে পরাজয় করিয়া প্লেগের হস্তে পতিত হইয়াছিল। প্লেগের ও ইঁদুরের অত্যাচারে যখন গ্রাম ও নগর উৎসন্ন হইতে লাগিল, ফিলিস্তাইনেরা ইঁদুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইজিপ্টের ডাক্তার রুফাসের মতে খৃষ্টজন্মের তিন শতাব্দী কি তাহার পূর্ব্বে প্লেগ লিবিয়া মিশর ও সিরিয়ায় অধিকার স্থাপন করে। তখনও ইহার দৃষ্টি ইউরোপের উপর পতিত হয় নাই। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে জস্টিনিয়ান্ প্লেগ মিশর দেশ হইতে ইউরোপের দিকে ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তুরস্ক ফ্রান্স ও ইতালী জনশূন্য করিল। তদবধি উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপই ইহার বিশেষ লীলা ভূমি। মধ্যে মধ্যে আফ্রিকা ও চীন পারস্য ও আরব ইহার দরুণ সশঙ্কিত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে হংকং হইতেই ইহার বিক্রম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং অধিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল।

সাহেবদিগের এই ধারণা ছিল যে প্লেগ সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে আসিতে পারে নাই। জনপদোদ্ধংসন যদি প্লেগ হয়, তাহা হইলে অতি পুরাকালেও যে ভারতে ইহার প্রকোপ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ অঞ্চলের দেবীপুরাণে নাকি প্লেগের কথা আছে এবং তাহাতে এই উপদেশ আছে, যে যখনই যেখানে ইঁদুরের মড়ক দেখিবে তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই গ্রন্থ ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। অনুমান সত্য হইলে একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে প্লেগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতে প্লেগের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। যে মহম্মদ টগলক চীন ও পারস্য জয় অভিলাষে বহু অর্থ নষ্ট করিয়া অর্থশূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য প্রজা-রক্ত শোষণ করিয়াছিল এবং করভয়ে পলাতক প্রজাদিগকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় হত্যা করিয়াছিল, তাহারই রাজত্ব কালে (১৩৩৪) এই ভীষণ শত্রু ভারতে প্রবেশ করে। আবার সেই ভয়ঙ্কর নরপিশাচ টাইমুর যে সময় দিল্লীর পথে পাঁচ দিন ধরিয়া নর শোণিতের নদী প্রবাহিত করিল এবং গলিত মৃতদেহের উপর মৃতদেহ পুঞ্জীকৃত করিতে লাগিল, সেই সময় (১৩৯৯) অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ প্রাদুর্ভূত হইয়া দেশ ছারখার করিয়াছিল। টাইমুর মধ্য আসিয়া হইতে আসিয়াছিল, তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, চীন দেশজাত ব্ল্যাক্ ডেৎ এবং দিল্লীর প্লেগ একই পদার্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দিল্লীতে প্লেগ ছিল। এই শতাব্দীর শেষভাগে যখন সিরিয়া ও পারস্যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব, সেই সময় সুরাট বন্দরে (১৬৮৪ সালে) ও বোম্বাই নগরে (১৬৮৯ সালে) ইহার লীলার প্রথম অভিনয়। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে যে সময় লিভ্যান্ট, আশিয়া মাইনার, আর্মেনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় ইহার আধিপত্য, সেই সময় (১৮১২) কচ্চ, কাটিবর, গুর্জ্জর এবং সিন্ধু দেশে তিন বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের পর ইহার ভীষণ দৌরাত্ম্য। কমায়ুনের অন্তর্গত গাড়োয়াল প্রদেশে ১৮২৩ সাল হইতে অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার রাজত্ব। ১৮২৮—২৯ সালে দিল্লী ও রোহিলখণ্ড এবং ১৮৩৬ সালে মাড়োয়ারের অন্তর্গত পালি এবং রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে ইহার ভীষণ পরাক্রম। এই সময়ে ইহার পূর্ব্বনিবাস লিভ্যান্ট অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত চীনদেশ প্লেগের আবাস ছিল। কিন্তু ১৮৯৪ সালে হংকং নগরে যখন ইহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তদবধি সমস্ত পৃথিবী ইহার ভয়ে কম্পিত। তাহার দুই বৎসর পর হইতে ভারতবর্ষ অধিকার জন্য ইহার বিশেষ চেষ্টা। এখনও মনে আছে, ১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসের সেই গভীর রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া এক জন দূত আসিয়া ডাক্তার (এখন অধ্যাপক) সিমসনের আহ্বান পত্র দিয়া গেল। তদনুসারে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম প্লেগ কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছে, এবং আমাদিগকে অতি সন্তর্পণে নগর রক্ষা করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট

১ Dr. Michoud. ২ Yang-tzu-ping. ৩ Black Death. ৪ Justinian Plague. ৫ Pestis Inguinaria. ৬ Kaumpuli. ৭ Rubwunga. ৮ Levantine Plague. ৯ Pali Plague. ১০ Oriental Plague. ১১ Bubonic Typhus. ১২ Battle of Ebenezer.

ও জনসাধারণ তখন ডাক্তার সিম্‌সনের কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না, সংবাদ পত্রিকায় "সিম্‌সোনিয়ান্ প্লেগ" লইয়া উপহাস চলিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের সেই "সিম্‌সোনিয়ান্ প্লেগ" অদ্য নিঃসন্দেহে প্রকৃত প্লেগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত এবং এ বিষয় লইয়া কোন আন্দোলনই হইত না। নূতন মিউনিসিপাল আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে লর্ড হ্যামিলটন বলিয়াছিলেন যে, ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়াছিল। রোগিদের দেহ হইতে বীজ লইয়া ডাক্তার সিমসন্ প্লেগ-বীজ আবিষ্করক কিটাস্তাটোর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিটাস্তাটো ইহা প্লেগ বীজ বলিয়াই স্বীকার করেন। ডাক্তার সিমসনের মতে ১৮৯৫ সালে কেল্লায় প্রথম মৃদু প্লেগ হয়। যাহা হউক, সেই সময় হইতেই যে কলিকাতা নগরী প্লেগের লীলাভূমি এবং "সিম-সোনিয়ান্ প্লেগই" যে অদ্যকার কলিকাতা প্লেগের সূচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন বোম্বাই, সুরাট, পুনা, মান্দ্রাজ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতি নানা স্থানে ইহার প্রকোপ। সে দিকে হংকং এ ইহার রণভেরী আবার বাজিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত প্লেগতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক সিমসন্ প্লেগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ইনি কখন কোন দেশের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং ইহার

গতিবিধি

নিরাকরণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। মিশরে ইঁহার, প্রথম আবির্ভাব খ্রীষ্ট জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে। দ্বিতীয় বার ৮০০ বৎসর পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে, তৃতীয় বার ৮০০ বৎসর পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, চতুর্থবার ২৫০ বৎসর পর সপ্তদশ শতাব্দীতে, পঞ্চমবার প্রায় ২০০ বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, ষষ্ঠ বার ১২ বৎসর পর ১৮১২ সালে, সপ্তমবার ২ বৎসর পর, অষ্টমবার ১৪ বৎসর পর, নবমবার ৫ বৎসর পর। শেষ বার ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৮৪৫ সালে অন্তর্দ্ধান। লণ্ডনে প্রথম প্রাদুর্ভাব ১৩৪৮ সালের শেষে; তৎপরে দ্বিতীয় বার ১৫০ বৎসর পর। তৃতীয় বার ৩৭ বৎসর পর, ৮, ১৫, ১৬, .০, ৭, ৪, ২২, ১১, ১০, এবং ১৭ বৎসর অন্তর সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ বার ইঁহার ভয়ে লণ্ডন কম্পিত। অনেকে মনে করেন অগ্নির ভয়ে ইনি লণ্ডন ছাড়িয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তিনি তেমন পাত্রই নন; অগ্নি কাণ্ডের পরেও ১৩ বৎসর (১৬৭৯ পর্য্যন্ত) তথায় ছিলেন।

বোম্বাই সহরে প্রথম বার ইহার ভোগ ১৩ বৎসর ছিল; এবার ১৯৪ বৎসর পর ইঁহার পুনরাবির্ভাব; তিরোধান কবে তাহা কে বলিতে পারে? কমায়ুনে প্রথম প্রকোপ ১৮২৩ সালের দ্বিতীয় বার ১১ বৎসর পরে, তৃতীয় বার ১৩ বৎসর পরে, চতুর্থ বার ২ বৎসর পরে এবং পঞ্চম বার ২২ বৎসর পরে। ১৮৭৭ সালের ইঁহার পাঞ্চাললীলার শেষ অভিনয়।

গমনাগমন সম্বন্ধে যখন ইহার এই প্রকার খামখেয়ালি, তখন বহুকাল অব্যাহতি পাইয়াও কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না এবং কতকাল কোথায় বাস করিবেন তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কলিকাতায় ত অহেতুকী ভক্তিবাদী শ্রীচৈতন্যের শিষ্যবৃন্দ ভয়-ভক্তি-বিজড়িত স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে কতবার নগর প্রদক্ষিণ করিলেন, তথাপি ইঁহার দয়ার উদ্রেক হইল না; এখন দেখা যাউক বিংশ শতাব্দীর মহিলাকুলের তোপধ্বনি মিশ্রিত শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যে ইহার ক্রোধের কতদূর শান্তি হয়।*

* আজকাল কলিকাতায় প্রতি রাত্রে ৯।০ টার সময় প্লেগ-শান্তির জন্য মহিলারা শঙ্খধ্বনি করিতেছেন।

কালাকাল

সম্বন্ধেও কোন বিচার নাই। মিশরে প্রায়ই সেপ্টেম্বর মাসে আগমন এবং জুন মাসে গমন। শীতপ্রধান দেশে বসন্ত কালে আগমন, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকোপ এবং শীতকালে গমন। চীন দেশে মে মাসে আগমন, জুন মাসে প্রকোপ এবং সেপ্টেম্বরে অন্তর্দ্ধান। বোম্বাই সহরে ১৮৯৬ সালে অক্টোবর মাসে আগমন, শীতকালে প্রকোপ এবং এপ্রিলের শেষে অন্তর্দ্ধান! পর বৎসর নবেম্বরের শেষে আগমন, গ্রীষ্মারম্ভে প্রকোপ এবং জুনে অন্তর্দ্ধান; তৃতীয় বৎসরে ডিসেম্বরে আগমন, গ্রীষ্মাতিশয্যে প্রকোপ এবং জুলাই মাসে অন্তর্দ্ধান। কলিকাতায় প্রথম বার গ্রীষ্মারম্ভে প্রকোপ এবং জুনে অন্তর্দ্ধান। এবার বসন্ত কালে প্রকোপ এবং গ্রীষ্মাতিশয্যে অন্তর্দ্ধান। পুনায় বর্ষাকালে এবং দাক্ষিণাত্যে বর্ষাশেষে ও শীতারম্ভে ইঁহার প্রকোপ। সুতরাং ইনি শীতাতপ সহিষ্ণু মহাযোগী। ইঁহার স্থানাস্থান ভেদ নাই। নাইল, ইউফ্রেটিস্ ও ভল্‌গা তীরস্থ নিম্ন জলাভূমিতেও ইনি আনন্দে বিচরণ করেন এবং সমুদ্র হইতে ৬০০ ফুট উর্দ্ধে কমায়ুন এবং কুর্দ্দিস্থানেও অবলীলাক্রমে আরোহণ করেন।

পাত্রাপাত্রভেদ

আছে বলিয়া বোধ হয়। ময়লা পরিপূর্ণ পর্ণকুটীরের অর্দ্ধভুক্ত দরিদ্রের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ সখ্য। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বলেন, যেখানে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সেখানেই ইঁহার আধিপত্য। তবে আর ভারতের আশা কি? লণ্ডনে দরিদ্রদিগকেই ইনি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন; তবে রোগী সংসৃষ্ট ডাক্তার, পাদ্রী, এবং রাজকর্ম্মচারী অবস্থাপন্ন হইলেও সেই কৃপায় বঞ্চিত হন নাই। ইঁহার

বাহন

অনেক। কখনও সিদ্ধিদাতা গণেশের ন্যায় মূষিক বাহনে গৃহে গৃহে পল্লিতে পল্লিতে বিচরণ করেন, কখনও বা নরস্কন্ধে আরোহণ করিয়া কি রোগী স্পৃষ্ট বস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া দেশদেশান্তরে গমনাগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনদেশে যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব, সই সময় নাকি ইঁদুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং রক্ত বমন করিতে করিতে পড়িয়া মরিয়া যাইত। চীন গ্রন্থকারেরা বলেন ইঁদুরের মৃতদেহ হইতে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নরদেহ আক্রমণ করিত। সেই সময়ে তথাকার প্রসিদ্ধ কবি টন্-জুয়ান্ ইঁদুরের মৃত্যু উপলক্ষে একটী সুন্দর কবিতা রচনা করেন। তাহার নাম "ছুছুন্দরী কাব্য" রাখা হইয়াছিল কিনা তাহা জানিনা। তবে ঐ ইঁদুর মড়ক জনিত রোগেই যে তাঁহার মৃত্যু হয় চীন গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে। ডাক্তার সিম্‌সন্ যে সময় কলিকাতায় প্লেগের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করেন, সেই সময় বড় বাজার অঞ্চলে চাউল গম ও ছোলার গুদামে অনেক রুগ্ন ইঁদুর দেখা যাইত। ইহাদের লোমহীন শরীর, অস্বাভাবিক ঘোলা ঘোলা চক্ষু এবং সশঙ্ক গতি দেখিয়া দোকানিদের পোষা বিড়াল তাহাদের নিকট অগ্রসর হইত না। হংকং প্লেগের সময়ও ইঁদুরের মড়ক হইয়াছে। সুতরাং ইঁদুরই যে প্লেগাসুরের প্রধান বাহন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্লেগাক্রান্ত স্থানের লোক অন্য স্থানে যাইবামাত্র কিম্বা এক স্থানের প্লেগ রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য অন্য স্থানে নীত হইবার পর যে সেই সব স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এই সমস্ত প্রণালীতে যে রোগ সংক্রামিত হয়, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; এমন কি এ বিষয় লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে যে ভূমির বৈগুণ্য জন্মায় এবং তাহার দরুণ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও মনুষ্য রোগাক্রান্ত হয়, অতি পুরাকালে চরক তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ভূমি যে বিকৃত হয়, ভূগর্ভবাসী ইঁদুরের মড়ক তাহার প্রমাণ। চীন পণ্ডিতেরা

বলেন যাহার মুখ ভূমির যত নিকটে সে তত শীঘ্র প্লেগাক্রান্ত হয় ; যথা সর্ব্ব প্রথমে ইঁদুর এবং তৎপরে শূকর, বিড়াল, কুকুর, গরু এবং মানুষ, পরে পরে রোগাক্রান্ত হয়। প্লেগ যে সংক্রামক এই সংস্কার ইউরোপেও অতি পুরাতন। আমাদের দেশে যেমন, বিলাতেও তেমনি, নাপিত মহাশয়েরাই অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। ১৫৪০ সালে অষ্টম হেন্‌রীর রাজত্ব কালে চন্দ্রবৈদ্যকে অস্ত্রবৈদ্যের কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কারণ তাহারা ক্ষৌরী কার্য্য স্থলে প্লেগ রোগীকে আশ্রয় দিতেন।* ডাক্তার রসেল বলেন প্লেগের সংক্রামকতায় অবিশ্বাস এক প্রকার বাতুলতা এবং পালা জ্বরের মতন ছাড়িয়া ছাড়িয়া সময় বিশেষে প্রবল হয়। গবর্ণমেণ্ট যখনই জাহাজ আটক করিবার বিধি প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখনই বণিক মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে এবং সংক্রামকতার মত বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৮২৫ সালে বণিকদের উত্তেজনায় এই সংক্রামকতার মত অনুসন্ধান করিবার জন্য দুইটী কমিটি নিযুক্ত করেন। তাহাতে ম্যাক্‌লীন নামক একজন বিকৃত মস্তিষ্ক কর্ত্তব্যহীন চিকিৎসক বণিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। জাহাজ সংক্রান্ত বিধি যায় যায় হইয়াছিল ; এমন সময় কোয়ার্টার্লী রিভিউ পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গুচের লেখনী প্রসূত একটী চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখনীর যেমন শক্তি, পত্রিকারও তেমন সম্ভ্রম। রাজমন্ত্রিগণ সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং জাহাজ সংক্রান্ত বিধি পরিবর্ত্তন করিবার সংকল্প তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্লেগের সংক্রামকতা সম্বন্ধে গুচ যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করিব :—

১। মার্সেলিস্ মারী—

৭০ বৎসর পর মার্সেলিস্ বন্দরে প্লেগ অকস্মাৎ রণঘোষণা করিল, কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করিল না। ম্যাজিস্‌ট্রেটরা লোকের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা প্লেগ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন ; তাহা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ চলিতে লাগিল এবং জনসাধারণের নিকট নানাপ্রকার গঞ্জনাভোগ করিতে হইল। কিন্তু যখন গাড়ী গাড়ী মৃতদেহ গোরস্থানে স্তূপীকৃত হইতে লাগিল, সৎকার অভাবে মৃতদেহ পথে ঘাটে পড়িয়া রহিল, সংক্রামক বিষ পোড়াইয়া ফেলিবার মানসে হাটে মাঠে দ্বারে দ্বারে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল, দোকান পাট বন্ধ করিয়া সকলে নগর ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন এই আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল প্লেগ দেখা দিবার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে একখানা জাহাজ প্লেগাক্রান্ত সিরিয়া ও ত্রিপলি হইতে যাত্রী লইয়া মার্সেলিস্ বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। পথে এক জন তুরস্ক যাত্রীর প্লেগে মৃত্যু হয়। দুই জন নাবিক ঐ মৃতদেহ জলে ফেলিবার চেষ্টা করে কিন্তু কাপ্তানের আদেশে নিবৃত্ত হয়। কিছু দিন পর ঐ দুই নাবিক ক্রমশঃ আরও দুই জন নাবিক এবং জাহাজের ডাক্তার, ছয় জন জাহাজের কুলী, একটী বালক আর এক জন ডাক্তার ও তাঁহার পরিবার প্লেগ্ কবলে পতিত হইল। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত জাহাজ তীরে আসিতে দেওয়া হয় নাই। পরে যাত্রীগণ পুরাতন বস্ত্রাদি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া তীরে উঠিল। পাঁচ মাস জাহাজে বন্দী থাকিয়া যাত্রিগণ যখন কোন বড় সহরে প্রবেশ করে, তাহাদের প্রথম কাজ রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ। ক্রয় বিক্রয়, আদান প্রদান, দেখা সাক্ষাৎ, গল্পগুজব প্রভৃতি কত প্রকার প্রয়োজনে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং তাহাদের দ্বারা রোগ ছড়াইয়া পড়িবার অনেক সুযোগ থাকে। সহরে প্রথম যে ব্যক্তি প্লেগাক্রান্ত হয়, সে ঐ জাহাজের একজন যাত্রী। ঐ জাহাজের সঙ্গে যাহাদের কারবার ছিল এইরূপ কতিপয় লোকের পরিবারেও প্লেগ দেখা দিয়াছিল। এইরূপে মার্সেলিস্ ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ৮০, ০০০ মৃত্যু হইয়াছিল।

একটী হোটেলে ৩০০।৪০০ লোক থাকিত। একটী স্ত্রীলোক তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলে তাহার সামান্ত জ্বর হইয়াছে। দুইজন দাসী তাহাকে ধরিয়া বিছানায় রাখিয়া আসে। পরদিন সেই দুইজনের প্লেগ হইল। এইরূপে ডাক্তার, কর্ম্মচারী, চাকর প্রভৃতি সকলেই প্লেগাক্রান্ত হইল, এবং তন্মধ্যে কেবল মাত্র ৩০ জন আরোগ্য লাভ করে।

মার্সেলিসে মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ভিখারীরা গাড়ী করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইত। ভিখারীরাও একে একে মরিল। তৎপর কয়েদীদিগকে কারামুক্তির প্রলোভন দেখাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু এক পক্ষের মধ্যে ২৭৩ জন বন্দীর মধ্যে কেবল মাত্র ১১ জন জীবিত রহিল।

সমুদ্রে তিনখানি বন্দীজাহাজ ছিল। একখানিতে প্লেগরোগী, এবং একখানিতে অন্য রোগী এবং একখানিতে সন্দেহজনক রোগী থাকিত। এইরূপে খুব সতর্ক থাকাতে ১০, ০০০ লোকের মধ্যে কেবল মাত্র ১৩০০ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় এবং অর্দ্ধেক লোক আরোগ্য লাভ করে।

মার্সেলিসের প্রথম সেরিফ বলেন, যাহারা বহির্জগতের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব রাখে নাই তাহারা প্লেগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

২। মস্কো প্লেগ।

ডাক্তার মার্টেন্স্ মস্কোর একজন চিকিৎসক। তিনি বলেন ১৫০ বৎসরের মধ্যে সেখানে প্লেগ দেখা যায় নাই। ১৭৬৯ সালে রুশে তুর্কে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরবৎসর রুশীয় ইয়াসি নগরে প্লেগ আবির্ভূত হইয়া বহু রুশের প্রাণনাশ করিল। দুইজন সৈন্য পথে প্লেগাক্রান্ত হইয়া মস্কোর সৈন্য-হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে তথাকার একজন ডাক্তার (Demonstrator of Anatomy) এবং এগার জন পরিচারক ঐ রোগে আক্রান্ত হইল। অধ্যক্ষেরা হাসপাতাল সহরের বাহিরে লইয়া গেলেন, বাহিরের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিলেন দরজায় সিপাহীর পাহারা বসাইলেন, এবং রুগ্ন সৈন্য ও তাহাদের পরিবারবর্গকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া তাহাদের বস্ত্রাদি দগ্ধ করিলেন। প্লেগ তখনকার মতন অদৃশ্য হইল। একটী কারখানায় একজন স্ত্রীলোক প্লেগ লইয়া আসে। তাহার দরুণ ১১৭ ব্যক্তির প্লেগে মৃত্যু হয়। যাহাতে ভিতর হইতে বাহিরে লোক না যাইতে পারে তজ্জন্য পাহারা বসান হইল, কিন্তু রাত্রিযোগে জানালা দিয়া অনেকে পলায়ন করিল। রোগ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল ; প্রতিদিন ২০০ হইতে ৪০০, ৪০০ হইতে ৬০০, ক্রমে হাজার মৃত্যু হইতে লাগিল। একদিন বিকালে সমুদয় নগরবাসী দলবদ্ধ হইয়া দ্বার জানালা ভাঙ্গিয়া হাসপাতালে প্রবেশ করিল, মহা সমারোহে সাধুমূর্ত্তি (Saints) রোগীদিগের নিকট লইয়া গেল এবং

---

* "Because persons using surgery often take into their cures and houses such sick and diseased persons as have been affected with the pestitence &c. —do use or exercise barbery, as washing or shaving, or other feat, † thereto belonging, which is very perilous for infecting the king's liege people resorting to their shops or houses, there being washed or shaven." *Act of the Parliament of Henry VIII, 1540, quoted by Dr. Gooch in the Quarterly Review, 1825.*

সকলে একে একে সেই সব মূর্ত্তি চুম্বন করিল। দেশীয় প্রথানুসারে তাহারা মৃতদেহ আলিঙ্গন করিল এবং নগরের মধ্যস্থলে সমাহিত করিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে রোগ নিবারণের চেষ্টায় দরুণ ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; তাই সকলে মিলিত হইয়া ডাক্তারদিগের গৃহ আক্রমণ করিল এবং তাহাদের গৃহ লণ্ড ভণ্ড করিল। প্লেগও ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রতিদিন ১২০০।১৩০০ প্রাণী গ্রাস করিতে লাগিল। বন্দীরা মৃতদেহ সৎকার করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। দরিদ্রদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল, এবং একটী বড় জামা, দস্তানা এবং ওয়েল ক্লথের মুখোস দিয়া বলা হইল যেন হস্ত দ্বারা মৃতদেহ স্পর্শ না করে। এই উপদেশ কেহই পালন করে নাই; তাহাতে বহুসংখ্যক দরিদ্রলোকের মৃত্যু হয়। যে সমুদয় ডাক্তার রোগীকে কেবল দেখিয়া যাইতেন কিন্তু স্পর্শ করিতেন না, তাঁহাদের কোন রোগ হয় নাই, কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসকেরা রোগী স্পর্শ করিতেন বলিয়া রোগাক্রান্ত হইতেন। সমুদয় নগরে প্লেগের ভীষণ প্রকোপ, কিন্তু অনাথ হাসপাতালে ১৪০০ লোকের মধ্যে একটীও প্লেগরোগী ছিল না। বাহিরের সঙ্গে ইহাদের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। এক রাত্রে ছয়জন লোক হাসপাতাল হইতে গোপনে পলায়ন করে এবং রোগ লইয়া প্রত্যাগমন করে। তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইল; তদবধি আর সেখানে প্লেগ দেখা দেয় নাই।

মণ্টাদ্বীপবাসী ৩৭ বৎসর নিরুদ্বেগে বাস করিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন প্লেগাক্রান্ত আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে সেণ্ট্ নিকলো নামক জাহাজ আসিয়া তথায় নঙ্গর করিল। পথে দুইজন নাবিকের প্লেগে মৃত্যু হয়। নঙ্গর করিবার পর জাহাজ হইতে তুলিয়া নাবিকদিগকে হাসপাতালে রাখা হইল। ক্রমে কাপ্তান ও তাহার ভৃত্যের ঐ রোগে মৃত্যু হয়। পরে জাহাজ আলেকজাণ্ড্রিয়া ফিরিয়া গেলে সকলে নিশ্চিন্ত হইল। কিছুদিন পর বর্গ নামক একজন চোরাই মাল বিক্রেতার একটী সন্তান প্লেগে মারা যায়। তাহার মাতা অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে একটী সন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল এবং একে একে তাহাদের সমস্ত পরিবার নির্ম্মূল হইল। বর্গের স্ত্রীকে যে ধাত্রী প্রসব করাইয়াছিল তাহাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইয়া তাঁহার এক কুটুম্ব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। তাহার দ্বারে অনেকক্ষণ আঘাত করিয়া যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে ব্যক্তি দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল ধাত্রী জানু পাতিয়া অচল হইয়া রহিয়াছে: অনেক ক্ষণ নাড়িয়া যখন বুঝিল যে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তখন সেই স্থান হইতে আসিয়া স্বাস্থ্য কমিটীতে সংবাদ দিল। কমিটী তাহাকে একটী স্বতন্ত্র স্থানে আবদ্ধ করিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্লেগে মৃত্যু হইল। এইরূপ প্লেগের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেবল মঠ, জেল প্রভৃতি যে সব স্থানে বাহিরের সঙ্গে কোন সংস্রব ছিল না, সেই সব স্থানে প্লেগ দেখা দেয় নাই।

৪। মিশর যুদ্ধে স্যার জেমস্ ম্যাগ্রিগর ভারতীয় সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, তের জন ডাক্তার প্লেগ হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে রোগীর রক্ত মোক্ষণ করিতে হইত এবং কুঁচকিতে অস্ত্র করিতে এবং পটি বাঁধিতে হইত। এই কার্য্যের জন্য দেশীয় গ্রীক ডাক্তার নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বহু অর্থের প্রলোভনেও কেহ স্বীকৃত হয় নাই। অবশেষে ঐ তের জনের মধ্যে সাত জনের প্লেগ এবং ৪ জনের মৃত্যু হইল। যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসে নাই, অথচ তথায় বাস করিত তাহারা রোগাক্রান্ত হয় নাই।

৫। ফরাসীস প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার ছয় বৎসর পর ৮০ জন ডাক্তারের প্লেগে মৃত্যু হয়। এই জন্য ব্যবস্থা হইল তুরকী নাপিত প্লেগ রোগীর অস্ত্র চিকিৎসা করিবে। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে দুই বৎসরে কেবল ১২ জন ডাক্তারের প্লেগে মৃত্যু হইল। কিন্তু তুর্কী নাপিত মণ্ডলীর অর্দ্ধেক লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

৬। ১৮০১ সালে মিশর যুদ্ধের সময় ফরাসীস সৈন্যগণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার ডেস্‌গেনেটেস্ Desgenetes তাঁহাদের ভয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যদের সমক্ষে নিজ দেহে বিষ সঞ্চার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একটী আরোগ্যোন্মুখ রোগীর কুঁচকির পুঁজে ছুরি ডুবাইয়া, সেই ছুরী দ্বারা নিজের কুঁচকীও বগলে অল্প খোঁচা দিয়া, সাবান জলে ধুইয়া ফেলিয়া ছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি সুস্থ শরীরে সৈন্যদের সমক্ষে স্নান করিলে সকলে আশ্বস্ত হইল। এই কথা শুনিয়া ইংরাজ ডাক্তার হোয়াইট মনে করিলেন তবে ত প্লেগ সংক্রামক নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রীতিমত নিজ দেহে বিষ সঞ্চার করিলেন, কিন্তু ধূর্ত্ত ফরাসীস ডাক্তারের সতর্কতার সহিত ছুরীর আঁচড় দেওয়া কি সাবান জলে ধুইয়া ফেলার কথা তিনি শুনেন নাই এবং তদ্রূপ সাবধানও হন নাই। ২রা জানুয়ারী তিনি একটী স্ত্রীলোকের কুঁচকী হইতে পুঁজ লইয়া উভয় উরুতে ঘর্ষণ করেন এবং পর দিন প্রাতে নিজ হস্তে ছুরিকাঘাত করিয়া আঘাত স্থানে একজন সিপাহীর কুঁচকীর পুঁজ মাখাইয়া দেন। চতুর্থ দিন বিকালে (৬ই) তাঁহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল, খুব ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, মস্তিষ্কের দোষ ঘটিল, হস্ত পদের কম্প হইল, জিহ্বা শুষ্ক ও কাল হইল, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি একজন প্রধান সংক্রামক-মত বিরোধী। তাঁহার প্লেগ হইয়াছে বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, এবং কাহাকেও বগল কুঁচকী পরীক্ষা করিতে দিলেন না। ষষ্ঠ দিবসে (৮ই) প্রলাপ আরম্ভ হইল এবং সপ্তম দিবসে (৯ই) মৃত্যু আসিয়া সমুদয় মতামত বিরোধ ঘুচাইয়া দিল।

৭। ১৮১১ সালের একখানা ডাক্তারি পত্রিকায় ('Journal de Medicine') উল্লিখিত আছে ভ্যালি (Valli) নামক একজন ইতালীয় চিকিৎসক প্লেগের সময় কনষ্টাণ্টিনোপলে বাস করিতেন। তিনি বসন্তের পুঁজ, ব্যাঙের পাক রস, কিম্বা তৈলের সহিত প্লেগের পুঁজ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। কোন মুসলমান তাঁহার চক্ষু রোগের চিকিৎসা করাইতে আসিল, অমনি আদেশ হইল—"চক্ষুর পাতায় ঐ তৈল মালিশ কর।" কেহ বা পেটের বেদনায় অস্থির হইয়া তাঁহার নিকট আসিল, অমনি ঐ তৈল পেটে মালিশ করিবার ব্যবস্থা হইল। এই উপায়ে ভ্যালি ৩০ ব্যক্তির দেহে প্লেগ সঞ্চার করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসার মাত্রা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, অবশেষে সুলতান হস্তক্ষেপ করিলেন, এবং যে ব্যক্তি ভ্যালির ঐ তৈল প্রস্তুত করিত তাহাকে বন্দী করিয়া, তাহার সমুদয় তৈল দগ্ধ করিলেন এবং তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

কলিকাতায় যখন ডাক্তার সিম্‌সন্ প্লেগের আগমন ঘোষণা করেন, তাহার পূর্ব্বে কেল্লায় হংকং হইতে একদল ফৌজ আসে। ডাক্তার সিম্‌সন্ বলেন তাহাদের মৃদু প্লেগ হইয়াছিল। ১৮৯৮ সালের যে প্রথম রোগীর বিবরণ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, সে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আরম্ভে মৃদু প্লেগ হইয়া থাকে; অনেকে তাহা লক্ষ্য করেন না। মেডিকেল কলেজে এই প্রকার কয়েকটী রোগী ভর্ত্তি হয় এবং একজনের মৃত দেহ ঐ ছাত্র ব্যবচ্ছেদ করে। অল্প দিন পরেই তাহার প্লেগে মৃত্যু হয়। এইরূপ প্লেগ রোগীর শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া দুই জন ডোম প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল এবং ডাক্তার গ্রীন্ ঐ রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তরে রোগ সংক্রামিত হইবার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বস্ত্র উপলক্ষে প্লেগ সঞ্চারের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। হাওয়ার্ড্ বলেন ১৬৬৫ সালে যখন লণ্ডন প্লেগে ছারখার হইতেছিল, সেই সময় একজন প্লেগ রোগীর বস্ত্র ডার্বিসিয়ারের অন্তর্গত ইয়াম গ্রামে প্রেরিত হয়। সেই সময় হইতে সেই গ্রামে প্লেগ প্রাদুর্ভূত হইল। পাদ্রী মম্পেসন্ তাঁহার যজমানদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে

পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, অবশেষে প্লেগের কবলে পতিত হইলেন। এইরূপে ২৬০ জন গ্রামবাসীর প্লেগে মৃত্যু হয়।

ফরাশীশ সৈন্যের ডাক্তার পগ্‌নেট্ (Pugnet) বলেন যে প্লেগে মৃত একজন ডাক্তারের গলাবন্ধ এবং রুমাল ১৪ জন লোককে বিতরণ করা হয়। তাহাদের সকলেরই প্লেগ হইয়াছিল এবং গলার বীচি ফুলিয়াছিল।

১৮৩৫ সালে মিশরে এই বিষয়ে পরীক্ষা হইয়াছিল। দুইজন প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীকে প্লেগরোগীর বস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারই বিছানায় শোয়ান হয়। ফল—উভয়েরই প্লেগ, তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু।

এইরূপে ইঁদুরদেহ, নরদেহ এবং রোগীর বস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া যে প্লেগ দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিউমোনিয়াবিকারে প্লেগ বায়ু আশ্রয় করিয়াও দেহান্তরে প্রবেশ করিতে পারে। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার একজন প্লেগরোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই রোগীর কাসি ছিল; তাহার কফ ডাক্তারের নাকে ও মুখে প্রবেশ করে। এই ঘটনার পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু ও রোগী শোকে কাতর হইয়াছিলেন।

অনেক সময় অদৃশ্য যান আরোহণ করিয়া প্লেগ শত শত যোজন দূরে গিয়া ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ওলাবিবি পানীয় জলে বাস করেন, এ বিষয়ে এখন আর মতভেদ নাই; কিন্তু যখন কোথাও তাঁহার প্রাদুর্ভাব হয়, কোন শুভমুহূর্ত্তে কোথাকার পানীয় জল অবলম্বন করিয়া তিনি প্রথম রোগীর দেহে প্রবেশ করেন, তাহা সমুদয় স্থলে নির্ণয় করা যায় না। প্লেগ সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া প্লেগ প্রথম ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন তাহা অনেক সময়ে নিরাকরণ করা অসাধ্য।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

মেঘরাজ্যে।

চৈত্র বৈশাখের প্রখর রৌদ্র তাপে মস্তিষ্ক যখন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একমাত্র তালবৃন্ত খানিকে সার করিয়া যখন দৈনিক সমস্ত কর্ত্তব্যগুলির প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িতে হয়, তখন পৌষমাসের সেই আরামের দিন গুলিকে স্মৃতি পথে আনিলে, উপস্থিত যন্ত্রণাটা যেন কঠোরতর ও তীব্রতর হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ কাল ইংরেজ-রাজের কৃপায়, সভ্যতার উন্নতিতে ও বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই কষ্ট-কণ্টকিত স্মৃতিটা অনেকের পক্ষেই সুখকর হইয়া উঠিয়াছে। জীবনব্যাপী কঠোর কার্য্য পরম্পরা হইতে কিঞ্চিৎ অবসর লইয়া কষ্ট-সঞ্চিত রৌপ্যমুদ্রা গুলির মধ্যে কয়েকটির মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলেই নিদারুণ গ্রীষ্মের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারা যায়।

আমরাও এই অভিসন্ধিতে বৈশাখের খর-রবি-করোজ্জ্বল ও উত্তপ্ত, ধূলিধূসরিত কলিকাতা সহর খানিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অপরাহ্ন ৪ৠটার সময় দার্জ্জিলিং মেল ট্রেণে একদম উত্তর মুখে ছুটিয়া চলিলাম। আমাদের দুঃখ অনুভব করিয়াই বুঝি দেরী হওয়ার ভয়ে ট্রেণ খানি যথাশক্তি দৌড়িয়া সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে পদ্মাপারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামুকদিয়া পৌঁছিয়া তাপদগ্ধ দেহটাকে শ্রান্তি হারিণী পদ্মার সুশীতল বক্ষে ভাসাইয়া দিলাম।

সারাঘাটে উঠিয়া সর্ব্ব সন্তাপ-হারিণী নিদ্রাদেবীর স্নেহময় ক্রোড়ে দেহ খানিকে ঢালিয়া দিলাম। শিশু রবির মৃদু কিরণস্পর্শে যখন চক্ষের পাতা খুলিয়া গেল, তখন আমরা হিমালয়ের পদ-প্রান্তে অনন্ত হিমানীর শান্ত ছায়া সমাহিত-শিলিগুড়ী ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; এই ষ্টেশন হইতে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে আরম্ভ। এই রেলওয়েটীকে যেন আদরচ্ছলে রহস্য করিয়াই Toy Railway বলা হয়। ক্ষুদ্রাকার গাড়ীগুলি দেখিয়া হাসি পাইল। মনে হইল, ছোট বেলার খেলনার রেল গাড়ীর মত ইহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী স্প্রাং আঁটিয়া ছাড়িয়া দিলে বুঝি খানিকটা ছুটিয়া চলিবে। কিন্তু যখন সেই ছোট্ট ট্রেণ খানি ঝকাঝক্ হস্ হস্ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিল, তখন হাসির পরিবর্ত্তে গভীর বিস্ময়ের উদয় হইল। ছোট্ট ইঞ্জিনখানির বিপুল শক্তি দেখিয়া অবাক হইলাম। শিলিগুড়ী পার হইয়া জীবনে প্রথম চা বাগানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অনেক কালের উপভুক্ত জিনিসটাকে সশরীরে সম্মুখে পাইয়া চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে মেঘান্তরালে লুক্কায়িত, হিমালয়ের অস্পষ্ট অভ্র, বিশাল দেহ তৃষিত চক্ষের সম্মুখে একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

বর্ত্তমান সময়ে দার্জ্জিলিং যাওয়াটা যত সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। এখন যেমন ২৫ টাকা বেতনের একজন কেরাণীও .৬৷০ টাকা ব্যয় করিয়া দুপাঁচ দিনের জন্য শৈল বিহার করিয়া আসিতে পারেন, তখন তাহা ছিল না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যাত্রীকে হাওড়া ষ্টেসন হইতে ২২০ মাইল দূরবর্ত্তী সাহেব গঞ্জ ষ্টেসনে যাইতে হইত। সেখান হইতে ট্রিমা

কারাগোলা, সেও প্রায় ৫৬ ঘণ্টার রাস্তা হইবে। কারাগোলা হইতে পালকী, গরুর গাড়ী, ঘোড়া, নৌকা কিম্বা ডাক গাড়ীতে পূর্ণিয়া, কিষনগঞ্জ ও তেঁতুলিয়া হইয়া শিলিগুড়ী পৌঁছিতে হইত। শিলিগুড়ী হইতে প্রায় ৫০ মাইল রাস্তা টোঙ্গায় চড়িয়া অবশেষে দার্জ্জিলিং পৌঁছান যাইত। সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ জে, ডি লুকার সাহেব ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত পথে তাঁহার সুবিখ্যাত হিমালয় যাত্রা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কারাগোলা হইতে [illegible] পৌঁছাইতে তাঁহার ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় [illegible] হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কষ্টের সীমা [illegible] স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জ্জিলিং যাত্রাটা তখন [illegible] মহাপ্রস্থানের মত জীবনের শেষ যাত্রা বলিয়া [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] স্বজনের [illegible] হয় না, [illegible] পক্ষে সহজ সাধ্য আরামের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শক্তির একটি অতি বিস্ময়জনক প্রকাশ। পৃথিবীতে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ আছে, এই রেলওয়ে তন্মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে। আমেরিকার এণ্ডিস্ পর্ব্বত মালার রেল রাস্তা ছাড়া ইহার সহিত তুলনা আর কোন রাস্তারই হয় না। এই লাইনের সর্ব্বোচ্চ ষ্টেসন ৭৪০৭ ফুট উচ্চ। কি সুকৌশলে এতটা উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত দ্রুতগামী রেলগাড়ী অনায়াস-গতিতে চলিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময় ও কৌতূহলে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট কার্য্যকুশল সার এস্‌লি ইডেন সাহেবের যত্নে ও সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফ্রাঙ্কলিন্ প্রেস্‌টেজ্ সাহেবের বুদ্ধিকৌশলে এই রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুকাল হইল গভর্ণমেণ্ট মাইল প্রতি প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শিলিগুড়ী হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত একটি সুপ্রসস্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই রাস্তাটিকে পাঙ্খাবাড়ি রোড্ বলিত। এখন উহার নাম কার্টরোড্। বর্ত্তমান রেলের রাস্তা কোথাও এই কার্টরোডের উপর দিয়া, কোথাও বা পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭৯ সালে কার্য্যারম্ভ হইয়া ১৮[illegible] ১৮৮১ সালে ৪ঠা জুলাই বঙ্গেশ্বর সার্ এস্‌লি ইডেন্ [illegible] রাস্তা উন্মুক্ত করেন। হিমালয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানি ইহার জন্য মাইল প্রতি প্রায় ৩৫০০ পাউণ্ড বা ৫২৫০০৲ টাকা খরচ করিয়াছেন।

যাঁহারা কখনও দার্জ্জিলিং যান নাই, তাঁহারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, রেল রাস্তাটা বুঝি ক্রমোচ্চ ভাবে বরাবর সরল গতিতে শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়াছে। তাহা নহে। রেলরাস্তা বরাবর পর্ব্বতের গাত্র-সংলগ্ন থাকিয়া উহার বক্রতার অনুগামী হইয়াছে। এক এক [illegible] বক্রতা এত অধিক যে চলিতে ভয় হয়, এবং এই [illegible]ony Point, Sensation Point প্রভৃতি [illegible] কোথাও বা সহসা অনেক ঊর্দ্ধে [illegible] অসম্ভব; [illegible] সব[illegible] এক এক [illegible] Reverse দ্বারা রাস্তা অনায়াসে প্রায় ১০০ ফুট ঊর্দ্ধে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

আবার কোথাও Loop প্রস্তুত করিয়া রাস্তার উপরদিয়া রাস্তা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সকল স্থানে উপরে উঠিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অতিক্রান্ত রেল রাস্তাটি পরিস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। কাকলঙ্গ বেণ্ডের (Bend) নিকট দ্বিতীয় লুপ্‌টি ঠিক যেন একটি ৪ সংখ্যা অঙ্কিত করিয়াছে। চিন্‌বাটী লুপ্‌টি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত এবং ইহার সমস্ত দৃশ্যটি এমনই মনোরঞ্জক ও বিস্ময়োৎপাদক যে, পাঠকদিগকে ইহার একটি সুন্দর চিত্র উপহার দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

শিলিগুড়ী হইতে শুক্‌না পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। তারপরে যখন ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলাম তখন যাহা দেখিলাম ও অনুভব করিলাম, তাহা লিখিয়া জানাইবার মত মানুষের ভাষা নাই। আমার প্রাণে যত ভাব ও চিন্তা আসিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবারও আমার শক্তি নাই। শুক্‌না ষ্টেশন হইতে ট্রেণখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, সর্পগতিতে দ্রুতবেগে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ পথেই রাস্তার একদিকে গভীর খাত, অন্যদিকে

চিন্‌বাটী লুপ।

পাহাড় ঘুরিয়া রঙ্গটঙ্গ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, ষ্টেসনে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারেন। শুকনা ও রঙ্গটঙ্গের মধ্যবর্ত্তী স্থানে হাতী বাঘ, চিতা, বন্য-কুকুর, শুকর, শশক, হরিণ প্রভৃতি বহু সংখ্যক আরণ্য জন্তু সর্ব্বদা বিচরণ করে। রঙ্গটঙ্গের বিপরীত পশ্চিমদিকে কাক-লঙ্গ পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই উত্তর পার্শ্বে টিণ্টারিয়া ষ্টেশন। টিণ্টারিয়া হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইলেই প্রথম Reverse দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখেই শিবাখোলা নদী। শিবাখোলা গয়াবাড়ির নিকট পাগলাঝোরা হইতে উৎপন্ন হইয়া মহানদীতে পতিত হইয়াছে। গয়াবাড়ী হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইলেই পাগলা ঝোরা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এই ঝরণায় এমন প্রবল বেগ হয় যে, রেলওয়ে কোম্পানীকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়। ১৮৯০ সালে ঝরণার জল প্রায় ৫০০ গজ রেলের রাস্তা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

ইহার পরেই মাহালদ্রাম রেঞ্জ। এই পর্ব্বতমালার সর্ব্বদক্ষিণে মহানদী ও খার্সিয়াং ষ্টেশন, সর্ব্বোত্তরে দার্জ্জিলিং। মহানদীর নাম হইতে মহানদী ষ্টেসনের নামকরণ হইয়াছে। ষ্টেসন হইতে কয়েক গজ অগ্রসর হইলেই মহানদীর জন্মস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। শিলিগুড়ীর পরেই এই মহানদীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেখানে নদীর উপরে সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। যত উপরে উঠিতে লাগিলাম ততই শীত বোধ হইতে লাগিল। তারপরে শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের গায়ে চা বাগানগুলির দৃশ্য বড়ই সুন্দর। কোনও কোনও স্থানে

অভ্রভেদী শিখরমালা। ডান দিকে হাত বাড়াইলে পর্ব্বত-গাত্র স্পর্শ করা যায়; আবার বাম দিকে ট্রেণখানি নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে কয়েক আঙ্গুল সরিয়া গেলেই একেবারে পাতাল পুরীতে নাগলোকে যাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। যতদূর দৃষ্টি যায় পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত বই আর কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় কত রকমের কত গাছ, কত রকমের সুন্দর লতা পাতা, কত সুন্দর ফুল ফল। একাধারে এমন প্রাণবিমোহন কোমল সৌন্দর্য্য ও এমন হৃদ্‌কম্পকারী ভয়াবহ বিস্ময়োৎপাদক দৃশ্য আর কোথাও সম্ভবে না।

কখনও আমরা একটা পাহাড়ের গায়ে উপরে উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুই তিনবার উঠিয়া আবার আর একটা পর্ব্বতে আসিয়া পৌঁছিলাম। উর্দ্ধে উঠিয়া নীচের অতিক্রান্ত রেলপথ দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। কখনও বা ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠিকপূর্ব্ববর্ত্তী স্থানেই আবার আসিয়া হাজির হইলাম। পূর্ব্ববর্ণিত চিন্‌বাটি লুপ্‌ ঠিক রঙ্গটঙ্গ ষ্টেসনের উপরে, কিন্তু রঙ্গটঙ্গ হইতে ৪৫ মিনিটে আমরা প্রায় ৮০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া এই স্থানে পৌঁছিলাম। দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কেহ ইচ্ছা করিলে এই স্থানে অবতরণ করিয়া সোজা রাস্তায়, ট্রেণখানি কাকলঙ্গ

হইতে সমতল ক্ষেত্র দেখা যায়। সেখানকার বড় বড় গাছগুলি ঠিক যেন ছোট ছোট ঘাসের ঝোপ্ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নদীগুলি দেখিয়া মনে হইল, কে যেন শাদা কাপড় মাঠে বিছাইয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আমরা খার্সিয়াং ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এই স্থান সমুদ্রতীর হইতে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ। ক্ষুদ্র সহরটী ষ্টেসন হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে মাহালদ্রাম রেঞ্জের একটী Spur এর উপর স্থাপিত। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থানকে Eagle's Crag বলে, এবং ইহা শিলিগুড়ীর পরবর্ত্তী শুক্‌না ষ্টেসন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ট্রেণ এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দাঁড়াইয়া আমরা টিরাইর সমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। খার্সিয়াং হইতে রওয়ানা হইলেই পশ্চিম দিকে সিঙ্গালিলা রেঞ্জের সীমান্ত প্রদেশ নয়ন পথে পতিত হয়। এই পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগেই স্বাধীন নেপাল রাজ্য। মাহালদ্রাম ও সিঙ্গালিলার অন্তর্ভূত উপত্যকার নাম বালাসুন। ইহার শ্যামল বক্ষকে বিধৌত করিয়া বালাসুন নদী প্রবাহিতা। এই নদীর জন্মস্থান ঘুম পাহাড়ের নিকটে। আমরা বাম দিকে বরাবর এই নদী ও উপত্যকা এবং ডান দিকে মাহালদ্রামে বিবিধ তরুলতাসমাচ্ছন্ন তুঙ্গ শিখরমালা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ইতিপূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখনও অল্প অল্প পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিকে সদ্যস্নাত বৃক্ষ লতা মৃদু সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। মাহালদ্রাম রেঞ্জের আপাদমস্তক বৃক্ষলতাপূর্ণ গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে এই গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী প্রতি-মধুর কলনাদে উপত্যকার গভীর গহ্বরে নিপতিত হইতে-ছিল। সহসা নির্জ্জন বনভূমির অন্তরাল হইতে ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতে কুঞ্চিত ঝরণার-নির্ম্মল সলিল-প্রবাহ শত হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া গভীর আবর্ত্ত উৎপাদন করিতেছিল, আবার সেই অনাবিল আবর্ত্তকে উল্লম্ফনে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

পথিমধ্যে এই প্রকার বহু সংখ্যক ঝরণা দেখিতে দেখিতে আমরা সোনাদা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আপ্ ও ডাউন মেলের প্রায় এই স্থানেই সাক্ষাৎ হয়।

সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান কালে সৌদামিনী সংবৃত যে জলদ মালাকে মস্তকোপরি কত উর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিতাম, আজ তাহা সহসা পথিমধ্যে আসিয়া আমাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করিল। উপরে নীচে, আশে পাশে চতুর্দ্দিকেই মেঘ। কেহ কেহ ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক দম আমাদের গাড়ীর ভিতর দিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। সোনাদা ও ঘুমের অন্তবর্ত্তী স্থান প্রায় সর্ব্বদাই কুয়াসাচ্ছন্ন থাকে। সে দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর। শুভ্র, ঘনসন্নিবিষ্ট কুয়াসা ভেদ করিয়া যখন ট্রেণ খানি হুস্ হুস্ শব্দে চলিতে থাকে, তখন ডান্ দিকের উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী অস্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হইয়া প্রাণের ভিতর এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে। আবার পশ্চিম দিকে দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী কুয়াসা-সমুদ্র দেখিয়া মনে

ঘুম-ডাইনী।

হয় যেন আমরা সৃষ্টির প্রান্তসীমায় দণ্ডায়মান হইয়া অসীম শূন্য উপলব্ধি করিতেছি। সময় সময় বাত্যাহত উড্ডীয়মান তুলারাশির ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কুয়াসা-জাল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন অপরিস্ফুটরূপে প্রতিভাত সুন্দর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রকে স্বপ্ন দৃষ্ট কাল্পনিক জগৎ বলিয়া ভ্রম জন্মে। আমরা এই শুভ্র বাষ্পসমুদ্র ভেদ করিয়া জোড়বাঙ্গলা নামক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘুমনামক ষ্টেসনে পৌছিলাম। এই স্থান ৭৪০৭ ফুট উচ্চ। ঘুম হিমালয়ান্ রেল্‌ওয়ের সর্ব্বোচ্চ ষ্টেসন। এই স্থানের পশ্চিম দিকে ৪ মাইল গেলেই ঘুমরক নামক পাহাড়টী দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই পলিতকেশ ও গলিতচর্ম্ম এক বুড়ী অদ্ভুত রকমের পোষাক পরিয়া 'বাবু একটী পয়সা বকসিস্" বলিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে উপস্থিত হয়। ইহাকে সকলে 'ঘুম ডাইনী' অথবা The Ghoom Witch বলিয়া থাকে। ইহার উপস্থিতি যাত্রীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং কৌতূহল বশতঃ দুই একটী পয়সা দিয়া ইহার দন্তহীন মুখের সরল হাসিটী দেখিতে অনেকেই কাতর হয় না।

পশ্চিমে দিকের বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন গম্ভীর-ভাবব্যঞ্জক পর্ব্বতগুলির দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। আমরা এই স্থান হইতে মোড় ফিরিয়া, বালাসুন উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া, ছোট রঙ্গিতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই দার্জ্জিলিং সহরের রমণীয় দৃশ্য। পাহাড়, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, নদী, ঝরণা মেঘ ও বিদ্যুতের ভিতর দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা হিমাদ্রি-শিখরস্থিত অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের মত দার্জ্জিলিং সহরের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শৈলসুন্দরীর অঙ্কগত এই অপূর্ব্ব আনন্দ-নিকেতন দর্শন করিয়া বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় মন অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। দূর হইতে দার্জ্জিলিঙের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত দেবপুরীর মত শুভ্রছাত বিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর গৃহ গুলি প্রাচীন পর্ব্বতমালার গাত্রে থরে থরে সাজান রহিয়াছে। দার্জ্জিলিং ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইলেই ডান দিকে লিম্বোঝোরা। বিগত ঝড়বন্যাতে এই ঝরণার চারিদিক হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড (ধস্) Slip পড়িয়া স্থানটিকে আতঙ্কপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বহুসংখ্যক পাহাড়ী-কুলী পাথর দিয়া এই স্থান বাঁধিতেছে। দৃঢ়কায় পাহাড়ীরা পিঠে পাথর লইয়া শত হস্ত নিম্ন হইতে সোজা উপরদিকে উঠিয়া যাইতেছে।

নেপালী কুলি।

আশে পাশে পাহাড়ীদের ছোট ছোট কুটীর। তাহাদের বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু দেহ, লাল লাল গাল, ও গোল গাল ছেলে মেয়ে গুলি দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বেলা প্রায় ৩টার সময় মেল্ ট্রেণ দার্জ্জিলিং ষ্টেসনে পৌছিল। ষ্টেসনটি ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বড়ই সুন্দর। ভুটিয়া ও পাহাড়ী কুলীতে প্ল্যাটফরম্ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কতগুলি আমাদের বিছানা বাকস্ লইয়া চলিল। এক এক জন কুলী

নেপালী মেয়ে।

এক সুসভ্য জাতির পদার্পণে পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়া, এক অভিনব সজীবতা ও প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছে! যেস্থানে দুর্দ্দান্ত পর্ব্বতবাসিগণও নির্ভয়ে চলিতে সাহস করিত না, আজ সেখানকার সুশোভিত রাজপথে অবলাগণও নিঃশঙ্কচিত্তে মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে! ব্যবসা-বাণিজ্যের কোলাহলে, শাসন ও শিক্ষার সুবন্দোবস্তে, নৃত্য-গীতের উন্মত্ততায়, হিমাদ্রিশিখরস্থিত সেই অরণ্যপুরী আজ স্বর্ণপুরীতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রমক্লিষ্ট মানবের জন্য দার্জ্জিলিঙে যে সুশীতল বিশ্রাম গৃহ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার জন্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাঙ্গালী মাত্রেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চির ঋণী।

আমরা অকলাণ্ড রোড্ দেখিয়া একেবারে Mall এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অকলাণ্ড রোডের শেষভাগেও চৌরাস্তাকে দার্জ্জিলিংএর চৌরঙ্গী ও ইডেন গার্ডেন বলা যাইতে পারে। এখানে হ্যারিংটন ও পার ফটোগ্রাফার; হোয়াইটএওয়েলেডল, মূর, ফ্রান্সিস্ হ্যারিসন হেথওয়ে পোষাক বিক্রেতা; নিউমেন স্মিথ ষ্টেনিষ্ট্রীট প্রভৃতি কলিকাতার বড় বড় দোকানদার সুরম্য দোকান সাজাইয়া বসিয়াছেন। চৌরাস্তার মোড়ে ড্রামড্রইড ও কলিকাতার সুবিখ্যাত হোটেলওয়ালা, মিসেস্ মঙ্কের রকভিল হোটেল।

Mall স্থানটী অনেকটা ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড বাজিবার স্থানের মত—চারিদিকে সারি সারি বসিবার বেঞ্চ স্থাপিত আছে। বেঞ্চগুলির পশ্চাতে গাছের ডালে নানা রকম সুন্দর সুন্দর অর্কিড ফুটিয়া রহিয়াছে। চারিদিক গোলাপ, দালিয়া প্রভৃতি নয়নরঞ্জক প্রস্ফুটিত ফুলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ বাঙ্গালী, স্ত্রী পুরুষ, ছেলে বুড়া সকলেই প্রত্যহ একবার এখানে বেড়াইতে আসিয়া থাকেন। এখানে পাহাড়ীরা নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিস লইয়া বিক্রয়ার্থ দণ্ডায়মান থাকে। তন্মধ্যে

তিন মণ বোঝা অনায়াসে বহিতে পারে। ছোট ছোট বালক বালিকারাও কুলীর কাজ করে। ইহারা মাথায় করিয়া মোট বহিতে পারে না। কপালের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া বাক্স, বিছানা, খাট, পালঙ্গ, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, সিন্দুক সমস্তই পিঠে করিয়া লইয়া যায়। পাহাড়ে দেশে মাথায় মোট লইয়া উঠা নামা করা অসম্ভব।

ষ্টেসন হইতে প্রায় ২০ মিনিট পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আমরা আমাদের প্রবাসগৃহ করলটন ভিলাতে পৌঁছিলাম। সহর দেখিবার জন্য এমন আগ্রহ উপস্থিত হইল যে, আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম।

মানবের অনধিগম্য যেস্থান একদিন অরণ্যচর হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ থাকিয়া সৃষ্টির প্রাচীন প্রকৃতির স্বাধীন লীলাক্ষেত্র রূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া বিরাজ করিতেছিল, আজ সেইস্থান,

"কথা" রচনা করায়, বঙ্গসাহিত্যে কিয়ৎ পরিমাণে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। এক সময়ে স্বদেশের এবং বিদেশের পুরাতন পুস্তকের ভাবানুবাদ করা বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর কল্পনার প্রাবল্যে সে লক্ষ্য ভাসিয়া গেলে, কিছুদিন বঙ্গসাহিত্য বহু পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও মানভঞ্জনের তরল তরঙ্গের রঙ্গ রসেই সমধিক মত্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অনুরোধে কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল নখরাঘাতে বহু ঐতিহাসিক চরিত্র শতধা বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং স্বদেশের ইতিহাস হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেবরে কবিতা নিবদ্ধ করিলে? যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কবি বঙ্গ-সাহিত্য-সেবকগণের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া [illegible]।

[illegible] কবিকল্পনা যে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ [illegible] ভাষা

[illegible]

সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির মূলেও বিলক্ষণ দোষ প্রবে[শ] করিয়াছে; বচন-রচন-কৌশল-বলে তাঁহারা কবি বলিয়া সমাদর পাইতে পারেন না। সৌন্দর্য্য রুচির সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। যে শ্মশানে দাঁড়াইয়া চিতাধূমাচ্ছন্ন গগন মণ্ডলে নেত্রনিবদ্ধ করিয়া কুৎসিত সঙ্গীত গান করিতে পারে, সে প্রতিভাশালী পণ্ডিত হউক—কবি নহে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে যে মহাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিরপ্রচলিত প্রথা পদ্ধতির বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কেবল চরিত্র গৌরবে অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ভগবান্ শাক্যসিংহ ও বৌদ্ধাচার্য্য উপগুপ্ত তজ্জন্য চির প্রসিদ্ধ। মগধাধিপতি বিম্বিসারের শাসন সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়—তিনি বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার রাজপুরী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল লোকে প্রাণভয়ে পুরাতন ধর্ম্ম পুনঃগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিহাস-বিখ্যাত প্রিয়দর্শন অশোক নরপতি প্রথমে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মেই আস্থাবান্ ছিলেন; অবশেষে [illegible] উপগুপ্তের মন্ত্র শিষ্য হইয়া অর্দ্ধ

মেমসাহেবেরা অনেকেই রিক্‌স [illegible] ডাণ্ডি চড়িয়া Mallএ আসেন। রিকস্ এক রকম ছোট গাড়ী, মানুষে টানে। ডাণ্ডীর একখানি ছবি দিলাম।

এই রমণীয় রাজ্য দেখিতে দেখিতে এক অপার সৌন্দর্য্য সাগরে প্রাণটা ডুবিয়া গেল। অনন্ত নীলিমার কোলে শ্যামল পরিচ্ছদে সু-সজ্জিত হইয়া পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, শিখরের উপর শিখর মস্তক উত্তোলন করিয়া কত শত সহস্র বৎসর, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! আপনাদে সুবিস্তৃত দেহে মহান্ সৌন্দর্য্যরাশির অনন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া কতকাল ধরিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রকৃতির উপাসক মানব প্রাণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছ! বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমার অসীম শক্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ধরণীবক্ষে বিরাজ করিতেছে! এই

অভিসারিকার চরণ পাত তাঁহার বক্ষে পতিত হয়। তখন

নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে,
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

সুতরাং কোথায়ও কেহ দেখিবার লোক ছিল না। রমণী এরূপ সময়ে এরূপ স্থানে সহসা নরদেহ স্পর্শে চমকিত হইয়া প্রদীপ ধরিয়া দেখিল—

নবীন গৌর কান্তি,
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা কিরণে বিকচ নয়ান
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান,
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

নয়নে "লজ্জা জড়িত" হইলেও, রমণী রূপ দেখিয়া আত্ম সম্বরণ করিতে পারিল না। মুখরার ন্যায় তাঁহাকে স্ব ভবনে আহ্বান করিয়া ফেলিল! উপগুপ্ত বলিলেন :—

অয়ি লাবণ্য পুঞ্জে!
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনী,
সময় যে দিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

অল্পদিনের মধ্যেই সে সময় আসিল; উপগুপ্তও প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। কিন্তু হায়! সেদিন রমণী বসন্তরোগগ্রস্তা গলিতদেহা ;—

রোগমসি ঢালা কালি তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

উপগুপ্ত সেই দিনটিতে তাহার শিয়রে আসিয়া শ্মশান শয্যায় স্বহস্তে সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ লেপন করিতে বসিলেন। এই সন্ন্যাসীর চরিত্রবলেই উত্তরকালে ভারতবর্ষের পুণ্য নাম দেশ দেশান্তে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে কেহ ইঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এই চরিত্র সৌন্দর্য্য মিলাইয়া দেখ,—ইহার নিকট কত চন্দ্রকরোজ্জল রজনী মলিন বলিয়া বোধ হইবে না কি?

আর এক সময়ে আমাদের দেশে অভিনব আর একটি শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল;—তাহার জন্মস্থান পঞ্চনদ, তাহার গুরু নানক ও শক্তি বিধাতা গুরুগোবিন্দ, ইতিহাসে সুপরিচিত। যাহারা এই মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শিখ্ নামে পরিচিত হইয়া বীরবলে অদ্যাপি সভ্যজগতে সম্মান লাভ করিতেছে। কিন্তু কবে কিরূপে এই শক্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না। যখন ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল;—

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্ম্মম নির্ভীক্।

তখন কাণ পাতিয়া সকলেই শুনিল;—

"অলখ নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয় ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝঞ্জন্।

দীল্লির বাদশাহের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই এই নবাগত মহাশক্তির সংঘর্ষ সমুপস্থিত হইয়াছিল। সে সংঘর্ষে শিখ্ বহুবার পরাজিত হইলেও কদাচ বশীভূত হয় নাই। দিল্লীশ্বরের বাহুবল ছিল, তাহার নিকট লক্ষ লক্ষ শিখ্ মাথা পাতিয়া জীবন দান করিয়াছে, কিন্তু একটি প্রাণীও কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরে জীবন ভিক্ষা করে নাই! গুরুদাসপুর গড়ে

মোগল শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুইজনে।

ইহার একটি কথাও কবিকল্পিত নহে; কিন্তু এত করিয়াও এই যুদ্ধে শিখ্বীর বন্দা বন্দী হইয়াছিলেন। মোগলেরা তাঁহাকেও তাঁহার পার্শ্বচরগণকে দিল্লীতে বাঁধিয়া আনিল। সেখানে যাহা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই!

পড়িগেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজীর" কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।

জীবন রক্ষার জন্য পাড়া পাড়ি করাই জীবের প্রকৃতি।

জীবন বিসর্জ্জনের জন্য এমন কাড়া কাড়ি করিতে শিখ্‌ ভিন্ন আর কেহ শিখিয়াছিল কি না সন্দেহ। দিল্লী বীর-শোণিতে প্লাবিত হইয়া গেল; অবশেষে

বন্দার কোলে কাজি দিল তুলে
বন্দার এক ছেলে;
কহিল, ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।

* * * *

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি।

* * * *

তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায় আনি—
বালকের মুখ চাহি.
"গুরুজীর জয় কাণে কাণে কয়
"রে পুত্র ভয় নাহি।"

পিতাপুত্র উভয়কেই জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল। ঘাতক বন্দার দেহ সাঁড়াশি দগ্ধ করিয়া ছিড়িল; কিন্তু—

স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ।

শিখ্‌ কিরূপ নির্ম্মল নির্ভীক্‌ তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া, সে কিজন্য নির্ম্মল নির্ভীক্‌ তাহাও সুকৌশলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শিখের ইতিহাসে অকাতরে মুণ্ডদানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তজ্জন্য গুরুগোবিন্দের মৃত্যু ও তরুসিংহের জীবনবিসর্জ্জনের গাথাও প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্জাবের শিখের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের মারাঠারাও এক দিন নববলে বলিয়ান্‌ হইয়া উঠিয়াছিল। শিখ নির্ম্মল নির্ভীক্‌—মারাঠা কর্ম্মনিষ্ঠ ও সুচতুর। শিখ্‌ ক্ষুদ্ররাজ্য গঠন করিয়াছিল; মারাঠা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভের উপক্রম করিয়াছিল। কি জন্য মারাঠা দিল্লীশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইয়া আবার কালক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, কয়েকটি চিত্রে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মারাঠা শক্তির জীবন প্রভাতে—মারাঠা শক্তির জীবনদাতা ছত্রপতি শিবাজী গুরু রাম দাসের গৈরিক বসনের পতাকা উড়াইয়া পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; যে যেখানে ছিল স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের উদ্ধার কামনায় পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিল। জীবন মধ্যাহ্নে পেশোয়ারবংশের ধন লিপ্সায় মারাঠাশক্তি স্বার্থ চিন্তায় পরার্থ বিস্মৃত হইয়াছিল; জীবন সন্ধ্যায় তাহারা দস্যু তস্কররূপে মানব সমাজে উপদ্রব করিয়া তৃণ জঙ্গলের ন্যায় একে একে ভস্ম হইয়া গেল।

রাজস্থানের রাজবংশধরগণ সামন্তসেনা সহায়ে ইতিহাসে যে সকল অদ্ভুত বীরকীর্ত্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য দেশে দুর্লভ। রাজা ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া সামন্তগণ তাঁহার আহ্বানে অকুতোভয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিতে আসিত; রাজশক্তি প্রজা-সাধারণের বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রাজা বিচারকালে ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেখ;—

বিপ্র কহে "রমণী মোর
আছিল যেই ঘরে
নিশীথে সেথা পশিল চোর
ধর্ম্মনাশ তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহ
চোরে কি দিব সাজা?"
"মৃত্যু" শুধু কহিলা তারে
রতন রাও রাজা।

ছুটিয়া আসি কহিল দূত—
"চোর সে যুবরাজ।
বিপ্র তাঁরে ধরেছে রাতে
কাটিল প্রাতে আজ!
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে
কি তারে দিব সাজা?"
"মুক্তি দাও" কহিলা শুধু
রতন রাও রাজা।

পড়িতে পড়িতে কবিকল্পিত কাহিনীর মত বোধ হয়, এমন ঘটনা কেবল রাজস্থানের ইতিহাসেই সম্ভবে! সে ইতিহাসে বীরের ন্যায় বীররমণীও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে পৃথিবীকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। কবি তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন! কোন এক বিশেষ যুদ্ধে রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করা সহজ, কেন না তাহা স্বাভাবিক। ধর্ম্মনাশ ভয়ে চিতায় প্রবেশ করা কঠিন হইলেও তেমন কঠিন নহে, কারণ দশের দৃষ্টান্তে উত্তেজনা আসিয়া দুর্ব্বলতাকে বলদান করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতি দিবসের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ভিতরে স্বদেশের জন্য আত্মসুখ মুহূর্ত্তে তুচ্ছ করিয়া জীবনদানের জন্য অগ্রসর হওয়া তেমন সহজ নহে। সহজ না হইলেও রাজস্থানের পল্লীতে পল্লীতে নরনারীকে এইরূপে জীবন দান করিতে দেখিয়া ইতিহাসলেখক তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া থাকেন। কবি এইরূপ একটি বিবাহসভায় বর্ণনা করিয়াছেন। বরবধূ "আঁচল বাঁধা আঁখি নত" মন্ত্র পড়িবার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান; এমন সময়ে মহারাণার দূত আসিয়া যুদ্ধের জন্য বর...

আহ্বান করিল ; তখন প্রহর খানেক রাত হয়েছে শুধু ! শাঁখ বাজাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ ব্যাপারটা শেষ করিয়া গেলেও না চলিত এমন নহে, কিন্তু রাজপুত সে শিক্ষালাভ করে নাই !

বাঁধা অঞ্চল খুলে ফেলে বর
মুখের পানে চাহে পরস্পর
কহে প্রিয়ে মিলেম অবসর
এসেছে ঐ মৃত্যু সভার ডাক।"

সত্য সত্যই বরের আর বিবাহ করা হইল না। কন্যা চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া বরের বাটীতে উপনীত হইলেন ; কিন্তু তখন

নিশীথ রাতে বর সজ্জা পরা
মেত্রিপতি চিতার পরে শুয়ে।

কন্যা ক্রন্দন করিলেন না, কপালে করঘাত করিলেন না, বসন ভূষণ খুলিয়া ফেলিলেন না ; চিতায় বসিয়া পতিপদ ধারণ করিলেন। কবিও তাঁহার শোকে বসুধাকে দ্বিধা বিভক্ত হইবার জন্য অনুরোধ না করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

ধুধু করে জ্বলে উঠল চিতা—
কন্যা বসে আছেন যোগাসনে।
জয় ধ্বনি উঠে শ্মশান মাঝে
হুলুধ্বনি করে পুরাঙ্গনা।

কিন্তু আপাদ মস্তক এরূপ রুধির রঞ্জিত ঐতিহাসিক চিত্র বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান পাঠক পাঠিকার চিত্ত রঞ্জন করিতে কতদূর সক্ষম হইবে, তাহাতে কিছু সন্দেহ বোধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা গানই অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত, তাহা ক্রমশঃ নিম্ন স্তরেও গড়াইয়া পড়িতেছে। সুতরাং কবি বন ফুলের মালার গান গাহিয়া মন ভুলাইয়া এখন রক্ত তিলক পরা কৃপাণকরা ভৈরবী মূর্ত্তির বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন দেখিয়া, বাঙ্গালী ভয়ে চক্ষু মুদিয়া ঘন ঘন শ্রীদুর্গা স্মরণ করিতেছে না, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

স্কটলণ্ডের সমর কবিতা, রাজ স্থানের অমর কবি চন্দ ভট্টের বীর গাথা, এ সকলই কিন্তু কথার আকারে ছড়ার সুরে সরল ভাবে গ্রথিত। জন সাধারণ শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিবে, বালক বালিকা ক্রীড়া কৌতুকের ন্যায় আবৃত্তি করিবে, শ্রমজীবী চিত্তবিনোদনের জন্য পরিশ্রমের সময়ে [illegible] ন্যায় [illegible] করিয়া গান করিবে,—তাহাই এই শ্রেণীর কবিতার [illegible] উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, কবি বোধ হয় সেই জন্যই ইহাকে ব্যালেড কবিতা বা তদ্রূপ কোন গুরুতর নামে পরিচিত না করিয়া বিনীতভাবে বলিয়াছেন,—ইহার নাম "কথা"। আমাদের ভাষায় যে "কথা" নাই,তাহা ঠিক নহে। সুয়া রাণী দুয়া রাণীর কথা, ঘুম পাড়ানিয়া মাসি পিসির কথা, বেহুলা লখিন্দরের কথা, দাশুরায়ের নলিনী ভ্রমরের কথা এবং পৌরাণিক কীর্ত্তি-কাহিনী ও মেয়েলী ব্রতের কথায় বাঙ্গালা দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তথাপি এ দেশে উচ্চ লক্ষ্যের খাতিরে তুচ্ছ কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া লক্ষ্য সাধন করিবার কথা নূতন করিয়া রচনা করিবার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। যিনি প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহার উদ্যম হয়ত কিছুদিন লোকের নিকট তেমন ভাল লাগিতে না পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর কথা একবার ভাষায় স্থান লাভ করিলে কালে যে তাহা বহুমূল্য অলঙ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ হয় না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

হিমাচল বক্ষে।

(২)

জমীদার মহাশয়ও তাঁহার অনুচরকে ডাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। জনমানবশূন্য নির্জ্জন স্থানে মনুষ্য-সমাগম যে কি প্রীতি-কর তাহা অন্তরে অনুভব করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই দিবা দ্বিপ্রহরে, কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে, কিম্বা আরব্যোপন্যাসসুলভ আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ ঘর্ষণ করিয়া, এই মরুতুল্য অচল পৃষ্ঠে তিনি খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিবেন, এরূপ দুরাশায় আমরা আশ্বস্ত হই নাই। আমার মনে হইল আমি এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অপরিচিত পথ ভ্রমণে নানা অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা, এ অবস্থায় তাঁহার ন্যায় একজন স্থানী ভদ্রলোকের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিব, ইহা অল্প সুবিধার কথা নহে। আহারাভাব হইলে বড় দুশ্চিন্তা ছিল না ; এজীবনে ত কতদিন একাদশী করিয়া অতিবাহিত করিয়াছি, ক্ষুধায় কাতর হইয়া গিরিবক্ষনিঃসৃত নির্ঝরের স্ফটিক বিমল জলধারা আকণ্ঠ পুরিয়া প

করিয়াছি, কখন তাহাও পাই নাই, কিন্তু কোন দিন ত পড়িয়া থাকে নাই, আজিকার এ দীর্ঘদিনও না হয়, সেই ভাবে অতিবাহিত হইবে। উপবাসই এ পথের প্রধান সম্বল, তবে দৈবাৎ কিছু আহার্য্য মিলিলে তাহা নিতান্তই ভগবদানুগ্রহ মনে হইত। সুতরাং আহারের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্মিতমুখে জমীদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা করা গেল।

ডাকবাঙ্গালায় সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখিয়া জমীদারমহাশয় মহাসম্ভ্রমে আমাদের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিলেন; অন্য কাহারও মনে যাহাই হউক, ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম; আমি এখনও ভালরকম 'সাধু' হইতে পারি নাই, গঞ্জিকার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, ভস্মে দেহ ভূষিত করিতে শিখিনাই, সাধু সন্ন্যাসীর মত নির্লজ্জভাবে যাহা জানি না তাহা লইয়া অজস্র কাব্য-স্রোত উদ্গিরণ করিতেও এপর্য্যন্ত অভ্যস্ত হই নাই; তথাপি জমীদার মহাশয় আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন, ইহাতে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া বড় অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার মনে সহসা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল। মনে হইল, আমার এ সন্ন্যাস বিড়ম্বনার মধ্যেও কোন সুখ, কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি নাই, যাহাতে আমার অধিকার নাই, অম্লানবদনে তাহা আত্মসাৎ করিয়া কেন পাতকগ্রস্ত হইতেছি? কেন অন্যকে প্রতারিত করিতেছি? কিন্তু অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি আর ফিরিবার উপায় নাই; আমার হৃদয়ে যতই অসাধুভাব থাক, আমার চিত্তে যতই দুর্ব্বলতা থাক, আমার জ্ঞান-নেত্র যতই অন্ধ হোক, সাধুর অভিনয় আমাকে করিতেই হইবে, নতুবা ঐ পর্ব্বতপ্রান্তে কোন্ গিরি গুহায়, কোন্ তৃণাচ্ছন্ন অদৃশ্য রসাতলগর্ভে আমার মত নিরাশ্রয় শ্রদ্ধাবিশ্বাসশূন্য লোকের দেহ নিপতিত হইবে, কে বলিতে পারে? ভণ্ডামিটাও আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে এতই আবশ্যক হইয়া উঠে। এ দোষ কাহার তাহা বলিতে পারি না; সাধু সন্ন্যাসীর, না লোটা, কম্বল, গেরুয়া বসনের? যাহারই হোক, কিন্তু আমার সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে হিন্দুর দেশ এই ভারতবর্ষ সাধুসন্ন্যাসিগণের দ্বারাই শাসিত। যাহারা সংসারের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছে, কামিনী কাঞ্চনের মোহবন্ধনচ্ছিন্ন করিয়া অনাদি অনন্ত বিশ্বদেবতার চরণে সুপবিত্র জীবনকুসুমাঞ্জলি দান করিয়াছেন—তাঁহাদেরই মঙ্গলকিরণানুরঞ্জিত নৈতিক প্রভাবে যে দেশ শাসিত হয়, যে দেশের সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সে দেশ চিরদিন আধ্যাত্মিক উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরূঢ় থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের এ শোচনীয় অধঃপতন কেন? আমাদের ন্যায় এবং আমাদের অপেক্ষাও নরাধম সন্ন্যাসিদলের আতিশয্যই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হইল। ভণ্ডামী সর্ব্বত্র এমন কি 'সন্ন্যাসগিরি'ও এখন একটা ব্যবসায়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যবসায়ে পরিশ্রম অল্প, দারিদ্র্যের ঝঞ্ঝাট নাই, অথচ লাভের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই ব্যবসায়ের দিকে বহুলোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে মঠধারী মহান্ত হইতে ভেকধারী ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই শুকদেব গোস্বামীর অভিনব সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারা আর কিছু না জানুক এটুকু জানে যে এই গৈরিকবসন ভারতজয়ী। ভারতের এমন স্থান নাই যেখানে ইহা সবল ও দুর্ব্বল সর্ব্বশ্রেণীর ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারে। হয়ত আমাদের দেশের জনকত শিক্ষিত যুবক প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া ইহার প্রতি বীতরাগ; কিন্তু এ ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মধ্যে তাঁহারা কয় জন? কয়জন তাঁহাদের মতের সারবত্তা স্বীকার করে? ত্রিশকোটীর মধ্যে তাঁহাদের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি, তাহাদের যুক্তি, বিশ্বাস সমস্ত ডুবিয়া যায়।

প্রলোভন ত অল্প নহে, এই রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডের মহিমায় কত নরপিশাচ বিনা পরিশ্রমে উদর পুরিয়া আহার করিয়া থলি ভরিয়া অর্থ লাভ করিতেছে, দেশ ছাড়িয়া নাম বাহির করিতেছে। হিন্দুর গৃহদ্বার সাধুসন্ন্যাসীর জন্য উন্মুক্ত দেখিয়া, দলেদলে লোক যে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু শিক্ষিত লোক যতই নাসিকা কুঞ্চিত করুন, অশিক্ষিত জনসমাজে, অন্তঃপুরে এখনও গৈরিক বসন ও উদ্রাক্ষের অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, এখনও তাহারা হিমাচলের পাষাণবক্ষ হইতে কন্যাকুমারিকার সুনীল সিন্ধুসলিলবিধৌত শ্যামল তটভূমি পর্য্যন্ত অটুট অধিকার বিস্তৃত রাখিয়াছে। সরলতার প্রতিমা, শ্রদ্ধাভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ভারতললনাগণ

সাধু দেখিলেই, সে যতই পাপিষ্ঠ হউক, ভক্তিভরে মস্তক অবনত করেন, তাহার পর যদি সেই সাধু নানা 'তীরথ' দর্শন করিয়া থাকেন, কিম্বা দর্শন না করিয়াও অসঙ্কোচে মিথ্যা বলিয়া সর্ব্বতীর্থ সন্দর্শনের অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, দুই চারিটা অশুদ্ধ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে গৃহলক্ষ্মীগণ ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে তাহাদের জন্ত যে শুধু আটা-ঘৃতের বন্দোবস্ত করেন তাহা নহে, অম্লান বদনে তাঁহারা তাঁহাদের সযত্ন সঞ্চিত স্বর্ণ ও রজতখণ্ডও সাধুচরণে উপহার দান করিয়া আত্মার পরিতৃপ্তি লাভ করেন। হিমালয়ের নিভৃতবক্ষেও এমন ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর অভাব নাই, ইহা তাঁহাদের জাতীয় প্রকৃতি। আমার পরিধানে যদিও গৈরিক বসন, অঙ্গে ভস্ম ও মস্তকে জটাভার ছিল না, তথাপি আমার মলিন ছিন্ন বস্ত্র, আজানুবিলম্বিত কম্বল, সুদীর্ঘ পর্ব্বত ভ্রমণের জন্ত এবং ধূলিময় বিশৃঙ্খল কেশরাশি আমার সাধুত্ব বিঘোষিত করিতেছিল। তাহার উপর সাধুর ভণ্ডামিও যে একেবারে না ছিল এমন নহে, স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় নিজের সম্মান-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দুই চারিটি সাধু বাক্যও প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু তাহার একটি উপদেশও প্রতিপালন করা কি কঠিন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় কোন দিন হয় নাই। বাহিরের কম্বল ও ভিতরের আত্মম্ভরিতা ইহাই আমাদের সন্ন্যাসের প্রধান সম্বল। আমরা সাধু!

যাহাহউক, লোকের ভিতরের দিকটা সহসা অন্যের দৃষ্টিপথে পড়ে না, আর বাহিক খোলস দেখিয়াই মনুষ্যের মর্য্যাদার বিচার হয়, তাই জমীদার মহাশয় আমাকে একটি মহাতেজস্কর সাক্ষাৎ বিশ্বামিত্র তুল্য পরাক্রান্ত তপস্বী স্থির করিয়া আমার অদূরে বরাসনে সসম্ভ্রমে উপবেশন করিলেন। তাঁহার অনুচর পদাতিকদ্বয় কিছুদূরে বসিয়া শ্রমদূর করিতে লাগিল। আমরা তিহরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি শুনিয়া জমীদার মহাশয় আত্মপরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন; সেই পরিচয় হইতে জানিতে পারিলাম, তিনি তিহরীর রাজার একজন অতি নিকট কুটুম্ব! এই কুটুম্বিতাসূত্রে তিনি তিহরীর রাজপরিবার হইতে একখণ্ড ক্ষুদ্র জমীদারী লাভ করিয়াছেন, এই জমীদারির আয় হইতেই তাঁহার সংসার প্রতিপালন ও সাধুসেবার কার্য্য নির্ব্বিরোধে সম্পন্ন হয়। একথাটা শুনিয়া আমাদের সেই শিক্ষা সভ্যতা সমাচ্ছন্ন নদীমেখলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের স্বধর্ম্ম নিরত রাজপ্রসাদ লোলুপ জমীদার পুঙ্গবগণের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের মধ্যে কয়জন সাধুসেবাকে তাঁহাদের পারিবারিক কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত মনে করেন? সে রূপ জমীদার বাঙ্গালাদেশে শতকরা একজনও আছেন কি না সন্দেহ। এমন একদিন ছিল, যখন তাঁহাদিগের পুণ্য প্রয়াসী পিতৃপুরুষগণ পরোপকার সাধনে প্রচুর অর্থব্যয় জীবনের একটি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তাঁহাদের গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, সেই সকল পার্ব্বণোপলক্ষে যে প্রচুর ব্যয় বিধানের নিয়ম ছিল, দীনদুঃখীকে অন্ন বস্ত্রদান, পরের দুঃখ মোচন ও প্রতিপালন, ও প্রজার নিকট হইতে লব্ধ অর্থের সদ্ব্যয় দ্বারা সেই নিয়ম প্রতিপালিত হইত, তাঁহাদের অতিথিশালায় বহুদূর দেশ হইতে সমাগত অতিথিগণ আশ্রয় লাভ করিত, তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় ও নিদাঘপীড়িত, তৃষার্ত্ত প্রজাপুঞ্জের জলকষ্ট নিবারণ করিত। পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মীগণ পরসেবা-ব্রতকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের দেশের সে দিন আর নাই, আমাদের দেশে সুখ ও কর্ত্তব্যের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে এখন বিজ্ঞাপনের যুগ, যাহারা দেশ হিতকর কার্য্য করেন তাঁহারা অধিকাংশস্থলেই ঢক্কানিনাদ সহকারে স্ব স্ব মহিমা প্রচার না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, উপাধির আশায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা সৎকার্য্যে অর্থদান করেন, এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটে সেই দানের সংবাদ প্রচারিত হইলেই তাহার স্বার্থকতা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। সৎকার্য্যের জন্য এরূপ দানেও দেশের উপকার হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত এই প্রকার প্রলোভনই তাঁহাদিগের দানশক্তিকে পরিচালিত করিতে থাকে, তাহাহইলে কিছুদিন পরে দেশের নিঃস্ব অনাথগণ আর মুষ্টিভিক্ষা লাভেও সমর্থ হইবেন না, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি সমাদর একেবারেই অনাবশ্যক প্রতীয়মান হইবে। বঙ্গ দেশে এমন একদিন ছিল যখন অতিথি সৎকার মহাপুণ্যের কার্য্য বলিয়া গৃহস্থগণের বিশ্বাস ছিল, এমনও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, যেদিন গৃহে কোন অতিথির আবির্ভাব না হইত, গৃহস্থ সেদিন নিতান্তই নিরর্থক গেল বলিয়া মনে

করিতেন। বাঙ্গলাদেশের লোকের হৃদয় হইতে এই প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে, এমন কি অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে গৃহে আশ্রয়দান করা একালে অনেকে মহা নির্ব্বোধের কার্য্য মনে করেন। এই সকল কারণে বঙ্গগৃহে আর তেমন অতিথির সমাগম হয় না। দেশভ্রমণের নানাবিধ সুবিধা হওয়াতে অতিথির সংখ্যারও অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে, নিতান্ত বিপদে না পড়িলে এখন আর কেহ কাহারও গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য প্রার্থনা করে না। কিন্তু পথ ঘাট বর্জ্জিত এই হিমাচল বক্ষস্থিত সম্ভপ্ত দুর্গম পল্লী সমূহ সম্বন্ধে একথা খাটে না, এখানে অনেক প্রবাসী পান্থকেই বাধ্য হইয়া পরগৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইতে হয়। গৃহস্বামিগণও তাহাদিগকে আহার ও আশ্রয় দান একটি প্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই রায় বাহাদুর বা রাজা খেতাব লাভের আশায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক এক বাণ্ডিল কোম্পানীর কাগজ দান করেন না, মিউনিসিপালিটীর কমিশনর কিম্বা জেলা বোর্ডের মেম্বর হইবার আগ্রহ তাঁহাদের নাই, চাঁদার খাতায় তাঁহাদের সহিও দেখা যায় না, কিন্তু স্বয়ং অনাহারে থাকিয়াও গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আতিথ্য সৎকারে কোন দিন তাঁহাদের বিরাগ নাই। আর ইহাঁদের সামর্থ্যই বা কতটুকু।—আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ঐ যে জমীদারটি—পরিচয়ে বুঝিতে পারিলাম ইনি বেশ একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার, কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গিতে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই, জমীদারীর আয় হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায় না, কারণ ইঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশের জমীদার। আমাদের সমতল ভূমির জমীদারের ন্যায় কমলা দুই হস্তে ধন ধান্য বিতরণ করিয়া ইঁহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন না। হিমালয় অতুল সৌন্দর্য্যের আকর, হিমালয়ের নিভৃত পাষাণ বক্ষের ভিতর প্রসন্ন সলিলা প্রেম মন্দাকিনী অবিরল নির্ঝর ধারায় প্রবাহিতা, হিমালয়ের অপরিজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত অন্ধকার গহ্বরে কত মণিমুক্তা, কত কুবেরের ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য রাশি রাশি মণিমুক্তা সঞ্চিত আছে, কিন্তু হিমাচলের পাষাণ বক্ষে শস্যোৎপাদনের কোন সুবিধা নাই, চাষ করিবার উপযুক্ত জমি প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না, তথাপি উহারই মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অধিবাসিগণ গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য বৎসরান্তে উৎপাদন করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে, তদ্দারা অতিথি সৎকারও করিয়া থাকে। প্রজার যেখানে এইরূপ অবস্থা সেখানে সেই সকল প্রজার ভূস্বামী জমীদারগণের অবস্থা যে কিছু মাত্র সচ্ছল নহে, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং বলাবাহুল্য আমাদের এই জমীদার মহাশয়ের আয় অতি সামান্য, তবে তাঁহার একটা সুবিধা এই যে, তাঁহাকে রাজকর যোগাইতে হয় না। তাঁহার প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ এবং তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত আলাপে তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আমরা এখন যেখানে বসিয়া আছি ইহাও তাঁহার জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত: এই স্থানটির নাম ডাক চওড়া। নামের ডাক খুব চওড়া হইলেও স্থানের জাঁক কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইল না, কিন্তু এজন্য স্থানটির প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করা যায় না। আমাদের বীরশূন্য বঙ্গদেশে আজকাল অনেক বীরেন্দ্র নাথ অনেক বিদ্যাশূন্য বিদ্যাবাগীশ এবং দৃষ্টিশক্তিশূন্য পদ্মলোচন দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশে ভূসম্পত্তিহীন ধনবান্ কেবল চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর মাত্র সম্বল করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাবে সম্মানিত হন, সে দেশে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য উপত্যকা যতই সংকীর্ণ হউক, তাহার নাম ডাক চওড়া হইলে সে নামের স্বার্থকতা সম্বন্ধে কাহারও কটাক্ষপাতের অধিকার নাই।

আমাদের আহারের কি বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য জমীদার মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার জমীদারীর মধ্যে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সাধু সন্ন্যাসী যে আহারাভাবে কষ্ট পাইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য, একথা তাঁহার কথার ভাবেই বুঝিতে পারিলাম। আমরা দেখিলাম, আহারের কোন আয়োজন করিয়া উঠিতে পারি নাই, তাঁহার নিকট এ কথা প্রকাশ করিলে তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, অথচ সে ব্যস্ততার কাহারও কোন লাভ নাই। আগ্রহ মাত্র সম্বল করিয়া মানুষ সকল সময় অভীষ্ট সাধন করিতে পারে না, বিশেষতঃ সম্বলশূন্য অবস্থায় এরূপ জন মানব বর্জ্জিত পাহাড়ের দুর্গম বক্ষে। তথাপি তাঁহার আগ্রহাতিশয্য

বলিতে হইল, সঙ্গে নিজের দেহ এবং বষ্টি ও কম্বল ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী নাই, এখানেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সুতরাং আমরা আহারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুস্থির চিত্তে কাল যাপনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, যার ক্ষুধা তৃষ্ণাতে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াইত এ ভীষণ পথে বাহির হইয়াছি, এ অবস্থায় অতিথি সৎকারের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা অনাবশ্যক।

কিন্তু মানুষ এ পৃথিবীতে আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক কাজও করিয়া থাকে, জমীদার মহাশয় অল্প কালের মধ্যেই তাহার নজীর প্রকাশ করিলেন; আমাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা শেষ হইলে তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে ডাক বাঙ্গালোর বারান্দা হইতে নামিয়া গেলেন, কোথায় কি অভিপ্রায়ে যাইতেছেন তাহা প্রকাশ করিলেন না, আমরাও অবশ্য তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য জ্ঞান করিলাম। কৌতূহলের সহিত নীরবে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি দোকানদারের রুদ্ধ দ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার তালাটা একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। তিনি যে পরের ঘরের তালা এভাবে পরীক্ষা করিবেন, এ সম্ভাবনা একবারও আমার কল্পনায় উদিত হয় নাই, এ অধিকার তাঁহার কতটুকু আছে তাহাও জানিতাম না। কিন্তু তিনি জমীদার মনুষ্য, পার্ব্বত্য প্রদেশের অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন ভূস্বামী—প্রজা পুঞ্জের জরু গরুর উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব—তিনি ইচ্ছা করিলে একটা দোকানের তালার উপর তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবেন, ইহা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে। আমার নিকট এই দৃশ্য যতই বিস্ময় উৎপাদক হউক, তাঁহার পাইকগণ এ ব্যাপার দেখিয়া বিন্দুমাত্র ও বিস্ময় প্রকাশ করিল না। জমীদার মহাশয় বারকত তালাটা ধরিয়া টানাটানি করিয়া একটু দাঁড়াইয়া একবার কি চিন্তা করিলেন, বোধ হয় কিং কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার জমীদারীর মধ্যে তাঁহার সম্মুখে সাধু সন্ন্যাসী সারা বেলা অভুক্ত থাকিবেন, আর তিনি গৃহে ফিরিয়া পরম হৃষ্ট চিত্তে ও প্রসন্নমনে ডাল রুটির ব্যবহার করিবেন, আমাদের বঙ্গদেশের লক্ষপতি গণের চক্ষে ইহা বিসদৃশ না ঠেকিলেও, হিমালয়-বক্ষ বিহারী সেই সরল হৃদয় সাধুভক্ত অশিক্ষিত জমীদারের নিতান্তই রুচি বিরুদ্ধ মনে হইতেছিল। কিন্তু পরের ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না, তাই তিনি দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া কতক্ষণ চিন্তা করিলেন। অবশেষে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলী পুটে প্রকাশ করিলেন, যদি আমরা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করি তাহা হইলে তাঁহার গৃহ পবিত্র ও তাঁহার জীবন ধন্য হয়। জমীদার মহাশয়ের গৃহ পবিত্র ও জীবন ধন্য করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, বিশেষতঃ ক্ষুধার আতিশয্য অনুসারে তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে হইয়াছিল; কিন্তু তখন আমার উপর মধ্যাহ্ন সূর্য্য সুতীব্র কিরণ জাল বর্ষণ করিতেছিলেন, পথের প্রস্তর খণ্ড অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দেহেও ক্লান্তির অভাব ছিল না, সুতরাং অগত্যা ক্ষুধা নাশের সুখ অপেক্ষা বিশ্রামের শান্তিই তখন প্রার্থনীয় বোধ হইতেছিল; সুতরাং সেই মধ্যাহ্ন কালে এত কষ্ট সহ্য করিয়া তিন মাইল পথ আহারের প্রলোভনে নামিয়া যাওয়া কিছু মাত্র বাঞ্ছনীয় জ্ঞান হইল না। জমীদার মহাশয় শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। বোধ হয় কোন সাধু সন্ন্যাসীর মুখে তিনি আহারের প্রতি এতখানি ঔদাসিন্যের কথা আর কখনও শ্রবণ করেন নাই, তাই পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, সামান্য পথশ্রমের জন্য মহা প্রাণীকে এত কষ্ট দেওয়া কখন সঙ্গত নয়, তাঁহার গ্রামের পথ যেরূপ সিধা তাহাতে আমরা অতি সহজেই অল্প কালের মধ্যে লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্তু আমি সর্ব্বত্যাগী সংযম-পরায়ণ সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিলাম, বলিতে কি শ্রীচরণদ্বয় তখন এই গুরুদেহ ভার বহনে অসম্মত হইয়া বসিয়াছিল, আর পথের সুগমতা সম্বন্ধে তিনি যতই ভরসা প্রদান করুন, এ অঞ্চলের পথ ঘাট সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না, এদেশের এক ক্রোশের পথও জানি, সোজা পথ যে কেমন সরল হইয়া থাকে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই; তাই সবিনয়ে তাঁহাকে জানাইলাম যে এমন ছায়া-শীতল আশ্রয় স্থান ও নিশ্চিত অনাহার পরিত্যাগ করিয়া আমি অনিশ্চিত আশ্রয় ও নিশ্চিত আহারের সন্ধানে আর ছুটিতে পারি না। বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বিশ্রাম ভোগ করা যাইতেছে।

জমীদার মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন, এমন আহার-

সুখবিমুখ সাধু দেখিয়া তাঁহার ভক্তি নদীতে প্রবল জোয়ার বহিল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া গোবধ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বিনাশ প্রদানের যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার অনুচর পদাতিকদ্বয়কে সেই দোকানের তালা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা অবিলম্বে বিনা সঙ্কোচে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল, দুই মিনিটের মধ্যে দোকানের দ্বার উন্মুক্ত হইল, জমীদার মহাশয় তাঁহার অনুচর দ্বয়ের সহিত দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা কৌতূহল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহাদের অনুষ্ঠান দেখিতে লাগিলাম। জমীদার মহাশয়ের আদেশ ক্রমে পদাতিকদ্বয় সেই দোকানী শূন্য দোকান হইতে যথেচ্ছা পরিমাণে আটা, ডাইল, ঘৃত, লবণ ও লঙ্কা বাহির করিয়া আমাদের সম্মুখে সংস্থাপন করিল। আমার পাপ যে একেবারেই হয় নাই তাহা বলিতে পারি না, কারণ আমাদের ক্ষুধার পরিমাণ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহাতে আমরা লুব্ধদৃষ্টিতে সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি চাহিতে লাগিলাম, মনে হইল এই পাহাড়ের ভিতর এমন নির্ব্বান্ধব স্থানে বহুদিন আহারের এমন উপকরণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই; প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে কাহার বদন-কমল সন্দর্শন করিয়া ছিলাম তাহাও একবার চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞান একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই, তাই জমীদার মহাশয়কে জানাইলাম আমাদের মত মুসাফির লোকের এত অতিরিক্ত আটা, ডাইল, ঘৃতের কোন আবশ্যক নাই, সুতরাং দোকানদার বেচারীর এত জিনিষ নষ্ট করা যাইতে পারে না। কিন্তু জমীদার মহাশয় বলিলেন, আমাদের ন্যায় দুজন জোওয়ান সাধুর জঠরাগ্নিতে কতখানি দ্রব্য পরিপাক হইতে পারে তাহা তিনি জানেন, তাই তিনি দুবেলার উপযুক্ত রসদ বাহির করিয়া দিয়াছেন। অপরাহ্নে যদি আমরা এই বাঙ্গলায় থাকি তাহা হইলে ত আটা ঘৃত কাজে লাগিবেই, আর যদি নিতান্তই না থাকি, অর্থাৎ ছয় মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অপর ডাক বাঙ্গলায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহার আবশ্যক হইবে, কারণ সেখানে একখানিও দোকান নাই। সাধুর ভবিষ্যৎ ক্ষুধার চিন্তায় জমীদার মহাশয়কে আকুল দেখিয়া বড় হাসি আসিল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই দুর্গম দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে কেহ আমার কম্বলে দুই সের সোণা বাঁধিয়া দিলেও তাহা আমি বহিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত নহি, আটা, ডাইল, ঘি, লবণ ত দূরের কথা। শুনিয়া জমীদার মহাশয় বলিলেন পথে সোণা খাওয়া যায় না, কিন্তু দেহ ধারণের জন্য এ সকল দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক এবং এ বিষয়ে যখন আমাদের এত বিরাগ তখন আমরা কখনও ভাল সাধু হইতে পারি না, বিশেষতঃ তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবার জন্য যে সকল দ্রব্য মাপিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা পুনঃগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের নিকট পতিত হইতে পারিবেন না, অতঃপর তাঁহাকে যেন আর অন্যায় অনুরোধ না করি! অবশেষে আমি সেই আটা, ঘি, ডাইল, লঙ্কা লবণের মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বড় সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। আমার কথা শুনিয়া তিনি মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, আমরা বোধ হয় কোন কালেই গৃহী ছিলাম না, গৃহীর দ্বারে সন্ন্যাসী বা সাধু আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করার পর গৃহীর প্রদত্ত দ্রব্যাদির দাম জিজ্ঞাসা করা কেবল গৃহীর অপমান করা নয়, তাহাতে আতিথ্য ধর্ম্মও কলুষিত হয়, আমাদের আশীর্ব্বাদে সাধু সেবার এই সামান্য উপকরণের মূল্য প্রদানের সামর্থ্য তাঁহার আছে, আর সামর্থ্য না থাকিলেও তিনি ভিক্ষা করিয়া সেই মূল্য সংগ্রহ করিতেন। হায় জননী বঙ্গভূমি! তোমার সুফলা সুজলা শস্যশ্যামলা ক্রোড়ে বিলাসপটু অপব্যয়ী জমীদার পুঙ্গবগণের মধ্যে এমন সহৃদয় অতিথিবৎসল জমীদার কয়জন আছেন? আমরা সুশিক্ষিত, সুসভ্য, আলোক প্রাপ্ত, আর ইহারা অশিক্ষিত, ঘোর মূর্খ, অসভ্য !!! এতদিন পরেও শিক্ষা সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলাম, জমীদার মহাশয়ের শেষ কথাটায় আমাকে বড় অপ্রতিভ হইতে হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম, ভদ্রলোক আমার কথায় মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া, আমরা জমীদার মহাশয়কে আর এখানে বিলম্ব করিতে নিষেধ করিলাম বিশেষতঃ তাঁহাকে অনেকদূর যাইতে হইবে। তিনি তাঁহার সঙ্গী পেয়াদা দুজনের মধ্যে [illegible] আমাদের 'রসুই উসুই বানানেকো' [illegible] দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার [illegible] পথে [illegible] যাইবার

সময়েও যাহাতে 'সাধু লোগোঁকো সেবা আচ্ছিতরে' হয় তাহারি জন্য তাঁহার পেয়াদাকে সাবধান করিতে ভুলিলেন না। দোকানদার দোকানে না আসা পর্য্যন্ত দোকানের খবরদারি করিবার হুকুমও দান করিয়া গেলেন।

প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য পদাতিকবর দুই জনের আহারোপযোগী আটা ভিজাইল। আমি বলিলাম, ও আর রাখিবার দরকার নাই, বিলকুল্ আটা ভিজাইতে হইবে। সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মনিব সাধুকে দেবতার মত ভক্তি করিয়া গেলেন, আর সে সামান্য ভৃত্য হইয়া সেই সাধু মহাত্মার কথার প্রতিবাদ করিবে, পাহাড়ী ভৃত্যের এত সাহস না থাকিলেও সে যাহা বুঝিল না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না, জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্ত আটা পাঁচ জনের খোরাক, এত আটা কেন ভিজাইব ?" আমি বলিলাম "আমাদের খোরাকও অল্প নহে।" অগত্যা সে বেচারা সমস্ত আটা ভিজাইয়া লইল, ভিজাইতে ভিজাইতে দুই একবার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দেহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল। যে উদরে এত আটা, ডাইল ঘৃত ও লবণের স্থান হইতে পারে, সে উদরের পরিধি সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা করাই বোধ হয় তাহার কটাক্ষপাতের উদ্দেশ্য।

আটা ভিজান শেষ হইলে, পেয়াদা সাহেব সাধু সেবার জন্য দোকান হইতে দোকানীর থালা বর্ত্তন বাহির করিয়া আনিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই অতি উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের সৃষ্টি হইল—আটার পুরু পুরু রুটি, আর খোসাওয়ালা কড়াইয়ের ডাল। ঘৃত, লঙ্কা ও লবণ সংযোগে তাহা অমৃতের ন্যায় উপাদেয় হইয়া উঠিল, আমরা মহানন্দে যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্তির সহিত ভোজনকার্য্য শেষ করিলাম, পেয়াদাও তাহার যথাযোগ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। আহারের সময় একবার ভগবানের করুণার কথা মনে পড়িল, মনে হইল তাঁহার কৃপায় কি না হইতে পারে ? তাঁহার ইচ্ছায় মরুভূমিতে বারিবর্ষণ হইতে পারে, শ্মশানে কুসুম ফুটিতে পারে, জন্মান্ধের নয়ন উন্মিলিত হয়, এমন কি, জনমানবশূন্য খাদ্যসামগ্রী লাভের সম্ভাবনা বিরহিত সমুন্নত গিরি-বক্ষে আটা, ঘি, ডাল, লবণ লঙ্কা দিয়া মহা সমারোহে সন্ন্যাসী-ভোজনও হইতে পারে—আজ ত তাহা প্রত্যক্ষই করিলাম। তথাপি তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি না, তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না, বিপদের মেঘে চারিদিক সমাচ্ছন্ন দেখিলে কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া বলি, "হে ভগবন্! তোমার বিচার নাই, আমার ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তি টুকু নষ্ট না করিলে তোমার বিশ্ব নিয়ম কি ব্যর্থ হইয়া যাইত ?'—হায়, "তাঁহারই দেওয়া সুখ, তাঁহারই দেওয়া দুঃখ" সমান সহিষ্ণুতার সহিত উপভোগ করিতে পারি না কেন ?

আহারাদির পর গৃহপ্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া মনে মনে এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, আর পার্শ্বশায়িত সঙ্গীটির বিকট নাসাগর্জ্জন তাঁহার উদরের পরিতৃপ্তি ও সুখ-সুপ্তির অকাট্য যুক্তি বহন করিয়া আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

শ্রীজলধর সেন।

তিন মিত্র।

১। আমরা অনেক সময়ে চিন্তা করি, কিরূপে আমাদের দুর্দ্দিন ঘুচিবে ? এই অধঃপতিত জাতি কি প্রকারে আবার উন্নতির উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবে ? স্বজাতির প্রতি ভালবাসা মানবের অন্তরের এক স্বাভাবিক ভাব, এবং এ ভাব নিন্দনীয়ও নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন স্বীয় পরিবারের প্রতি বিশেষ ভালবাসা আছে, স্বজাতির প্রতিও সেইরূপ একটা বিশেষ প্রাণের টান আছে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, সে আবার কি ? মানবজাতির প্রতি প্রেম থাকিলেই হইল, আবার একটা জাতীয়তার গণ্ডী দিবার প্রয়োজন কি ? আমরা কিন্তু এরূপ বিশ্বজনীনতার পক্ষপাতী নহি। যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই পরিবার, সেই দেশের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্বন্ধ অবশ্যই আছে, এবং বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, বিশেষ ভালবাসাও আছে। ইহা সংকীর্ণত্ব নহে, বিশেষত্ব। কোন ব্যক্তি যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহা যদি সে বিশ্বপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া জগতের সকল লোককে বিলাইয়া দেয়, আর যাহাদের ভার বিশেষভাবে তাহার স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে, সেই জনক জননী, স্ত্রী পুত্র অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার অধর্ম্মই হয়, ধর্ম্ম হয় না।

হয় না। ঈশ্বর যে বিধি আমাদের প্রকৃতিতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা কদাপি ধর্ম্ম নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গলকর। এ জগতে সকলেই যদি সকলের জন্য ভাবে, কেহ যদি বিশেষভাবে কাহারও জন্য না ভাবে, তাহা হইলে আর সংসারে দায়িত্ববোধ বলিয়া একটা জিনিষ থাকে না, এবং অবশ্যম্ভাবিরূপে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি অসম্ভব হইয়া পড়ে; শিশুগণ নিঃসহায় হয়, বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, দেশের বাণিজ্য, ব্যবসায়, শিক্ষা সকলই নষ্ট হইয়া যায়; কারণ যাহা সকলের কাজ তাহা কাহারই কাজ নহে। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? যে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি প্রেম যত প্রবল, সে জাতি তত উন্নত। কার্য্যে আমরা নিজ নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, মুখে কেবল "ভারত" "ভারত" বলিয়া চীৎকার করি। যে প্রেম থাকিলে দেশের জন্য মহামতি ম্যাট্‌সিনির ন্যায় ফকির হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতে হয়, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হয়, প্রাণটাকে অনায়াসে অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিতে পারা যায়, সে প্রেম কোথায়? যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে এত বিলাস দেখিতাম না, এত বাক্যব্যয় দেখিতাম না, নীরবে সকলে বিন্দু বিন্দু শরীরের রক্ত দিয়া দেশের সেবা করিতাম। হায়! সে প্রেম কোথায় পাই, কিরূপেই বা জাগে?

২। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলেরই জন্য আছে। আমাদের হিমাচল, আমাদের সিন্ধুকাবেরী, য়ুরোপীয়দিগকেও তৃপ্তি ও আনন্দ দান করে; পক্ষান্তরে য়ুরোপের আল্‌প্‌স্ ও আমেরিকার নায়েগ্রাও ভারতবাসী পর্য্যটকের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এক পদার্থ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলেরই পক্ষে সব বস্তুকে মধুময় করিয়াছে। ভারতের প্রচুর শস্যশালিনী ভূমি ইংলণ্ডের মুখে অন্ন দিতেছে, আবার ইংলণ্ডের শিল্প আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতেছে, এমন কি আমাদের ঘরে প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বালিয়া দিতেছে। আমাদের ঋষি য়ুরোপে যাইয়া য়ুরোপীয়দিগকে অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন; য়ুরোপের উইলবারফোর্স ও ড্যামিয়ন আসিয়া আমাদিগকে নরসেবা শিক্ষা দিতেছেন। আমাদের কালিদাস য়ুরোপে পূজিত, য়ুরোপের সেক্সপিয়র আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। য়ুরোপের ম্যাট্‌সিনি, হ্যামডেন্ আমাদের অন্তরে স্বদেশপ্রিয়তা জাগাইতেছেন, আমাদের সন্ন্যাসিগণ য়ুরোপীয়দিগকে বিকৃত স্বার্থ-বিষাক্ত জাতীয়তার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বিশ্ব-প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং আমাদের দেশে যাহা আছে তাহাই ভাল ভাবিয়া জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে চলিবে না; পরন্তু যে দেশে যে উন্নতি হইয়াছে ও হইবে তাহাই আনিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে নিয়োগ করিতে হইবে, নতুবা জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যে জাতি যাহা কিছু পায় তাহা জগৎপিতা ঈশ্বরের নিকট হইতেই পায়, সুতরাং তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে। পাছে বিদেশীয় আলোক প্রবেশ করে, এই ভয়ে সর্ব্বদা হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, দিন দিন ঘন অন্ধকার আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিবে, নিজের ক্ষীণালোক ক্রমে মন্দীভূত হইয়া অবশেষে একেবারে নিভিয়া যাইবে।

৩। অনেকের মনে জাতীয় বিদ্বেষ অতিশয় প্রবল। ইংরাজ ফরাসীর নাম শুনিতে পারে না, ফরাসী ইংরাজের উপর সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত। প্রবল প্রতাপান্বিত য়ুরোপীয় জাতিগণ যেন পরস্পরকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, এবং অকারণে দুর্ব্বলজাতিদিগের সহিত কলহ বাধাইয়া তাহাদের দেশ ও স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করিয়া দিতেছে! ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়; ইঁহাদের সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও ইঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, যে সকল জাতিরই স্বার্থ এক, জগতের উন্নতিই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং এক জাতিকে বিনাশ করিয়া অপর জাতির উন্নতি হইবে না, সকলে হাত ধরা ধরি করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে উঠিতে হইবে। মানবের প্রতি প্রীতিহীন হইয়া, ঈশ্বরকে ভুলিয়া, নরশোণিত পান করা কদাপি সভ্যতা নহে; বস্তুতঃ ভক্তি, প্রীতি ও সভ্যতা একই পদার্থ, তাহার মধ্যে দমদম্ বুলেট্ ও ম্যাক্‌সিম্ গানের কোন স্থান নাই।

এখন প্রশ্ন এই,—কোন জাতিই যে জগতের অন্যান্য জাতিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারেন না, এই মহৎ উজ্জ্বল সত্যটা তাঁহারা অনুভব করেন না কেন? ইতিহাস ত এই সত্যটাকে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া

দেখাইয়া দিতেছে। জগতে যে জাতি এক সময়ে উন্নত ছিল, কালক্রমে তাহার অধঃপতন হইয়াছে, আবার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিও সময়ে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে। সাগর-তরঙ্গের ন্যায় জগতে এইরূপ উত্থান পতন চিরদিনই দেখা যাইতেছে। কোন জাতি যতই উন্নত হউক না কেন, অন্যান্য জাতির সহিত নানা সূত্রে তাহার যোগ অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং হীনজাতিকে উন্নত করিতে না পারিলে উন্নত জাতিকেও ক্রমশঃ হীনতা প্রাপ্ত হইতে হয়, কারণ যোগে ভাবের বিনিময় অনিবার্য্য। এরূপ অধোগতি হইতে কি জাতি, কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। চীন দেশীয় উন্নত প্রশস্ত প্রাচীর তাহাকে অন্যান্য দেশ হইতে বিযুক্ত করিয়া বহির্বালোককে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই ; সুতরাং বিশাল চীনরাজ্য আজ বিদেশীয়দিগের কুক্ষিগত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব যোগেও রক্ষা নাই, বিয়োগেও রক্ষা নাই, রক্ষা কেবল পরস্পরের উন্নতি সাধনে।

সমগ্র জগৎ এক মহা বিধানের অন্তর্গত, এক মহাসত্য, মহাসংকল্প—সকল মানবকে, সকল জাতিকে একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে,—এই সত্য দর্শন করিলে, জাতীয়, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সমস্ত বিদ্বেষ দূর হয়, ভ্রাতৃভাব আইসে, এবং সব সত্যকেই সেই মহাসত্যের অন্তর্গত জানিয়া, তাহাদের মধ্যে যে স্বাভাবিক যোগ আছে তাহা অনুভব করিয়া, আমরা নিঃস্বার্থ, পবিত্র ও উৎসাহান্বিত হইয়া আত্ম-কল্যাণ-সাধনে ও জগতের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন সত্যকে গ্রথিত করিয়া এক করিতে হয় না, তাহা প্রিয়দর্শন সুস্নিগ্ধ গোলাপের পত্রের ন্যায় স্বভাবতঃ একত্র সমাবিষ্ট ও নিত্যযুক্ত হইয়াই আছে, কেবল সেই যোগ দেখিতে পাইলেই হইল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত

সমালোচনা।

পট।*

'পট' একখানি গল্প পুস্তক। লেখক শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় মাসিক সাহিত্যের পাঠকবৃন্দের নিকট অপরিচিত নহেন। গল্প রচনায় দীনেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠা আছে ; তাঁহার চিত্রিত "পটে" সেই প্রতিষ্ঠার হানি হইবে না, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

'পট' ছয়টী ডিটেক্‌টিভ গল্পের সমষ্টি। পুস্তকের ভূমিকায় দীনেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "বাঙ্গলায় ভাল ডিটেক্‌টিভের গল্প নাই" এ কথা বোধ হয় আমাদের শিক্ষিত পাঠকগণ অস্বীকার করেন না। চেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পাঠকগণ এই পুস্তকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।" দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাই বলুন, 'পট' পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় না। সত্যই বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে আমরা এরূপ সংযত ভাষায় লিখিত, বর্ণনা নৈপুণ্যে অলঙ্কৃত, সুরুচি সঙ্গত ডিটেক্‌টিভের গল্প পাঠ করি নাই। এ পুস্তকখানি যে বাঙ্গলা ডিটেক্‌টিভের গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রেষ্ঠ বলিতেছি কেন, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করা বাহুল্য নহে। আজকাল ডিটেক্‌টিভ গল্প বলিলেই ইংরেজী অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠক কুৎসিত প্রণয়-রহস্য, পাপের বীভৎস কাহিনী, প্রতারণা প্রবঞ্চনার লোমহর্ষণ চিত্র, ঘৃণিত হত্যাকাণ্ড, পাপের পৈশাচিক দৃশ্য প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারেন না। এ জন্য তাঁহাদের অপরাধ নাই ; তাঁহারা এইরূপ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠেই অভ্যস্ত। ডিটেক্‌টিভ্-কাহিনী পাপচিত্র যে না হইতেও পারে, কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে পারে, বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারে, তাহা "পট" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'পটের' প্রধান গুণ এই যে, ইহার রুচি মার্জ্জিত; কোন স্থানে এরূপ একটী শব্দ নাই, যাহা আপত্তিজনক, বা যেজন্য এই পুস্তক গৃহ-লক্ষ্মীগণের হস্তে অসঙ্কোচে দেওয়া যায় না। বঙ্গরমণীগণ অনায়াসে ইহা পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, গ্রন্থকারের ইহাই প্রধান কৃতিত্ব।

ইহা ভিন্ন 'পট' রচনায় গ্রন্থকারের অন্য প্রকার কৃতিত্বও পরিলক্ষিত হয়। বর্ণন-কৌশলে দীনেন্দ্র বাবু যে সিদ্ধহস্ত, তাহা পাঠকগণের অগোচর নাই ; এই বর্ণনার গুণেই 'পটের গল্পগুলি ঠিক সত্যঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই বোধ হয় গ্রন্থকার, পুস্তকের নাম "পট" রাখিয়াছেন।

"হত্যা রহস্য"—গল্পটী একটী বৃদ্ধা রমণীর আত্মজীবন কাহিনীর একাংশ। এই গল্পটী আমাদের সকল অপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে—ভাল লাগিবার প্রধান কারণ বর্ণনার মাধুর্য্য, দ্বিতীয় কারণ গল্প রচনার কৌশল। বাঙ্গলা ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাস সমূহে ইংরাজীর আদর্শে উপন্যাসের নাটকগণকে চোর ডাকাত ধরিবার জন্য গোয়েন্দাগিরি করিতে দেখা যায় ; কিন্তু তাহার ভিতর বৃদ্ধা রমণীর অবতারণা এমন অস্বাভাবিক হইয়া উঠে, যে তাহা কোন প্রকারে খাপ খায় না,—যেন বিলাতী মেয়ে ডিটেক্‌টিভ বাঙ্গলা দেশের উপন্যাসের মধ্যে সাড়ী পরিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু এই 'হত্যারহস্যে' গল্পের নায়িকা কুসুমকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না, যে বঙ্গালীর কন্যা বঙ্গবধু নহে। প্রিয়তমকে প্রথম বিদেশে বিদায় দিবার সময় কুসুমের মনের ভাব, তাহার অন্তর্বেদনা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। গল্পের নায়িকা কুসুম বলিতেছেন—

"সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে নগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, আমি অশ্রুপূর্ণনেত্রে, কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। বসন্তের মৃদু সান্ধ্য সমীরণ হিল্লোলে বৃক্ষ পত্র মর্ম্মরিত হইতেছে, আম্র বাগানে অন্ধকার ক্রমে নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ অবিরাম ঝঙ্কার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিতেছে. এবং বৃক্ষপত্রে, ঝোপের আড়ালে, বাগানের মধ্যে শত শত জোনাকী মিট্ মিট্ ক

---

* শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য ; মূল্য একটাকা চারিআনা।

জ্বলিয়া সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারে সহস্র চক্ষুর স্পন্দন দীপ্যমান করিয়া তুলিতেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী কতক্ষণ আমি বিহ্বল-চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে মনটা একটু শান্ত হইলে, উজ্জ্বল নক্ষত্র-পূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে বলিলাম, 'ভগবন্ নগেন্দ্রকে কুশলে রাখিয়ো ; আমি আর কিছু চাহিনা।' এ দৃশ্য পল্লীগ্রামের এবং এ চিত্রমাধুরী-মণ্ডিত বঙ্গবধূর।

বাঙ্গলা দেশের পাঠক সাধারণের সম্মুখে সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গলা ডিটেক্‌টিভ গল্প সংগৃহীত দেখা যায়, তাহা যে শিক্ষিত পাঠকের আনন্দ-প্রদ হয় না, তাহার প্রধান কারণ তাহার ভিতরে 'আর্ট' নাই ; হয়ত তাহার ভিতর ডিটেক্‌টিভ গল্পের সমস্ত উপাদান ভাদ্রের কুলপ্লাবিনী তরঙ্গভঙ্গময়ী ভাগিরথী বক্ষে আলুলায়িত-কুন্তলা রমণীর লম্ফ প্রদান, খড়্গাঘাতে নিদ্রিত দস্যুর শিরশ্ছেদন করিয়া কোন বিপন্না রমণীর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতন, এই রকম অসংখ্য বিষয় আছে, যাহা সাধারণ পাঠক নিশ্বাস রোধ করিয়া পাঠ করেন, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান, কিন্তু গল্প রচনার যাহা 'আর্ট', তাহার অভাবে সে গল্পগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া থাকে। চুরী, ডাকাইতি, নারী নির্য্যাতন, প্রভৃতি ব্যতীত আরও অনেক ব্যাপার যে ডিটেক্‌টিভের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের বিষয় হইতে পারে, দীনেন্দ্র বাবু তাঁহার 'প্লটে' তাহা দেখাইয়াছেন। তাহার 'চক্ষুদান' 'হত্যা-রহস্য' 'জাল ডিটেক্‌টিভ' প্রভৃতি গল্প পাঠ করিয়া যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে পারা যায় ; তাঁহার গল্প লেখার বিড়ম্বনা পাঠ করিয়া অতি গম্ভীর প্রকৃতি পাঠকেরও হাস্যোদ্রেক হয়। পুস্তক খানির ভিতর ও বাহির উভয়ই সমান হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি আমরা দীনেন্দ্র বাবুকে ক্ষমা করিব না। মাসিক সাহিত্যে যিনি পরিচিত চিত্র আঁকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পাঠকগণকে মুগ্ধ করিয়া দেন, যাঁহার 'জমিদারের' ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস-বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য ও আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে, তিনি ডিটেক্‌টিভের গল্প দিয়া বাঙ্গালী পাঠককে ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে যিনি বঙ্গ ভাষার বরাঙ্গ হীরক-খচিত স্বর্ণাভরণে সজ্জিত করিতে পারেন, তিনি আজ একখানি ডাকের গহনা হাতে করিয়া ছেলে ভুলাইতে আসিয়াছেন, ইহা অসহ্য,—দীনেন্দ্র বাবুর এই কৃপণতা ক্ষমার অযোগ্য।

জীবজন্তু :—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ।।৹ টাকা। ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুকসোসাইটি হইতে প্রকাশিত।

সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখান যেমন পিতামাতার একটি চিন্তার বিষয়, তেমনি তাহাদিগকে পাঠ্যপুস্তক যোগানও একটি চিন্তার বিষয়। উহাদের ক্ষুধা অগাধ ; কৌতূহল ততোধিক। কৌতূহল মনের ক্ষুধা। শারীরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি যেমন আবশ্যক, মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি তেমনি আবশ্যক। প্রথমোক্তটিকে খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা সহজেই সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু শেষোক্তটিকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। একটি সপ্রতিভ শিশুর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যিনি একদিন মাত্রও চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই আমাদের এই মন্তব্যের সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। অবিশ্রান্ত আহার যোগাইয়াও এই মানসিক ক্ষুধা দূর করা যায় না ; এদিকে আবার খাদ্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসতর্ক হইলেই উৎকট রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

এই জন্যই সন্তানেরা লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিবামাত্র এই চিন্তা উপস্থিত হয়, যে ইহারা কি পড়িবে ? স্কুলে গিয়া তাহারা কি পড়িবে, সে চিন্তা ততটা করিতে হয় না। কিন্তু স্কুলের বাহিরে কি পড়িবে, ইহাই প্রধান ভাবিবার বিষয়। পিতামাতার এদিকে দৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা উপযুক্ত গৃহপাঠ্য পুস্তকের জন্য ব্যস্ত হন। যদি এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি না থাকে, তবে যে ছেলেদের কেবল স্কুলের পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক পড়া বন্ধ হইয়া যায় তাহা নহে, তখন তাহারা যাহা পায় তাহাই পড়ে, এবং তজ্জন্য অনেক সময় তাহাদের গুরুতর অনিষ্ট হয়।

কয়েক বৎসর যাবৎ বালক বালিকাদিগের জন্য অনেকগুলি গৃহপাঠ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। এই সকল পুস্তকের লেখকগণের নিকট বাঙ্গালার প্রত্যেক সন্তানবান্ ব্যক্তি ঋণী। এরূপ পুস্তকের প্রচার আরো অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"এরূপ" শব্দটা অতিশয় সাধারণ ভাবেই এ স্থলে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'শিশুদিগের পাঠোপযোগী' এই কথা বলাই আমার অভিপ্রায়। তদ্ভিন্ন, আজকালকার এই শ্রেণীর অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তকই যেরূপ কেবলমাত্র খেলার পুস্তক হইয়া দাঁড়াইতেছে, সকল পুস্তকই সেইরূপ হওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই সকল পুস্তক পাইয়া আপাততঃ বালকবালিকাগণ যতই সন্তুষ্ট হউক না কেন, ইহাদের স্থায়ী মূল্য বড় অধিক নহে। ইহাদের দ্বারা শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের কতদূর সৌষ্ঠব ও পুষ্টি হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

এরূপ গ্রন্থ যাঁহারা লিখিতেছেন, তাঁহাদের কলম কাড়িয়া লওয়ার কথা হইতেছে না। উঁহারা স্বচ্ছন্দে এই সকল পুস্তক রচনা এবং প্রচার করিতে থাকুন, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে এতদপেক্ষা সারবান্ গ্রন্থসকল প্রচারিত হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমি নীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ক গম্ভীর বক্তৃতা পুস্তকের কথা বলিতেছি না। এরূপ পুস্তক অনেক সময় শিশুর জনকজননীর চিত্তকেই আকৃষ্ট করিতে পারে না, শিশুর নিজের কথা আর কি বলিব। কিন্তু ইহা জানি, যে অন্যান্য ভাষায় ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইত্যাদি বিষয়ক শিশুপাঠ্য অতি উপাদেয় পুস্তক সকল আছে। কোন কল্পিত গল্পের অথবা হাস্যকৌতুকের পুস্তক তদপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক নহে। এবং ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া আমোদের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের যে উপকার হয়, গম্ভীর বক্তৃতা দ্বারা তাহা হওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই শ্রেণীর একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ; তৎসম্বন্ধে দু একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুস্তক খানির নাম "জীব জন্তু", গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। বর্ণনীয় বিষয় নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার আর কিছু বলা আবশ্যক বোধ হয় না। দেখিতেছি, এ পুস্তকে বিষয়টি শেষ হয় নাই, সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য আমরা গ্রন্থকারের নিকট এ বিষয়ে আরো কিছু আশা করিতে পারি।

বালকদিগের উপযোগী ভাষায় ধারাবাহিক প্রাণী বৃত্তান্ত বিষয়ক এমন মনোহর বাঙ্গলা গ্রন্থ আমি আর দেখি নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং শিশুদিগের রুচি, উভয়ের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পুস্তক লেখা অতিশয় কঠিন কার্য্য। এই কার্য্য এরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে গ্রন্থকারকে নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বালকগণের হস্তে যদি সকল সময় তাহাদের পড়িবার পুস্তক ক্রয় করিবার ভার থাকিত, তবে তাহারা দ্বিজেন্দ্র বাবুর এ পরিশ্রম ব্যর্থ হইতে কখনই দিত না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২০।১নং কর্টস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্থ ভাগ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৮। {১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

শোকার্ত্তা পুরী।

মহারাজ দশরথ, অযোধ্যার পতি,
কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হ'য়ে যবে
নির্ব্বাসিলা সীতাসহ প্রিয় পুত্র রামে,
সৌমিত্রি-সহায়-মাত্র, ভীষণ দণ্ডকে,
রাজ্য-অভিষেক-হর্ষ মহান্ বিষাদে
পরিণত হ'ল হায় ; দিবালোক যথা
পরিণত অন্ধকারে রবির অভাবে—
রবিকুলরবি রাম, বিহনে তাঁহার
শোকতমোমগ্না, হায়, অযোধ্যানগরী।

নিশ্চেষ্ট, নীরব, লীন নাগরীকচয়,
নিজ নিজ কক্ষে, যথা বিহঙ্গমকুল
নিরানন্দ, নীড়লীন, ত্যজিয়া কাকলী
নিশার সঞ্চারে। শূন্য পড়ি রাজপথ,
নিরন্তর যাহে লোকপ্রবাহ মহান্,
সরযূর স্রোতসম আতটপ্লাবিনী,
কলকল নাদে, হায়, বহিত উল্লাসে।
বদ্ধ বিপণির দ্বার, দ্রব্য বিনিময়
নাহি করে কেহ ; নাহি শব্দলেশ কোথা
নীরব বাদিত্র, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
প্রভাতে সায়াহ্নকালে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি
দেবনিকেতনে কেহ নাহি শুনে আর ;
সমীরণ নাহি বহে ধূপের সুবাস,
নাহি আনে দূর হ'তে শ্রবণ-মধুর
নরনারী হাস্যধ্বনি নিস্তব্ধ নিশীথে।
ধায় না পথের মাঝে হয়, হস্তী, যান
বহিয়া বিলাসপ্রিয় যুবক যুবতী
প্রমোদ-কানন-মুখে সায়াহ্ন সময়ে।

চন্দন সুরভিজলে নহে সিক্ত আর
দীর্ঘ রাজপথ চয়, ধূলায় ধূসর,
পত্রাকীর্ণ, যেন হায় শোকের মূরতি—
শ্বসিত বিষাদভরে পবন তাড়নে।
অযোধ্যার যোদ্ধৃকুল সিংহপরাক্রম
কোদণ্ড টঙ্কারে আর করে না ধ্বনিত
আকাশমণ্ডল; নহে মল্লযুদ্ধে রত;
না ছাড়ে হুঙ্কার আর হইয়া বিজয়ী,
স্ফীতবক্ষ, শুনি নিজ জয়োল্লাস ধ্বনি
ধ্বনিত সহস্র কণ্ঠে। ব্রাহ্মণনিচয়
তপোধন, মহাভাগ, স্বাধ্যায়নিরত,
ব্রহ্মঘোষ নিনাদেতে করে না মুখর
কাননের বায়ুরাশি, পবিত্র নির্জ্জন।
গগন আচ্ছন্ন নহে হোমধূমে আর;
সুপবিত্র হবির্গন্ধ বহি সমীরণ
করে না প্রসন্ন চিত মধুর প্রভাতে।
যায় না উদ্যানে ক্রীড়া করিবার তরে
কুমারীনিচয়, আহা, পবিত্র, সরল,
বসন ভূষণ পরি। গৃহে কুলবালা
হাস্য পরিহাসে রত নহে সন্ধ্যাকালে,
সমাপিয়া গৃহকর্ম্ম; গাহে না অথবা
মিলাইয়া কণ্ঠধ্বনি পবিত্র চরিত
মহীয়সী মহিলার নারী শিরোমণি!
প্রাণহীন মহাপুরী, নিস্তব্ধ, ভীষণ—
মৃত্যুরাজ্যসম, যেন জীবের সঞ্চার
নাহিক কোথাও, হায়! স্পর্শিয়া গগন
দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে রাজার প্রাসাদ
মনোহর, সুবিশাল, বিচিত্র গঠন।
রুদ্ধ বহির্দ্বার তার, পিহিত কপাট;
নিশ্চষ্ট প্রহরী, ত্যজি বেত্র ধনুঃশর।
রাজসভা জনহীন, রাজসিংহাসন
শূন্য পড়ি সভামাঝে; সভাসদচয়
কে কোথায় আছে, তাহা কেহ নাহি জানে।
শুধু কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহর্ষি,
কাশ্যপাদি ঋষিগণে হ'য়ে পরিবৃত,
উপবিষ্ট এক পার্শ্বে শোকাকুল মনে।

জনশূন্য কক্ষ্যাচয়, কেবল প্রহরী
দাঁড়াইয়া দ্বারদেশে বিষাদিত চিতে,
কর্ত্তব্যবিরতমন; ভাবে চক্ষু মুদি,
(বৃদ্ধ দ্বারী বলিতাঙ্গ, পলিত কুন্তল)
রামের সুচারু রূপ, অমিয় বচন,
করুণ হৃদয়, মরি, দয়ার আধার—
সৌমিত্রির তেজোগর্ব্ব প্রফুল্ল মুরতি
যবে দোঁহে অন্তঃপুরে করিত প্রবেশ
বন্দিতে জননীগণে। হায়, এবে তারা,
সুকুমার রাজপুত্র, জটাচীরধারী,
ভ্রমিছে অরণ্যমাঝে, কত কষ্ট সহি'।
চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষে হবে প্রত্যাগত।
বাঁচিবে কি তত কাল, হায় রে, প্রহরী
সার্থক করিতে নেত্র, হেরিয়া দোঁহারে
রাজলক্ষ্মী সীতাসহ? ভাবিতে ভাবিতে
আকুল হৃদয় তার; ঝরিল সবেগে
অশ্রুধারা, গণ্ডদেশ কুঞ্চিত প্লাবিয়া।
এইরূপ প্রতিদ্বারে শোকের উচ্ছ্বাস।

পঞ্চ কক্ষ্যা অতিক্রমি, ষষ্ঠ কক্ষ্যামাঝে
কৈকেয়ীর অন্তঃপুর সুরম্য বিশাল।
উচ্চচূড় অট্টালিকা, সুধাধবলিত।
স্ফটিকের স্তম্ভ তাহে শোভে সারি সারি,
মণিমুক্তা প্রবালাদি খচিত হইয়া।
রত্নময় সিংহাসন শোভে স্থানে স্থানে
রম্য লতা কুঞ্জ মাঝে; বাপী সরোবর
কুমুদ কহ্লার কুবলয়ে সুশোভিত,
নিনাদিত নিরন্তর বিহঙ্গম রবে।
নিত্য পুষ্পফলপ্রসূ কত মহাতরু,
শান্ত সুশীতলচ্ছায়, শোভে দাঁড়াইয়া।
ময়ূর ময়ূরী, শুক, সারস, সারসী,
পিকবর, রাজহংস, হরিণ হরিণী,
নানাবিধ জীবজন্তু পালিত তথায়,
তুষিবারে নিরন্তর মহিষীর মন।
দিব্যধাম সম, হায়, ছিল অন্তঃপুর,
মুরজ মুরলী বীণা হইত ধ্বনিত,—

ভ্রমিত চৌদিকে কত দাসী সুবেশিনী
চঞ্চল চরণে, মরি, ধ্বনিয়া নূপুর ;—
সুমধুর হাস্যরব উঠিত নিয়ত
আনন্দলহরী তুলি অন্তঃপুর মাঝে।
কিন্তু, হায়, আজি তাহা নিস্তব্ধ, নীরব।
না উঠে হাস্যের ধ্বনি, নাহি কোলাহল ;
নিরানন্দ পশু পাখী, শঙ্কা বিজড়িত ;
কেহ নাহি দেয় ভক্ষ্য, কেহ না আদরে,
কনক পিঞ্জরে বসি ডাকে শুধু শুক,
বিকৃত কর্কশ কণ্ঠে, রহিয়া রহিয়া,
পাইতে আহার্য্য কিছু, কিন্তু, হায়, তার
করুণ প্রার্থনা কেহ করে না শ্রবণ।
ক্লান্ত মনে শেষে শুক নয়ন মুদিয়া,
নৈরাশ্যের মূর্ত্তিসম, বসে এক পাশে।

কৈকেয়ীর নিজ কক্ষ নিষ্প্রভ মলিন—
দুগ্ধফেননিভ শয্যা, আস্তরণ তার
মহামূল্য, ছিন্ন ভিন্ন র'য়েছে পড়িয়া—
কোথাও বসন পড়ি, কোথাও ভূষণ ;
পুষ্পাধারে ম্রিয়মাণ বিকচ নলিনী ;
বিশুষ্ক কুসুমমালা ভূতলে পড়িয়া।
হরিষ বিষাদে মগ্না মানিনী মহিষী ;—
ভরতের অভ্যুদয়ে প্রফুল্ল হৃদয়,
কিন্তু নৃপ নহে প্রীত, সে হেতু বিষাদ—
বিষাদ জড়িত তায় রোষ অভিমান।
নহে কি নৃপতিপ্রিয়া কৈকেয়ী মহিষী ?
নহে কি ভরত সৌম্য নৃপতিনন্দন ?
রাম রাজা হ'লে যথা হইত নৃপতি
হরষিত, নহে কেন তদ্রূপ এখন ?
ভেবেছিলা মুগ্ধা রাণী যৌবন-গরবে,
আনন্দিত হ'বে রাজা আনন্দে তাঁহার,
ফেলিবে না রামতরে বিন্দু দীর্ঘ শ্বাস,
কিম্বা অশ্রুকণা এক ; ভরতাভিষেক
মহানন্দে বিঘোষিবে, রামে নির্ব্বাসিয়া,
উঠিবে দুন্দুভিধ্বনি, হর্ষ কোলাহল,
অযোধ্যানগরী মাঝে, মাতিবে উৎসবে
নরনারী পরি চারু বসন ভূষণ।
কিন্তু সেই আশা, হায়, হ'ল না সফল ;—
যৌবনের কূটবন্ধ শ্লথ আচম্বিতে ;
রাণীর অঞ্চল হ'তে বিচ্ছিন্ন নৃপতি
সহসা ডুবিলা, হায়, শোকের সাগরে,
ছিন্নরজ্জু তরীসম, বাত্যা-অভিহত !
চমকি উঠিলা রাণী গর্ব্বিত হৃদয়
ভাঙিয়া পড়িল, আহা, ধূলির উপর—
বুঝিলা সুখের দিন অবসান তার,
যৌবনের বৃথা গর্ব্ব, বৃথা আর মান ;
ভূপতিতা তাই রাণী, ভুজঙ্গী সমান
দন্তাহতা, কাঁদে, মরি, গুমরি গুমরি।

ক্ষিপ্তপ্রায় দশরথ রামশোকে, হায় !
ম্রিয়মাণ রবি সম, রাহু ভীমরূপী
গরাসে যখন তাঁরে করাল বদনে।
অশ্রু কলঙ্কিতমুখ, নিষ্প্রভ, মলিন ;
আরক্তিম নেত্র দুটী ; স্ফীত নাসাপুট ;
অসংযত বেশভূষা ; মাথার মুকুট
খসিয়া পড়েছে কোথা ; কুণ্ডল বিহীন
কর্ণ দুটী। নাহি পায় বিশাল সংসারে
কোথাও শান্তির লেশ, জুড়াইতে প্রাণ—
দগ্ধ যাহা অহর্নিশ শোকের অনলে।
"হা রাম, হা রাম" সুধু মুখে সরে বাণী ;
কভু মূর্চ্ছা, কভু জ্ঞান, কভু মোহাবেশ ;
কভু কাঁদে, কভু গর্জ্জে, কভু রহে স্থির ;
কভু উঠে, কভু পড়ে, কভু ধায় বেগে
কৌশল্যার গৃহ হ'তে রাজপথ মুখে,
ক্ষিপ্ত চিত্ত প্রায় ; আহা, কৌশল্যামহিষী
পতিব্রতা, পুত্রশোকে কাতরহৃদয়া,
লুকাইয়া হৃদিমাঝে হৃদয়ের জ্বালা,
তোষে নৃপে প্রাণপণে সান্ত্বনা বচনে,
দুঃখিনী সুমিত্রা সহ। কিন্তু নরপতি
কিছুতেই নহে স্থির মুমূর্ষুর সম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

কৌমুদী।

এস গো অপ্সরোরূপা প্রকৃতি-শোভিনি,
সৌন্দর্য্যের জনয়িত্রী এ সৃষ্টি মণ্ডলে !
কবি চক্ষে তুমি রাণি ! বিশ্ব-বিমোহিনী !
ভুবনে ভরেছ জ্যোতিঃ মধুর উজ্জ্বলে !
ভেদিয়া মেঘের জাল দীপ্ত রাগভরে,
করে ধরি ওষধির কনক মঞ্জরী ;
উদ্ভাসিয়া দশ দিক্ নীলনভোপরে,
বাহিরিছ শশী হ'তে বিশ্ব আলো করি !
অপূর্ব্ব মহিমাময়ি ! হে সুর-সুন্দরি !
দিয়াছ ব্রহ্মাণ্ডবুকে সৌন্দর্য্য জীবন ;
নব সঞ্জীবনীরস, অমৃত লহরী,
ঢালে শিশুজীবরাজ্যে তব মাতৃস্তন !
উরিছ বিশাল দু'টি পক্ষ বিস্তারিয়া,
করুণ নয়নে ধরা কিরণে মথিয়া।

কি শুভ্র জোৎস্না তুমি !—রজত বল্লরী—
আন বিশ্বে অলকার দ্যুতি সমুজ্জ্বল,
বিকশিত শরতের শ্যাম অঙ্গ'পরি
মুকুতার সম কান্তি করে ঝলমল !
ললিত-কুরঙ্গ-আঁখি-মুকুর-প্রভায়
হিল্লোলে নাচাও সরে নীল-কুবলয় ;
বিলোল সমুদ্র স্ফীত তোমারি লীলায়,
কুসুমিত ধরাবুক চিরমধুময় !
জীবচক্ষে ত্রিদিবের দিয়ে ঘুমঘোর,
বসাও জগত মাঝে সুষুপ্তির মেলা ;
বাঁধিয়া পরাণে কোন্ বিস্মৃতির ডোর,
ভুলাও এ স্বপ্নময় মিথ্যা ধূলিখেলা !
শুধু রঙ্গে, বর অঙ্গে ও শোভা মাখিয়া,
কি চিরযৌবনে বিশ্ব রয়েছে শোভিয়া !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বেদ ও দেব।

ক্রমোন্নতির নিয়ম সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। জড়-জগৎ যেমন অতীন্দ্রিয় পরমাণুপুঞ্জ হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সুন্দর মনোহর আকার ধারণ করিয়াছে, অন্তর্জগতেও সেইরূপ ক্রম-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান স্থূলকে ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে অনন্তের সাক্ষাৎ পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে, মানবকে নীচ স্বার্থ-পরতা, ও ইন্দ্রিয়াশক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বেচ্ছায় চিন্ময় ঈশ্বরের মধুময় প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখাইয়াছে। কোন জাতিই প্রথমে সচ্চিদানন্দরূপী অনন্ত ঈশ্বরকে ধরিতে পারে নাই। বৃক্ষ যেরূপ পরিণত হইয়া সুমিষ্ট ফল প্রসব করে, মানবের জ্ঞানবৃক্ষও সেইরূপ ক্রমশঃ পরিণত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতময় ফল প্রসব করিয়াছে। গ্রীসীয় সভ্যতার প্রথমাবস্থায়ই আমরা প্লেটো ও আরিষ্টট্-লের সাক্ষাৎ পাই না; ইহুদীদিগের দেশেও প্রথমেই ঈশার আবির্ভাব হয় নাই। ইহুদীগণও প্রথমে যে ঈশ্বরের পূজা করিতেন, তিনি আমাদের ইন্দ্র অথবা গ্রীকদিগের জুপিটার অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। অপর কোন দেশে যাহা ঘটে নাই, কেবল ভারতবর্ষেই কি তাহা ঘটিয়াছে? কখনই নহে। ভারতেও অবশ্যম্ভাবিরূপে এই নিয়মই কার্য্য করিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র এই:—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং।"
"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বান-কারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী, আমি অগ্নির স্তুতি করি।"

রমেশচন্দ্র দত্ত।

"অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ যজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ।"
"হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি! এই ছিন্ন কুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে দেবতাদিগকে আনয়ন কর; তুমি আমাদিগের স্তুতিভাজন ও দেবতাদিগের আহ্বান-কারী"।

ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল, ১২ সূক্ত তৃতীয় ঋক্।

ঋষি যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার স্তুতি করিতেছেন। কেন স্তুতি করিতেছেন, তাহাও প্রথম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইতেছে, অগ্নি সেই দেবতাকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতে সমর্থ, এই জন্যই অগ্নির স্তুতি। অগ্নি স্বয়ম্ভু নহেন, কিন্তু কাষ্ঠোৎপন্ন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঋষি প্রথমাবস্থায় জড় অগ্নিকেই দেবতা বলিয়াছেন, অগ্নির অতীত কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিতেছেন না; অগ্নির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু আত্মা ভিন্ন যে কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই, তাঁহার জ্ঞানে এখনও তাহা প্রকাশ পায় নাই, অর্থাৎ তাঁহার আত্মজ্ঞানের উদয় হয় নাই, সুতরাং জড় ও আত্মার ভেদজ্ঞানও জন্মে নাই; কিন্তু তিনি নিজের কর্ত্তৃত্ব দর্শনে বহির্জগতে যে পদার্থের কিছু কার্য্য দেখিতেছেন, তাহাতেই কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া ও তাহার অপ্রতিহতা মহতী শক্তি দেখিয়া তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। প্রত্যেক কার্য্যেরই যে একজন কর্ত্তা আছে, এই জ্ঞান হইতেই মানবের ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি। শক্তিমত্ত ও ঈশ্বরত্ব অবশ্য এক নহে, কিন্তু প্রথমে শক্তিদর্শন হইতেই দেব ভাব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

অগ্নির সম্বন্ধে যাহা সত্য অন্যান্য দেবতার সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। অগ্নির পরেই ইন্দ্র প্রধান বৈদিক দেবতা। অগ্নির ন্যায় ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত বহু মন্ত্র ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে যে, জীবনধারণের পক্ষে ইঁহাদেরই অধিকতম প্রয়োজনীয়তা দেখিয়াই বৈদিক ঋষি ইঁহাদের বহু স্তুতি করিয়াছিলেন। অগ্নি ও ইন্দ্রের পর বরুণ ও বায়ু প্রধান বৈদিক দেবতা। অগ্নির দেবতা অগ্নি, জলের দেবতা ইন্দ্র, আকাশের দেবতা বরুণ, বায়ুর দেবতা বায়ু, বেদে এই রূপ তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ আছে। ইঁহাদের প্রত্যেকে প্রকৃতির কোন না কোন বিভাগের দেবতা, কিন্তু প্রত্যেকেই পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন পুরুষ, সকলে এক নহেন।

"মক্ষিথা ধিয়া নরাঃ"
ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল ২ সূক্ত
৬ ঋক্।
"হে নরদ্বয় (বায়ু ও ইন্দ্র) এই কর্ম্ম ত্বরায় সম্পন্ন কর।"
"নরৌ পুরুষৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেন উপেতৌ।" সায়ণ।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, প্রথমে বেদের প্রত্যেক দেবতাই এক ভিন্ন পুরুষ, ও প্রকৃতির এক বিভাগের দেবতা; পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র। জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় এরূপ ভ্রম হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। বৈদিক ঋষি ক্রমশঃ তাঁহার এই ভ্রম দেখিতে পাইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে, যে অগ্নি তাঁহার সম্মুখে জাজ্বল্যমান, তাহা সেই সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ নহে, কিন্তু জলে স্থলে শূন্যে বিবিধ আকারে বিদ্যমান

রহিয়াছেন; বিশ্বচক্ষু সূর্য্য তাঁহার একরূপ, ক্ষণস্থায়িনী চঞ্চলা চপলা তাঁহার আর এক রূপ :—

"গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং
গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং।
অদ্রৌ চিদস্মা অংতর্দুরোণে।
বিশাং ন বিশ্বো অমৃত স্বাধীঃ॥

"যে অগ্নি জলের মধ্যে ও বনের মধ্যে ও স্থাবর পদার্থের মধ্যে ও জঙ্গমের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁহাকে কি যজ্ঞগৃহে, কি পর্ব্বতের উপর সর্ব্বত্রই লোকে হব্য প্রদান করে। প্রজাবৎসল রাজা যেরূপ প্রজার হিতকর কার্য্য করেন, অমর অগ্নিও তদ্রূপ আমাদের হিতকর কার্য্য সম্পাদন করেন।"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই দেখা যায় যে, ঋষি ইন্দ্র ও অগ্নিকে একত্র আহ্বান করিতেছেন।—

"যুবেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে সুতং সোমং সধস্তুতৌ॥
ইন্দ্রাগ্নী আগতং নরাঃ॥

"হে একত্রে স্তুতিযোগ্য নেতা, ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিষুত সোমের অভিমুখে আগমন কর।"

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঋষি অগ্নি ও ইন্দ্রের (তাপ ও মেঘের) মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়াছেন। অন্য একস্থলে ঋষি বলিতেছেন :—

"স নো বিশ্বেভির্দেবেভিরূর্জো নপাদ্ভদ্রশোচে।
রয়িং দেহি বিশ্ববারং।" ৬.৮।৭১

"হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন প্রদান কর।"

এই মন্ত্রে বুঝা যাইতেছে যে, ঋষি দেবগণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যোগ দেখিতে পাইয়াছেন; তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে প্রকৃতির শক্তিনিচয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবিরূপে পরস্পরের সহিত যুক্ত, এবং একশক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া কিছুই করিতে পারে না, অর্থাৎ প্রকৃতি এক আশ্চর্য্য, বিচিত্র যন্ত্র, বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এক।

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব সংপ্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা।"
ঋগ্বেদ—৮।৩।১০।৮২।৩

যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।"

জ্ঞানোন্নতি সহকারে ঋষি এখন বুঝিতে পারিলেন, যে জগতে একই শক্তি নানা ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, একই বিশ্বকর্ম্মা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা পাতা বিধাতা, এবং তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন রাজ্যে যে বিভিন্ন দেবতা দেখিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞানতার ফল মাত্র, প্রকৃত দেবতা এক। বৈদিক ঋষি কখনও মনে করিতেন না যে, জগতের মূলস্থিত সেই দেবতা কেবল সত্ত্বা মাত্র, কিন্তু তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, সব অবলোকন করেন, ধারণ করেন, এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগতের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তিনিই মানবের একমাত্র পূজ্য—

"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম॥"
"যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা
জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"
"যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং
রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম॥

"যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁহার ছায়া অমৃত স্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ দেবতাকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?"

"যিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ দেবতাকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?"

"যাঁহার মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, সসাগরা ধরা যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়, এই সকল দিক্ বিদিক্ যাঁহার বাহু স্বরূপ, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন্ দেবতাকে আমরা হব্য দ্বারা পূজা করিব?"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় জীবনরক্ষা।

ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার, জাতীয় জীবনের এই তিনটীই প্রধান উপাদান;—জাতীয় জীবনের এই তিনটীই প্রাণ। যে জাতির ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার বিলুপ্ত হয়, সে জাতির অস্তিত্বলোপ হয়। যে জনসমষ্টি লইয়া জাতি, ভাষাদি প্রাণত্রয়ের লোপ হইলে, সেই জনসমষ্টি থাকে, কিন্তু সে জনসমষ্টির সে জাতীয়তা থাকে না; সেই দেহ থাকিলেও, সে প্রাণ থাকে না। হয় দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া

থাকে, না হয় তাহাতে অন্য প্রাণ আসিয়া অধিকারস্থাপন করে। তখন সেই জনসমষ্টিকে অন্যজাতিরূপে পরিচিত হইতে হয়।

দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পুরাতন অধুনাতন উভয়ে ইতিহাসেই দৃষ্টান্ত পাইবে; প্রাচীন নবীন উভয় সমাজে দৃষ্টান্ত পাইবে; অতীত বর্ত্তমান উভয় যুগেও দৃষ্টান্ত পাইবে। খৃষ্টধর্ম্মের আধিপত্য হইবার পূর্ব্বে, ইউরোপের যে ইউরোপত্ব ছিল, এখন সে ইউরোপত্ব নাই। সেই দেশ প্রদেশ পড়িয়া আছে, সেই নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই গিরি পর্ব্বত এখনও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সে ইউরোপ আর নাই। সেই সকল গ্রাম নগরের অবস্থান ভূমি সেইরূপ আছে, কিন্তু সে সকল গ্রামের সে গ্রামত্ব আর নাই, সে সকল নগরের সে নগরত্ব আর নাই!

ইউরোপে সেইরূপ জনসমষ্টি এখনও রহিয়াছে; তখন যাহাদের বংশে ইউরোপ বিরাজিত ছিল, এখনও অনেক স্থলে তাঁহাদের বংশই বিরাজ করিতেছে। কিন্তু জাতীয়তার ব্যতিক্রমে জাতিরও ব্যতিক্রম হইয়াছে; ইউরোপের সকল ভূমিভাগই তখন নব নব জাতিজাতে পূর্ণ হইয়াছে।

সেই গ্রীস এখনও আছে, গ্রীসের সেই এথেন্‌স্ এখনও রাজধানীরূপে বিরাজ করিতেছে; সেই শৌর্য্যকেতন থার্ম্মপিলি ও মেরাথন এখনও পড়িয়া আছে; সেই সকল যুদ্ধক্ষেত্র এখনও রহিয়াছে; কিন্তু গ্রীসের সে গ্রীসত্ব আর নাই। গ্রীসের সে ভাষা নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে আচার নাই; সুতরাং সে গ্রীসের আর কিছুই নাই, গ্রীসের তিন প্রধান প্রাণই কবে উড়িয়া গিয়াছে!

তিন পুরাতন প্রাণের স্থানে তিন নূতন প্রাণ আসিয়া বসিয়া আছে। গ্রীক জাতির সে ভাষা নাই! যে ভাষায় গ্রীক-বাল্মীকি হোমর, গ্রীক-রামায়ণ ইলিয়দ অদিসির রচনা করিয়াছিলেন, যে ভাষায় সক্রেতীস প্লেতো দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে ভাষায় আরিস্ততল বিজ্ঞান লিখিয়াছিলেন, যে ভাষায় দিমস্থিনীশ বক্তৃতা করিয়া সুপ্ত নির্জ্জীব গ্রীসকে জাগরিত ও সজীব করিয়াছিলেন, যে ভাষায় পিতাগোরাস ভারতীয় আর্য্য শাস্ত্রের অনুকরণ করিয়াছিলেন, যে ভাষায় এরিষ্টোফেনীশ এবং ইউরিপিদীশ নাটক লিখিয়াছিলেন, যে ভাষায় থুসিদিদীশ ও জেনোফন ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, যে ভাষায় এল্‌কিবাইদীশ ও পেরিক্লীশ রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলেন, গ্রীসের সে ভাষা এখন আর জীবিত নাই; সে ভাষা গ্রীকের মুখে আর শোনা যায় না; মৃত গ্রীক জাতির সে মৃত ভাষা এখন ইতিহাসকাব্যাদিময় প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে।

গ্রীকজাতি রোমকজাতির বশীভূত হইলে, গ্রীকরাজ্য রোমকরাজ্যের অঙ্গীভূত হইলে, গ্রীক ভাষায় ও রোমক ভাষায় যে সংমিশ্রণ হইতেছিল, পরে সেই সংমিশ্রণই গাঢ়তর ও ঘনীভূত হইয়া উঠে; সেই ঘনীভাবের পর গ্রীসরাজ্যে এক নূতনপ্রকার ভাষারই আবির্ভাব হইয়া পড়ে। সেই ভাষাই রোমের নামে "রোমায়িক" ভাষা বলিয়া পরিচিত। ভারতের উর্দ্দু যেমন সঙ্কর ভাষা—মিশ্রিত দো-আঁস্‌লা ভাষা, গ্রীসের ঐ রোমায়িকও সেইরূপ দোআঁস্‌লা ভাষা। রোমায়িক গ্রীসের উর্দ্দু। কিন্তু গ্রীসের সে রোমায়িকও এখন আর নাই। প্রাচীন গ্রীকের অপভ্রংশ এবং পরিবর্ত্তনে এক নূতন গ্রীক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই গ্রীকই এখন গ্রীসের ভাষা।

আবার, সেই রোমকেরও সেই দশা! যে দশা গ্রীসের, সেই দশা রোমের! প্রাচীন রোমের সে প্রাচীন লাটীন এখন, প্রাচীন গ্রীকের মত, প্রাচীন সাহিত্যেই বিরাজমান। সিপীয়ো, সীজার, কেটো, কাইকেরো, ভার্জিল, হরেস, তাসীতস, সেনেকা প্রভৃতির ভাষা এখন গ্রন্থগহ্বরে গুপ্ত। রোমকের মুখে এখন অন্য ভাষা, রোমকের কলমেও এখন অন্য ভাষা।

ইউরোপের অনেক রাজ্যেই দৃষ্টান্ত পাইবে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস রোমে দৃষ্টান্ত যেরূপ ফুটন্ত, অন্যত্র ঠিক সেরূপ নহে। রুষ জর্ম্মণ ফরাসি ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষাকৃত নূতন ভাষা; গ্রীক লাটীনের তুলনায় নবীন ভাষা। প্রাচীনে যত পরিবর্ত্তন, নবীনে তত নহে। তথাপি দেখিবে, খৃষ্টের পূর্ব্বে যে ভাষার যে প্রকৃতি ছিল, এখন সে ভাষার সে প্রকৃতি নাই।

কিন্তু কেবল ভাষার লোপেও জাতীয়তা-লোপ পূর্ণ মাত্রায় হইত না; তিন প্রাণের এক প্রাণ উড়িয়া গেলেও ইউরোপীয় জাতিগুলি আর দুই প্রাণ লইয়া জীবনধারণ করিতে পারিতেন। ধর্ম্ম এবং আচার যদি ঠিক থাকিত—এই দুই প্রাণও যদি বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলেও আমরা এখন ইউরোপে সেই প্রাচীন ইউরোপত্ব দেখিতে পাইতাম।

ধর্ম্মান্তরই একেবারে রূপান্তর করিয়া দিয়াছে। ইউরোপের যদি ধর্ম্মান্তর না হইত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের সে পুরাতন জাতীয়তা, কতক পরিমাণে, জীবিত থাকিত। ইউরোপে তখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ছিল, তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা বিদ্যমান ছিল। এখন সমগ্র ইউরোপের এক জাতি; ইউরোপে এখন এক খৃষ্টান মহা জাতিরই বস বাস; প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলি এখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়েই পরিণত হইয়াছে। গ্রীক জাতি, ইতালীয় জাতি, জর্ম্মণ জাতি, ফরাসি জাতি, রুষ জাতি, ইংরেজ জাতি প্রভৃতি যত জাতিই এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে খণ্ড খণ্ড উপজাতি; এক খৃষ্টান জাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। তাই বলিতেছি, এই সকল অংশ, এই সকল উপজাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইউরোপের যত প্রাচীন জাতিরই তিরোভাব হইয়াছে। সে জাতি কুত্রাপি নাই; সে জনসমষ্টি মাত্র পড়িয়া আছে; সে দেহ আছে, সে দেহে সে ধর্ম্ম প্রাণ আর নাই। যে ধর্ম্ম-প্রাণ তিরোহিত হইয়াছে, নূতন এক ধর্ম্ম-প্রাণ তাহার আসনে বসিয়াছে।

ধর্ম্মের তিরোভাব হইলেই, আচারের তিরোভাব হইয়া থাকে। আচার ধর্ম্মেরই নিত্য সহচর। তাপ যেরূপ তেজের সহচর, গুরুত্ব যেরূপ দ্রব্যের সহচর, আচার সেইরূপ ধর্ম্মের সহচর। আচারহীন ধর্ম্ম নাই। অখৃষ্টান ইউরোপে যে আচার বিরাজ করিয়াছিল, এখনকার খৃষ্টান ইউরোপে সে আচার দেখিতে পাইবে না। এখন মহাখৃষ্টান জাতির আচারে প্রায়ই একতা দেখিতে পাইবে; স্থানভেদে—সম্প্রদায়ভেদে—যে তারতম্য, তাহা অতি সামান্য। অখৃষ্টান প্রাচীন ইউরোপীয় জাতিসমূহের ভিতর ধর্ম্মভেদজনিত যেরূপ আচারভেদ ছিল, সেরূপ আচারভেদ—তত অধিক আচারভেদ—এখন আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না।

আচারভেদ হইলেই অনুষ্ঠানভেদ হইয়া থাকে। আচারভেদে অনুষ্ঠানভেদ, আচারভেদে ব্যবহারভেদ, আচারভেদে আহারভেদ, আচারভেদে পরিচ্ছদভেদ; আচারভেদের তারতম্যেই আর সমস্ত ভেদেরও তারতম্য হইয়া থাকে। ইউরোপে এখন মূলধর্ম্ম এক, মূল আচারও এক। স্থলভেদে—প্রদেশভেদে—মূলধর্ম্মে যেরূপ সামান্য তারতম্য হইয়াছে, মূল আচারেও সেইরূপ নামমাত্র তারতম্য দাঁড়াইয়াছে। আহার বিহার, বিবাহ মিলন, পোষাক পরিচ্ছদ, সমস্তই আচারের অনুগত; সমস্তই আচারের অঙ্গীভূত। সকল লইয়াই আচার। সুতরাং আচারভেদ যেখানে যেরূপ, আহারব্যবহারাদিরও সেখানে তারতম্য সেইরূপ।

দেখিলে, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—ভিন্ন ভিন্ন ভূমিভাগে—যেরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল, এখন সেরূপ ভাষা কুত্রাপি নাই। পূর্ব্বে যেরূপ ধর্ম্ম ছিল, সেরূপ ধর্ম্ম কুত্রাপি নাই। আর পূর্ব্বে যেরূপ আচার ছিল, এখন সেরূপ আচারও কুত্রাপি নাই।

আর দেখিলে, ভাষার যেরূপ ভিন্নতা আছে, ইউরোপে ধর্ম্মের ঠিক সেরূপ ভিন্নতা কুত্রাপি নাই; সুতরাং আচারেরও ততদূর ভিন্নতা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। আচারের সেরূপ ভিন্নতা নাই বলিয়াই, আহার ব্যবহার পরিচ্ছদাদিরও সেরূপ ভিন্নতা নাই।

ধর্ম্মগত তারতম্য পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখন সেরূপ নাই। মূল খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপের এক; তাই মূল উপাসনাপদ্ধতিও সর্ব্বত্র এক। খৃষ্টধর্ম্ম মূলে এক থাকিয়াও, শাখাপ্রশাখা-পত্রপল্লবাদ্যবচ্ছেদে স্থলভেদে যে রূপ সামান্য ভেদগ্রহ করিয়াছে, উপাসনাপদ্ধতিরও সেইরূপ সামান্য ভেদগ্রহ হইয়াছে মাত্র। উপাসনায় যাহা ঘটিয়াছে, উপাসনার অঙ্গ—অনুষ্ঠানেও তাহাই ঘটিয়াছে।

ফলতঃ, ভাষার জন্য ইউরোপে জাতীয়তার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ধর্ম্মের জন্য ইউরোপে জাতীয়তার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আচার অনুষ্ঠানের জন্যও ইউরোপে জাতীয়তার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহের জাতীয় দেহ সমানই আছে—একই আছে; জাতীয় দেহের সে জাতীয় প্রাণ কুত্রাপি নাই। জাতীয় প্রাণের—ভাষা ধর্ম্ম এবং আচারের—ঘোরব্যতিক্রম হইয়াছে। সে জাতি কুত্রাপি নাই, সে জনসমষ্টি সর্ব্বত্র আছে। জনসমষ্টির পুরাতন তিন প্রাণই তিরোহিত হইয়াছে; তিন প্রাণের স্থানে তিন নূতন প্রাণের আধিপত্য হইয়াছে। পুরাতন ভাষার পদে নূতন ভাষা বসিয়াছে, পুরাতন ধর্ম্মের আসনে নূতন ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করিয়াছে, পুরাতন আচার অনুষ্ঠানের স্থানে নূতন আচার অনুষ্ঠান দখল সাব্যস্ত করিয়াছে।

তবেই দেখ, সে ইউরোপের মৃত্যু হইয়াছে; এখন যাহা দেখিতেছ, তাহা নূতন ইউরোপ—এক স্বতন্ত্র ইউরোপ।

কলার ঝাড়ে পুরাতন এঁটে দিয়া নূতন তেউড় বাহির হইয়াছে; নূতন তেউড় নূতন গাছে পরিণত হইয়াছে। নূতন গাছের থোড় খোলা, পাতা পেটো, সবই নূতন; নূতন থোড়ে নূতন মোচা; নূতন মোচায় নূতন ফল।

প্রাচীনতার ধূয়া ধরিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার ইউরোপের নাই;—ইউরোপের কোন দেশের কোন জাতির সে অধিকার নাই। প্রাচীন ভাষার গৌরবে গর্ব্ব করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, ক্ষমতা ইউরোপে কাহারও নাই; প্রাচীন ধর্ম্মের জন্য আত্মশ্লাঘা করিবার অধিকার কাহারও নাই; প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের কথা তুলিয়া অহঙ্কার করিবার একারও ইউরোপে কাহারও নাই।

সে ইউরোপ নাই, সে ইউরোপের সে গ্রীস রোম নাই; সে সব কিছুই নাই, সে সব শব হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের সেই শবে নূতন প্রাণ পশিয়াছে। এখনকার ইউরোপ ঠিক জীয়ন্ত ইউরোপ নহে, এ যে দানো-পাওয়া ইউরোপ। এই দানো-পাওয়া ইউরোপের জাতীয়তা, সভ্যতা, পাণ্ডিত্য, বীরতা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, প্রভুতা, দিগ্বিজয়, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি সমস্তই সেই দানো-পাওয়া প্রাণের লক্ষণ। তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইও না, দানো-পাওয়া শবের তেজ ভয়ঙ্কর। মানুষ জীয়ন্ত বেলায় যে দেহে—যে অঙ্গে—যে কাজ করিতে না পারে, দানো-পাওয়া দেহের—দানো পাওয়া অঙ্গে—সে কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারে। তখন অসাধ্যসাধনেও তাহার ভ্রূক্ষেপ হয় না; অসাধ্যও তখন তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইয়া উঠে।

হিন্দুর ভারতে।

খৃষ্টানের ইউরোপ হইতে একবার হিন্দুর ভারতে আসিয়া উপস্থিত হও; দেখিবে, ভারতও ইউরোপের মত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের—ভিন্ন ভিন্ন ভূমিভাগের সমবায়। দেখিবে, ভারতের মহাহিন্দুজাতিও ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির সমবায়; এক মহাজনসমষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন জনসমষ্টির সমবায়। দেখিবে, ভারতে বাঙ্গলা, উত্তরপশ্চিম, আসাম, পঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এইগুলি প্রদেশ। দেখিবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আবার ভিন্ন ভিন্ন উপপ্রদেশ বিদ্যমান। বাঙ্গালা প্রদেশে দেখিবে, বঙ্গ, বিহার, উৎকল, ছোটনাগপুর। উত্তর-পশ্চিম, অযোধ্যা এবং পঞ্জাবে ঠিক এরূপ উপপ্রদেশ নাই,—ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ খণ্ড নাই; কিন্তু ঋতুভেদে—ভাষাভেদে—প্রকৃতিভেদে—ঐ সকল প্রদেশেও ভিন্ন ভিন্ন উপপ্রদেশের দর্শন পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম বা অযোধ্যার পূর্ব্ব ভাগে যে অবস্থা, পশ্চিম ভাগে সেরূপ নহে; পঞ্জাবের উত্তর ভাগে যে অবস্থা, দক্ষিণ ভাগে সেরূপ নহে; আবার সমতল পঞ্জাবে যে প্রকৃতি, বিষমতল পার্ব্বত্য পঞ্জাবে সে প্রকৃতি দেখিতে পাইবে না। বোম্বাই প্রদেশে সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি উপপ্রদেশের অস্তিত্ব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অঞ্চলে যে ভাব, সম্বলপুর অঞ্চলে সে ভাব দেখিতে পাইবে না। মান্দ্রাজের কর্ণাট উপপ্রদেশে আর মলবার উপপ্রদেশে বিলক্ষণ তারতম্য দেখিতে পাইবে। মধ্যভারত ও রাজপুতনায় যে, রাজ্যভেদে উপপ্রদেশভেদ, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। আসামেও উত্তর আসাম আর দক্ষিণ আসামে, সমতল আসাম আর পার্ব্বত্য আসামে, অনেক প্রভেদ দেখিতে পাইবে। তাই বলিতেছি, যেখানে দেশ সেই খানেই প্রদেশ, যেখানে প্রদেশ সেই খানেই উপপ্রদেশ। ভারতেও নবীন প্রাচীনের ভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পাইবে। তখনকার অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধে, আর এখনকার বঙ্গ বিহার নাগপুর উৎকলে কিরূপ প্রভেদ, তাহা বেদব্যাসের মহাভারত দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষে আর বর্ত্তমান কামরূপ-আসামে অনায়াসে তারতম্য করিতে পারিবে। তখনকার আর্য্যাবর্ত্তে আর এখনকার উত্তর পশ্চিমে ইতরবিশেষ করা কঠিন হইবে না। দেখিবে, তখনকার অযোধ্যায় আর এখনকার অযোধ্যায় কত বৈসাদৃশ্য; তখনকার ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পঞ্চনদে এবং এখনকার পাঞ্জাবে কত বৈসাদৃশ্য; তখনকার গুর্জ্জরে আর এখনকার গুজরাটে কত বৈসাদৃশ্য। তখনকার মহারাষ্ট্রে আর এখনকার মহারাষ্ট্রেও তারতম্য দেখিতে পাইবে। কর্ণাট কানাড়ায় সেইরূপ তারতম্য; মালয় মলবারেও তারতম্যের অভাব নাই। প্রদেশে প্রভেদ হইয়াছে, উপপ্রদেশে ইতরবিশেষ হইয়াছে—নগরে গ্রামেও ভিন্নভাব ঘটিয়াছে।

এখনকার পাটনা তখনকার পাটলীপুত্র নহে। এখনকার এলাহাবাদে আর তখনকার প্রয়াগে অনেক প্রভেদ তখনকার হস্তিনাপুর কোথায় গিয়াছে; নব হস্তিনা

পুরে আর দিল্লীসহরেও কত প্রভেদ! সে অবস্তী আর এ উজ্জয়িনীর তুলনায় আলোচনা কর, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইবে। রাজসাহী-বিভাগে বিরাট-রাজ্যের অন্বেষণ করিতে গেলে, বিরাটবিভ্রাটে পতিত হইবে। যেখানে যাইবে, যে দিকে চাহিবে, সেইখানেই সেই নবীন প্রাচীনের তারতম্য দেখিতে পাইবে।

তখনকার কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রী, গুর্জ্জরী, মাগধী প্রভৃতি রীতির ভেদে ভাষায় যেরূপ ভেদ দেখিতে পাইতে, এখনকার একবিধা ভাষায় সেরূপ রীতিভেদে সেরূপ ভিন্নতা পাইবে না। তখন রীতিভেদে কিছু কিছু ভাষা-ভেদ ছিল; এখন ভাষারই সম্পূর্ণ ভেদ হইয়াছে। এখন কানাড়ী, মারাঠি, গুজরাটী, হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাষারই সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।

সেই সংস্কৃত প্রাকৃত মূলে এবং পালিরূপ অপভ্রংশে, এখন যে হিন্দী বাঙ্গলা মারাঠি প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে, এ গুলির এখন স্বাতন্ত্র্যই হইয়া গিয়াছে। এখন প্রদেশেভেদে ভাষাভেদ, উপপ্রদেশেভেদেও ভাষার অবান্তরভেদ। তখন এক ভাষায় রীতিভেদ ছিল, এখন ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকৃতিভেদ হইয়াছে। এখনকার বাঙ্গলা, উৎকল, আসামী, এক হইয়াও ভিন্ন। এক হিন্দী বিহারে যেরূপ, পশ্চিমে সেরূপ নহে। আবার মুসলমানদিগের আবির্ভাবে একটা নূতন অতিরিক্ত ভাষারই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রথমে পল্টনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, এই উর্দ্দু ক্রমে হিন্দুস্থানের রাজকীয় ভাষায় পরিণত হইয়া পড়ে। হিন্দী আরবী পারসীর মিলনে উৎপন্ন উর্দ্দু, মুসলমান বাদশাহ নবাবের ভাষা হইয়া, ভারতের সর্ব্বত্র আধিপত্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মুসলমান রাজার সে আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে রাজকীয় জারজভাষার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ভাবেই রহিয়াছে। উর্দ্দু এখনও ভারতের ভাষাসমাজে রাজত্ব করিতেছে।

সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবী এবং পারসী এখন মৃতভাষা; পালি আরও মৃত। পালিও কিন্তু বৌদ্ধ-আধিপত্যের সময়ে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাষা বলিয়া, পালি ভারতের বাহিরেও রাজত্ব করিয়াছিল। যেখানে বৌদ্ধ, সেইখানেই পালি। বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে, অশোকের মত বৌদ্ধ সম্রাটের সময়ে, পালিও ভারতে উর্দ্দুর মত আধিপত্য করিয়াছিল। রাজভাষার সর্ব্বত্র সকল যুগে একাধিপত্য হইয়া থাকে। বৌদ্ধযুগে পালির যাহা হইয়াছিল, মুসলমান যুগে উর্দ্দুর যাহা হইয়াছিল, এখন ইংরেজ যুগে ইংরেজিরও তাহাই হইতেছে। এখন ভারতের সর্ব্বত্র ইংরেজের জয়, সর্ব্বত্রই ইংরেজির জয়। কিন্তু ইংরেজি এখনও উর্দ্দু হইতে পারে নাই; উর্দ্দু সদরে অন্দরে আধিপত্য করিয়াছিল, হাটে বাজারে বিরাজ করিয়াছিল। আমীর ফকীর, জমিদার রাইয়ত, ভিখারী কুবের, মূর্খ পণ্ডিত সকলের মুখেই উর্দ্দুর অধিকার হইয়াছিল। ইংরেজির এখনও সেরূপ মাহেন্দ্রযোগ হয় নাই। ইংরেজি বিদ্বানের ভাষা; ইংরেজি ভৃত্যের ভাষা; ইংরেজের সহিত সংস্রব রাখিতে হইলেই, ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লইতে হয়।

কিন্তু উর্দ্দু ইংরেজির সহিত এ প্রবন্ধের তাদৃশ সম্বন্ধ নয়। আমাদের এখন সম্বন্ধ যত ভারতীয় ভাষার সহিত ভারতের যত প্রদেশীয় বর্ত্তমান ভাষার সহিতই আমাদের এ প্রস্তাবে সম্বন্ধ। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পূর্ব্বে যেরূপ প্রদেশীয় ভাষার আধিপত্য ছিল, এখন সেরূপ প্রদেশী ভাষার আধিপত্য নাই। সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ র যখন ভারতে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তিনি যে সকল ভাষা দেখিয়াছিলেন তাঁহার বংশধর রামচন্দ্রের অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া যখ রামানুজেরা, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, চারিদিকে ভ্রম করিয়াছিলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঠিক সে সক ভাষা দেখিতে পান নাই। আবার চন্দ্রবংশাবতংস পাণ্ড দিগের দিগ্বিজয়কালেও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষা আর ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল।

এখন ত কথাই নাই! তখন ভাষায় কিছু কিছু রূপান্ত হইত, এখন একেবারেই রূপান্তর! সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ভাষায় আর কলির ভাষায় সম্পূর্ণ প্রভেদ। আবার কলির যত সময় যাইতেছে, কলির ভাষারও তত পরিবর্ত্ত হইতেছে। কেবল ভাষায় যদি জাতীয়তার জীবন নির্ভ করিত, তাহা হইলে ভারতে হিন্দু জাতির জাতীয়তা এবে বারেই বিলুপ্ত হইত।

কিন্তু ধর্ম্মের লোপ না হইলে, জাতীয় জীবনের লো হয় না। ধর্ম্মের লোপ না হইলে, জাতীয় আচারেরও লো হয় না। ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার, জাতীয় জীবনের ঃ

তনটীই প্রধান প্রাণ। ভারতে একটী প্রাণের, ভাষারূপ প্রাণের, তিরোভাব হইয়াছে, আর দুইটী প্রাণের—ধর্ম্মপ্রাণ ও আচারপ্রাণের তিরোভাব হয় নাই; তাই ভারতে এখনও জাতীয় জীবন বিদ্যমান আছে। জীবনের এক প্রাণ গিয়াছে, এক পাদও গিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর জাতীয় জীবন এখনও দুই প্রাণে দুই পাদে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দুই প্রাণ যত দিন থাকিবে, হিন্দুর জাতীয় জীবন তত দিন থাকিবে। হিন্দুর ধর্ম্ম থাকিলেই আচার থাকিবে; ধর্ম্ম বাঁচিয়া থাকিলেই হিন্দুর দুই প্রাণ বাঁচিয়া থাকিবে। দুই প্রাণেই হিন্দুর জাতীয় জীবনও রক্ষা পাইবে। জাতীয় জীবন যতদিন থাকিবে, হিন্দু জাতিও ততদিন থাকিবে।

ধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে অনেক, লাগিয়াছে অনেকবার; কিন্তু ভারতের হিন্দুধর্ম্ম প্রাণে মরেন নাই। বৌদ্ধের বিষম বহ্নিবাণ দিগ্দেশ জ্বালাইতে জ্বালাইতে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছিল; আর্য্যভূমি সেই বৌদ্ধ বহ্নিবাণে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আর্য্যধর্ম্মকেও সে বাণের বিষম জ্বালা সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের অপঘাত হয় নাই। হিন্দুর রাজ্য বৌদ্ধরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, হিন্দুর মন্দির দেবালয় বৌদ্ধ বিহার মঠে পরিণত হইয়াছিল, হিন্দু দেবতার পূজক পুরোহিতেরা বৌদ্ধ প্রচারক হইয়াছিলেন, হিন্দু সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মৃত্যু হয় নাই; অমরের মৃত্যু হয় না।

হিন্দুর ধর্ম্ম অমর, সুতরাং হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানও অমর। তাই শঙ্কর আবার আর্য্যভূমে আর্য্যধর্ম্মের পুনরাধিপত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। তাই হিন্দুধর্ম্মের নিত্য-অনুচর আচার অনুষ্ঠানও আবার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; তাই হিন্দুর ভারত আবার হিন্দু হইয়াছিল; তাই বৌদ্ধরূপ ভ্রষ্ট হিন্দুরা আবার হিন্দু হইয়াছিল; বৌদ্ধ ভিক্ষু আবার সন্ন্যাসী অবধূত হইয়াছিলেন।

মুসলমানের ভয়ঙ্কর প্রবাহ আসিয়া হিন্দুর ভারতকে আবার ডুবাইয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। মুসলমানের তরবারিপ্রচারিত ধর্ম্ম আসিয়া ভীরু চকিত অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল। মুসলমানও, ভারতে একাধিপত্য করিয়া, ভয়মৈত্রে—আতঙ্ক প্রলোভনে—অসংখ্য হিন্দুকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। হিন্দুর ভারত, মুসলমান ধর্ম্মের জন্য, মুসলমান ধর্ম্মের অনুগত মুসলমান আচার অনুষ্ঠানের জন্য,—বিব্রত বিপন্ন হইয়াছিল; হিন্দুর ভারত মুসলমানের হাতে পড়িয়া যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রলয়প্রবাহেও হিন্দুধর্ম্ম আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মগ্ন ধর্ম্ম আবার তীরে উঠিয়াছিলেন. ভগ্নহিন্দুসমাজ আবার সংযুক্ত হইয়াছিল, জীর্ণ হিন্দুজাতি আবার সবল হইয়াছিল। মুসলমানধর্ম্মের জন্য হিন্দুধর্ম্মকে প্রথমে অবসন্ন হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অবসাদ স্থায়ী হয় নাই। অমর হিন্দুধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্মের কালগ্রাস হইতেও আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্ম্মও যে হিন্দুধর্ম্মকে মারিতে পারে নাই, ইংরেজের খৃষ্টধর্ম্ম সে হিন্দুধর্ম্মকে মারিতে পারিবে না। আর রাজভেদে প্রকৃতিভেদ। বৌদ্ধ রাজারা ভারতের সমস্ত হিন্দুকে বৌদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; মুসলমান বাদশাহ নবাবেরাও ভারতের সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। আমাদের রাজাধিরাজ ইংরেজের প্রকৃতি অন্যরূপ; মতিবুদ্ধি অন্যরূপ। নিজে খৃষ্টান হইয়াও রাজা ইংরেজ কাহারও ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হন না; কাহারও ধর্ম্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপও করেন না। নিজে করেন না, পরকেও করিতে দেন না। বৌদ্ধ ও মুসলমান ভারতপতিরা ভারতের হিন্দুকে যেরূপ ধর্ম্মত্যাগে বাধ্য করিতেন, ভারতের ইংরেজ নরপতি সেরূপ বাধ্য ত করেনই না; পরন্তু যে সেরূপ বাধ্য করিতে চাহে, তাহাকেও রাজা ইংরেজ প্রশ্রয় দেন না; বরং নিষেধ করেন—নিবারণ করেন। ভারতের কাহারও ধর্ম্মত্যাগে সমদর্শী ইংরেজ রাজ উৎসাহ প্রশ্রয় দেন না।

ধর্ম্মরক্ষায় হিন্দুর পথ সহজ হইয়াছে। ভাষায়, বৌদ্ধ মুসলমান আঘাত করিয়াছিলেন, ইংরেজরাজ ভাষায় আঘাত না করিয়া উৎসাহ দিতেছেন। প্রকৃত আচার অনুষ্ঠানেও রাজা ইংরেজ বাধা দেন না; বৌদ্ধ মুসলমান খুবই বাধা দিতেন। তাই বলিতেছি, পূর্ব্বে আমাদের ভাষারক্ষার—ধর্ম্মরক্ষার—আচারপালনের পথ যেরূপ দুর্গম—যেরূপ বিপৎসঙ্কুল ছিল, এখন আর সেরূপ নহে। এখন যে, আমরা ধর্ম্মে চ্যুত হই—ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হই, তাহা আমাদের নিজের দোষে; এখন যে, আমরা আচারপালনে এবং অনুষ্ঠান আচরণে উদাসীন বা বিরত হই, তাহা আমাদের নিজের দোষে। এখনকার হিন্দু যে, অহিন্দু হয়, তাহা সেই হিন্দুর নিজের অপরাধে। এখনকার ভাষা রাজার দোষে

বিকৃত হয় না, বরং রাজার উৎসাহে, সাহায্যে, এখনকার ভাষা উন্নতিলাভ করিতেছে। এখনকার ধর্ম্ম রাজার দোষে বিকৃত হয় না, এখনকার আচারও রাজার দোষে কলুষিত হয় না। এখন যে দিকে যে দোষ, তাহা আমাদের নিজের দোষে। আর এখন যদি ভারতীয় হিন্দুর জাতীয়তা নষ্ট হয়, তাহা হইলে ভারতীয় হিন্দুর দোষে; এখন যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন নষ্ট হয়, তাহা হইলে, হিন্দুর স্বকৃত পাপে। ভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার, জাতীয় জীবনের এই তিন মহাপ্রাণই এখন আমাদের নিজের হস্তে। আমরা যদি না রাখি, তবে কেহই রাখিতে পারিবে না।

বাঙ্গালীর বঙ্গে।

হিন্দুভারতে হিন্দুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হিন্দুভারতে হিন্দুর প্রগাঢ় ভক্তি; কিন্তু বঙ্গেই বাঙ্গালি হিন্দুর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, হিন্দুবঙ্গেই বাঙ্গালিহিন্দুর প্রগাঢ়তর ভক্তি। বঙ্গ বাঙ্গালি হিন্দুর জন্মভূমি; বঙ্গভূমির বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালিহিন্দুর মাতৃ-ভাষা। দেবভাষা—সংস্কৃত ভাষা—হিন্দুর চিরপূজ্যা, বাঙ্গালিহিন্দুরও চিরপূজ্যা। এই দেবভাষাই বাঙ্গলাভাষার জননী। তাই দেবভাষার প্রতি বাঙ্গালিহিন্দুর অচলা ভক্তি। বাঙ্গলা ভাষা আমাদের মাতা, সংস্কৃত ভাষা আমাদের মাতামহী; মাতামহী আমাদের মাতারও পূজ্যা। কিন্তু—আমাদের কাছে সাক্ষাৎ মাতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্যা। তাই বাঙ্গলা ভাষা আমাদের অধিকতর পূজ্যা।

আর, এই বাঙ্গলা ভাষার জন্যই বাঙ্গালি হিন্দুর স্বতন্ত্রতা। হিন্দু বলিয়া আমারাও শ্লাঘা করিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দু বলিয়াই আমরা অধিক গৌরব করি। আমাদের শ্লাঘা অন্যের কাছে আত্মশ্লাঘা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, এ গৌরব অন্যের বিবেচনায় গর্ব্ব বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে; আমাদের কাছে—আমাদের মত যত বাঙ্গালি হিন্দুর কাছে—কিন্তু এই শ্লাঘাই পরম পবিত্র শ্লাঘা, এই গৌরবই শ্রেষ্ঠ গৌরব। অগ্রে মাতা, পরে মাতামহী। যে হিন্দুসন্তান মাতৃপূজা না করিয়া মাতামহীর পূজা করিতে তৎপর, সে হিন্দুসন্তানের আমরা প্রশংসা করি না। যাঁহার মানে মাতামহীর মান, যাঁহার আদরে মাতামহীর আদর, সেই মাতার যে সন্তান পূজা না করে, তাহাকে আমরা নরাধম বলিয়া মনে করি

সত্যই বলিতেছি, বঙ্গভূমি আমাদের কাছে যত প্রিয়, ভারতভূমি তত নহে; বঙ্গের বাঙ্গলা ভাষা আমাদের কাছে যত প্রিয়, ভারতের সংস্কৃত ভাষা তত নহে।

ধর্ম্মেও আমরা কিঞ্চিৎ তারতম্য করিয়া থাকি; ধর্ম্মের তারতম্য করিয়া আমরা আচারেরও তারতম্য করিয়া থাকি। হিন্দুধর্ম্ম মূলে সর্ব্বত্র এক হইলেও, প্রদেশভেদে তাহার প্রকৃতিভেদ আছে। আচার-ভেদেই হিন্দুধর্ম্মের এই ভেদ। যে হিন্দুধর্ম্ম এখন বঙ্গে বিরাজ করিতেছে, ঠিক সে হিন্দুধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুষ্ঠান-হীন ধর্ম্ম নাই, অনুষ্ঠানভেদেই এক ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই আচার; আচার আর অনুষ্ঠানে নিত্য সম্বন্ধ।

বঙ্গের বাঙ্গলা ভাষা আমাদের অধিক প্রিয়, বঙ্গের বঙ্গীয় হিন্দুধর্ম্মই আমাদের অধিক প্রিয়, বঙ্গের আচার অনুষ্ঠানও আমাদিগের অধিক প্রিয়। আহার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই আচারের অধীন ও অঙ্গীভূত। এই জন্যই বঙ্গের আহার ব্যবহারে আমাদিগের অধিক অনুরাগ, বঙ্গের পোষাক পরিচ্ছদেই আমাদিগের অধিক আসক্তি।

বঙ্গের যাহা নিত্য, যাহা চিরন্তন, তাহাই আমাদিগকে রাখিতে হইবে; তাহাতেই আমাদিগকে অনুরাগ বাড়াইতে হইবে; তাহাতেই আমাদিগকে অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে।

ধর্ম্ম ও আচারের কথা অনেক কহিলাম। এখন ভাষার কথাই ভাল করিয়া কহিব। জাতীয় জীবনে জাতীয় ভাষার কিরূপ উপযোগিতা, তাহা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। বঙ্গীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে বাঙ্গলা ভাষার কিরূপ উপযোগিতা, তাহাও পাঠককে ইঙ্গিতে আভাসে দেখাইতে ত্রুটি করি নাই। বঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা যত দিন থাকিবে, বাঙ্গালি হিন্দুরও জাতীয় জীবন তত দিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কেবল ধর্ম্ম ও আচার অক্ষুণ্ণ রাখিলে, আমরা হিন্দু থাকিতে পারিব; কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাকে অক্ষুণ্ণ না রাখিলে, আমরা বাঙ্গালি নামের অধিকারী হইতে পারিব না। ভাষা আমাদের জাতীয়জীবনের প্রাণস্বরূপ, বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্বরক্ষার পক্ষে আর দুই প্রাণ অপেক্ষা এই প্রাণেরই অধিক উপযোগিতা।

যখন বাঙ্গলা ভাষা না থাকিলে আমাদের বাঙ্গালিত্ব থাকিবে না, বাঙ্গলা ভাষার তিরোভাবে, যখন আমাদিগের

বাঙ্গালিস্বরূপে মৃত্যু হইবে; তখন এই বাঙ্গলা ভাষার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি, আদর, যত্ন তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে; বাঙ্গলা ভাষারই পুষ্টি উন্নতির দিকে আমাদিগের অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত।

যাঁহারা বঙ্গের বাঙ্গালি হইয়াও অন্য ভাষাকে বাঙ্গলা ভাষার অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা বঙ্গভূমির সুসন্তান বলিয়া মনে করি না; মাতৃরূপা বাঙ্গলা ভাষার তাঁহারা পুত্র হইবারই যোগ্য নহেন। সংস্কৃত ভাষা মাতামহী; ভারতের হিন্দী মহারাষ্ট্রী দ্রাবিড়ী প্রভৃতির ন্যায় যত ভাষাই আমাদের মাতৃরূপা বাঙ্গলা ভাষার সহোদরা। মাসীমাদিগকে, ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; কিন্তু মাসীকে কখনই মার অপেক্ষা উচ্চ আসন দিই না। মাতার সহোদরা বলিয়াই ত মাতৃস্বসা আমাদিগের পূজনীয়া। আর যখন খোদ মাতামহীকেই মাতার অপেক্ষা অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা দিতে পারি না; তখন মাতৃস্বসাদিগকেই বা মাতার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে পারিব কেন? যে ভক্তি সংস্কৃত ভাষাকেও দিতে প্রস্তুত নহি, সে ভক্তি হিন্দী গুর্জ্জরী প্রভৃতিকে দিতে পারিব কেন? মাতার উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা মাতারই প্রাপ্য; বাঙ্গলা ভাষার উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা বাঙ্গালির কাছে বাঙ্গলা ভাষাই চিরদিন পাইবেন।

বাঙ্গলার পূজা।

মাতৃভাষা মাতার ন্যায় পূজনীয়া। মাতৃভাষার পূজা কিরূপে করিতে হয়, আয়র্লণ্ডের স্বদেশহিতৈষীরা তাহা আমাদিগকে শিখাইয়া দিতেছেন। আয়র্লণ্ড ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্গত,—অঙ্গীভূত। বিলাতের পার্লেমেণ্টেও আয়র্লণ্ডের লোকে সভ্য হইয়া থাকেন। আয়র্লণ্ডের লর্ডেরা লর্ড হাউসে বসেন,আয়র্লণ্ডের ১০৩ জন সভ্য 'কমন' সভায় বসেন। আয়র্লণ্ডের সুইফট্, গোল্ড্স্মিথ, মুর প্রভৃতি ইংরেজি ভাষায় সুন্দর সুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্য ইংরেজ কবির কাব্য অপেক্ষা আদরে সম্মানে হীন নহে। আয়র্লণ্ডের লেকি ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল ইংরেজি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার আদর ইংলণ্ডেও অসীম। আয়র্লণ্ডের জষ্টিন মাকার্থির মত ইংরেজিলেখক ইংলণ্ডেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বর্ক ও শেরিডান আয়র্লণ্ডের কুলতিলক। আইরিষ ওকনেল গ্রাটান প্রভৃতির ইংরেজি বক্তৃতা এখনও সকলের আদর্শ। ভারতের বড় লাট লর্ড মেয়ো আয়র্লণ্ডে জন্মিয়া আয়র্লণ্ডে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস আয়র্লণ্ডের সুসন্তান। আয়র্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা হীন নহে। আয়র্লণ্ডে যাঁহারা বারিষ্টার হন, তাঁহাদিগের অধিকার ইংরেজ বারিষ্টারদিগের সমান। আয়র্লণ্ডের লোকে সর্ব্বাংশেই ইংরেজের সমতুল্য। ইংরেজি ভাষা আয়র্লণ্ডের একপ্রকার জাতীয় ভাষাই হইয়া গিয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইংরেজ, স্কচ্, ওয়েল্শ এবং আইরিষের কোনরূপ তারতম্য নাই।

তথাপি আয়র্লণ্ডের আইরিষ,আইরিষ ভাষার—আপনার মাতৃসমা গেলিক ভাষার—প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে যেরূপ যত্ন করিয়া থাকেন, বঙ্গের বাঙ্গালি সেরূপ করেন না। ছয়শত বৎসরের আধিপত্যে ইংরেজিভাষা আয়র্লণ্ডের একপ্রকার জাতীয় ভাষাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি আইরিষ স্বীয় মাতৃভাষার মঙ্গলার্থে নিজের ধন প্রাণাদি সমস্তই ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, অকাতরে ছাড়িয়া দিতেও তিনি সমর্থ।

ভারতের পরম সৌভাগ্য! রাজা ইংরেজ আইরিষদিগকে মাতৃভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বীতরাগ করিবার জন্য ছয় শত বৎসর ধরিয়া যত্ন চেষ্টা বিধিব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ভারতের ভারত-সন্তানকে মাতৃভাষায় সেরূপ বীতশ্রদ্ধ ও বীতরাগ না করিয়া তিনি বরং জাতশ্রদ্ধ এবং জাতরাগই করিবার তরে নিরন্তর যত্ন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

আয়র্লণ্ডের ভাষাগত অবস্থার পরিচয়টা পাঠক একজন আইরিষের মুখেই শ্রবণ করুন। বৃটিশ পার্লেমেণ্টের আইরিষ সভ্য টমাস ওডনেলের প্রবন্ধেই আইরিষ ভাষার রহস্য গ্রহণ করুন। ওডনেল বলিতেছেন;—

১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এক আইন করিয়া আয়র্লণ্ডে আইরিষ ভাষার ব্যবহার রহিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। সেই আইনে বিধান হয়,—"যে ব্যক্তি আইরিষ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে বা পত্রাদি লিখিবে, সেই দণ্ডনীয় হইবে। সে যদি স্বীয় ভবিষ্যৎ সদাচরণের জন্য—আর কখনও মাতৃভাষা মুখে আনিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞার

প্রতিপালন করিবে বলিয়া—উপযুক্ত রাজভক্ত লোককে জামিন দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই সরকারে বাজে-আপ্ত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি আইরিষ কৃষককে আইরিষ ভাষায় শিক্ষা দিবে, তাহারই কারাদণ্ড না হয় অর্থদণ্ড হইবে!"

তথাপি আইরিষ নিজের মাতৃভাষাকে একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। ওডনেল সাহেব বলিতেছেন "তথাপি আয়র্লণ্ডের অন্ততঃ ১০লক্ষ লোক এখনও আইরিষ ভাষার ব্যবহার করে; মাতৃভাষায় কথাবার্ত্তা করিতে পারে।"

কেন পারে? আইরিষ ভাষার সঞ্জীবতা কিসে রক্ষা পাইয়াছে—কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে?

ওডনেল সাহেবের মুখেই উত্তর লউন। তিনি বলিতেছেন, "আমরা মাতৃভাষার—আমাদের প্রিয় গেলিক ভাষার—মঙ্গলের জন্য যে সভা করিয়াছি, এখন তাহার ২০৮ শাখা চারি দিকে বিরাজ করিতেছে। এই সকল শাখার লক্ষ লক্ষ উদ্যোগী সভ্য দেশের চারিদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতেছেন; মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন ও উন্নতিবিধান করিতেছেন। যেখানে আইরিষ, সেইখানেই সভার শাখা। আমেরিকা আইরিষে পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের ভাষারক্ষণী সভার শাখাও আমেরিকায় অনেক বসিয়াছে। ইংলণ্ডে আইরিষ আছে; নিজ ইংলণ্ডেও সভা হইয়াছে। লণ্ডনে সভা আছে, লিবারপুলে সভা আছে, মেঞ্চেষ্টারে সভা আছে। আমি নিজে অনেকস্থলে মাতৃভাষায়—আমার গেলিক ভাষায়—বক্তৃতা করিয়াছি। আমার মুখে মাতৃভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া যত আইরিষ আনন্দিত হইয়াছে; সকলেই উৎসাহ অনুরাগের পরিচয় দিয়াছে।"

আয়র্লণ্ডের রাজনীতিক ওডনেল যাহা বলিয়াছেন, পাঠক তাহা শুনিলেন; আবার ধর্ম্মপ্রচারক পাদরি ওডনেল যাহা বলিয়াছেন, তাহারও একটু শ্রবণ করুন। পাদরি বলিতেছেন—

"মাতৃভাষার গৌরব প্রতিপত্তি যতদিন না বাড়িবে, ততদিন দেশের কোনরূপে উন্নতি হইবে না। মাতৃভাষার আদর যেরূপ বাড়িবে, দেশের মঙ্গল সেইরূপ হইবে। মাতৃভাষায় যাঁহার অটল অচল অনুরাগ নাই, তিনি প্রকৃত দেশভক্ত বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত নহেন। যে মাতৃভাষার বিরাগী, সেত জন্মভূমির সুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকারী নহে।"

পাদরি ওডনেল বলিতেছেন, "আয়র্লণ্ডের যেখানে দেখিবে মাতৃভাষার আদর আছে, যেখানে দেখিবে সম্প্রদায়ের সকল লোকেই মাতৃভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে, সেইখানেই যত লোকের মুখে, নর নারী বালক বালিকার মুখে, মনুষ্যত্বের আভাস পাইবে। দেখিবে, মনের মহত্ব মুখে ফুটিতেছে।"

পার্লেমেণ্টে ৮৫ জন স্বদেশহিতৈষী আইরিষ সভ্যের যে একটী দল আছে, সে দলের প্রতিপত্তি নিতান্ত কম নহে। সেই দলের প্রধান পরিচালক রেডমণ্ড সাহেব কি বলিতেছেন, একবার শ্রবণ করুন। রেডমণ্ড বলিতেছেন;—

"আমাদের মাতৃভাষা—গেলিক ভাষাই—আমাদিগের জাতীয়তারক্ষায় সমর্থ হইবে। আইরিষ হৃদয়ের আইরিষ ভাব, আইরিষ সংস্কার, আইরিষ চিন্তা, এই আইরিষ ভাষাই সর্ব্বত্র উত্তেজিত করিয়া রাখিবে। অন্যথা আমাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হইয়াই থাকিবে। আইরিষ ভাষার গৌরব থাকিলেই, আইরিষ জাতির গৌরব থাকিবে; আইরিষ জীবনের গৌরব থাকিবে।"

আইরিষ রাজনীতিক ওডনেলই বলিতেছেন,—

"আইরিষ ভাষাই আইরিষের স্বাতন্ত্র্য—আইরিষের আইরিষত্ব বজায় রাখিতেছে। আইরিষ ভাষার কল্যাণেই, আইরিষ জগতের সর্ব্বত্র, সুদূর জগৎপ্রান্তেও, আইরিষ বলিয়া, পরিচয় দিতে পারিতেছে।"

আয়র্লণ্ডের এক মহাকবি বলিয়াছেন,—

"মাতৃভাষা—শৈশবের ভাষা—যে জাতির সজীব না থাকে, সে জাতি কখনই সজীব থাকিতে পারে না; দোলনার ভাষা কবরে গেলে, জাতিকেও কবরে যাইতে হয়।"

পূর্ব্বে যাহাই হইয়া থাকুক, এখন কিন্তু আয়র্লণ্ডে আইরিষ ভাষা আবার সজীব হইতেছে। মরা গোড়ায় আবার ডেউড় গজাইতেছে। যেখানে আইরিষ ভাষার আদর, সেইখানেই সুফল। আয়র্লণ্ডে জাতীয় শিক্ষার যে কমিশন বা সভা আছে, মহামতি সার প্যাটরিক কীনান তাহার অধ্যক্ষ। দেশের যত বিদ্যালয়ই এই কমিশনকে দেখিতে হয়। সুতরাং সার প্যাটরিক কীনানের অভিজ্ঞতা সর্ব্ববাদিসম্মত তিনি বলিতেছেন;—

"যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সকল আইরিষ সন্তানেরই আইরিষ ও ইংরেজি, দুই ভাষায় শিক্ষালাভ করা উচিত।

যেখানে দেখিয়াছি, আইরিষ বালক বালিকারা আইরিষ ছাড়িয়া—মাতৃভাষা ভুলিয়া—কেবল ইংরেজি শিখিতেছে, সেইখানেই ফল দেখিয়া, হতাশ ও বিস্মিত হইয়াছি; সেইখানেই যত বালক বালিকার মুখে যেন নির্ব্বুদ্ধিতাই ফুটিয়া বাহির হইতেছে; মুখে চোখে যেন জড়তাই বিরাজ করিতেছে। সকলের উচিত, প্রথমে আইরিষ ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়া, পরে আইরিষ ভাষার সাহায্যে ইংরেজিবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করা।"

সার প্যাটরিক কীনান নিজের রিপোর্টে আয়রলণ্ড সম্বন্ধে যে কথা কহিয়াছেন, আমাদের শিক্ষাবিভাগের যে কোন কীনানই স্বকীয় রিপোর্টে সেই কথা কহিতে অধিকারী; সত্যই এই কথা কহিতে বাধ্য। সার প্যাটরিক বলিতেছেন:—

"গত বৎসর আমাকে পরিদর্শনব্যপদেশে অনেক স্থানের অনেক বিদ্যালয়ে অনেকবার যাইতে হইয়াছে। অনেক বালক বালিকার পরীক্ষাও আমাকে লইতে হইয়াছে। বালক বালিকাদিগকে ইংরেজি ভাষায় প্রশ্ন করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে, ইতস্ততঃ করিতেছে। কিন্তু যাই আইরিষ ভাষায় প্রশ্ন করিয়াছি, অমনই দেখিয়াছি, সকলের মুখে একটা জ্যোতি বাহির হইতেছে, উৎসাহ যেন ফুটিয়া পড়িতেছে; আর আইরিষ প্রশ্নে আইরিষ ভাষায় উত্তর দিবার সময়ে সকলেই বিচিত্র দক্ষতারই পরিচয় দিতেছে।"

অনেক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন করা—এক স্থানে শত শত বালক বালিকার পরীক্ষা করা—এক সময়ে আমাদের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। আমাদের সামান্য সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাও কিন্তু সার প্যাটরিকের অসামান্য অসংকীর্ণ অভিজ্ঞতারই পথে যাইতেছে। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি—জন্মভাষা ও জন্মভূমি—স্বভাবতঃ সকলের কাছে জননীসমা। নানা কারণে যে ব্যতিক্রম হয়, তাহাই অস্বাভাবিক। স্বার্থ, অভিমান, অবুদ্ধিই লোককে মাতৃভাষার বিরাগী করিয়া, অন্য ভাষার অনুরাগী করে। কিন্তু যেখানে বহুদর্শিতা, সেইখানেই এক মত। সেইখানেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, "অর্থ বা অন্যরূপ স্বার্থের জন্য অন্য ভাষা শিখিতে পার, কিন্তু মাতৃভাষায় কদাচ বিরাগী হইও না। ভিন্ন জাতীয় রাজার রাজ্যে রাজভাষা ভাল করিয়া না শিখিলে চলে না, কিন্তু নিজের ভাষাও যেন সদা লক্ষ্য থাকে। রাজভাষায় স্বার্থসম্পাদন কর, রাজভাষায় জ্ঞানসম্পাদন কর, রাজভাষায় বিদ্যাবর্দ্ধন কর; আপত্তি নাই। কিন্তু সকল স্বার্থ যেন মাতৃভাষার অর্থে নিযুক্ত হয়; সকল বিদ্যা, সকল জ্ঞানই যেন মাতৃভাষায় সংযুক্ত হয়।" আয়রলণ্ডের জাতীয় শিক্ষাসমিতির অধ্যক্ষ সার প্যাটরিক কীনানের বাক্য বেদবাক্য! আয়রলণ্ডের যত আইরিষকে—যত শিক্ষক ও পরিদর্শককে—তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

আমাদের পথ আইরিষের মত দুর্গম বন্ধুর নহে। রাজা আমাদের জাতীয় ভাষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। আমাদের আদালতে জাতীয় ভাষার গৌরব আছে। আমাদের আইনেরও রাজাদেশে জাতীয় ভাষায় অনুবাদ এবং প্রচার হয়। আমরা জাতীয় ভাষায় রাজদ্বারে অভাব, আকাঙ্ক্ষা জানাইতে পারি। আমাদের সকল বিদ্যালয়েই জাতীয় ভাষার আদর আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও জাতীয় ভাষা এখন একেবারে অনাদৃত নহে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা আমাদের জাতীয় ভাষায়—বাঙ্গালী আমাদের বাঙ্গলা ভাষায়—বীতরাগ হইয়া থাকি, তাহা হইলে, এ মহাপাপ আমাদের; এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। জননী মাতা, জন্মভূমি মাতা, আর ভাষা মাতা; এই তিন মাতাই আমাদের পূজ্যা। এক মাতায় অভক্তি হইলেই আমাদিগকে মাতৃদ্বেষী হইতে হইবে।

আমাদের কাজ কর্ম্মে, আমাদের সমিতি সভায়, আমাদের চিঠী পত্রে, আমাদের পুস্তক পুস্তিকায়, আমাদের সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রে—যদি আমরা আমাদের বাঙ্গলাকেই একাধিপত্য করিতে না দিই, তাহা হইলে আমরা মাতৃদ্বেষী, আমরা মহাপাপী নরাধম। ইংরেজি ভাষা—রাজভাষা। আমাদের মাতৃভাষা নহে, বাঙ্গলাই আমাদের মাতৃভাষা, কোন্ ভাষায় আমাদিগের অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত, কোন্ ভাষায় আমাদের অধিক যত্ন অনুরাগ রাখা উচিত, তাহা বুঝা সহজ। যে ভাষায় আমরা শৈশবে "মা" বলিয়াছি, যে ভাষায় এখনও আমরা "মাকে" ডাকিতেছি, যে ভাষায় আমাদের পুত্র কন্যা এখন "মা" বলিতেছে—আমাদিগকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে, যে ভাষায় আমরা সুখ সমৃদ্ধি উৎসবের সময়ে আনন্দে করিতেছি, যে ভাষায় দুঃখের সময়ে কাতরতা-প্রকাশ করিতেছি, যে ভাষায় আমরা হাসিতেছি, যে ভাষায় কাঁদিতেছি, যে

ভাষায় বিপৎকালে ভগবান্‌কে ডাকিতেছি, যে ভাষায় মরণকালে হরিনাম করিতেছি, সেই ভাষা—আমাদের সেই মাতৃভাষা—বাঙ্গলীর সেই বাঙ্গলা ভাষা—কিরূপ পূজনীয়া—কিরূপ মাননীয়া—কিরূপ বরণীয়া—কিরূপ স্মরণীয়া—কিরূপ ভরণীয়া—তাহা যদি আমরা না বুঝি, তাহা হইলে আমাদের মত নরাধম—আমাদিগের মত পশুর অধম—জগতে আর নাই। নরকের শয়তানসন্তানেরাও মাতৃভাষা ভুলিতে পারে না!

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র।

যে মহাপুরুষগণের মরজীবন অতি সুমধুর ও সুপবিত্র সৌরভে সুরভিত, যাঁহাদের মহাশিক্ষাময় চরিত্র-কাহিনী আলোচনা করিলে, মনের সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা বিদূরিত হয়, স্বর্গগত কালীকৃষ্ণ মিত্র সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাজনগণের অন্যতম। আজ দশবর্ষ হইল কালীকৃষ্ণবাবুর মর্ত্ত্যবাসের অবসান হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ বাবুর নামোল্লেখ করিলেই আর দুইটী পুণ্যশ্লোক বঙ্গসন্তানের কথা মনে পড়ে—স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার। এই দুই মহাত্মা কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত চিরজীবন প্রাণে প্রাণে বাঁধা ছিলেন। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই তিন মহাত্মার জীবনবৃত্ত আলোচনা করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, এই তিনটী জীবনস্রোত মুখ্যতঃ একই খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহজ্জীবনের কথা সর্ব্বজনবিদিত, প্যারীচরণ বাবুর অপেক্ষাকৃত অপরিজ্ঞাত জীবনী যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সে চরিত্র কত সুদুর্লভ ও উচ্চাদর্শে গঠিত। আর কালীকৃষ্ণ বাবুর মর্ত্ত্যবাস-কাহিনী এত মধুর, এত পবিত্র ও এত মহান্ যে, সে কথা আলোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, পাছে ক্ষুদ্র হৃদয় ও অক্ষম লেখনী সে ইতিহাসের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিয়া ফেলে, সে চরিত্রের শুভ্র সৌন্দর্য্য মলিনতাস্পৃষ্ট করে। কালীকৃষ্ণবাবু সুধী ও গুণগ্রাহী সমাজে "A Modern Rishi" "মহর্ষি" "The Sage of Baraset" "Philosopher" "জ্ঞানাগার" প্রভৃতি অভিধায় সম্ভাষিত হইয়াছিলেন, দীন দরিদ্রগণ তাঁহাকে মানবাকারে দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করিত।

কালীকৃষ্ণ বাবু খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবনারায়ণ মিত্র। শিবনারায়ণ বাবু দর্জ্জিপাড়ার বনিয়াদি মিত্র বংশীয় এবং তিনি সুপ্রসিদ্ধ "ছাতুবাবু"র নিকট আত্মীয় ছিলেন। শিবনারায়ণ বাবুর চারি পুত্র, কালীকৃষ্ণ বাবু

তৃতীয়। পিতার সাংসারিক অবস্থার অসচ্ছলতা নিবন্ধন কালীকৃষ্ণ বাবু ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়কে পাঠ্যাবস্থায় দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। কালীকৃষ্ণ বাবু বাল্যকালে হেয়ার সাহেবের স্কুলে, সেই চিরপূজনীয় শিক্ষাগুরুর পাদমূলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। এবং ঐ কলেজে বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার স্বীয় বৃত্তিলব্ধ অর্থ হইতে, প্রকৃতপক্ষে নিজেই নির্ব্বাহ করেন; এবং সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কালীকৃষ্ণ বাবু পিতৃহীন হয়েন।

কালীকৃষ্ণ বাবুর অগ্রজদ্বয়ের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, বিদ্যানুশীলনে অনন্যসাধারণ সাফল্যলাভ তাঁহাদের বংশগত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺কৃষ্ণধন মিত্র হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার জন্য এরূপ খ্যাতি লাভ করেন, যে তিনি Encyclopœdia Britannica নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি শব্দকোষ গ্রন্থ এদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহাপণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব, ঐ দুরূহ কর্ম্মভার এদেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া, কৃষ্ণধন বাবুকে প্রশংসা জ্ঞাপন করেন ও উৎসাহ দান করেন। নির্ম্মম মৃত্যু কৃষ্ণধন বাবুকে সেই কীর্ত্তি রাখিয়া দিবার অবসর দেন নাই, তিনি যৌবনকালেই অনুমান বিংশতিবর্ষ বয়সে এ জগৎ হইতে অপসৃত হয়েন। কৃষ্ণধন বাবু ৺রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং ডি এল্ রিচার্ডসন্ সাহেবের সম্পাদিত Oriental Pearl নামক পত্রে "K. D. M." শীর্ষক কৃষ্ণধনবাবুর বিয়োগজনিত শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তদীয় প্রতিভালোকদীপ্ত জীবনের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কালীকৃষ্ণ বাবুর মধ্যমাগ্রজ ৺নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়েন—নবীনবাবুই মেডিক্যাল কলেজের প্রথম স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত ছাত্র। উত্তরকালে নবীন বাবু চিকিৎসা-বিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শিতা লাভ করেন; লোকে তাঁহাকে ধন্বন্তরী বলিত। নবীন বাবুর গবেষণা কেবল ভৈষজ্যশাস্ত্রেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি ইংরাজি সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষও সচরাচর দেখা যায় না। নবীন বাবু কাশিমবাজারের ৺রাজা কৃষ্ণনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং সেই সূত্রে উভয়ে অকৃত্রিম প্রীতি-ডোরে আবদ্ধ হয়েন। একবার রাজা কৃষ্ণনাথ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ নবীন বাবুকে একলক্ষ মুদ্রা অর্পণ করিয়াছিলেন; নবীন বাবু বন্ধুর দান গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সহিত সেই উপহার প্রত্যাখ্যান করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাত সময়ে নবীনবাবু, এদেশীয় ছাত্রগণকে ইংরাজি ফরাশী জর্ম্মান্ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন করিবার উদ্দেশে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগী হয়েন এবং উহার গঠন-প্রণালী নিজেরই বিদ্যা ও প্রতিভাবলে লিপিবদ্ধ করেন। রাজা কৃষ্ণনাথ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, স্বীয় উইলে, নবীনকৃষ্ণ বাবুকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থে বহুলক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। দৈবদুর্ব্বিপাকে নবীনবাবুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কামনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। রাজা কৃষ্ণনাথের শোচনীয় মৃত্যুকালে নবীন-কৃষ্ণবাবু পীড়িত অবস্থায় সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন ৺মহারাণী স্বর্ণময়ীর আপত্তিতে তাঁহার স্বামীর উক্ত উইল ধর্ম্মাধিকরণে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে! সে ইতিহাস এখানে উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন। কালীকৃষ্ণবাবু উক্ত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদ্বয়ের উপযুক্ত ভ্রাতা, কালীকৃষ্ণবাবুর মনস্বিতা দেশের গৌরবস্থানীয়।

পঠদ্দশায় কালীকৃষ্ণবাবু হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কলেজে বিদ্যাশিক্ষা কালীকৃষ্ণবাবুর জ্ঞানার্জ্জনের প্রথম সোপান মাত্র, তিনি জীবনব্যাপী অবিরাম গবেষণায় ও নৈসর্গিক ক্ষমতাবলে এরূপ প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে এ দেশে তাঁহার সমকক্ষ বিদ্যান্ ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অতি প্রবল ছিল, তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থবারিধি মন্থন করিয়া সেই অদম্য তৃষ্ণা নিরারণ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থাতেও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণ তাঁহার জন্য কলিকাতা ও অপরাপর স্থানের শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয়সমূহ হইতে অবিরত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সেই অধ্যয়ন-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইতেন না। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে গভীর চিন্তাশীল ও দুরূহ গ্রন্থ সমূহ আয়ত্ত করিতেন,

যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং যে পুস্তক একবার কালীকৃষ্ণবাবুর অধীত হইত, তাহার গূঢ়তম রহস্য চিরদিনের জন্য তাঁহার নিজস্ব হইয়া যাইত। কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি আধ্যাত্ম সকল শাস্ত্রই তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। পরন্তু একাধিক শাস্ত্রে তাঁহার গবেষণা ও জ্ঞান অতি গভীর ছিল। ইণ্ডিয়ান মিরার লিখিয়াছেন "He was at his death we believe one of the most up to date scholars of our country, keeping abreast of the latest contributions to human knowledge by an enthusiastic and unwearied application to books in more than one language"*—'আমাদের বিশ্বাস তিনি মৃত্যুকালে, জ্ঞানের আধুনিক বিকাশে সুপরিজ্ঞাত, একজন এদেশীয় মহামনীষী ব্যক্তি ছিলেন। সাগ্রহ ও অক্লান্ত অভিনিবেশের সহিত একাধিক ভাষার গ্রন্থসমূহে অধ্যয়নরত থাকিয়া, মানবসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের অভিনব সম্পদ আহরণ করিয়া তিনি উন্নতির পথে কালের সহগামী ছিলেন।'

কালীকৃষ্ণবাবুর অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বতোমুখী ছিল; কিন্তু উদ্ভিজ্জ ও কৃষিবিদ্যা (Botany and Agriculture), নিদানশাস্ত্র, ভৌতিক বা অতিপ্রকৃত বিদ্যা (Spiritualism), যোগশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। উদ্ভিজ্জ ও কৃষিবিদ্যায় তিনি সমকালীন ব্যক্তিগণের মধ্যে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যাদ্বয়ের অনুশীলন তাঁহার পুঁথিগত ছিল না, তিনি উহার কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন করিতেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন, তিনি জীবনের একটী মুখ্যব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ব্রত সমাধানের আশায় তিনি অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকর পাশ্চাত্য দেশে আবিষ্কৃত নব নব যন্ত্র সমূহ আনাইয়া তিনি পরীক্ষা করিতেন এবং কৃষিজীবিগণকে ঐসকল বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাক্ষেত্র হইয়াছিল বারাসতে নবীনকৃষ্ণবাবুর সুবিশাল ও সুবিখ্যাত উদ্যানে। ঐ উদ্যানে কালীকৃষ্ণবাবু একটী আদর্শ কৃষিভাণ্ডার (Model Farm) উন্মুক্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ উদ্যান-প্রসূত শস্যাবলীর উৎকর্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রশংসা উদ্রিক্ত করিত। ঐ উদ্যানে কালীকৃষ্ণবাবু বায়ুমান, তাপমান বারিসম্পাতমান প্রভৃতি আবহবিদ্যা (Meteorology) সংক্রান্ত যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া উহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতেন, এবং উন্নতপ্রণালীতে বিদেশীয় হল-চালনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্তিকার উপাদান সমূহের কেবল গুণজ্ঞাপক বিশ্লেষণ (qualitative analysis) করিয়া নিরস্ত ছিলেন না, উহাদের পরিমাণজ্ঞাপক বিশ্লেষণ (quantatative analysis) করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কৃষিরসায়ণ শাস্ত্রেও (agricultural chemistry) তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রও কালীকৃষ্ণবাবু বিশেষ অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; অগ্রজ নবীনকৃষ্ণবাবুর উক্ত বিদ্যানুশীলনের আগ্রহই বোধ হয় প্রথমাবস্থায় অনুজের জ্ঞানপিপাসু হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। পরে কালীকৃষ্ণবাবুর স্বাভাবিক পরহিতকামনা ঐ বিদ্যার প্রতি অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত করে। শেষাবস্থায় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শাস্ত্রেরই তিনি আলোচনা করিতেন। হোমিওপ্যাথী বিষয়ক কোন পুস্তকই তাঁহার অনধীত ছিল না এবং ঐ বিষয়ে, তিনি এত পুস্তক রচনা ও বিনা নামে কেবল মাত্র দরিদ্র গৃহে বিতরণের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে সেগুলি হিন্দু পেট্রিয়টপত্রের কথায়, "তাহাদের রচয়িতার বিদ্যা ও পরিশ্রমের এক মহাকীর্ত্তি" ("a monument of their author's learning and industry")।* যোগশাস্ত্র, ভৌতিক বা অশরীরী আত্মা সম্বন্ধীয় যাবতীয় অলৌকিক বিদ্যালোচনায় তাহার নিরতিশয় আস্থা ছিল। তিনি ঐ বিদ্যানুশীলনের জন্য বারাসতে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠ্য-সমিতি (Truth Seekers' Reading club) নামক একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অতিপ্রকৃতে নিষ্ঠাবান বহুতর বিদেশীয় ও দেশীয় প্রথিতনামা ব্যক্তির সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় হইত, এবং উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার জন্য তিনি অভিনন্দিত হইতেন। "থিয়জফিষ্ট" পত্র বলেন যে, কালীকৃষ্ণবাবু পরলোক-প্রয়াণের সময় অলৌকিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট এবং সুসম্পূর্ণ পুস্তকাগার রাখিয়া যান ("left one of the best and most

* Indian Mirror 18th August, 1891.

* Hindu Patriot 3rd August, 1891.

complete libraries of occult literature"* হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদীয় কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রই কালীকৃষ্ণবাবুর অপরিজ্ঞাত ছিল না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ পাঠ ও আয়ত্ত করিতেন। কিন্তু কোনও এক শাস্ত্র বিশেষের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সর্ব্বশাস্ত্রালোচনা জনিত প্রগাঢ় মনীষিতার জন্যই কালীকৃষ্ণবাবু বিদ্বজ্জন সমাজে বরেণ্য হইয়াছিলেন।

অনেকে আক্ষেপ করেন, কালীকৃষ্ণবাবু তদীয় অপরিমেয় পাণ্ডিত্যের কোন স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সে বিষয়ে কোনও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াও বোধ হয় না। ইহার একটী কারণ আছে এবং সেই কারণটাই বোধ হয় তাঁহার অসাধারণ জীবনের বিশেষত্ব। তিনি যেরূপ জ্ঞানতৃষাতুর ছিলেন, তাহাতে কোনও সারবান গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কালীকৃষ্ণবাবু পরদুঃখ নিবারণই জীবনমার্গের ধ্রুবনক্ষত্র স্থির করিয়া সেই মুখেই প্রধাবিত হইয়াছিলেন, গ্রন্থকাররূপে বরিত হইবার কামনা বা অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি জানিতেন, জগতের জ্ঞান সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য দেশ দেশান্তরের শত শত সুধীজন নিয়োজিত আছেন, সেই জ্ঞান সাগরে তাঁহার বিন্দুবারি দান না করিলে জগতের বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু তিনি যদি স্বদেশীয় নিম্নশ্রেণীস্থ, অসহায় ও নিরক্ষর ব্যক্তিগণের ও অজ্ঞান তিমিরমগ্ন বঙ্গরমণীগণের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের কণা মাত্রও প্রবেশ করাইতে পারেন, তিনি যদি দেশীয় শ্রমজীবি কৃষিজীবিগণের শোচনীয় অবস্থার কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নতি বিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার মানবজীবনের উদ্দেশ্য মহত্তররূপে সফল হইবে! তাই কালীকৃষ্ণবাবু কৃষকগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করিয়া গ্রাম্য বালিকাগণের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া, পীড়িতের চিকিৎসা, নিরন্নকে অন্ন দান, আর্ত্তকে সান্ত্বনা করিয়া আপনার মূল্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দুঃখ দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, উহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিত, অর্থনীতির তুলাদণ্ডে উচিত অনুচিত বিচার করিবার সামর্থ্য থাকিত না, তিনি কি নিকট-চিন্তা ঠেলিয়া দূরের চিন্তা করিতে পারেন? তিনি কি প্রত্যক্ষ শত হাহাকারের মধ্যে বাস করিয়া জগতের পরোক্ষ বা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত হইবার অবসর পাইতে পারেন? তাই কালীকৃষ্ণবাবু গ্রন্থরচনায় তাঁহার যোগ্য কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তিনি আপনার জীবনটীকে কায়োমনোবাক্যে একটী পরার্থপরতার ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন।

পরন্তু যে প্রবল কামনার প্রেরণায় লেখকগণ সাধারণতঃ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, সেই কামনার অস্তিত্ব কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনে একেবারে ছিল না। যশোলিপ্সা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, অহংজ্ঞান তিনি হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন, প্রশংসায় আত্ম-প্রসাদ লাভ করা দূরে থাকুক, ভক্তের অযাচিত প্রশংসাবাদে তিনি যেন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেন, তাঁহাকে বড় বলিলে তিনি যেন মনে ব্যথা পাইতেন। এমন কি স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণ তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি লইয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করেন, এ প্রস্তাবও তাঁহার প্রীতিকর হইত না, তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁহার "ফটো" গ্রহণ করিবার অনুমতি দেন নাই; এ স্থলে যে ছবিখানি প্রদত্ত হইল উহা কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনান্তের পর গৃহীত হইয়াছিল। উহা তাঁহার অন্তিম শয্যাশায়ী প্রাণহীন নশ্বর দেহের প্রতিকৃতি।

কোন অমর গ্রন্থ রচনা না করিলেও কালীকৃষ্ণ বাবুর লেখনী অলস ছিল না। তিনি লিখিতেন, প্রচুর পরিমাণে লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী ধারণের উদ্দেশ্যও তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যের একটী সহযোগী উপায় মাত্র,—পরহিতসাধন। তিনি যখনই কোন প্রবন্ধ রচনা করিতেন, বা পুস্তক প্রকাশ করিতেন, তাহা জনসাধারণের পাঠের জন্য, সমাজের মঙ্গল ও শিক্ষার জন্য, দরিদ্রের উপকারের জন্য। কালীকৃষ্ণ বাবুর ইংরাজি ও বঙ্গভাষায় উক্তরূপ রচনার বিরাম ছিল না, এবং পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি বিনা নামে প্রকাশিত হইত।

হিন্দুকলেজে পাঠ সাঙ্গ করিয়া অনুমান বিংশতি বর্ষ বয়সের সময় কালীকৃষ্ণ বাবু ও তদীয় অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ বাবু সপরিবারে বারাসতে যাইয়া বাস করেন, এবং বারাসতেই কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনের অবশিষ্ট, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল অতিবাহিত হয়। বারাসতে তাঁহাদের মাতুলাশ্রম ছিল

* Theosophist, October, 1891.

এবং পরে ঐ স্থানে তাঁহারা উদ্যান ও বসত বাটী নির্ম্মাণ করেন। কালীকৃষ্ণ বাবু আজন্ম ক্ষীণকায় ও অসুস্থ ছিলেন এবং সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহাকে অন্ন সংস্থানের জন্য পরের দাসত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। অগ্রজ নবীনকৃষ্ণবাবু তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে দেন নাই, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে কালীকৃষ্ণ বাবুকে সে চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। নবীনকৃষ্ণ বাবু নিজে চিকিৎসা ব্যবসাতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, এবং সেই অর্থ প্রাণাধিক কালীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; তিনি জানিতেন কালীকৃষ্ণের হস্তে অর্থের যেরূপ সদ্ব্যবহার হইবে, জগতে আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হইবে না। উদারতা ও করুণায় ভ্রাতৃদ্বয় আজীবন এক প্রাণ ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ বাবুর বারাসতে বসবাস স্থাপনের অল্পদিন পরেই, ইংরাজি ১৮৪৬ অব্দে স্বর্গগত বাবু প্যারীচরণ সরকার স্থানীয় নবস্থাপিত গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বারাসতে গমন করেন। সেই সময়ে নবীনকৃষ্ণ বাবু ও কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত প্যারীবাবুর যে ঘনিষ্ঠ প্রীতি বর্দ্ধনের সূত্রপাত হয়, তাহা বন্ধুত্রয়ের জীবনান্ত পর্য্যন্ত সমভাবে বেগবান ছিল। উত্তরকালে কালীকৃষ্ণ বাবু ও প্যারীচরণ বাবুর সৌহার্দ্দ দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়াছিল। কালীকৃষ্ণ বাবু এবং প্যারীচরণ বাবু উভয়েই তখন যৌবনাবস্থায়। উভয়েই সমাজের হিতকল্পে যৌবনদৃপ্ত উদ্যমে সর্ব্বান্তকরণে আগুয়ান্। উভয় বন্ধুর সমবেত চেষ্টায়, নবীনকৃষ্ণ বাবুর সমপ্রাণতাময় সহায়তায় এবং তৎকালীন বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) মহামান্য চার্লস বেনি ট্রেবর (C. B. Trevor) সাহেবের সহৃদয় উৎসাহে বারাসতের সেই সময়ে যেরূপ শ্রীশোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। সেই সময়েই বারাসত স্কুল বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করে, সেই সময়েই বারাসতে বঙ্গদেশের প্রথম কৃষিবিদ্যালয় (Agricultural School), শ্রমজীবিগণের বিদ্যালয় (Industrial school) বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস (Hostel for Students), প্রতিষ্ঠিত হয়। এ গুলি সমস্তই প্যারীচরণ বাবুর কীর্ত্তি; তিনি বারাসতে কর্ম্মবীররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই প্যারীচরণ বাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন; তিনি বারাসত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতেন, শ্রমজীবিগণকে শিক্ষা দিতেন, স্থানীয় জনগণকে ঐ সকল সদনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব সাধনের জন্য, উহাদের সাফল্য লাভ কার্য্যে সহায়ার্থ সর্ব্বপ্রযত্নে উদ্বোধিত করিতেন, এবং বন্ধুবর প্যারীচরণ বাবুকে কায়মনোবাক্যে উৎসাহ দিতেন। তৎকালীন শিক্ষা সভার (Council of Education) ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের ও পরবর্ত্তী কালের বার্ষিক বিবরণগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় কালীকৃষ্ণবাবু বারাসতের এই নবীন অনুষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধনে কত তৎপর ছিলেন এবং কত পরিশ্রম করিতেন। তিনি স্থানীয় শিক্ষা সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

ঐ সময়ে বারাসতে আর একটী সদনুষ্ঠান হয়, যাহার জন্য বঙ্গদেশীয় স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে কালীকৃষ্ণ বাবু ও প্যারীচরণ বাবুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত, তাঁহারাই বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রথম গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তখনও স্মরণীয় বীঠন্ বালিকা বিদ্যালয় (Bethune Girl School) প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এই গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় তিন বর্ষ পরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ঐ বীঠন্ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উষাযোগে এই বন্ধুযুগলকে ও তাঁহাদের পরম সহায় নবীনকৃষ্ণ বাবুকে উক্ত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সমাজের নিকট বহুতর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এমন কি, হিন্দুসমাজও ধর্ম্ম বিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়া স্থানীয় কোন জমিদার পুঙ্গব তাঁহাদের প্রাণ হননের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় অটল থাকিয়া সেই সমাজসমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ট্রেবর ও জ্যাকসন্ সাহেব তাঁহাদের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয় কয়েক বর্ষ স্থায়িত্বলাভ করিলে তৎকালীন শিক্ষাসভা গবর্মেণ্ট তাঁহাদের বঙ্গের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপয়িতা বলিয়া অতি প্রশংসমান বাক্যে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, উৎসাহ দিয়াছিলেন, এবং বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সহৃদয় ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন।* মহামতি বীঠন্ (Drink

* General Report on Public Instruction, Bengal for 1849-50, pages 4-5.

water Bethune), সার্ জেমস্ কল্‌ভিল (Sir James Colvil) প্রমুখ উচ্চ পদস্থ ইংরাজগণ এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে বারাসতে গমন করিতেন, স্থাপয়িতাগণকে বিবিধ প্রকারে উৎসাহ দিতেন, বালিকাগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। নবীনকৃষ্ণ বাবুদের বাটীতেই এই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত, এবং বিদ্যালয়ের স্বপক্ষ কয়েক জন সহৃদয় ব্যক্তির পরিবারস্থ বালিকাবর্গকে লইয়াই প্রথমে এই বিদ্যালয় উন্মুক্ত হয়। নবীন বাবুর কন্যা—৺কুন্তীবালা ই (যিনি সুলেখিকা বলিয়া তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য সংসারে পরিচিতা হইয়াছিলেন) এই স্মরণীয় বিদ্যালয়ের প্রথমা ও শ্রেষ্ঠা ছাত্রী। কিয়দ্দিন পরে যখন বারাসতবাসিগণ অবগত হইলেন যে, কালীকৃষ্ণ বাবু নিজে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন, তখন তাঁহাদের অনেকেরই নিজ নিজ কন্যাগণকে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আপত্তি রহিল না, কালীকৃষ্ণ বাবুর সুপবিত্র চরিত্রের উপর তাঁহাদের আনুপূর্ব্ব এত ভক্তি ছিল! সেই কঠিন সমস্যার সময় কালীকৃষ্ণ বাবুর চরিত্র-গৌরবই ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের সাফল্য লাভের একটী প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়াছিল।

বারাসতে আট বর্ষ অবস্থানের পর প্যারীচরণ বাবু কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের (হেয়ার স্কুলের) হেড মাষ্টার পদে উন্নীত হইয়া ১৮৫৪ সালে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়েন। সেই সময় হইতে প্যারী বাবুর অনুষ্ঠিত সুকীর্ত্তিগুলি যাহাতে বিলুপ্ত না হয় তজ্জন্য কালীকৃষ্ণ বাবুকে সচেষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। শ্রমজীবি ও কৃষি বিদ্যালয়টী বিস্তৃত আকারে তিনি নিজ উদ্যানে সংস্থাপন করিয়া পরিচালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে কালীকৃষ্ণ বাবু সপরিবারে ঐ উদ্যানস্থ ভবনেই বাস করিতেন।

বারাসাতের এই দেড়শত বিঘা ভূমি বিস্তৃত উদ্যান নির্ম্মাণে নবীন কৃষ্ণ বাবুর লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এবং কালীকৃষ্ণবাবুর জীবনব্যাপী সযত্ন পরিশ্রমে উহা নন্দন-শ্রী ধারণ করিয়াছিল। অত দুষ্প্রাপ্য দেশীয় ও বিদেশীয় নানা জাতীয় ফল পুষ্পাদির তরুলতায় সুশোভন উদ্যান তৎকালে এ অঞ্চলে আর ছিল না। সার্ আস্‌লি ইডেন প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এই উদ্যানের মুক্ত কণ্ঠে গুণগান করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্যান যেমন একদিকে বিদেশীয় ও কল্পানুরাগিগণের নিকট শ্রী সম্পদের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তেমনি আবার আদর্শ কৃষি ভাণ্ডার ও কৃষি জীবিগণের শিক্ষা-ক্ষেত্র বলিয়া স্বদেশ হিতৈষিগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণের নিকট এই উদ্যান উচ্চতর সম্মান লাভ করিয়াছিল—মহর্ষি কালীকৃষ্ণর আশ্রম বলিয়া। এই পরম রমণীয় প্রকৃতির নিভৃত নিলয়ে কালীকৃষ্ণ বাবু শান্তিময় ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতেন। সেই শান্তি উপভোগ করিবার জন্য এবং প্রিয়তম বন্ধুর সাহচর্য্য লাভ করিবার জন্য প্যারীচরণ বাবু অবসর পাইলেই সেই উদ্যানে গমন করিতেন। কোন কোন দিন কালীকৃষ্ণ বাবুর অপর সুহৃদ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্যারীবাবুর সহযাত্রী হইতেন। নবীনকৃষ্ণ বাবু কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার সময় ঝামাপুকুরে বাস করিতেন, সেই বাসা বাটীতে নবীনকৃষ্ণ বাবু ও কালী বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতা জীবনান্ত স্থায়ী অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে পরিণত হয়। প্যারীবাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ ও লোকহিতকর যাবতীয় মহদনুষ্ঠানে কালীকৃষ্ণ বাবু সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ সংস্কারের এবং প্যারীচরণ বাবুর মাদক নিবারিণী সভার কালীকৃষ্ণ বাবু এক জন ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সামাজিক ব্যবহারে ও ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে অতি উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং সমাজের হিতকর দেশের উন্নতিকর যাবতীয় সংস্কার চেষ্টায় অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণপণে সহায়তা করিতেন, সমাজস্থ দলপতিগণের সঙ্কীর্ণ মতামতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারী বাবু এই বারাসতবাসী বন্ধুর নিকট অনেক সদনুষ্ঠানের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্যারী বাবুর সম্পাদিত "Well Wisher" "হিতসাধক" ও "এডুকেশন গেজেট" পত্রগুলির কালীকৃষ্ণ বাবু একজন প্রধান লেখক ছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবুর লেখনী প্রসূত "বিধবাবিবাহ" "কৃষিবিদ্যা" স্ত্রীশিক্ষা' "মাদক নিবারণ" প্রভৃতি বহুবিধ উৎকৃষ্ট, চিন্তাশীল ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ এই পত্রগুলিকে অলঙ্কৃত করে। ক্রমশঃ—

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

অমর জীব।

জীবমাত্রই মরণশীল। মৃত্যুর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইতে পারে এমন জীব দেখা যায় না। মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা সকলেরই জন্ম আছে, সকলেরই মৃত্যু আছে। জীবগণ জন্মগ্রহণের পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শৈশব ও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হয়। এই সময়ে তাহারা বংশরক্ষার নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করে। যৌবনের পর আর তাহাদের শরীরের বৃদ্ধি হয় না, বরং ক্ষয় হইতে থাকে এবং বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া তাহারা জীবন-লীলা সাঙ্গ করে। যে খাদ্য ভোজন করিয়া, যে অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া, বাল্যে ও যৌবনে তাহাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছিল, যৌবনের পরে সেই খাদ্য ভোজন করিয়া ও সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আর তাহাদের শরীরের পুষ্টি হয় না। শারীরিক যন্ত্র সকলের কার্য্যক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে,—বার্দ্ধক্য ও স্থবিরতার বাহ্যলক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়,—অবশেষে দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। ইহাকেই প্রাণ-বিয়োগ, জীবনান্ত বা মৃত্যু বলে।

দেখিতেছি জীবন থাকিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু বলিতে স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই বুঝিতে হইবে। অপঘাত বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলিতেছি না। আঘাতে ছিন্ন হইয়া, চাপে নিষ্পেষিত হইয়া, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, বা রসাভাবে শুষ্ক হইয়া দেহ যন্ত্রের ক্রিয়ার রোধ বশতঃ যে মৃত্যু, সে মৃত্যু শৈশব বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই ঘটিতে পারে। সে মৃত্যু স্বাভাবিক নহে, সে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে অনেকেই পারে। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের যে ধীর ক্ষয়, ক্রমিক শিথিলতা,—পূর্ব্বে যে অবস্থার মধ্যে থাকিয়া দেহ-যন্ত্রের কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছিল, পরে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আর সেরূপ চলে না—তৈলক্ষয়ে দীপ শিখার ন্যায় ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া অবশেষে যে নির্ব্বাণ, তাহাই স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহা বার্দ্ধক্যে বা জীবনের শেষ দশাতেই ঘটে। এ মৃত্যুর হাত এড়াইতে কাহাকেও দেখা যায় না।

তাহাতেই কথা উঠিয়াছে জীবমাত্রেই মরণশীল। এ কথাটা খুব সত্য, তবে খাঁটি সত্য নহে। অমর জীবেরও আবিষ্কার হইয়াছে।

নিষ্প্রবাহ জলাশয়ের তলে জল ও পঙ্ক মধ্যে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক প্রাণী বাস করে, তাহাদের দেহাবয়বের কিছু মাত্র জটিলতা নাই। দেহ একটি মাত্র কোষে গঠিত, তাহার কোনই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। কোষ কি? একবিন্দু গাঢ় তরল পদার্থ থলির মধ্যে আবদ্ধ। অনেক সময়ে এই থলি বা কোষের সূক্ষ্ম আবরণও থাকে না—কেবল মাত্র আবরণশূন্য একবিন্দু তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই পদার্থ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, না-তরল, না-কঠিন, অর্থাৎ গাঢ় তরল,—নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন প্রভৃতির জটিল রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন ডিম্ব-শ্বেতবৎ পদার্থ। এই পদার্থ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি জীবনী শক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয় না। ইহাই জীবনের আদি ও একমাত্র লীলাক্ষেত্র। সেই জন্য ইহার নাম প্রোটোপ্লাজম, আদি ধাতু বা জীবন-ধাতু। প্রোটোপ্লাজমেই জীবনের বিকাশ। প্রোটোপ্লাজম তৈয়ার করিতে পারিলেই জীবনের সৃষ্টি করিতে পারা যাইবে। ইতঃপূর্ব্বে এক সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে এরূপ প্রবল আশা জাগ্রত হইয়াছিল যে, তাঁহারা জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন দশ রকম জটিল রাসায়নিক পদার্থের সংগঠন করিতে পারিতেছেন, সেইরূপ একদিন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যথাবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রোটোপ্লাজমের সৃজন করিয়া জড়ে জীবন সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু হায়! যতই জ্ঞানের উন্নতি ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, প্রোটোপ্লাজম নির্ম্মাণ করিয়া জীবনোৎপাদন করিবার আশা বৈজ্ঞানিকের হৃদয় হইতে মরু মরীচিকার ন্যায় ততই দূরে পলায়ন করিতেছে।

এই প্রোটোপ্লাজম পদার্থকে তাঁহারা অন্যান্য রাসায়নিক যৌগিক-পদার্থের ন্যায় যতটা সরল মনে করিতেন, এখন আর ততটা সরল সুতরাং সহজ রচনীয় বলিয়া মনে করেন না। ইহার রাসায়নিক সংযোগ এত জটিল যে, অদ্যাবধি কেহই ইহার বিশ্লেষণ করিয়া কোন্ পরিমাণে কি কি উপাদানে ইহা গঠিত, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্ব্বে যে পদার্থকে নিরবচ্ছিন্ন সমভাবাপন্ন বোধ হইত, অধুনা অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে ফেনিল ও জটিল রচনা-প্রণালী সম্বলিত দৃষ্ট হয়।

জীবন-ধাতুময় কোষকে জীবন-কোষ বলে। অনুবীক্ষণের তলে জীবন-কোষস্থিত জীবন-ধাতুর মধ্যে তৈল বিন্দু, শ্বেতসার বিন্দু প্রভৃতি জীবনী শক্তির ক্রিয়া সমুদ্ভূত বহুবিধ জটিল রাসায়নিক পদার্থের কণা সকল দৃষ্ট হয়। জীবন কোষের মধ্যে একস্থানে সূক্ষ্মাবরণবেষ্টিত আর একটি ক্ষুদ্র কোষ দৃষ্ট হয়, তাহাকে অন্তঃকোষ বা কেন্দ্রাণু (nucleus) বলা হয়। অন্তঃকোষের পদার্থ জীবন-ধাতু হইতে গাঢ়তর ও ভিন্ন। অন্তঃকোষের ধাতুতে যে যে রাসায়নিক উপাদানের সমাবেশ ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়, জীবন-কোষের ধাতুতে তাহা হয় না। এই অন্তঃকোষ বা কেন্দ্রাণুর মধ্যে অনেকগুলি সূত্রবৎ বা জালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়।

অন্তঃকোষ-সম্বলিত জীবন-ধাতুময় এক একটি কোষ এক একটি জীবন-কোষ। জীবন-কোষ জড়পদার্থের ন্যায় নির্জ্জীব নহে। ইহা জীবিত-চেষ্টা বিশিষ্ট।

অনুবীক্ষণের সাহায্যে পঙ্কমধ্যে এইরূপ জীবিতচেষ্টা-বিশিষ্ট এক-কোষী জীব অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরলদেহী—আমিবা।

আমিবা প্রাণিজগতের আদিম বা নিকৃষ্টতম প্রজা। আমিবা চমৎকার প্রাণী। আমিবা বিশিষ্ট-আকার শূন্য, অবয়ব রহিত। আমিবা গোল, আমিবা লম্বা। আমিবার হস্ত পদ নাই, আমিবার বহু হস্ত পদ। আমিবার মুখ নাই, আমিবা মুখময়। আমিবার উদর নাই, আমিবা উদরময়। আমিবার নাসিকা নাই, অথচ সর্ব্বাংশই নাসিকার কার্য্য করে।

যে একটিমাত্র জীবন-ধাতুময় কোষে আমিবার দেহ গঠিত তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। দেহ-পদার্থ জীবন-ধাতুময় বর্ণহীন গাঢ় তরল।

অনুবীক্ষণের তলে কাচ-ফলকের উপর আমিবাকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। আমিবার পা নাই, পাখা নাই, ডানা নাই, এককথায় চলিবার কোন অঙ্গ নাই, তথাপি আমিবা চলে। দেহাকৃতির আকুঞ্চন প্রসারণ ও পরিবর্ত্তনেই আমিবার গমন কার্য্য সাধিত হয়।

আমিবা সদা গতিশীল। দেহ সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষণে বর্ত্তুলাকৃতি, ক্ষণে চক্রাকৃতি, ক্ষণে লম্বাকৃতি, ক্ষণে তারকাকৃতি ধারণ করে। তাহার কোমল দেহ প্রতি নিমিষে

আমিবার বিভিন্নরূপ ধারণ।

নানা ভিন্নরূপ ধারণ করে। দেহ হইতে অঙ্গুলি সদৃশ অনেকগুলি ক্ষেপনী বা স্পর্শনী বাহির করে, আবার সেগুলি গুটাইয়া দেহমধ্যে বিলীন করে।

আমিবার শ্বাস প্রশ্বাসের কোন নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র নাই, অথচ তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নিয়ত চলিতেছে। জলে যে বায়ু সংমিশ্রিত থাকে, তাহা হইতেই শরীরের সর্ব্বাংশ দ্বারা অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া পরে শরীর হইতে অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করিয়া তাহার জীবন যন্ত্র চালাইতে থাকে।

বিভিন্ন আকারে নিরন্তর ভ্রমণ উপলক্ষে তাহার দেহ-বিলম্বিত অঙ্গুলি সদৃশ কোন স্পর্শনী, বা দেহের অপর কোন অংশ, যদি ক্ষুদ্রতর কোন উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ পদার্থের সংস্পর্শে উপস্থিত হয়, তবে আমিবা আপন তরল সুকোমল দেহটি সেই পদার্থের দিকে ঠেলিয়া বা ঢালিয়া দেয়।

আমিবার ভোজন-প্রণালী।

তাহাতে অচিরে সেই পদার্থ আমিবার দেহ-ধাতু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও আবৃত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। আমিবা এইরূপে খাদ্য উদরসাৎ করে। গ্রস্ত বা ভুক্ত পদার্থটি শীঘ্রই আমিবা দেহের সহিত সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে বিলীন হইয়া যায়। যে অংশ দেহের সহিত একেবারে মিলিয়া মিশিয়া না যায় তাহা দেহাভ্যন্তর হইতে বহিষ্কৃত ও নিক্ষিপ্ত হয়। আহার্য্য গ্রহণ করিবার কোন বিশেষ অঙ্গ না থাকিলেও দেহের যে কোন অংশ আহার্য্য-সংস্পৃষ্ট হয় সেই অংশ দিয়াই আহার্য্য দেহমধ্যে প্রবেশ করে। আমিবা মুখ-বিবর-হীন হইয়াও খাদ্য উদরসাৎ করে, উদর-হীন হইয়াও খাদ্যের পরিপাক করে।

আমিবার বিলক্ষণ অনুভূতি আছে। অভিপ্রেত অনভিপ্রেত বিচার করিবার, খাদ্যাখাদ্য বাছিয়া লইবার শক্তি আছে। চলিতে চলিতে বালু-কণা বা অপর কোন অখাদ্য বস্তুর সহিত তাহার স্পর্শনী সংস্পৃষ্ট হইলে, ধীরে ধীরে স্পর্শনীটি সংকুচিত করিয়া পিছাইয়া আইসে ও সেই অসার পদার্থকে এক পার্শ্বে রাখিয়া পুনরায় অগ্রসর হয়। উত্তাপের কিম্বা চাপের হ্রাস বৃদ্ধি করিলে, উত্তেজক বা অবসাদক রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ করিলে, আমিবা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে, তাহার দেহের গতির বৃদ্ধি বা নিবৃত্তি করে। দৈহিক উত্তেজনার বাহ্য প্রকাশ অনুভূতির লক্ষণ।

প্রচুর খাদ্য পাইলে আমিবা-দেহের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। নিত্য নূতন পদার্থ দেহে শোষিত হইতে থাকিলে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। কোন আমিবাই খুব বড় হইতে পায় না, কিয়ৎকাল বর্দ্ধনের পর দেহমধ্যে একটি চমৎকার ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতেই তাহার দেহের আর বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে আমিবা মন্থরগতি প্রাপ্ত হয়, স্পর্শনী সকল সঙ্কুচিত হয়। তাহার দেহ-কোষ-মধ্যস্থিত অন্তঃ-কোষটি স্বতঃ দ্বিধা ভিন্ন হইয়া দেহকোষের দুই প্রান্তে অবস্থিতি করে, এবং দেহকোষের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহ-কোষটিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দেয় এবং দুইটি ভিন্ন জীব-কোষের উৎপত্তি হয়। এই এক একটি জীব-কোষ এক একটি আমিবা।

একটি আমিবা বিভক্ত হইয়া দুটি স্বতন্ত্র আমিবার উৎপত্তি হইল, উৎপন্ন আমিবাদ্বয়ের প্রত্যেকটি প্রথমটির অর্দ্ধাংশ। ইহারা প্রত্যেকে প্রথমটির ন্যায় জীবনবৃত্তির পরিচালনা করিতে থাকিবে এবং যথাকালে দ্বিখণ্ড হইয়া
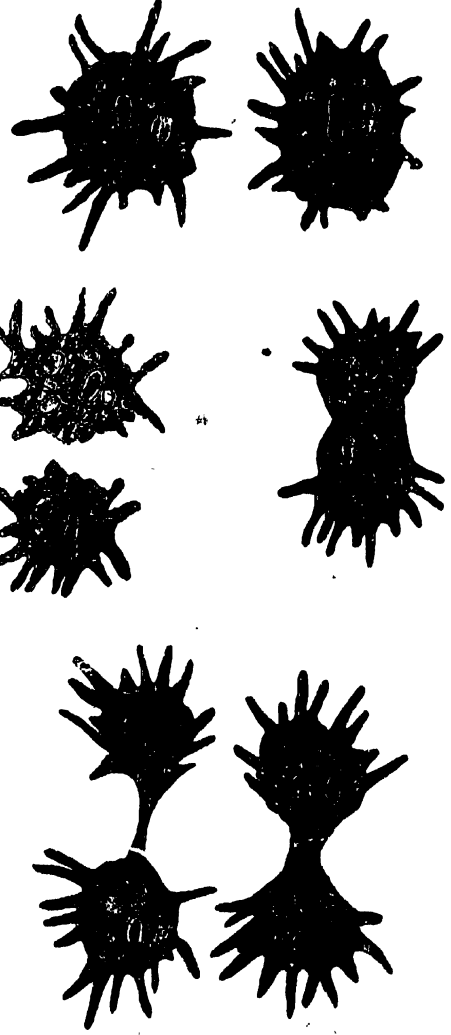
আমিবার বংশবৃদ্ধির প্রণালী।

চারিটি আমিবার সৃষ্টি করিবে। সেই চারিটি আবার যথাকালে বিভক্ত হইয়া আটটি আমিবার সৃষ্টি করিবে। অবস্থা অনুকূল থাকিলে এইরূপেই আমিবা বংশের বিস্তার হইতে থাকিবে। আমিবার স্ত্রী পুরুষ নাই। সন্তান উৎপাদনে স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষা রাখে না। একটি আমিবা যখন দুই

আমিবায় পরিণত হইল, তখন প্রথমটি কোথায় গেল? তাহার কি মৃত্যু ঘটিল? তাহা ত নহে। তাহার দেহযন্ত্র ত বিকল হইয়া পড়িয়া নাই। পূর্ব্বে ছিল একটি যন্ত্র, এখন হইল দু'টি যন্ত্র, দু'ই কার্য্যক্ষম, দু'ই জীবন্ত।

যে আমিবা বৃদ্ধির চরম সীমায় উপস্থিত হইল সে বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে আসিল। দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যে দুটি আমিবার সৃষ্টি হইল তাহারা নূতন, তাহাদের যৌবন দশা। পুরাতন আমিবা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া জরা বার্দ্ধক্য পরিহার করিয়া নবযৌবন লাভ করিল। পুনরায় বৃদ্ধ হইলে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নবযৌবন লাভ করিবে।

আমিবার জীবনপর্য্যায় যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে তবে আমিবার মৃত্যু কোথায়? যেটি অপর প্রাণী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে বা জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িবে তাহারই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। অন্য কাহারও মৃত্যু ঘটিবে না।

অনুবীক্ষণের তলে অদ্য যে আমিবাকে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে দেখিতেছি, সে ভূতলে মানবের আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কোন তড়াগ বা পল্বলে প্রথম আবির্ভূত আদিম আমিবা। আমিবা অজর অমর।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

কুকিজাতির বিবরণ।*

(১)

পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিমধ্যে কুকিগণ সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর ও নিরক্ষর। ইহাদের ন্যায় হিংস্র স্বভাবাপন্ন জাতিও আর দেখা যায় না। কুকিদিগের আহার বিহার এবং আচার ব্যবহারাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদিগকে রাক্ষস নামে অভিহিত করা যাইতে পারে!

কুকিগণ কিরাত বংশোদ্ভব। ইহারা অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজমালার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ইহাদের তেইশটি শ্রেণীর নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের অনুসন্ধানে তদতিরিক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও সম্প্রদায় থাকা সম্ভবপর; কিন্তু তাহা বিশুদ্ধরূপে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। যে ছাব্বিশটি সম্প্রদায়ের নাম সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

(১) পাইতু, (২) চোটলাং, (৩) খরেং, (৪) বাইকেই, (৫) আমড়ই, (৬) চম্লেন, (৭) বল্তে, (৮) রিয়েতে, (৯) বাল্তে, (১০) রাংচন্, (১১) রাংচিয়ে, (১২) ছাইলই, (১৩) জংতেই, (১৪) পাটলেই, (১৫) বেতলু, (১৬) পাইতে, (১৭) ফুন, (১৮) ফুনতেই, (১৯) লেন্তেই, (২০) হ্রালতেই, (২১) সওয়ালই, (২২) পওয়াকুতু, (২৩) ধুন, (২৪) বুরদইয়া; (২৫) ছলজেন; (২৬) রাংতে।

এতদ্ব্যতীত আর একটি সম্প্রদায়ের কুকি আছে, তাহারা "হালাম্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন হালামগণ কুকি ও ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী সঙ্করজাতি। মূলতঃ তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব না হইলেও হালামগণ কুকিজাতির মধ্যেই পরিগণিত। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা এবং ত্রিপুরার রাজ-সরকারি কাগজপত্র আলোচনায় যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা হালামগণ কুকিজাতির একটি সম্প্রদায় বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। হালাম সম্প্রদায়ও অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত। তাহার এক একটি শাখাকে "দফা" বলে। কৈলাস বাবু ইহাদের ত্রয়োদশটি দফার নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদের অনুসন্ধানে সতরটি দফার নাম সংগ্রহ হইয়াছে, যথা:—

(১) মুতিলাংল, (২) কর্ব্বং, (৩) বংশের, (৪) লঙ্গাই, (৫) লছবাং, (৬) চড়ই, (৭) মরছম, (৮) রূপণী, (৯) খুলং, (১০) কলই, (১১) দাপ, (১২) রাংখল, (১৩) কাইপেং, (১৪) থাঙ্গাছেপ্, (১৫) শাখাছেপ্, (১৬) খগলং, (১৭) মুর্ছাফাং।

নোয়াতিয়া ও জমাতিয়া দফাকেও কেহ কেহ কুকিসংসৃষ্ট সঙ্করজাতি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা কুকিসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, উত্তরে কাছাড় ও মণিপুর, এবং দক্ষিণে আরাকাণ, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী দশ সহস্র বর্গমাইল পরিমিত পার্ব্বত্য ভূমিতে কুকিগণ বসবাস করিয়া আসিতেছে।

* এই প্রবন্ধের অতি অল্প অংশ 'নির্ম্মাল্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ ঘটনাবশতঃ উক্ত পত্রিকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, তৎকালে অবশিষ্টাংশ প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া, অপ্রকাশিত অংশের সহিত পুনঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন কোন কুকিসম্প্রদায়কে বাসস্থানের নামানুসারে পরিচিত হইতে দেখা যায়। লুসাই পর্ব্বতবাসী কুকিগণ সাধারণতঃ "খচাক্" নামে অভিহিত। কিন্তু কাছাড়বাসিগণ ইহাদিগকে "লুছাই" বলিত। এই লুছাই শব্দ হইতেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট "লুসাই" শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, লঙ্গাই উপত্যকাবাসী হালামগণই "লঙ্গাই" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুকিগণ মধ্যে মধ্যে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা কোথা হইতে আসিয়া বর্ত্তমান বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছে, এবং ইহাদের প্রকৃত জনসংখ্যা কত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।* আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের বংশাবলী ও কোন কোন সম্প্রদায়ের স্থান পরিবর্ত্তনাদির বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশ করিব।

কুকিগণের সকল শ্রেণীর ভাষাই মূলতঃ এক। তবে উচ্চারণের তারতম্যের দরুণ সামান্য রকমের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের ভাষার সহিত মণিপুরী ভাষার কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"মণিপুরী ভাষার সহিত কুকি ভাষার ও শব্দের বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও মণিপুরী ভাষার স্বর ও গঠনের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কুকিদিগের উচ্চারিত ভাষাও কণ্ঠ, তালু, দন্তোষ্ঠ ও মূর্দ্ধাভিঘাতজনিত সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ আবশ্যক হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মূর্দ্ধণ্য বর্ণ উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে।"

"সাময়িক সমালোচনার সমালোচন ও মীমাংসা" নামক পুস্তকে কুকিগণের ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"—এই সকল শ্রেণীর ভাষা মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন নহে। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদিগের ভাষার সহিত পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগের ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিগত যেরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, ইহাদিগের শ্রেণী সমুদয়ের ভাষাতেও পরস্পর সেইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—৩০ পৃঃ।

হালাম সম্প্রদায়ের এক দফার সহিত অন্য দফার ভাষার উচ্চারণগত এত পার্থক্য দেখা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেক দফার ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে।

কুকি ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোনও কথা বলিবার পক্ষে আমরা অধিকারী নহি। অদ্যাপি কুকি ভাষার অক্ষর প্রচলন হয় নাই। ইহা ত্রিপুরা ভাষার ন্যায় সংকীর্ণ নহে। এই ভাষা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের মনোগত ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। এবং ইহা শ্রুতিমধুরও বটে। কিন্তু ত্রিপুরা ভাষা সংকীর্ণ হইলেও কাপ্তান লে উইন্ সাহেব, বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমান্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে সেই ভাষারই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।*

কুকিগণের চেহারায় অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের বর্ণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কিছু কাল, নাসিকা অপেক্ষাকৃত উন্নত, এবং ওষ্ঠ পাতল। ইহাদের মধ্যে অনেকের নিবিড় শ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, বাঙ্গালীর সংস্পর্শে ইহাদের আকৃতিগত এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে কাপ্তান লে উইন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আরাকাণ ও ব্রহ্মদেশবাসিগণের চেহারা হইতে কুকিগণের চেহারা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। তাতার বা মঙ্গোলিয়ানদিগের সহিত ইহাদের মুখের সাদৃশ্য নাই। ইহাদের বর্ণ কাল, গণ্ডস্থল সাধারণতঃ পালিশ, (মুখ চাপা নহে)। অনেকের ঘন দাড়ি গোঁপ আছে। বাঙ্গালির রক্ত সংমিশ্রণে তাহাদের চেহারার এবম্বিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কুকিগণ অনেক বাঙ্গালী পুরুষ ও রমণীকে কয়েদ করিয়া নিয়াছিল, বাঙ্গালীর রক্ত তাহাদের মধ্যে মিশিবার ইহাই কারণ।"

তিনি আবার উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে বন্দী করিয়া নেওয়া হইয়াছে, এমন কথা জানি না। অথচ কুকিগণের মধ্যে পাকা শ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধও দেখা গিয়াছে।"

শেষোক্ত বাক্য আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কাপ্তান লে উইন্ তাঁহার প্রথমোক্ত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিজেই সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু কৈলাসবাবু সেই সন্দেহ দূর করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"আমরা গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছি যে, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কুকিজাতির অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। তদবধি বাঙ্গালী রমণী সংযোগে কুকিবংশ বৃদ্ধি হইতেছে।" রাজমালা,—৩য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এই বাক্য আলোচনায় প্রকাশ পাইতেছে, বহুকাল হইতেই কুকির সহিত বাঙ্গালীর সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং লে উইন্ সাহেবের ভ্রমণ কালে কুকিগণের মধ্যে ঘন দাড়ি গোঁপ বিশিষ্ট প্রাচীন লোক দেখা বিচিত্র নহে।

* বিগত সেন্সাস অনুসারে স্বাধীন ত্রিপুরাবাসী কুকিগণের জনসংখ্যা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, যথাস্থানে তাহা সন্নিবেশিত হইবে।

* Lewin's Hill Tracts of Chittagong, P. 99.

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, বাঙ্গালীর সংস্রবেই কুকিগণের আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে এই রকমের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। লে উইন্ সাহেব কিছু দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের চেহারার সহিত ইহাদের চেহারার তুলনা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের সহিত যাহারা এক পর্ব্বতে বাস করিতেছে (ত্রিপুরা, রিয়াং প্রভৃতি), তাহাদের সহিতও ইহাদের আকৃতিগত বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটি কুকির প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত ইহাদের আকৃতিগত পার্থক্য অনেক বেশী।

পর্ব্বতজাত বাঁশ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে, বাঁশের পাতাদ্বারা ছাউনি দেয় এবং বাঁশের বেত দ্বারাই বাঁধিয়া থাকে। মধ্যস্থলে বৃত্তাকারে আঙ্গিনা রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে গৃহ নির্ম্মাণ করে। কুকিগণ মৃত্তিকা দ্বারা গৃহ-ভিত্তি প্রস্তুত করে না। বাঁশের দ্বারা উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি বাস করে। এই মঞ্চের নীচে পালিত পশু—শূকর, ছাগ ইত্যাদি রাখা হয়। মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবার নিমিত্ত মাচার উপরই একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লয়। মল ইত্যাদি নীচে পড়া মাত্র শূকরে ভক্ষণ করে। ইহারা খুব বড় বড় ঘর প্রস্তুত করিয়া থাকে। এবং বাঁশের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য করিয়া ও রং ফলাইয়া গৃহগুলি সুসজ্জিত করে। এক এক গৃহে ৩০।৪০ জন পর্য্যন্ত লোক

সাধারণ কুকী।

সাধারণতঃ বহুসংখ্যক কুকি একত্রিত হইয়া, নিবিড় অরণ্য মধ্যে কতক স্থান আবাদ করিয়া তথায় বাস করে। ইহাদের এক একটি বাড়ী পাড়া নামে অভিহিত। ইহারা

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে বাস করিতে দেখা যায়। কোন কোন গৃহে আগন্তুকগণের অবস্থানের জন্য একটি প্রকোষ্ঠ রক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জীর্ণ গৃহ পুনঃ

সংস্কার করে না। এক গৃহ ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে, তৎপরিবর্ত্তে আবার নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বিনা ব্যয়ে গৃহ প্রস্তুতের উপাদান পাওয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের এই অভ্যাস জন্মিয়াছে। ঘন ঘন স্থানপরিবর্ত্তনও ইহার একটি কারণ বটে।

কুকিগণের একতা ও সমাজবন্ধন অতীব প্রশংসনীয়। ইহারা এক পল্লীতে বহুলোক একত্র বাস করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক গৃহেও বহুসংখ্যক লোক বাস করে। কিন্তু ইহাতেও বিবাদ বিসম্বাদ বা মনোমালিন্য ঘটিতে বড় একটা দেখা যায় না। কুকিগণের রাজা অথবা পাড়ার সরদারই তাহাদের সমাজের নেতা। কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষের দণ্ড অথবা সমাজের উপর কোনও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণের মত গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং সমাজপতির স্বেচ্ছাচারী হইবার সুবিধা নাই। কোন ব্যক্তি সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সামাজিক কঠোর শাসন সহ্য করিতে হয়, এজন্য সমাজে উচ্ছৃঙ্খল লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কুকি জাতির মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীরই প্রাধান্য বেশী। পুরুষকে এক রকম রমণীর অধীন হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সুখের কথা এই যে, সভ্যসমাজে অনেকস্থলে স্ত্রী-স্বাধীনতার যে সকল বিষময় ফল ফলিতে দেখা গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে তদ্রূপ ঘটনা বড় একটা ঘটিতে দেখা যায় না। ইহাদের সমাজে ব্যভিচার-দোষ অতি বিরল। সামাজিক কঠোর শাসনই বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ। বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ ব্যভিচারের কথা প্রকাশ পাইলে তাহাদিগকে সামাজিক কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। এজন্য বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে প্রায়ই ব্যভিচার দোষ দেখা যায় না। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীর ব্যভিচার তত দোষাবহ নহে। এরূপ ঘটনাস্থলে তাহারা প্রায়ই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায়। কোনও অনিবার্য্য কারণে তাহাদের মধ্যে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন পক্ষে বাধা ঘটিলেও ইহারা কোনরূপ কলঙ্কিত বা সমাজে ঘৃণনীয় হয় না। ইহা আধুনিক সভ্যসমাজের 'কোর্টসিপ'এর ন্যায় মার্জ্জনীয় হয়।

কুকি-সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই পরিণত বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীপুরুষের প্রণয়মূলেই সম্পাদিত হয়। কোন কোন বিবাহ বর ও কন্যার অভিভাবকগণের দ্বারাও সাব্যস্ত হইয়া থাকে। সকলে মিলিয়া অপরিমিত মদ্য ও মাংস উদরসাৎ করা এবং নৃত্যাদি * আমোদ ব্যতীত ইহাদের বিবাহে অন্য কোনরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হয় না। ইহাদের মধ্যেও কন্যা-পণের বিষময় প্রথা প্রবেশ করিয়াছে। এই পণের পরিমাণ স্থলবিশেষে ১০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য হইতে দেখা যায়।

কুকিগণের মধ্যে "পরিত্যাগ" (Divorce) প্রথা প্রচলিত থাকিলেও তাহা সহজে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। বিশেষ কারণ বশতঃ একে অন্যকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, অথবা কেহ নিজে পরিত্যক্ত হইতে চাহিলে, তদ্বিষয়ে সমাজের নিকট আবেদন করিতে হয়। সমাজে আলোচিত হইয়া প্রার্থনার কারণ গুরুতর বলিয়া বুঝা গেলে আবেদন মঞ্জুর করা হয়। আর যদি পরিত্যাগ করিবার বা পরিত্যক্ত হইবার কারণ সামান্য বলিয়া উপলব্ধি হয়, তবে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় না। সমাজের এবম্বিধ বিচারের পরেও যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে প্রতিপক্ষের ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিকগণের ভোজের ব্যয় বহন করিতে হয়। তদ্রূপ করিলেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইল। তখন ইচ্ছানুসারে অন্য ব্যক্তির সহিত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত থাকার দরুণ কুকিগণের মধ্যে সচরাচর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহাদের সমাজে বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে।

কি সভ্য সমাজ, কি অসভ্য সমাজ সর্ব্বত্রই রমণীজাতির স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য ও কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কুকিগণ যেরূপ দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র স্বভাবাপন্ন, তাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, ইহাদের রমণীগণও ইহাদেরই ন্যায় উগ্র স্বভাবাপন্ন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের গৃহের অনেক মহিষাসুরমর্দ্দিনী উগ্রচণ্ডা

* কুকিগণের নৃত্য অতি ভয়াবহ দৃশ্য। ইহারা রণসাজে সজ্জিত হইয়া অস্ত্রাদি চালনা সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে।

মূর্ত্তি অপেক্ষা ইহারা শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতিবিশিষ্টা, চরিত্র-মাধুর্য্যও যথেষ্ট আছে।

সুন্দরী কুকিরমণীগণের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। ইহারা সাজগোজ বড়ই ভাল বাসে, কিন্তু মণিরত্ন বা স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য গহণার নিমিত্ত ইহারা লালায়িতা নহে। নানাবর্ণের পুঁতি, হস্তী-দন্ত ও মহিষের শৃঙ্গ বিনির্ম্মিত চুড়ী এবং নানাবিধ প্রস্তরের মালায় ইহাদের অলঙ্কারের কার্য্য সম্পাদিত হয়। খুব মোটা মোটা পিতলের শিকল ইহারা কটিতে পরিধান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা কর্ণের লতিকা বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে এমন বৃহদাকারের হস্তী-দন্ত নির্ম্মিত সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ, তদ্রূপ কুকিরমণীগণও এবম্বিধ বিস্তৃত কর্ণরন্ধ্র বড়ই পছন্দ করে। শিশুকালে ইহাদের কর্ণলতিকা বিদ্ধ করা হয়। পরে ক্রমে ক্রমে সেই ছিদ্র বাড়াইতে থাকে। ইহারা অতি পরিপাটি রকমে বেশবিন্যাস করিয়া থাকে। পুরুষগণও রমণীদিগের ন্যায় লম্বা চুল রাখিয়া কবরিবন্ধন করে এবং কর্ণে রূপার এক প্রকার চুঙ্গি পড়িয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি কুকি রমণীর প্রতিকৃতি পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তদ্দর্শনে ইহাদের আকৃতি এবং গহণা ও পরিচ্ছদাদির বিষয় কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কুকীরমণীগণ।

চুড়ী অথবা বাঁশের চুঙ্গি প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় যে, সেই চুড়ীর ভিতর দিয়া অনায়াসে হস্ত প্রবেশ করান যাইতে পারে। কর্ণলতিকার চর্ম্মদ্বারা সেই চুরীর বা চুঙ্গির চতুর্দ্দিক আবরিত থাকে। কর্ণের এবম্বিধ বিস্তৃত ছিদ্র আমাদের চক্ষে বড়ই কুৎসিত দেখায়, কিন্তু ইয়ুরোপীয় রমণীমহলে সরু কটি এবং চীন দেশীয় রমণীগণের ছোট পা যেমন

যে সকল প্রাণীর মাংস বা উদ্ভিজ্জাদি বিষাক্ত নহে, তাহার প্রায় সমস্তই কুকিগণের আহার্য্য। ইহারা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অথবা জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা মাংসাদি অর্দ্ধপক্ক মাত্র হয়। ইহাদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে লবণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের মসলা বা তৈল ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা

মাংসই ইহাদের উপাদেয় ও প্রিয় খাদ্য। তন্মধ্যে আবার হরিণ, খরগোস, হস্তী, অশ্ব, বিড়াল, বাঁদর, অজগর সর্প, গোসাপ এবং ভেক ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ। নানা কারণে এখন মনুষ্যটা খাদ্যশ্রেণী হইতে বাদ পড়িয়াছে। বর্ষার সময় শিকার করা কষ্টসাধ্য বলিয়া, ইহারা শীত ঋতুতে হস্তী ইত্যাদি নানাবিধ জন্তুর মাংস শুষ্ক করিয়া মজুদ রাখে।

ইহারা কুকুরকে তণ্ডুল ভক্ষণ করাইয়া তখনই তাহাকে বধ করে। অথবা মৃত কুকুরের উদরে চাউল পুরিয়া শেলাই করে। তৎপর সেই কুকুরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থ সিদ্ধ তণ্ডুল পরম উপাদেয়জ্ঞানে সেই অর্দ্ধসিদ্ধ কুকুরের মাংস সংযোগে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কুকিসমাজে এই খাদ্য আমাদের পোলাওয়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। কুকিগণ ইহাকে কি বলে জানিনা, বাঙ্গালীগণ এই খাদ্যকে "কুকুর-পিঠা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দুগ্ধ ইহাদের সমাজে নিতান্ত অখাদ্য বস্তু!

কুকিগণ অপরিমিত মদ্যপায়ী। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই সুরাপান করিয়া থাকে। তাহাদের পানীয় মদিরা আপনারাই চুয়াইয়া লয়। কিন্তু তাহা বিক্রয় করিতে পারে না। বিক্রয় করিলে, ত্রিপুর-রাজ্যের প্রচলিত আইনানুসারে "বিঝাড়ার" অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়।

কুকিরমণীর সাধারণ বেশ।

ইহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, সকলে মিলিয়া তাহার দেহ প্রোথিত করিয়া থাকে। এবং মৃতব্যক্তির স্বর্গকামনায় সামাজিকদিগকে প্রচুর পরিমাণে মাংস ও মদিরা দ্বারা ভোজ দেওয়া হয়। কোনও রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ না পুঁতিয়া অগ্নি উত্তাপে শুষ্ক করিয়া যতকাল পারা যায়, সযত্নে রক্ষা করে। যখন রক্ষার অযোগ্য হইয়া পড়ে, তখন সকলে মিলিত হইয়া, মহাসমারোহে সেই দেহ সমাহিত করিয়া থাকে।* এবং প্রধান প্রধান পর্ব্বোপলক্ষে মৃতরাজার উদ্দেশ্যে মাংস ও মদিরা উৎসর্গ করিয়া, তাহা ভোজন করে। মৃত্যুর পরে কয়েকদিবস শোক-বাদ্য-বাদন ভিন্ন ইহারা কোন প্রকারের শোক-চিহ্ন ধারণ করে না।

কুকিরমণীগণ অপ্রশস্ত ও ছোট এক এক খণ্ড বস্ত্র কটিতে জড়াইয়া পরিধান করে। এবং দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া থাকে। এই বক্ষ আবরক বস্ত্রখণ্ডের সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না। গৃহকার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকা কালে, অনাবৃত বক্ষে থাকিতেই দেখাযায়। ইহাতে তাহারা কোনরূপ লজ্জা বোধ করে না। কুকিরমণীগণ

* কৈলাশবাবুর লেখা দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল কুকিগণের মৃতদেহ দাহ করা হয়। এখন দেখিতেছি, আমাদিগের সে বিশ্বাস প্রকৃত নহে।

সর্ব্বদা যে অবস্থায় থাকে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কতিপয় রমণীর চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

পুরুষগণ আবশ্যক হইলে বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে মাত্র। অনেক সময় আবার বস্ত্র পরিধান না করিয়া, একখানা "পাছুড়ি" দ্বারা সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া চলে। আজ কাল যাহারা একটু সভ্য হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বদাই বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী, পুরুষ সকলেই উলঙ্গ হইয়া স্নান করে।

কুকিগণের শস্যোৎপাদন-প্রণালী ত্রিপুরাজাতির প্রণালীর অনুরূপ। ইহারা গভীর অরণ্য কাটিয়া, তাহা শুষ্ক হইলে অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দেয়। এই উপায়ে জঙ্গল পরিষ্কার হয়, অথচ দগ্ধ হওয়ার দরুণ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এই উপায়ে জঙ্গল আবাদের পর ধান, কার্পাস, তিল, কাঁকুড়, তরমুজ, ভুট্টা প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও শস্যের বীজ মিলাইয়া, দায়ের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে রোপণ করে। এই সকল বীজ হইতে উপযুক্ত সময়ে গাছ ও ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ফুটি কাঁকুড় ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ধান বাহির হয়, তাহা আশ্বিন মাসে কর্ত্তন করে। কার্ত্তিক মাসে তিল ও কার্পাস সংগৃহীত হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত ক্ষেত্রকে "জুম" ক্ষেত্র বলে। এবম্বিধ উপায়ে একস্থানে ২।৩ বৎসরের অতিরিক্তকাল ভাল ফসল জন্মায় না। এবং এতদ্দ্বারা প্রজাগণ শ্রমোপযোগী ফসল পাইতে পারে না। হল-কর্ষণ দ্বারা শস্যোৎপাদন করিলে ইহারা অধিকতর লাভবান হইতে পারে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ আবাদেরও সুবিধা হয়। এই দুইটি কারণে ত্রিপুররাজ্যের পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে হল চালনা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ত্রিপুর জাতির মধ্যে অনেকেই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। কুকিগণ অদ্যাপিও চাষের কার্য্য আরম্ভ করে নাই। তাহাদিগের এ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, রাজ-সরকার হইতে সমস্ত কুকিরাজগণকে অল্প জমায় কায়েমি-স্বত্বে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে। এবং দরিদ্র প্রজাদিগকে গো মহিষাদি সংগ্রহের নিমিত্ত রাজসরকার হইতে সাহায্য প্রদানের জন্য কৃষিব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। এই সুযোগে অনেক পার্ব্বত্য প্রজা হল কর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদনের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবে সন্দেহ নাই।

কুকিগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমভাবে খাটিয়া থাকে। শস্যক্ষেত্রে রমণীগণ পুরুষের সমান পরিশ্রম করে। ভার বহন পক্ষেও তাহারা পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহারা স্কন্ধে অথবা মস্তকে কোন প্রকারের ভার বহন করিতে পারে না। দড়ি অথবা বৃক্ষের ছাল দ্বারা বোঝা বাঁধিয়া সেই দড়ি মাথায় (কপালের দিকে) লাগাইয়া লয় এবং সেই দড়িতে বাঁধা বস্তু পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া ঈষৎ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চলিতে থাকে। এই উপায়ে তাহারা সচরাচর দেড়মণ, দুইমণ পর্য্যন্ত ভার বহন করে। সন্তানগণকেও ইহারা ক্রোড়ে না লইয়া, কাপরের বুচ্‌কীতে ভরিয়া, কাঁধের সহিত বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠে বা পার্শ্বে ঝুলাইয়া লয়। শিশুগণ সেই অবস্থায়ই চুপ্‌ করিয়া থাকে। (২য় চিত্র দ্রষ্টব্য।)

কুকিগণ শিল্প কার্য্যে অতি নিপুণ; বাঁশ, বেত ও কাষ্ঠ দ্বারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে। রমণীগণ আপন আপন পরিবারস্থ সকলের পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করে। তদ্ভিন্ন বিছানায় পাতিবার একপ্রকার অতি সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে, তাহাকে "পরি" বলে। চেষ্টা করিলে এবং আবশ্যকীয় অর্থ যোগাইলে, ইহাদের দ্বারা শিল্পের বিস্তর উন্নতি করা যাইতে পারে। আজকাল মেথলী (মণিপুরী) গণের নির্ম্মিত "লাইমপী" নামক শীতবস্ত্র নানা দেশে রপ্তানী হইতেছে এবং ভদ্রসমাজে এই কাপড়ের আদর বাড়িয়াছে। কুকিগণের নির্ম্মিত কাপড় রপ্তানী হইলে তাহাও সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা অতি অল্প পরিমাণ বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। আপনাদের প্রয়োজন সাধন করিয়া বড় বেশী বিক্রয় করিবার সুবিধা হয় না।—

কুকি রমণীগণ অতি ধীর ভাবে, বিশেষ নিপুণতার সহিত বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। ইহারা যে প্রণালীতে বস্ত্র বয়ন করে, পর পৃষ্ঠায় তাহার একখানা ছবি দেওয়া গেল।

আপনাদের নির্ম্মিত মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়াই কুকিগণ পরিতৃপ্ত হয়। বিলিতি কাপড় এতকাল ইহাদের সমাজে ঠাঁই পাইত না; এখন বৃটিশ গবর্মেণ্ট ও ত্রিপুরার

বস্ত্রবয়ন-প্রণালী।

মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত উপহারচ্ছলে তাহাদের মধ্যেও মাঞ্চেষ্টার প্রবেশ লাভ করিয়াছে!

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

বৈদ্যনাথ।

হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ বৈদ্যনাথ কলিকাতা হইতে কিঞ্চদধিক ২০০ শত মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত। ইহা "দেওঘর" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "দেও"শব্দ দেবশব্দের অপভ্রংশ এবং ঘরশব্দ গৃহশব্দের প্রাকৃত। সম্ভবতঃ বৈদ্যনাথ দেবের অধিষ্ঠানই দেওঘর নাম হইবার কারণ। দেওঘর নাম প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও উভয় নাম সমসাময়িক নহে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তৎপরিবর্ত্তে হার্দ্দপীঠ, হরিদ্রাপীঠ, রাবণ কনক, কেতকীবন, হরিতকী বন এবং বৈদ্যনাথ নাম দৃষ্ট হয়। মোসলমান রাজত্বের শেষভাগে বৈদ্যনাথ বীরভূম জিলার অন্তর্গত ছিল। অধুনা ইহাকে সাঁওতাল পরগণায় সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে শিবগঙ্গা নামে ৯০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০০ ফুট প্রস্থ একটী দীর্ঘিকা। ইহা অতিশয় গভীর এবং অবতরণোপযোগী প্রস্তরময় সোপানাবলী শোভিত। লঙ্কাধিপতি রাবণ পদাঘাতে ইহার সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্বে শিবগঙ্গা একটী অগভীর জলাভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল। সম্রাট্ আকবর সাহের প্রধান সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ উড়িশ্যা গমন কালে বৈদ্যনাথে আসিয়া এতদুভয়ের মধ্যে একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করান; এবং স্বীয় নামানুসারে উক্ত জলাভূমির "মান সরোবর" আখ্যা প্রদান করেন (১)। বৈদ্যনাথের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উৎক্ষিপ্ত তিনী ভূমি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তর দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই স্থানে একটী ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। প্রায় এক মাইল পশ্চিমে "দারোয়া" নামে স্বল্পসলিলা এক নদী। বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্য সময়ে "দারোয়া" অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আকার ধারণ করে। কিন্তু ইহার জল অতিশয় পরিপাক-শক্তি সম্পন্ন। প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে "তপোবন" নামক একটী পাহাড়। তপোবন প্রকৃতই শান্তিরসাস্পদ তপোবনের ন্যায় গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতাব্যঞ্জক।

তীর্থস্থান ব্যতিরেকে বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধির আরও একটী কারণ আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীন কালেও উক্ত কারণে এই স্থান বিখ্যাত ছিল। ভৈরবের

---

(১) The lake Forms a part of a large tract of low land or ravine, the western portion of which has been cut off by a heavy embankment, on the top of which runs the road aforesaid. This embankment must have been put up by Maharja Man Sinha, the great general of Akber, who came to this place on his way to Orissa, as I find, his name is associated with the western portion, which is called "Man sarovara."

(On the Temples of Deoghur)

Dr. Rajendra Lal Mitra, L. L. D. C I E.

বৈদ্যনাথ" নাম এবং অধিষ্ঠাত্রী শক্তির "আরোগ্যা" নামই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে (১)। পুরাতন জ্বর, প্লীহা এবং যকৃত রোগীর পক্ষেই বৈদ্যনাথ বিশেষ উপযোগী। পরিবর্ত্তনের জন্য শীত ঋতুই প্রশস্ত। রোগীর জন্য সহর অপেক্ষা উন্মুক্ত স্থান অধিকতর স্বাস্থ্যজনক। পশ্চিমের মৃদু পবন রোগমুক্তির অনেক সাহায্য করে; কিন্তু উত্তর ও পূর্ব্বের বাতাস অনিষ্টকর বলিয়া খ্যাত।

বৈদ্যনাথ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বলিয়া বৈদ্যনাথবাসীদিগকে সাঁওতাল বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীহট্ট জিলা আসামের মধ্যে হইলেও শ্রীহট্টবাসী যেরূপ আসামী নহেন. ঠিক্ তদ্রূপ বৈদ্যনাথ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত হইলেও এই স্থানের লোক সাঁওতাল নহেন। লোক সংখ্যা প্রায় ৮২০০। তন্মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ২০০ শত। প্রচলিত ভাষা "কায়েতি।" ইহা হিন্দি ও বাঙ্গালার সংমিশ্রণ মাত্র। প্রায় ৫০০।৬০০ ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করিতেছেন। ইহারা বহু পূর্ব্বে মিথিলা, কান্যকুব্জ এবং বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত। বৈদ্যনাথ দেবের পূজা এবং যাত্রীদের পৌরহিত্য অর্থাৎ পাণ্ডাগিরি ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন বৃত্তি নাই। জীবন যাত্রার জন্য যাত্রীদের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং দানশীলতাই ইহাদের একমাত্র ভরসা। সম্প্রতি শ্রীমান শৈলজানন্দ ওঝা, বৈদ্যনাথদেবের প্রধান-পূজক। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ যোধন ওঝা সর্ব্বপ্রথমে মিথিলা হইতে আসিয়া বৈদ্যনাথদেবের পূজক হন। "ওঝা" শব্দ উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। শৈলজানন্দ যোধনের বিংশতিতম পরবর্ত্তী। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ ওঝা গিধোড়াধিপতি পুরণমল্ল সিংহকে বৈদ্যনাথ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

সহরের প্রায় এক মাইল দূরে একটী কুষ্ঠাশ্রম। বৈদ্যনাথের ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানই কুষ্ঠরোগীর উপযুক্ত। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয়ের অবিচলিত যত্নে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এই পবিত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ইহা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার একাকী বহন করিয়া নিরাশ্রয় কুষ্ঠীদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামানুসারে এই আশ্রম "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণের দয়া এবং দানশীলতা দ্বারাই ইহা পরিচালিত হয়। আশ্রমে ৩০ জন রোগীর বাসোপযোগী স্থান আছে। কুষ্ঠীদিগের শয্যা, শীতবস্ত্র, আহার্য্য এবং ঔষধ প্রভৃতি আশ্রম হইতে প্রদত্ত হয়। যোগীন্দ্র বাবু ইহার অবৈতনিক সম্পাদক। তাঁহার যত্নে হতভাগ্যদিগের কোন প্রকার অসুবিধা না হইলেও আশ্রমের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। স্কুলের দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে ইহাদের জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি বিব্রত হন না। কথা প্রসঙ্গে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন "My body may be tired but never my spirit". অনেক স্থলে এই বাক্যের সত্যতা কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আশ্রমের দেওয়াল সংলগ্ন কাষ্ঠফলকে একটী কাতর প্রার্থনা লিখিত আছে;—"Please contribute something for those unfortunate sons of God" পড়িলে কাহার প্রাণে না করুণার সঞ্চার হয়? হায়! বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কতদিকে কত অর্থ ব্যয় হইতেছে, কিন্তু সদনুষ্ঠানে অর্থাভাব কি কম পরিতাপের কথা?

বৈদ্যনাথ মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সদর রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ২ ফুট উচ্চ এক মেটফরমের উপরে তিনটী সমচতুষ্কোণ প্রস্তর দৃষ্ট হয়। ইহাদের দুইটী মেটফরমের উপর সোজাভাবে প্রোথিত এবং তৃতীয়টী তদুপরি তোরণাকারে স্থাপিত। প্রোথিত প্রস্তরগুলি প্রত্যেকে ১২ ফুট এবং উপরিস্থিত প্রস্তরটী ১৩ ফুট দীর্ঘ; ইহার উভয় প্রান্তে মকর মৎস্যের মুখ অঙ্কিত। এই প্রস্তরত্রয় সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে: কাপ্তান সার উইল সাহেব, এই প্রস্তরগুলি কি, কোন উদ্দেশ্যে কর্ত্তিত এবং এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে তাহাই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তিনি এইমাত্র বলেন, উপরিস্থিত প্রস্তরের উভয়প্রান্তে হস্তী কিম্বা কুম্ভীরের মুখ অঙ্কিত (১)। হাণ্টার সাহেব বড়ই অদ্ভুত রকমের একটী কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, আদিম সাঁওতালগণ এই প্রস্তরগুলিকে পূজা করিত (২)। সম্ভবতঃ প্রস্তরের অস্তিত্বের কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিতে পারিয়া তিনি অসভ্য সাঁওতালদের শরণ লইয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার মতটী অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সাঁওতালগণ ইতাকার প্রস্তর পূজা করিত বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। প্রস্তর-অর্চ্চনা তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ হইলে সাঁওতাল ভূমির অন্যান্য স্থানেও দুই একটা উপাস্য প্রস্তর লক্ষিত হইত। তদ্ভিন্ন এত প্রকাণ্ড প্রস্তর কর্ত্তনোপযোগী কোন যন্ত্র সাঁওতালদিগের নাই। বেগলার সাহেব উক্ত প্রস্তরগুলিকে কোন প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। এইরূপ "ভিন্ন মুনির ভিন্ন মতের" মধ্যে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের উক্তিই আমরা যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি বলেন, দোল পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণকে দোলাইবার জন্য এই প্রস্তরগুলি তোরণাকারে স্থাপিত হইয়াছে। অন্য কোন কারণ থাকিলে মকর মুখের প্রয়োজন ছিল না। অদ্যাপি ঐ স্থানে দোল যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণকে দোলান হইয়া থাকে। (৪)

বৈদ্যনাথ তীর্থের উৎপত্তি শিবপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম না। কেবলমাত্র সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রচলিত একটী কৌতুহলজনক কিম্বদন্তী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পুরাণোক্ত বিবরণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। পুরাকালে এক দল ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান বৈদ্যনাথের সমীপ-

---

(১) আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী। ৭১ শ্রীমদ্দেবীভাগবৎ সপ্তম স্কন্ধ, ত্রিংশোঽধ্যায়।

(১) There is a faint attempt at sculpture at each end of the vertical faces of the horizontal beam repressing either elephants' or crocodiles' heads.

(Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. XIV P. 325).

(২) The three great stones which their (Santhals) Fathers worshipped and which are to be seen at the western entrance of the holy city to this day.

(Annals of Rural Bengal p. 192).

(৩) There is however one object that must be expected : that is a great gateway consisting of two pillars spanned by an architrave; this is clearly the remains of some great ancient temple which has been entirely disappeared leaving its outer gateway alone standing.

Archœological Survey of India. Reports Vol VIII. p. 128.

(৪) Three great stones······are at once made out by Hindu eyes to be no more than a Hindu *Dolkat Frame* in stone with *makara* faces at the extremities of the horizontal beam which is used for swinging Krishna in the Holy Festival,

(Mukherjee's Magazine. Vol II.)

বর্ত্তী এক মনোহর হ্রদের তীরে বাস করিতেন। তাহাদের চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই ছিল না। তাহাতে কৃষ্ণকায় পার্ব্বত্য জাতি বাস করিত। ব্রাহ্মণেরা সেই হ্রদের তীরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা তাহারা জীবন রক্ষা করিতেন। প্রতিবাসী অসভ্যেরা বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া দিনপাত করিত। উর্ব্বরা ভূমি এবং তাহাতে অক্লেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় দেখিয়া কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ অলস ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে লাগিল। শিবলিঙ্গের আরাধনা তাহারা সম্যকরূপে পরিত্যাগ করিল। পার্ব্বত্যজাতি হইাতে অতিশয় রুষ্ট হইল। অবশেষে তাহাদের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন এবং বলিষ্টকায় "বৈজু" নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের যথেচ্ছচারিতা দমন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহাদের উপাস্য দেবতাকে প্রতিদিন যষ্টি প্রহার না করিয়া সে অন্ন জল গ্রহণ করিবে না!

"বৈজু" যথা নিয়মে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। একদা সে সমস্ত দিন পরিশ্রমে কাতর হইয়া সন্ধ্যার সময় অবসন্ন দেহে ভোজনে বসিয়াছে, এমন সময় সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল। তৎক্ষণাৎ ভোজন পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি শিবলিঙ্গের প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ হ্রদ হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন:—"বৎস বৈজু নিরস্ত হও; আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" বৈজু উত্তর করিল:—"আমার ধন সম্পদের অভাব নাই; যদি প্রসন্ন হইয়া থাক তবে এই বর দেও—তোমার নামের সহিত যেন আমার নাম সংযুক্ত থাকে। তোমার নাম "নাথ"; এক্ষণে ইহা "বৈজুনাথ" হউক"। তথাস্তু বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। তদনুসারে অদ্যাপি সাঁওতাল ও হিন্দুস্থানীয়া বৈদ্যনাথের পরিবর্ত্তে "বৈজুনাথ" বলে।

এখন বৈদ্যনাথ মন্দিরের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। প্রাচীর পরিবেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে ইহা স্থাপিত। উচ্চতা প্রায় ৭২ ফুট। চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মী নারায়ণ, অন্নপূর্ণা, পার্ব্বতী, কালী, সূর্য্য এবং আনন্দভৈরব প্রভৃতি দেবতার অনেকগুলি মন্দির আছে। কিন্তু তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন। ইহার অভ্যন্তর অন্ধকারময়। দিবসেও ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। লিঙ্গ প্রায় চারি ইঞ্চি উচ্চ। উপরিভাগ ভগ্ন ও পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বন্ধুর ছিল। কিন্তু অসংখ্য যাত্রীর হস্তঘর্ষণ এবং অনবরত দুগ্ধ ও বারিধারায় অধুনা তাহা মসৃণ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুমতে রাবণের মুষ্ট্যাঘাত এবং সাঁওতাল মতে বৈজুর যষ্টি প্রহার লিঙ্গ ভঙ্গের কারণ। অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইবার তিনটী দ্বার আছে। উত্তর দ্বার দিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে সুগভীর "চন্দ্রকূপ"। রক্ষোরাজ রাবণ লিঙ্গের অভিষেক ও অর্চ্চনার জলের জন্য এই কূপ খনন করেন। বৈদ্যনাথ-মন্দিরের সম্মুখেই পার্ব্বতীর মন্দির। এই মন্দিরটী মনোহর; মধ্যস্থলে চতুর্ভুজা গৌরীমূর্ত্তি এবং অষ্টভুজা পার্ব্বতী মূর্ত্তি। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহাদের প্রীত্যর্থে বহুসংখ্যক ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। পশুবলি বৈদ্যনাথের অপ্রিয়; তজ্জন্য বলি প্রদানের সময় তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। হরপার্ব্বতীর চিরসম্মিলন সূচনার জন্য উভয়ের মন্দিরের চূড়া বস্ত্রদ্বারা সংযোজিত করা হইয়াছে। তারকেশ্বরের ন্যায় বৈদ্যনাথেও 'হত্যা' দেওয়ার প্রথা আছে।

শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান ভিন্ন অন্য একটী কারণেও বৈদ্যনাথ প্রাচীনতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী তনুত্যাগ করিলে ভার্য্যাশোকে উন্মত্তপ্রায় মহাদেব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে বিষ্ণুচক্র দ্বারা সেই শব ৫২ ভাগে কর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পতিত হয়। এই স্থানে সতীর উৎকৃষ্টাঙ্গ হৃদয় পতিত হইয়াছিল। সুতরাং বৈদ্যনাথ একটী "মহাপীঠ" স্থান। অদ্যাপি এখানে হৃদয়পতনস্থান সূচক একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। ইহাকে "হার্দ্দিকুণ্ড" বা হৃদয়কুণ্ড" বলে। পূর্ব্বে এই কুণ্ড একটী অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধময় ডোবা মাত্র ছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুযাত্রী ব্যতীত অন্য কেহ ইহার জল স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা করিত না। তিন বৎসর অতীত হইল রোহিণীর ঘাটওয়ালিনী শ্রীযুক্তা কস্তুরা কুমারী ইহার পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে জল ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ মন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য মন্দিরে কয়েকটী প্রস্তরলিপি লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে দুই একটী প্রাচীনত্ব নিবন্ধন অতিশয় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যনাথ মন্দিরের ভিতরের পূর্ব্ব দ্বারের উপরে দেবনাগর অক্ষরে নিম্ন লিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে।

অচল শশিশায়কোল্লাসিত ভূমি শাকাব্দকে
বলতি রঘুনাথকে হলব পুজাকে শ্রদ্ধয়াত্র
বিমলগুণ চেতসা নৃপতি-পূরণে নাচিরং
ত্রিপুরহরমন্দিরং ব্যরাচি সর্ব্বকামপ্রদং।
নরপতি কৃত পদ্যামিদং।

এই শ্লোকে "বলতি" এবং "হলব" এই দুইটী শব্দ অশুদ্ধ। সম্ভবতঃ তাহা ভাস্করের অসতর্কতা হেতু ঘটিয়া থাকিবেক। তাহা না হইলেও রাজরচনা সমালোচ্য নহে। পণ্ডিতের হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। যাহা হউক ইহা পাঠ করিয়া বৈদ্যনাথ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল এবং নির্ম্মাতা নির্ণয় করা যাইতে পারে! অচল=৮, শশী=১, শায়ক=৫ এবং ভূমি =১; সুতরাং ১৫১৮ শকাব্দ অথবা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রঘুনাথের প্রার্থনায় পূরণমল্লসিংহ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। রঘুনাথ বৈদ্যনাথের তৎকালীন প্রধান পূজক ছিলেন। বীর বিক্রমসিংহ ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে গিধোড় রাজধানী সংস্থাপন করেন। পূরণমল্ল তাঁহার বংশধর। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্বর্গগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমাদের কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বৈদ্যনাথ মন্দির ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের আরও অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক। তজ্জন্য তাঁহার মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে যাইয়া কয়েকটী যুক্তিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ পূরণমল্ল ও রঘুনাথের সময়ের পূর্ব্বে কোন মন্দির না থাকিলে রঘুনাথের পিতা যোধন কি পূজা করিতেন? দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থে বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সহস্রাধিক লিঙ্গের মধ্যে মাত্র দ্বাদশটী অতি প্রাচীন বলিয়া খ্যাত (১)। তন্মধ্যে বৈদ্যনাথের শিবলিঙ্গ একটী। এই লিঙ্গ উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের সমসাময়িক। ভুবনেশ্বর ১২০০ বৎসরের প্রাচীন। সুতরাং ইহার সমকালের হইয়া বৈদ্যনাথ লিঙ্গ এত দীর্ঘ সময় (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত) মন্দির শূন্য অনাবৃত স্থানে থাকিতে পারে না। কোন না কোন হিন্দু তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেক। তৃতীয়তঃ পূর্ব্ব মন্দির ভগ্ন করাইয়া পূরণমল্ল সিংহ নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এরূপও সম্ভব হয় না। কারণ দেবমন্দির ভগ্ন করা স্মৃতিতে নিষেধ আছে। স্মৃতির অনুশাসন অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং পূরণ মল্ল স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুরাজা হইয়া অনার্য্যোচিত কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই। এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

(১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্
উজ্জয়িন্যাং চ মহাকালং ওঁকারমমরেশ্বরে
কেদারং হিমবৎ পৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং
বারাণস্যাং চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমী তটে
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দ্বারকাবনে
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুস্মেশং শিবালয়ে।
(বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য)

তিনি বলেন, পূরণ মল্ল বৈদ্যনাথ মন্দিরের নির্ম্মাতা নহেন (১)। তিনি মন্দিরসংলগ্ন অলিন্দ মাত্র প্রস্তুত করাইয়া মন্দির নির্ম্মাণের প্রশংসা ও যশোলাভ কামনায় উক্ত অসত্য প্রস্তর-লিপি স্বহস্তে লিখিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলি অকাট্য এবং উক্তিটি অভ্রান্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। প্রথম যুক্তির প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। রঘুনাথের পিতা শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন বলিলেই প্রচুর হয়। দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—বৈদ্যনাথ-লিঙ্গ অতিশয় প্রাচীন, এই কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু তৎসঙ্গে বৈদ্যনাথের মন্দিরও ঠিক সেইরূপ প্রাচীন, এই বাক্যের পোষকতা করিতে পারি না। দেবতা প্রাচীন হইলেই তাঁহার মন্দিরও তদ্রূপ পুরাতন হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। তদ্ভিন্ন শিবলিঙ্গের পক্ষে অনাবৃত স্থানে থাকাও অসম্ভব নহে। হিন্দুদের অনেক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে যাহাতে মন্দির নাই। পুরাণোক্ত ৫২টী "মহাপীঠ" স্থান যে প্রাচীন ও বিখ্যাত তীর্থ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সেই সকল প্রত্যেক তীর্থেই কি ভৈরব ও ভৈরবীর মন্দির আছে? গঙ্গার "সাগর সঙ্গম" একটী অতিশয় পুরাতন ও সর্ব্বজন-বিদিত তীর্থস্থান। ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। বোধ হয় ইহা বৈদ্যনাথ তীর্থ হইতেও অধিক পুরাতন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন দেব দেবীর জন্য কি এই সাগর সঙ্গমে কোন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল? মাত্র পাঁচ বৎসর অতীত হইল এই তীর্থে কপিলের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুতীর্থে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থে যদি মাত্র ৫ বৎসর পূর্ব্বে মন্দির নির্ম্মিত হইল, তবে ৩০৪ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ তীর্থে কোন মন্দির ছিল না, অথবা এত বৃহৎ মন্দির ছিল না এই কথা স্বীকার করিতে হানি কি? মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় যুক্তিও অপ্রতিবাদযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। দেব মন্দির ভগ্ন না করিয়া কি নূতন মন্দির প্রস্তুত করান যাইতে পারে না? হয়ত বৈদ্যনাথের পূর্ব্ব মন্দির প্রাচীন হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে ভগ্ন হইয়াছে; অথবা ভূকম্পনেও ভূমিসাৎ হইতে পারে; এবং তৎপরে পূরণমল্ল সিংহ কর্ত্তৃক নূতন মন্দির ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে পুনর্নির্মিত হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাকেও স্মৃতির নিষেধ বাক্যের অবজ্ঞা-জনিত পাপে নিমগ্ন হইতে হয় না।

বৈদ্যনাথ মন্দিরের ন্যায় একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে কোন রাজা অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক। আধুনিক চাঁদা তুলিবার প্রথাও সেই সময় প্রবল ছিলনা। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইত। অন্যান্য হিন্দুরাজ্য অপেক্ষা গিধোড় রাজ্যই বৈদ্যনাথের সন্নিকটে। এরূপ অবস্থায় এই রাজ্যের একজন রাজা উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন তাহা কিছু অসম্ভব নহে। পূরণমল্ল সিংহের স্বহস্ত-লিখিত প্রস্তর-লিপিই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একজন রাজাকে মিথ্যাভাষী স্থির করিবার প্রয়োজন কি? রাজ্যশাসন কিম্বা সমাজশাসনে পূরণমল্ল অসত্যশীল এবং প্রবঞ্চনা-পরায়ণ হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু হিন্দু হইয়া তিনি দেবমন্দিরে মিথ্যালিপি খোদিত করাইয়াছেন ইহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিনা।

আমি বৈদ্যনাথের লোকসংখ্যা ৮২০০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান সেন্সাসে ইহার ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীসীতানাথ দেব।

(১) It is obvious to me therefore, that the tradition which holds the temple to be old and ascribes to Purana Malla only the lobby, is correct and that having defrayed the cost of the lobby which became a part and an integral part of the temple, he by a Figure of "synecdoche" claimed credit for the whole. (On the Temples of Deoghrh ; Dr. Rajendra Lall Mitra.)

মৃণালিনীর দৌত্য।

সূত্রপাত।

রমেশচন্দ্র রায় এম, এ; কলিকাতা—কালেজের একজন বিখ্যাত নবীন অধ্যাপক। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ তাঁহার গৃহে এক অতিথি উপস্থিত। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রমেশচন্দ্রের মাসতুত ভাই, বয়সে তিন বৎসরের ছোট। অতুলও শিক্ষিত; বি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নাগপুরে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন। দুই ভ্রাতায় পরম সৌহার্দ্দ। আদালত বন্ধ উপলক্ষে অতুল কলিকাতায় রমেশচন্দ্রের বাড়ী আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসিলে রমেশচন্দ্রের বাড়ীই তাঁহার স্থান। দূরে দূরে থাকা সময়ও প্রায় প্রতি সপ্তাহে পরস্পরে নিকট চিঠি পত্র চলে। মূলকথা, দুইজনের মধ্যে গাঢ় প্রণয়।

রবিবার দিন বিকাল বেলায় দুই বন্ধু রমেশচন্দ্রের দ্বিতল শয়নগৃহে বিস্তৃত খাটের উপর বসিয়া পান খাইতেছিলেন এবং আলাপ করিতেছিলেন। রমেশচন্দ্রের স্ত্রী নলিনী-সুন্দরী গৃহের এক কোণে জানালার পাশে বসিয়া আরও পান সাজিতেছিলেন। বিকালে পূরা এক ডিবা পান না হইলে রমেশচন্দ্রের তৃপ্তি হয় না। শয়নগৃহে বসিয়া সংসার-সঙ্গিনীর স্বহস্ত-সজ্জিত দুই একটী পানে ও বয়সে কাহারই বা তৃপ্তি হইয়া থাকে? গৃহে বয়োজ্যেষ্ঠ দেবর, সুতরাং নলিনীসুন্দরী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন। দুই বৎসরের খোকা শয্যার একপাশে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল।

শয্যাপার্শ্বে দেয়ালের গায় সুন্দর ফ্রেম বাঁধা কয়েকখানি ফটোগ্রাফ ছিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, অতুলচন্দ্র বলিলেন;—"দাদা, ছবি তুলিলে কবে?—এখানি তো তোমার ছবি; মধ্যের এখানি তো খোকা! খোকার ছবি-

খানি বেশ উঠিয়াছে ;—মাথাভরা চুল, মুখভরা হাসি!—খোকার হাতে এটা কি ?"

রমেশ। ওটা তোমার বধূ ঠাকুরাণীর সোণার কাণ।

অতুল। সোণার কাণ! কেন? অভাব পূরণার্থে নাকি? সেইজন্যই কি অত খানি ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছেন?

নলিনীসুন্দরী আসীমন্ত অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া নামাইলেন।

রমেশ। না হে, তা বলিতে পারিবে না! অমন সুন্দর কাণ যার তার নাই। মা আদর করিয়া মতি বসান সুন্দর সোণার কাণ বানাইয়া দিয়াছেন। ফটো তুলিবার সময় সাজ সজ্জার জন্য গহনার বাক্স খোলা হইয়াছিল। খোকা ছাড়িল না, তাই তাহার হাতে একটা কাণ ছিল; সেই বেশেই তাহার ফটো তোলা হয়।

অতুল। তা খোকার ছবি বেশ উঠিয়াছে।—পাশে এ কার ছবি?

রমেশ। কালেজে ভবভূতির উত্তরচরিত পড়িয়াছিলে না?

অতুল। পড়িয়াছি বৈকি।

রমেশ। প্রথম অঙ্কে চিত্র-পরিদর্শন সময় সীতা একটী স্ত্রীচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'বাছা, এটি কে?'—লক্ষ্মণ কিন্তু সে কথার কোন উত্তর দেন নাই।

অতুল। আমি সীতা নই; কালেজে শিক্ষিত আজি কালির লক্ষ্মণ, কিন্তু প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই উত্তর দিতে প্রস্তুত!—এ উর্ম্মিলা ঠাকুরাণীর দিব্য কাণ!

নলিনীসুন্দরীর অবগুণ্ঠন আরও কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইল।

অতুল। এ ছবি ঠিক হইয়াছে কিনা তা তুমি বলিতে পার।

রমেশ। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে বলিব যে, ফটোগ্রাফার আদর্শের ভারি অপমান করিয়াছে।

অতুল। তা হবে।

রমেশ। তোমার বিশ্বাস না হয়, আদর্শতো এখানেই উপস্থিত; তুলনা করিয়া দেখ।

নলিনীসুন্দরীর অবগুণ্ঠন এবার অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বৃদ্ধি পাইল।

অতুল। তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। দাদা, সোণার গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধা এটা কি এ?

রমেশচন্দ্র, খোকা ও নলিনী সুন্দরীর ছবির একটুকু উপরে দেয়ালে খাটান অতি সুন্দর বিলাতি ফ্রেমে বাঁধা একত্রে যোড়া দেওয়া দুই খানি মলিন কাগজ, তাহাতে দুই হাতের লেখা কতকগুলি অঙ্কপাত মাত্র। আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য নিম্নে অঙ্কগুলি মুদ্রিত করিলাম :—

১৮।১২।১০— ১৮ ১৩।১ —২৪৪।১১।৬— ৩০।১২।১
১৫২।১১।৮ —১০৪।১৪।৬ —১৯৬। ১।২—১৫১। ৭।৫
২৪৯।১৬।৪ —১২২।১০।১১—১৬৩। ৫।৩— ৭৮। ৫।৫॥

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭—১০৪।১৪।৬— ৩৫।১৩।৪
৮৬।১৬।৬— ৯৪ ১২।১— ৮৬। ৪।২—২৪৫।২০।৭
৩৫।১৭।৭— ৩৫।১১।৭—১৫৫। ১।১—২১৩।১৬।৯
৪১।১৮।৪—১১০।১৫।৩—১৫২। ২।৩—১৮৭।১৪।৪
৭।১৬।৬— ৮।১২।৫—১৩৩। ৩।৪॥

অতি সুন্দর গিল্টি করা ফ্রেমে সাজান প্রাচীন দৈবজ্ঞ লিখিতবৎ আর অর্থযোগ শূন্য শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাত সমন্বিত এই মলিন কাগজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অতুল বলিলেন ;—"ইহার অর্থ কি?"

বন্ধুদ্বয়ের দৃষ্টি যখন সেই অঙ্ক শ্রেণীর দিকে প্রবৃত্ত ছিল, সে সময় নলিনীসুন্দরীর চকিত দৃষ্টিও একবার সেই দিকে নিপতিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্ত মাত্রের জন্য। রমেশচন্দ্র যদি সে সময় অবগুণ্ঠনবতীর দিকে চাহিতেন, তাহা হইলে জানালার অনতিদূরে উপবিষ্টা নলিনীসুন্দরীর সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া ও তাঁহার স্মিত বিভাসিত আকর্ণ আরক্ত মুখশ্রী দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেদিকে না চাহিয়াই উত্তর করিলেন ;—"উর্ম্মিলা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা কর।'

অতুল। আমি তোমার মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর নই, অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, তুমি কাছে থাকিতে এই দুর্ব্বোধ অঙ্কপাতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিপন্ন করিব না।

নলিনীসুন্দরী মনে মনে দেবরের শত প্রশংসা করিলেন

রমেশ। অর্থ না বুঝিয়া কি আর ইনি কাকচরিত্রের এক পৃষ্ঠাবৎ এই অঙ্কপাত গুলি নিজের শয্যাপার্শে এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন?

অতুল। তা হউক; তুমি বল।

বুদ্ধিমান নাবিক যেমন ধন ধান্যে ভরা নৌকা গঙ্গা-স্রোতে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে দড়ি কাছি, দাঁড় বৈঠা পাল প্রভৃতি সরঞ্জম সাজাইয়া গুছাইয়া যথা স্থানে রাখিয়া প্রস্তুত হয়, পলায়নোন্মুখী নলিনীসুন্দরী তেমনি আপনার সাজ সজ্জা, সেমিজ সাড়ী, অবগুণ্ঠন আঁটীয়া টানিয়া ঠিক ঠাক করিতে লাগিলেন।

রমেশ। আমাকেই বলিতে হইবে?—কিন্তু ইহার যে অংশ আমার লেখা, তাহার অর্থ আমি বলিব, আর যে গুলি অন্যের লেখা তাহার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

নলিনীসুন্দরী সজ্জিত পান গুলি ডিবার মধ্যে রাখিয়া ডিবা বন্ধ করিলেন; বন্ধ করিবার সময় হাতের সোণার চুড়িগুলি ঝণৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র চারু কর্ণবিলম্বী স্বর্ণ ইয়ারিং বিকম্পিত হইয়া আরক্ত গণ্ড আরও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। তখন স্মিত চক্ষে নলিনীসুন্দরীর দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া রমেশচন্দ্র আরম্ভ করিলেন,—

"সে আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা। গঙ্গাতট পরিশোভী সুন্দর মুঙ্গের সহর। চৈত্র মাসের শেষে একদিন সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম। চন্দ্রোদয়ে চারি দিক জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া ছিল। মৃদু শীতল বাতাস—"

অতুল। তুমি যে দস্তুর মত নভেল আরম্ভ করিলে!

রমেশ। আগে শুন। মৃদু শীতল বাতাস ঝুরু ঝুরু করিয়া বহিতেছিল, গাছের ডালে কোকিল ডাকিতেছিল। আমি বেড়াইতে বেড়াইতে "বসন্ত কুটীরের" দিকে—"

নলিনীসুন্দরী পান ভরা ডিবাটী শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অলক্তরাগরঞ্জিত পদসংসক্ত মল চতুষ্টয়ের রুণু ঝুণু শব্দে সেই গৃহ মৃদুমুখরিত হইয়া উঠিল।

রমেশ। ওগো, পানে চুণ কম হইয়াছে, ওগো—

আর চুণ! নলিনীসুন্দরী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে যাইয়া দরজা আঁটিয়া দিলেন।

পূর্ব্ব কথা।

রমেশচন্দ্র সেই অঙ্কপাতের কাহিনী অতুলচন্দ্রের নিকট বলিলেন। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা তাহা বিবৃত করিতেছি।

নলিনীসুন্দরার পিতা হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বভাব কুলীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার অবস্থা মন্দ ছিল না। পুত্র অক্ষয়চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতায় এক বড় হৌসে কাজ পাইয়াছেন। হারাণচন্দ্র মেলবন্ধ সমান ঘর হইতে প্রথমা পুত্রবধূ আনিয়াছিলেন; কিন্তু এক বৎসর না যাইতেই সে বধূর অভাব হয়। তাহার পর সিদ্ধ শ্রোত্রিয় মধুসূদন রায়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত অক্ষয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন।

হারাণচন্দ্রের দ্বিতীয় সন্তান কন্যা নলিনীসুন্দরী। ঘরে শিক্ষিত বড় ভাই, তাহার সঙ্গে আবার উপযুক্ত ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীর মিলন হইল। বাল্যকাল হইতে ভ্রাতা, পরে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর যত্ন চেষ্টায় নলিনী সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। নলিনীর বয়স পঞ্চদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। স্বভাব কুলীনের কন্যা, মেলের ঘরে ভাল ছেলে নাই; সুতরাং এতক তাহার বিবাহ হয় নাই। সদ্যপ্রফুল্ল মধুগর্ভ অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার ন্যায় নলিনী পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্র ভগিনী কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে যাইতে লাগিলেন। তখন রমেশচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। মধুর বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম দিন রমেশকে দেখিয়া নলিনী স্তম্ভিত হইল। বালিকা নিজের মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিল না। কোন কোন দিন রমেশের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কোন কোন দিন অজ্ঞাত প্রকৃতি লজ্জা, শঙ্কায় সঙ্কুচিত হইয়া পালাইয়া যাইত। কখনও বা শ্রদ্ধা, ভক্তি; কখনও বা লজ্জা, মৃদুভীতি। উন্মেষোন্মুখী যুবতী পরে বুঝিতে পারিল—এ ভাব ভক্তি নহে, শ্রদ্ধা নহে; অভক্তি অশ্রদ্ধা ত একেবারেই নহে। লজ্জা নহে; ভীতি নহে; আরও যেন কিছু, প্রগাঢ় চিত্তাকর্ষক আরও যেন কিছু!—কি? যাহা কোন দিন দেখে নাই, যাহা কোন দিন আপন মনে অনুভব করে নাই—হৃদয়ে সেই অননুভূতপূর্ব্ব তীব্রমধুর উদ্দীপক উন্মাদকারী নবীন উচ্ছ্বাস! নলিনী শেষে বুঝিল; বুঝিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিল;—

"প্রভু, দাসীকে রক্ষা কর। অকূল সমুদ্রে ভাসাইও

না। অনিবার অগ্নিতে দগ্ধ করিও না; আত্মসংবরণ শিক্ষা দাও।—আমি গরীব, রাজ বৈভবে যেন আমার লোভ না হয়!”

বাসনা ও তৃপ্তির মধ্যে কত যে গিরিনদী ব্যবধান, নলিনী তাহা জানিত। পিতা সংসার লইয়া ব্যস্ত, মাতা যেন দেখিয়াও দেখেন না, আত্মসুখে উন্মাদচিত্ত ভ্রাতার চক্ষু তখনও বুঝি ফুটে নাই। কেবল একজন বুঝিল; বুঝিল সমবয়স্কা কুমুদিনী।

উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, হাসিতে খেলিতে যে দিবা রাত্রি কাছে কাছে, সেই ভ্রাতৃবধূ বুঝিল। শূন্য-নয়নে চন্দ্রালোকফুল্ল আকাশের দিকে তাহার চাহনি দেখিয়া বুঝিল; অতর্কিত আহ্বানে তাহার চকিত দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিল; আহারে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অনুদ্যম, অধ্যয়নে অমনোযোগ, হাসিতে বিষণ্ণতা, লাবণ্যে কালিমার ছায়া দেখিয়া বুঝিল। বুঝিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিল;—“প্রভু, এ কি করিলে? দুইটী প্রাণীকে জীবন্তে দগ্ধ হইতে দেখিবে?—পর্ব্বত তো দুরারোহ। নদী তো দুস্তর! তবে কেন এ বিড়ম্বনা?”

একদিন কুমুদিনী নিভৃতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—“ঠাকুরঝির বিবাহের কি করিলে?”

অক্ষয়। কিছুই হয় নাই।

কুমু। কবে হইবে?

অক্ষয়। বলা সহজ নহে। মেলের ঘরে দশ বৎসরের এক বালক আছে; আর আছে দুইটী বৃদ্ধ!

কুমুদিনী নিস্পন্দনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল;—“এই ঘরেই করিতে হইবে?”

অক্ষয়। মেল ভাঙ্গিয়া কাজ করা সহজ নহে।

কুমু। কেন?

অক্ষয়। কুল থাকিবে না।

কুমু। কুল দিয়া কি করিবে?

অক্ষয়। কি করিব জানি না। তোমাকে এতদিন বড় কিছু বলি নাই; তাই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে আমি নিশ্চিন্ত আছি। নলিনীর কথা মনে করিতে বুকে পাষাণের চাপ পড়ে। কাল মার সঙ্গে বিশেষ করিয়া আলাপ করিব।

কুমু। করিও, আর বিলম্ব করা চলে না।

অক্ষয়। কাল রমেশের এখানে আসার কথা আছে না?

কুমু। কথা ছিল; কিন্তু দাদা লিখিয়াছেন, আসিতে পারিবেন না।

অক্ষয়। কেন? রমেশ কি রাগ করিয়াছে?—গত রবিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, আসে নাই; কালও আসিবে না! কেন?

কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। নিকটে টেবিলের উপর বাটীতে দুধ ঢাকা ছিল; খোকার খাওয়ার সময় হইয়াছে। অগ্নিপাত্রে দুধ গরম করিতে দিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কুমুদিনী বলিলেন;—

“দাদা এখন আর এ বাড়ীতে বড় আসেন না। না আসাই ভাল।”

অক্ষয়। সে কি!—রমেশের আসা ভাল না?

কুমু। তুমি অন্ধ! দূরদৃষ্টির জন্য চস্‌মা পরিয়াছ, কিন্তু তোমার দূরদৃষ্টি নিকটদৃষ্টি কিছুই নাই!

অক্ষয়। রমেশ কি—

কুমু। শুধু তাহা হইলে দোষ ছিল না,—

অক্ষয়। আর কি?

কুমু। এ দিকে ঘরের কুসুমেও কীট ধরিয়াছে!

অক্ষয়। কুমু, আমি প্রকৃতই অন্ধ!

তাহার পর দিন বিকালে কুমুদিনী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। নলিনী বারান্দায় খোকার হাত ধরিয়া “হাঁটি হাঁটি” করিতেছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে খোকা পড়িয়া যায়, আর উভয়ের মুখে হাসির উৎস ছুটে! আছাড় পড়িয়া খোকার হাসি, আর তাহাকে পড়িতে দেখিয়া হাতে তালি দিয়া নলিনীর হাসি!

অক্ষয়চন্দ্র আফিস হইতে আসিয়া মাতার ঘরে জলখাবার খাইতে খাইতে বলিলেন;—

“মা, নলিনীর সম্বন্ধের কি হইল?”

মাতা। হবে আর কি? ঈশ্বর যা করেন, তাই হইবে।

অক্ষয়। মেলের ঘরে তো ছেলে নাই; অন্যত্র দেখিলে হয় না?

মাতা। আর কোথায় দেখিবি?

অক্ষয়। আচ্ছা, মা, রমেশের সঙ্গে হয় না?

মাতা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন ;—

"অমন ছেলে! কার্ত্তিকের মত রূপ, লেখা পড়ায় তোরাই তো বলিস্ কত কি পাশ করিয়াছে, ধনে জনে পূর্ণ ঘর। মানুষ তপস্যা করিয়া অমন ছেলে পায় না। কিন্তু——"

অক্ষয়। কি, মা?

মাতা। জানিস্‌ই তো, রমেশ কুলীন নয়। কুল ছাড়িয়া কেমন করিয়া কাজ হইবে?

অক্ষয়। মা, তোমরা তো দিন কাটাইয়া আসিলে; আমার জন্যই তো কুল?—তা আমি তোমাকে জানাইতেছি, ভঙ্গ হইলে আমার কোন কষ্ট হইবে না। গত বৎসর বাবা বলিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানে গ্রামে আমাদের এক পালটী ঘর আছে; সে ঘরে এক বর আছে। শুনিয়াছি, তাহার অবস্থা ভাল নয়, বয়সও বেশী হইয়াছে, ঘরে দুই স্ত্রী। বাবা বোধ হয় সেই চেষ্টায় আছেন?

মাতা। এক দিন আমার কাছেও তাহা বলিয়াছেন।—অভাগিনী কুলীনের ঘরে জন্মিয়াছে, ভাল কপাল কোথা হইতে আসিবে?

অক্ষয়। শুন, মা সেখানে নলির বিবাহ হইতে পারিবে না। কুল যায়, যাইবে; নলি সুখে থাকিবে। রমেশের সঙ্গে কার্য্য করিতে হইবে। অমন সুন্দর ঘর, সুন্দর বর ফেলিয়া দিয়া কেন আমরা কোন্ বন জঙ্গলে ঝগড়া কন্দলের ঘরে অপমূর্খের হাতে তাহাকে অর্পণ করিব?

মাতা পুত্রে আরও অনেক কথা হইল। তাহার পর অক্ষয়চন্দ্র মাতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া নিজের শয়ন ঘরের দিকে গেলেন। বারান্দায় নলিনী ডাকিয়া বলিল—

"দাদা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। দেখ খোকা কেমন সুন্দর হাঁটিতে পারে। হাঁটতো খোকামণি! 'হাঁটি হাঁটি পায় পায়'——"

দু চার পা চলিতেই শ্রীমান্ খোকা "পপাত ধরণীতলে।" অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন —

"হাঁ, নলি, খোকা বেশ হাঁটিতে পারে।"

অক্ষয়চন্দ্র দাঁড়াইলেন না। অন্যান্য দিন হাঁটিবার চেষ্টা করিয়া ধূলি বালু সমেত বাবার কোলে উঠিয়া খোকা মুখ চোখ ভরা কত পুরস্কার পায়, আজ আর তাহা পাই না। নলিনী দেখিল দাদার মুখ যেন কেমন মলিন।

নলিনী তাহার পর খোকাকে লইয়া মাতার ঘরে গেল মাতা বিষণ্ণ মুখে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া কি যে ভাবিতেছিলেন। নলিনী কাছে গেলে তাহার অবেণীব কেশরাশি দেখিয়া বলিলেন ;—

"নলি, এখনো চুল বাঁধ নাই কেন?"

নলিনী। বৌর অবসর ছিল না, এখন বাঁধিয়া দিবে

মাতা। বেলা গেল, যাও, মা, চুল বাঁধ গিয়া খোকা আমার কাছে থাকুক্।

মাতার কণ্ঠস্বর যেন কেমন কাতর; দৃষ্টি যেন কেমন করুণ! নলিনী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া কুমুদিনী ঘরের দিকে চলিল। দরজার কাছে যাইতেই শুনিল কুমুদিনী বলিতেছেন,—

"——মেল ভঙ্গ সহজ নহে।"

উত্তরে অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন ;—

"মা স্বীকার হইয়াছেন, এখন রমেশ——"

শুনিয়া নলিনীর হৃদয়কক্ষে হঠাৎ যেন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল সে আর অগ্রসর হইল না। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল। সূর্য্য অস্ত যাইবা অধিক বিলম্ব নাই। পশ্চিমাকাশে রবিরাগরঞ্জিত মেঘ মালা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে; কাক, কপোত, চিল— কত পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; ঝাঁকে ঝাঁকে কত পাখী কুলায় অন্বেষণে নানা দিকে ছুটিতেছে। নলিনী ছাদের আলিশা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ নেত্রে আকাশের সেই মনোহর শোভার দিকে চাহিয়া রহিল তাহার নব যৌবনোদ্ভিন্ন গৌর মুখমণ্ডল সান্ধ্য রবিকরে স্ফুরদারক্তলাবণ্যময় হইয়া উঠিল।—চাহিয়া রহিল মাত্র কিন্তু সে শোভা তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে ছিল না হৃদয়ে তাহার বিষম তরঙ্গাভিঘাত হইতেছিল। হা ঈশ্বর!

এমন সময় আয়না চিরুণী ফিতা লইয়া কুমুদিনী সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কি ভাবিতেছিস্, ঠাকুরঝি?" অতর্কিত প্রশ্নে নলিনীর মুখ ফুল্লারবিন্দবৎ আকর্ণ রক্তাভ হইয়া উঠিল। কুমুদিনী বলিল ;—

"বেলা গেল চুল বাঁধ্‌বি না?"

কুমুদিনী তখন ক্ষিপ্রহস্তে শারদাকাশে সঞ্চরমান নবীন জলদজালবৎ নলিনীর নিবিড় নীল বিপুল কেশরাশি বেণীবদ্ধ করিয়া সুন্দর কবরী রচনা করিয়া দিল। কেশ রচনা শেষ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাহার মুখ পরিমার্জ্জিত করিয়া দিবার জন্য কুমুদিনী ননদকে ফিরাইয়া বসাইয়া দেখিলেন যে, তাহার সুন্দর আয়ত চক্ষু জলভরা পরিনম্র হইয়াছে। নলিনী চক্ষু মুদ্রিত করিল, কিন্তু দুই বিন্দু অশ্রু তাহার দীর্ঘ সুনীল পক্ষ্মশ্রেণী সংসক্ত হইয়া রহিল।

কুমু। তুই কাঁদিতেছিস্ ভাই!

নলিনী কোন উত্তর করিল না।

কুমু। আমার কাছে গোপন করিতে পারিস্ নাই, আমি সকলই বুঝিয়াছি।—কেন এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলি? কুলীনের কন্যা তুই, রায়বংশ যে শ্রোত্রিয়!

দরবিগলিত অশ্রুধারা নলিনীর গণ্ড বক্ষ পদপ্রান্ত বিধৌত করিতে লাগিল। অতি ধীরে, অতি আদরে মৃদুহস্তে কুমুদিনী ননদের চক্ষু মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—"ঝাঁপ দিয়াছিস্, বোন্, দেখি আমরা কূল কিনারায় আনিতে পারি কি না।"

সন্ধ্যা বহিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল, কত গ্রহ নক্ষত্র উঠিল, শীতল সন্ধ্যাবায়ু ঝুর্ ঝুর করিয়া বহিতে লাগিল। নলিনী কোন কথা বলিল না।

তখন মাতা ডাকিলেন। হাত ধরাধরি করিয়া ননদ [illegible] ছাদ হইতে নীচে নামিয়া গেলেন।

[illegible] আশার দাস।

[illegible] সন্তান। কিন্তু বিধবা মাতা আর [illegible] বিত্তসম্পত্তি থাকিলেই সংসার [illegible] রিবার কেহ নাই। কুমুদিনী [illegible] একাকিনী সংসার চালাইতেছেন [illegible] বৃদ্ধা হইয়াছেন। পুত্র রমেশের বিবাহোচিত ব[illegible] অনেক দিন হইয়াছে। কালেজের পাঠ শেষ না হইলে বিবাহ করিবেন না বলিয়া রমেশ এত দিন মাতাকে বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। এখন সে আপত্তির কারণও আর নাই। এখন বিবাহে আর কি আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু রমেশ আজ কাল করিয়া বড় বিলম্ব করিতেছেন। আজ মাতা রমেশকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন।

মাতা। আমাকে আর কত দিন আবদ্ধ রাখিবি? পড়া শুনাতো শেষ হইয়াছে, এখন বিবাহ কর, খালি ঘরে আর তিষ্ঠিতে পারি না।

রমেশ। করিব বৈ কি, এ বৎসরটা থাক্।

মাতা। আজ কয় বৎসর তুই ঐ এক কথা বলিয়া আসিতেছিস্। আমার কি আর কোন সাধ নাই? বৌ আসিবে, ছেলেপিলের কোলাহলে আমার শূন্যগৃহ পূর্ণ হইবে—আমি বাঁচিয়া থাকিতে কি কিছুই হইবে না?

রমেশ। এই তো এই কয়েকটা মাস বৈত নয়? —যাই, একবার একটুকু বাহিরে যাইতে হইবে।

মাতা। ঘটকী ঠাকরুণকে আবার ভবানীপুর পাঠাইব?

রমেশ। না, মা। তোমাকে সেদিন বলিয়াছি, শীঘ্রই আমি একবার মুঙ্গের যাইব। আমি ফিরিয়া আসিলে যা হয় করিও।

বিবাহের প্রস্তাব উঠিলেই রমেশ কথা কাটাইয়া চলিয়া যায়, মাতা তাহা জানিতেন।

বৈঠকখানায় আসিয়া একটা কাউচের উপর শুইয়া পড়িয়া রমেশচন্দ্র কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মানুষ জানে যে, যে জিনিশের জন্য যত আগ্রহ, যত আকাঙ্খা—সে জিনিষ ততই দুর্লভ। তথাপি মানুষ চিরকাল আশার দাস! আকাঙ্খার সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তো উপভোগ এত মধুর, অতি তৃষ্ণাতেই তো জল এত সুরস! আকাঙ্খা বিড়ম্বনা মাত্র হইতে পারে, কিন্তু এ মর্ত্তভূমিতে আকাঙ্খা দিয়াই তো মানুষের জীবন গঠিত, চিত্রিত, পরিচালিত। নলিনী নভঃসঞ্চারিণী সৌদামিনীবৎ দুষ্প্রাপ্য, দুস্পর্শ হইতে পারে; কিন্তু রমেশচন্দ্র যখন সেই দুষ্প্রাপ্যের আশায় একবার মন বাঁধিয়াছেন তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া সে কথা আর শিথিল করিতে পারিতেছেন না।

এমন সময় হর্‌করা একখানা চিঠি দিয়া গেল। বৌবাজার হইতে আসিয়াছে, ভগিনী কুমুদিনীর লেখা;—

"দাদা, আজ প্রায় পোনের দিন হইল তুমি আমাদিগকে দেখিতে এস নাই। আজ দশ বার দিন হইল খোকার অসুখ করিয়াছে, কিছুতেই সারিতেছে না। আমি ভারি চিন্তায় পড়িয়াছি। শ্রীযুক্ত শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী আজ পাঁচ দিন হইল শয্যাগত, তাঁহারও জ্বর। এ দিকে আফিসের

কামাই নাই; কাজ বড় বেশী পড়িয়াছে। আমি বড় কষ্টে আছি।

ঠাকুর বাড়ীতে নাই, বর্দ্ধমান গিয়াছেন। সেখানে নাকি মেলের ঘরে একটী বর আছে। ঠাকুরঝির জন্ম তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। এদিকে বাড়ীতে আর সকলের আর এক মত হইয়াছে। আজ দশবার দিন হইল অাফিস হইতে আসিয়া অনেকক্ষণ মার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলেন, মেল ছাড়িয়া ভাল বরের সঙ্গে বিবাহ দিতে বলেন। অনেক কথা হয়! ঠাকুরাণীর মত ফিরিয়াছে। এখন ঠাকুর বর্দ্ধমানে পাকা কথা না বলিয়া আসিলে হয়। ইঁহারা তোমাকেই বোধ হয় ভাল বর মনে করিয়াছেন। মা আজ কয় বৎসর যাবৎ তোমার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন; এটা না, ওটা না, এখন না ইত্যাদি বলিয়া তুমি ফাঁকি দিতেছ। যদি এখানে হইবার কথা হয়, তবে তো স্বীকার আছ? কাল বিকালে অবশ্য আসিও। খোকার চিকিৎসার একটা ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না হইলে কিছু ঠিক করা যাইবে না। শুনিলাম, তুমি নাকি পশ্চিমে মুঙ্গের যাইবে, কেন?—সেবিকা—কুমুদিনী।"

চিঠি পড়িয়া রমেশচন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া আবার পড়িলেন; কাউচ পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রকাণ্ড হলের এ পাশ ও পাশ বেড়াইতে বেড়াইতে আবার পড়িলেন। খোকার অসুখ করিয়াছে, বিশেষ চিন্তার বিষয়। কুমুর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অসুখ করিয়াছে, সেও বড় বিপদ। কিন্তু তা ছাড়া চিঠিতে আরও কথা আছে। ক্ষীণ, অতিক্ষীণ আশার কথা;—মেল ভঙ্গ! তাহাই যদি হয় তবে কি না হইতে পারে? বাস্তবিক রূপগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বিত্ত সম্পত্তিতে রমেশচন্দ্র যে প্রার্থনীয় বর তাহা তিনি নিজে জানিতেন! কেবল কুলাংশে ন্যূন বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করাইতে সাহস করেন নাই। নতুবা তাঁহার কামনা পূরণ পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু সেই এক প্রতিবন্ধকই যে বিষম প্রতিবন্ধক, —চন্দ্রপনের দুর্লঙ্ঘ্য। কুলীন কন্যায় শ্রোত্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা!

পরদিন বিকাল বেলায় রমেশচন্দ্র ভগিনীর বাড়ীতে গেলেন। ভাগিনেয়ের জ্বর তেমন প্রবল নহে, সামান্য জ্বর, কিন্তু তাহা ভাল করিয়া ছাড়ে না। তাহার শরীর বড় কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে "হাঁটি হাঁটি" নাই, সে মধুর হাসির উৎস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভগিনীপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার চিকিৎসার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। কুমুর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পুরাতন পীড়া। তিনি বয়সে নিতান্ত প্রাচীনা না হইলেও রোগ শোক চিন্তা দুঃখে তাঁহার শরীর অকালপক্ব, রুগ্ন হইয়াছে। দেশীয় ভাল কবিরাজ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার কথা হইল। ভগিনীপতির সহিত আরও অনেক কথা হইল।

অক্ষয়। আমি একা পড়িয়াছি, বাবা বাড়ীতে নাই; আফিসেও ছুটি নাই।

রমেশ। তিনি——

অক্ষয়। বর্দ্ধমান গিয়াছেন। নলিনীর বিবাহ এখন না দিলেই নয়। আমরা কুলীন বলিয়া এতদিন সহিয়াছে, কিন্তু আর গৌণ করা উচিত নয়।—কেমন তুমি কি মনে কর?

রমেশ। এখন তো হওয়াই উচিত।

অক্ষয়। আমাদের নানা বিপদ। মেল বাঁধা ঘর, ভাল বর পাওয়া বড় কঠিন। এক ঘরে দশ বৎসরের এক ছেলে আছে, আর আছে দুইটী বৃদ্ধ!

রমেশ কোন উত্তর করিলেন না, চাহিয়া রহিলেন।

অক্ষয়। বর্দ্ধমানে নাকি আর একটী বর আছে; বয়স চল্লিশ হইবে; তাঁহার দুই বিবাহ, দুই স্ত্রীই বর্ত্তমান। আমাদের পাল্টী আর ঘর নাই। বাবা এই বরের অনুসন্ধানে গিয়াছেন।

রমেশ। কবে ফিরিবেন?

অক্ষয়। এ বরের সঙ্গে কার্য্য করিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই; মাও সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মেল ছাড়িয়া দিয়া সুপাত্রে নলিনীর সম্বন্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

রমেশ। তোমার পিতা ঠাকুর সম্মত হইবেন?

অক্ষয়। সম্মত করাইতে হইবে। সহজে যে সম্মত হইবেন, সে ভরসা কম। তবে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব, শ্রোত্রিয়ের মধ্যে সৎপাত্র পাওয়া যাইতে পারে।

রমেশ। মেল ছাড়িয়া ভগিনীর বিবাহ দিলে অনেক ভাল বর পাওয়া যাইবে।

অক্ষয়। শোন——থাক্। তুমি শীঘ্রই মুঙ্গের যাইবে?

রমেশ। আগামী শনিবার যাইব মনে করিয়াছি।

অক্ষয়। এখন কেন যাইবে? তোমার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ আবশ্যক হইতে পারে।

রমেশ। আবশ্যক হয় আমাকে চিঠি লিখিও, আসিব।

অক্ষয়চন্দ্র আর অগ্রসর হইলেন না। বাড়ীর কর্ত্তা তিনি নহেন, ভবিষ্যতের স্থিরতা নাই; আত্মীয়ের সঙ্গে কথা, অধিক কিছু বলা শ্রেয় জ্ঞান করিলেন না। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিলেন।

বাড়ীর ভিতর কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"মুঙ্গের কি নিশ্চয় যাইবে দাদা? কেন যাইতেছ?"

রমেশ। মনটা ভাল না; কয়েকটা দিন বেড়াইয়া আসিব?

কুমু। কোন কথা বার্ত্তা হইল?

রমেশ। তোমার শ্বশুর ঠাকুর ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমার কলিকাতায় থাকা যেন অক্ষয়ের ইচ্ছা।

কুমুদিনী দাদার মুখের দিকে কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তবে যাইতেছ কেন? থাকিয়া যাওনা কেন?"

রমেশ। না, যাইব। খোকা কেমন থাকে আমার কাছে লিখিস্। সর্ব্বদা চিঠি লিখিস্।

তারপর শনিবার দিন রমেশচন্দ্র মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। সময় কাটাইবার জন্য সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজি পুস্তক আর বঙ্কিম বাবুর অনেকগুলি উপন্যাস সঙ্গে লইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

২য় প্রবন্ধ।

(২০১ পৃষ্ঠার পর)

মহারাজা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করত স্বহস্তে দর্পণ সমক্ষে বিরল শ্মশ্রুর ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন। পরে গায়ে জামা ও মাথায় টুপি দিয়া উড়ানী স্কন্ধে ফেলিয়া একটী সুআয়তন সুকোমল সুখচিত শয্যার উপরে উপাধানপার্শ্বে উপবেশন করিতেন। তিনি চেয়ারে বসিতে ভাল বাসিতেন না,—তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে একটীও চেয়ার ছিল না। এই সময়ে ডাক্তার বাবু আসিয়া স্বহস্তে ঔষধ খাওয়াইয়া যাইতেন। যেদিন মহারাজের বিশেষ কোন অসুখ না থাকিত, সে দিনও ডাক্তার বাবুকে সালসা বা তদ্রূপ কোন পোষ্টাই ঔষধ খাওয়াইতে হইত। ফলতঃ ঔষধ খাওয়াটা দৈনিক আহারের অন্তর্গত ছিল। অতঃপর মহারাজ অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন। সেখান হইতে সদরে ফিরিয়া আসিলে পেস্কার প্রভৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী (Personal Staff) তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। যে সকল কর্ম্মচারী জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহারা অঞ্জলিপুটে যজ্ঞোপবীত লইয়া প্রত্যহ এই প্রথম রাজদর্শনের সময়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তিনিও প্রত্যেককে যোড়করে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন। ব্রাহ্মণেতর কর্ম্মচারীরা মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন। আশীর্ব্বাদ বা প্রণাম করিয়া রাজসন্নিধান হইতে চলিয়া আসিবার সময়ে সকলকেই পশ্চাৎ পদে হাঁটিয়া আসিতে হইত। এই সময়ে পেস্কার জরুরী কাগজ পত্রে মহারাজের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া বিদায় হইতেন। মহারাজ তখন হয় কোন নূতন ফটো তুলিবার জন্য ষ্টুডিও গৃহে প্রবেশ করিতেন বা কোন অয়েল পেইণ্টিং লইয়া বসিতেন। কোন বিবসনা রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলে, দুচারিটি বিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য লোকের গৃহপ্রবেশ নিষিদ্ধ হইত; দরবারের ভাষায় বলা হইত—"সাক্ষাৎ মানার ছবিতে আছেন" অর্থাৎ নিষিদ্ধ ছবি লইয়া আছেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে মহারাজের সম্মুখীন হইয়া কোন কথা তাঁহাকে বলিতে হইলে, মহারাজ বা ধর্ম্মাবতার শব্দ ব্যবহার করিয়া ব্যাকরণের প্রথম পুরুষ দ্বারা কাজ সারিতে হইত, যথা—"হুকুম দিতে মহারাজের মরজি হোক" (Be it the pleasure of your Highness to pass an oider in this matter ;) 'আপনি' বা 'মহাশয়' শব্দের ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু পরোক্ষে মহারাজ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে 'সাক্ষাৎ' শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইত, কদাচিৎ 'মহারাজ' শব্দও প্রযুক্ত হইত; যথা মহারাজ আহার করিতে বসিলে বলা হইত "সাক্ষাৎ পাতিতে আছেন" বা "সাক্ষাতের পাতি লাগিয়াছে"। ("আহার" বা 'খাওয়া' শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'পাতি' শব্দটিই এস্থলে প্রযুক্ত হইত।) উক্ত সাক্ষাৎ শব্দটী ইংরাজী His Highness শব্দের সমর্থক। প্রসিদ্ধ ইংরাজী ভাষাবিৎ মৃত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি কয়েক বৎসর মহারাজের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন) স্বীয় পুস্তকে এই শব্দটীকে 'His Presence' দ্বারা অনুবাদ করিয়াছেন।

বেলা বারটা একটার সময়ে মহারাজ, স্নানাহারের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন। আহারান্তে নিদ্রার পরে ৪টা ৪৷০ টার সময়ে উঠিয়া সদরে আসিতেন। এই সময়ে ডাক্তার বাবুকে হাজির থাকিয়া প্রাতঃকালের ন্যায় মহারাজের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে ও ঔষধ সেবন করাইতে হইত।

অতঃপর প্রদীপালোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত রাজ-দরবার আরম্ভ হইত। পেস্কার বা হেড্ ক্লার্ক সমস্ত দিনের চিঠি ও দরখাস্তগুলি পড়িয়া শুনাইতেন, বৈষয়িক কাগজপত্র দেখাইতেন, এবং আবশ্যক মত কোন কোন কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা বা অনুমতি প্রার্থনা করিয়া লইতেন। ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে মহারাজ ডাকের চিঠিগুলিও নিজে পড়িতেন না। যদি তিনি রাজ্য শাসন সংক্রান্ত অন্য যাবতীয় বিষয়ে উদাসীন থাকিয়াও কেবল দৈনিক চিঠি ও অভিযোগ-পত্রগুলি স্বয়ং আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন, তবে বোধ হয় রাজ্যের অর্দ্ধেক গলদ, প্রজার বার আনা অশান্তি এবং নিজের ষোল আনা দুর্নাম অপসারিত হইত।

ভারতের অনেক রাজা মহারাজা এইরূপ ক্ষণিক 'আয়েস' সম্ভোগের লোভে প্রাইভেট্ সেক্রেটারির মুখে কর্ণ আস্বাদন করিতে যাইয়া আপনাদের জীবন বিস্বাদ ও পরিণাম তিক্ত করিয়া থাকেন। মহারাজের হৃদয় দয়ার নবনীত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তাঁহার অনন্য সুলভ তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি ছিল; অসাধারণ লোকচরিত্র-পরিজ্ঞান-শক্তি ছিল; একটী অপরিচিত লোকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার-সময়েই এমন ভাবে তাঁহার আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতেন যে, বোধ হইত যেন রঞ্জেনের আলো অপেক্ষাও তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর গূঢ়দর্শী ও মর্ম্মস্পর্শী; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেলিত হইলে

চতুর্থ ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। { ১২শ সংখ্যা।

মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অবশিষ্ট ভাগ)

আজীবন শিক্ষাবিস্তারে তৎপর থাকিয়া কালীকৃষ্ণ বাবু একজন নিপুণ শিক্ষাদাতা (educationist) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষকরাজ প্যারীচরণ ও পণ্ডিত চূড়ামণি বিদ্যাসাগর মহাশয়, অধ্যাপনা ও পাঠ্য-পুস্তক রচনা বিষয়ে বন্ধুবর কালীকৃষ্ণের মতামত অতি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন এবং সতত তাঁহার সুপরামর্শ বা সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। শেষ জীবনে পরলোকগত প্রথিতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের কলিকাতায় বাটীতে অবস্থানকালে কালীকৃষ্ণ বাবুর নিকট অনেকানেক কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণের সমাগম হইত। তাঁহারা জ্ঞানালোক আদান প্রদান সম্বন্ধে কালীকৃষ্ণ বাবুর উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত উক্ত বিষয়ে কথোপকথন করিয়া আপনাদের ধন্য জ্ঞান করিতেন। স্বর্গগত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় এই অধ্যাপক মণ্ডলীর অন্যতম।

কালীকৃষ্ণ বাবু অতি কঠোর নীতি শিক্ষাদান করিতেন, এবং তিনি নিজ জীবনে সেই শিক্ষার সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। সত্যের তিল মাত্রও ব্যতিক্রম তিনি অতি দূষণীয় বলিয়া মনে করিতেন। যাঁহারা "শ্যামা সুন্দরী দাসী বনাম কালীকৃষ্ণ মিত্র দিগর" নামক বারাসতের উদ্যান সংক্রান্ত আলিপুর জজ আদালতের মকর্দ্দমায় কালীকৃষ্ণ বাবুর সাক্ষ্যদানের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন কালীকৃষ্ণ বাবুর সত্যসাধনা কি কঠোর ছিল। কালীকৃষ্ণ বাবু নিজের স্বার্থ,—সংসারীর চক্ষে অন্যায়রূপে—পদে পদে ঠেলিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার স্বপক্ষ স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বাস্তবতঃ যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল তাহাই ঠিক বিবৃত করিতে বলেন ; এবং সেই কথা বলিবার জন্য স্বপক্ষ ব্যবহারজীবিগণ অনেক সুকৌশল প্রশ্নের মোহজাল বিস্তার করেন, অনেক কৃত্রিম রোষ ও ভ্রূভঙ্গি করেন, কিন্তু

তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল, যে সত্যের উপর ঐ মকর্দ্দমার ফলাফল নির্ভর করিতেছিল, কালীকৃষ্ণ বাবু সেই সত্যের প্রাণ ধরিয়া কথা কহিয়াছিলেন—তাঁহার বাহ্যিক ভাব স্বমঙ্গলপ্রদ হইলেও ভ্রমেও উহা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

কালীকৃষ্ণ বাবুর সত্যনিষ্ঠা সংসারের রাগ বিরাগের অতীত ছিল। কালীকৃষ্ণ বাবুর জনেক স্নেহাস্পদ তরুণবয়স্ক পরমাত্মীয়ের একবার একটী গুরুতর পারিবারিক বিষয়ে কালীকৃষ্ণ বাবুকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। উক্ত তরুণ বয়স্ক আত্মীয়ের শিক্ষাভার আশৈশব মুখ্যত কালীকৃষ্ণ বাবুর উপরই ন্যস্ত ছিল—এবং তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুর পুত্র স্থানীয় ছিলেন বলিলেই হয়। উক্ত স্নেহভাজন ব্যক্তির জননী-বিয়োগ হইলে কালীকৃষ্ণ বাবুর নিকট বিজ্ঞাপিত হয় যে সমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধ-প্রথায় ঐ আত্মীয় ব্যক্তির শ্রদ্ধা নাই, সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুযায়ী মাতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন, এবং কালীকৃষ্ণ বাবু এ বিষয়ের যেরূপ নিষ্পত্তি করিবেন তিনি সেইরূপ কার্য্যই করিবেন। এই প্রস্তাব লইয়া কালীকৃষ্ণ বাবুদের হিন্দু পরিবার মধ্যে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। পরিবারস্থ সকলেই আশা ও অনুরোধ করিয়াছিলেন যে কালীকৃষ্ণ বাবু এই দেশাচারবিরুদ্ধ প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত হইবেন না। কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবু তৎকালে নিজের বা পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মতামতের বিষয় চিন্তা করিয়া ঐ তরুণ বয়স্ক আত্মীয়ের উক্ত বাসনার প্রতিকূলতাচরণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই, বস্তুতঃ সেই অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। এই সমাজ-বিরুদ্ধ আচারে প্রশ্রয় দেওয়াতে তাঁহার স্ত্রীপরিবারস্থ সকলেই এবং আত্মীয় বন্ধুগণ কালীকৃষ্ণ বাবুকে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অনেকে তাঁহার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবু সকল প্রতিবাদের প্রধানতঃ একই উত্তর দিয়াছিলেন,—তিনি কপটাচারের সমর্থন করিতে পারেন না। তিনি যাহাকে আশৈশব সত্যনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাকে কি বলিয়া তদীয় বিশ্বাসের প্রতিকূল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়া, ঐ অনুষ্ঠানে বিশ্বাসের ভাণ করিতে বলিবেন!

জীবনমধ্যাহ্নে কালীকৃষ্ণ বাবু এক নিদারুণ বিপদে পতিত হয়েন। তাঁহার জীবনাবলম্বন, প্রাণাধিক অগ্র নবীনকৃষ্ণ বাবু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হয়েন। প্রিয়তম ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে কালীকৃষ্ণ বাবুর অর্থাগমে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইল, কিন্তু দায়িত্ব সকলই রহিল। পোষ্যবর্গ প্রতিপালন, সুবিশাল ও চিরপ্রিয় উদ্যান রক্ষণ এবং দীনসেবা,—সকলই ব্যয় সাপেক্ষ। শুভাদৃষ্ট বশতঃ কালীকৃষ্ণ বাবু, দুইটী (এ জগতে দুর্লভ) অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন। এই বিপদকালে প্যারীচরণ বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, যাহাতে কালীকৃষ্ণ বাবু ভ্রাতৃবিয়োগজনিত কোনরূপ সংসারিক ক্লেশ অনুভব না করেন তজ্জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া অযাচিতভাবে ও হৃষ্টচিত্তে তাঁহার ব্যয়ভার তুল্যাংশে বহন করেন। যদিও এই দায়িত্ব তাঁহাদের অধিক দিন বহন করিতে হয় নাই। বর্ষেক কাল পরেই নবীনকৃষ্ণ বাবুর সুযোগ্য জামাতা পূর্ব্বোক্ত ৺ কালীচরণ ঘোষ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের হস্ত হইতে ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এবং তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুকে জীবনের অবশিষ্ট কাল কোন অভাবই বোধ করিতে দেন নাই—তাঁহাকে পরম যত্ন ও সমাদরে পিতৃস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কালীচরণ বাবুর পত্নীকে কালীকৃষ্ণ বাবু শৈশবাবধি কন্যাধিক যত্নে লালন পালন করেন ও নিজেই তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা দান করিয়াছিলেন—কুন্তীবালার প্রতি কালীকৃষ্ণ বাবুর স্নেহমমতার অবধি ছিল না, এবং প্রিয়তমা ভ্রাতুষ্পুত্রীও কালীকৃষ্ণ বাবুর সেই অনন্ত ভালবাসার তুল্যমূল্যে প্রতিদান করিতেন। এই স্নেহবন্ধনই কালীচরণ বাবু কালীকৃষ্ণ বাবুর পুত্রস্থানীয় করিবার অন্যতম কারণ। কালীচরণ বাবুর নৈসর্গিক সহৃদয়তা ও গুণগ্রাহিতা সেই স্নেহ ও ভক্তি বন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর করে। তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুকে লোকসেবা কার্য্যে সবিশেষ সহায়তা করেন।

কালীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অভাব অতি সামান্যই ছিল। একখানি বিলাতী অল্প মূল্যের কাপড়, চটী জুতা ও শীতকালে একখানি বালাপোষ হইলেই তাঁহার বেশভূষা সম্পন্ন হইত, আর দীনদরিদ্রগণের ক্ষুন্নিবারণের উপযোগী আহারীয় হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন,—তিনি যৌবনকাল হইতে নিরামিষ ভোজী ছিলেন। টাকা পয়সা রাখিবার জন্য তাঁহার বিলাতী purse বা মনিব্যাগের প্রয়োজন হইত

না, একটী দেশলাইয়ের বাক্স হইলেই চলিত ; এবং অধ্যয়ন বা লিখনের জন্ম তিনি টেবিল-চেয়ার-সজ্জিত পাঠাগার অপেক্ষা, কোন বৃক্ষতলে স্থাপিত একখানি সামান্য কাষ্ঠাসন অধিকতর পছন্দ করিতেন। কালীকৃষ্ণের নিজের অভাব ছিল না বলিলেই হয়, কিন্তু পরের অভাব মোচনের জন্য তিনি সতত ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছিলেন—"Extremely simple and abstemious in his habits, he strongly reminded one of Wordsworth's 'Wanderer,' and his life was one continuous self-sacrifice in word and thought and deed"* আড়ম্বর মাত্র বিরহিত অতি মিতাচারী তাঁহাকে দেখিলে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Excursion নামক কাব্যে বর্ণিত নিভৃত কুটীরবাসী সরল ও পবিত্র পরহিতপরায়ণ ও ধর্ম্মাচরণরত প্রাচীন পরিব্রাজক বন্ধুর) Wandererএর কথা প্রবলভাবে স্মরণ পথে উদিত হইত। তাহার জীবন, বাক্যে, চিন্তায় ও কার্য্যে, একটী নিরবচ্ছিন্ন আত্মোৎসর্গের ইতিহাস।' এই শান্তিময় উপবনে কালীকৃষ্ণ বাবু ধর্ম্মচিন্তায়, জ্ঞানসঞ্চয়ে ও পরহিতসাধনে অতি প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট মনে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি সেই পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া জগতের জনতা কোলাহলে মিশিতে চাহিতেন না। কখন কখন কোনও বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ইংরাজ ধর্ম্মযাজক বা দেশীয় ভক্ত, বারাসতে যাইয়া সেই শান্ত দান্ত ঋষির জ্ঞানসম্পদে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার তপশ্চর্য্যা ভঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাঁহাকে জ্ঞানীজন সমাজে আসিয়া আত্মপরিচয় দিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু কালীকৃষ্ণ বাবু সবিনয়ে সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করিতেন। তিনি সিন্‌সিনেটাস্ প্রমুখ প্রাচীন রোমকগণের জীবনই এ সংসারে কামনার বস্তু বলিয়াই মনে করিতেন। কালীকৃষ্ণ বাবু বলিতেন, ঐ রোমকগণ প্রয়োজন হইলে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেন—শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের অবসান হইলেই তাঁহারা নিজ নিজ পল্লীকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কৃষি জীবন যাপন করিতেন ; নগরের বিলাস বিভব আড়ম্বর অপেক্ষা পল্লীজীবনসুলভ সুখশান্তি তাঁহারা অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেন।

* Hindu Patriot, 3rd August 1891.

কালীকৃষ্ণ বাবু শান্তিময় পল্লীবাস ভাল বাসিতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট বিরাম প্রার্থনা করিতেন না। লোকসেবায় ও উদ্যান-পরিচর্য্যায় এবং অবসরকালে জ্ঞান অর্জ্জনে ও বিতরণে তিনি অহরহঃ ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রত্যহ প্রাতে বারাসতের সেই উদ্যানভবনে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে শত শত দরিদ্র ব্যক্তি শরীরের ব্যাধি যাতনা, কেহ বা অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া সেই মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইত। তিনি পীড়িতকে ঔষধ দিতেন, পথ্য দিতেন, শোকাতুরকে সান্ত্বনা করিতেন, অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিতেন—আপনার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য তাঁহাদের সাংসারিক অভাব ও ক্লেশ মোচন করিতেন। কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনের এই অধ্যায়টী স্মরণ করিয়াই সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তদীয় সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছিলেন—

"জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব বিনত
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।"

বারাসতে কোন পথিক বা আগন্তুক আশ্রয়-প্রার্থী হইলে লোকে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে কালীকৃষ্ণ বাবুর নিকট প্রেরণ করিত। তিনি অতিথিকে পরম সমাদরে তুষ্ট করিতেন, এবং অসময়ে উপস্থিত হইলে হৃষ্ট চিত্তে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন। এই পর-সৎকারবৃত্তি কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। প্রাচীন বয়সে তিনি যখন মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় বাস করিতেন, তখন প্রতিনিয়ত প্রাতে তাঁহাকে লং সাহেবের গির্জ্জার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেশীয় খৃষ্টান পল্লীতে এবং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ তৎকালীন মেথরের পল্লীতে (Depot) দরিদ্র ও পীড়িত পরিবারগণের দ্বারে দ্বারে ঔষধ বিতরণ করিয়া, নিরাময়ত্ব বিধানের আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। বাটীতে কোন ক্রিয়াকলাপ হইলে তিনি উদ্বৃত্ত বা উচ্ছিষ্ট আহারীয়গুলির কোনরূপ অপচয় করিতে দিতেন না, সেগুলিকে স্বহস্তে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, ও নিকটস্থ দীন দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে ডাকিয়া আনিয়া বিতরণ করিতেন। ইং ১৮৬৬ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়, যখন তাঁহার অপর দুই বন্ধু, প্যারীচরণ বাবু চোরবাগানে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, কালীকৃষ্ণ বাবু পটলডাঙ্গার গোলদীঘিতে ক্ষুৎপীড়িত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইতেন।

কালীকৃষ্ণ বাবুর পরার্থপরতার শেষ ছিল না, এবং তাঁহার সরল, অমায়িক, ও সুপবিত্র স্বভাবের অমানুষী মাধুরীরও অন্ত পাওয়া যাইত না। তিনি সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, অথচ তিনি বিরাগীর ন্যায় পরমপূত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র মহিমা, স্বভাব সুষমা এবং পর সুখান্বেষী প্রবুদ্ধ জীবন, দেশীয় বিদেশীয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু অহিন্দু সকল লোককেই মোহিত করিত। যাঁহারা মহাত্মা কালীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সংসর্গ লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন যাঁহারা বারাসতের সেই তপোবনে যাইয়া কালীকৃষ্ণ বাবুর দৈনিক জীবন পরিদর্শন বা কলিকাতায় ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার জ্ঞানময় অমৃতভাষিতা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অবগত আছেন সে মহাচরিত্রের কি মোহিনী শক্তি ছিল। সঞ্জীবনী লিখিয়াছিলেন "তাঁহার সহিত দুদণ্ড থাকিলে জীবন উন্নত ও পবিত্র হইয়া গেল বোধ হইত।" * কোনও সুপণ্ডিত ও সুলেখক ইংরাজ ভক্তিপূর্ণ ভাষায় কালীকৃষ্ণ বাবুর অসাধারণ চরিত্রমাহাত্ম্যের গুণগান করিয়া লিখিয়াছিলেন—"His life was more striking than his words, and his conversation always came short of the depth and reality of his interior life and experience" † 'তাঁহার জীবন তদীয় বাক্যাবলী হইতেও অধিকতর বিচিত্র ছিল, এবং তাঁহার কথোপকথন কখনই তদীয় অন্তর্জীবনের অনুভূতির গভীরতা ও প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিবার উপযোগী ভাষা পাইত না।'

কালীকৃষ্ণ বাবুর জ্ঞানোন্নতি ও চিত্তশুদ্ধি, আত্মসুখবর্জ্জন ও পরসুখান্বেষণ আদর্শস্থানীয়, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণতাই সেই অপরূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। তিনি অতি উচ্চতম অর্থে ধার্ম্মিক ছিলেন, সকল ধর্ম্মের সারাৎসার তাঁহার হৃদয়মন্দির ভরিয়া রাখিয়াছিল। সে ধর্ম্মজ্ঞান এরূপ উদার ও মধুর, সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বজনীন, যে সম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রভাবের কণামাত্র তাহাতে স্পর্শ করিত না, সাম্প্রদায়িকতা মহত্তর ধারণায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয়গণ কালীকৃষ্ণ বাবুর মুখে আত্মত্যাগী খ্রীষ্ট চরিত্রের ভক্তিপূর্ণ গুণগান শুনিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম-নিষ্ঠ মনে করিয়া আত্মসম্প্রীতি লাভ করিতেন; আত্মোন্নতি অহিংসাদি বৌদ্ধধর্ম্মাচরণের উচ্চঅঙ্গগুলিতে কালীকৃষ্ণ বাবুর অবিচল আস্থা দেখিয়া, তিনি গৌতম বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মকে ভারতের অতুলনীয় গৌরবের বস্তু মনে করিতেন বলিয়া, এবং তিনি ধ্যানের সহায়তার জন্য বুদ্ধদেবের একটী শিলামূর্ত্তি নিজ উপাসনাগারে পরমভক্তিভরে জীবনের শেষ দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল রক্ষা করিয়া বুদ্ধদেবের চিরদয়িত নির্ব্বাণ প্রার্থনা করিতেন বলিয়া বৌদ্ধগণ তাঁহাকে স্বদলভুক্ত জ্ঞান করিতেন; ব্রাহ্মগণ কালীকৃষ্ণ বাবুকে বারাসতের সেই উদ্যানের কোনও বনস্পতিতলে ঈশ্বরোপাসনারত দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী মনে করিতেন, থিয়জফিষ্টগণ তাঁহার যোগাভ্যাস, মুগ্ধবিদ্যা, অতিপ্রকৃত প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস ও আসক্তি দর্শনে তাঁহাকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞান করিতেন, এবং আত্মীয় স্বজনগণ কালীকৃষ্ণ বাবুকে পরম পবিত্র ঋষি তুল্য হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু নামে কিছু আসিয়া যায় কি? যিনি সকল ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ—সেই ভগবানের প্রতি অনন্ত ভক্তি ও প্রেমে কালীকৃষ্ণ বাবু আজীবন তন্ময় ছিলেন—কায়মনোবাক্যে তাঁহারই সুমঙ্গলময় ইচ্ছা পালন করিবার জন্যই তিনি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন!

সাংসারিক ভাবে দেখিলে কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবন সুখস্বচ্ছন্দময় বলিয়া বোধ হয় না, তিনি নিরাময় স্বাস্থ্য বা সবল দেহের অধিকারী ছিলেন না, তিনি অসময়ে আপনার ইহজীবনের প্রধান সহায় স্নেহময় অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ বাবুকে হারান, এবং জীবনাবসানের পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার অপর সোদরাধিক বন্ধু প্যারীচরণ বাবু এজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, প্যারীচরণের বিচ্ছেদ জীবন সায়াহ্নে এবং ভগ্নদেহে কালীকৃষ্ণ বাবুর হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সংসারের কোন ঘাত প্রতিঘাতেই কালীকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হয়েন নাই, কখনই নিরাশা বা দুঃখবাদ তাঁহার অন্তরের স্বর্গীয় আলোক নিষ্প্রভ করে নাই, তিনি চিরজীবনই জগদীশ্বরের অপার করুণায় অভ্রান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই কেবল শেষাবধি জীবিত ছিলেন; উভয় বন্ধু একত্রে—ছয় দিন মাত্র ব্যবধানে পুণ্যলোকে আরোহণ করেন।

এই মহানগরীতে ৺ কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের মৃজাপুর

* সঞ্জীবনী ২৪ শে শ্রাবণ, ১২৯৮।

† The Epiphany, 13th August, 1891

ষ্ট্রীটস্থ বাটীতেই কালীকৃষ্ণ বাবুর অন্তিম দিবসগুলি অতি বাহিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে পীড়া-কাতর ও চলৎশক্তি রহিত হইয়াও শিবিকারোহণে বন্ধু কালীকৃষ্ণ বাবুকে শেষ পীড়ার সময় দেখিতে আসিতেন। উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের জীবনদীপ স্তিমিতপ্রায়, এবং সেই ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বন্ধু-যুগল যখন জরাখিন্ন পীড়াবিশীর্ণ মুখে পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, অতীত সুখ দুঃখের পুরাতন কাহিনা পর্য্যালোচনা করিতেন তখন মৃত্যুর ছায়া ভেদ করিয়া তাঁহাদের নয়নেও সৌহার্দ্র-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত।

খ্রীষ্টীয় ১৮৯১ অব্দের ২রা আগষ্ট প্রভাত সময়ে সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে, বার্দ্ধক্যসী সহধর্ম্মিণী ও দুইটী বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া কালীকৃষ্ণ বাবু অনন্তধামে গমন করেন!

সেই দুর্দ্দিনে, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকল ধর্ম্মের বিদ্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ কালীকৃষ্ণের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, দেশীয় সকল সংবাদ পত্রে কালীকৃষ্ণের মহা-জীবনের কথা শোকসন্তপ্ত ভাষায় আলোচিত হইয়াছিল। ছয়দিন পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগজনিত দেশ-ব্যাপী উচ্চতর শোকধ্বনির মধ্যে, সেই নিভৃতবাসী ঋষি জীবনের তিরোধানের কথা সর্ব্বসাধারণের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সে সংবাদে বারাসতের গৃহে গৃহে—প্রতি দরিদ্র কুটীরে হাহাকার উত্থিত হইয়াছিল। এবং যাঁহারা জীবনে একবারও কালীকৃষ্ণ বাবুর সাক্ষাৎ সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন, কি অমূল্য জীবনই এজগত হইতে অন্তর্হিত হইল, কত সুদুর্লভ লোক-হিতৈষণার দৃষ্টান্ত লোকচক্ষু হইতে অপসৃত হইল,

"কত ধ্যান জ্ঞান আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে!"

বারাসতবাসিগণ তাঁহাদের চিরগৌরব কালীকৃষ্ণের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু সম্ভব সেটুকু করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ বাবু বারাসতে যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রাণ পাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই অক্ষয় কীর্ত্তির স্মরণার্থে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়টীর তাঁহারা কালীকৃষ্ণের পবিত্র নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। সেই "কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়" এর এখনও বারাসাতের "ট্রেবর হল" (Trevor Hall) নামক সাধারণ ভবনে অধিবেশন হইয়া থাকে। এবং সেই "ট্রেবর হলের" গাত্রেই বারাসাতবাসিগণ কালী-কৃষ্ণের প্রতি অনন্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ যে প্রস্তরফলকখানি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"This Tablet
SACRED TO THE MEMORY OF
THE LATE
BABU KALLYKRISSEN MITTRA
The Sage of Baraset
THE FATHER OF THE POOR
The first leader in the cause of philanthropic and educational reform
IN THIS PART OF THE COUNTRY
The founder of the first Girls' School in Bengal
AND THE PIONEER OF HOMŒOPATHY IN THE BARASET DISTRICT
HAS BEEN RAISED BY THE
BARASET ASSOCIATION
In reverent loving and mournful memory of his immortal services
RENDERED UNCEASINGLY DURING HALF A CENTURY
In the cause of peoples' well being
HIS VAST ERUDITION
His large sympathy in the cause of education for all
HIS CATHOLICITY IN MATTERS RELIGIONS AND SOCIAL
HIS SELFLESSNESS AND CHARITY
HIS SAINTLINESS OF CHARACTER
And the exalted purity and simplicity of his life
Ever devoted to the ministry of good works
AND HIS MANY PRIVATE AND PUBLIC VIRTUES
Not least amongst which was
HIS HIGH SOULED IDENTIFICATION AT WHATEVER COST
OF THE PUBLIC INTEREST WITH HIS OWN.
Born 1822 A. D. Died 1891 A. D.
"Aged 70 years',

আজ দশবর্ষ হইল, কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনান্তের পর, ইণ্ডিয়ান মিরার লিখিয়াছিলেন :—

"The memorials of his *rishi* life are left in the hearts that knew and honoured him in life, but such a sweet and pure life has leassons to teach to the present generation, and we shall be happy to have fuller records of a life which has been well called by the Indian Messenger "One faithful prayer" in a more permanent form by some one suited to the duty.*" "তাঁহার ঋষি জীবনের স্মৃতি যাঁহারা জীবিত কালে তাঁহাকে জানিতেন ও ভক্তি করিতেন তাঁহাদেরই হৃদয়ে রহিল, কিন্তু এমন মধুময় ও পবিত্র জীবনে বর্ত্তমান কালের জনগণের অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্র যে জীবনকে 'একটী একনিষ্ঠ ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা' বলিয়া সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোন যোগ্য ব্যক্তি সেই জীবনকাহিনী স্থায়ী ও পূর্ণতর আকারে লিপিবদ্ধ করিলে আমরা সুখী হইব।" আমরাও সর্ব্বান্তকরণে মিরার সম্পাদক মহাশয়ের এই শেষ কামনাটীর সিদ্ধি প্রার্থনা করি। সহৃদয় পাঠকবর্গকে এই কথাটী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। বর্ত্তমান লেখক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই গ্রন্থ মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবে, কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনের যে কয়টী কথা প্রয়োজন বোধে উল্লেখ করিয়াছে, তাহারই সারাংশ মাত্র এস্থলে সঙ্কলন করিয়া দিল। ইহা কালীকৃষ্ণ বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী নহে—তাঁহার পুণ্যাচরণোদ্দেশে একটী ভক্তি অর্ঘ্য মাত্র।†

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

বর্ষায় পল্লীদৃশ্য।

[চিত্র]

ভাদ্রমাস। ভাদ্রের প্রায় শেষ হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে বর্ষা না বলিয়া শাস্ত্রানুসারে শরৎকাল বলিতে হয়; কিন্তু একালে শাস্ত্রের শাসন বড় কেহ মানিতে চাহে না, এমন কি

* The Indian Mirror, 16th August 1891.

† এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র বসু ৺কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করিয়া আমাদের কাছে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঘটনাগুলির অধিকাংশই এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া পত্রখানি এস্থলে আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইল না, কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতে উড়ের মত (উ'ড়ুশ্যা দেশবাসীর মত) ছিলেন এই কারণে কেহ কেহ ঠাট্টা"করিয়া বিদ্যাসাগরকে উড়ে সাগর" বলিত; বন্ধু কালীকৃষ্ণও বিশেষ সুশ্রী ছিলেন না, উদ্যানে বৃক্ষাদির সেবা-নিরত কালীকৃষ্ণকে দেখিলেই লোকে (অপরিচিত ব্যক্তি) বাগানের মালী বলিয়া ভাবিত! একদিন কালীকৃষ্ণ তাঁহার কুটীর-সম্মুখে বসিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িতে ছিলেন, পার্শ্বস্থ সদররাস্তা দিয়া কয়েকজন সিপাহী সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে যাইতেছিল। তাহারা বারাসতে কখনও আইসে নাই, কাছারী কোথায় তাহাও জানে না; সুতরাং কালীকৃষ্ণ বাবুকে গাছের গোড়া খুঁড়িতে দেখায় রুক্ষস্বরে বলিল "এ উড়িয়া হাবালোক কো কাছারীকা পথ দেখ্ লায়ে দেও"। কালীকৃষ্ণ বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "কাছারী যাবে, যাও না। ঐ সদর রাস্তা ধরেই যাও" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কাছারীর পথ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ কাণ্ডজ্ঞানহীন পশ্চিমে খোট্টারা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল "চল্ হাম্ লোককো সাৎমে চল্ দেখ্ লায়ে দেগা।" বৃদ্ধ কালীকৃষ্ণ "আমায় আবার কষ্ট দিবে চল" বলিতে বলিতে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

আদালতে উপস্থিত হইলে তৎকালীন সবডিবিসনাল আপিসার মহাশয় মহাত্মা কালীকৃষ্ণের আগমন দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীকৃষ্ণবাবু হাসিতে হাসিতে সমস্তই বিবৃত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ক্রোধে ঐসকল সিপাহীগণের জরিমানা করিতে উদ্যত হইলেন, সাধু কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন "দেখুন একে উহারা মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান হীন, তায় পুলিষে কর্ম্ম করে, উহাদের শত দোষ মার্জ্জনীয়," বলিয়া চলিয়া আসিলেন। পথে ঐসকল লোক তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি তাহাদের অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন "আমি তোমাদের হুজুরকে তোমাদের জরিমানা করিতে বারণ করিয়াছি, আর কোন ভয় নাই।" কি অপূর্ব্ব ক্ষমাশীলতা! অত্যাচারী দুর্জ্জনের প্রতি এরূপ ক্ষমা প্রদর্শন আর কোথাও দেখি নাই। ক্ষমাশীলতার আর একটা উদাহরণ দেখুন। তাঁহার মালী একদিন একটী লোককে গোটাকয়েক লেবু সমেত ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে বলিল "বাবু! এইবেটা প্রত্যহ লেবু চুরি করে, ক দিন থেকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি আজ বেটাকে ধরেছি" বলিয়া তাঁহারই সম্মুখে বেদম্ প্রহার করিল এবং পুলিষে দিবার জন্য বাবুকে অনুরোধ করিল। দয়ালু কালীকৃষ্ণ প্রহারের কারণ মালীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া লেবুচোরকে নিকটে ডাকিয়া মিষ্ট কথায় বলিলেন "দেখ বাপু! তোমার যদি লেবু খাইবার এত সাধ তবে আমায় বল নাই কেন? আমি তোমায় দিতাম, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় তাহাও কি জান না? আমার বাগানে চুরি করিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইলে, অন্য কাহারও হাতে পড়িলে তোমার জেল হইত; তাহাতে চিরকালের জন্য দাগি হইয়া যাইতে এবং ইহজন্মে আর কেহ তোমায় বিশ্বাস করিত না। এক্ষণে বাড়ী যাও, দেখ আর কখন এমন কর্ম্ম করিও না।" চোর কালীকৃষ্ণের এইরূপ সততা ও সাধুতা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল এবং পরে হস্ত দিয়া দিব্য করিয়া বলিল "খেতে না পাই সেও স্বীকার, তথাপি চুরী করিব না।" বাস্তবিক সে অবধি ঐ ব্যক্তি আর কখনও কোন দুষ্কর্ম্ম করে নাই।" প্রঃ সঃ

স্বয়ং প্রকৃতি দেবীও না। তাই ভাদ্র-শেষে এখনও পরিপূর্ণ বর্ষা। কলিকাতায় বসিয়া বর্ষার পূর্ণ প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায় না; সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর হাত চালাইয়া যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়াছে, বাহ্য প্রকৃতি তাহার উপর অসঙ্কোচে তাহার লীলাঞ্চল প্রসারিত করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না; কিন্তু পল্লী-প্রকৃতি সম্বন্ধে একথা খাটে না, এখানে বর্ষা তাহার সকল সুখদুঃখ, সকল বিভব সম্পদ লইয়া সম্পূর্ণ-রূপে আত্ম প্রকাশ করে। নগরবাসিগণের সে সুখ সে দুঃখ উভয়ই বোধ হয় অপ্রীতিকর। কিন্তু কবিচিত্ত তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না; কারণ, তাহা যে কেবল মেঘদূতের অম্লান কবিত্ব হৃদয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগাইয়াদেয় তাহাই নহে, কবিকঙ্কনের 'বারমাস্যা'র বর্ষাসুলভ দুঃখের অস্তিত্বও তাহাতে অনুভব করিতে পারা যায়। এই সুখ ও দুঃখ, এই তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, এই মিলন বিরহের আশাভয় বিজড়িত, আনন্দ বেদনা কল্লোলিত ভাবরাশি বর্ষাপ্রকৃতির সুশ্যামল নবীন সৌন্দর্য্যের উপর মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য কিরণ ও সায়াহ্নের ধূসর মেঘাচ্ছায়ার তুলিকাসম্পাতে, পল্লিবাসি-গণের জীবন কখন হাস্যময়, কখন বিপদে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তোলে।—সে সুখ ও সে দুঃখ উভয়েই উপভোগ্য।

ক্ষুদ্র বিনোদপুর গ্রাম খানি নিতান্ত গণ্ডগ্রাম নহে, ভদ্র পল্লী। রেলপথ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, নদীপথও বৎসরের অধিকাংশ কাল বিরল সলিল ও শৈবালদলরুদ্ধ থাকে। কিন্তু নদী এখন আর সংকীর্ণকায়া নহে, শৈবাল রাশিতে আর জলরেখা আচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই; পদ্মার বিপুল জলরাশি খাল, বিল, নালা প্রভৃতি সমস্ত জলাশয় ভাসাইয়া গ্রাম-প্রান্তবাহিনী সেই বিমল সলিলা সঙ্কীর্ণ তটিনীকে পঙ্কিল জলের উদ্দাম প্রবাহে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সে পুলক, সে চাঞ্চল্য, সে তরঙ্গভঙ্গ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তাহার অপ্রশস্ত বক্ষে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না, তাই নদী-জল 'পাউড়ির' উপর বটগাছের স্কন্ধদেশ জলমগ্ন করিয়া, আমকাঁটালের বাগানের ভাঁট, আশ্যাওড়া ও কাল্‌কাসিন্দের জঙ্গল ডুবাইয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বাঁধের পদতলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। অপর দিকে দীঘির জল মাঠের নিম্ন জমিকে সরোবরে পরিণত করিয়া, জেলাবোর্ড নির্ম্মিত মেঠোপথের উভয় পাশের নয়ানজুলি প্লাবিত করিয়া, গ্রামের পুষ্করিণী গুলি ছাপাইয়া বর্ষার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। চতুর্দ্দিক জলময়; গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে; এখন বিশ্বসংসারের সহিত এই গ্রামের স্থলীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন-প্রায়, কিন্তু নৌকাপথে বহির্জ্জগতের সহিত তাহার নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, কত নূতন নূতন দেশের নূতন নূতন দ্রব্য পূর্ণ নৌকা আসিয়া গ্রামপ্রান্তে নঙ্গর করিয়াছে; সমস্ত গ্রামবাসী বহির্জ্জগতের সহিত প্রীতিবন্ধনের নিবিড়তা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছে।

বন্যার এইরূপ অবস্থা, তাহার উপর বৃষ্টির বিরাম নাই। প্রভাতে মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে রাত্রে সর্ব্বক্ষণ বৃষ্টি—কখন মুষল ধারে বর্ষণ, কখন অতি সূক্ষ্ম শুভ্র জলকণা, সাধারণ ভাষায় যাহার নাম, 'ইলসে গুড়্‌নি'। আজ সমস্ত সকাল বেলাটা ধরিয়া অবিরল ধারায় বর্ষণ হইয়া গিয়াছে, সেই বৃষ্টিধারা মস্তকে ধরিয়াই পল্লীবাসিগণ প্রসন্ন মনে তাহাদের নিত্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে, গৃহস্থ শাক বা বেগুণের ক্ষেতে নিড়ানী দিয়াছেন, রাখাল গরু চরাইয়াছে, চাষারা আউস ধান কাটিয়াছে—কাহারও মস্তকে বাঁশের মোটা ডাটা বিশিষ্ট তালপাতার ছাতি, কাহারও মাথায় গামছা। কুলবধূগণ কেহ শেফালিকাবৃন্তে রঙ্গকরা ছোবান থানের গামছা, কেহবা রঙ্গিন চারখানার বা তারকেশ্বরের গামছা মাথার উপর ফেলিয়া কলসি-কক্ষে ঈষৎ অবনত বদনে নদীপথে চলি-তেছেন। বৃষ্টি ধারায় সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে, কপোলে ললাটে ঘর্ম্ম বিন্দুর ন্যায় বারিবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে, বায়ু বাহিত জলকণা তাঁহাদের সরল, সুন্দর, সঙ্কোচহীন মুখের উপর আনন্দের উদ্দীপনা সংমিশ্রিত কৌতুক হাস্যের রচনা করিয়াছে, বোধ হইতেছে—

"সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে
যৌবন সৌন্দর্য্য যেন লইতে চায় কেড়ে।"

সুন্দরীগণ পিচ্ছিল পথে পা ফেলিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছেন, কাহারও বা পদপ্রান্তে সুচিত্রিত অলক্ত লেখা, তিনি আরও সাবধানে পা ফেলিতেছেন, সম্মুখে কর্দ্দম দেখিলে দৈবাৎ তাঁহার ননদকে আহ্বান করিয়া ছড়া কাটিয়া বলিতেছেন,—

"পায়ে আল্‌তা পথে কাদা
আমি যাই কেমন ক'রে?

ঠাকুর ঝি তোর পায়ে পড়ি,
আমায় নে কোলে ক'রে।
যদি থাকৃতেন তোমার দাদা,
মুছিয়ে দিতেন পায়ের কাদা।"

ছড়ার আর শেষ হইল না, "মরণ আর কি, এত সখও যায়"—বলিয়া ঠাকুরঝি বৌকে ধরিয়া সেই কাদার উপরই ঠেলিয়া দিলেন, বধূ কৌতুক হাস্তে বলিলেন, "তোমার দাদারই খাটুনি বাড়্লো!" দত্তদের কাদম্বিনী বলিল, "হ্যালো বিন্দু দিদি, তোমার দাদা আবার নাপিত হলেন কবে হ'তে?"—বিন্দু খুব সপ্রতিভ মেয়ে, তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "যত দিন হ'তে ঘরে রসের নাপতিনি আমদানী করেছেন।" স্নানের ঘাটের পথে পল্লীরমণীগণ কি ভাবে আলাপ করিয়া থাকেন, পুরুষ লেখক তাহার সম্যক পরিচয় দানে অসমর্থ, কারণ 'রিপোর্টারের' মুখে অতি অল্প কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

রমণীগণ ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, একহাঁটুর অধিক জলে নামিবার সাহস নাই—ডুবিয়া যাইবার ভয়ে, ভাসিয়া যাইবার ভয়ে, কুমীরের কবলে পড়িবার ভয়ে, এবং পাছে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে সকল অপেক্ষা কলঙ্ক ভয়ে; তাঁহারা একহাঁটু জলে দাঁড়াইয়াই অবগাহন শেষ করিতেছেন, নদীর দূরব্যাপী বিস্তারের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে তাঁহাদের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে, প্রবল স্রোতে টোপাপানা ও পাণিফলের জঙ্গল নদীর মধ্যস্থল দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। নদীর বুকে মেঘের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, ভাসমান শৈবালের মধ্যে পানকৌড়ী একবার ডুব দিতেছে আবার অনেক দূরে গিয়া তাহার দীর্ঘ গলাটা জলের উপর তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। নদী তীরস্থ জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া একটা ডাহুক 'কুয়া কুয়া' করিয়া অশ্রান্ত ভাবে ডাকিতেছে, সে ডাকে রস নাই, মাধুর্য্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই। তথাপি বোধ হইতেছে এই বিশালকায়া তটিনীর প্রচণ্ড সৌন্দর্য্য ও রুদ্র ভাব প্রাণের মধ্যে সচেতন করিবার জন্ম ডাহুকের এই প্রকার তীব্র আর্ত্তনাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহার সেই কণ্ঠস্বরে তরঙ্গাহত তটভূমির আবেগ কম্পিত কণ্ঠের উচ্ছ্বাসরব শুনিতে পাওয়া যায়।

নদীর অপরপারে অন্ধকার, শ্যামল বনশ্রেণী ধূসর মেঘের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে; কূলে কূলে জলভরা, বিটপী রাজী সমাচ্ছন্ন বিজন গ্রামখানি দূর হইতে ছবির মত দেখাইতেছে, বড় বড় মহাজনী নৌকা পালভরে কত দিক্‌দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে! একখানি খেয়া নৌকা এই বৃষ্টির মধ্যেও অপর পার হইতে এ পারে, আসিতেছে; তালপত্রের ছাতা মাথায় দিয়া মাঝি শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছে, দু জন বলবান্ দাঁড়ী হাতের শিরা ফুলাইয়া, নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সবলে দাঁড় টানিতেছে। দূরে গিয়া স্রোতের মুখে ফেলিবার জন্ম নদীর কূলে কূলে নৌকা উজানে চালান হইতেছে। নৌকার উপর চাউল বিক্রেত্রীগণ নূতন আউসের চাউল লইয়া এপারে বিক্রয় করিতে আসিতেছে। সম্মুখে চিংড়িমাছের চুবড়ি নামাইয়া মেছুনী নৌকার বাঁশের পাটাতনের উপর বসিয়া আছে। একটা বংশদণ্ড বিশিষ্ট কালো ছাতা মাথায় দিয়া বাউসুমারির চৌকীদার নৌকায় চড়িয়া থানায় হাজিরা দিতে চলিয়াছে, তাহার অঙ্গে নীলকোট, লালপাগ্ড়ি এখন দোছোটরূপে চৌকীদার-বরের স্কন্ধে বিরাজিত, টিনের চোঙাটি কটিদেশে আবদ্ধ, জানুদেশ পর্য্যন্ত কর্দ্দম বিরাজিত, দুইবস্তা আউশ ধান লইয়া দুজন চাষা নৌকার উপর এক পাশে বসিয়া 'চাষার নশিবে' আল্লা কি পরিমাণ 'দুস্‌খু' লিখিয়াছেন। তাহারই আলোচনা করিতেছে। নৌকাখানি ভাটিতে পড়িয়া খরস্রোতে তর তর করিয়া কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, টলমল করিয়া দুলিতেছে।

গৃহলক্ষ্মীগণ বৃষ্টিতে ভিজিয়াই গৃহস্থালীর সকল কাজ শেষ করিয়াছেন। প্রাঙ্গণে কূপ একহাত লম্বা, দড়ি হইলেই এখন কূপের জল তুলিতে পারা যায়, কলসি কলসি জল তুলিয়া তাঁহারা সেই বৃষ্টির মধ্যেই কূপ সন্নিকটবর্ত্তী সানে বসিয়া ছাই ও পাকা তেঁতুল সহযোগে বাসনগুলি ঝকঝকে করিয়া মাজিয়া, গৃহগুলি গোময়ানুলিপ্ত করিয়া, তুলসীমঞ্চ পরিমার্জ্জিত করিয়া স্নানান্তে হেঁসেলে প্রবেশ করিয়াছেন। উননে দুধের কড়া বসান, ভিজেকাঠ কিছুতেই ধরিতেছে না, তাই কেহ কেহ চালের খড় টানিয়া উননে দিয়া ক্রমাগত ফুৎকার দিতেছেন, প্রচুরোদ্যত ধূম্রে বধূর চক্ষু ছল ছল করিতেছে, ক্রমাগত ফুৎকারে মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার আর্দ্র কেশজাল পৃষ্ঠদেশে লতাইয়া পড়িয়াছে, কাহারও কেশাগ্রে একটি গ্রন্থি বাঁধা, ধূমে গৃহ পরিপূর্ণ

ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে কুণ্ডলী পাকাইয়া তাহা বাহিরে আসিতেছে। খড়ের চালের উপর চাল কুমড়ার গাছ, বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া চালখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, পীতবর্ণের বড় বড় ফুলগুলি সবুজ পাতার ভিতর হইতে স্বর্ণাভা বিকীর্ণ করিতেছে। নিকটে একটা শজনে গাছ, দুই একটা ভিজে কাক একবার তাহার শাখায়, একবার ঘরের চালে, একবার বা রান্নাঘরের মুরির নীচে রক্ষিত ফেন জলের গামলার উপর আসিয়া বসিতেছে—'কা' 'কা' করিয়া ডাকিয়া মানসিক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। একটা বিড়াল ভাঁড়ার-ঘরের হাঁড়ি কলসি রাখিবার মাচার নীচে সুখনিদ্রায় মগ্ন, তাহার তিনটি শাবক সমান্তরাল ভাবে ভূতলে দেহ-প্রসারণ করিয়া মাতৃস্তন্যে ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে। একটা কুকুর, ঢেঁকি ঘরের পরচালার নীচে ছাইগাদার উপর কুণ্ডলাকারে শয়ন করিয়া আছে। রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা গরু উচ্ছিষ্ট কদলীপত্র চর্ব্বণ করিতেছে, চর্ব্বণ-সুখে নিমিলিত-নেত্র, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বৃষ্টিধারা ঝরিতেছে। অদূরে বাঁশতলায় বর্ষাজলপুষ্ট নিবিড় বন,—দুটো শিয়াল তাহার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিতেছে। অশথ তলায় প্রকাণ্ড গর্ত্ত, বর্ষার জলে পরিপূর্ণ। সেই গর্ত্তের ধারে ছোট একখান তক্তা পাতিয়া সদুর মা তাহার উপর ক্ষারসিক্ত ময়লা কাপড়গুলি আছড়াইয়া কাচিতেছে। গর্ত্তের ধারে কচুবন, ঢাল ঢাল কচু পাতায় বৃষ্টির জল আটকাইয়া মুক্তার মত টলটল করিতেছে। বাঁশবনে বাঁশের আগা বায়ুভরে লুটোপুটি করিতেছে; নর্দ্দমা বহিয়া গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গন ও পথের জলরাশি কলকল শব্দে গর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। ব্যাঙগুলা গর্ত্তের নূতন জলে নানাসুরে নানারাগিণীতে গান করিতেছে। ছোট বড় ডোবা, গর্ত্ত, নর্দ্দমা প্রভৃতির সংকীর্ণ মিলনপথে গ্রামবাসিগণ বংশ-নির্ম্মিত বৃত্তি বসাইয়া গিয়াছে, নানাপ্রকার মাছ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তাহার মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

বেলা দশ এগারটার সময় বৃষ্টির প্রকোপ কমিয়া আসিল। গ্রাম্য ইস্কুলের ছেলেরা শ্লেট, খাতা ও পুস্তকগুলি চাদরে জড়াইয়া, কটিদেশে বাঁধিয়া, খালিপায়ে মল্লবেশে স্কুলের দিকে চলিয়াছে। মুখ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ, সমস্ত সকাল বেলাটা ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া এখন ঠিক স্কুলের সময়টিতেই বৃষ্টি ধরিয়া গেল! কেহ কেহ 'রেণি-ডে' লাভের দুরভিসন্ধিতে জামা ও কাপড় নর্দ্দমার জলে ভিজাইতেছে, কেহ কেহ চলিতে চলিতে পিছলের উপর সখ করিয়া আছাড় খাইতেছে, আশা—স্কুলে উপস্থিত হইবামাত্র বস্ত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ ছুটি পাইবে। মাষ্টার পণ্ডিত কেহই এখনও ইস্কুলে পদার্পণ করেন নাই, ছোট ছোট ছেলেরাই স্কুলের বাহিরে সেই অল্প বৃষ্টির মধ্যেই ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ কাহাকেও প্রহার করিতেছে, জিহ্বা বাহির করিয়া কেহ কাহাকেও মুখ ভেঙাইতেছে, কেহ কাহারও একপাটি চটি লইয়া তদ্দারা ফুটবলের অভাব মিটাইতেছে। পাঁচ সাতটি বালক নাচিতে নাচিতে সুর করিয়া বলিতেছে—

"রেণ্ কম ঝমাঝম্,—
আমরা এলাম তাড়াতাড়ি,
মাষ্টার গেল শ্বশুরবাড়ী।"

আজ অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য গ্রাম্যহাটে অধিক সামগ্রী বিক্রয় হইতে আসে নাই। তরকারী বিক্রেতারা লাল কঙ্কার শাক, শোলা কচু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলা, পটোল, সাদা আলু ও কাঁচা কলা লইয়া এক হাঁটু কাদার মধ্যেই ঝোড়া সমেত বসিয়া গিয়াছে। বাগ্দিনীরা একধারে বসিয়া গোড়া লেবু, ওল, কল্মী ও হেলাঞ্চার শাক, শশা, কুম্‌ড়ো, ঝিঙে, কাল কাল পাকা তাল বিক্রয় করিতেছে। ভাদ্রের পাকা তাল পল্লী অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সামগ্রী, বর্ষার অপরাহ্নে পল্লীযুবকগণের পরম রমণীয় মুখরোচক খাদ্যের মধ্যে একটি প্রধান খাদ্য—তালের বড়া। পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যে ব্যক্তি তালের বড়ায় রসনেন্দ্রিয়ের কখন তৃপ্তিসাধন না করিয়াছে—তাহার জীবনই বৃথা, পল্লীগ্রামে বাসও বৃথা। বাড়ীর অদূরে তালবৃক্ষের মূলে 'ধম্' করিয়া পাকা তাল পড়িবার শব্দ হইলে—ছেলে মেয়েরা যে উৎসাহে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ছুটিয়া যায়, এবং তাহা লাভ করিয়া যে আনন্দ-উদ্দীপনায় তাহাদিগের শিশু-হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না।

মেছো বাজারে মাছের আমদানী এ সময়ে প্রায় একেবারে বন্ধ, মাছের দুর্ভিক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই এক ঝোড়া চিংড়ি, বেলে, কৈ, জিয়োল প্রভৃতি মাছ লইয়া মেছুনীরা তাহা বিক্রয় করিতে বসিয়াছে; হাটের এই অংশ খুব সরগরম। ক্রেতাদিগের ছত্রাচ্ছাদিত মস্তকগুলি মেছুনীর

ডালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দৈবাৎ একজনের ছাতার শিকে আর একজন ক্রেতার মস্তকে কিছু আঘাত লাগিল; আহত ক্রেতাটি তাহার মাছের 'টোকা' উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল "বাহারে মজা! চোখে দেখ্‌তে পাওনা নাকি? আর একটু হ'লেই চোখটা যে কাণা হয়ে গিয়েছিল!" ছত্রধারী বলিল, "কাণা হওনি ত, অত চোট্‌ কেন বাবু"—সঙ্গে সঙ্গে মেছুনিকে বলিল, "দেনা বেটি আর একমুটো চিংড়ি, নিয়ে চলে যাই।" মেছুনি দুইবার চিংড়ি ফাউ দিয়াছে, আবার ফাউ চাওয়াতে তাহার ধৈর্য্য নষ্ট হইল। সে ক্রেতার হস্তস্থিত কচুর পাতা হইতে মাছগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য সবেগে হাত বাড়াইয়া দিল, বলিল, "আ মোলো. যা অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, এক পয়সায় এক ঝুড়ি মাছ খেতে এসেছে। আর মাছ খেতে হবে না, যা। এই বাদলায় গাঙ্গের জলে মাছ মিল্‌ছে কি না?" হঠাৎ বাজারের কয়াল সেই দ্বন্দ্বক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। সে সেই জন-প্রাচীর ভেদ করিয়া মেছুনির ডালা ঠেলিয়া তাহার ঝুড়ির ভিতর হাত পুরিয়া দিল এবং মুঠা ভরিয়া চিংড়ি তুলিয়া লইয়া তাহা নিজের ঝোড়ায় নিক্ষেপপূর্ব্বক ব্যস্তভাবে অন্য দোকানে চলিল। মেছুনী রাগ করিয়া ঝুড়িটা ঠেলিয়া ফেলিয়া কয়ালের সপ্ত পুরুষ নরকস্থ করিতে করিতে মুখে ঝড় বহাইতে লাগিল। সে ঝটিকাবেগ অসহ্য ভাবিয়া ও তাহার রুদ্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ক্রেতার দল সসম্ভ্রমে দুই হাত তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘোলা মেঘ করিয়া আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি আসিল। অট্টালিকা সমূহের ছাদ হইতে মুরি দিয়া কল কল শব্দে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কাগজের নৌকা প্রস্তত করিয়া বাতায়ন পথে তাহা রকের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ তক্তপোষের উপর দাঁড়াইয়া "ঐ আমার নৌকা আগে যাচ্ছে" বলিয়া করতালি দিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। খড়ের ঘরের 'ছাঁচে' জলের স্রোত বহিতে লাগিল, তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠিয়া মনুষ্যজীবনের নশ্বরতার উদাহরণ-স্বরূপ মুহূর্ত্তে লয় পাইতে লাগিল। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বৃষ্টির সুযোগ দেখিয়া আজ পলাণ্ডুখচিত খেঁচুড়ীর আয়োজন করিলেন; দরিদ্রগণেরই যত কষ্ট, তাহারা ভিজে-কাঠের জালে কোন প্রকারে আউসের মোটা চাউল সিদ্ধ করিয়া কচুসিদ্ধ, শজনের শাক ভাজা ও কাঁচা তেঁতুলের অম্বল দিয়া উদরস্থ করিল। যাহারা বাজারে যৎকিঞ্চিৎ চিংড়ি মাছ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তাহারা পুঁইশাক দিয়া পুঁই চিংড়ির আস্বাদনে রসনা তৃপ্ত করিল। পল্লী-ললনাগণের নিকট পুঁইশাক বর্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তরকারী।

ছেলে মেয়েদের আহার শেষ হইলে, কেহ ঘরে গিয়া শয়ন করিল, যে বাড়ীতে ছেলে মেয়ের সংখ্যা অধিক, সে বাড়ীর বালকবালিকাগণ চক্রাকারে বসিয়া 'আগডুম বাগডুম' খেলিতে লাগিল, একটু অধিক বয়স্কা মেয়েরা 'ঘুটিং' লইয়া খেলা করিতে বসিল। কর্ত্তারা আহারান্তে তামাক টানিতে টানিতে তন্দ্রামগ্ন হইলেন, কোন কোন বাড়ীতে পাশার আড্ডা পড়িল। অন্দরের মেয়েরা পা ছড়াইয়া আহারে বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দত্তদের ছোট জামাই, বোসেদের মেজ বৌ, মজুমদারদের ন গিন্নি এবং চাটুর্য্যেদের হারাণী সম্বন্ধে নানা কথার সমালোচনা চলিতে লাগিল। কোন বিরহিণী আহারান্তে নির্জ্জন ঘরের বাতায়নপ্রান্তে বসিয়া পরম আগ্রহভরে প্রিয়তমকে পত্র লিখিতেছেন, এক একবার সভয়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, যদি কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়ে! আকাশে কালমেঘের শোভা, জলের ছলছল শব্দ, মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন, ভেকের আনন্দ ধ্বনি আর আর্দ্র বায়ুর হিল্লোল—বর্ষা-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি একত্র মিলিয়া তাহার বিরহখিন্ন ক্ষুব্ধ হৃদয়কে সংসারের প্রতি উদাসীন করিয়া তুলিতেছে। তাহার অধীরচিত্ত যেন সংসারের মোহাচ্ছাদন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তপক্ষ প্রজাপতির ন্যায় কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চির আকাঙ্ক্ষিতের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে একটা অভাব, একটা অতৃপ্তি একটা বেদনা কেন যে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছেনা, এবং পত্রেও সেভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাণের সকল কামনা ঢালিয়া লিখিতেছে, "প্রিয়তম, এমন দিনে তুমি কোথায় আছ, তোমার জন্য আমার মন বড় কেমন করিতেছে।"

সূর্য্যদেব মেঘের অন্তরালে থাকিয়াই ধীরে ধীরে অস্ত-গমনোন্মুখ হইলেন। আর বেলা নাই। ঘাট হইতে জল আনিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া পুরললনাবর্গ চুল বাঁধিয়া, কক্ষে কলসী লইয়া দল বাঁধিয়া জল আনিতে চলিল। এ জল আনিতেই হইবে; দুর্য্যোগে মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া

পড়িলেও, নদী, দিঘী বা সরোবরের জল আনিতে যাইতে হইবে।

" বেলা যে পড়ে এ'লো জলকে চল "

এই পুরাতন সুর বঙ্গের প্রতিপল্লীতে দিবাবসানে সখী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াও কোন দিন নবীনত্ব বঞ্চিত হয় নাই। ঘরের কলসীতে জল থাক বা না থাক, একবার 'জলকে চলিতে' হইবেই। সেই তরুলতাবেষ্টিত বিজন বনপথ, বাঁশের বন, অশথের তল, বায়ুর অব্যাহত গতি এবং মুক্ত আকাশতলে, দুঃখের পর দুঃখের প্রসারণ, নির্ভয়ে প্রিয়সখীর সহিত বিশ্রম্ভালাভ,—সখীজন ইহার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিতে পারে ?

হঠাৎ মেঘান্তরিত গগনপথ উদ্ভাসিত করিয়া অস্তাচল-যাত্রী তপনের লোহিত কিরণচ্ছটা ধারাপাত-পুষ্ট সজল শ্যামল প্রকৃতির উপর বিকীর্ণ হইল, বোধ হইতে লাগিল—প্রকৃতির চক্ষে অশ্রু ও অধরে হাস্য শোভা পাইতেছে। বাঁশগাছের নতমস্তকে, গৃহস্থের 'খোড়ো' চালের মটকায়, তেঁতুল গাছের সুনিবিড় পত্রাগ্রভাগে রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গ্রাম্যপথের কাদা ভাঙ্গিয়া গোপবালকবৃন্দ মাঠ হইতে গাভীগুলিকে গৃহমুখে আনিতেছে। গোপ-পল্লীর প্রতিগৃহ হইতে সাঁজালের ধূম উঠিতেছে, পোয়াল গাদার কাছে দাঁড়াইয়া দুই তিনটি গরু উন্নমিত মুখে পোয়াল চর্ব্বণ করিতেছে, নিকটে কয়েকজন কৃষাণ 'খোলায়' কতক-গুলি সদ্যঃকর্ত্তিত আউস্ ধানের আটি বিছাইয়া বলদ দিয়া তাহা 'মলাই' করিতেছে। পাঁচটি বলদ একরজ্জুতে শ্রেণী-বদ্ধ, ধানের আটির উপর তাহারা ক্রমাগত ঘুরিতেছে, একজন কৃষক বলদগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। তাহার হাতে হুঁকা-কলিকা; বাম হস্তে হুঁকা ধরিয়া নাক মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া সে ধরশান্ টানিতেছে, দক্ষিণহস্তে অবাধ্য বলদের লেজ ডলিতেছে, কখন বা বলদের পিঠে সজোরে পাচনের আঘাত করিতেছে, আর একজন কৃষাণ একটা 'কাঁদাল' দিয়া (লোহার হুক যুক্ত দীর্ঘ বংশদণ্ড) বলদের পদতলের ধানের আটি উলটাইয়া দিতেছে। তাহার অদূরে একটা তালপত্রের ছাতি পড়িয়া আছে, সম্মুখবর্ত্তী সংকীর্ণ পথ দিয়া একজন কৃষাণ তাহার 'মাথালের' উপর এক আটি ঘাস লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে; পথের উপর একটা বাবলা গাছ, তাহার শাখায় বসিয়া গোটাকত 'ক্যাচকেয়ে' পাখী ক্রমাগত 'ক্যাচ্ক্যাচ্' করিতেছে। ঘোষানী তাহার ঘরে বসিয়া বড় 'তোলো' হাঁড়িতে ধানসিদ্ধ করিতেছে, তুঁষের জালে ধানসিদ্ধ হইতেছে, দপ্ দপ্ করিয়া তুঁষগুলা জ্বলিতেছে,—ঘোষানীর ক্রোড়ে স্তন্যপানরত শিশু। বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর জড়ান কতকগুলি শুষ্কপ্রায় ধান্যের স্তূপ। সিক্ত খড়ের চাল হইতে ফোটা ফোটা বৃষ্টির জল এখনও ছাঁচের নীচে গড়াইয়া পড়িতেছে—বর্ণ কৃষ্ণাভ লাল; প্রাঙ্গনে শশা ও ঝিঙের টালে ঝাঁকে ঝাঁকে বুল্ বুল্ পীতবর্ণ ফুলগুলি কাটিয়া ফেলিতেছে, কচি কচি শশাগুলিও কাটিতেছে; তাহাদের সহর্ষ কণ্ঠস্বরে টালটি ঝঙ্কারিত; টালের উপর একটা কঞ্চিতে কয়েকটি শামুক গুচ্ছাকারে আবদ্ধ—এক একবার বায়ু-হিল্লোলে সে গুলি থন্‌থন্ করিয়া নড়িতেছে, আর পাখীগুলি এক একবার ঝাক বাঁধিয়া উড়িয়া অদূরবর্ত্তী নিম গাছের পাতার ভিতর গিয়া বসিতেছে—আবার ক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র গ্রাম খানি আচ্ছন্ন করিল। ভাঁট ও কাল কাসিন্দের পাতায় পাতায় জোনা-কীর ম্লান আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গ্রাম্য বাজারের দোকানে দোকানে দীপাবলী প্রজ্জ্বলিত হইল, দেব মন্দিরে কাঁশর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। গ্রাম্য কালী মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ঘন-শাখাপত্র-সমন্বিত সুবৃহৎ বকুল বৃক্ষমূলে গঞ্জিকাসেবী সন্ন্যাসিগণ ধুনী জ্বালিয়া মহা উৎসাহে গাঁজা টানিতে লাগিল, তাহাদের 'বোম্ বোম্' শব্দ বায়ু-তরঙ্গ কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি উত্থিত করিল। দোকানদারগণ স্ব স্ব দোকানে ধুনা জ্বালাইয়া, দোকানের দ্বারে দ্বারে জলসেক-পূর্ব্বক 'লক্ষণ' করিয়া পিতলের ময়লা ধরা পিলসুজের উপর সংস্থাপিত মৃৎ-প্রদী-পের মৃদু আলোকে বসিয়া সুর করিয়া "কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ" পাঠ করিতে লাগিল। দাড়ী গোঁফ কামানো মোটা কাঠের মালা গলায় প্রৌঢ় দোকানদার দোকানের মাদুরের উপর বসিয়া, ময়লা সুতা বাঁধা একখান পুরাতন কাঁচের চসমা নাকে লাগাইয়া, বটতলার পুঁথি হইতে সেই বহু প্রাচীন যুগের সুখ দুঃখ ও আশা নিরাশার অনিন্দ্য সুন্দর কাহিনী মাথা দুলাইয়া, অক্ষরের পর অক্ষর মিলাইয়া পাঠ করিতেছে—শ্রোতৃগণ রুদ্ধ নিশ্বাসে নিবিষ্ট মনে স্তব্ধ

ভাবে তাহা শ্রবণ করিতেছে। এই সাহিত্য-রসে তাহারা চিরনিমগ্ন; রামায়ণ ও মহাভারত, তাহাদিগের পল্লী-জীবনের অবসরকাল-ক্ষেপণের জন্য, ভাষার অনন্ত ভাণ্ডার।

বাজারের ভিতর দিয়া পাকা সড়ক থানা পর্য্যন্ত প্রসারিত, ইহা গ্রাম্য মিউনিসিপালিটীর গৌরবময় পদাঙ্ক-রেখা। এই পথের উপর দিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে সমাগত একখানি গো শকট হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, গাড়ীর চাকা দুখানি কর্দ্দমে সমাচ্ছন্ন, বলদের লেজের কর্দ্দমে গাড়োয়ানের সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত। ছৈয়ের ভিতর আরোহিণী আছে বলিয়া তাহার সম্মুখভাগ এক খানি পাতলা চাদর দিয়া ঢাকা, গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে প্রকাণ্ড একটা ঘাসের বোঝা, তাহার উপর বলদের 'জাব' মাখিবার টোকরা, গাড়ীর নীচে একটা গোলাকার টিনের লণ্ঠন, ভিতরে একটি কেরোসিনের টিমি, লণ্ঠনের গাত্রস্থ ছিদ্র পথে আলো অপেক্ষা অধিক ধূম নির্গত হইতেছে। এই লণ্ঠনটি পথ দর্শনের সৌকর্য্যার্থ নহে, গ্রাম্য মিউনিসিপালিটির আদেশ পালনার্থ এস্থানে রক্ষিত। মিউনিসিপালিটীর কড়া হুকুম, আলো সঙ্গে না লইয়া যে সকল গাড়ী 'সহরের' ভিতর প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে পাঁচ আইনের বলে আটক্ করিতে হইবে। গাড়োয়ানেরা বুদ্ধিমান্, এমনই করিয়া তাঁহারা পাঁচ আইনের এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আবর্জ্জনাস্বরূপ মিউনিসিপালিটীর সম্মান রক্ষা করে।

মেঘ কাটিয়া গিয়া পূর্ব্বাকাশে শুক্ল পক্ষে শশধর সমুদিত হইল। সহসা বর্ষান্তে শরৎ যেন তাহার শুভ্র মহিমায় ধরাতলে বিকসিত হইয়া উঠিল, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে সিক্ত প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। গ্রামের জলপূর্ণ ডোবা ও গর্ত্তগুলিতে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইতেছে, গৃহস্থগণের বেড়ার ধারে রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা কুসুম ক্ষীণবৃন্তে ভর করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে সুমিষ্ট গন্ধ বিকিরণ-পূর্ব্বক তরল জ্যোৎস্নালোক ও বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছে। কামিনী গাছের নিবিড় পত্র আচ্ছন্ন করিয়া থোকা থোকা কামিনী ফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বালক বালিকাগণ জ্যোৎস্নালোকে পুলক-স্পন্দিত হৃদয়ে ঠাকুরমার কাছে 'রূপকথা' শুনিতেছে—ঠাকুরমার হস্তে হরিনামের মালা। বধূগণ কেহ কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইতেছেন; কেহ দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ক্রন্দনশীল শিশুকে অদূরবর্ত্তী তেঁতুল গাছে জোনাকীর স্পন্দন দেখাইয়া জুজুর ভয় দেখাইতেছেন; কেহ নিদ্রিত শিশুকে তাহার ভগিনীর কাছে শোয়াইয়া রাখিয়া ভাত রাঁধিতেছেন, শিশুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণিদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, কজ্জলপূরিত নয়ন মুদ্রিত, তাহার বক্ষের উপর বস্ত্র খণ্ড, শিথানে কাজল-লতা, প্রদীপের ম্লান আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার মুদ্রিত নয়নের ঊর্দ্ধে অস্ফুট ভ্রূ এক একবার সঙ্কুচিত হইতেছে, ওষ্ঠ এক একবার কম্পিত হইতেছে। তাহার মা উননের সম্মুখে বসিয়া ভাত রাঁধিতেছেন, উননের অগ্নি রাশির কম্পিত আলোক শিখা মুখের উপর আভা বিস্তার করিয়া সেই গ্রাম্য যুবতীর সরল সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

কৃষক-পল্লীতে কৃষকগণ খঞ্জনী বাজাইয়া গলা কাঁপাইয়া আকাশে সুর তুলিয়া বেহুলা লখিন্দরের গান করিতেছে। দিবসের পরিশ্রমের পর সূত্রধর-নন্দনগণ ডুগি বাজাইয়া মাথা নাড়িয়া বে-সুরে চীৎকারপূর্ব্বক গাহিতেছে—

"আমার বাড়ী এসো যাদু বস্‌তে দেবো পিঁড়ে
জল পান করতে দেবো সরু ধানের চিঁড়ে।"

অদূরবর্ত্তী কলুপাড়ার ঘানিঘরে কঁ্যা-কোঁ করিয়া ঘানির শব্দ উঠিতেছে, সে শব্দের বিরাম বিশ্রাম নাই, বলদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘানি গাছের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে আর অশ্রান্ত কঁ্যা-কোঁ শব্দ উঠিতেছে। কিন্তু সে সকল শব্দকে ডুবাইয়া, নিতাইদাস বৈরাগীর আখড়া হইতে বহু কণ্ঠের সংকীর্ত্তন শব্দ উত্থিত হইয়া গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। তালে তালে মৃদঙ্গ বাজিতেছে, আর গায়কগণ বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে টিকি দুলাইয়া মুখ-ব্যাদান-পূর্ব্বক প্রাণপণে চীৎকার করিয়া গাহিতেছে—

"সংকীর্ত্তন মাঝে আমার গোরা নাচে"

দেখিতে দেখিতে আকাশ আবার ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইল, চন্দ্র মেঘের অন্তরালে লুপ্ত হইল। আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামখানি জনহীন ও সুপ্ত বোধ হইতে লাগিল। কেবল চারিদিকে জলের ঝর্ ঝর্ শব্দ, ভেকের গ্যাঁৎ গ্যাঁৎ হর্ষধ্বনি, শন্ শন্ বায়ু-প্রবাহ অন্ধকার-মণ্ডিতা বৃষ্টি প্লাবিতা নৈশ-প্রকৃতির জীবন-প্রবাহের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে লাগিল। গ্রামবাসিগণ শয্যালীন, কাহারও ওষ্ঠে হাস্য, কাহারও চক্ষে

অশ্রু। কেবল জন্মদুঃখিনী বিধবা ও প্রোষিতভর্ত্তৃকা বিরহিণী অন্ধকার গৃহের মুক্ত বাতায়নপথে তাহাদের কাতর হৃদয়ের যে নীরব বেদনা-উচ্ছ্বাস বিধাতার উদ্দেশে উৎসারিত করিতে লাগিল—তাহা সেই সর্ব্বদর্শী চির-জাগ্রৎ অনাদি অনন্ত দেবতা ভিন্ন অন্য কাহারও মর্ম্মস্পর্শ করিল না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

হিমাচল বক্ষে।

(৩)

অপরাহ্ণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্গী স্বামীজির নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বামিজী বলিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি"? আমি বলিলাম, "কর্ত্তব্য মহদাশ্রয়। জমীদার মহাশয়ের পাইক যখন আমাদিগকে ভরসা দিয়াছে, আর তিন মাইল চলিলেই তিহরীর রাজার আর একখানি বাঙ্গালা পদধূলির স্পর্শে পবিত্র করিতে পারিব, তখন আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ত কিছু নাই। সমস্ত দিন এখানে কাটিল, আর ত ভাল লাগে না।"

স্বামীজির বোধ করি, রাত্রিতে আহারের আবশ্যককতা ছিল না। তিনি যাত্রার নামটি না করিয়া দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিলেন; বলিলেন, "তা বাপু, ভাল না লাগিলেও সমস্ত জীবনটা এইরকম করিয়া কাটাইতে হইবে। অদৃষ্ট ছাড়াইয়াত আর পথ নাই। অদৃষ্টই যদি বশে রাখিতে পারিবে ত, সুখে থাকিতে এরকম ভূতের কিলের রসাস্বাদন করিতে এ পথে আসিলে কেন?"—আমি বলিলাম, "বৃদ্ধেরা যখন সামর্থ্য ও উৎসাহের অভাবে ক্রমাগত সাবধান হইয়া চলিবার উপদেশ প্রদান করেন, তখন যুবকেরা স্ব স্ব উন্মত্ত যৌবন ও অসীম আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বিপদের পূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তাহাতে তাহারা শান্তি না পাক্, সুখ পায় বটে; আমি সে সুখে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না।"—আমি লাঠি ও কম্বল লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর কি বৃদ্ধ স্থির থাকিতে পারেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা উভয়েই পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথটির কিছু বিশেষত্ব দেখা গেল। পথের পার্শ্বে কোন দিকে একখানি গ্রাম নাই, পথও পরিষ্কৃত নহে, লতা-গুল্ম জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া যেন পথের একটা অস্ফুট ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, অপরাহ্ণের সূর্য্যালোকে সেই বক্র সঙ্কীর্ণ পথচ্ছায়াকে সেই পার্ব্বত্য বন্য প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্য পুষ্পমালার মৌনছায়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল। স্বামীজি সেই পথের উপর দিয়া নির্লিপ্ত সন্ধ্যার শ্রান্ত পথিকের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন, গমনের সেই উদাসীন ভঙ্গি তাঁহার মত লোকের পক্ষেই সম্ভব। যিনি নিশ্চিত জানেন, সন্ধ্যার পর স্বগৃহ-সন্নিকটবর্ত্তী পান্থের ন্যায় তাঁহার আশ্রয় অবশ্যই মিলিবে, তিনি এমনই বিশ্বাসভরে, নিরুদ্বেগে চলিতে পারেন। যিনি ইহ সংসারের সর্ব্বস্ব পরম দেবতার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার করুণা-কণাকে মাত্র ইহ জীবনের অবশিষ্ট কতিপয় দিনের অন্তিম অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিতেছেন, তিনিই এমন প্রসন্ন মনে অব্যাকুলচিত্তে চলিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে সে বিশ্বাস, সে প্রসন্নতা, সে নির্ভর নাই,আমার কোন উদ্দেশ্যই নাই—তাই আমি উর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলাম। কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে চলিব? সহিষ্ণুতা-লক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন দিয়া আমি এই কয় বৎসর যেভাবে চলিয়া আসিয়াছি, আজও তেমনি চলিতে লাগিলাম। আমার অজ্ঞাতসারেই আমার গতির বৃদ্ধি হইল, স্বামীজি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন। তিনিও ডাকিলেন না, আমিও তাঁহার জন্যে অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বৃদ্ধ হয়ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, "স্নেহ-ডোরে তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া বাঁধিয়াছি, সে পলাইবে কোথায়?"

হায়, বাঁধিলেই যদি আটকাইয়া রাখা যাইত!

আমার একটা লক্ষ্য ছিল, সন্ধ্যাকালে একটা আড্ডা চাই। সমস্ত জীবনটাই ত এই রকম এক আড্ডা হইতে আর এক আড্ডা পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছি। এক সময় আড্ডাকে সত্য ঘর বাড়ী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। মানুষ দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ দূরদৃষ্টিহীন, একান্ত ঘটনাচক্রের দাস, সুতরাং হয়ত আবার এক দিন এই রকম আর আড্ডাকেও সুখের অনন্তকালস্থায়ী গিরি-দুর্গ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সন্ধ্যার আড্ডা একটা বিশ্রাম-নিকেতন বলিয়াই মনে হইত। সমস্ত দিনের

পরিশ্রমের পর মুক্ত গিরিক্রোড়ে আমার জীর্ণ কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া শ্রমখিন্ন পদদ্বয়কে বিশ্রামদানের জন্ত তাহার উপর পড়িতাম, আর আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে চাহিয়া বলিতাম

"পাপ-তিমির-চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ মোহ-স্বপন
করহ প্রেম-বীজ বপন, সিঞ্চি ভকতি-বারি।"

তখন মনে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, যে সুখ পাইয়াছি, স্নেহ ও মায়ার এই সহস্র বন্ধনে আর সে আনন্দ, সে সুখ, সে তৃপ্তি পাইলাম না। পাশ্চাত্য দর্শনে বলে, "Life is earnest, life is real"—আমার শঙ্করাচার্য্য ঠাকুর উপদেশ দান করিলেন, "নলিনীদলগতজলমতিতরলং—তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।" এই তর্কের মীমাংসা কোথায়? তুমি শত্রু-শোণিতে তাহাদের সুখময়ী শান্তিময়ী জন্মভূমি কলঙ্কিত করিয়া বলিবে, "উহারা অসভ্য, আমরা উহাদিগকে সভ্য করিব,"—আর আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীরস্বরে বলিবে, "Life is real, life is earnest"—এ তোমাদের খৃষ্টানী মত। আমাদের প্রাচ্য মত ঐ "তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।' সত্যই ত জীবন অতি চপল ক্ষণপ্রভ দীপ্তিবৎ চঞ্চল, এই সামান্য সময়টুকু ভূমানন্দ স্বামীর চরণপঙ্কজ ধ্যান কর। আমাদের এ মত ভ্রাতার বুকে ছুরী বিঁধাইয়া পিতৃরাজ্য অপহরণ করিবার কল্পনাও করে না। তথাপি সুখের যাহা আবরণ মাত্র. তাহাকেই প্রকৃত সুখের পদে বরণ করা তোমাদের জীবনের একটি মহৎ শিক্ষা।—কিন্তু যে সুখ প্রাচ্যমতে শ্রেষ্ঠ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার এ উদাসীন হৃদয় সংসারের মধ্যে কোথায় শান্তি লাভ করিবে?

তাই ত, জীবনের অসারতার কথা চিন্তা করিতে করিতে নিতান্তই অসার লোকের মত কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কেবলই 'বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে' দ্রুতবেগে চলিতেছি। এ পথের কি শেষ নাই? পৃথিবীর পথ ত এক দিন শেষ হয়, কিন্তু আজ এ একেবারে অনন্ত বোধ হইতেছে। সমুচ্চ বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের পল্লবে অন্ধকার বাঁধিয়া আমার মস্তকের উপর তাহা নত করিয়া ধরিল। আমি একবার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলাম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, পর্ব্বত-গাত্রে তিহরীরাজের বাঙ্গালা দেখিতে পাওয়া যায় কি না; কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে মরীচিকার মত তাহার একটা ছায়াও দেখিতে পাইলাম না। একবার ভয়চকিত নেত্রে দূরে চাহিলাম। দেখিলাম, পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গগুলি দূর হইতে দূরে তরঙ্গিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর গোধূলির শেষ রৌদ্রচ্ছটা একটু স্বর্ণময় আভা অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার লঘু রেখাপাত হইয়াছে। উর্দ্ধে চাহিলাম, গগনপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সে নীল সরোবরে একটা নক্ষত্র-কমলও তখন ফুটিয়া উঠে নাই।

সভয়ে পদতলে চাহিলাম, দেখিলাম, পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে—কে জানে, কোন্ ভীষণ জন্তুর গুহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া এ পথের শেষ হইবে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা হিংস্র জন্তু আছে, তাহা জানিতাম, বুঝিলাম—পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। বুঝিলাম; মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম—"তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্"—এখান হইতে অদূরবর্ত্তী ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিতে যতখানি সময় লাগে, 'নলিনীদলগত জলম্' তাহা অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হয়।—দেখিলাম, তর্ক অনুসারে জীবনটাকে পরিচালন করা যায় না। যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা দেবতা। তেমন দেবতা পৃথীতে কয় জন?

কিন্তু এ সকল তর্ক তখন মনে আসে নাই। তখন কোন্ দিকে পলায়ন করিলে অতি অল্প কালে দুর্জ্জনের স্থান পরিত্যাগ করিতে পারা যায়—সেই চাণক্যনীতি-ঘটিত যুক্তি শাস্ত্রের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম।

তাহার পর, "যঃ পলায়তি স জীবতি,"—পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যাঘ্রের কল্পনা আমার পদদ্বয়ে পবনের গতি প্রদান করিল। হঠাৎ মনে হইল—স্বামীজি!—তাঁহাকে সেই যে পশ্চাতে ফেলিয়া বীর গর্ব্বে ছুটিয়াছিলাম! এখন আবার কাপুরুষের মত পশ্চাতে ছুটিতেছি। স্বামীজিকে কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি! একটা ভয়ঙ্কর আত্মদ্রোহকর তিরস্কার মনের মধ্যে ভয়ানক প্রদাহ উপস্থিত করিল। সেই দুর্ব্বল, কৌশলজ্ঞান-হীন ধার্ম্মিক বৃদ্ধ এই অন্ধকারময় গিরিপথে একাকী প্রাণধারণ করিতে পারিবেন? হয়ত ভয় করিবেন না, কিন্তু বিপদ্ হইতে তাঁহাকে কে রক্ষা করিবে?—মনে হইল, ভগবানই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আমরা কেবল মূঢ়তা-বশতঃ নিজের অক্ষম চেষ্টাকে তাঁহার বিধানের র্দ্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক মানবীয় দাম্ভিকতার আদর্শ রক্ষা ক .।

মন একটু শান্ত হইল বটে, কিন্তু উদ্বেগ একেবারে দূর হইল না। তাঁহাকে কাছে পাইবার জন্য একটা আকুলতা, আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, বোধ হয় তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কায়। বীরত্ব-প্রকাশে এমন শোচনীয় পরিণামের সম্ভাবনা, একবার কল্পনা করিলেও কি কখন এ পথে বীরদর্পে অগ্রসর হই?

বন্ বন্ করিয়া ছুটিতেছি, অন্ধকার ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে সমান অন্ধকার—সূচিভেদ্য; বহুদূরে গিরিঅঙ্গে ওষধির উজ্জ্বল বিকাশ অধিকাংশই লোহিত, আমার কল্পনানেত্রে দেখিলাম, যেন মুক্তকেশী কালীর করালমূর্ত্তি আমাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে—দিকে দিকে তাঁহার কেশরাশি উড্ডীন হইয়া অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তৃতীয় নেত্রে ধক্ ধক্ অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। কে বলিবে, জগজ্জননীর এ সংহারমূর্ত্তি ভয়ঙ্করী নহে। একবার ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম শত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাহা হইতে স্বর্গীয় শান্তি ও করুণা ক্ষরিত হইতেছিল।

কিছু দূর ছুটিয়া যাই, আর একবার দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, যদি কোন দিকে স্বামীজির ছায়া দেখিতে পাই। দুই এক বার ভ্রমও হইল। অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকি, স্বামীজি! স্বামীজি নিরুত্তর। শেষে সাবধানে হস্তপ্রয়োগ করিয়া দেখি—স্বামীজির সুদীর্ঘ দাড়ী বলিয়া যাহা অনুভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখশোভার বৃদ্ধিকর শ্মশ্রুভার নহে, একটা পার্ব্বত্য গুল্মের কণ্টকিত অগ্রভাগ। দৃষ্টি শক্তি দ্বারা কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বোধ করি ভৌতিক জগতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতারিত হয় নাই।

এইরূপে প্রতারিত হইতে হইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে যেন কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ দশহাত তফাতে কে বলিল—মনুষ্যকণ্ঠে—সুধাময় মনুষ্য কণ্ঠে বলিল, "কোন্ হ্যায়?"—স্বরে ভয়, সন্দেহ, উদ্বেগ কিছু নাই, কিন্তু তাহা অসীমস্নেহে সিক্ত, করুণারসে আর্দ্র। যেন তিনি বুঝিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আর একজনের দৃষ্টি ছাড়াইয়া যাইতে পারি নাই। আমি স্বামীজির আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলাম, বৃদ্ধের কি শান্তিপূর্ণ, পুণ্যময় প্রগাঢ় আলিঙ্গন! বক্ষের চিন্তাগ্নিরাশির উপর ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইল।—দুজনে কোন কথা কহিতে পারিলাম না, আমি স্বীয় বাহুপাশে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সেই অন্ধকার পথের উপর দাঁড়াইয়া কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বৃদ্ধের বাহুদ্বয় আমার স্কন্ধে স্থাপিত, তাঁহার সুদীর্ঘ শ্মশ্রু বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু আমার উত্তপ্ত, শ্রান্ত ললাটে নিপতিত হইল,—আমি এবার শিশুর ন্যায় অধীর হইয়া তাঁহার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলাম, তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "গাও 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।"

আমি আকাশের দিকে চাহিয়া উন্মত্তের মত তাঁহার আদেশে কম্পিত কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলাম,—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্র মাঝে আর, হ'ব না'ক পথহারা।"

পথ হারাইয়া পথ হারাইবার বিপদ উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারা যায়, আমরা তাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাই আজ কাতর কণ্ঠে, সেই গিরিপ্রান্তে নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আকুল হৃদয়ে গানটি গাহিতে লাগিলাম। সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল, আমার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্তির সহিত তাহা গাহিতে লাগিল।—ভাববিহ্বল স্বামীজি সেই লতা-গুল্মাবজড়িত পথের উপরই বসিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহার ক্রোড়ের কাছে বসিয়া নৈশস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া হৃদয় ঢালিয়া গাহিতে লাগিলাম—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।"

গান শেষ হইলে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বিশ্রামান্তে উঠিলাম। স্বামীজি বলিলেন, "কেমন বাপু, বিপৎসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া কি রকম সুখলাভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাইলে কি?"—আমি বলিলাম "যথেষ্ট; কিন্তু এই কষ্ট, ভয় ও যন্ত্রণা অপেক্ষা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা যাওয়া অধিকতর আরামজনক হইতে পারে, কিন্তু এরূপ আরামপূর্ণ জীবন জননী বন্যপ্রকৃতির অনাবৃত বক্ষে ছুটিয়া আসিয়া সুখ দুঃখ আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করে নাই।"

স্বামীজি বলিলেন যে, আমিই উৎসাহ বশে পথ ভুলিয়া বিপথে গিয়া পড়িয়াছিলাম, শেষে তিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য অনেক ডাকিলেন, কিন্তু সে ডাক আর শুনিতে পাই নাই; বোধ হয় তাঁহার কথা একেবারেই মনে ছিল না।

শেষে যখন মনে হইল, তখন ফিরিলাম, ভুল পথে পদার্পণের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলাম, পথের যেখানে সন্দেহ হইল, তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলাম—শেষে তাঁহাকে পাইলাম।—পথ একই, কিন্তু মানুষের দাম্ভিকতা ক্রমাগত তাহাকে ঘুরাইয়া কেবল স্বকীয় অসারতা প্রতিপন্ন করে।

আমার যে পথ ভুল হইয়াছিল, তাহা স্বামীজি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি আমার অবলম্বিত ভুল পথেরই অনুসরণ করিয়া ছুটিতে ছিলেন। আমার উদ্ধারের জন্য এমন জাগ্রৎ চেষ্টা, আর কখন দেখি নাই।

এবার স্বামীজির প্রদর্শিত পথে চলিতেছিলাম। বুঝিলাম, যে পথে যাওয়া উচিত ছিল—এবং আমি ভ্রমক্রমে যে পথ এক পাশে ঠেলিয়া উঠিয়া গিয়াছি—এ সেই পথ; বন-গুল্মে সমাচ্ছন্ন হইলেও সম্পূর্ণ দুর্গম নহে। অন্ততঃ বুঝিলাম, আমার সেই ব্যাঘ্রগহ্বরের সন্নিহিত পথ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।—সেই পথে চলিতেছি বটে, কিন্তু আর কত দূর চলিব? রাত্রি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে—পর্ব্বত-দেহ ক্রমেই ভীষণতর ভাব প্রকাশ করিতেছে, কোন দিকে জনমানবের সংস্রব নাই, এমন কি লোকালয় কতদূর তাহাও জানিবার উপায় নাই, যেন কোন পর্ব্বত গুহাশায়ী পাষাণ-হৃদয় দৈত্যের কঠোর অভিশাপে পর্ব্বতস্থ জীবিত প্রাণিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে—আমরা দুই জন বহুকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই প্রেতলোকে বিচরণ করিতেছি। নিজের নিঃসঙ্গতা সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইল।—কিন্তু আর ত অগ্রসর হওয়া যায় না; অন্ধকারের মধ্যে কোন্ গুহায় পদদ্বয় পড়িবে, তাহা অনুমান করিবার সামর্থ্য ছিল না। নিরাশ হৃদয়ে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, একটি অনতিদীর্ঘ শাখাবহুল বৃক্ষ। স্বামীজিকে অঙ্গুলী প্রসারণে তাহা প্রদর্শন করিলাম এবং অগত্যা তাহারই স্কন্ধদেশে রাত্রিবাস করিব, মনে করিয়া সেই বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইলাম। করস্পর্শ করিয়া দেখি—আঃ রাম, এ যে তিন দিকে দেওয়াল বিশিষ্ট একখানি মৃৎ কুটীর! ছাদ নাই, দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আমার নিকট অন্ধকারের মধ্যে বৃক্ষমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। দৃষ্টি শক্তির শোচনীয় অবস্থার কথা আর একবার স্মরণ-পথে উদিত হইল, কিন্তু মনে ক্ষোভ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ আনন্দই হইল। এমন স্থানে এই রাত্রে যে বৃক্ষারোহণে কালযাপন করিতে হইল না, ইহাই আমাদের পক্ষে পরম সুখকর কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই গিরিপ্রান্তে ভগ্ন-প্রাচীরাবশিষ্ট কুটীর জীবনের আরামদায়ক অবলম্বন বলিয়া মনে হইতে লাগিল—মনে হইল, সত্যই মানব সামাজিক জীব। একখানি ভাঙ্গা কুটীরও তাহার পক্ষে এ নির্জ্জন গিরি প্রদেশে যথেষ্ট সান্ত্বনার কারণ।

দেওয়ালের পাশে একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া স্বামীজি বসিয়া পড়িলেন, লম্ব স্বরে বলিলেন, "বৃন্দাবনম্ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"—সে স্থান হইতে 'পাদমেকং' অগ্রসর হইবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। কম্বল বিছাইলাম, মাথার উপর সহস্র নক্ষত্রদীপ্ত অনন্ত আকাশ, পদতলে সুকঠিন গিরি দেহ, তিন দিকে অনুচ্চ প্রাচীর, এক দিকে পার্ব্বত্য অরণ্য—এইরূপ মহা সুখকর স্থানে রাত্রিজাগরণের সম্ভাবনায় স্বামীজি বিধাতার কৃপা স্মরণপূর্ব্বক ভাব বিভোর হইয়া পড়িলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আঃ রাজার সিংহাসন কি ইহা অপেক্ষা পবিত্র? ইহা অপেক্ষা নির্ব্বিকার, এমন আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত? গাও ত বাপু, ঐ কম্বলের ভিতর হইতেই ভগবৎ প্রেমের একটা গান গাও। আজ সন্ন্যাসীর কামনার কিছু পরিচয় পাইয়াছি, তাহা প্রেম। সে প্রেমের নাম মনুষ্যের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। সে প্রেমে মিশিতে একেবারে জল হওয়া দরকার। গাও প্রাণ ভরিয়া একবার ভগবানের প্রেমের গান শুনি।"

আমি আমার বন্ধুবর—বাবুর রচিত একটি প্রেমের গান ধরিলাম—গিরি কানন প্রতিধ্বনি তুলিয়া প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল:—

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে;
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হ'লে।
অবিরাম হ'য়ে নত, চলে যাও নদীর মত,
কলকল অবিরত, 'জয় জগদীশ' বলে;
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ পাড়ি ভাঙ্গ সমূলে;
চেয়োনা কোন কূলে, (শুধু) নেচে গেয়ে যাওরে চলে।
সে জলে নাইবে যা'রা, থাক্‌বে না মৃত্যু জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে;
(যারা) সাঁতার ভুলে নামতে পারে, (তাদের)
টেনে নেবাও একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে যাও, সেই পরিণাম সিন্ধুজলে।

রমেশচন্দ্রের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আর, এ অঙ্কপাতগুলি কি?—

১৮।১২।১০—১৮।১৩।১—২৪৪।১১।৬—৩০।১২।১

১৫২।১১।৮—১০৮।১৪।৬—১৯৪।১।২—১৫১।৭।৫

২৪৯।১৬।৪—১২২।১০।১১—১৬৩৫।৩—৭৮।৫।৫

রমেশচন্দ্র অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক অনুধাবন করিলেন। বার তিথি নক্ষত্র?—না! তারিখ মাস বৎসর?—না! দণ্ড পল বিপল?—না! তবে এগুলি কি? অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হর্ষবিকসিত হইয়া উঠিল। ১৮।১২।১০! মৃণালিনীর অষ্টাদশ পৃষ্ঠা খুলিলেন, দ্বাদশ পঙ্ক্তির দশম শব্দ "এ", ত্রয়োদশ পঙ্ক্তির প্রথম শব্দ—"সংসারে";—এ সংসারে!—তাহার পর ২৪৪ পৃষ্ঠার একাদশ পঙ্ক্তির ষষ্ঠ শব্দ "কামনা", ৩০ পৃষ্ঠার দ্বাদশ পঙ্ক্তির প্রথম শব্দ—"সামগ্রী";

"এ সংসারে কামনার সামগ্রী"—!

রমেশচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি অঙ্ক ভেদ করিয়া একখানি কাগজে লিখিতে লাগিলেন; শেষে পড়িয়া দেখিলেন, অঙ্কপাতের অর্থ—

"এ সংসারে কামনার সামগ্রী
বড়ই দুর্লভ; তাহা না
হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইত॥"

পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। নলিনী সুন্দরী লিখিয়াছেন! কামনার সামগ্রী! নলিনী সুন্দরী তো বালিকা নহেন। তবে কি—?

হরি! হরি! মানুষের দুয়ারের পাশে, ঘরের কোণে, হাতের কাছে কামনার বস্তু বিরাজ করে; তথাপি তাহা কত দুস্পর্শ, কত দুর্লভ!—স্বর্গ?—স্বর্গ কি গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র লোকের অপর পারে?—যাহার পুণ্যবল আছে, তাহার শয়নকক্ষই তো অমরার স্বর্ণকক্ষবিজয়ী পরম রমণীয় সুখাগার! কিন্তু সে সুকৃতিসঞ্চয় কয় জনের আছে?

সে রাত্রিতে রমেশচন্দ্রের নিদ্রা অতি কম হইয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়া শুনা চিন্তা কল্পনায় কাটিয়া গেল। কখনও বা কামচারিণী কল্পনার পক্ষাশ্রয় করিয়া সুরঞ্জিম ইন্দ্রচাপরঞ্জিত নীলাকাশতলে সুরজনকাঙ্ক্ষিত নন্দন কাননের সুবাসিত কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা গুরুপ্রস্তরভারগ্রস্ত অতল জলে নিমজ্জমান হতভাগ্যের ন্যায় অবসন্ন, মথিতচিত্ত হইতে লাগিলেন। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রমেশচন্দ্রের নিদ্রা আসিয়াছিল।

খোকার অবস্থা এখন অনেক ভাল। তাহার হাসি খুসি এখন ফিরিয়া আসিয়াছে; খোকা পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মাতার স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনে তাঁহার কোন উপকার হয় নাই, বরং অপকারই হইয়াছে।

এক দিন মাতার শরীর যেন কিছু ভাল বোধ হইল। দুপ্রহরে তাঁহার সুনিদ্রা হইল। নলিনী কুমুদিনীর শয়ন ঘরে খোকাকে খেলা দিতেছিল। এমন সময় কুমুদিনী একখানা চিঠি আর একখানা পুস্তক হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল;—

"ঠাকুরঝি, কাল হইতে না তুই তোর 'মৃণালিনী' খুঁজিয়া পাইতেছিস্ না?—এই নে তোর 'মৃণালিনী'; আর দ্যাখ্ চিঠি পড়িয়া, কোথাকার বই কোথায় গিয়াছিল!"

চিঠিতে লেখা ছিল;—"কাল তোমাদের ফুল বাগানে বেঞ্চের উপর এক খানা বই পাইয়াছিলাম; এই লোকের সঙ্গে তাহা ফেরত পাঠাইতেছি।—তোমার দাদা।"

চিঠি পাঠ করিয়া নলিনী সুন্দরী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিল,—

"বোধ হয় সন্ধ্যার সময় বাগানে বেঞ্চের উপর ফেলিয়া আসিয়াছিলাম!"—কিন্তু পুস্তক খুলিয়াই বলিল; "এ বই তো আমার নয়! এ যে—" প্রথমেই নলিনী দেখিল, পুস্তকে "শ্রীরমেশচন্দ্র রায়" নাম লেখা রহিয়াছে, কিন্তু ৩০শে পৌষ ১২ দেখিতে পাইল, নামের নিম্ন ভাগেই কতকগুলি অঙ্ক লেখা রহিয়াছে,"—

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭—১০৪।১৪।৬—৩৫।১৩।৪

৮৪।১৬।৬—৯৪।১১।১—৮৬।৪।২—২৪৫।২০।৭

৩৫।১৭।৭—৩৫।১১।৭—১৫৫।১।১—২১৩।২৮।৯

৪১।১৮।৪—১১০।১৫।৩—১২৫।২।৩—১৮৭।১৪।৪

৭।১৬।৬—৮।১২।৫—১৩৩।৩।৪॥

নলিনীর সাগ্রহ দৃষ্টি সেই গুলির প্রতি ন্যস্ত ছিল।

কুমু। কিলো?—কার বই?

নলিনী। নাম পড়িয়া দ্যাখ্।

কুমু। তাই তো, দাদা দেখি দিব্য ভুল করিয়াছেন!

—নামের নীচে ধারাপাতের নামতা, কাঠাকিয়ার মত এ আঁক গুলি কি ?

নলিনী দেখিয়াই সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়াছিল; অর্থোদ্ধার করিবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যত ভাবিয়া তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের পুস্তকে লিখিত কথা গুলির সঙ্গে কি এ গুলির কোন সম্বন্ধ আছে ? সে গুলি তো রমেশচন্দ্র দেখিয়াছেন !

কুমু। আঁক গুলির অর্থ কি কিছু বুঝিলি ?

নলিনী। যখন স্কুলে যাইতাম, আমাদের ক্লাসের একটী মেয়ে এই রকম একটি সঙ্কেত আমাদিগকে শিখাইয়া ছিল। এ বোধ হয় সেই সঙ্কেতই হইবে।

তখন নলিনী সুন্দরী অর্থোদ্ধার করিয়া থরকম্পিত হস্তে এক খানা কাগজে পেন্সিল দিয়া লিখিল ;—

কামনার	বিষয়	দুর্লভ	হইতে
পারে	কিন্তু	মানুষ	শেষ
পর্য্যন্ত	আশা	ত্যাগ	করে
না	আশা	অবলম্বন	করিয়া
জীবন	ধারণ	করে ॥	

[illegible]রিয়া নলিনীর বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। [illegible]ও কিছু চিন্তাকুল হইল।—দাদা এই সাঙ্কেতিক লেখাযুক্ত বই কি ইচ্ছা করিয়া, না, ভুল করিয়া পাঠাইয়াছেন [illegible] করিয়া, ঠাকুরঝি পড়িবে বলিয়া যদি পাঠা [illegible] একটী [illegible]

"রাখিয়া দে, [illegible] পিয়াছে, বিকালে দাদা আসিলে ফিরাইয়া দিব। [illegible]ই, ঠাকুরাণী ডাকিতেছেন।"

[illegible]খোকা দুলিতে দুলিতে মায়ের কোলে গেল। নলিনী [illegible]নী সেই ঘরে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। [illegible]ন সময় চাকরাণী আর এক খানা চিঠি ও বই লইয়া [illegible] জিজ্ঞাসা করিল ;—

"দিদি বাবু, বৌঠাকুরুণ কোথায় ?"

নলিনী। দে, আমার কাছে দে।

পুস্তক ও চিঠি খানি রাখিয়া চাকরাণী চলিয়া গেল। নলিনী দেখিল এখানা তাহারই 'মৃণালিনী'। তখন চকিত নেত্রে দরজার দিকে চাহিয়া নলিনী দ্রুত হস্তে নিজের নাম ও সেই অঙ্কপাতযুক্ত পাতাখানি আমূল ছিন্ন করিয়া লুকাইয়া রাখিল। আজ দুই তিন দিন হইল কেন যেন সেই কিশোর কালের শিক্ষিত সঙ্কেত স্মরণ করিয়া নলিনী কয়েকটা কথা পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিল। সে পুস্তক যে বাহিরে কাহারও হাতে পড়িবে এ সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় নাই। কুমুদিনীও এপর্য্যন্ত তাহা দেখেন নাই। নলিনীর বড় ভয় হইল, যদি কুমুদিনী এখন তাহা দেখিয়া তাঁহার দাদার পুস্তকে লিখিত কথা গুলির সঙ্গে তুলনা করেন, তবে কি মনে করিবেন ? ভয়ত্রস্তহস্তে নলিনী সেই পাতা খানি ছিঁড়িয়া লুকাইয়া রাখিয়া কুমুদিনীকে ডাকিল।

নলিনী। এই নে, তোর চিঠি নে। আমার বই আমি পাইয়াছি। ভুল সংশোধন জন্ম আবার লোক আসিয়াছে !

চিঠিতে লেখা ছিল ;—"বামন ঠাকুর বৃহৎ ভুল করিয়াছে। তোমাদের পুস্তকের পরিবর্ত্তে আমার নিজের খানা পাঠাইয়াছে। তোমাদের 'মৃণালিনী' পাঠাইতেছি। আমার খানা এই লোকের সঙ্গে শীঘ্র পাঠাইবে।"

বামন ঠাকুরকে ডাকাইয়া কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রমেশচন্দ্র সে দিন আহারান্তে বাহিরে চলিয়া যাইবার সময় ব্রাহ্মণের হাতে সে চিঠিখানা দিয়া এবং নলিনী সুন্দরীর "মৃণালিনী" খানা দেখাইয়া দিয়া এ বাড়ীতে শীঘ্র পাঠাইবার জন্ম বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। [illegible] পরিষ্কার করিবার সময় কাগজ পত্র পুস্তকাদি [illegible] তাহার উপর ছিল তৎ [illegible] করিয়াছিল। [illegible] আহারান্তে বামন ঠাকুর যখন চিঠি সহ চাকরকে [illegible], তখন ভুল ক্রমে রমেশ চন্দ্রের নিজের পুস্তক খানা তাহার হাতে দেয়। ঠাকুর বাঙ্গলা লেখা পড়া কিছু কিছু জানিত।

কুমুদিনী দেখিলেন, ভুলই হইয়াছিল; কিন্তু বড় মারাত্মক ভুল। দাদার এই ভ্রম ঠাকুরঝিকে অগাধ জলে না ডুবায় !

রাত্রিতে কুমুদিনী স্বামীকে বলিলেন ;—"ঠাকুরঝি সম্বন্ধে একটা কিছু শীঘ্র ঠিক করিতে হয়।"

অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন ;—

"মা'র অসুখটা আরাম হইলেই সব ঠিক ঠাক করিব। আমি তো মনে মনে ঠিকই করিয়াছি ; মাকেও বলিয়াছি।'

গ্রন্থিবন্ধন।

কিন্তু মাতার অসুখ আর সারিল না। ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে অতি আশঙ্কাজনক অবস্থায় দাঁড়াইল। দিনরাত্রি জাগিয়া কন্যা পুত্রবধূ তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন ; দিন রাত্রি জাগিয়া অক্ষয়চন্দ্র রমেশচন্দ্র তাঁহার তত্ত্বাবধান, তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইলেন। সেবাশুশ্রূষা, যত্ন চেষ্টা চিকিৎসা যতদূর সম্ভব তাহা হইল, কিন্তু তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৃহিণীকে কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে স্বীকার হইলেন না। রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর মনোহর তরঙ্গলীলা দেখিতে পান ; জ্যোৎস্না প্রফুল্ল যামিনীতে গঙ্গার শীতল মৃদু বাতাসে তাঁহার গাত্রজ্বালা প্রশমিত হয় ; এমন পবিত্র নীরিবিলী স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার ক্ষুদ্র গলি মধ্যে ক্ষুদ্র বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে গৃহিণীর একান্ত অনিচ্ছা। দিনই যদি আসিয়া থাকে, তবে—ঈশ্বর করুন—গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে শুনিতে, সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে দেখিতে, পুত্র পৌত্রের সাক্ষাতে স্বামীর চরণপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। শুনিয়া স্বামী পুত্র কন্যা পুত্রবধূ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল না। সেই খানেই চিকিৎসা চলিতে লাগিল ; কিন্তু আর ভরসা রহিল না।

রমেশচন্দ্র এখন দিন রাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় সে বাড়ীতে। পুত্রের ন্যায় গৃহিণীর কাছে কাছে। সময় সময় অক্ষয়চন্দ্র ভাবী বিপদ আশঙ্কায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র অকাতরে নিরন্তর খাটিতেন। বিদেশে বিপাকে আত্মীয়তা আরও গাঢ় হয়।

মাতা দেখিতেন ; রমেশচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, তাঁহার হৃদয়ভরা মায়া, তাহার অকপট ব্যবহার, তাহার দেবদুর্লভ চরিত্র মাতা দিবারাত্রি লক্ষ্য করিতেন। আর দেখিতেন নলিনী ও রমেশের ভাব। কেহ কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিত না। কিন্তু সেবাশুশ্রূষা, পথ্য ঔষধ প্রদান ইত্যাদি কার্য্যে যখন যাহার যতটুকু সাহায্য করা আবশ্যক অপরে তখনই নিঃশব্দে তাহা করিয়া দেয় ; এক জন গৃহে প্রবেশ করিলে অন্য জন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায় না,—কেনই বা যাইবে? রোগশয্যাপার্শে লজ্জার তীব্রতা কমিয়া যায়!—কিন্তু কেমন যেন মৃদু সঙ্কোচে আরব্ধ কার্য্যে আরও মনসংযোগ করে। মাতা দেখিতেন, আর কত কি ভাবিতেন ;—প্রজাপতি কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

এক দিন দ্বিপ্রহরে গৃহিণীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাশের ঘরে একটুকু আরাম করিতে ছিলেন। গৃহিণীর নিকট নলিনী কুমুদিনী, অক্ষয়চন্দ্র আর রমেশ। খোকা এখন অনেক সময়ই চাকরাণীর কোলে। গৃহিণীর অবস্থা বড়ই খারাপ ; তাঁহার যেন বাক্য রোধ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত শরীরের যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। পদসম্বাহনকারিণী পুত্রবধূকে ইঙ্গিত করিয়া কাছে আনিয়া তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। খোকাকে কাছে আনাইয়া তাহাকে ক্ষণকাল আপনার শীর্ণ বক্ষসংলগ্ন রাখিলেন। অক্ষয়ের দিকে আকুল চক্ষে চাহিয়া কর্ত্তাকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। পার্শে থাকিয়া নলিনী মাতার হাতে বাহুতে হাত বুলাইতেছিল, মাতা কাতর চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া তাহার কেশ রাশিতে হাত দিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা সেঘরে প্রবেশ করিয়া অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। গৃহিণীর নিকট যাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করি-লেন ;—

"এখন কেমন আছ?" গৃহিণী ক্ষীণস্বরে কি যেন বলিতে চাহিলেন ; তাঁহার চক্ষুর ভঙ্গীতে বুঝা গেল যেন বলিলেন—ভাল আছি। কিন্তু তাঁহার চাঞ্চল্য যেন বৃদ্ধি হইল ; কি যেন বলিতে চাহিতেছেন, বলিতে পারিতেছেন না। কর্ত্তা অতি কাতর জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহি-লেন। তখন গৃহিণী হাত দিয়া আপনার মস্তক দেখাইয়া তাহাতে স্বামীর পদস্পর্শ প্রার্থনা করিলেন। অতি সংক্ষুব্ধ-চিত্ত স্বামী সতীর বাসনা পূর্ণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদস্পর্শে গৃহিণীর নীলিমমান মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সীমন্তশোভী সিন্দুরবিন্দু যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। রমেশচন্দ্র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিলেন, গৃহিণী অপরিমেয় স্নেহভরা চক্ষে রমেশের দিকে চাহিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন, এবং নলিনী[illegible] কম্পমান যুগলহস্ত অপর হস্তে ধরিয়া [illegible] একত্র করিয়া গভী- মর্মস্প[illegible] [illegible]তে স্বামীর দিকে [illegible] [illegible]নায় পিতা কি [illegible] [illegible]তার মুখের দিকে [illegible]

[illegible] [illegible]শতঃ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় [illegible] করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, শেষে [illegible] নাই হইবে।"

গৃহি[illegible] [illegible]র চন্দ্রকলাবৎ হাসির রেখা দেখ[illegible] [illegible]মেশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ন[illegible] [illegible]াপিয়া উঠিল ;—সেখানে বসিয়া থাকা তাহা[illegible] হইল—নীরবে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে শয্যায় পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

লোকের পূর্ণ হৃদয় যখন আবেগসংক্ষুব্ধ হয়, তখন চিত্তের অজ্ঞাতসারে নেত্রে অশ্রু দেখা দেয়!

সেই রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ের পর গঙ্গাস্রোতভঙ্গের কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে শুনিতে স্বামী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পুত্র-বধূ, ভাবী জামাতা—সকলের সাক্ষাতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সতী ঈশ্বরধামে চলিয়া গেলেন।

* * *

[illegible] ফ্রেমে বাঁধিবার সময় রমেশ মৃণালিনীর সেই অশ্রুপাতযুক্ত দুইখানি পাতা ছাঁটিয়া কাটিয়া যোড়া দিয়া অতি উৎকৃষ্ট বিলাতি ফ্রেমে বাঁধাইয়া নিজের শয্যাপার্শ্বে দেয়ালে খাটাইয়া রাখিয়াছেন।

১৮। [illegible]২।১৩।১——

২৪৪। [illegible]৪৪।১১।২——!

সে দিকে দৃষ্টি পড়িলেই দুজনের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে!

পরিশি[illegible]

রমেশচন্দ্র অশ্রুপাত কাহিনী [illegible] করিলেন। কিন্তু সেঘরে নলিনী সুন্দরীর আশু প্রবেশের সম্ভাবনা কম দেখিয়া দুই বন্ধু পরিশেষে ভিতর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

রাত্রিতে আহারান্তে রমেশচন্দ্র নিজ শয়নকক্ষে টেবিলের নিকট বসিয়া পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু নিদ্রায় ভারি হইয়া আসিতেছিল। শেষে পুস্তক রাখিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"কাজের কি আর শেষ নাই? রাত যে এগারটা বাজে!"

এমন সময় মৃদু রুণু ঝুণু শব্দে নলিনী সুন্দরী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রমেশ। আগমন হইল কি? বহু ভাগ্য, রাত্রি যে এখনো প্রভাত হয় নাই!

নলিনী। কেন, আজ কি ঐ যে টচন্টার না কি পোড়ামুখো সাহেবগুলোর পিণ্ডদান এত শীঘ্রই হইয়া গেল?

রমেশ। আজ কি আর কোন বাজে অঙ্কে মন যায়? অতুলের কাছে অশ্রুকাহিনী আলোচনা করিতে করিতে আজ সারাটা বিকাল কাটাইয়াছি!

নলিনী। তোমার কি একটুকু লজ্জাও হইল না? সমস্তই বলিয়াছ? আমার সাক্ষাতেই আরম্ভ!—আজ হইতে ও আয়নাখানা আমি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিব।—কই সেখানা?

[illegible] [illegible]য়া দেখিবার জন্য [illegible] [illegible]ছ।—আয়না বাক্সে [illegible] করিতে পারিবে?"

[illegible]

নলিনী সেই টেবিলের পার্শ্বে আর একখানি কেদারায় বসিলেন; রমেশচন্দ্রের সম্মুখে যে পুস্তকখানি ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন; ডিবা খুলিয়া একটা পানের খিলি স্বামীর মুখে দিয়া বলিলেন ;—

"তোমার মুখ তো বন্ধ করিলাম। কিন্তু আজ যাঁহার নিকট বলিয়াছ, তাঁহার কৃপায় অশ্রুপাতের কাহিনীটা সংবাদপত্রে না উঠিলে বাঁচি।"

রমেশ। অতুলকে মানা করিয়া দিব, সংবাদপত্রে যেন বাহির না করে।

নলিনী। নৌকা ডুবাইবার কথা তুমি আর পাগলকে মনে করিয়া দিও না!—সে কথা থাক্। ঠাকুরঝিকে কবে আনাইবে?

নলিনী সুন্দরী শ্বশুরগৃহে থাকা সময় কুমুদিনীকে "ঠাকুরঝি;" আর পিত্রালয় গেলে "বৌ" বলিয়া ডাকিতেন। কুমুদিনীও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রমেশ। তুমি যেদিন বল।

নলিনী আপনার নিবিড় কেশরাশি পীবর অংশদেশের উপর দিয়া বক্ষের দিকে আনিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বেণীবন্ধন করিতেছিলেন। তাঁহার দ্রুত-সঞ্চালিত গৌর অঙ্গুলিদাম আষাঢ়ের নবীন মেঘবৎ সেই কৃষ্ণ কেশরাশির কোণে কোণে বিদ্যুৎবিভ্রম জন্মাইতেছিল। গ্রীবা বক্র করিয়া বেণী বন্ধন কার্য্যে চক্ষু রাখিয়া নলিনী বলিলেন;—

"আজ রবিবার, পরশ্ব না তোমাদের কলেজ বন্ধ আছে?"

রমেশ। হাঁ।

নলিনী। সেই দিনই আনিতে পাঠাও।

রমেশ। হঁা।

নলিনী। ঠাকুরঝি গতবার আসিয়া এক রাত্রি মাত্র এখানে ছিল; এবার কিন্তু তা হইতে পারিবে না।

রমেশ। না।

নলিনী। ঠাকুরঝির ছোট খোকা দিব্য ফর্‌সা হইয়াছে!

রমেশচন্দ্র নিরুত্তর।

নলিনী। ছোট থাকিতে ঠাকুরঝি বলিয়াছিল, তত ফর্‌সা হইবে না; কিন্তু এখন কেমন ফুট্‌ফুটে ফর্‌সা হইয়াছে!

নলিনীসুন্দরীর বেণীবন্ধন শেষ হইল। মুখ তুলিয়া দেখিলেন রমেশচন্দ্র নিদ্রায় বিভোর; আস্তে আস্তে নলিনী সম্মুখস্থ আলোটি উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়া নির্নিমেষনেত্রে স্বামীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুপ্ত মুখের বড়ই শোভা। মানুষ যখন জাগিয়া থাকে তখন মনের ভাব গোপন রাখিয়া কত হাসে, কত কাঁদে—কত কি করে! কিন্তু ঘুমন্ত মুখে কোন ছল চক্র নাই, অন্তরের প্রকৃত চিত্র মুখে ফুটিয়া উঠে। নলিনী সুন্দরী দেখিলেন, এমুখে অন্তরের অপরিমেয় প্রেমের প্রভা প্রস্ফুরিত হইতেছে। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। স্বামীর স্কন্ধে বাহু রাখিয়া নলিনী [illegible] ঘুমাইয়াছ!" পরে মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন—

"ওগো, জাগো; রাত ভোর হইয়াছে!"

রমেশচন্দ্র জাগিয়া উঠিলেন। তখন যদি কেহ সুবৃহৎ মুকুরাভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে [illegible] পাইত,—পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট যুগলমূর্ত্তি হাসিয়া পড়িতেছে!

এমন সময় দ্বারের কাছে ঝি আসিয়া ডাকিল;—

"দাদাবাবু, জাগিয়া আছ?"

রমেশ। কে ও, ঝি?

নলিনী সুন্দরী দরজা খুলিয়া দিলেন। ঝি ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা বই ও বাঁধান একখানা আয়না দিয়া বলিল;—

"বৈঠকখানা হইতে দাদাবাবু পাঠিয়েছেন।" ঝি চলিয়া গেল। রমেশচন্দ্র আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন;—

"ওগো, দেখ, অক্ষয় যেন নীচে কি লিখিয়া দিয়াছে!"

২২১।১০।১১—১৬৩।৫৩—২৪৫৬।২

৯৪।১১।৭—১৪৯।৮

২৩২।১১।৬—১৩।১৬৬—৭৭।৫।২॥

নলিনী তাড়াতাড়ি "মৃণালিনী" খুলিলেন; উভয়ে মিলিয়া অর্থোদ্ধার করিলেন;—

পৃথিবী স্বর্গ হইয়াছে

ঈশ্বর করুণাময়

তাঁহাকে প্রণাম করি॥

তখন দুই জনে একই মুহূর্ত্তে, এক মনে, এক প্রাণে যোড় হস্তে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

কুকি জাতির বিবরণ।

(২)

কুকিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাহারা বলে, ঈশ্বর প্রয়োজনমতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিচরণ এবং প্রাণিগণের হিতাহিত ও শুভাশুভের বিধান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা

প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করা হয়। ইহারা দেব দেবীকে "পাতিয়েন" বলে এবং তাহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

কুকিগণ পরকাল অথবা পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাহাদের সর্ব্ব প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানই ঐহিক মঙ্গলের কামনায় হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে সুখ-শান্তির কামনায় এবং সময় সময় রোগ-প্রশমনার্থ ইহারা পূজা করিয়া থাকে। কুকিগণ মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে না। কোনও বৃহৎ বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত বা বংশনির্ম্মিত আসনকে অবলম্বন করিয়া "পাতিয়েনের" পূজা করে। পূজক দণ্ডায়-মান অবস্থায় সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূজার জিনিসে যাহাতে থুতু পড়িতে না পারে, এজন্য তাহারা মুখে কাপড় দিয়া সমস্ত অর্চ্চনা কার্য্য সম্পাদন করে। তাহারা প্রথমতঃ আবাহনীয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাকে আহ্বান করে। আমরা 'হালাম' সম্প্রদায়ের জনৈক 'ওঝাই'* এর নিকট হইতে পূজার কয়েকটি মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

"আ খালে কাপুয়ই সাং যোয়ঙ্‌র্‌ কাপুয়ই যেই চেকো যেই মা লুয়ঙ্গ।

অর্থ—হে শ্বেতাঙ্গিনী দেবীমাই, শূন্যপথে, পিচ্ছিল গতিতে এখানে আসিয়া এই স্থান পূর্ণ করিয়া ফেল। †

"সিমাকুনা মারকুনা সাং যোয়ঙ্‌র্‌ সিম্‌নিয়ম্‌ সরখায়ম তৈজ্ঞাই থিম্‌ রালা সাং যোয়ঙ্‌র্‌ কাপু

অর্থ—উত্তরের দক্ষিণের দেবতা, পূর্ব্বের পশ্চিমের দেবতা, জলের দেবতা (গঙ্গা), দূরের দেবতা, সকলেই শূন্যপথে আইস মাই।

"রাকুন থাং রয়লেম থাং কানুয়ং সাং যোয়ঙ্‌র্‌।"

অর্থ—সমস্ত সমুদ্রের দেবতা এবং সমুদ্রের দেবতার প্রধান দেবতা সকলেই আইস মাই।

এই প্রকারে আবাহনের পর নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়;—

"ছিপ ছিপ ম হং শিপ্র জেই রেং জোরা।"

অর্থ—আমার পূজার জিনিস সকলে আসিয়া গ্রহণ কর।

ইহার পরে বলিদান হয়। সাধারণতঃ ছাগ, বরাহ, হংস ও কুক্কুটাদির বলিদান হইয়া থাকে। গবয় একটি বিশেষ বলির মধ্যে পরিগণিত। গবয় একপ্রকার গো এবং মহিষের মধ্যবর্ত্তী বন্য পশু। অনেকে ইহাকে বনগরু বলিয়া অনুমান করে। মহিষ অপেক্ষা এই প্রাণী আকারে ছোট নহে, শক্তি মহিষের তুলনায় অনেক বেশী। ইহা-দের ললাটদেশ গো এবং মহিষের ললাট অপেক্ষা বেশী চৌড়া। শৃঙ্গদ্বয় মহিষের শৃঙ্গের ন্যায় লম্বা নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মোটা ও দৃঢ়। শিং প্রথমতঃ সোজাভাবে গজাইয়া থাকে, পরে যত বড় হয়, ততই উপরের দিকে বাঁকাইয়া উঠে। কলিকাতার চিড়িয়াখানায় অনেকেই গবয় দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বলিদানের পরে প্রার্থনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুকিগণ ঐহিক মঙ্গল কামনায় দেবার্চ্চন করিয়া থাকে। ইহারা কেবল আত্মমঙ্গলকামী নহে, এবং পূজা করিয়া কেবল যে দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করে, এমনও নহে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার জন্যও তাহাদের প্রার্থনা আছে। পূজা সমা-প্তির পরে, রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য, সমস্ত মনুষ্যের জন্য এবং নিজের জন্য তাহারা বর মাগিয়া থাকে।

ওকা পুমা রেং পাখিবেং মিমান দাম্রো দেশী হৈরসে, রাজা হৈরসে, দামরং উং রেং দাম্রেছে।

অর্থঃ—হে আমার রাজা ও রাজার দেবতা, মনুষ্যের ভাল কর, দেশের ভাল কর, রাজ্যের ভাল কর; আমাদের ভাল কর এবং মহারাজ বাঁচিয়া থাকুক।

দেবতার নিকটে দাঁড়াইলে,—হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হইলে, মানুষের চিত্তবৃত্তি কত উদার হয়, এস্থলে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নরমাংস-লোলুপ হিংস্র-স্বভাবাপন্ন কুকি, দেবসন্নিধানে মনুষ্যের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছে, ইহা অপেক্ষা উদারতার দৃষ্টান্ত আর কি থাকিতে পারে।

হালামগণ রাজভক্ত প্রজাও বটে। দেবতার সঙ্গে সঙ্গে রাজার নিকট বর প্রার্থনা করাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতদ্ভিন্ন আমরা এবিষয়ের আরও যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

সার্দ্ধ ত্রিশত বর্ষকাল পূর্ব্বে (ত্রৈপুরী দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে) প্রবল পরাক্রমশালী ও রাজনীতিকুশল মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন*

* কুকির পুরোহিতগণকে ওঝাই বলে।

† যে সকল কুকি ভাষার বঙ্গানুবাদ লিখিত হইল, জনৈক হিতার্থীর সাহায্যে আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়াছি। এই অনুবাদের ভ্রম প্রমাদের জন্য আমরা দায়ী নহি।

* মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালের বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে, মল্লিখিত "মহারাজ বিজয়মাণিক্য বাহাদুর" শীর্ষক প্রবন্ধে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৎকালে জয়ন্তিয়াধিপতি মহারাজ বিজয় কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লওয়ার মানসে পার্ব্বত্য কিরাত জাতির সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ কথা গোপন রহিল না; অল্পকাল মধ্যেই জয়ন্তিয়াধিপের ষড়যন্ত্রের বিষয় বিজয় মাণিক্য বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল।

তৎকালে জয়ন্তিয়া রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী সাখাচেপ্' ও 'থাঙ্গাচেপ্' দফার হালামগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুরার রাজশ্রী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুগত এবং রাজভক্ত প্রজা হইলেও এই সময়ে মহারাজ বিজয় ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি কৌশলক্রমে, তাহাদিগকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন যে, তাহারা কোন কালে বশ্যতার বিপরীত কোন কার্য্য করিবে না। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা চিরস্মরণীয় ও অক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ধাতুনির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।* উক্ত প্রতিমূর্ত্তি দ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে, বাঙ্গলা অক্ষরে, নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যাবলী খোদিত আছে:—

> "পূর্ব্বাপোর্ব্বা ক্রমাত্তবত্ত আত্মীয়া,
> ইদানীং যদি বৈপরীত্যমাচরন্তি,
> তবোপরি ধর্ম্মঃ শস্তনাশো ভবিষ্যতি,
> পশ্চাদ্গজ শার্দ্দূলো।"†

মর্ম্ম:—পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের সহিত আত্মীয়তা চলিয়া আসিয়াছে। ইদানীং যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে তোমাদের ধর্ম্ম ও শস্ত নষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎ গজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক তোমরা বিনষ্ট হইবে।

কুকিগণের রাজভক্তি এত দৃঢ় যে, অদ্যাপি তাহারা উক্ত আদেশবাণীর কোনরূপ অবমাননা করে নাই। এবং উপরি উক্ত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়কে দেবতা জ্ঞানে স্থাপিত বিগ্রহের ন্যায় প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকে। সার্দ্ধ ত্রিশত বর্ষকাল যাবৎ পুরুষানুক্রমে, এই আদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসা অসভ্য কুকি জাতির পক্ষে সামান্য রাজভক্তির পরিচায়ক নহে।

এতদ্ব্যতীত লঙ্গাই দফার হালামগণের নিকট সুসজ্জিত যুধ্যমান সোয়ার সহ, ধাতুনির্ম্মিত একটি সুন্দর অশ্বমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই অশ্বের পৃষ্ঠদেশে মহারাজ বিজয় মাণিক্য ও মহারাজ ছত্র মাণিক্যের নাম এবং যে সরদারকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার নাম খোদিত আছে। প্রদানের সন অশ্বপুচ্ছে খোদিত ছিল, এখন তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। আমরা আয়তন-বর্দ্ধক কাচের সাহায্যেও তাহা পাঠ করিতে পারি নাই। কোন্ মহারাজের শাসন কালে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল, লিপিতে তদ্বিষয়ের উল্লেখ নাই; সুতরাং ইহা কত কালের জিনিস, তাহা নির্ণয় করিবার সুবিধা হইল না। ছত্র মাণিক্য, মহারাজ বিজয় মাণিক্য বাহাদুরের বহু পরবর্ত্তী ভূপতি। অশ্বপৃষ্ঠে ছত্র মাণিক্য বাহাদুরের নাম খোদিত থাকায় এই প্রতিমূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত হস্তী ও ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অপেক্ষা আধুনিক বলিয়াই সাব্যস্ত হইতেছে। ছত্র মাণিক্যের শাসনকালে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, তাহাও দুই শত বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন! রাজদত্ত উপহার বলিয়া কুকিগণ এই প্রতিমূর্ত্তিটি পুরুষানুক্রমে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন ত্রিপুরার দরবার হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আমরা কুকিগণের নিকট দেখিয়াছি। এই সকল জিনিস বহু পুরাতন, ইহার মধ্যে অনেক সামান্য সামান্য বস্তুও আছে, কিন্তু রাজদত্ত বলিয়া তাহা কুকিগণের অতি আদরের জিনিস এবং তাহাদিগের দ্বারা বহু যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

সাখাচেপ্ ও থাঙ্গাচেপ্ দফার হালামগণের রক্ষিত জিনিসের তালিকা;—(১) অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, ছত্রের তালা (তাম্র নির্ম্মিত) ৪টী; (২) রৌপ্য নির্ম্মিত কর্ণভূষণ ৪টী; (৩) দেবতার পদতলে দেওয়ার রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্র ৮খানা; (৪) রমণীগণের বক্ষে বাঁধিবার রৌপ্য নির্ম্মিত স্তনাবরণ ২টী; (৫) ছত্রের ফুল (তাম্র নির্ম্মিত) ২টী; (৬) রৌপ্যপত্র ২খানা; (৭) জোড় ঘণ্টা ১টী; (৮) সূর্য্যাকৃতি ছত্রের ফুল (তাম্র নির্ম্মিত) ৪টী; (৯) রৌপ্য নির্ম্মিত পূজার জল দেওয়ার চুঙ্গ ১টী; (১০) লৌহ

---

* এই মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন কালে ফটোগ্রাফের কাজ জানিতাম না। এজন্য সেই গভীর রাজনীতির নিদর্শনের প্রতিকৃতি, পাঠকগণকে উপহার দিতে অক্ষম হইয়া নিতান্তই দুঃখিত আছি।

† পাঠের প্রথমাবধি "শস্তনাশো ভবি" পদপর্য্যন্ত হস্তিপৃষ্ঠে এবং অবশিষ্টাংশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে খোদিত হইয়াছে।

নির্ম্মিত খড়্গা ১ খানা; (১১) রৌপ্য ফলক ১ খানা;* (১২) লৌহ নির্ম্মিত তুলাদণ্ড ১টী;* (১৩) রৌপ্য নির্ম্মিত কোটরা ২টী;* (১৪) হনুমান মূর্ত্তি-অঙ্কিত নিশান ১খানা।

লঙ্গাই দফার রক্ষিত জিনিসের তালিকা;—

(১) লৌহ নির্ম্মিত তুলাদণ্ড ১টী; (২) লোহার ওজনী (বাট খারা) ১টী; লৌহ নির্ম্মিত ফুড়ই † ১টী

তাম্র নির্ম্মিত জিনিসগুলির উপরে পূর্ব্বে সোণার গিলটি ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। শীঘ্র নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ইহার কোন জিনিসই কুকীগণ ব্যবহার করিতেছে না। অতি মূল্যবান ও গৌরবের পরিচায়ক জ্ঞানে তাহা যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেছে। বর্ব্বর জাতির পক্ষে রাজভক্তির নিদর্শন ইহার বেশী আর কি হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিলে এই রকমের আরও বিস্তর জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাইবে।

বরাহ, গবয়, ছাগ ইত্যাদি পশু সচরাচর কুকিগণ পোষণ করিয়া থাকে। ইহাদের পোষিত ছাগ স্বতন্ত্র জাতীয়। স্বাধীন ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহা "কু'কে পাঠা" নামে অভিহিত। এই ছাগগুলি সাধারণ ছাগ অপেক্ষা অনেক বড় হয়। এই সকল ছাগের লোমাবলী খুব লম্বা ও কোমল। অনেকে বলে, ইহা তিব্বত দেশীয় ছাগের বংশ-সংসৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহা হউক বা না হউক, এই সকল ছাগের লোমেও উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। পার্ব্বত্য জাতির পরস্পর সংস্রবে তিব্বত দেশীয় ছাগের বংশ বিস্তার হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা নহে।

স্বাধীন ত্রিপুরায় প্রাচীন কাল হইতে বহু সংখ্যক কুকিপ্রজা বস-বাস করিয়া আসিতেছে। কুসাই পর্ব্বতও এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল; কাল প্রভাবে এখন তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কুকিপ্রজা ঐ রাজ্যে বাস করিতেছে, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুকিগণের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বিগত আদম সুমারীতে ত্রিপুরারাজ্যের কুকি ও হালাম সম্প্রদায়ের সংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশী সাব্যস্ত হইয়াছে। জন সংখ্যা গণনার কাজ যে সম্পূর্ণ শুদ্ধরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কুকি পল্লীর ন্যায় দুর্গম অরণ্য মধ্যে ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অধিকতর অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং কুকিসংখ্যা আরও বেশী আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ত্রিপুরেশ্বরের অধীন কতিপয় কুকি জাতীয় সামন্ত রাজা দ্বারা ইহারা শাসিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে।* এতকাল কুকিগণের অপরাধের বিচারাদি সামন্ত রাজগণ দ্বারাই হইত। তাঁহারা অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড করিতেন। কয়েদিকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইত না; রাজার বাড়ীতে উপস্থিত থাকিয়া বিনা বেতনে তাঁহার কাজ করিতে হইত। এখন আর সে নিয়ম নাই। আজকাল মহারাজ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত আদালতে কুকিগণের অপরাধের বিচার হইয়া থাকে। কেবল সামাজিক বিচারের মীমাংসাদি কুকিরাজগণ করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচারও তাঁহারাই করেন।

কুকিগণ ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের সরকারে "ঘরচুক্তি কর" নামে একটি কর আদায় করে। এই করের সহিত ভূমির কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; 'খানার' উপর ইহা ধার্য্য হইয়া থাকে। অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠরোগী, বিধবা ও বিপত্নীকগণকে কর দিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন সামন্ত রাজাদিগকে সকলে মিলিয়া প্রতিবৎসর একটি 'জুম' ক্ষেত্র করিয়া দেয়। আবশ্যকতা মতে তাঁহাদের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ ও উৎসবাদি উপলক্ষে বিনা বেতনে তাহাদিগকে কাজ করিয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতীত সামন্ত রাজগণ অন্য কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না।

শেল, জাঠা, তরবারি ও ধনুর্ব্বাণ কুকিগণের যুদ্ধের অস্ত্র। এই সকল অস্ত্রে ইহারা বিলক্ষণ সিদ্ধহস্ত ধনুর্ব্বাণ দ্বারা তাহারা সর্ব্বদা পশু পক্ষী ইত্যাদি শিকার করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে বীর পুরুষ, রমণীগণের কর্ণলতিকার ছিদ্রের ভিতর দিয়া অনায়াসে তীর চালাইতে পারে, সে ব্যক্তি সমাজে বিশেষ সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়া থাকে। 'ঢোং' নামক একপ্রকার কাংস্য নির্ম্মিত বৃহৎ বাদ্য যন্ত্র দ্বারা ইহাদের রণবাদ্যের কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রের-

* এই জিনিস গুলিতে অনেক কথা লিখিত ছিল, অস্পষ্ট হওয়ায় তাহা পাঠ করিতে পারা গেল না।

† 'ফুড়ই' একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। যুদ্ধ কালে বা অন্য কোনও প্রয়োজনে এই চিহ্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রেরণ করিলে, তাহা দৃষ্টিমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে সমবেত হইতে বাধ্য। ফুড়ইতে রক্ত মাখাইয়া দিলে, যুদ্ধ উপস্থিত বলিয়া বুঝা যায়। ত্রিপুর দরবারের অনুমত্যানুসারে ফুড়ই চালনায় প্রথা এখন রহিত হইয়াছে।

* এই সামন্ত রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পরে লিখিব।

শব্দ অতি গম্ভীর ও দূরগামী। ইহার আকার কাঁশীর ন্যায়। পাঁচ ছয় ফুট পর্য্যন্ত বাঁসের "ঘোং" যন্ত্র আমরা দেখিয়াছি। ইহার পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে বর্ত্তুলাকার একটী উচ্চস্থান থাকে, সেই স্থানে আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। যন্ত্রটী বংশ বা কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যস্থলে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দুইজনে কাঁধে লয়, অন্য একজনে বাজায়।

কুকিগণের রণসজ্জা অতি সুন্দর। তাহারা আপনাদের নির্ম্মিত কাপড়ের একটী জামা পরে, কাল পাছুড়ি দ্বারা মাথায় পাগড়ি বাঁধে এবং তাহার উপর কুক্কুট-পুচ্ছ বা ময়ুর-পুচ্ছ গুঁজিয়া দেয়। বক্ষঃস্থলে (যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ঝুলাইয়া) আট অঙ্গুলি পরিমিত চৌড়া একটী পট্টি বাঁধে। এই পট্টিটি কড়িদ্বারা সাজান হয়। হস্তে একটী শেল (বর্ষা) থাকে, তাহার ফলক উপরের দিকে রাখিয়া কাঁধে ফেলিয়া লয়। এই সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিলে, কুকিগণের উগ্রমূর্ত্তি অধিকতর উগ্রভাব ধারণ করে। আমরা স্বাধীন ত্রিপুরার কতিপয় কুকি সৈন্যের প্রতিকৃতি এই সঙ্গে প্রদান করিলাম।

এই কামান বন্দুকের যুগে ধনুর্ব্বাণ বা শেলশূল কার্য্যকরী হয় না। এজন্য কুকিগণ বন্দুক ব্যবহারও শিক্ষা করিয়াছে। অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় বন্দুকেও ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ। স্বাধীন ত্রিপুরার বন্দুকধারী কতিপয় কুকি সৈন্যের ছবিও প্রদত্ত হইল।—

কুকিগণ সম্মুখ সংগ্রামে তত পটু নহে। লুক্কায়িতভাবে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া শত্রুদলকে ইহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনা করিলে, কুকিগণের এই উপায়ে যুদ্ধ জয় করিবার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

"হিন্দু" শব্দ-রহস্য।

সম্প্রতি "ভারতী" পত্রিকায়, সুযোগ্য লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়, "হিন্দু শব্দ-তত্ত্ব" বহু গবেষণার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি "হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে যে সকল ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যা পড়িয়া কিন্তু তাহার মধ্যে একটী ভুল আমাদের সত্য বলিয়াই ধারণা জন্মিয়াছে। মহাভারতী মহাশয় দফায় দফায়, অনেক "ভুল" উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিজ বক্তব্য স্থলে অনেক "হিন্দু" ধার্য্য করিয়া, পূর্ব্বাহ্ণেই স্বপক্ষে "ডিক্রী"র স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারই কথায়, তাঁহারই সিদ্ধান্ত বোধ হয় উলটাইয়া গিয়াছে; অথবা তিনি যাহা "ভুল" বলিয়া সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, পরিণামে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

আমি বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত নহি, এবং গবেষণার শক্তি, সামর্থ্য এবং সময়ও আমার নাই; কিন্তু তথাপি, মহাভারতী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুপাঠ্য প্রবন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইতেছি। ইহা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা মাত্র, সন্দেহ কি? তবে, আমি "হিন্দু" শব্দের অর্থে, হীনতাজনক কিছু না বুঝিয়াও, নিজেকে "হিন্দু" মনে করি, এবং "হিন্দু" শব্দ "সিন্ধু" শব্দেরই প্রকারান্তরে অপভ্রংশ বলিয়া বিশ্বাস করি। "ভারতী"র প্রবন্ধ পড়িয়াও, সে বিশ্বাস দূর হইল না; সেই জন্য, আমার বক্তব্য প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। আশা করি, মহাভারতী মহাশয় আমার (এবং বোধ হয় আমার মত অনেকেরই) ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য পুনরায় এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিবেন।

মহাভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধদ্বয়ের সার সঙ্কলন করিলে "হিন্দু," শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপতঃ এইরূপ দাঁড়ায়:—

(১) জেন্দাবেস্তায় "হপ্তহিন্দব" শব্দের উল্লেখ আছে।

(২) "বেদে" ইহাই "সপ্তসিন্ধবঃ"। "সপ্তসিন্ধবঃ" বলিয়া এক আর্য্য রাজ্য ছিল।

(৩) "বেদ" ও "জেন্দাবেস্তা" সমসাময়িক।

(৪) "বেদ" ও "জেন্দাবেস্তা," হিব্রু ভাষা ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

(৫) জেন্দ ভাষা হিব্রু ভাষার জননী। য়ীহুদী জাতি ও দেশ তাহাদের প্রাচীন কালে জেন্দ-ভাষাভাষী পারসিকগণের অধীন ছিল।

(৬) হিব্রু "ওলড্ টেষ্টামেণ্টে" "হদ্" শব্দের উল্লেখ আছে।

(৭) হিব্রু ভাষার নিয়মানুসারে, "হিন্দব" শব্দ জেন্দ

ভাষা হইতে রূপান্তরিত হইয়া "হন্দ্" শব্দে পরিণত হইয়াছে।

(৮) ছিক্রে শাস্ত্র রচনা কালে "হন্দ্" জাতি শক্তিশালী, পরাক্রান্ত, মহিমময় বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং "হন্দ্" শব্দ গৌরব ও শক্তিসূচকরূপে "হন্দ্" জাতিকে বুঝাইত।

(৯) গ্রীক-আক্রমণ কালে এই "হন্দ" জাতি বর্ত্তমান আফগানিস্থানের কিয়দংশ এবং বর্ত্তমান পঞ্জাবের কতক অংশে উপনিবিষ্ট ছিল। "হন্দ" অধিকারের সীমা বলিয়া উত্তর পশ্চিমের সীমা পর্ব্বত "হন্দকোশ" নামে গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিল। ইহাই "হিন্দুকুশ"।

(১০) গ্রীকেরা "হন্দ্কোঃ', বা "হন্দকোশ"কে Hondkosh, Indikos, 'ইণ্ডিকস্' বলিয়া লিখিতে ও বলিতে আরম্ভ করে।

(১১) ইণ্ডিকস্ বা ইণ্ডিয়স হইতে "ইণ্ডিয়া" শব্দ উৎপন্ন।

(১২) পশতু ভাষায় হন্দ্ বা হিন্দ্ "হন্দু" রূপে পরিণত।

(১৩) শিখ গুরুমুখী ভাষায় "হন্দু" "হিন্দু" হইয়া গিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে "হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে প্রচলিত "ভুল" কি? লোকে মনে করে যে, "সিন্ধু" শব্দের "স" যাবনিক ভাষায় "হ" হইয়াছে। এখন মহাভারতী মহাশয়ের প্রমাণ অনুসারে যেন স্বীকার করা গেল, আরবী বা পারসীতে "স" "হ" বলিয়া উচ্চারিত হইবার প্রয়োজন নাই, এবং সংস্কৃত "সপ্তাহ," পারসী "হপ্তা" রূপে পরিণত হয় নাই। কিন্তু উপরিলিখিত "হিন্দু" শব্দের ইতিহাসে, স্পষ্টই ত দেখা যাইতেছে, বৈদিক ("সংস্কৃত" নাই বা হইল!) "সপ্তসিন্ধব' শব্দ "হপ্তহিন্দব" বলিয়া জেন্দ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। "সপ্তসিন্ধবঃ" যদি "হপ্তহিন্দব" হইল, তাহা হইলে কি "স" স্থানে "হ" হইল না? জেন্দ ভাষা পরবর্ত্তী পারসীক ভাষার ন্যায় 'যাবনিক' না হইলেই বা কি? আর্য্য ও ইরাণী একই মূল জাতির বিভিন্ন শাখা বটে। কিন্তু বৈদিক আর্য্যেরা যেখানে "স" উচ্চারণ করিতেন, জেন্দিক্ ইরাণীরা সেখানে 'স'কে যে 'হ' উচ্চারণ করিতেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এখনও ত অনেক কথিত ভাষার দেশান্তরভেদে এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়। যেমন বাঙ্গালা ভাষায়। তদ্ব্যতীত বৈদিক "অসুর", কি জেন্দ "আহুর" নহে? বৈদিক "সোম" কি জেন্দ 'হোম" নহে? যদি বৈদিক 'স' স্থানে জেন্দ উচ্চারণ 'হ' স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে অপর পক্ষে স্বীকার করিতে হয় জেন্দ 'হ' বৈদিক 'স'তে পরিণত হইয়াছিল; অর্থাৎ, পূর্ব্বের "হপ্তহিন্দব," পশ্চাতে বেদে, "সপ্তসিন্ধবঃ" আকার ধারণ করিয়াছিল। এ কথা কি প্রামাণ্য? যে দেশে যাহারা বসবাস করে, সে দেশের নাম মূলতঃ তাহারাই দেয়। মূল আর্য্যস্থান হইতে, বৈদিক আর্য্যেরা দক্ষিণবাহী হইয়া, হিন্দুকুশ ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে উপনিবেশ স্থাপন করিলে, তাঁহারাই নদীর সংখ্যা দেখিয়া, দেশকে সপ্তসিন্ধব নাম দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতিবেশী অগ্নিপূজক ইরাণীগণ ঐ "সপ্তসিন্ধবঃ" নাম "হপ্তহিন্দব" বলিয়া উচ্চারণ করিতেন, এইরূপ অনুমানই ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

"সিন্ধু" শব্দ বেদের সময় উৎপন্ন হয় নাই, বা "সিন্ধু" অর্থে প্রবহমান নদ-নদী ও সাগর বুঝাইত না, এ সিদ্ধান্ত কিরূপে প্রমাণ হইল, বুঝা যায় না। লেখক মহাশয় (এবং "ভারতী-সম্পাদিকা মহাশয়া) কি, "হিন্দব" হইতে "সিন্ধব" এবং "সিন্ধবঃ" হইতে "সিন্ধু" শব্দের উৎপত্তি ধরিতে চান? "পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকের" উপর আক্রোশের ত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া গেল না। "সিন্ধু" শব্দের বহুবচনেই ত "সিন্ধবঃ" নিষ্পন্ন হইতে পারে! আগে একবচনান্ত মূল শব্দ, না আগে বহুবচনান্ত নিষ্পন্ন শব্দ? "সিন্ধু" শব্দের উল্লেখ নাই বলিয়া বা তখনও "ব্যাকরণ" প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে, যে "সিন্ধু" শব্দ ছিল না? আগে ভাষা, না আগে ব্যাকরণ? 'সপ্ত" শব্দ ত বহুবাচক বটে; 'সপ্ত' এই বিশেষণ যোগে বিশেষ্য, "সিন্ধব" না হইয়াই পারেনা! "সিন্ধব" ছিল, "সিন্ধু" ছিল না, পরে হইয়াছে, ইহা নিতান্তই অপ্রামাণ্য।

"মহাভারতী" মহাশয়ের নানাভাষাজ্ঞানদীপ্ত আলোচনায় সপ্রমাণ হয়, "হিন্দু" শব্দ "সপ্তসিন্ধবঃ" এই দেশবাচক আর্য্য শব্দ হইতে, জেন্দ ভাষায়, পরে ছিক্র ভাষায়, তৎপরে গ্রীক্ ভাষার ভিতর দিয়া সহস্র সহস্র যুগ বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে, এবং পশতু ও গুরুমুখী ভাষায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সংস্কৃতে "হিন্দু" নাম পাওয়া না যাইতে পারে, কিন্তু সেই "সপ্তসিন্ধবঃ" দেশবাসী-

দিগকেই প্রাচীন জাতিরা, এবং তাহাদের সভ্যতার উন্নত আধুনিক বৈদেশিক জাতিরা, 'হুন্দ' 'হিন্দ' বা 'হন্দ' বা 'হিন্দু' বা 'ইন্‌দু' বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছে ইহা স্পষ্টই জানা যায়। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্য ঔপনিবেশিকের বংশধরেরাই "হিন্দু" বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এবং হইতেছে; এবং তাহাদের দেশই বর্ত্তমানে "হিন্দুস্থান" নাম ধারণ করিয়াছে। "সিন্ধু" ও "হিন্দু" নিতান্ত অসংস্পৃষ্ট নহে, এক অপরের বিকৃতি ও পরিণতি; ভাষান্তরের মধ্য দিয়া হইলেই বা, মূল সম্পর্ক কোথায় যাইবে?

আমার বোধ হয়, ভারতে মুসলমানের আবির্ভাব ও প্রভাব কালে, ভারতীয় আর্য্যগণের যে 'হিন্দু' নাম পাশ্চাত্য বৈদেশিক জাতিগণের মধ্যেই পরিচিত ছিল, তাহা পুনরায় পাশ্চাত্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতে সমধিক প্রচলিত হয়; এবং মুসলমান রাজগণের দেখাদেখি, আমরাও আপনা-দিগকে "হিন্দু" বলিয়া সাধারণ্যে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 'হিন্দুস্থান' নাম, মুসলমান কর্ত্তৃক প্রদত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। মুসলমানেরা এরূপ অনেক দেশের নাম-করণ করিয়াছিল, যথা আফ্‌গানস্থান, বেলুচিস্থান, কুর্দ্দি-স্থান, তুর্কিস্থান ইত্যাদি।

শ্রীসু—

"চলি চলি পা—পা।"

ধরণী, শ্যামল অঙ্ক
দাও দাও বিছাইয়া—
"চলি, চলি, পা-পা" ধায়
বাছা হেলিয়া দুলিয়া।

পরশ-হরষে মত্ত
অধীর হ'য়োনা ধরা,
ফেল'না বাছারে মোর
কোলেতে লইতে ত্বরা।

পড়েছে তোমার কোলে
ভানুর কিরণ-ধারা,
সে সোণা কুড়াতে দেখ
ছুটেছে পাগল পারা;

হোথায় ডাকিছে পাখী—
তারই মত হর্ষ-স্বরে;
গাছ পালা হেলি' দুলি'
ডাকিছে কাঁপায়ে করে।

চৌদিকে স্নেহের ডাক,
চৌদিকে প্রীতির আঁখি,
কোন্ দিকে যাবে বাছা?
কোথা তারে ধরে রাখি?

এখন হাসিছে যথা
মাণিকের চারি ধারে,
সোহাগের ফুল-বীথি—
গাঁথা চুম্বনের হারে,

বয়সের সনে যেন
কঠিন সংসার-পথ
প্রীতি-শ্যামায়িত রহে
পূর্ণ করি মনোরথ।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

মান—অপমান।

তুমি দিয়াছিলে মান তুমি নিলে কেড়ে—
আমার কি ক্ষোভ তাহে আছে গো জননি?
তোমার এ রঙ্গভূমে যা সাজাবে মোরে
অম্লান-বদনে তাই সাজিব তখনি।

'চিরদিন রাজা হব, হব না ভিখারী—
একি অপরূপ কথা—একি আব্‌দার!
তুমি যার কেনা দাসী এ দাবী তাহারি—
আমি কে যে হেন সাধ খাটিবে আমার?

সকলেই সেনাপতি, কেহ নহে সেনা—
আমার লাগে না ভাল এমন নিয়ম:—
তোমার কথায় কথা আমার সহে না,
আবদার দেখে মোর উপজে সরম;

তাইত তোমার পায় দিয়াছি অঞ্জলি—
আমার যা কিছু আছে মান অপমান;

যা করাবে হাসিমুখে করিব সকলি—
কখনো সাজিব রাম—কভু হনুমান।

শ্রীবিজয় কুমার সেন।

নির্ব্বাসিতা সীতা।

উত্তরিল রথ যবে ভাগীরথীপারে,
লক্ষ্মণ করুণ কণ্ঠে কহিলা সীতারে
রামের কঠোর আজ্ঞা। মূর্চ্ছি না সীতা
সামান্তা নারীর মত—সাধ্বী শুচিস্মিতা
পড়িলা না মহাদুঃখে ভাঙ্গিয়া গলিয়া;
ক্ষণতরে সতী-গর্ব্বে উঠিলা জলিয়া
নিরপরাধিনী শুধু! কহিলা লক্ষণে,—
আপনার মন্দভাগ্য, জেনো নাহি গণে
নির্ব্বাসিতা সীতা। ভাবিতেছি মনে,
ধর্ম্ম কি সহিবে, হায়, আজি অকারণে
রাজহস্তে অপমান! সে অমূল্য ধন
দেবেন্দ্রদুর্লভ। নিমিষের অযতন
নাহি সহে তার। যশে নাহি ক্রীত হয়;
বলে নাহি হারে।—রাজদণ্ডে তারি ক্ষয়!
এত কহি নিরবিলা—ফিরে এল প্রাণে
আত্মবিস্মিতার ভাব। পতিপদ ধ্যানে
সকলি ডুবিয়া গেল। সস্নেহ নয়নে
বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণে,
রাজ-আজ্ঞা, ভ্রাতৃ-আজ্ঞা, করেছ পালন,—
ধন্ত তুমি! যাও ফিরে রামের সদন
কর্ত্তব্যে রহিও স্থির—করি আশীর্ব্বাদ!
কেন লজ্জানত? তোমার কি অপরাধ?
শ্বশ্রূ মাতা পৌরজনে প্রবোধিও, বীর,
কহিও নাথের কাছে দীনা জানকীর
এই নিবেদন,—রাজা তিনি, তিনি স্বামী;
তার কিছু নাহি দোষ! অভাগিনী আমি,
তেঁই মোরে বাম সবে! মাতা বসুমতি
কোলে নাহি দিলা স্থান—হায়, কি নিয়তি!
শুনেছি অনলে স্বর্ণ ধরে উজ্জ্বলতা,
স্বর্ণ নহি—নাহি গেল নিন্দা-মলিনতা!
কিন্তু না হইনু ছাই!—রামের সন্তান
ধরেছি যে গর্ভে আমি; যদি থাকে প্রাণ,
পিতৃগুণে বিমণ্ডিয়া তুলিব তাহারে।
রহিব নির্জ্জন বনে শুদ্ধ তপাচারে
অন্তরে জাগিবে মোর এক মনস্কাম,—
জন্মে জন্মে পতি যেন হন মোর রাম।
এতবলি নিবারিলা রঘুকুলেশ্বরী,
ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম। শূন্ত তটোপরি
অস্ত গেল সন্ধ্যাসূর্য্য। মুছি দুনয়ন
ফিরিলা পশ্চাতে বাখি' শোকার্ত্ত লক্ষ্মণ,—
স্তব্ধ ব্যোম, স্থির নদী, উদাস অটবী,
মাঝে তার জ্যোতির্ম্ময়ী বিষাদের ছবি!

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

কঙ্গ্রেস,—সপ্তদশ অধিবেশন

[ব্যয় সমর্থন]

অনর্থক আত্মবিরোধ, যেদেশের একাল সেকালব্যাপী বদ্ধমূল ব্যাধি,—পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কাল হইতে, শিশিরবাবু সুরেন্দ্র বাবুর সময় পর্য্যন্তও, আত্ম-বিরোধ, যেদেশে, কোন অনিষ্টেরই অবধি রাখে নাই—রাখিতেছেনা,—অধীনতা, অসম্ভ্রম, অন্নক্লেশ, সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক অবনতি ও দুর্গতি, এককথায় অধঃপতনের সর্ব্বরকমেরই প্রকার ভেদ, যেদেশে একমাত্র আত্ম বিরোধেরই ফল,—আত্ম-বিরোধ যে দেশের স্বাধীন জীবন, বহুকাল পূর্ব্বে, বিনষ্ট করিয়া, অধীন জীবনেরও অস্থি মজ্জা, কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া চলিয়াছে,—পরন্ত, যেদেশের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতেও পাঁচটা পৃথক পৃথক দল,—যেদেশে দশজনের অনুষ্ঠিত একটা অতি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান—একটা যৎসামান্ত যৌথ বিধান, কচিৎ জীবিত থাকে,—"দশে মিলে করিকাজ, হারি জীতি নাহি লাজ"—যেদেশের বহুপুরাতন ও একান্ত প্রচলিত প্রবচন হইয়াও, দেশবাসী কর্ত্তৃক তাহা পদে পদে উপেক্ষিত অগ্রাহ্য;—সেদেশে, এই "কঙ্গ্রেস" নামক সমগ্র দেশব্যাপী দেশের প্রত্যেক প্রদেশ-স্পর্শী, সমবেত-ভারতবর্ষের এই বিরাট, বিচিত্র, অপূর্ব্ব প্রজানৈতিক একতানুষ্ঠান—বিপুল

"প্রজাস্বত্ব" ষোলবৎসর কাল সজীব থাকিয়া, সেই সজীবতার সহিত আজ সপ্তদশ বর্ষে, পৌঁছিতে পারিয়াছে, ইহাইযে আমাদের প্রথমতঃ পরম সৌভাগ্য ;—কেবল ইহাতেই,—উহার কৃতকার্য্যের ফলাফল দূরে রাখিয়া এবং গণনার মধ্যে না লইয়া,—কেবল মাত্র ইহাতেই—সজীব-ভাবে এই ১৭ বৎসর কাল জীবিত থাকাতেই যে, কঙ্গ্রেসের "জয়জয়কার"। পরন্তু, সপ্তদশ-বর্ষ-ব্যাপী উহার এই নাতি দীর্ঘ-জীবন কালটুকু, নেহাত পুষ্প-বাসে ও প্রীতিরসেও কাটে নাই। বড়ই পিচ্ছিল, পঙ্কিল ও পদে পদে কণ্টকাকীর্ণ এবং বিঘ্ন-বিপদ সঙ্কুল পথ পারাইয়া, বহু ঝঞ্জাবাত ও বজ্রপাতের মধ্যদিয়া, উহাকে এই সপ্তদশে আসিতে হইয়াছে। একদিকে, রাজশক্তির ভ্রুকুটি কটাক্ষ—অলক্ত লোহিত লোচন এবং বিপক্ষ-পক্ষের অপ্রীতির ও অহেতুক বিদ্বেষের প্রখর দংশন এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষাক্ত লেহন ; পরন্তু অপর দিকে, স্বপক্ষ পক্ষের ও স্বজনগণের উপেক্ষা ঔদাসিন্য, অবসাদ মনোমালিন্য,—শত শত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া, শত শত সাংঘাতিক বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে "কঙ্গ্রেস" আজ সপ্তদশে উপস্থিত হইয়াছেন। সহৃদয় ভারত সন্তান মাত্রেরই অনাবিল আনন্দের বিষয় ; সজাতীয় সম্ভ্রম এবং কিঞ্চিৎ শ্লাঘার বিষয়ও নয় কি ?

কিন্তু, এখন এই উপস্থিত অবস্থায় আরও অধিকতর সমর্থন, অধিকতর সম্তর্পণ ও মনোমিলন, অধিকতর সতর্কতা ও সমবেত সহায়তা এবং অচল অটল একতার প্রয়োজন। বঙ্গের,—বোধহয় সমগ্র ভারতের সর্ব্বপুরাতন ও প্রবীন প্রজানৈতিক সমিতি,—বৃদ্ধ ও বিশিষ্ট "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের" কি বিসদৃশ অবস্থা, অন্তঃ বিপ্লববিজৃম্ভিত ও আত্মবিদ্বেষ-বিক্ষোভিত কি শোচনীয় ও সাংঘাতিক দৃশ্য,—কি অসার ও বিদ্রূপকর অভিনয়, আমরা সম্প্রতি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম, প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই আত্মকলহ-বিচ্ছিন্ন, আত্ম-বিরোধ বিদগ্ধ দেশে, এই ব্যক্তি গত প্রাধান্য স্থাপনের এবং অতিমাত্র আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রলোভন-কলুষিত জল বায়ুতে, সমবেত সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই পদে পদে শঙ্কা, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণীয়। এবং অন্ততঃ সেই সূত্রেও আত্ম সমাজ বা সম্প্রদায় গত স্বার্থ, আবশ্যকস্থলে, বরং কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া, বিশেষতঃ আত্ম ব্যক্তিগত খ্যাতি প্রতিপত্তির কামনা, একেবারে বিলুপ্ত না হউক, অন্ততঃ সম্যকরূপে আবৃত ও উপেক্ষিত করিয়া, কঙ্গ্রেস-ক্ষেত্রে, উহার পরিচালকগণের বিচরণ ও স্ব স্ব অংশে নির্দ্দিষ্ট, নিরতিশয় কঠিন সাধারণ কার্য্য সকল সাধন করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা একটু অতিরিক্ত হইলেও, উহার কেবল একান্ত ও আদৌ অলঙ্ঘনীয় আবশ্যকতা নিবন্ধন, নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্যের পক্ষেও অনুপযুক্ত নহে। যেক্ষেত্রে, আত্মত্যাগ, আত্ম ব্যক্তিত্বের বিলোপ, বিসর্জ্জন, বিস্মরণ ও বলিদান একমাত্র কার্য্যোপদান, সে ক্ষেত্রে, আত্ম বিস্তার বা অণুমাত্রও আত্ম-প্রভা, প্রতিপত্তির প্রসার, নিরতিশয় সাংঘাতিক ও সর্ব্বনাশ বিধায়ক নয় কি? কে ইহা না জানেন, না বুঝেন, বিশ্বাস না করেন ?

নিশ্চই, কঙ্গ্রেসের ন্যায়, প্রজানীতির সাধারণ সমালোচনা ও মন্ত্রনা-গৃহে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই, এমন কি সংযম ও শিষ্টাচারের অপেক্ষাকৃত উচ্চ আদর্শ—বৃটিশ পার্লেমেণ্টেও অসহিষ্ণুতা, অধীরতা ও অনৈক্য এবং আত্ম-ব্যক্তিত্বের ও সম্প্রদায়িক স্বার্থের অযথা বিস্তার ঘটিত বিসদৃশ ব্যাপার ও লজ্জাকর দৃশ্যের অভাব নাই, সচরাচরই সেরূপ—অনুপযুক্ত, অশিষ্ট ও অসংযত অভিনয়ের সংবাদ শুনা যাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের অসামান্য উন্নত ও নিত্য উন্নতিশীল অবস্থা, ও অবস্থিতি, ও আমাদের নিরতিশয় অবনত ও একান্ত দুরাবস্থা ও দুর্গতি এ উভয়ের মধ্যে অপরিসীম প্রভেদ,—আকাশ পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। সে সকল স্থলে, যে পরিপক্ক ও চির প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় শক্তি পরম্পরা সর্ব্ববিধ পার্থক্যের সমাহার ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি নিচয়কে, সাধারণ কল্যাণের একই মহা কেন্দ্রে, মাধ্যাকর্ষণবৎ আকৃষ্ট করে, এবং সেইই কল্যাণের একই অব্যাহত, ও অলঙ্ঘনীয় সুপ্রসর পথে, যদা পরিচালিত ও প্রবাহিত করে, তাহা আমাদের মধ্যে কোথায়? সৌভাগ্য ও শুভসংযোগে, তাহা যদি কখন সৃষ্ট ও গঠিত হয়, হইতে কত কাল লাগিবে? পরন্তু, সে সকল স্থলের বিমানস্পর্শী, সংগঠন-ক্ষম ব্যক্তিগত অতুল প্রতিভা, অবিচলিত দৃঢ়তা, অসীম কার্য্যশীলতা, পুরুষ পরম্পরাগত অব্যাহত উৎসাহ, উদ্যম, একই অব্যাহত উন্মুক্ত প্রবাহে প্রবাহিত, সদাই সজীব ও সতেজ "জোয়ার" পূর্ণ, জাতীয়

জীবন, আমাদের অকর্ম্মণ্য, অবসন্ন, অসংখ্য ভগ্নাংশে বিচ্ছিন্ন জাতি নিচয়ের মধ্যে কোথায়! কতকালের স্বাধীন আবহাওয়ায়, ও স্বাস্থ্যকর, সুনিয়মিত শিক্ষায়, ঐ সকল শক্তি, অদ্যকার য়ুরোপীয় জাতি নিচয়ের মধ্যে অভিব্যক্ত ও সঞ্চিত হইয়াছে? এ সোপানে, আমরা আজও দাঁড়াইতেও শিখি নাই, সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিই আমাদের হয় নাই, পদে পদেই পদস্খলন ও পতনের সম্ভাবনা; অতএব কতই সাবধানতা ও সতর্কতা প্রয়োজন, তাহা চিন্তাশীল চিত্তেরই অনুভবনীয়।

তবে,—আত্মশ্লাঘা প্রচারার্থে নয়, ষোলআনা সত্যের খাতিরে, ইহাও এ প্রসঙ্গে বক্তব্য বিবেচনা করি যে, অপরাপর স্বাধীন ও সজীব জাতির তুলনায়, আমাদের নির্জীব ও অনাত্ম শাসনাধীন, বহুবর্ণে ও বিভাগে বিভক্ত ও বিযুক্ত জাতি নিচয়ের এই সমবেত সমষ্টিভুক্ত ও এক জাতীয় একতা যুক্ত, জাতীয় অনুষ্ঠান, যতই ক্ষীণ, যতই ক্ষুদ্র, যতই অঙ্গহীন, অপূর্ণ ও অশেষ অভাব পূর্ণ হউক না কেন, ইহার সাধারণ ক্রিয়ায় ও প্রক্রিয়ায়, আমাদের ভারতীয় কঙ্গ্রেসের কোন অধিবেশনেই, কখনও অশিষ্টতা বা অসংযততার, অধিরতার বা অভব্যতার বিসদৃশ ও বিরক্তিকর দৃশ্য সংঘটিত হয় নাই। এরূপ বৃহৎ সমাগমের, ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষী ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মী বহুজন সমবেত সভার কার্য্য নিচয় এতাদৃশ শান্ত, শৃঙ্খলা—সংযম—শিষ্টাচার-সমন্বিত ভাবে সমাধা হইতে, প্রায় খুব কমই শুনা যাইয়া থাকে। অন্ততঃ এই একটী বিষয়েও আমাদের এই জাতীয় মহাসমিতি অপরাপরের আদর্শ স্থল, স্বাধীন ও শৌর্য্য-বীর্য্যবন্ত য়ুরোপীয় সভাসমতি নিচয়েরও দ্রষ্টব্য দ্রব্য।

বিপক্ষ বর্গের ত কথাই নাই,—কঙ্গ্রেস-বিদ্বেষী ত বলেনই,—বলিবেনই; কিন্তু যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে কঙ্গ্রেসের বিপক্ষ-স্বপক্ষ কোন পক্ষেরই পক্ষাবলম্বী নহেন, এমন অল্পাধিক পরিমাণে নিজপক্ষ বা নিরপেক্ষ, কোন কোনও শ্রেণীস্থ লোকের মৌখিক ও লিপিবদ্ধ সমালোচনায়, (বলা আবশ্যক এই সব লোক নেহাত নির্ব্বোধ নহেন ও সংখার হিসাবে স্বল্প ও নহেন) অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে সাধারণতঃ এই একটা খুব অবাধ অথচ অল্পাধিক পরিমাণে অনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ অবগত হওয়া যায় যে, কঙ্গ্রেস এই ষোল বৎসর ব্যাপিয়া, যাহা কিছু করিয়াছেন এবং এখন বৎসরে বৎসরে, সেই বিগতকেই পুনঃ সংঘটিত করিয়া, যে ব্যাপার করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে তাদৃশ কোন ইষ্টই ত দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে রাজ দ্বারে এবং কর্ত্তৃত্ব-প্রভুত্ব-প্রভাবিত রাজপুরুষ নিচয়ের নিকটে, প্রত্যক্ষে বা পরক্ষে আমাদের বরং শাফ্ অনিষ্টই হইতেছে।—জমিদার, তালুকদার বা তদনুরূপ রূপেয়াদার ও শক্তিধর শ্রেণীস্থ লোকদের সন্দেহ ও শঙ্কা বাড়িয়াছে, তাঁরা অনেকেই, পূর্ণ মাত্রায় কঙ্গ্রেস-নির্ম্মুক্ত এবং কেহ কেহ প্রচ্ছন্নভাবে কঙ্গ্রেস ভুক্ত থাকিয়াও আঁধার দেখিতেছেন; সন্দেহ শঙ্কার সর্ষপ পুষ্প সদাই তাঁদের নয়ন সমক্ষে প্রস্ফুটিত হইতেছে। পরন্তু,চাকুরীর উমেদারগণের চাকুরী হইতেছে না। এবং বহাল চাকুরেয়া কর্ত্তা সাহেবদের বিষনয়নে পড়িয়া, চাকুরী বাঁচান ও চাবুক এড়ান, উভয় দিকেই শঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন। কঙ্গ্রেস কর্ত্তৃক রাজদ্বারে, দেশের অপরাপর অনেক অপ্রকাশ্য লঘু গুরু অনিষ্টের সংঘটনের মধ্যে, জমিদার দলন ও কেরাণী পীড়ন, এই দুইটা অনিষ্ঠ, নিত্যই বেশি বেশি ফুটিয়া উঠিতেছে, এবং দণ্ডে দণ্ডে ডাগর হইয়া দাঁড়াইতেছে। পক্ষান্তরে, কঙ্গ্রেসী গণ, কঙ্গ্রেস করিয়া এই দরিদ্র দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় ও অপব্যয় করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে আপনাদের মানসিক শক্তি সামর্থের অনর্থক ক্ষয় করিতেছেন। ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, কঙ্গ্রেসের বিরুদ্ধে, আর অনেকানেক অভিযোগ বরং অল্পাধিক যুক্তিযুক্ত, ও বিশ্লেষণ ও বিচারের যোগ্য এবং তাহাদের কোন কোনও অভিযোগ প্রকৃত পক্ষেই, কঙ্গ্রেসের প্রতি প্রযোয্য এবং কঙ্গ্রেসের যথার্থ অপরাধের পরিচায়ক হইলেও, উপরিউক্ত অভিযোগ দুইটার একটা অর্থাৎ প্রথমটা, এতই অসার, অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রকৃত এবং উহা পূর্ণ বয়স্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধিমান ও অল্পাধিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি যুক্ত বৈষয়িক লোক ও লেখকগণের প্রকৃত বা আরোপিত উক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেও, এতাধিক বালক-বিনিন্দী অনভিজ্ঞতায় পূর্ণ এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব জ্ঞাপক যে, উহা পরীক্ষা ও প্রতিবাদ উভয়েরই অযোগ্য; উপেক্ষাই উহার এক মাত্র প্রাপ্য। উহার অসারতার আলোচনায় অবশ্য কিছু কৌতুক ও হাস্য রসের অবতারণা ও উদ্দীপনা হইতে পারে; কিন্তু তজ্জন্য অনাবশ্যক আরও কতকটা স্থান গ্রহণ করিতে উৎসুক নহি।

তবে দ্বিতীয় অভিযোগটী একটু পরীক্ষা করিলেও চলে। উহা সর্ব্বথা পরীক্ষণীয়ই বটে, কিন্তু সম্যক বিশ্লেষণ ও বিচারের স্থল এখানে হইবে না। স্বতন্ত্র ভাবে, বিশেষ সমালোচনার তীক্ষ্ণ ও সন্নিকট দৃষ্টি নিক্ষেপে, ব্যয় "আই-টেম" নিচয়ের অঙ্কপাত করিয়া, রীতিমত গণনা ও বিষয়ের অভ্যন্তরস্পর্শী আলোচনা দ্বারাই তাহা সম্ভাব্য; তাহাতে হিসাবের অঙ্ক আবশ্যক, অজ্ঞাত ও অনির্দ্দিষ্ট উপাদানের উপর বা উপাদান-বিহীনতার উপর নির্ভর করিয়া, এবিষয়ে কোনও একটা "ঢালোয়া" কথা বলা চলে না;—বলা ভালও শুনায় না, আর বলাও বৃথা। সংক্ষেপে, কয়েকটী কথায় আমরা এই সারবান ও যৌক্তিক অভিযোগটী অতিক্রম করিয়া যাইতেছি।

ব্যয় ভিন্ন, সংসারের অতি তুচ্ছ ও সামান্য কার্য্যও সম্পন্ন হয় না। কংগ্রেসের মত বৃহৎ ব্যাপারে ব্যয়, বহু ব্যয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী—অনিবার্য্য। তবে কিনা, কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের বহিরঙ্গ গঠনে ও অঙ্গরাগের প্রসাধনে, যে অর্থরাশি ব্যয় হইতেছে, পরন্তু আরও অনেকানেক অবান্তর অস্থায়ী ও অল্পে-হইলেও-চলে এমন সকল বিষয়ে যে ব্যয়, শুনিয়াছি, সে ব্যয়ও নাকি প্রভূত হইয়া থাকে; তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ সাতগুণ কম হইয়া, উদ্বৃত্ত টাকা, উদ্দিষ্ট কার্য্যের উদ্ধারার্থে একান্ত আবশ্যকীয়, এবং একাল পর্য্যন্ত অল্পাধিক উপেক্ষিত বা একেবারেই বিস্মৃত, বিষয়নিচয়ে ব্যয়িত হইলেই উপযুক্ত হইত এবং প্রকৃত কার্য্য অধিকতর অগ্রসর হইতে পারিত। দরিদ্রা, চিরদুঃখিনী বিধবা মাতার সন্ততিগণের, বর্ণ বৈচিত্র্যে ও বাহ্য চাকচীক্যে, বাহ্যাড়ম্বর বা বিলাসকলার কিছুমাত্র সংস্পৃষ্ট বিষয়ে বহু ব্যয়ের প্রয়োজন কি?—সে ত কেবল অপব্যয় নয়, অতীব বিসদৃশ ও বৈরিগণের বিদ্রূপোত্তেজক ব্যয়। যে পরিমাণ ব্যয়ে জননীর সম্ভ্রমস্ততা রক্ষা হয়, তাহাই প্রচুর।

তত্রাচ, এই ব্যয়ের সপক্ষে, গুটি দুই তিন সাংসারিক ও সামাজিক সামান্য কথা, এবং কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যগত একটী উচ্চতর কথা অসঙ্কোচে উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন, উহার অন্তর্নিহিত সারগর্ভ মুখ্য কার্য্য সাধনা, স্বভাবতই কিয়ৎ পরিমাণে সামাজিক অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁড়াইবারই কথা। এক এক বৎসর এক এক প্রদেশের এক একটী স্থানে বহু প্রদেশের, বহুতর বিভাগের এবং উপবিভাগের, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক-প্রতিনিধি,—অতি সম্ভ্রান্ত অতি উচ্চ পদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি কংগ্রেসের ব্যবস্থানুসারে, আহুত ও আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন; এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩।৪ দিন মাত্র, অর্থাৎ কার্য্য সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত, তথায় অবস্থিতি করেন। এই ক'টী দিন তাঁহাদিগকে যথাবিহিত আদর আহ্বান করা, সম্মান সৎকার করা, তাঁহাদের আহার, শয়ন, উপবেশন, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা, কেবল সাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্য নহে,—উহা মনুষ্য-স্বভাব-প্রণোদিত অনিবার্য্য ক্রিয়া। স্বদেশে সমাগত বিদেশীয়দিগকে বিশেষতঃ স্বদেশে আমন্ত্রিত বিদেশীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে, একই ব্রতে বদ্ধ, একই সাধারণ কার্য্যসূত্রে সংযুক্ত সুহৃদবৃন্দকে, কিরূপে আদর যত্ন করিলে, কোথায় কোন্ সুখাসনে বসাইয়া সৎকার সম্মান করিলে, বাসনা মিটে, বহু ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া, বুকের উপর রাখিয়াও অতৃপ্ত আতিথ্য, অনুষ্ঠানের তৃপ্তি হয় না, ইহা সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পরন্তু, অপরাপর প্রদেশ হইতে, অপর্য্যাপ্ত আতিথ্যের আদর অভ্যর্থনা উপভোগ করিয়া আসিয়া, তাহার প্রতিদান করার স্পৃহাও স্বাভাবিক! অপিচ, আপন আপন প্রাদেশিক নগরের সম্ভ্রান্ততা, এমনকি এক মাত্রা অধিক গৌরব গরিমা প্রদর্শন করার প্রবৃত্তিও মনুষ্য-স্বভাবোচিতই বটে। অতএব, ঐ সকল বিষয়ের ব্যয় বরাদ্দ করিবার সময়ে, অর্থ-নীতির নিয়ম, স্বভাবতই মনে পড়ে না, দুঃখ দরিদ্রতার প্রতিও দৃষ্টি যায় না, আতিথ্য সম্পাদন ও স্বস্থানের সম্মান সংরক্ষণের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া, 'এষ্টিমেট' ফর্দ্দের অঙ্ক অবাধে স্ফীত করিয়া তুলে। এ কথাটা নিজের নিজের উপর খাটাইলে, থামকাই বুঝা যায়। যে দেশের অতি দরিদ্রও মাতৃ-পুণ্যার্থে, বাস্তুভিটা বাঁধা দিয়া, "দানসাগর" করিতে চাহে, বা যে দেশের নিঃস্ব লোকে ভিক্ষা দ্রব্য আনিয়া, দুর্গোৎসব করে, সে দেশের লোককে এ কথাটা নিশ্চয়ই বুঝাইতে হইবে না। অতএব, ইহা কিছুই বিচিত্র নয় যে বক্ষ্যমাণ বিষয়ে ব্যয়াধিক্য হয়।

তবুও প্রকৃত ও পুরা অতিথি সংকার হয় কি? আমাদের হিন্দু হিসাবে, তাহার কিছুই হয় না। কোনও আশ্রম ধর্ম্মী ও সমাজ-ধর্ম্মের স্বধর্ম্মানুসারে তাহা বোধ হয়, হয় না, ইহাই বড় আক্ষেপ। কংগ্রেস অধিবেশনে, অভ্যাগত প্রাদেশিক প্রতিনিধি ও ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেটগণের নিকট হইতে, তাঁহাদের আহারের ব্যয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যুগধর্ম্মে ইহা যাহাই হউক, আমাদের সমাজ-প্রচলিত প্রথানুসারে, ইহা কখনও হইতে পারিত না। আমরা অভ্যাগত ডেলিগেটদিগকে, বরং সামান্য কম্বলাসনে বসাইয়া কয়েকদিন, যৎকিঞ্চিৎ শাকান্নও খাওয়াইতাম; তথাচ আগন্তুকের আহার্য্য ও পেয় যোগাইয়া, কখনও তাহার মূল্য গ্রহণ করিতাম না। তাহা আশ্রম ধর্ম্ম, সমাজ ধর্ম্ম, সদাচার ও মনুষ্য স্বভাবের বিরোধী। চক্ষু লজ্জার ত কথাই নাই। হইলই-না-হয়, তাঁহারা আসিয়াছেন, সাধারণ কার্য্যে [illegible] আমাদের আশ্রমে। আমরা কোন্ [illegible] ম্লান বদনে, খোরাকির কয়েকটী [illegible] কং[illegible] কেতায় করিতেছেন। কাযেই [illegible]ও করিতেছেন। কিন্তু ইহা এ দেশের প্রথা নয়। মনে হয় স্বদেশীয় প্রথা সবই আগা গোড়া বাদ দেওয়াতেই, কংগ্রেস আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, এখন মনে কর যে স্বদেশী সাবেক প্রথানুসারে, ডেলিগেটদিগকে, যদি আহার দিতে হইত,—সত্য সত্য কিছু আর শাকান্ন দেওয়া যাইত না; যিনি যেমন ব্যক্তি, যিনি যে প্রণালীর আহার্য্যে অভ্যস্ত, তাঁহাকে তাহাই দিতে হইত এবং তাহাতে এখন অপেক্ষা আরও কত অধিক ব্যয় হইত, বিবেচনা কর।

তা, যতই ব্যয় হউক, কংগ্রেসের তাহাই করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহাতে সাধারণ-তহবিল ক্ষয় হইত না, নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইতে থাকিত। কিরূপে, এখনি অঙ্কপাত করিয়া ও প্রচুর নজির ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়া, দেখাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু, তাহার প্রয়োজন দেখিতেছিনা। ফলতঃ কংগ্রেসকে, কোনও কথা কর্ণে শুনাইবার, যদি আমাদের কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে উহার পরিচালকবৃন্দের নিকট, অন্ততঃ উহার বঙ্গীয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে, ডেলিগেট দিগের আহ্বান সম্বন্ধে, প্রচলিত বিদেশীয় ও বিসদৃশ প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহার স্থলে স্বদেশীয় সনাতন রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা করিতাম। এবং তজ্জন্য প্রকৃত পক্ষে, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে, করিতে হইলেও আমরা তাহাতে অসম্মত হইতাম না, সর্ব্বাগ্রেই ঝুলিস্কন্ধে ঝুলাইতাম। এক কথায়, এখন এই "রিসেফ্সনের" ব্যবস্থাটা, যে মিশ্রিত প্রণালীতে, হওয়ার কথা শুনিয়াছি, তাহা অর্থনীতি ও সমাজ নীতি, উভয়ের কাহারও পুরা অনুমোদিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ দুয়ের কেহই পুরাপুরি ভাবে উহার মধ্যে নাই।

অতঃপর, এসম্বন্ধে কংগ্রেসের সমর্থক আর একটা সামান্য কথা এই যে, উহার বার্ষিক অধিবেশনে, সন সন যে ব্যয়টা হইয়া থাকে, সে টাকাটা সবই, কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পরিচালকবৃন্দ ও প্রাদেশিক পৃষ্ঠ-পোষকগণ পরস্পরের মধ্যে স্বতঃ পরতঃ সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সমগ্র দেশ হইতে, অর্থ উঠেনা, উঠাইবার উপযুক্ত তেমন উপায় ও চেষ্টাকরা হয়না। সমগ্র দেশ হইতে অর্থ উঠিলে কি রক্ষা থাকিত? এতদিন সবদিকে, "সামাল সামাল" শব্দ উঠিত। কংগ্রেসীগণ তাহার কোনও পথ করিতে পারেন নাই, সেই খানেই তাঁহাদের স[illegible] ত্রুটি। এখন তাঁরা আপনাদেরই টাকা আপনারা [illegible] করিতেছেন, তাহাতে অপরের কথা কহিবার অধিকার কি[illegible] আমরা শ্রমজীবী সামান্য রায়ত, তাহাতে একেবারেই কোন কথা কহিতে পারি না। জমিদারেরা প্রকাশ্যে ও গোপনে এখন যে টাকাটা, এ তহবিলে দেন, টাকাটা নেহাত কম[illegible] না হইতে পারে,—সে টাকাটা অবশ্য রায়তেরই টাকা বটে[illegible] রায়তের ঘরে রায়তের গা-খামান কড়ি বই, তাহা আ[illegible] কিছুই নয়। তথাচ রায়ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে টাকা দেয় না সে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, সবই দিয়া থাকে জমিদার বাবুদিগকে কাযেই সব ব্যাপারেই সে নির্ব্বাক। বোঝেই না কিছু তা আর বলিবে কি! বোঝাই বহিয়া মরে, কিছুই বো[illegible] না। কংগ্রেস যদি কখনও সেই অবোধকে বুঝাই[illegible] পারেন, সেই অবাকের মুখে বাক্য দিতে পারেন, রায়তে[illegible] বিন্দু বিন্দু রক্তে যদি কংগ্রেসের দেহ কখনও পুষ্ট হয়, তথা[illegible] জানা যাইবে যে, কংগ্রেস এ দেশে টিকিয়াছে ও তাহা উদ্দেশ্য সাধনের শক্তি সামর্থ্য সঞ্চয় করিয়াছে। [illegible] আশা এখন "আকাশ কুসুম।" আকাশ-কুসুম[illegible]

আসল পুষ্পে পরিণত করিতে সম্ভবতঃ আমাদের এখনকার এই কঙ্গ্রেস—এই শীতল কোমল "কুসুম কঙ্গ্রেস' পারিবেন না। তজ্জন্য "কুঠার কঙ্গ্রেস" জন্মিবে। কুসুম, কালে "ক্রিষ্টালাইজড্" হইয়া লৌহ হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব হইতেও পারে যে, এই "কুসুম কংগ্রেস" কুঠার কংগ্রেস" কে উত্থিত করিয়া, ও তাহাকে স্বকীয় আসন দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিবে।

বলা বাহুল্য, তবুও খুলিয়া বলা ভাল যে, এই কয়টা কথা একটু "আলঙ্কারিক" ও এক বিন্দু আবৃত হইলেও, ইহার একটা কথাও "আন্‌কনষ্টিটিউসনল" ও "আনকোরটিউস' নয়। যে "ডেমোক্রেটিক ফিডারেশন" উপস্থিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি, এ-স্থলে কল্পিত ও উত্থান সম্ভাব্য ভবিষ্য কংগ্রেসের করণীয় কার্য্য বলিয়া অনুমিত, তাহা আধুনিক য়ুরোপীয় রাজ-বিধির বিরোধী নয়; প্রত্যুত তাহা আধুনিক য়ুরোপীয় হিসাবেই "ইম্পিরিয়ালিজমের" আবশ্যকীয় একটী অঙ্গেরই মধ্যে। পরন্তু সেরূপ "ডেমোক্রেসী" দিকে এ দেশের পুরুষ পরম্পরাগত ও স্মরণাতীত কাল প্রচলিত ও নানা সময়ে নানা, আকারে পরিবর্ত্তিত, শীতন ও পলিত গলিত "আরিষ্টোক্রেসির" দুর্জ্জয় ও দুর্গন্ধময় আবহাওয়ায়, এবং অপর দিকে, এ দেশীয় সামাজিক ও বৈষয়িক বদ্ধমূল দাসত্বের ও দাসত্বের জ্ঞানান্ধতার গাঢ় অন্ধকারে, উদ্ভব হওয়া অসম্ভব। প্রাচ্য ভূমির এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও শোধন আলোক বিন্দু বিরহিত অন্ধকার রাশি, সমূলে উৎপাটন করিয়া, তথায় পাশ্চাত্য প্রজাশক্তির সতেজ শোণিত সঞ্চার করা সহজসাধ্য হইবে না; তাহার জন্য কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। ইহাই ঐ কয়টা কথার অর্থ।

ব্যয় সম্বন্ধে শেষ সামান্য কথাটা এই যে, রঙ তামাসা নাচ মুজরা, ও মজলিস মফেলে এবং তদনুরূপ ও তাহারও অপেক্ষা সামান্য ও জঘন্য অকিঞ্চিৎকর ও হেয় ব্যাপারে, ঐশ্বর্য্যশালী ও ইদানী মধ্যবৃত্তবর্গেরও কত অর্থ উড়িয়া যাইতেছে। এক "বারইয়ারী"তেই প্রতি বৎসর কত কত লক্ষ বিনা বাক্য-ব্যয়ে বারির মত ব্যয় হইয়া যায়। শাফ অমিতাচার ব্যসন ও ব্যভিচারে, এই নগরে, নিত্য রজনীতে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ধ্বংস হইয়া শত শত শরীর ও আত্মার ধ্বংস হইয়া থাকে। নিত্য নিয়মিত ভাবে, এই অর্থরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। পরন্তু, নৈমিত্তিক নৈশ অনাচারের অপব্যয়ে, এই সহরেই, কত কত লক্ষ রাজপথের গ্যাসের বাতি না নিবিতে নিবিতেই গলিয়া যায়, তাহা ও গণনাতীত। এই সব অপব্যয় অপচয়ের—এই সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় পর্ব্বত অনিবার্য্য, অপরিমিত বর্দ্ধিত ও স্ফীত; দেদীপ্যমান সকলেরই সমক্ষে দণ্ডায়মান। পুরোহিত, পাদরী, ধর্ম্মযাজক, নীতি শিক্ষক, সমাজ সংস্কারকাদি থাকিতে হয় আছেন; উহারা যেমন আছে, ইঁহারাও তেমনি আছেন। ইঁহাদের অস্তিত্বে; উহাদের অস্তিত্বের ও উন্নতির এক বিন্দুও ব্যাঘাত হয় নাই। ইঁহাদের অস্তিত্ব উহারা একেবারেই আমলে আনে না, গণনার মধ্যেই গ্রহণ করে না; কিন্তু, উহাদের অস্তিত্বহেতু, বরং ইঁহারা বাঁচিয়া আছেন ও বর্দ্ধিত হইতেছেন। কই কখনও ত আমাদের কোন অর্থনৈতিক ও সাধারণের সুখ দুঃখের সমালোচক ও দেশের আয় ব্যয় ব্যবস্থার পরিদর্শক, ঐ সকল নিত্য নৈমিত্তিক অমিতাচার-জনিত অপরিসীম অপব্যয়ের বিরুদ্ধে বাঙনিষ্পত্তি করেন না। দেশের দুর্ভিক্ষ দরিদ্রতা, দুর্গতি, কই কখনও তো, উহাদের সুপ্রসর রাজপথ, এক মুহূর্ত্ত কালও আটকাইয়া দাঁড়ায় না। অথচ ঐ অপব্যয়গুলা কিছু আর নেহাত বনের পশুতে করে না। প্রধানতঃ সমাজের ঐশ্বর্য্যশালী, মান্য গণ্য বড় বড় লোকেরাই করেন। আর তাঁহাদের স্ব স্ব শ্রম-লব্ধ অর্থও তো উহা নহে। অপরের শোণিত মেধ অস্থিতে গঠিত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ, তাঁহারা যথেচ্ছাচারে, জলবৎ প্রবাহিত করিয়া দিয়া, পুনঃ অন্নক্লিষ্ট শ্রমেরই শোণিত মোক্ষণে জলৌকা প্রয়োগ করেন! জলৌকা-মুখে মোক্ষণ ও যথেচ্ছাচার-সুখে ব্যয়ভূষণ উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ চলিতেছে। অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সব নীতিই, এ ক্ষেত্রে নির্ব্বাক। অনিবৃত্ত অনিবার্য্য বলিয়াও নির্ব্বাক, আরও নানা কারণে নির্ব্বাক। সর্ব্বোপরি, উহা নিবারণ বা ছেদনের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নূতন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন, সে হাতিয়ার গঠনসাপেক্ষ, তাহা এ দেশ প্রচলিত অতীত ও বর্ত্তমান কোন নীতিতেই নাই। কাযেই নীতি বা নৈতিকগণ নির্ব্বাক। বরং পুরোহিত প্রভৃতি পাপ দুর্গের মামুলী প্রহরী বা পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে, বাক্য স্ফূর্ত্তি, সমালোচকদের মুখে হয়;

কিন্তু দৃঢ় দুর্গস্থিত সেই নিৰ্বিঘ্ন দ্রব্যনিচয়,—অমিতাচার, ঐশ্বর্য্যের অপচার, সাধারণ ভাণ্ডারের কোটী কোটী স্বর্ণের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, কে কথা কহিবে! কাহার এত স্পর্দ্ধা! আর উহাদের আর সবই ত আর অপ্রকাশ্য ও নীতি অননুমোদিত নয়।

উপরে আমরা যে কয়টা অপব্যয়ের "হেড" দিয়াছি, সকলেই জানেন, তাহার দুই একটা মাত্র কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন; কি না open secrets আর অবশিষ্ট সব কয়টীই পুরাতন ও নূতন সামাজিক [illegible] ও প্রচলিত নীতি [illegible] র্থিত হইয়া থাকে। [illegible] প্রতিমা দালানে বা [illegible] বা উদ্দেশে অসমক্ষে, [illegible] ও সব মঞ্জুর। সম্বন্ধ সাধারণের হইলে, "বারইয়ারী"। বশ্‌ নিশ্চিন্ত। কার বাপের সাধ্য কথা কয়! 'বারইয়ারী' একে, দুয়ে দেব-[illegible] দুনিয়ার যত কিছু দুর্গন্ধ আছে, বারইয়ারী-[illegible] তাহা সবই অবাধ বিধেয়, সবই সুগন্ধ অপব্যয়ের [illegible]ই ভাবি, ততই বেশি বাহাদুরী। পরন্তু, ব্যাপার যদি [illegible] ছোট বা মধ্যবৃত্ত বাবু বাড়ীতে হইল, তবে তাহা ব্যক্তিগত বৈভবের বিশেষ অনুষ্ঠান অতএব ব্যসন কেবল মঞ্জুর নয়, যশস্কর। পীঠ-বস্ত্র,—যৎসামান্য ব্যয়ে, অল্লাধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীকে, কিছু কিছু আহার্য্য ও দুই চারিটা করিয়া পয়সা বিতরণ। ইহাতেই সর্ব্বপাপক্ষয়। কিন্তু, এই "পাপক্ষয় কর" পদার্থত্রয়,—দেব প্রতিমা, বামুন ও কাঙালীও, ক্রমে "ইজেষ্ট" হইতে বসিয়াছে। এসব আবরণ-দান অনুষ্ঠান এখন না হইলেও চলে। বিশেষতঃ বাগান পার্ট ও সাহেবি-আনা, গায়রহে কিছুই লাগেনা।

সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ সাহেব সুবারাও এসব সৎকীর্ত্তি-ক্ষেত্রে সুভাগমন করিয়া ও কৃতী-গণের মুরুব্বি হইয়া, তাহাদের পুরুষার্থের প্রসার ও পরামার্থের ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া থাকেন। অমিতাচারে অপব্যয়ের আর অধিক কি সাপোর্ট ও সার্টিফিকেট চাই? কিন্তু, এসব হইল মঞ্জুরি ও মিশনারি "আইটেমস"। ইহাতে লুকোচুরি কিছুই নাই। লুকোচুরি যাহাতে কিছু কিছু এতকাল ছিল, সভ্যতা ও সরলতার [illegible] সে "লুকোচরি" এখন শাফ সরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহাকে দিব্য দিবালোকে দীপ্যমান ও দর্শনীয় হইয়া সদর্পে আত্ম-স্বরূপ প্রচার করিবার অবসর দিতেছে। ইহাদের সমর্থ মুখপত্র, লিপি-কুশল অসংখ্য সমর্থক ও কলা-প্রিয় প্রতিপালক ও "পেট্রন" গণ-দেখা-দিয়াছেন, এবং অনুপেক্ষনীয় প্রভাবে ইহাদের পক্ষ সমর্থন ও পুষ্টি সাধন করিতেছেন।

সভ্যতার এই সদ্য অভিব্যক্ত অভিনব "স্পীরিট" কে কঙ্গ্রেসের স্পীরিট কি বলিবেন? শেষে ইতিহাসে ত উঠিবে না যে, তাহারা একত্রে একই জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন।

এখন কথাটা এই যে, প্রতিবৎসর এই সকল "আইটেম" যদি সমগ্র ভারতবর্ষে পাঁচসাত [illegible] বাক্যব্যয়ে মঞ্জুর করা যায়, তবে ব[illegible] অধিবেশন ও কনফারেন্স ক[illegible] অধিবেশনে, মোট ৭০।৭৫ হাজার [illegible] খানেক টাকা কি খুবই বেশি! [illegible] কঙ্গ্রেসীগণেরও বোধহয় সকলেরই ইচ্ছা যে, ইহা অপেক্ষা আরও কমব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। যাউক এসব অতি তুচ্ছ ও অবান্তর কথা, যদিও তাহা বলিতে বলিতে স্থান ও সময় অবসান হইয়া আসিয়াছে।

কঙ্গ্রেসের বহু বহু লক্ষ্য, কর্ত্তব্য ও মন্তব্যের মূল ও [illegible] ভাষা হইতে 'সার সঙ্কলন' করিয়া, এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র লেখক—আমরা মোটের উপর উহার দুইটা সর্ব্ববিষয় ব্যাপী উদ্দেশ্য বুঝিয়া, তাহারই সাধন কল্পে কঙ্গ্রেসের কৃতকার্য্যের ও অকৃত কার্য্যের পরিমাণের একটা 'সরদর' স্থূল হিসাব করিয়া থাকি। আমাদের এই একটা "ঘরো[য়া] হিসাব" এই ষোলবৎসর যাবৎ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই, করিয়া আসিতেছি। কেন? ঠিক বলিতে পারিনা। কঙ্গ্রেস [illegible] কঙ্গ্রেসের কোনও বিশেষ নিকটবর্ত্তী লোকের সহিত কোন সম্বন্ধ সংস্রব আমাদের নাই;—আমরা সকল দিকে প্রকৃতই তাহার অযোগ্য। কিন্তু, কঙ্গ্রেস হওয়ার [illegible] হইতে, আমাদের তখনকার সেই তরুণ-চিত্তের স[illegible] কল্পনায়, কেমনই একটা অনির্দ্দিষ্ট, অবক্তব্য, সুদূর [illegible] মোহের মহা-রাজ্যস্থিত, অদ্ভুত—পূর্ব্বভাব আসিয়া প্র[illegible] করিয়াছিল, যাহা, একাদি ক্রমে এই ষোল বৎসর ক[illegible] কঙ্গ্রেসকে, উহার অস্তিত্বের ও অবস্থার, অবস্থিতির মা[illegible]